সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯

বিশ্বভারতী পত্রিকা

লং প্লেইং ও অটোকাপলিং রেকর্ডে

রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য

ফাল্গুনী

LONG PLAYING JNLX1001
AUTO-COUPLING JNG10051-56

• তৎসহ আরো কয়েকটি রবীন্দ্র সংগীত •

রুমা গুহঠাকুরতা

J. N. G. 6128 | কোথা বাইরে দূরে
ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়

J. N .G. 6127 | তুমি মোর পাওনাই পরিচয়
বলো গোলাপ বলো

ঋতু গুহঠাকুরতা ও
অর্ঘ্য সেন (দ্বৈত সংগীত)

J. N. G. 6126 | আমরা সবাই রাজা
পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে

বন্দনা সিংহ

J. N. G. 6132 | মম মন উপবনে
ও আমার চাঁদের আলো

॥ কথা ও সুর ॥ রবীন্দ্রনাথ

MEGAPHONE
CALCUTTA

মেগাফোন কোং
কলিকাতা-৯

medium-NG-1/62

প্রতি মাসের স্মরণীয় বই
৭ তারিখে আমাদের নূতন বই অ্যাসোসিয়েটেড-এর
প্রকাশিত হয় প্রস্তুতিথি

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

বিশেষ প্রকাশনা : ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৩ শকাব্দ ১০.০০

ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহের—আকাশ ও পৃথিবী

প্রাচীন মানুষ যা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল তা হলো আকাশ ও পৃথিবী। তারই রহস্যময় পরিচয় সরস গল্পের ভঙ্গিতে লেখা। পাতায় পাতায় অসংখ্য চিত্রের সন্নিবেশ। মানুষ ও প্রকৃতি, সৌরজগৎ, নক্ষত্রজগৎ, মহাজাগতিক রশ্মি, মহাকাশ-জয়ের পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ সরস সচিত্র সবিস্তার বর্ণনা। সুকুমারমতি বালক বালিকা থেকে প্রবীণ ও পণ্ডিত সকল শ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন ও অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করবার অদ্বিতীয় গ্রন্থ।

শ্রীদিলীপকুমার রায় সঙ্কলিত—দ্বিজেন্দ্র কাব্য সঞ্চয়ন ৮.৫০

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, সুরকার জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্রের ভূমিকা ও শ্রীদিলীপকুমার রায়ের কাব্য-সমালোচনা সমৃদ্ধ।

হাসির গান, আষাঢ়ে, মন্দ্র, আলেখ্য, ত্রিবেণী, গান, নাট্য-কাব্য (সীতা, পাষাণী, সোহরাব-রুস্তম, ভীষ্ম) প্রভৃতি সঙ্গীত ও কাব্যগ্রন্থ ও দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীত, ধর্ম-সঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত ও খণ্ড-কবিতার সঙ্কলন।

সুধীরচন্দ্র সরকারের—বিবিধার্থ অভিধান ৬.৫০

এই অভিধানে আছে—বাংলা বিশেষার্থক শব্দ ও কথা (Idioms & Phrases—অর্থসমেত)। বাংলা প্রবাদ ও প্রবচন (প্রত্যেক প্রবাদের অর্থসমেত) .বাংলায় আগত বিদেশী শব্দ। বাংলায় আগত অন্য ভারতীয় শব্দ। যুদ্ধোত্তর নূতন বাংলা কথা। বাংলা-ভাষার অপশব্দ (Slang Words) গ্রাম্য শব্দ। অনুকার শব্দ। সাংবাদিক নূতন বাংলা শব্দ। বাংলা দ্বিত্ব শব্দ। বিপরীতার্থক শব্দ। সমষ্টিগত শব্দের তালিকা। বৃহৎ ও ক্ষুদ্রবাচক শব্দ। পরিভাষা—(বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ক পরিভাষা)। উপরোক্ত বিষয় ছাড়া আরো অনেক আবশ্যকীয় বিভাগ আছে। প্রায় পনরো হাজার শব্দের সমন্বয়ে গ্রথিত।

কাজী আবদুল ওদুদের—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১২.০০

রবীন্দ্রকৃতির সুবিস্তীর্ণ আলোচনা। রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র কাব্য-সাহিত্য-দর্শনের বিশ্লেষণমূলক এই বিপুল গ্রন্থখানি রবীন্দ্র-দর্শনের সমস্ত দৃষ্টি-কোণকে পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিবে।

ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্যের—বাংলা কাব্যে শিব ১০.০০

পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় প্রসারিত শিবের রূপ এবং সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা পর্যন্ত তার রূপান্তরের অদ্বিতীয় পর্যালোচনা। এতে বর্ণিত হয়েছে : শিবের উৎসমূল। ভারত শিব। প্রাচীন কাব্যে দেবতা ও মানব শিব। আধুনিক কবিতায় শিব ও শৈবতত্ত্ব : ইত্যাদি।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রাম : কালচার ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১

বাংলা সাহিত্যের কয়েকখানি বরণীয় গ্রন্থ

॥ সাহিত্য-বিষয়ক ॥

বিমানবিহারী মজুমদার : **ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য** ১৫·০০ ; **পাঁচ শত বৎসরের পদাবলী** ৭·৫০ ॥ অজিত দত্ত : **বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস** ১২·০০ ॥ মদনমোহন গোস্বামী : **ভারতচন্দ্র** ৩·০০ ॥ ভবতোষ দত্ত : **চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র** ৬·০০ ॥ রথীন্দ্রনাথ রায় : **সাহিত্য-বিচিত্রা** ৮·৫০ ॥ নারায়ণ চৌধুরী : **আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন** ৩·৫০ ॥ অরুণ মুখোপাধ্যায় : **উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য** ৮·০০ ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ : **আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য** ৮·০০ ॥ সত্যব্রত দে : **চর্যাগীতি-পরিচয়** ৫·০০ ॥ অরুণ ভট্টাচার্য : **কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল** ৪·০০ ॥ প্রশান্ত রায় : **সাহিত্য দৃষ্টি** ৪·০০ ॥ সাধনকুমার ভট্টাচার্য : **রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা** ৬·০০ ; **নাটক ও নাটকীয়ত্ব** ২·৫০ ; **নাটক লেখার মূলসূত্র** ৫·০০ ॥ আজ্‌হারউদ্দীন খান্‌ : **বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল** ৫·০০

॥ জীবনী সাহিত্য ॥

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য : **বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-কাহিনী** ১·৫০ ॥ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : **বঙ্গের প্রাচীন কবি** ১·০০ ॥ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : **ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ** ৫·০০ ; **শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে** ৫·০০ ॥ বলাই দেবশর্মা : **ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়** ৫·০০ ॥ প্রভাত গুপ্ত : **রবিচ্ছবি** ৬·০০ ॥ খাজা আহম্মদ আব্বাস : **ফেরে নাই শুধু একজন** ৪·০০ ॥ মণি বাগচি : **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ** ৪·৫০ ; **মাইকেল** ৪·০০ ; **কেশবচন্দ্র** ৪·৫০ ; **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র** ৪·৫০ ; **রামমোহন** ৪·০০ ॥

॥ বিবিধ গ্রন্থাবলী ॥

প্রবোধচন্দ্র সেন : **রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি** ৩·০০ ॥ অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় : **সমসাময়িক মনোবিজ্ঞান** ৪·০০ ॥ রাধাকৃষ্ণণ : **হিন্দু সাধনা** ৩·০০ ॥ তারাপ্রসন্ন দেবশর্মা : **রামায়ণতত্ত্ব** ৪·৫০ ॥ দীনেশচন্দ্র সেন : **রামায়ণী কথা** ৪·০০ ॥ ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী : **রামায়ণের কথা** ১·২৫ ; **ভারতজিজ্ঞাসা** ৩·০০ ; **মনোবিদ্যা ও দৈনন্দিন জীবন** ২·৫০ ॥ শিশিরকুমার নিয়োগী : **সহজ কৃত্তিবাসী রামায়ণ** ৩·৫০ ॥ বিশ্বেশ্বর মিত্র : **পৃথিবীর ইতিহাস প্রসঙ্গ** ৩·৫০ ॥ কল্যাণী কার্লেকর : **ভারতের শিক্ষা** ১ম খণ্ড ২·৫০ ; ২য় খণ্ড ৫·৩০ ॥ প্রফুল্লকুমার দাস : **রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রসঙ্গ** ১ম খণ্ড ৩·৫০ ॥ সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় : **আফ্রিকার চিত্র** ১·৫০ ॥ সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় : **লাইবেরিয়ার উপকথা** ১·৫০ ॥ সুনীলকুমার গুহ : **স্বাধীনতার আবোল তাবোল** ৫·০০ ॥ সত্যকিঙ্কর সাহানা : **হিন্দুধর্ম** ১·৫০ ; **বিবিধ প্রবন্ধ** ২·৫০ ; **বিচিত্র প্রবন্ধ** ২·৫০ ॥ মণীন্দ্র সমাদ্দার : **প্রবাসী বাঙালীর কথা** ১·৫০ ॥ মানবেন্দ্রনাথ রায় : **মার্কসবাদ** ১·৫০ ; **দর্শন ও বিপ্লব** ১·৫০ ॥ শ্রীজ্ঞানান্বেষী : **দেশবিদেশের শিক্ষা** ৪·০০

॥ গল্প ও উপন্যাস ॥

বুদ্ধদেব বসু : **আমার বন্ধু** ২·০০ ; **চারদৃশ্য** ২·৫০ ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : **লক্ষ্মী** ২·০০ ; **হাসি** ২·০০ ॥ বাণী রায় : **শূন্যের অঙ্ক** ২·৫০ ॥ সুবোধ মজুমদার : **অন্তর ও বাহির** ২·০০ ; **পলাতক** ৩·০০ ॥ বিদ্যুৎবাহন চৌধুরী : **অনুস্মৃতি** ২·৫০ ॥ কল্যাণী কার্লেকর : **কন্যা ও কুমার** ১·৭৫ ॥ সুধীররঞ্জন গুহ : **ময়নানদী** ৩·০০ ॥ সুবোধ বসু : **মানবের শত্রু নারী** ২·০০ ; **স্বর্গ** ২·০০ ; **পুনর্ভব** ২·৫০ ; **উর্ধ্বগামী** ৩·০০ ; **চিমনি** ৩·০০ ; **ইঙ্গিত** ২·৫০ ; **পদ্মা প্রমত্তা নদী** ৩·৭৫ ; **গল্পলতা** ৪·০০ ; **পদ্মানদীর ডাক** ১·৭৫ ॥ সুকুমার রায় : **কয়েকটি গল্প** ১·০০ ॥

জিজ্ঞাসা ॥ ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ : ১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

॥ 'বেঙ্গল'এর বই মানেই সবসেরা লেখকের সার্থক সৃষ্টি ॥

সদ্য প্রকাশিত

বৈদেশিকী পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত নব সংস্করন ৫.৫০

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। রামায়ণ, মহাভারতের মতো প্রতীচীর মহাকাব্যগুলি থেকে চয়ন করে এনেছেন অজস্র পুরাতনী কথা। অজস্র ছবি সম্বলিত ৫.৫০

AFRICANISM Rs. 16/

রাশিয়ার ডায়েরী

অজস্র দুষ্প্রাপ্য ছবি। নয়নাভিরাম প্রচ্ছদ

কথাশিল্পী প্রবোধকুমার সান্যালের সাহিত্যসৃষ্টি তুলনাহীন। এই অদ্বিতীয় স্রষ্টা ভ্রমণ-সাহিত্যের পথিকৃত তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন নতুন করে উপস্থাপিত করেছেন এই আশ্চর্য-সুন্দর আভনব গ্রন্থে। পঁচিশ টাকা।

দেবতাত্মা হিমালয় ১ম খণ্ড ১০ম মুঃ ৯.০০। ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ মুঃ ১০.০০

প্রখ্যাত সাহিত্য-কর্মী ও গবেষক বিনয় ঘোষ -কৃত

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১ম খণ্ড ১২.৫০

উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির উপকরণ তদনীন্তন বাংলা সাময়িকপত্র থেকে এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম খণ্ড এবং কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার রচনাবলী এই প্রথম খণ্ডে সংকলিত হল। অতি দুষ্প্রাপ্য, জীর্ণ ও ব্যবহারের অযোগ্য পত্রিকা ঘেঁটে বাংলার অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে যাবতীয় উপকরণ এই সংকলনে বিষয়ভেদে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিস্তারিত সম্পাদকীয়, প্রাসঙ্গিক তথ্য ও টীকা সংযোজিত। ১৮৪০ সন থেকে ১৯০৫ সন পর্যন্ত বিষয় সংকলিত। এই ধরনের আরো ক'টি খণ্ড প্রকাশিত হবে।

বাঙালীর নবজাগরণ-ইতিহাসের প্রাথমিক আকরগ্রন্থ

গ্রন্থ-প্রকাশনে ভারত ও বাংলা সরকারের অর্থানুকূল্যের জন্য বৃহৎ রয়েল অক্টাভো সাইজের ৬০০ পৃষ্ঠার বই, আর্টপ্লেট ও বোর্ড-বাঁধাই সমেত নামমাত্র করা হয়েছে। ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, সমাজকর্মী সকলের পাঠযোগ্য অতুলনীয় গ্রন্থ।

॥ উল্লেখযোগ্য বই ॥

আনন্দকিশোর মুন্সীর
ভেলকি থেকে ভেষজ ৩য় মুঃ ৬.৫০
অশোক মিত্রের
ভারতের চিত্রকলা ১৫.০০
দেবেশ দাশের
ইয়োরোপা ৭ম মুঃ ৩.০০
বুদ্ধদেব বসুর
স্বদেশ ও সংস্কৃতি ২য় মুঃ ৪.০০
হুমায়ুন কবিরের
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ৩য় মুঃ ৩.৫০
দেবজ্যোতি বর্মণের
আধুনিক ইয়োরোপ ৩.২৫

প্রমথনাথ বিশীর
বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ৪র্থ মুঃ ৪.৫০
সৈয়দ মুজতবা আলীর
চতুরঙ্গ ১৪শ মুঃ ৪.৫০
গোপাল হালদারের
আড্ডা ২য় মুঃ ২.০০
নলিনী দাশগুপ্তের
বৈদিক ও বৌদ্ধশিক্ষা ৬.০০
বিনায়ক সান্যালের
রবি-তীর্থ ৪.০০
সরলাবালা সরকারের
হারানো অতীত ৩.০০
বিক্রমাদিত্যের
যুদ্ধের ইয়োরোপ ৪.০০

নারায়ণ চৌধুরীর
বাংলার সংস্কৃতি ৩.০০
বীরেন্দ্রমোহন আচার্যের
আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ২য় মুঃ ৭.৫০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আমার কালের কথা ২য় মুঃ ৪.০০
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
আয়ুবের সঙ্গে ২.০০
শশিভূষণ দাশগুপ্তের
ব্যান ও বন্যা ৩.০০
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
বিগত দিন ৩.৫০
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
চরণিক ৩.০০
শিবনাথ শাস্ত্রীর
ইংলণ্ডের ডায়েরী ৪.০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

জওহরলাল নেহরুর
"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার। সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় গৃহীত মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন যুগের ক্রমিক চিত্রাবলী নিয়ে লিখিত একখানা শাশ্বত গ্রন্থ। জে. এফ. হোরাবিন -অঙ্কিত ৫০খানা মানচিত্রসহ প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ॥

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫'০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
আত্মচরিত
সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ : ১০'০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
ভারতকথা
দাম : ৮'০০ টাকা

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন
সচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ : ৭'৫০ টাকা

আর. জে. মিনির
চার্লস চ্যাপলিন
সচিত্র দাম : ৫'০০ টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ
তৃতীয় সংস্করণ : ২'৫০ টাকা
অনাগত। উপন্যাস : ২'০০ টাকা
ভ্রষ্টলগ্ন। উপন্যাস : ২'৫০ টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য। কবিতা-সঞ্চয়ন : ৩'০০ টাকা

ত্রৈলোক্য মহারাজের
গীতায় স্বরাজ। দ্বিতীয় সং : ৩'০০

মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে : ২'৫০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লি.
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্রেমের গল্প ৪'০০
তিন শূন্য ৩'৫০

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
রূপসী রাত্রি ৫'০০
যে যাই বলুক ৬'০০
প্রচ্ছদপট ৩'৫০
প্রেমের গল্প ৪'০০

শ্রীসুবোধ ঘোষের
ভারত প্রেমকথা ৬'০০

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
সারা রাত ৪'০০
মনের মানুষ ৩'০০
প্রেমের গল্প ৪'০০

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের
তিন দিন তিন রাত্রি ৫'০০
ময়ূরী ৩'০০

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারীর
রবীমানসের উৎস-সন্ধানে ৩'৫০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের
বিবেকানন্দ চরিত। ১০ম সং : ৬'০০
ছেলেদের বিবেকানন্দ। ৬ষ্ঠ সং : ১'২৫

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের
চিন্ময় বঙ্গ। তৃতীয় সং : ৪'০০

সরলাবালা সরকারের
গল্পসংগ্রহ ৫'০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি.
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

বাক্-সাহিত্যের বই

শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত

রবীন্দ্রায়ণ

রবীন্দ্রদর্শন ও মননের যাবতীয় দিক সম্বন্ধে স্বীকৃত পণ্ডিতদের রচনাবলী সমন্বিত। দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খণ্ডের দাম দশ টাকা।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সাংস্কৃতিকী

'সাংস্কৃতিকী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃতি, কোল-জাতির সংস্কৃতি, যবদ্বীপের মহাভারত, রামায়ণ, কুরল, দরাফ খাঁ গাজী, সূফী অনুভূতি ও দর্শন, অল্-বীরুনী ও সংস্কৃত ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। দাম—৫'৫০

বিনয় ঘোষের নতুন বই

সুতানুটি সমাচার

উইলিয়াম হিকি, এলিজা ফে, ফ্যানি পার্কস, ভিকতর জ্যাকমো প্রভৃতি বিখ্যাত ইংরেজ ও ফরাসী প্রত্যক্ষদর্শী পর্যটকদের স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনী অবলম্বনে রচিত, প্রায় দুশো বছর আগেকার কলকাতা শহরের বিচিত্র সমাজচিত্র ও জীবনালেখ্য। একুশখানি অতি দুষ্প্রাপ্য আর্টপ্লেট সংবলিত। দাম—১২'০০

বিদ্রোহী ডিরোজিও

বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ইতিহাসে ভিভিয়ান ডিরোজিও উনিশ শতকের প্রথম পর্বে সমাজসংস্কারে ও জীবনদর্শনে যে বৈপ্লবিক চিন্তার প্রেরণা যুগিয়েছিলেন তা বাঙালীর স্মরণ করা কর্তব্য। ডিরোজিওর বিস্ময়কর জীবনকাহিনী বাংলা ভাষায় এই প্রথম লিপিবদ্ধ হল। দাম—৫'০০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত

সাহিত্য-সংস্কৃতি-সময়

বিগত ও বর্তমান কালের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে মননশীল লেখকের নিরপেক্ষ আলোচনা ও বিশ্লেষণ আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্যের গর্বের বস্তু। দাম—৪'০০

বীরেন্দ্রমোহন আচার্য প্রণীত

আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ ও পদ্ধতি

শিক্ষক-শিক্ষণ-শিক্ষার্থীদের পক্ষে অপরিহার্য বই। দাম—৯'০০

বাক্-সাহিত্য

৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশ অপেক্ষায়

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কৃত

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এই মৌলিক গ্রন্থ। ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মূল্যবান গ্রন্থখানি প্রকাশে আর্থিক সাহায্য করায় আশাতীত হ্রাস মূল্য ধার্য হবে। উৎকৃষ্ট ছাপা, বাঁধাই ও প্রামাণ্য চিত্রপট।

ভিন দেশীর

কুলীন কলিকার পাঁচালি

ব্যঙ্গরস সিঞ্চিত বর্তমান সমাজ চিত্র লেখক অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। বিদগ্ধজনের অভিনন্দন ধন্য। মূল্য দু' টাকা।

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষের

বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই সুকল্পিত, সুবিন্যস্ত ও সুলিখিত গ্রন্থখানি হাস্যরস ও তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য কোষ গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করবে। চৌদ্দ টাকা।

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্তের

নজরুল-চরিত-মানস

কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সৃষ্টি সম্বন্ধে এমন ব্যাপক আলোচনা ইতিপূর্বে আর হয়নি। দশ টাকা।

সুধীরচন্দ্র করের

রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্রপরিচয়

বহুগ্রন্থের মধ্যেও এগ্রন্থ হারিয়ে যাবার নয়। সাড়ে তিন টাকা

রণজিৎকুমার সেনের

বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য

এ গ্রন্থ লেখককে প্রতিষ্ঠা দেবে। চার টাকা।

অবনীভূষণ ঘোষের সচিত্র বিজ্ঞান গ্রন্থমালা

সাপের কথা ১'২৫, **ভূত ভূত নয়** ১'৫০

জানলে পরে ভাঙবে ভুল ১'০০

বেগম সামসুন নাহারের

নজরুলকে যেমন দেখেছি ২'৫০

সন্‌জীদা খাতুনের

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৫'০০

অবিনাশ সাহার

প্রাণগঙ্গা

বিদগ্ধজন সাধারণত উপন্যাস পড়েন না। কিন্তু এগ্রন্থখানি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। ছ' টাকা।

ভারতী লাইব্রেরী

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

বিশ্বভারতী পত্রিকা

পুরাতন সংখ্যা

বিশ্বভারতী পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা কিছু আছে। যাঁরা বিশ্বভারতী পত্রিকার সেট সম্পূর্ণ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁদের অবগতির জন্য বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হল—

¶ প্রথম বর্ষের মাসিক বিশ্বভারতী পত্রিকার চার সংখ্যা পাওয়া যায়। একত্র ১'০০।

¶ তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা হাতে নিলে ১'০০।

¶ পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা হাতে নিলে ১'০০।

¶ অষ্টম বর্ষের প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা হাতে নিলে ১'০০।

¶ নবম বর্ষের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা হাতে নিলে ১'০০।

¶ ষষ্ঠ, সপ্তম, দশম, একাদশ ও চতুর্দশ বর্ষের সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যায়। প্রতি সেট হাতে ৪'০০ ও রেজেস্ট্রী ডাকে ৬'০০।

¶ দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ বর্ষ নিঃশেষিত।

¶ পঞ্চদশ বর্ষের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা হাতে মিলে ১'০০।

¶ ষোড়শবর্ষের প্রথম সংখ্যা নিঃশেষিত; দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্ত-সংখ্যা, মূল্য হাতে ৩'০০, রেজেস্ট্রী ডাকে ৪'০০।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কলকাতার গ্রাহকবর্গ

স্থানীয় গ্রাহকদের সুবিধার জন্য কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত ক্রেতারূপে নাম রেজিস্ট্রি করবার এবং বার্ষিক চার সংখ্যার মূল্য চার টাকা অগ্রিম জমা নেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এইসকল কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা উল্লিখিত হল—

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
৩৩ কলেজ রো

ভবানীপুর বুক ব্যুরো
২বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড

যাঁরা এইরূপ গ্রাহক হবেন, পত্রিকার কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হলেই তাঁদের সংবাদ দেওয়া হবে এবং সেই অনুযায়ী গ্রাহকগণ তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। এই ব্যবস্থায় ডাকব্যয় বহন করবার প্রয়োজন হবে না এবং পত্রিকা হারাবার সম্ভাবনা থাকে না।

মফস্বলের গ্রাহকবর্গ

যাঁরা ডাকে কাগজ নিতে চান তাঁরা বার্ষিক মূল্য ৫'৫০ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলিকাতা ৭ ঠিকানায় পাঠাবেন। যদিও কাগজ সার্টিফিকেট অব পোস্টিং রেখে পাঠানো হয়, তবুও কাগজ রেজিস্ট্রি ডাকে নেওয়াই অধিকতর নিরাপদ। রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানোর জন্য অতিরিক্ত ২৲ লাগে।

Some of Our English Publications :

Amit Sen

NOTES ON THE BENGAL RENAISSANCE

In this little volume the learned author tells us in a masterly way the absorbing story of the great awakening of Bengal. The period under review is divided into five sections: (1) 1814-1833, (2) 1833-1857, (3) 1857-1885, (4) 1885-1905, (5) 1905-1919. The discussion, though short, is illuminating.

(second edition) 1·25

Hiren Mukerjee

GANDHIJI-A STUDY

A study of the life and work of Gandhiji by an well-known Marxist.

5·00

Muzaffar Ahmad:

THE COMMUNIST PARTY & ITS FORMATION ABROAD Rs. 3-50

COMMUNIST PARTY OF INDIA: YEARS OF FORMATION (1921-1933) 0·56 nP.

Dhirendranath Das Gupta

WITH NEHRU IN CHINA Rs. 2-50

Hemanga Biswas:

WITNESSING CHINA WITH EYES 0·75 nP.

NATIONAL BOOK AGENCY P. Ltd.

12 Bankim Chatterjee St., Cal.-12

172 Dharamtala Street, Calcutta-13

Nachan Road, Benachity, Durgapur 4

নতুন বই

রেডিয়ম আবিষ্কারক

মাদাম কুরী

ভূমিকা: অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

[প্রখ্যাতা বিজ্ঞানীর জীবনী লিখেছেন তাঁরই কনিষ্ঠা কন্যা ইভ কুরী। ২৭টি ভাষায় অনূদিত সুবিখ্যাত বইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন কল্পনা রায়। আটখানা ছবি সহ প্রকাশিত হলো] দাম: ১০·০০

রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

দাম ৩·০০

নীল সমুদ্রের পাণ্ডুলিপি

উষারঞ্জন ভট্টাচার্য

[জলে বাস করা মানুষদের নিয়ে উপন্যাস]

দাম ৪·২৫

রমাঁ রোলাঁর

বিমুগ্ধ আত্মা (১-৩) ১৫·০০

জাঁ-ক্রিসতফ:

উষার আলো ৩·০০

বিদ্রোহ ৫·০০

জনারণ্য ৫·২৫

ম্যাকসিম গর্কীর

মনিব ২·৫০ ॥ **গল্পসংগ্রহ** ৩·০০

পাবেল লুকনিৎস্কীর

নিশো ৭·৫০

[উপজাতি-জীবনের উপর উপন্যাস]

ডঃ মুলকরাজ আনন্দের

কুলি ৫·০০ ॥ **অচ্ছুৎ** ৩·০০ ॥ **দরাজ দিল** ৩·৭৫

একটি রাজার কাহিনী ৭·৫০ ॥ **দুটি পাতা**

একটি কুঁড়ি ৪·৫০ ॥ **নরসুন্দর সমিতি** ১·৭৫

পার্ল এস বাকের

ড্রাগন সীড ৫·২৫ ॥ **গুড আর্থ** ৫·৫০

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব

কলেজ স্কোয়ার—কলিকাতা-১২

বুকল্যাণ্ড : প্রবন্ধ গ্রন্থের বিশিষ্ট প্রকাশক

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী ৫·০০

ডঃ শান্তিরঞ্জন দাসগুপ্ত
রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য ১০·০০

ক্ষুদিরাম দাস
রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় ১০·০০

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার
রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান ৬·০০

সোমেন্দ্রনাথ বসু
রবীন্দ্র অভিধান
প্রথম খণ্ড ৬·০০
দ্বিতীয় খণ্ড ৬·০০
সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ ৪·০০
বিদেশী ভারত সাধক ৩·৭৫

শিশির চট্টোপাধ্যায়
উপন্যাস পাঠের ভূমিকা ৫·০০

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য
লিপিবিবেক ৬·০০

মোহিতলাল মজুমদার
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র ১০·০০

ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান ৬·০০

অহীন্দ্র চৌধুরী
বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র ৫·০০

ধীরানন্দ ঠাকুর
রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা ১২·০০
রাবীন্দ্রিকী ৪·৫০
বাংলা উচ্চারণকোষ ৩·০০
জগদানন্দের পদাবলী ৩·০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২·৫০

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য ১০·০০

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাস ৮·০০

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী
বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প ৩·০০

শিশির দাস
মধুসূদনের কবিমানস ২·৫০

গোপালদাস চৌধুরী ও
প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত
প্রবাদ-বচন ৬·০০

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়
অনুন্নত দেশের অর্থনীতি ৪·০০

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কালিদাসের কাব্যে ফুল ৪·০০

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড : ১ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা-৬
শাখা : এলাহাবাদ, পাটনা

॥ বাংলাসাহিত্যের চিন্তাসমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠগ্রন্থ ॥

প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্রসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ দিগ্‌দর্শন

রবীন্দ্রসরণী ১০৲

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ৫৲

রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ (১ম) ৫৲ (২য়) ৫৲

মাইকেল মধুসূদন ৪৲

ডঃ শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার ৬৷৷৹

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের

আধুনিক বাংলা কাব্য ৬৷৷৹

কালিদাস রায় কবিশেখরের
সাহিত্য-প্রসঙ্গ ৫৲

বিশ্বপতি চৌধুরীর
কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৷৷৹
কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৲

রাজশেখর বসুর
চলচ্চিন্তা ৩৲

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
ভারত সংস্কৃতি ৫৲

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের
সমীক্ষা ৫৲

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের
কাব্যসাহিত্যের ধারা ৪৲

মোহিতলাল, শ্রীকুমার, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের
কুমুদ কাব্যপরিচিতি ৩৲

ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্তের
টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ৫৲

যোগেশ বাগলের
জাগৃতি ও জাতীয়তা ৪৷৷৹

শশিশেখর বসুর
যা দেখেছি যা শুনেছি ৩৷৷৹

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের
রবি-দীপিতা ৫৷৷৹

পরিমল গোস্বামীর
সপ্তপঞ্চ ৩৲

ডঃ সুশীল দের
নানা-নিবন্ধ ৫৷৷৹

ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্তের
নিরীক্ষা ৪৲

অলডুস হাক্সলের
এপ য়্যাণ্ড এসেন্স ৪৷৷৹

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পথের দাবী (৮ম সং) ৬·৫০
দত্তা ৩·৫০ শেষের পরিচয় ৫·৫০
শ্রীকান্ত (নাটক) ২·০০ পরিণীতা (নাটক) ১·৫০

পরশুরাম
পরশুরামের কবিতা ২·০০
চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প ৩·০০
আনন্দীবাঈ ৩·০০ নীলতারা ৩·০০
গড্ডলিকা ৩·০০ গল্পকল্প ৩·০০

অবনীনাথ মিত্র
আচার্য জগদীশচন্দ্র ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দির ১·৫০

অমল হোম
পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ (৩য় সং) ৩·৫০

কণিকা ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র-সংগীতের ভূমিকা ২·০০

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রাচীন ইরাক ৬·০০
মহাচীনের ইতিকথা ৭·০০

বুদ্ধদেব বসু
জাপানি জর্নাল ৩·৫০
যেদিন ফুটলো কমল (২য় সং) ৪·০০

বিমল মিত্র
অন্যরূপ (২য় সং) ৫·৫০

নীহারকণা মুখোঃ এম. এ. ডি-ফিল.
সঙ্গীত ও সাহিত্য ৭·০০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর গল্প-সংকলন
জীবন-যৌবন ৩·০০

দীপক চৌধুরী
মালদা থেকে মালাবার ৩·০০
পাতালে এক ঋতু (১ম খণ্ড) ৬·০০
ঝড় এলো ৫·০০ শঙ্খবিষ ৫·৫০

সুশীল রায়
ত্রিনয়না (উপন্যাস) ৫·০০

বিশু মুখোপাধ্যায়
বিখ্যাত বিচারকাহিনী (২য় সং) ৩·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ
প্রথম খণ্ড ৫·০০ ; দ্বিতীয় খণ্ড ৫·০০

অন্নদাশঙ্কর রায়
জাপানে ৬·৫০ অপ্রমাদ ৩·০০
অসমাপিকা ৩·০০ দেখা ৩·০০
রূপের দায় ৩·৫০ কামিনীকাঞ্চন ৩·০০

প্রবোধকুমার সান্যাল
মনে রেখ ৬·৫০

প্রতিভা বসু
অতল জলের আহ্বান ৩·৫০
মধ্যরাতের তারা ৩·২৫

প্রাণতোষ ঘটক
রাজায় রাজায় ৯·০০

সুলেখা সরকার
রান্নার বই (৩য় সং) ৫·০০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
প্রেমতারা (উপন্যাস) ৪·০০

ধীরাজ ভট্টাচার্য
মন নিয়ে খেলা (উপন্যাস) ৫·০০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

গ্রন্থটি রচনার জন্য ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য একাদেমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫৲]

রামায়ণ : কৃত্তিবাস বিরচিত

পূর্ণাঙ্গ রামায়ণটির বহুবর্ণ চিত্র সমন্বিত যুগরুচিসম্মত অনিন্দ্য প্রকাশন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। [৯৲]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলন, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের আধুনিকতম আকরগ্রন্থ। [২৫৲]

রবীন্দ্র-দর্শন

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্র জীবনবেদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা [২॥০]

জীবনের ঝরাপাতা

রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবীচৌধুরাণীর আত্মচরিত। ঠাকুরবাড়ির আলেখ্য। [৪৲]

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান

পরিবর্ধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। [৮॥০]

Samsad Anglo-Bengali Dictionary

বহু প্রশংসিত উচ্চমানবিশিষ্ট ইংরাজী-বাঙ্গালা আধুনিক শব্দকোষ। [১২॥০]

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ড সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪ খানি একত্রে) তৃতীয় মুদ্রণ বাহির হইল। [১২৲]

দ্বিতীয় খণ্ড সমগ্র সাহিত্য-অংশ একত্রে [১৫৲]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস একত্রে [৯৲]

উভয় রচনাবলীই শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও লেখকদিগের সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। উপহারে ও গ্রন্থাগারে অপরিহার্য।

পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন :

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ॥

॥ কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই ॥

রবীন্দ্র বীক্ষা
সম্পাদনা ॥ ডঃ নীলরতন সেন ১২·০০

রবীন্দ্র প্রণাম
৩·০০

পঁচিশজন সাম্প্রতিক কবি
সম্পাদনা ॥ দিনেশ দাস ৪·০০

শরৎচন্দ্র—দেশ ও সমাজ
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২·০০

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন
জয়ন্ত চৌধুরী ২·০০

আজকের পশ্চিম
ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ৪·৫০

কবি তরু দত্ত
রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ২·৫০

বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ
ডঃ নীলরতন সেন ৩·৫০

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

উইলিয়াম ফক্‌নার
জীবনী ও সাহিত্য আলোচনা ১·০০

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

এ : ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা বারো ॥ ফোন : ৩৪-২৩৮৬

ভালো কাগজের
দরকার থাকলে

এই ঠিকানায়
অনুসন্ধান করুন

দেশী বিদেশী বহু বিচিত্র
কাগজের ভাণ্ডার

এইচ. কে. ঘোষ
অ্যাণ্ড কোম্পানী

২৫এ সোয়ালো লেন। কলিকাতা
টেলিফোন ॥ ২২-৫২০৯

অধ্যাপক রমণীমোহন চক্রবর্তী
বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কাল ৫·০০
অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র-সাহিত্যে নবরাগ ৫·০০
বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর :
স্বাধীন সুলতানের আমল ১৫·০০
অধ্যাপক ডঃ মনোরঞ্জন জানা
রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক) ১২·৫০
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ৮·০০
(সাহিত্য ও সমাজ)
অধ্যক্ষ সন্তোষকুমার কুণ্ডু
বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ৪·০০
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
মুক্তির সন্ধানে ভারত ১০·০০
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ
প্রাথমিক উদ্যান-বিদ্যা (২য় সং) ৪·০০
সাধারণ কৃষি-বিজ্ঞান (২য় সং) ৫·০০
বাসবদত্তা
গৃহস্থবধূর ডায়েরী ৭·০০
অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার
কাব্য-মঞ্জুষা (পূর্ণাঙ্গ ও সটীক) ১০·০০
শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ৭·০০
শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত
মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ (২য় সং) ৬·০০
পরমারাধ্যা শ্রীমা (৪র্থ সং) ২·৫০
রূপ হতে অরূপে ২·৫০
মুক্তিপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা ৬·০০

ভা র তী বু ক স্ট ল
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৪।৫১৭৮ গ্রাম : Granthlaya
পোস্ট বক্স : ১০৮৩১

এন. আর. বোস অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলিকাতা-৬
[কাগজ সরবরাহক]

ফোন—৫৫-৪৪০০
পোষ্ট বক্স—১১৪৪৬
গ্রাম—পেপার গুডস্।

ভারতীয় সংস্কৃতি'র যে ভাবধারা ও ঐতিহ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন,—তার উপলব্ধি ও প্রসারই হলো দক্ষিণী'র আদর্শ ও লক্ষ্যস্থল।

দক্ষিণী

'দক্ষিণী-ভবন'

১, দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্ট, কলিকাতা-১৬

ফোন ॥ ৪৬-২২২২

বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

ক্ষিতিমোহন সেন

প্রাচীন ভারতে নারী ২'০০

প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থা ও অধিকার সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণযোগে বিস্তৃত আলোচনা।

শ্রীসুখময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ

তন্ত্রপরিচয় ২'০০

হিন্দুধর্মে তন্ত্রের প্রভাব, আগমাদি সংজ্ঞার অর্থ, তন্ত্রের কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা।

মীমাংসাদর্শন ১'০০

মীমাংসা-শাস্ত্রে প্রবেশেচ্ছু পাঠকগণের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রচিত।

জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরঃ ৫'৫০

পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ সংযোজন করিয়া এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় সম্পাদন করা হইয়াছে।

মহাভারতের সমাজ। ২য় সংস্করণ ১২'০০

মহাভারতের সামাজিক ও দার্শনিক সর্ববিধ আলোচনাই এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন ভারতের সমাজের একটি সম্পূর্ণ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার ২'৫০

আচার্য শান্তিদেবের অপূর্ব গ্রন্থ বোধিচর্যাবতারের সরল অনুবাদ।

মৈত্রীসাধনা ০'৫০

প্রাচীন ভারতে বৈদিক ও বৌদ্ধ সাধকগণের মৈত্রী-সাধনার যে পরিচয় আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে পাই, এই গ্রন্থ তাহার উদ্ধৃতি সহযোগে আলোচনা।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী -সম্পাদিত

সাহিত্যপ্রকাশিকা প্রথম খণ্ড ১০'০০

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল -সম্পাদিত কবি দৌলত কাজির 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী', এবং শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'বাংলার নাথসাহিত্য' এই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল -সম্পাদিত

সাহিত্যপ্রকাশিকা দ্বিতীয় খণ্ড ৬'০০

শ্রীরূপগোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বিশিষ্ট সংস্কৃত প্রমাণগ্রন্থ। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই গ্রন্থের যে ভাবানুবাদ হয় তাহার বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি-অবলম্বনে বিস্তৃত ভূমিকার সহিত শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।

সাহিত্যপ্রকাশিকা তৃতীয় খণ্ড ৮'০০

বাঙ্গালার নাথ-পন্থের মত ধর্ম-পন্থেও ভারতীয় সনাতন চিন্তাধারার বহুধা বিকাশের আলোচনা সংবলিত। নবাবিষ্কৃত যাদুনাথের ধর্মপুরাণ ও রামাই পণ্ডিতের অনাদ্যের পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে।

সাহিত্যপ্রকাশিকা চতুর্থ খণ্ড ১৫'০০

এই খণ্ডে দ্বিজ হরিদেবের রচনাবলী মুদ্রিত হইয়াছে।

চিঠিপত্রে সমাজচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড ১৫'০০

বিশ্বভারতী-সংগ্রহ হইতে ৪৫০ ও বিভিন্ন সংগ্রহের ১৮২ : মোট ৬৩২খানি পুরাতন (খ্রী ১৬৫২-১৮৯২) চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের সংকলনগ্রন্থ।

পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড ১০'০০

দ্বিতীয় খণ্ড ১৫'০০

বিশ্বভারতী-সংগ্রহের সর্বসমেত ৬০০০ পুঁথির মধ্যে প্রতি ৫০০ পুঁথির বিবরণ-সম্বলিত এক একখানি খণ্ড প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা অনুসারে মুদ্রিত।

বিশ্বভারতী

নৃত্যের তালে তালে

ভরত নাট্যম ! কথাটা শোনামাত্রই মনে ভেসে ওঠে নৃত্যচপল চরণের মায়াময় ছন্দ — পৃথিবীর বুকে একদা বিচরণশীল দেবদেবীদের প্রণয়লীলার কোমল মধুর প্রকাশ ভঙ্গিমা। বিষয়বস্তুর মৌলিকতায় বিশিষ্ট, অধুনা পৃথিবী বিখ্যাত ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যকলা, দেশের বহুবিচিত্র লোকনৃত্য থেকেই প্রথমে উদ্ভূত হয়েছিল।

সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও শিল্পকলার বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই নৃত্যকলা ভারতের দিকে দিকে আজ ব্যাপকভাবে সমাদৃত, আর তা সম্ভব হয়েছে আমাদের রেলপথের শাখাপ্রশাখার বিপুল বিস্তৃতিতে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

প্রাচীন ও আধুনিক
মতে অনুমোদিত
PEARL
BARLEY
লিলি
বার্লি
খাদ্যপ্রাণযুক্ত
খাদ্য, পথ্য ও পানীয়
LILY
BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

COMPANIONSHIP

There is enduring companionship where tastes are similar. Like cycling, for example.

Tastes always meet when it comes to a Raleigh, for this bicycle, distinguished by its attractive finish and graceful proportions, will go along with you for years and years . . . never failing you and never complaining.

RALEIGH

The World's Most Famous Bicycle

আপনার গৃহের শ্রীবৃদ্ধি

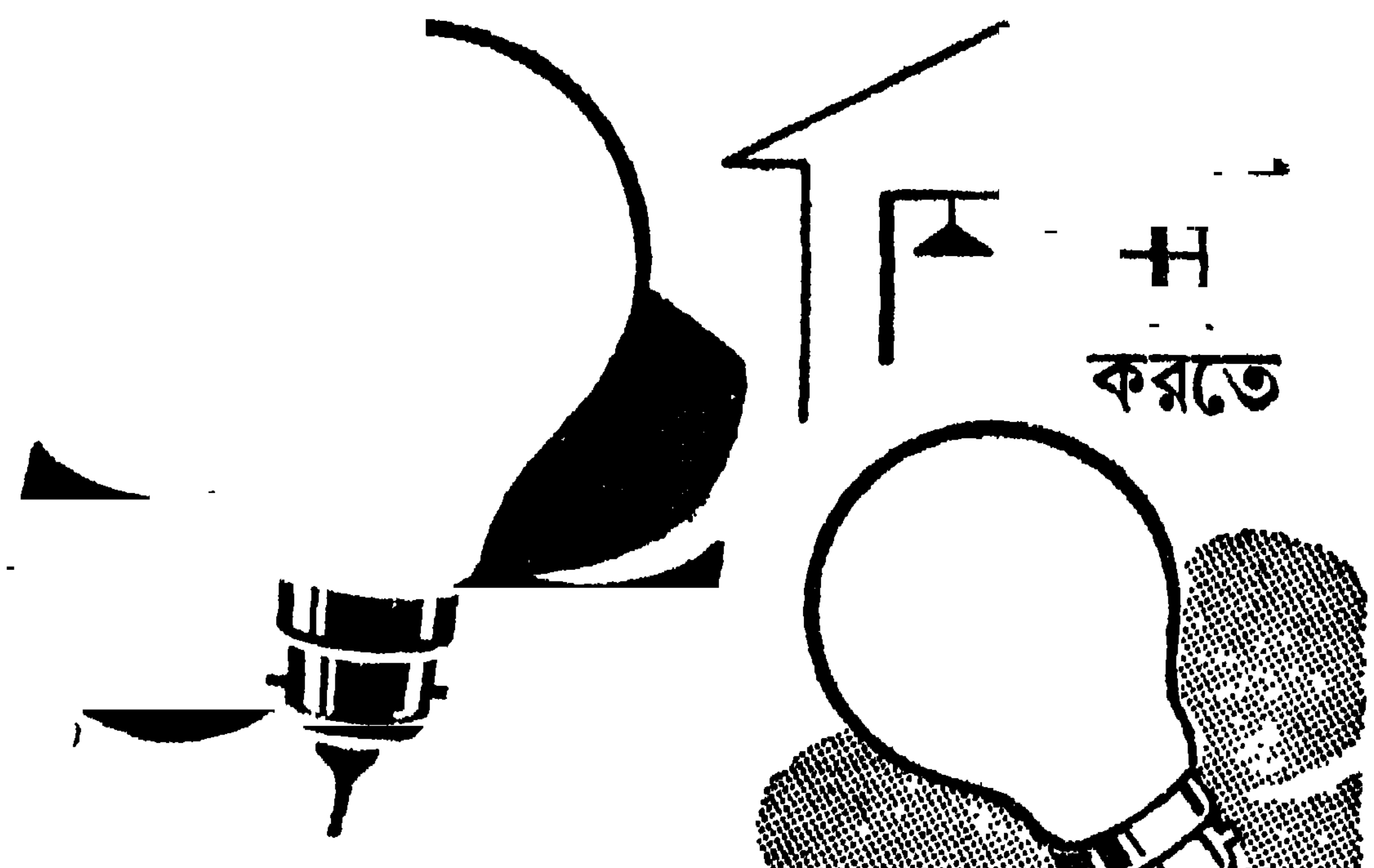

বেঙ্গল ল্যাম্প

(জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) অদ্বিতীয়

৩০ বৎসরের ল্যাম্প-উৎপাদন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ

দি বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস্ লিঃ

৭, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

আপনার মোটর গাড়ীর জন্য
কেন এক্সাইড ব্যাটারী কিনবেন—

১। ব্যাটারীগুলি মোটা শক্ত রবারের আধারে এমনভাবে তৈরী যে খারাপ রাস্তাতেও ক্রমাগত ধাক্কা সহ্য করতে সমর্থ।

২। (Porvic) সেপারেটারগুলি নিজস্ব কারখানায় বিশেষ গুণ-সম্পন্ন উপাদানে নির্মিত, ব্যাটারীর শক্তি এবং আয়ু বাড়িয়ে দিতে এরা যথেষ্ট সাহায্য করে।

৩। প্লেটগুলি বহু উপাদানের সংমিশ্রণে বিশেষভাবে প্রস্তুত। তাই প্লেটগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৪। ব্যাটারীগুলি প্রতিটি পর্যায়ে সতর্ক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তৈবী হয়।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রধান সার্ভিস এজেন্ট—

হাওড়া মোটর কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড
কলিকাতা-১

জীবনের প্রতিটি অণু পরমাণু
নটরাজের নৃত্য ছন্দে আবর্তিত। তাঁরই
ছন্দের লীলায় আকাশে রঙ লাগে, পৃথিবীতে জাগে
শ্যামলিমার জোয়ার, মানুষের মনে ওঠে সুরের ঝংকার।
যুগে যুগে সুরের মায়াজালে মানুষের জীবনে সামান্য
মুহূর্ত্তটী হয়ে উঠেছে অসামান্য, রয়ে গেছে চিরদিনের
জন্য ——

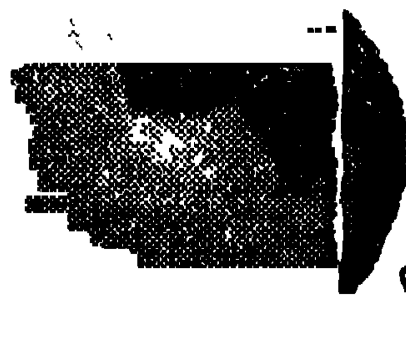

পত্র লিখিলে
সচিত্র মূল্য
তালিকা পাঠানো
হয়।

সুনির্ব্বাচিত বাদ্য যন্ত্রের একমাত্র পরিবেশক—

টেলিফোন : ২৩-২৯২৯

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ ৮/২ এসপ্ল্যানেড ইষ্ট কলিকাতা-১

রবীন্দ্রজীবনী

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

র বী ন্দ্র জী ব নী

এখন চারটি খণ্ডই পাওয়া যায়

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনের যাবতীয় ঘটনা ও রচনার তথ্যসমৃদ্ধ বিস্তারিত বিবরণ চারটি পর্বে বিভক্ত হয়ে এই চারটি খণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রথম খণ্ড

১২৬৮-১৩০৮। ১৮৬১-১৯০১॥ মূল্য ১৫৲

দ্বিতীয় খণ্ড

১৩০৮-১৩২৫। ১৯০১-১৯১৮॥ মূল্য ১৫৲

তৃতীয় খণ্ড

১৩২৫-১৩৪১। ১৯১৮-১৯৩৪॥ মূল্য ১৫৲

চতুর্থ খণ্ড

১৩৪১-১৩৪৮। ১৯৩৪-১৯৪১॥ মূল্য ১০৲

প্রথম তিনটি খণ্ড সংশোধিত সংযোজিত পরিবর্ধিত পুনর্মুদ্রণ।

রবীন্দ্রজিজ্ঞাসুদের পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্থ

•

সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে

রবীন্দ্র জীবন কথা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত এই বইটি চার খণ্ডে মুদ্রিত বিরাট রবীন্দ্রজীবনীর সংক্ষেপকৃত সংস্করণ নয়—এটা একটা নূতন বই। প্রথমত, চলতি ভাষায় লেখা, এবং দ্বিতীয়ত, সন-তারিখ-পাদটীকায় ভারাক্রান্ত নয়।

মূল্য ৬৲ টাকা, বোর্ড বাঁধাই ৮৲ টাকা।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতে প্রকাশিত বিশিষ্ট শ্রদ্ধাঞ্জলি-গ্রন্থ

রবিচ্ছবি ॥ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ৬·০০

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ॥ তোমার লেখা ‘রবিচ্ছবি’ বইখানা আমি পড়েছি। বিধান-সংসদে আমার বক্তৃতায় বইটি থেকে কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃতও করেছি। বেশ লেখা হয়েছে।

প্রতিমা দেবী ॥ আপনার বইখানি (রবিচ্ছবি) পেয়ে খুশি হলুম। এর সমস্তই সুন্দরভাবে সুগ্রথিত হয়েছে। আমি পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি এবং সকলেই পাবেন বলে মনে হয়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ বহু তথ্য ও তত্ত্ব পেয়েছি। ভালো লেগেছে।

অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন ॥ আপনার ‘রবিচ্ছবি’ আমি ইতিমধ্যে বার-দুয়েক পড়েছি। খুব ভাল লাগল। রবীন্দ্রনাথ মানুষটি কেমন ছিলেন এবং তাঁর সান্নিধ্যের সুগন্ধ কেমন বইত তার বেশ একটুখানি পরিচয় আপনার লেখায় পেলুম।

সজনীকান্ত দাস ॥ বহু বিচিত্র তথ্য চমৎকার শৃঙ্খলার সহিত প্রদত্ত হইয়াছে।

গীতবিতান পত্রিকা ॥ সম্পাদক ॥ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা ৮·০০

“প্রায় সাড়ে তিনশত পৃষ্ঠার এই জয়ন্তী সংকলনটিতে বিশ্বকবি সম্পর্কে শুধু নূতন তথ্যই পরিবেশিত হয়নি, পরন্তু বহুমুখী রবীন্দ্রপ্রতিভার একাধিক সৃষ্টিধারার নূতন দৃষ্টিভঙ্গীসম্বলিত ব্যাপক আলোচনা এতে রয়েছে।…প্রথমভাগে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সংগীত, নৃত্য, নাট্য সম্পর্কিত আলোচনা আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তথ্যমূলক স্মৃতিকথা।…রবীন্দ্রশতাব্দীপূর্তিতে এমন একটি সার্থক স্মারকগ্রন্থ জাতিকে উপহার দেওয়ায়…আমরা অভিনন্দন জানাবো। ঘরে বাইরের যে কোন শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্রে এর যথোচিত সমাদর না হয়ে পারে না।”—**দৈনিক বসুমতী**

“গীতবিতান পত্রিকায় এমন লেখা বেরিয়েছে যেগুলি বহুদিন ধরে রবীন্দ্র-গবেষকদের কাজে লাগবে।”

—কালিদাস নাগ

গীতবিতান ২৫বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৫

যুগপরম্পরায় চলেছে রূপের সাধনা কেশের পরিচর্য্যা—বিশেষ করে নারী জাতির। বর্ত্তমান যুগে ও চলেছে সেই নারীর রূপের আরাধনা। এ আরাধনায় নারী তার আলুলায়িত কেশকে সুরভিত ও শ্রীমণ্ডিত করে তুলবে—।

কিং কোর 'আর্ণিকা হেয়ার অয়েল' ব্যবহার করে এ যুগের নারী। রূপের সাধনায় আরও অপরূপ হয়ে উঠবে।

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ · ১৮৮৪ শক
সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বিষয়সূচী

ছন্দ-কণিকা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
মানুষ ও বিশ্বজগৎ	শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য	৭
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১
রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ	শ্রীসুকুমার সেন	৩৪
আনন্দবর্ধন ও রসপ্রস্থান	শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য	৫০
কোম্পানির আমলে বাংলা ভাষা	শ্রীশিশিরকুমার দাশ	৭০
ভারতবর্ষীয় সভা	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	৮৬
শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি · রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ-গ্রন্থপঞ্জী		৯৪
গ্রন্থপরিচয়	শ্রীনীহাররঞ্জন রায়	১০৬
	শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য	১০৭
স্বরলিপি : 'যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল· ·'	শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার	১১৩
সম্পাদকের নিবেদন		১১৭

চিত্রসূচী

ভাবিনী	শ্রীনন্দলাল বসু	১

মূল্য এক টাকা

ভাবিনী

শ্রীনন্দলাল বসু -অঙ্কিত ॥ ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ · ১৮৮৪ শক

ছন্দ-কণিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

ডাকিল কি তবে
মধু বাঁশরী রবে
একেলা যবে
বিজন নদী-পুলিনে
ছিনু বসে।
কেন এত ত্বরা
হল না ঘটভরা,
মনভ্রমরা
অজানা দূর-বিপিনে
উড়িল সে॥

২

ভাবি নব নব বাণী
যতনে গেঁথে আনি,
ছন্দোহার খানি
দিব গলে।
ভয়ে ভয়ে অবশেষে
তোমার কাছে এসে
কথা যে যায় ভেসে
আঁখিজলে॥

৩

কোনো এক যক্ষ সে
প্রভুর সেবাকাজে
প্রমাদ ঘটাইল
উন্মনা
তাই দেবতার শাপে
অস্তগত হল
মহিমা-সম্পদ
যত কিছু।
কান্তাবিরহগুরু
দুঃখ-দিনগুলি
বর্ষাকাল তবে
যাপে একা
স্নিগ্ধ পাদপছায়া
সীতার স্নানজলে
পুণ্য রামগিরি আশ্রমে॥

৪

ভেঙে ভেঙে পড়িছে পা চলে যেতে
নব দল ধানক্ষেতে
বসন শিশিরে ভিজিল।
নবারুণ-রাগ গিরিশিখরে
ঘন ছায়াময় বনের 'পরে
কি শোভা সৃজিল॥

৫

পৌর্ণমাসী উচ্চহাসি
কয় তারাকে,
আজকে কেন আর দেখি নে
পথহারাকে।

আপন দীপে অন্ধকারে
পাও না বাধা,
আমার দীপে চক্ষে লাগে
আলোর ধাঁধা ॥

৬

বিশ্বের সৃষ্টিতে
যে বিধাতা শিল্পী ও কবি,
রসিকের দৃষ্টিতে
গাঁথিছেন কাব্য ও ছবি।
তোমাদের সংসারখানি
যুগলের চিত্তের
সংগীত-নৃত্যের
রচি দিক শিল্প ও বাণী

৭

দূরের মানুষ কাছের হলেই
নতুন প্রাণের খেলা।
নতুন হাওয়ায় নতুন ঋতুর
ফুলের বসায় মেলা ॥

৮

প্রাণধারণের প্রবল ইচ্ছা থেকে
আমার বাঁধন ছাড়িয়ে থাকো যদি
গেলেম আমি রেখে পায়ে তোমার প্রণাম নিরবধি
বাঁচবে না কেউ নিত্যকালের তরে,
মরল যে জন ফিরবে না আর ঘরে,
যাত্রা-অন্তে মিলবে সাগর 'পরে
যতই দীর্ঘ হোক্-না ক্লান্ত নদী ॥

তখন সূর্য কিংবা রাতের তারা
ভাঙিয়ে স্বপন চাইবে না আর ফিরে—
মত্তমুখর ঝরনাজলের ধারা
গর্জনে আর চেতন করবে কি রে,
শীতের কিংবা চৈত্রেরি পল্লবে
নতুন ঋতুর বার্তা কি আর কবে,
অন্তবিহীন নিদ্রা কেবল রবে
অনন্ত রাত্তিরে ॥

৯

নয়ন-অতিথিরে
শিমুল দিল ডালি ;—
নাসিকা-প্রতিবেশী
তা নিয়ে দেয় গালি।
সে জানে গুণ শুধু
প্রমাণ হয় ঘ্রাণে,
রং যে লাগে রূপে
সে কথা নাহি জানে ॥

১০

মোহন কণ্ঠ সুরের ধারায় যখন বাজে
বাহির-ভুবন তখন হারায় গহন-মাঝে।
আকাশের বাণী ধরার ধূলায়
বিশ্ব তখন নিজেরে ভুলায়
ধরে অপরূপ নব নব কায় নবীন সাজে ॥

১১

সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষকেই মনে হত সকলের সেরা।
ভাষার মুখরতায় তার নৈপুণ্য। সেই ভাষা
চিহ্ন ও সংকেতের এমন যোগাযোগ যাতে বাঁচিয়ে রাখে
তার ভাবনা তার বাক্য

তারি পরে আপন বুদ্ধিকে সে লাগিয়ে রেখেছে,
আপন প্রাণবায়ু খরচ করছে তাই নিয়ে।
কেউ বা গুঞ্জরিত করছে দুঃখের নিবিড়তা,
কেউ বা বিশ্বসংসারে প্রচার করছে হৃদয়ের মহত্ত্ব।
তার আয়ুর মেয়াদ অন্য প্রাণীর মতোই পরিমিত,
তবু তার বাণী হাজার হাজার বছর প্রতিধ্বনিত হয়।
কিন্তু হে ঝিল্লি, এর কিছুই তোমার নেই জানা।
তোমার সুর তুমি রচনা কর প্রতিক্ষণে নিজের জন্যেই।
বসে বসে ভাবছিলেম এই-সব কথা,
তুলনা করছিলেম একের সঙ্গে আর, ক্ষতির সঙ্গে লাভ।
এমন সময় হঠাৎ ঘনিয়ে এল কালো মেঘ,
মাথার উপরে ঝলসে উঠল গর্জে উঠল ঝড়,
মেঘ-ডাকা আকাশ থেকে ঝরতে লাগল
মোটা মোটা বৃষ্টির ফোঁটা।
চুপ করে গেল ঝিল্লির ধ্বনি।

১২

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললেন
"ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করব, কী গোত্র আমার ?"
তিনি বললেন, "জানি নে তাত, কী গোত্র তুমি।
যৌবনে বহুপরিচর্যাকালে তোমাকে পেয়েছি,
তাই জানি নে তোমার গোত্র।
জবালা আমার নাম, তোমার নাম সত্যকাম,
তাই বোলো তুমি সত্যকাম জাবাল।"
সত্যকাম বললে হারিদ্রুমত গৌতমকে,
"ভগবন, আমাকে ব্রহ্মচর্যে উপনীত করুন।"
তিনি বললেন, "সৌম্য, কী গোত্র তুমি ?"
সে বললে, "আমি তা জানি নে।
মাকে জিজ্ঞাসা করেছি, আমার গোত্র কী।
তিনি বলেচেন, যৌবনে যখন বহুপরিচারিণী ছিলেম
তোমাকে পেয়েছি।

আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম,
বোলো আমি সত্যকাম জাবাল।”
তিনি তখন বললেন, “এমন কথা অব্রাহ্মণ বলতে পারে না।
সত্য থেকে নেমে যাও নি তুমি।
সমিধ আহরণ করো সৌম্য, তোমাকে উপনীত করি।”

১৩

আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলঙ্কারে।
তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়,
নবীন পথিক তোমারি কথা মনে করে।
যেন সময় হলে একদিন বলতে পারো
মিটল তোমাদেরও প্রয়োজন,
লাগল তোমাদেরও মনে ॥

ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধ লেখা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেকগুলি কবিতাকণা রচনা করেন। কোনো কোনো সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দকেও বাংলায় রূপান্তরিত করেন। ক্ষেত্রবিশেষে কয়েকটি বিদেশী কবিতাকেও বাংলা রূপ দেন। কিন্তু সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে বা ‘ছন্দ’ গ্রন্থে সবগুলি দৃষ্টান্ত স্থান পায় নি। ‘ছন্দ’ গ্রন্থে যেগুলি গৃহীত হয় তার কয়েকটি রচনা ‘স্ফুলিঙ্গ’ কাব্যে সংকলিত হয়েছে।

ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে রচিত আরও অনেকগুলি কবিতাকণা এখনও অপ্রকাশিত আছে। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলিত হয়ে এইজাতীয় কতকগুলি দৃষ্টান্ত-কবিতা ‘ছন্দ’ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ‘সম্পূরণ’ বিভাগে অচিরেই প্রকাশিত হবে। তার থেকে বাছাই-করা কয়েকটি রচনা প্রকাশ করা হল।

মানুষ ও বিশ্বজগৎ

কালিদাস ভট্টাচার্য

নিজেকে অতি উচ্চস্তরের জীব মনে করে মানুষ যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করুক-না কেন, এ কথা ভুললে চলবে না যে, তার দৈনন্দিন জীবনের বেশ অনেকখানি অংশ প্রকৃতির কঠোর নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। আর দশ-পাঁচটা জীবের মত সেও একটা জীব, এবং জৈবিক ব্যবহারে জীবপ্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করার সামর্থ্য তারও নেই। তার ভৌতিক দেহটাও যেসব উপাদানে গঠিত তাদের ব্যবহার তো আগাগোড়াই জড়প্রকৃতির অলজ্ঘ্য নিয়মে পরিচালিত।

অবশ্য, এমন অনেক কাজও সে করে যা আপাতদৃষ্টে নিছক জৈবিক প্রেরণা -উদ্ভূত বলে মনে হয় না। কত রকমের সামাজিক রীতিনীতি ধর্মীয় আচারব্যবহার সে মেনে চলে, যাদের সঙ্গে জৈবিক প্রেরণার কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। কিন্তু যদি এই কারণে বলা হয় যে, এইখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব, এই একটা ব্যাপারেই মানুষ অন্যান্য জীবজন্তু পশুপক্ষীর অ-সমধর্মী— তা হলে উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, কথাটা পুরোপুরি যথার্থ হল না। এইসব রীতিনীতি-আচারব্যবহারেও সে বহুলাংশে তাদের মতই অন্ধ। মানুষের বৈশিষ্ট্য শুধু এইটুকু যে, তার কাজকর্মের ক্ষেত্রটা অনেকখানি বিস্তৃততর। পশুপক্ষীদের অন্ধ কাজকর্মের কিছুটা সংসাধিত হয় বিশুদ্ধ পদার্থ ও-রসায়নবিদ্যা-সম্মত প্রাকৃতিক নিয়মে, বাকিটা ঘটে সহজাত সংস্কারবশে। মানুষের বেলায় এ দুই প্রকার কাজকর্মের উপরেও আছে সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ, যেগুলিও সমভাবে অন্ধ। সহজ অনুকরণপ্রবৃত্তি ও সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতির বশেই মানুষ এইসব সামাজিক ও ধর্মীয় কাজকর্ম করে।

'সামাজিক' ও 'ধর্মীয়' এই দুটি শব্দ এখানে বেশ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করা হচ্ছে। 'সামাজিক' কাজকর্ম বলতে বুঝতে হবে ব্যাবসাবাণিজ্য-সংক্রান্ত এবং রাজনীতিক ও লোকহিতকর সব জাতীয় কাজ, এবং 'ধর্মীয়' শব্দে আচারব্যবহার ছাড়াও যা-কিছু আধ্যাত্মিক ব্যবহার সবই বুঝতে হবে। মোটকথা, প্রাচীন আর্যঋষিরা যে ত্রয়ী বার্তা ও দণ্ডনীতির কথা বলে গেছেন সেই ত্রিবিদ্যাগত অধিকাংশ কাজই মানুষ করে অন্ধভাবে। কেবল ইতরজন নয়, শিক্ষিত মানুষও জীবনের অধিকাংশ সময়েই নিছক সংস্কারবশে বা সহজ অনুকরণপ্রবৃত্তির তাড়নায় চলে। ক'জন লোক জীবনের কতখানি সময়ে ধীর চিত্তে চিন্তা ক'রে কাজ করে?

একেবারেই যে করে না, তা অবশ্য নয়। কিছু কাজ সে করে ধীর চিত্তে এবং নিজেকে সংযত রেখে। কিন্তু এই আত্মসংযম ও স্বকৃত কার্যের ফলাফল অনুধাবনও কি অনেকাংশে সংস্কার ও অনুকরণপ্রবৃত্তি -জনিত নয়? সামাজিক ও ধর্মীয় কয়েকটি মূলনীতি অন্ধভাবে গ্রহণ করে তারই নিরিখে কি সে নিজ কর্মের ফলাফল বিচার করে না? অর্থাৎ, সাধারণ জীব হিসাবে সে যে তিমিরে পড়েছিল সেই তিমিরেই কি পড়ে থাকে না? অন্ধকার থেকে আলোকে আসবার চেষ্টা হয়তো তার আছে, কিন্তু অন্ধকার কাটিয়ে উঠতে পারল কৈ? সাঁতার যে জানে না সে 'লোষ্ট্রখণ্ডে'র মত তলিয়ে যায় না ঠিক, কিন্তু জলের মধ্যে হাবুডুবু-খাওয়াকে তো সাঁতার কাটা বলা চলে না? 'ইটপাটকেলে'র সহিত ডুবন্ত প্রাণীর পার্থক্য ঐটুকু মাত্র।

ঐ যে হাবুডুবু-খাওয়া, ওটাও ঘটে স্বাভাবিক জৈবিক নিয়মে। ইটপাটকেলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় জড়-প্রকৃতির নিয়মে; সচেতন প্রাণীর কাজকর্ম জড়প্রকৃতির নাগালের কিছুটা বাইরে থাকলেও আর-এক জাতীয় নিয়মে বাঁধা পড়ে, এবং তাকেই বলে জৈবিক নিয়ম। এই জৈবিক নিয়মের প্রকারভেদ ও স্তরভেদ থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা— স্বাতন্ত্র্য— বলতে যা বোঝায় তার কিছু অংশও জৈবিক ব্যবহারে নেই। তার কোনো কাজ কার্যকারণ নিয়মের ঊর্ধ্বে নয়। যেখানেই কার্যকারণশৃঙ্খলা বিদ্যমান সেখানেই প্রকৃতির একাধিপত্য। মানুষের কাজকর্মের অতি বিরাট একটা অংশ এই কার্যকারণ-নিয়মে শৃঙ্খলিত। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় সে একটু বেশি হাবুডুবু খেতে পারে, সীমিত গণ্ডির মধ্যে একটু বেশি হাত-পা ছড়াতে পারে, বন্দী দশাতেও একটু হাসতে কাঁদতে পারে— এইটুকুই যা তার বিশেষত্ব। আর দশটা প্রাণীর মত সেও প্রকৃতিরাজ্যের বশম্বদ প্রজা। সে হয়তো একেবারে কৃষিমজুর নয়, হয়তো উঁচুদরের অফিসর, কিন্তু সরকারি ফতোয়া মেনে চলতে সে বাধ্য।

সামাজিক ও ধর্মীয় কয়েকটা মূলনীতি সে অন্ধভাবে স্বীকার করে নিয়েছে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্ব-সম্প্রদায়গত চিন্তাধারায় নিজ কর্মের ফলাফল অনুধাবন করে বলে তার এইসব তথাকথিত মনুষ্যোচিত কাজকর্মও প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা।

প্রশ্ন হতে পারে— সে কি সর্বদাই এইভাবে কয়েকটা মূলনীতি মেনে নেয়, সর্বদাই কি প্রচলিত পথে ফলাফল চিন্তা করে? ইতিহাস কি সাক্ষ্য দেয় না যে, বহুবার সে মূলনীতি ও চিরাচরিত চিন্তাধারার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে? তাই যদি হয়, তা হলে তো আর সে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির আয়ত্ত হল না।

উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, এই ধরণের বিদ্রোহের অধিকাংশ স্থলেই থাকে অন্য কয়েকটা সমান্তরাল (বা বিকল্প) মূলনীতি ও চিন্তাধারার স্বীকৃতি, এবং ঐ স্বীকৃতিও থাকে সমভাবে অন্ধ। আর সে যখন সদর্পে ঘোষণা করে যে, সে কোনো মূলনীতি বা কোনো প্রচলিত চিন্তাধারা মেনে না নিয়ে শুধু নিজ প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করেছে, তখনও কি আমরা বলতে পারি না যে সেই প্রত্যয়গুলিও একান্তভাবে প্রকৃতিদত্ত? প্রত্যয়গুলি আসে কোথা হতে? বহিঃসংসারের সহিত স্বাভাবিক আদানপ্রদানের ফলেই— এবং ক্রমবিবর্তনের নিয়ম অনুসারেই— কি এই প্রত্যয়গুলি জন্মে নি? পারিপার্শ্বিক এবং নিজের ধাতুগত বৈশিষ্ট্যের মিলনেই যদি প্রত্যয়গুলি জন্মলাভ করে থাকে, তা হলে কার্যকারণ-নিয়মের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া গেল কিরূপে?

এ কথা বলতে চাই না যে, মানুষ সত্যই পুরোপুরি প্রকৃতির দাস। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে 'সবার উপরে মানুষ সত্য'— এই তত্ত্ব অতি সহজে স্থাপন করা যাবে না। হতে পারে, মানুষের স্থান বিশ্বচরাচরের সমস্ত অচেতন পদার্থ ও সমস্ত সচেতন জীবের ঊর্ধ্বে, কিন্তু এতে প্রমাণিত হয় না যে, তার স্থান প্রকৃতি-রাজ্যের বাইরে। অবিরাম হাবুডুবু-খাওয়া, একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসার ক্ষমতা, প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নিজ প্রত্যয়ের উপর নির্ভর— এসবের কোনোটাই তার স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করতে পারে না।

এ দিক দিয়ে প্রাচীন চার্বাকমতাবলম্বী ও আধুনিক মেটিরিয়ালিস্ট্‌ ঠিক কথাই বলেছেন। এঁরা কেউই মানুষের অভিনবত্ব অস্বীকার করেন নি। কিন্তু সকলেই একবাক্যে বলেছেন, এই অভিনবত্ব জন্মলাভ

করেছে প্রকৃতির ক্রোড়েই, এবং প্রকৃতিরই কার্যকারণ-নিয়মে। জননীর স্নেহলালিত শিশুর স্বাধীনতা কোথায়? জননীর মর্যাদাকে সে অতিক্রম করবে কিরূপে?

প্রকৃতির পূজারী বৈজ্ঞানিক এইজন্য মানুষের কোনো রাজকীয় মর্যাদা স্বীকার করেন না। এই মর্যাদা যাঁরা দিতে চান তাঁরা মানুষকে বসান বিশ্বজগতের একেবারে কেন্দ্রস্থলে। তাঁদের সমস্ত চিন্তাধারা, যা কিছু বক্তব্য এবং যা-কিছু কৃত্য সবই মানবকেন্দ্রিক। আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক— এবং এই বৈজ্ঞানিকদের পদাঙ্কানুসারী একদল দার্শনিক ও সমাজসংস্কারক— কিন্তু এই মানবকেন্দ্রিকতার ঘোরতম বিরোধী। তাঁরা মনে করেন যে মানুষ আপনাকে বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে বসিয়েই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। নিঃসীম বিশ্বজগতের অগণিত গ্রহতারকার মধ্যে পৃথিবী একটিমাত্র নগণ্য গ্রহ, এবং এই পৃথিবীবাসী অগণিত পশু-পক্ষীকীটাদির মধ্যে মানুষ মাত্র একপ্রকারের জীব। কী অধিকারবলে সে আপনাকে জগতের ভারকেন্দ্ররূপে আত্মপরিচয় দেয়? তা ছাড়া, কোটি কোটি বৎসর পূর্বে সৃষ্ট— হয়তো বা অনাদি— এই ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে এই সেদিন, এবং তারও অনেক পরে জন্মলাভ করেছে মানুষ। কী রাজতিলক ললাটে ধারণ করে সে মর্তে অবতীর্ণ হল যে সে দম্ভভরে একা গিয়ে বসবে জগদীশ্বরের পাদপীঠতলে, বিশ্বসভার কেন্দ্রাসনে?

এই কারণেই বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানপন্থী আধুনিকের দল এতকাল-প্রচলিত আপামর সাধারণ-স্বীকৃত মানবকেন্দ্রিকতার মূলোৎসাদনে এত সচেষ্ট। বিশ্বজগতের সঠিক ভারকেন্দ্রটি নির্দেশ করে তাঁরা যা-কিছু মানবকেন্দ্রিক শাস্ত্র ও বিদ্যা এতকাল ধরে গড়ে উঠেছে তার সমস্তটাই 'ঢেলে সাজাতে' আরম্ভ করেছেন। এই আমূলসংস্কারে তাঁরা অনেকখানি কৃতকার্যতাও লাভ করেছেন।

২

কিন্তু 'আজগুবি দুনিয়ার খেলা' হল এই যে, যে মানবকেন্দ্রিকতাকে নিঃসার ভ্রান্তি বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলেছে তাকে মিথ্যা বলে জানার পরও মানুষ তার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে না। মিথ্যার প্রতি মোহ থাকা ব্যাপারটা কিছু আজগুবি নয়— হয়তো 'মোহ' শব্দটির অর্থই হল মিথ্যার প্রতি অযৌক্তিক আসক্তি। প্রকৃত আজগুবি ব্যাপার ঘটে তখনই যখন সেই মিথ্যার মিথ্যাত্ব ধরা পড়া সত্ত্বেও, এবং ঐ মিথ্যাত্বধারণা সাধনাপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, মোহ কাটে না। মানবকেন্দ্রিকতার প্রতি মোহ যে আমাদের কাটে নি, তার প্রমাণ আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মেই উদগ্র ভাবে ফুটে ওঠে। ক'জন লোক, ক'জন বিজ্ঞানীই বা, বৈদান্তিক জীবন্মুক্তের মত নিজেকে ব্যাপক বিশ্বে বিলীন করে দিতে পেরেছেন? যদিবা এই আত্মবিলোপ সম্ভব হয়, তা হলেও প্রশ্ন থেকে যায়— এঁদের মধ্যে ক'জনই বা মানবপ্রীতি হতে মুক্তি পেয়েছেন? আত্মভোলা বড় বড় বৈজ্ঞানিকও কি পদে পদে মানবপ্রীতির পরিচয় দেন না? আত্মপ্রীতি হতে মুক্তিলাভ সম্ভবপর হলেও মানবপ্রীতি হতে মুক্তিলাভ দুঃসাধ্য, হয়তো অসাধ্য। কারণ, মানুষকে তার উচ্চাসন থেকে নামিয়ে আনার অর্থই হল ধর্মনীতি রাজনীতি প্রভৃতিতে জলাঞ্জলি দেওয়া। ক'জন তা করতে পেরেছেন? আধুনিক বিজ্ঞানপন্থীরা ধর্মনীতি রাজনীতি ও সমাজনীতিকে ঢেলে সাজাচ্ছেন, এ কথা ঠিক; কিন্তু তাঁরা তো এই বিদ্যাগুলি নস্যাৎ করেন নি— তাঁরা যে কাজে ব্রতী সেটা হল এই বিদ্যাগুলির নূতন রূপায়ণ। কিন্তু নব-রূপায়িত বিদ্যাগুলিও কি মানবকল্যাণমুখী নয়? অথবা, কল্যাণ-অকল্যাণের কথা ছেড়ে দিলেও, এগুলি কি মানবীয় ব্যবহারের বিজ্ঞান নয়? বিশ্বনিখিলের

পটভূমিতে মানুষ যদি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট -সমান হয়, তা হলে তার ব্যবহার নিয়ে, তার কল্যাণের জন্য শাস্ত্ররচনার কী প্রয়োজন? যদি বল মানুষ তো তার সগোত্র জীবের ব্যবহার ও তাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করবেই, তা হলে বলব, মানবকেন্দ্রিকতার মোহ তো কাটিয়ে উঠতে পারলে না।

মানবকেন্দ্রিকতার প্রতি এই মোহ কেন কাটানো যায় না? নানাবিধ মোহমুদ্গর প্রাচীন আর্যঋষিরা আমাদের দিয়ে গেছেন। কিন্তু মানবকেন্দ্রিকতার কোনো মোহমুদ্গর আছে কি? যদি না থাকে, তা হলে বুঝতে হবে এ জিনিসটার মূল বহুদূর প্রসারিত।

আপাত-অকাট্য যুক্তিতর্ক দিয়ে যদি প্রমাণ করে দিই অমুক জিনিসটা ভুল, অথচ তৎসত্ত্বেও যদি ভুলটা কিছুতেই দূর হতে না চায়, তা হলে সেই পরিস্থিতির দু রকম ব্যাখ্যা সম্ভব :

১. ভুলের কারণটা বুঝতে পারি, এটাও বুঝি যে, কারণটা দূর হওয়া উচিত; অথচ বেশ উপলব্ধি করতে পারি যে, আমার পক্ষে এই কারণটা এখনই দু হাত দিয়ে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণটা কোনো-এক সময়ে দূর হয়ে যাবে, এ বিশ্বাস আমার থাকে, এবং সেইজন্যই যে ক্ষেত্রে বাস্তব অপসারণ কোনো ভাবেই সম্ভবপর বলে মনে হয় না সে ক্ষেত্রেও ঐ কারণের অপসারণ আমরা কল্পনায় সম্ভব করে তুলি। একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। সূর্যকে যে আকারে প্রত্যক্ষ করি আসল সূর্য তার চেয়ে বহুগুণ বড়, ছোট সূর্য মিথ্যা— এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ছোট সূর্য -ভ্রান্তি কিছুতেই দূর হয় না। তার কারণ, সূর্য ও আমার মধ্যে যে দূরত্বের ব্যবধান সেটা আমি দূর করতে পারছি না। কেবল এখন পারছি না তা নয়, বাস্তবে এই দূরত্ব যে কী ভাবে অপসারিত হবে তাও জানি না। কিন্তু এই দূরত্বাপসারণ আমি কল্পনা করতে পারি, এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, যদি কোনো দিন এই কল্পনা সত্যায়িত হয় তা হলে আমি সূর্যকে তার বিরাটরূপেই দেখতে পাব।

২. কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভুলের কারণটাই জানতে পারি না, অথবা সেই কারণের অপসারণ কল্পনায়ও আনতে পারি না, সে ক্ষেত্রে বলতে হবে ভুল আমার হয়ই নি। যা দেখছিলাম তা ঠিকই ছিল। প্রতিপক্ষই দুর্ভেদ্য যুক্তিজাল বিস্তার করে আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। তখন স্বভাবতই আমার চেষ্টা হবে কি করে ঐ যুক্তিজাল ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারি।

এখন দেখা যাক, মানবকেন্দ্রিকতা যদি মিথ্যাই হয় তাকে সত্য বলে ধরে নিয়েছিলাম কি কারণে, এবং সেই কারণ দূর করা সম্ভব কি না। যদি প্রতিপক্ষ সেই কারণ দেখাতে না পারেন, অথবা যদি কল্পনাবিলাসেও সেই কারণ দূর করতে না পারি, তা হলে বলতে হবে প্রতিপক্ষই ভ্রান্ত, এবং তার যুক্তিজালে কোথাও কোনো ছিদ্র আছে।

সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, বিজ্ঞানীরা এই কারণ কোথায়ও নির্দেশ করেন নি। বিপুলায়তন বিজ্ঞানসাহিত্যে কোথাও কোনো উল্লেখ নেই কেন আমরা মানুষকে বিশ্বজগতের কেন্দ্রস্থলে বসিয়েছিলাম। বড়জোর তাঁরা এই কথা বলেন, মানুষ নিজেকে বড় করে দেখেছে বলে এই ভুল করেছে। কিন্তু এটা কোনো উত্তর হল না। নিজেকে এই ভাবে বড় করে দেখার নামই তো হচ্ছে মানবকেন্দ্রিকতা, এটা তো আর মানবকেন্দ্রিকতা-প্রতীতির কারণ নয়। 'ক'ই 'ক'এর কারণ হতে পারে না। যদি বা তাই হয়, তা হলেও প্রশ্ন থেকে যায়— এটা যে একটা দোষ, তা বুঝব কোন্ উপায়ে? আর, যদিবা দোষ হয়, দূর করব কী ভাবে? বিজ্ঞানের দিক থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর আসে নি। তাঁরা শুধু উচ্চ মিনার হতে

সু-উচ্চ রবে ঘোষণাই করে গেছেন—হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা জান না যে, তোমরা বিপুল বিশ্বের —অসীম অমৃতভাণ্ডের—কণা মাত্র ; তোমরা এই বিশ্বের ভারকেন্দ্র হতে পার না।

শুধু ঘোষণা—তা যতই উচ্চকণ্ঠ হোক-না কেন—কখনোই প্রমাণপদবী লাভ করে না। বিজ্ঞানীরা হয়তো দাবি করবেন, তাঁরা তো চিরশ্রদ্ধিত মানবিক বিদ্যাগুলির আমূল সংস্কারে সক্ষম হয়েছেন, এবং ঐ সংস্কার সাধিত হয়েছে তো বিশ্বকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে। উত্তরে আমরা বলব, সক্ষম তারা হয়েছেন ঠিক, কিন্তু একটা অপ্রমাণ-সূত্রের ভিত্তিতে একটা সমগ্র শাস্ত্র রচনা করলেই কি সেই শাস্ত্র প্রামাণ্য লাভ করে ?

মোট কথা এই যে, বিজ্ঞানপন্থীরা কিছুতেই দেখাতে পারবেন না যে মানবকেন্দ্রিকতায় বিশ্বাস একটা অন্ধ কুসংস্কার। এই বিরাট বিশ্বসংসারের বাসিন্দা 'আমি'-রূপ মানুষটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটতুল্য হতে পারি, কিন্তু তবু কেন আমার সব চিন্তা সব কৃত্য আমার শত বিরুদ্ধ চেষ্টা সত্ত্বেও সেই আমি-কেন্দ্রটির চারি ধারে আবর্তিত হয় ? কুসংস্কার তাকেই বলা যেতে পারে যার থেকে অন্তত কল্পনায় মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু আমি কি কখনও উপলব্ধি করতে পারি যে, আমি অথবা আমারই সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত যেসব মানুষ রয়েছে, আমার কাজকর্ম আমার চিন্তাধারা এদেরই কেন্দ্র করে ঘূর্ণীপাক খায় না ? মহাজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা হয়তো কিছুকাল আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকতে পারেন, হয়তো বা ক্ষণেকের তরে মানবপ্রীতি পরিহার করে বিশ্বচরাচরের একান্ত-আপন মূর্তিটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু এই অচিরকালস্থায়ী সমাধিদশার পরেই আসে ব্যুত্থান, অর্থাৎ সাধারণ দৈনন্দিন জীবনধারা, এবং সে অবস্থায় আবার ফিরে আসে ক্ষণিকবিস্মৃত সেই আত্মপ্রীতি ও মানবপ্রীতি। শুধু ফিরে আসে বললে যথেষ্ট হবে না—ব্যুত্থানদশায় এই মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরা ঐ ক্ষণাস্বাদিত বিশ্বমূর্তিটাকে মানবকল্যাণেই ব্যবহার করে থাকেন। যে মনোভাব প্রবৃত্তি বা চিন্তাধারা হতে চিরন্তন মুক্তি কল্পনাও করা যায় না, তাকে অন্ধসংস্কার বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা মূর্খতারই পরিচায়ক।

যেহেতু মানবকেন্দ্রিকতা হতে মুক্তিলাভ অকল্পনীয়, অর্থাৎ, যেহেতু একে মিথ্যা বললেও দোষ ঠিক কোথায় তা দেখানো অসম্ভব, অতএব মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানীরা জেনে রাখুন যে তাঁদেরই যুক্তিজালে কোথাও কোনো ফাঁকি আছে।

এ কথা বলতে চাইছি না যে, অতএব মানবকেন্দ্রিকতা একটা প্রমাণসিদ্ধ তত্ত্ব। আমাদের বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, অপ্রমাণ আখ্যা দিয়ে একে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। মনে রাখতে হবে, বিশ্বকেন্দ্রিকতার ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। বিশ্বকেন্দ্রিকতা অপ্রমাণ—এমন কথা বলবার দুঃসাহস আধুনিক কালে বোধ হয় কারও হবে না ; কিন্তু, তাই বলে, এটা যে প্রমাণসিদ্ধ অথবা অবশ্যস্বীকার্য—এমন কথা বলারও যুক্তি নেই। মানবকেন্দ্রিকতা ও বিশ্বকেন্দ্রিকতা উভয়েই প্রমাণ-অপ্রমাণ গোষ্ঠীর বাইরে দুটো বিভিন্ন পস্টুলেট, যার প্রত্যেকটার দৃষ্টিকোণ থেকে সুসমঞ্জস মতবাদ গড়ে তোলা যায়।

বিজ্ঞান বিশ্বকেন্দ্রিকতা-রূপ পস্টুলেটটি গ্রহণ করে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে একটা মতবাদ গড়ে তুলেছে, এরই জোরে সে এই পস্টুলেটটির মহিমা প্রচার করে বেড়ায়। পস্টুলেটটিকে সে প্রমাণপদবীতে উন্নীত করতে পারে নি। পারত যদি সে দেখাত যে, মানবকেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আর-একটা যে আধ্যাত্মিক মতবাদ অনাদিকাল থেকে চলে আসছে তার মধ্যে বড় বড় ভুল আছে। তা কিন্তু সে দেখায় নি। সে

শুধু বলে চলেছে যে আধ্যাত্মিক মতবাদ, বা তার ভিত্তিস্বরূপ যে মানবকেন্দ্রিকতা, তা তার কাছে একান্ত অবোধ্য। এটাও যে একটা চলনসই পস্টুলেট নয়, এটা সে কোনোদিনই দেখায় নি, দেখাতে পারেও না। অনাদিকাল থেকে শুরু করে সেদিন পর্যন্ত মানবকেন্দ্রিকতাই ছিল সব সভ্যতা সব সংস্কৃতির মূল পস্টুলেট। এমনকি, সাম্প্রতিক কালেও ইওরোপ ও মার্কিন ভূখণ্ডে বেশ একদল প্রতিপত্তিশালী দার্শনিক ও সাহিত্যিক বিজ্ঞানের হিমশীতল নিষ্প্রাণতা ও চরম মানব-উপেক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বহুনিন্দিত ও আজিকার সভ্যসমাজে প্রায়-অপাঙ্‌ক্তেয় মানবকেন্দ্রিক সংস্কৃতিরই পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছেন। হয়তো বা পর পর দুটা বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এই পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে। বিজ্ঞানীর স্পর্ধিত বিশ্বকেন্দ্রিক মনোভাব এই দুটা যুদ্ধের ফলে আজ কিছুটা হতমান। উনবিংশ শতাব্দীর উন্নাসিক তরুণ বিজ্ঞান হয়তো আজ প্রবীণতার ভারে ক্লিষ্ট। তার মুখ থেকে আজ তাই শুধু এই একটি কথা শুনতে পাচ্ছি— আমি তোমাদের মানবকেন্দ্রিকতা বুঝতে পারি না। উনবিংশ শতকের স্পর্ধিত নস্যাৎকরণের ভূমিকা এখন অনেকটা ম্লান।

পক্ষান্তরে, অমিতবিক্রম বিজ্ঞানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানবকেন্দ্রিকতাবাদও আজ যথেষ্ট সংযত ও আত্ম-সচেতন। বিজ্ঞানের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার রূপ সে দেখেছে, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে তার দানবীয় শক্তি, তার অপরিমিত প্রতাপ ও প্রতিপত্তি। তাই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সে যে কথা বলতে চায় তা বলতে শিখেছে অতি সাবধানে, আটঘাট বেঁধে। বিশ্বকেন্দ্রিকতাও যে একটা চলনসই পস্টুলেট হতে পারে, এ কথা সে অস্বীকার করে না, করবার ভরসাও পায় না। সে শুধু বলে, ঐ পস্টুলেটটা এবং ওর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিজ্ঞানরূপ ইমারতটা কেবলই ইট-পাথরে তৈরি, বড় নিষ্প্রাণ এবং মানুষস্পর্শবিহীনতায় বড়ই কুৎসিত। অর্থাৎ, মানবিকতাবাদীরা অতি সাবধানে মানুষ ও জগতের একজাতীয় তুলনামূলক মূল্যায়ন করে অগ্রসর হয়েছেন।

মানবিকতাবাদী মানবপূজারী, এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্বপূজারী। কি বুদ্ধির প্রাখর্যে, কি সংগঠনের কৃতিত্বে, এঁরা কেউ কারও পিছনে দীর্ঘকাল পড়ে থাকেন না। ভিন্ন ভিন্ন পস্টুলেট মেনে নিয়ে, ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে এঁরা বিশ্বজগৎ ও মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেছেন, এদের তুলনামূলক মূল্যায়ন করেছেন ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে। পরস্পরের প্রতি উপেক্ষা বা অসূয়া পোষণ করলেও, তৃতীয় কোনো বিচারকের দৃষ্টিতে এঁদের মধ্যে কোনো তরতমভাব ধরা পড়ে না। উভয়েই সমবলবান ও সমান কৃতী। পার্থক্য শুধু মূলগত দৃষ্টিকোণে, স্বীকৃত পস্টুলেটে।

কিন্তু মোগল-পাঠানের এই দ্বন্দ্বে আমরা কোন্ পক্ষ অবলম্বন করব? দুটা দৃষ্টিকোণই তো আমরা একসঙ্গে মানতে পারি না। আমাদের তো কোনো-এক পক্ষ সমর্থন করতে হবে। একটা সহজ দৃষ্টান্ত ধরে অগ্রসর হওয়া যাক।

শিল্পকলার বিচারে দেখা যায় একই শিল্পকৃতি একজনের কাছে সুন্দর বলে মনে হয়, অপরের কাছে মনে হয় কুৎসিত। এর জন্য যদি কেউ বলেন যে, অতএব কারও বিচারই চরমসত্যজ্ঞাপক নয়, প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী বিচার করে— তা হলে বলতে হবে যে, সমস্ত শিল্পকলা, তথা শিল্পকলা-বিচার, হল আগাগোড়া মিথ্যার বেসাতি। শিল্পকলা এবং শিল্পকলা-বিচার অবশ্যই মানবকেন্দ্রিক, এবং যেহেতু এরা

আগাগোড়াই মিথ্যা, অতএব মানবকেন্দ্রিকতা ব্যাপারটাই একটা বিরাট মিথ্যা, সুপরিকল্পিত ধাপ্পাবাজী। এতে আনন্দ আছে প্রচুর, কিন্তু নেই কোনো শাশ্বতের সন্ধান। শাশ্বত সত্যের সন্ধান মেলে একমাত্র বিজ্ঞানীর বিশ্বকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে। এবং ঐ একই যুক্তিতে বলতে হয় যে, সমগ্র নীতিজগৎ এবং মানবকেন্দ্রিক সমগ্র দর্শনশাস্ত্রও মিথ্যা।

অথচ আবহমানকাল ধরে মানুষ শিল্পচর্চা নীতিচর্চা ও দর্শনচর্চা করে আসছে, এবং বিভিন্ন শিল্পকৃতি নৈতিক কাজকর্ম ও বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের ভালোমন্দ সত্যাসত্য বিচার করে আসছে। সমস্তটাই যদি মিথ্যার বেসাতি ও শূন্যগর্ভ আনন্দসৃষ্টিমাত্র হয়, তা হলে জিজ্ঞাস্য এই যে, বুদ্ধিমান মানুষ আজও কেন এ-সবের চর্চা করে? শুধুই কি খানিকটা আনন্দ পাবার জন্য? প্রকৃত শিল্পী যাঁরা, এবং যাঁরা ধার্মিক ও দার্শনিক, তাঁরা কিন্তু এসবের মধ্যে শাশ্বতের সন্ধান পেয়েছেন বলেই দাবি করেন। তাঁরা এগুলিকে কেবল বিলাসের উপচাররূপে গ্রহণ করেন নি। তা ছাড়া, আর-একটা কথাও ভেবে দেখা উচিত—এগুলি যদি বা কেবল বিলাসসামগ্রী হয়, তা হলেও এ কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, এরা যে জাতের আনন্দ সৃষ্টি করে তা ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাজনিত আনন্দ নয়, অনেক উন্নততর। এই উন্নততরত্বের মাপকাঠি কী? এদের উচ্চজাতীয়ত্ব কি শাশ্বতের অনুসন্ধান জন্য নয়?

প্রশ্ন হতে পারে—শিল্পকলা দর্শন ও ধর্মনীতির রাজ্যে, যেখানে পদে পদে এত মতদ্বৈধ, সেখানে শাশ্বতের অনুসন্ধিৎসা আছে, এ কথা স্বীকার করি কিরূপে? ভাবখানা এই যে, স্বীকার করা যদি সম্ভব না হয় তা হলেই তো মানবিকতাবাদ খণ্ডিত হয়ে যায়। মানবপূজারী মানবিকতাবাদী কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন নানা ভাবে।

তাঁদের অনেকে সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ মতদ্বৈধ আছে, অর্থাৎ কটাক্ষ করে বলতে চেয়েছেন যে তা হলে বিজ্ঞানকেও মিথ্যার বোঝা বলব না কেন? বিজ্ঞানের রাজ্যেও দেখতে পাওয়া যায়, আজ যে মত বহুজনস্বীকৃত কাল তার ভিত্তি খসে যাচ্ছে। আইনস্টাইন কি নিউটনের মত খণ্ডন করেন নি? এই উত্তরটার মধ্যে, অবশ্য, অনেক ফাঁকি আছে। কিন্তু এইটুকুর দাপটেই অনেক বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানপদলেহী দার্শনিক ঘায়েল হয়ে পড়েছেন। ঊনবিংশ শতকের উন্নাসিকতা সংযত করে তাঁরা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিজ্ঞানও সর্বাংশে বা অনেকাংশে তত্ত্বানুসন্ধান নয়। তাঁরা অবশ্য একে নিছক বুদ্ধিবিলাসও বলবেন না। তাঁদের মতে বিজ্ঞান হল জগৎটাকে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে বুদ্ধির কাছে উপস্থাপিত করার একটা যৌক্তিক প্রয়াস। অর্থাৎ, এই পারিপাট্য যে সত্যই জগতে আছে, তা নয়; বুদ্ধি আপন প্রয়োজনেই এই পারিপাট্য আপনার মনে রচনা করে—শিল্পপ্রেরণায় নয়, যুক্তির প্রেরণায়। শিল্পদর্শনাদির সহিত বিজ্ঞানের প্রভেদ এই যে, বিজ্ঞানস্বীকৃত পারিপাট্য আবেগমূলক নয়, আবেগলেশশূন্য বুদ্ধি বা যুক্তি -মূলক।

বাক্‌চতুর এইসব মানবিকতাবাদী ও অসম্বৃত এই বিজ্ঞানবাদী দলের বিতণ্ডায় কিন্তু কোনো ইষ্টসিদ্ধি হল না। এই দলভুক্ত বিজ্ঞানবাদীরা তো অপ্রকৃতিস্থ হয়ে বলেই ফেললেন যে, বিজ্ঞান সত্যানুসন্ধান নয়, এবং 'মজ্জমানের তৃণখণ্ডাকর্ষণ' ন্যায়ে তাঁরা বিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যার মধ্যে যে প্রভেদ টানলেন তা প্রায় বালভাসিতের মতই শোনাল। মানবিকতাবাদীই বা কি লাভ করলেন? তিনিও তো দেখাতে পারলেন না যে, শিল্পকলা ধর্মনীতি ও দর্শন শাশ্বতানুসন্ধানমূলক?

মানবিকতাবাদীর আত্মপক্ষ সমর্থন তখনই সুষ্ঠু বলে গণ্য হবে যখন সে দেখাতে পারবে যে, সেও বিজ্ঞানবাদীর তুলনায় কম শাশ্বতানুসন্ধিৎসু নয়। প্রথমে বিনা দ্বিধায় ধরে নিতে হবে যে, বিজ্ঞান শাশ্বত সত্যের অনুসন্ধান করে এবং সার্থক ভাবেই করে। তার পরে দেখাতে হবে, বিজ্ঞান মানবকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি তুলেছে সেগুলি গ্রাহ্য নয়, এবং কেন। সর্বশেষে নিজের পক্ষে জোরাল সদর্থক যুক্তি দাঁড় করিয়ে দেখাতে হবে বিজ্ঞানের অনুসন্ধানপদ্ধতির সহিত তার অনুসন্ধানপদ্ধতির পার্থক্য কোথায়।

৪

শিল্পকলাদি দৃষ্টান্তে ফিরে আসা যাক। বিজ্ঞান বলছে, এইসব বিদ্যায় যাথার্থ্যের কোনো মাপকাঠি স্বীকৃত হয় নি; লোকে আপন-আপন অভিরুচি অনুযায়ী ভালোমন্দের বিচার করে; এইজন্যই এইসব বিদ্যা আবেগমূলক ও নিতান্তই আপেক্ষিক।

এর উত্তরে মানবিকতাবাদী বলবেন যে, এই যে আপেক্ষিকতার অভিযোগ আনা হয়েছে এটা নিতান্তই বিভ্রান্তিকর। আমি যখন কোনো শিল্পকৃতিকে সুন্দর বলি, বা কোনো কাজকে ভাল বলি, তখন এরকম কোনো কথা আমার মনে স্থান পায় না যে, এখন সুন্দর বা ভালো বললেও পরে কুৎসিত বা মন্দ বলতে পারি। অথবা, ঘুণাক্ষরেও এ কথা বলতে চাই না যে, এটা শুধু আমার দৃষ্টিতে সুন্দর বা ভালো, অপরের দৃষ্টিতে কুৎসিত বা মন্দ হতে পারে। তোমার বেলাতেও ঐ একই কথা, তোমার মনেও তখন এই জাতীয় সন্দেহ উঁকি দেয় না। আমি যখন এটাকে ভালো বা সুন্দর বলি তখন পরিপূর্ণ ভাবেই বিশ্বাস করি যে এটা ভালো বা সুন্দর, এবং তুমিও তাই কর। আমি বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করি যে চিরদিনের জন্য এটা ভালো বা সুন্দর, আরও বিশ্বাস করি, জ্ঞানবান ও রুচিমান সকলেই একে তাইই বলবে, মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, যারা এ কথা বলবে না তারা ভুল করবে। অর্থাৎ, আমি সহজ সরল ভাবে এর সৌন্দর্য ও নৈতিকতা মেনে নিই। তুমিও তাই কর। অতএব, শাশ্বতত্বের অস্বীকারমূলক আপেক্ষিকতার অবকাশ কোথায়?

এ কথা ঠিক যে, আমি যদি কোনো কাজকে ভালো বলি বা কোনো শিল্পকৃতিকে সুন্দর বলি এবং তুমি যদি ঠিক সেই কাজকেই মন্দ বা সেই শিল্পকৃতিকে অসুন্দর বল, তা হলে নিশ্চয়ই দুজনেই যথার্থ কথা বলছি না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অতএব দুজনেই অযথার্থবাদী। আপেক্ষিকতাবাদের মূলকথা হল— দুজনেই অযথার্থ কথা বলছি। তা যখন হচ্ছে না, পক্ষান্তরে দুজনেই যখন যাথার্থ্য দাবি করছি, তখন আপেক্ষিকতা আসে কোন্ পথে?

আপত্তি হতে পারে, একই বিষয়ে একই সময়ে দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ কথার প্রত্যেকটাই যথার্থ হতে পারে না। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই কি দাবি করছি যে দুজনেই সত্যদ্রষ্টা? অবস্থাটা একটু স্থির চিত্তে অনুধাবন করা প্রয়োজন। আমি দাবি করছি, আমিই সত্যদ্রষ্টা, তুমি ভ্রান্ত; এবং তুমি দাবি করছ, তুমিই সত্যদ্রষ্টা, আমি ভ্রান্ত। এই দুই দাবি যদি পরস্পরবিরুদ্ধ হয়, তার একমাত্র অর্থ হচ্ছে এই যে, আমাদের দুজনের মধ্যে যে-কেউ একজন সত্যকে শাশ্বতকে পেয়েছে, অন্যজন ভ্রান্ত।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা দুজনেই ভুল করে থাকতে পারি। কিন্তু সে অবস্থায়ও শাশ্বতত্বের হানি হয় না। আমরা প্রত্যেকেই যে নিজের বক্তব্যকে যথার্থ বলে দাবি করছি, এর থেকেই

প্রমাণিত হয় যে ভুল করে থাকলেও প্রত্যেকেই বিশ্বাস করছি যে, কোনো এক শাশ্বত তত্ত্ব আছে যেটার অনুসন্ধানে আমরা দুজনেই আপাতত ব্যর্থকাম হয়েছি। শাশ্বতত্ত্বের অস্বীকার কোনো ভাবেই করা হচ্ছে না।

তা ছাড়া, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি সঠিক জানতে পারছি যে আমি ভুল করেছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার বক্তব্যকে ভুল বলে স্বীকার করব কেন। ভুল হতে পারে—এ কথা অস্বীকার না করলেও, এর থেকে প্রমাণিত হয় না যে এটা সত্যসত্যই ভুল। 'হতে পারে' ও 'হয়েছে'—এই দুইএর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। দুরস্থ ভুলের সম্ভাবনা সর্বক্ষেত্রেই আছে, কিন্তু তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। আমার বক্তব্য যতক্ষণ না পর্যন্ত পরিষ্কার ভাবে ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ আমি তাকে একান্ত যথার্থ বলেই দাবি করব। আমার জ্ঞান বা বক্তব্যকে ভুল বলে মেনে নিতে প্রস্তুত তখনই থাকি যখন সেটা বুদ্বুদের মত ফেটে চুরমার হয়ে যায়, অথবা যখন তার কোনো দোষ ধরা পড়ে। আর, ভুল 'হতে পারে' বলে মেনে নিই তখনই যখন সেটা হয়ে ওঠে টলমল, অথবা যখন তার মধ্যে দোষের কোনো আঁচ পাই। কিন্তু কোনো কাজকে ভালো বা মন্দ, এবং কোনো শিল্পকৃতিকে সুন্দর বা অসুন্দর বলার সময় আমার বিশ্বাস সব ক্ষেত্রেই বুদ্বুদের মত ফেটে যায় না, অথবা পদ্মপত্রনীরের মত টলমলও করে না, অথবা আমার বক্তব্যের কোনো দোষ চোখে পড়ে না, তার কোনো আঁচও পাই না। তাই যদি হয়, তা হলে আমার বিশ্বাস বা বক্তব্যকে শাশ্বতানুগ বলব না কেন।

আপত্তি হতে পারে—এই কথা তো আমার বিরুদ্ধবাদীর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। অবশ্যই প্রযোজ্য, এবং এই জন্যই সেও তার মতবাদ পরিত্যাগ করতে রাজি হয় না। আবার প্রশ্ন উঠবে—দুজনেই যদি নিজ নিজ মতবাদ আঁকড়ে পড়ে থাকি, এরই নাম কি আপেক্ষিকতা নয়? উত্তরে বলব—না, এর নাম আপেক্ষিকতা নয়, এর প্রকৃত নাম হল গোঁয়ার্তুমি। আশার কথা এই যে, মানুষের মগজে সহজাত কিছুটা বুদ্ধি থাকে বলে প্রত্যেকেই বিরুদ্ধ মতবাদের মুখোমুখি হলে নিজের মতটাকে ঐ বিরুদ্ধ মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করে দেখে। এই যাচাই করার নামই যুক্তিতর্ক বা বিচার, এবং এর ফলে সুগম হয় সত্যানুসন্ধানের জয়যাত্রা। আপেক্ষিকতার কথা এখানে টেনে আনা মূর্খতারই শামিল। অতএব, মানবিকতাবাদীর শাশ্বতানুসন্ধান বিজ্ঞানীর চেয়ে কমজোর নয়। মানবিকতাবাদী হয়তো কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু সেটা তার সততারই পরিচায়ক। শাশ্বত তত্ত্বের আসল রূপটা সব ক্ষেত্রে সহজ সরল থাকে না, অনেক সময়েই সেটা থাকে বেশ জটিল ও গোলমেলে। মানবিকতাবাদীকে দ্বিধাগ্রস্ত হতে হয় এইজন্যই। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানী নিজের একটা পথ ছকে নিয়েছে, এবং এই পথের বাইরে যা-কিছু পড়ে তা সে উপেক্ষা করতেই অভ্যস্ত। তাই তার মন প্রায়ই থাকে দ্বিধাশূন্য। এটা বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য নয়, হয়তো দুর্বলতা।

মানবিকতার বিরুদ্ধে বিশ্বকেন্দ্রিক বিজ্ঞানের সব চেয়ে বড় আপত্তি ছিল এই যে, মানুষ যেহেতু জড়-ও-জীব-প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের একটা অধ্যায় মাত্র, অতএব সে জড়-ও-জীব-প্রকৃতির অমোঘ কার্যকারণনিয়মে নিয়ন্ত্রিত, এবং যেহেতু দেখা গেল, মানুষের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই, অতএব মানবিকতা ব্যাপারটাই ভিত্তিহীন। বিজ্ঞানী পূর্বেই বলেছেন, প্রকৃতির কোলে লালিত মানুষ বড়জোর কিছুটা হাবুডুবু খেতে পারে, কিছুটা হাত-পা ছড়াতে পারে, হাসিকান্নার খেলা খেলতে পারে; কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিতে সে প্রকৃতিরাজ্যেরই অন্তর্গত পদার্থবিশেষ। অর্থাৎ, মানবিকতা হল নৈসর্গিকতারই একজাতীয় শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাস। মানবিকতাবাদী এর কী উত্তর দেবেন?

তাঁরা বলবেন, জননীর স্নেহলালিত সন্তান কি কৈশোরোত্তর দশায় আত্মসচেনতা প্রাপ্ত হয় না, এবং তখন কি সে নিজ জননীর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে শেখে না? মাতৃক্রোড়ে ঐ শিশুর হাত-পা ছোঁড়া ও হাসিকান্নার খেলা কি যৌবনলব্ধ স্বাতন্ত্র্যের প্রস্তুতিপর্ব নয়? ডুবন্ত মানুষ যে লোষ্ট্রখণ্ডের মত তলিয়ে না গিয়ে কিছুক্ষণ হাবুডুবু খেতে পারে, সেটাই কি সাঁতার কাটার পূর্বাভাস নয়? বিবর্তনবাদের দোহাই সত্ত্বেও বিজ্ঞানীর দল মানুষের প্রতি অসীম কৃপাপরবশ হয়ে যেটুকু বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেটাই কি প্রকারান্তরে তার কার্যকারণনিয়মাতিগ স্বাতন্ত্র্যের অস্ফুট পরিচয় নয়? লোহার খাঁচার ভিতর যে পাখি ছটফট করতে থাকে, খাঁচাটি হাতে করে তাকে নিয়ে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ানো যায়, এবং খাঁচার গতিতেই তার সামগ্রিক গতি নিয়ন্ত্রিত হয়; কিন্তু মুক্তিলাভ করলে কি সেই পাখিই খাঁচার গতিস্থিতি উপেক্ষা করে আপন স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় অনন্ত আকাশে উড়ে বেড়ায় না?

জন্মের ইতিহাসটাই মানুষের সব-কিছু নয়। তার সত্তা চারটি ডাইমেনশনে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতায় তার স্থূল দেহটা অধিকার করে থাকে তিনপ্রকার ডাইমেনশন; কিন্তু তার ঐ হাত-পা ছোঁড়া, হাবুডুবু খাওয়া ও হাসিকান্নার খেলা-রূপ যে বৈশিষ্ট্য, সেটা থাকে বস্তুত চতুর্থ এক অধ্যাত্ম ডাইমেনশনে। এই চতুর্থ ডাইমেনশনের অবিসংবাদিত বাসিন্দা হল মানুষের আসল মানুষ-রূপটি, অর্থাৎ আত্মসচেতন স্বতন্ত্র আত্মা। সহজ জ্যামিতিক বিধিবশেই তিন-ডাইমেনশন-ব্যাপী জড়প্রকৃতির উপর চতুর্থ ডাইমেনশনস্থ অধ্যাত্মসত্তার প্রক্ষেপ (projection) পড়ে। প্রক্ষেপ কখনও প্রক্ষিপ্যমানকে স্বরূপে প্রদর্শন করতে পারে না, সহজ জ্যামিতিক নিয়মেই সেটা অল্পবিস্তর বিকৃত হয়ে প্রকাশ পায়। প্রকৃতির বুকে প্রক্ষিপ্যমান অধ্যাত্মসত্তারও অনুরূপ কারণে সুশৃঙ্খল বিকৃতি ঘটে। জড়প্রকৃতির বুকে অধ্যাত্মসত্তার প্রক্ষেপ-রূপ এই বিকৃতিই হল মানুষের জীবপ্রকৃতিগত হাত-পা ছোঁড়া, হাবুডুবু খাওয়া ও হাসিকান্না। জড়প্রকৃতি-রূপ মলিন আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়ে মানুষের তুরীয় অধ্যাত্মসত্তা এরূপ বিকৃতভাবেই প্রকাশিত হয়। অথবা এরা হল 'এলোমেলো' 'এবড়োখেবড়ো' অতি-কুঞ্চিত অনুপযোগী পর্দায় আঁকা আত্মসচেতন স্বতন্ত্র অধ্যাত্মসত্তার সংক্ষিপ্ত এবং বিকৃত রূপ। আসল চতুর্থ ডাইমেনশনটির খবর বিজ্ঞানীরা রাখেন না। তাই তিন-ডাইমেনশনাল জড়প্রকৃতির উপর প্রক্ষিপ্ত মানুষের যেটুকু রূপ তাঁরা দেখেছেন তাকেই সবখানি মনুষ্যত্ব, মানুষের আসল বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নিয়েছেন।

ভুল হয়তো তাঁরা করেন নি। সরোবরের উপরি-তলের প্রশান্ত জলরাশি দেখে যে সেটাকেই সব মনে করে, এবং সেই উপরি-তলের মানচিত্র এঁকে সরোবরের বর্ণনা দেয়, সে ভুল হয়তো করে না—যতটুকু সে দেখেছে তার হয়তো সঠিক বর্ণনাই দিয়েছে। কিন্তু যদি ঐ জলরাশির তৃতীয়-ডাইমেনশনের সহিত কোনোমতে তার পরিচয় করে দেওয়া যায়, তা হলে সে নিশ্চয়ই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়বে। জড়প্রকৃতি বিশ্বসত্তার উপরিতল মাত্র, বিজ্ঞানীর পরিচয় শুধু এই উপরিতলের সহিত। এর অভ্যন্তরে যে অধ্যাত্মসত্তা আত্মগোপন করে আছে, যদি কোনোদিন তার লেশমাত্র পরিচয় প্রকাশ পায় তা হলে বিজ্ঞানের সদম্ভ বিজয়-ঘোষণা নিমেষেই স্তব্ধ হয়ে যাবে।

৫

বিজ্ঞানের পরাভব ও মানবিকতার জয় তখনই সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে যখন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকে এই তুরীয় সত্তার দিকে ফেরানো সম্ভব হবে। সেটা হয়তো বিশেষ কঠিন কাজ নয়। প্রতি মানুষের আত্মসচেতন

'আমি'-বোধেই দৃষ্টির এই দিক্‌পরিবর্তন হয়। আমার জড়দেহটা এবং দেহসঞ্জাত যত কাজকর্ম সবই প্রকৃতিজগতের ব্যাপার। বিশাল বিশ্বের মাঝে এই দেহটা ঠিক আর দশ-পাঁচটা জড়জিনিসেরই মত। এই দেহটাকে প্রত্যক্ষ করি ঠিক সেই বহির্মুখীন দৃষ্টিতে যার দ্বারা আরও দশ-পাঁচটা জড়পদার্থ দেখি। তাদেরই মত এই দেহের গতিবিধি কার্যকারণের অলঙ্ঘ্য নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু, যদি কখনো 'আমি'কে দেখবার ইচ্ছা হয়, তা হলে দৃষ্টিকে বহির্জগৎ থেকে সরিয়ে এনে অন্তর্মুখীন করতে হবে।

এই অন্তর্মুখীনতা ব্যাপারটা বেশ ভালো ভাবে বোঝা প্রয়োজন। কোনো পদার্থের অন্তস্তল তার বহিস্তলের সহিত সহজ ভাবে সংলগ্ন থাকে না। অন্তর্ভাগকে বহির্ভাগেরই প্রসার বলা যায় না— অন্তর্ভাগ ও বহির্ভাগ পরস্পরসংলগ্ন দুটি অংশ নয়! এরা পরস্পর-বিপরীতমুখী। এদের, হয়তো, কোনো একটা মিলনস্থল আছে, না হলে এ কথা বলি কেন যে, এরা একই পদার্থের বহির্ভাগ ও অন্তর্ভাগ? কিন্তু কোথায় কেমন করে তাদের হাত ছোঁয়াছুয়ি হয়েছে বলা দুষ্কর। এই সম্পর্কেই 'আমি' আমার দেহের আন্তর সত্তা। সরোবরের গভীরতা যেমন তার উপরি-তলের অংশ নয়, আমিও অনুরূপ কারণে আমার দেহের অংশ হতে পারি না। আবার এমন কথাও বলা যাবে না যে, আমি ও আমার দেহ তৃতীয় কোনো সত্তার দুটি অংশ— সরোবরের উপরি-তল ও গভীরসত্তা তার দুই অংশ নয়। এইখানেই অংশ-তত্ত্বের সহিত ডাইমেনশন-তত্ত্বের মৌলিক প্রভেদ। 'আমি' পদার্থটা থাকে দেহসংলগ্ন এক বিদেহ ডাইমেনশনে।

এই 'আমি'কে অস্বীকার করা যায় না। আত্মসচেতনাই এর অস্তিত্বে সব চেয়ে বড় প্রমাণ। বিজ্ঞানীরা যে এই অধ্যাত্ম আমি-তত্ত্বটা স্বীকার করতে চান না, তার একমাত্র কারণ হল এই যে, তিন-ডাইমেনশনাল জড় (বা জৈব) দেহটার অতীত, অথচ তার গাত্রসংলগ্ন, অধ্যাত্ম ডাইমেনশনের কোনো সংবাদ তাঁরা পান নি। তাঁরা নিজেরা যে কখনও আত্মসচেতন হন নি, তা নয়; বরং প্রচলিত জনমতের বিরুদ্ধাচরণ করার সময়ে তাঁরা অতিমাত্রায় সচেতন থাকেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এই আত্মসচেতনার অন্তরালে তাঁরা কোনো গম্ভীর তত্ত্বের ইঙ্গিত পান না। হয়, তাঁরা একে রজ্জুসর্পের মত ভ্রান্তিবিলাস বলে উড়িয়ে দিতে চান, নাহয় জড়জগতের উপর এর প্রক্ষেপটাকেই 'আমি' বলে চালিয়ে দিতে চান। কিন্তু এর কোনোটাই যথার্থ নয়। সুস্পষ্ট আত্মসচেতনতাকে নিছক ভ্রান্তি বলে উড়িয়ে দেওয়ার যুক্তি কী হতে পারে? তিন-ডাইমেনশনাল জড়দেহটা ছাড়া আর কিছু পাই নি বলে? কিন্তু, এই না-পাওয়াটাই যে অন্যায় হয়েছে, সেটা বুঝতে পারছ না কেন? আত্মসচেতনতা ব্যাপারটাকে ফুৎকারে উড়িয়ে না দিয়ে কিছুটা বিশ্লেষণ করলে কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হত?

জড়জগতের উপর অধ্যাত্মসত্তার প্রক্ষেপকে খাঁটি 'আমি' বলাও যুক্তিসংগত হবে না। এই প্রক্ষেপরূপ 'আমি' আত্মসচেতন নয়। এই প্রক্ষেপ-'আমি'কে পাওয়া যায় অতি সহজ প্রাথমিক এক-প্রকার আমিত্ব-বোধে, যেটাকে হয়তো বোধ বলাই উচিত হবে না। অন্তত আত্ম-সচেতন আমিত্ব-বোধ এর অনেক ঊর্ধ্বে। দেহ-পটভূমিকায় প্রাপ্ত প্রাথমিক অহং-বোধের সহিত আত্মসচেতনার সমীকরণ সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচায়ক নয়।

বুদ্ধিমান লোক বলবে, যেহেতু আমার আত্মসচেতনতা আছে, অতএব অধ্যাত্মভূমি বলে একটা চতুর্থ ডাইমেনশন স্বীকার করতেই হবে, এবং যদি সেটা আপাতত দুর্বোধ হয় তবে সেটাকে অনুশীলন দ্বারা সুবোধ করে তুলতে হবে। সেটা দুর্বোধ থাকে এইজন্য যে, আমার দৃষ্টি সাধারণত প্রকৃতিমুখীন।

এক দণ্ডের স্বপ্নে যদি আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে শিলাইদহে পদ্মাতীরে সপ্তাহকাল বাস করে আসি,

তা হলে বলতেই হবে যে, ঐ সাত দিনের জীবনটা আমার বাস্তব-জীবন-সংলগ্ন এক নূতন ডাইমেনশন। অধ্যাত্মজীবনও অনেকটা এইভাবেই জড়জীবন-সংলগ্ন। প্রভেদ শুধু এইটুকু যে, সুপ্তোত্থিতির পর সেই স্বাপ্ন-জীবনটা আর দ্বিতীয় বার ফিরে পাওয়া যায় না, কিন্তু জড়জীবনে ফিরে আসার পরও বহুবার আমি সেই একই অধ্যাত্মজীবনে ফিরে যেতে পারি। সাত দিনের স্বাপ্নজীবনে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না বলেই সেটাকে মিথ্যা বলি। অধ্যাত্মজীবন কিন্তু মিথ্যা নয়, কারণ বারে বারে সেখানে ফিরে যেতে পারি।

এই অতি-সত্য অধ্যাত্মজীবনই মানবিকতার পশ্চাৎপট। বিশ্বকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে এই জীবনের সম্যক উপলব্ধি না হলেও এর অপলাপ অসম্ভব।

৬

বিজ্ঞান যেমন অধ্যাত্মজীবনকে উড়িয়ে দিতে চায়, আধ্যাত্মিক মানবিকতাবাদও এককালে ঠিক বিপরীতভাবে বিশ্বজগতের অপলাপ কামনা করেছিল। যুক্তি ছিল এই যে, অধ্যাত্মজীবনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে বিশ্বজগৎ তো আপনা হতেই লুপ্ত হয়ে যাবে, কারণ, অন্তর্মুখীন দৃষ্টি বহির্জগতের কী সংবাদ সংগ্রহ করবে? এই মূল কথাটাই নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের যোজনায় ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে মায়াবাদে পরিণত হয়েছিল।

বিশ্বসর্বস্ববাদের মত এই মায়াবাদও স্বৈরাচারী। বিশ্বসর্বস্ববাদের অধ্যাত্মনিন্দা তবুও কিছুটা সমর্থন করা যায়, বিশ্বমুখী দৃষ্টিতে অধ্যাত্মজীবন সত্যই ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। বিজ্ঞানীদের অপরাধ কেবল এইটুকু— যদিও সেটা মস্ত অপরাধ— যে, তাঁরা এটা ধরবার চেষ্টাও করেন না। মায়াবাদীরা, কিন্তু, বিশ্বসংসার অপলাপ করতে চেয়ে এর চেয়ে অনেক বেশি অপরাধ করেছেন।

তার কারণ এই যে, শুধুই অন্তর্মুখীন দৃষ্টি নিয়ে কেউই জন্মগ্রহণ করে নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৃষ্টির অন্তর্মুখীনতা, শৈশবেই, বহির্মুখীনতার চেয়ে প্রবলতর হতে পারে। কিন্তু সর্বপ্রাণিসাধারণ বহির্মুখীনতার একান্ত অভাব প্রথমজীবনে কারও থাকতে পারে না। সুতরাং কেউই দাবি করতে পারবে না যে, বহির্বিশ্বের কোনো ধারণা কস্মিন্‌কালেও তার মনে এসে পৌঁছয় নি। বহির্বিশ্বের ধারণা নিয়েই তো সে জন্মেছে। বহু সাধনা ও অনুশীলনের ফলেই সে বহির্মুখীন দৃষ্টিকে প্রয়োজনমত অন্তর্মুখীন, তেমন প্রয়োজন হলে সর্বতোভাবে অন্তর্মুখীন, করে তুলতে পারে। কিন্তু বহির্মুখীনতার কিছুটা আঁচ বরাবরই থেকে যায়। বহির্মুখীনতা সংবরণ করে দৃষ্টিটাকে অধ্যাত্মজগতে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে বলেই যে এই বিরাট বিশ্ব মিথ্যা হয়ে যাবে, এমন কথার পিছনে কোনো যুক্তি নেই। অধ্যাত্মবাদী বহির্জগৎকে অস্বীকারও করতে পারেন না, 'জানি না'ও বলতে পারবেন না। বিশ্বসর্বস্ববাদী কিন্তু অধ্যাত্মজগতের সন্ধান একেবারে নাও পেতে পারেন।

মায়াবাদ অগ্রাহ্য। অথচ এ কথাও ঠিক যে, এই মায়াবাদে এক গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত আছে। মনকে যতটা পরিমাণে অন্তর্মুখীন করা যায় ঠিক ততটা পরিমাণেই বহির্বিশ্বের আকৃতিতে কি যেন একটা পরিবর্তন ঘটে। বহির্বিশ্ব হতে নিজেকে যতই গুটিয়ে আনা যায় ততই বিশ্বের সামগ্রিক রূপের কোথায় কী যেন আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যে জিনিস আমার কাছে পরম সুখদায়ক বা অশেষ দুঃখদায়ক ছিল, আত্মসংবরণের ফলে সেটা আর ততখানি সুখদায়ক বা দুঃখদায়ক থাকে না। বহির্বিশ্বকে কেন্দ্র করে আমার

মনে যত-কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ ঘৃণা-বিদ্বেষ নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছিল, আত্মস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেসব যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়ে যায়।

সাইকো-অ্যানালিস্ট্‌রা বলেন, অবচেতন মনে নানাবিধ কম্‌প্লেক্স্‌ সৃষ্টি হওয়ার ফলে এই একটা জগৎই বিভিন্ন ভোক্তার কাছে বিভিন্ন মূর্তিতে প্রতিভাত হয় (এবং উৎকট কোনো কম্‌প্লেক্সের প্রকোপে যদি কেউ মনের ভারসাম্য হারিয়ে জগৎটাকে একেবারেই অনন্যসাধারণ মূর্তিতে দেখে, তখন লোকে তাকে বলে 'পাগল')। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে যে, এমনকি কম্‌প্লেক্স্‌-মুক্ত সুস্থচিত্ত মানুষও পূর্বজন্মার্জিত কর্মসংস্কারের ফলে সর্বজনগ্রাহ্য সাধারণ জগৎটাকে কিছুটা বিকৃত করে দেখবে। জাগতিক উপাদানসমূহের সংস্থান ব্যাপারটা, তাঁদের মতে, প্রতি দ্রষ্টার কাছে, তার পূর্বজন্মসংস্কারের ফল। আবার, পূর্বজন্ম স্বীকার করেন না এমন অনেক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকও প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের দেশ-কাল -রূপ সংস্থান, হয়তো বা আরো অনেক বিন্যাসপ্রণালী— এমনকি, কারো কারো মতে রূপরসগন্ধস্পর্শ-রূপ ভৌতিক ধর্মও— সংস্কারজাতীয় মনোবৃত্তি দ্বারা কল্পিত। এই বিভিন্ন মতবাদের যাথার্থ্য-অযাথার্থ্য বিচারে আমাদের প্রয়োজন নেই। মতবাদগুলি উল্লেখ করা হল শুধু একটি উদ্দেশ্যে— আমরা দেখাতে চাইছি যে, অনেক অনেক দার্শনিকের মতে মন অধ্যাত্মমুখী হতে আরম্ভ করলেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে, যে জগৎটাকে আমি মনো-নিরপেক্ষ স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম তার অনেকখানি অংশই— কারো কারো মতে, সবখানিই— মনঃকল্পিত।

মনকে অন্তর্মুখীন করার অর্থ ই হল আত্মসচেতন হওয়া। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, আত্মসচেতন হলেই জগতের সামগ্রিক আকৃতির পরিবর্তন হয়; আত্মসচেতনতার তারতম্যে এই পরিবর্তনের হ্রাসবৃদ্ধিও ঘটে। আবার, যেমন মনের অন্তর্মুখীনতার অর্থ হল আত্মসচেতনা, তদ্রূপ আত্মসচেতনতার অর্থ হল নির্লিপ্ত হয়ে জগৎ দেখা। এখন, কোনো-এক বিষয়ে নির্লিপ্ত হওয়া তখনই সম্ভব হয় যখন মন অন্য-এক পদার্থে লিপ্ত হয়। অতএব, বিশ্বজগতে নির্লিপ্ত হতে হলে তদতিরিক্ত অন্য-কিছুতে লিপ্ত হতে হবে। এবং সেই অন্য-কিছু পদার্থ টাই হল অধ্যাত্মজগৎ। কারণ, সমগ্র বহির্বিশ্ব বাদ দিলে আর একটিমাত্র পদার্থের অস্তিত্ব আমরা ভালো ভাবে বুঝতে পারি— সেটা হল অধ্যাত্মজগৎ, আন্তর জগৎ, যে জগৎ স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। অধ্যাত্মদৃষ্টিমান মহাজনেরা নির্লিপ্তভাবেই জগৎ দর্শন করেন। বহির্জগৎ তাঁদের কাছে কোনো সুখ-দুঃখ-ঘৃণা-বিদ্বেষ বহন করে আনে না, স্বয়ংপ্রতিষ্ঠও নয়; সর্বাংশে না হলেও, বহুলাংশে সে জগৎ ভাবসৃষ্ট, বাসনা-কল্পিত— কারো কারো মতে অধ্যাত্মজগতেরই বিপরীত পৃষ্ঠ। এর কোনো নিজস্ব মূল্য নেই, অধ্যাত্মজীবনের পরিপুষ্টিতেই এর সার্থকতা, অধ্যাত্মজীবনের প্রয়োজনেই এর স্থিতি। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বহির্জগতের অপলাপ ঘটে না, যা ঘটে তা হল এর নূতন মূল্যায়ন, নবরূপে প্রতিভান।

মানবিকতাবাদের মূল কথাই হল বিশ্বজগতের এই অভিনব মূল্যায়ন ও অনন্যপূর্ব প্রতিভান। বিশ্বসর্বস্ব বিজ্ঞানী এ তত্ত্বের পরিচয় পান নি, তাই তাঁরা মানুষকে তার প্রকৃত মর্যাদা দিতে শেখেন নি। বিজ্ঞানী বুঝতেই পারেন না, মানবিকতা-দর্শনে মানুষকে কেন জগতের কেন্দ্রস্থলে বসানো হয়। বিজ্ঞানীর কাছে সত্যের একটিমাত্র মাপকাঠি স্বীকৃত— সেটা হল বিশ্বকেন্দ্রিকতা। তাই তাঁর কাছে আর-সব কিছুই নিছক কল্পনাবিলাস। শিল্পকৃতি কাব্য দর্শন প্রভৃতি মানবিক বিদ্যার আদর তার কাছে নেই; যদি থাকে সেটা বিলাসের উপকরণ-রূপে।

আমরা দেখিয়েছি, মানবিকতাবাদের মূলে আছে মানুষের অধ্যাত্মসত্তার স্বীকৃতি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অধ্যাত্মসত্তা বলতে আমরা কতখানি বুঝব। তার দৈনন্দিন ব্যবহারিক মনের সবখানি— তার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ জৈবিক তাড়না, সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ইত্যাদি— না, এসবের অতীত অন্য কিছু? হিউম্যানিজ়ম্, পারসোন্যালিজ়ম্, রোমান্টিসিজ়ম্, একসিসটেনশিয়ালজ়ম্ প্রভৃতি নামে প্রচলিত যেসব মতবাদের সহিত ইদানীং কালে আমাদের পরিচয় ঘটছে তারা কিন্তু সব সময়ে খাঁটি মানবিকতাবাদ নয়। এইসব মতবাদীরা আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক মনটাকেই বিশ্বজগতের ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে চায়, বলতে চায় এই ব্যবহারিক মনটাই বিশ্বের ভারকেন্দ্র। তারা এই ব্যবহারিক মনোরাজ্যেই স্বাতন্ত্র্যের আস্বাদ পেতে চায়। তারা মনে করে এই ব্যবহারিক মন কার্যকারণ-নিয়মের অতিগ। কিন্তু, এইখানেই তারা বিরাট ভুল করে বসেছে।

ব্যবহারিক মন সহজাত সংস্কারবশেই চলে। এই সহজাত সংস্কার কার্যকারণ-নিয়মের গণ্ডির বাইরে থাকে না— কেন, তা আমরা বর্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দেখিয়েছি। দৈনন্দিন জীবনটাকে প্রকৃত অধ্যাত্মজীবন বলার চেয়ে বড় ভুল আর কী হতে পারে? এ কথা ঠিক— এবং পূর্বেই আমরা দেখিয়েছি— যে, জীবপ্রকৃতি কিছু অংশে জড়প্রকৃতির ঊর্ধ্বে। জীবপ্রকৃতির বিশেষত্বই হল জড়প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ রন্ধ্রে কিছুটা আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য— কিছুটা হাসিকান্না, হাত-পা ছোঁড়া ইত্যাদি। কিন্তু এ তো অতি সংকীর্ণ স্বাতন্ত্র্য, এর চারিধার ঘিরে রয়েছে জড়প্রকৃতির পাষাণ প্রাকার। যদি বা বুঝতাম, ঐ সঙ্কীর্ণ স্বাতন্ত্র্যটুকু, সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, প্রাণপণ চেষ্টা করছে পাষাণপ্রাকার চূর্ণ করে মহাশূন্যে বেরিয়ে আসতে, তা হলেও বলতে পারতাম, সংকীর্ণ হলেও ওটা একেবারে খাঁটি স্বাতন্ত্র্য, ওকে বন্দী করে রাখা হয়েছে জড়প্রকৃতির কারাগুহায়। কিন্তু ঐ সংকীর্ণ স্বাতন্ত্র্যে মুক্তির প্রয়াস তো পরিদৃষ্ট হয় না। তাই ওকে খাঁটি স্বাতন্ত্র্য বলতে পারি না। ওর নাম হচ্ছে জৈব স্বাতন্ত্র্য। ও হচ্ছে জড়জগতে অধ্যাত্মসত্তার প্রক্ষেপ মাত্র। এই স্বাতন্ত্র্যানুকল্প স্বাতন্ত্র্যপ্রক্ষেপের সহিত প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যের একাকার সাধন করে আধুনিক মানবিকতাবাদী মানবসংস্কৃতির মূলেই কুঠারাঘাত করেছেন। লাভ কিছু হয় নি, বরং প্রশ্রয় পেয়েছে অমিত পরিমাণ উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা।

খাঁটি অধ্যাত্মসত্তা অতি শান্ত, অতি সাত্ত্বিক। অধ্যাত্মসত্তার আলোকেই মানুষ বহির্বিশ্বের সত্যমূর্তি উপলব্ধি করে, আর এই শান্ত সাত্ত্বিক উপলব্ধি এনে দেয় অভূতপূর্ব অনির্বচনীয় আনন্দঘন এক মনোভাব, যা হল সৃষ্টির মূল প্রেরণা। এই অনির্বচনীয় আনন্দের পটভূমিতেই কল্পনার তুলী চালিয়ে মানুষ কত কি এঁকে চলে। এই চিত্রাঙ্কনই হল তার বিশ্বজগৎ। নিজ সৃষ্ট এই শিল্পকৃতির প্রতি থাকে তার অসীম আধ্যাত্মিক মমতা, যার অপর নাম মৈত্রী। এই মৈত্রীর ফলেই তার দৈনন্দিন জীবন, তার পারিপার্শ্বিক হয়ে ওঠে অপূর্ব মাধুর্যময়। জড়প্রকৃতির কার্যকারণ-নিয়মের বিরুদ্ধে এর কোনো বিদ্রোহ নেই, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বিধানের প্রতি নেই কোনো বিদ্বেষ। অত্যাচারের বিরুদ্ধে এর অভিযান চিরন্তন, কিন্তু নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি এ অশেষ শ্রদ্ধাশীল। সহজ সরল সাধারণ মানুষের কল্যাণে এর বাণী মাত্র একটা— অত্যাচারের প্রশ্রয় না দিয়েও কার্যকারণ-নিয়ম, জড় ও জীব -প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলা ও সামাজিক প্রথা রাষ্ট্রীয় বিধান সুষ্ঠুভাবে মেনে চলা যায়; শুধু 'মেনে চলা যায়' নয়, মেনে চলতেই হবে, কারণ, একজাতীয় তথাকথিত-স্বাধীনতার প্রলোভনে ন্যায়সংগত বিধিনিয়মের অবমাননা করলে উচ্ছৃঙ্খলতারই প্রশ্রয় দেওয়া হয়, এবং উচ্ছৃঙ্খল মনের পক্ষে অন্তর্মুখীনতার অনুশীলন সম্ভব হতে পারে না। খাঁটি মানবিকতাবাদ একজাতীয় ক্লাসিসিজ়ম্, হয়তো ক্লাসিসিজ়মের একমাত্র খাঁটি রূপ।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে প্রত্যাবর্তন

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রবিবার ১৩ই অক্টোবর, ১৯২৭।—

আজকে ব্যাংকক থেকে আমাদের বিদায়ের দিন। সকাল ৭টার ট্রেনে আমরা ব্যাংকক ত্যাগ ক'রলুম। কবিকে গাড়ীতে তুলে দেবার জন্য স্টেশনে বেশ লোক-সমাগম হ'য়েছিল। ভারতীয় বন্ধুরা প্রায় সকলেই এসেছিলেন, এঁদের মধ্যে 'বারিসীমাধ্যক্ষ' শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলী, তাঁর পুত্র শ্রীমান্ সাদের আলী, তাঁর আত্মীয় শ্রীযুক্ত সৈয়দ মোবারক আলী, শ্রীযুক্ত নন্দলাল, শ্রীযুক্ত নানা ইত্যাদি। জর্মান রাজদূত আর অন্য কয়েকজন বিদেশী ছাড়া, অনেকগুলি শ্যামী সরকারী কর্মচারী ও গণ্যমান্য লোক এবং কিছু চীনা ভদ্রলোকও এসেছিলেন।

সকালে Nakhon-Pathom নাখন-পাথম স্টেশন ছাড়বার পরে কবি আমার কামরায় এলেন— আমাদের একই গাড়ীতে পাশাপাশি compartment বা কামরা দিয়েছিল। শ্যামদেশের কাছ থেকে বিদায়, এই বিষয়কে অবলম্বন ক'রে কবি যে একটি কবিতা লিখেছিলেন, সেটি আমাদের শোনালেন— কবিতাটি ছোটো। এটি রাজকুমার দামরঙ-এর কাছে পাঠাবেন। আজকে এর মধ্যেই গাড়ীতে ব'সে-ব'সে তিনি এর তর্জমা ক'রলেন। কবিতা শোনবার পরে, কবি আমাদের হিন্দু সমাজ আর তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা ক'রলেন। অনেক বিষয়ে, মুসলমানদের সঙ্গে তুলনা ক'রলে হিন্দু তার সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার গলদের জন্য হ'টে আস্‌ছে সেটাই দেখা যাচ্ছে। যেমন, যে-সব ভারতীয় মুসলমান শ্যামদেশে গিয়ে উপনিবিষ্ট হ'য়েছেন, তাঁরা নিজেদের মুসলমানত্ব বজায় রাখ্‌ছেন, আর ঐ স্থানে বিবাহ ক'রে নিজেদের সমাজের বিশেষ পরিবর্ধন ক'রছেন। কিন্তু আমরা যা দেখে এলুম, তাতে জানা গেল যে হিন্দুদের কথা একেবারে উল্টো। যাঁরা বিদেশে গিয়ে বাস করেন, তারা নিজেদের অস্তিত্ব দুই দিনেই হারিয়ে' ফেলেন। এটা ভালো কি মন্দ তা বিচার করা কঠিন। তবে এইভাবে অস্তিত্ব-লোপে, একটা ক্ষোভ বা দুঃখ হয় তো অনেকেরই মনে না এসে পারে না। হিন্দুর ধার্মিক অনুষ্ঠান যে ক্রমে-ক্রমে প্রাণহীন হ'য়ে প'ড়ছে, সেটা আমরা সর্বত্রই দেখ্‌ছি। বিশ্বাসের অভাবে আর যুগধর্মের ফলে এটা হ'চ্ছে— এই প্রাণহীনতা কেউ আট্‌কাতে পারবে না।

শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ আলী আমাদের সঙ্গে প্রচুর আহার্য্য দিয়ে দিয়েছিলেন, ট্রেনে তার সদ্ব্যবহার ক'রলুম— পরঠা, মুরগীর কারী, মিষ্টি, আর তা ছাড়া প্রচুর ফল। বহুদিন প'রে ট্রেনে ধুতি প'রে সারাদিন শুয়ে' ব'সে আমাদের ভ্রমণ চ'ল্‌ল। আরিয়াম্ আমাদের সঙ্গে পেনাঙ পর্য্যন্ত যাবেন, আমার কামরায় তিনি এলেন। আমাদের ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। ট্রেনের ডাইনিং কারে ধুতি প'রেই আমরা ডিনার খেয়ে এলুম। Chumphon চুম্‌ফন বলে একটা ষ্টেশনে গাড়ী খানিকক্ষণ দাঁড়ায়। তখন শ্যামী রেল-পুলিসের এক ভোজপুরী পাহারাওয়ালা এসে কবিকে প্রণাম ক'রে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রতে লাগ্‌ল, কবিও তার সঙ্গে বেশ সৌহার্দ্যের সঙ্গে কথাবার্তা ক'রলেন।

সোমবার ১৭ই অক্টোবর।—

কাল সারা দিন আর সারা রাত আমরা ট্রেনে কাটিয়েছি। আজকে সকালে আমাদের গাড়ীতে রেলের অফিসার ফ্রা রথচারণ-প্রত্যক্ষ, যাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যাংকক যাবার পথে দেখা হ'য়েছিল, তিনি

আবার এসে দেখা ক’রলেন। বেশ সদালাপী লোকটি। শ্যামদেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে দুটি কথা ব’ললেন— ও দেশে বিশেষ ক’রে ব্যবসা-ক্ষেত্রে চীনাদের প্রভাব আর প্রতাপ, আর তা ছাড়া ভারতবর্ষ থেকে মুসলমান যাঁরা এসে শ্যামদেশে বসবাস ক’রছেন, তাঁদের সঙ্গে মালয় মুসলমানদের ধর্মগত সংযোগ নিয়ে বৌদ্ধ শ্যামদেশের মধ্যে একটা নোতুন সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

আমরা পরে পেনাঙ্-এর ওপরে Prai প্রাই স্টেশনে এসে পৌঁছুলুম। স্টেশনে পেনাঙ-এর বন্ধু ছোটো নাম্বিয়ার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী চেট্টী, একাম্বরন্, এঁরা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছিলেন। রেলওয়ের লঞ্চে ক’রে আমরা সমুদ্রের ফালিটুকুন পেরিয়ে পেনাঙ-এ পৌঁছুলুম। Eastern & Oriental Hotel-এ আমাদের থাকবার ব্যবস্থা ছিল ব’লে আমরা সোজা সেখানে গিয়ে উঠলুম। আমাদের জন্য দোতলায় সমুদ্রমুখো কামরা দিলে— কবির কামরার নম্বর ছিল ১৩২, আমার ১৩১।

আজকে আমাদের কোথাও যাবার কথা ছিল না, হোটেলে ব’সেই বিশ্রাম করা গেল। শ্যামদেশ থেকে যে-সমস্ত ছবি আর বই সঙ্গে এনেছিলুম, ব’সে-ব’সে আমি সেগুলি সব দেখ্‌তে লাগলুম। রাজা বজ্রায়ুধ শ্যামী ভাষার একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন, তাঁর একখানি শ্যামদেশীয় ঐতিহাসিক নাটক খুব সুন্দর রঙীন ছবিওয়ালা এক সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে, প্রাচীন শ্যামের বেশ চিত্তাকর্ষক ছবি এগুলি ; আর প্রাচীন শ্যামী ঢঙের ছবির দ্বারা অলংকৃত একটি পুরাতন শ্যামী কথা-কাব্য ; শ্যামদেশ সম্বন্ধে ছবিওয়ালা নানা ইংরিজি বই, ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া ক’রতে লাগলুম।

মঙ্গলবার ১৮ই অক্টোবর, ১৯২৭ সাল।—

সকালে আমরা কবিকে হোটেলে রেখে শহরের বাজারে ঘুরতে বেরুলুম। ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা বদলানো গেল, শ্যামী ৯৯ টিকলে আমাদের ১১০৬/০ পেলুম। Nippon Yusen Kaisha জাপানী জাহাজ কোম্পানির আপিসে গিয়ে আমাদের ফেরবার টিকিট প্রভৃতি পাকাপাকি ক’রে নিলুম। এক জাপানী ফোটোগ্রাফারের দোকান থেকে সুরেন-বাবু কিছু ফোটো-প্লেট কিনলেন। ইতিমধ্যে আমাদের পেনাঙ্-এর অন্য বন্ধুরা এসে জুটলেন। কবির চীনা দোভাষী Feng Chih Cheng, ফ্যঙ চি-চেঙ এলেন। Sungei Siput সুঙেই-সিপুং থেকে তামিল ভদ্রলোক বীরস্বামী পিল্লাই এলেন। চীনা বন্ধু Tan A-Yiu তান্ আ-য়িউ এলেন, তাঁর সেই পাগলাটে’ ভাব, মাথায় মস্ত ঝুঁটি। মেনন্ পরিবার আর নাম্বিয়ার পরিবারের ছেলেমেয়েরা আর পুরুষেরা এলেন। চীনা ছোকরা দিল-দরিয়া মেজাজের Hak Lim হাক্-লিম্, যার কথা আগে ব’লেছি, আর Mendis মেন্দিস্ বলে সিংহলী ভদ্রলোক— এঁরা বিকেলের দিকে এসে কবিকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। এর আগে ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে কবির এবং আমাদের ছবি তুলতে হ’ল। বিকেলে সুরেন-বাবু, আমি আর চীনা বন্ধু তান্ আ-য়িউ, শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ারের মোটরে করে পেনাঙের বিখ্যাত “সাপের মন্দির” দেখ্‌তে গেলুম। মন্দিরটি একটা পাহাড়ের উপরে, খানিকটা চড়াই পথ হেঁটে যেতে হয়— এটি বৌদ্ধ মন্দির। এখানে ছোটো-ছোটো সবুজ রঙের অনেক সাপ মন্দিরের প্রধান বেদির উপরে এবং তার আশেপাশে জড়াজড়ি ক’রে, পুঁটুলি পাকিয়ে’ প’ড়ে আছে। এই সাপ মানুষের ক্ষতি করে না। মন্দিরের ভিক্ষুরা এদের নিয়মিত খেতে দেয়। এখানে ছোটো হাতঘণ্টা বাজিয়ে’ এক চীনা বৌদ্ধ পুরোহিত চীনা ভাষায় মন্ত্র-পাঠ ক’রছেন দেখলুম। তান্ আ-য়িউ একজন free-thinker বা স্বাধীন-চিন্তক ব’লে নিজের পরিচিতি দিয়েছিলেন, কিন্তু এখানে এসে এই বৌদ্ধ

পুরোহিতের কাছে নিজের টিনের খনির সংক্রান্ত কথা জিজ্ঞাসা ক'রে, গোণাতে ব'সলেন, খনির কাজ-কর্ম কেমন চ'লবে। পুরোহিত তাঁর ভবিষ্যদ্-বাণীর সরঞ্জাম নিয়ে ব'সলেন। এই সরঞ্জাম হ'চ্ছে কতকগুলি বাঁশের চেঁচাড়িতে চীনা ভাষায় কিছু লেখা। সেই চেঁচাড়িগুলিকে নাড়াচাড়া ক'রে, তান্ আ-য়িউ-এর কি কর্তব্য-সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন মনে-মনে ক'রে, সেই বাশের চেঁচাড়ি একটা ধ'রতে ব'ললেন। সেই চেঁচাড়িতে লেখা অক্ষর বা সংখ্যা দেখে, ছাপা বই থেকে তার উত্তর বলা হ'ল—"ধর্ম-পথে থেকে কাজ ক'রে গেলে ফল ভালো হবে"। এই উত্তরেতে অবশ্য প্রশ্ন-কর্তার মনোগত প্রশ্নের কোন সমাধান-ই হ'ল না। মন্দিরেব বুদ্ধ মূর্তির সামনে যে প্রদীপ আছে তা জ্বালিয়ে' রাখবার জন্য আমাদের কাছ থেকে দুই আউন্স তেলের দাম দশ সেণ্ট চেয়ে নিলে।

তারপরে আমরা পেনাঙ্ শহরের শিখ গুরুদ্বার দেখে, সন্ধ্যের দিকে হোটেলে ফিরলুম। এই গুরুদ্বার আমি বহুপূর্বে, ১৯১২ সালে যখন প্রথম পেনাঙ-এ আসি, তখন দেখেছিলুম। এখন এর চেহারা সম্পূর্ণ বদলে' গিয়েছে, আর তখনকার দিনের গৃহবিরল বা খালি রাস্তায় বিস্তর বাড়ীও হ'য়েছে।

চীনা বন্ধু ফ্যঙ্ হোটেলেই র'য়ে গেলেন। আরিয়াম তাকে দিয়ে স্থানীয় চীনা পত্রিকা Kuang Hua "কুয়াঙ্-হুয়া" কাগজে প্রবন্ধ লেখাবেন। সুরেন-বাবু আর আমি মালাই থিয়েটার দেখ্‌তে গেলুম, Kuala Kangsar কুয়ালা-কাঙসার সড়কে Union Opera House নামে থিয়েটারে। দুটি নাটক প্রথমে হ'ল, এক-এক সীনের বা দৃশ্যের একাঙ্কী নাটক। তারপরে শুরু হ'ল মালয়ী নাচ গান। যে মেয়েগুলি এই নাচ গানে অংশ নিয়েছিল তাদের অধিকাংশই কুশ্রী, আর কুরুচিপূর্ণ পোষাকে নিজেদের আরও কুশ্রী ক'রে ফেলেছিল। এরা অধিকাংশই ইউরোপের ছোটো-ছোটো মেয়েদের মত হাঁটু পর্য্যন্ত ফ্রক প'রেছে। একটিমাত্র মেয়ে একটু সুশ্রী, লম্বা ছিপ্-ছিপে গড়নের, সে-ই সৌষ্ঠবপূর্ণ মালাই মেয়েদের পোষাক—সাদা ব্লাউস, রঙীন রেশমের সারঙ্, প'রেছে। দর্শকদের মধ্যে মালাই, ভারতীয় আর "বাবা-চীনা" অর্থাৎ মালয়-দেশীয় উপনিবিষ্ট মালয়-ভাষী চীনারাই বেশি ছিল। দর্শকদের মধ্যে একটি মালাই দম্পতীকে দেখে বড়ো ভালো লাগ্‌ল। স্ত্রীটির খুব বড়ো-বড়ো চোখ, সুন্দর মুখে কিছু সাদা রঙ্ মাখা, মাথা ঢেকে গায়ে পাতলা কালো ওড়না, আর পান খাওয়া ঠোঁট। নিজেদের মাতৃভাষায় ব'লে এই মালাই নাটক দেখ্‌তে এসেছে। দু'জন ইংরেজও ছিল। এদের এখানে রেওয়াজ আছে যে, কারো নাচ-গান ভালো লাগ্‌লে, আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথায় "প্যালা" দেবার মতন শ্রোতারা স্টেজের উপরে গায়িকা বা নর্তকীর উদ্দেশে টাকা বা নোট ছুঁড়ে দেয়। ইংরেজ দর্শক দুজন দু-দুবার একটি সুন্দরী নর্তকীর জন্য মালাই-দেশের ডলার-নোট পাকিয়ে স্টেজে ছুড়ে দিলেন, নর্তকী terima kasi "ত্রিমা কাসি" অর্থাৎ 'ধন্যবাদ' ব'লে নাচের মধ্যেই সেই নোট তুলে নিলে। একজন clown বা ভাঁড়ের অভিনয় খুব হ'ল—তার নামটি ছিল Chеross চেরোস। থিয়েটারের উপরের তলায় মালাই আর বাবা-চীনাদের মেয়েদের দল ব'সে দেখ্‌ছে। নানা ইউরোপীয় যন্ত্র বাজিয়ে' যারা বাজনার সঙ্গত ক'রছে, তারা রকমারি জাতের মানুষ—এদের মধ্যে দো-আঁশলা ফিরিঙ্গি আছে, তামিল আর মালাই জাতির মিশ্র লোকও আছে; আরও দেখলুম কর্ণেট বাজাচ্ছে একজন মাথায় কালো পাগড়ী আর লম্বা চুল-দাড়িওয়ালা শিখ; আর এ-ছাড়া চীনাও আছে। নানা জাতির এ এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এরা বাজাচ্ছে ইউরোপীয়, মালয়ী আর ভারতীয় গৎ। দুটি দারোয়ান এই থিয়েটারের দরজায় মোতায়েন, লম্বা-চওড়া জবরদস্ত চেহারার দুই পাঞ্জাবী, একজন মুসলমান আর একজন শিখ,—দ্রষ্টারা মাতলামী ক'রলে বা অন্যভাবে বেয়াদবি ক'রলে, এরা এসে তাদের ঘাড় ধ'রে বা'র ক'রে দেয়। এই থিয়েটারের টিকিটের দাম

হ'চ্ছে যথাক্রমে ৩ ডলার, ২ ডলার, ১ ডলার, ৫০ সেণ্ট আর ৩০ সেণ্ট— ৩০ সেণ্টের টিকিটে পিছনে দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' দেখ্‌তে হয়, এদের জন্য বস্‌বার জায়গা নেই। রাত সওয়া এগারোটায় আমরা থিয়েটার থেকে হোটেলে ফিরলুম।

বুধবার ১৯শে অক্টোবর ১৯২৭ সাল।—

আজ সকলে কবির সঙ্গে খানিকক্ষণ সময় নানা বিষয়ের আলাপে কাটানো গেল। তিনি তাঁর রচিত দুই কবিতা "বোরো-বুদুর" আর "শ্যামের প্রতি", এই দু'টির ইংরেজী ছাপানো অনুবাদের কতকগুলি প্রতির উপরে নিজের নাম সই ক'রে দিলেন; সই-করা এই ইংরেজী অনুবাদ দু'টি, যবদ্বীপের আর শ্যাম-দেশের কবির অনুরাগী আর অন্য সজ্জনের কাছে পাঠানো হ'ল। বেলা ১২টায় আমাদের মালপত্র জাহাজে পাঠিয়ে' দেওয়া হ'ল। শ্রীযুক্ত আরিয়ম্ সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে এলেন। আমরা বিকেল তিনটের দিকে যাত্রা ক'রলুম। পেনাঙ্ বন্দরে লঞ্চ Rosemary সরকারের তরফ থেকে ঠিক করা ছিল। আমরা তাতে ক'রে, জাপানী Nippon Yusen Kaisha কোম্পানির জাহাজ Awa-Maru "আওয়া-মারু"তে গিয়ে উঠলুম। শ্রীযুক্ত আরিয়ম্ আর ফ্যঙ্ আর শ্রীযুক্ত তান্ আ-ম্বিউ, এঁরা আমাদের জাহাজে তুলে দিয়ে গেলেন। জাহাজের কাপ্তেন Commander K. Harada হারাদা আর অন্য অফিসাররা সকলে এসে কবিকে সম্মানপূর্ণ সংবর্ধনার সঙ্গে গ্রহণ ক'রলেন, তাঁকে স্বাগত ক'রলেন।

এই জাহাজে মোটেই ভীড় নেই। প্রথম শ্রেণীতে মাত্র ৭।৮ জন যাত্রী। সামনের দু'টি ডেক্ একেবারে খালি, মানুষের ভীড় নেই। জাহাজে যাচ্ছে কতগুলো শুঁটকী মাছের পিপে, আর সুপুরির হ'লদে থলে। সেগুলো ফার্স্ট-ক্লাস থেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে' রাখ্‌লে। জাহাজ ছাড়তে ৫টা বাজিয়ে' দিলে।

সমুদ্র একেবারে কাঁচের মত স্বচ্ছ, স্থির। আমরা সানন্দে যাত্রা ক'রলুম। এর অনেক আগে আরিয়ম্, ফ্যঙ্ আর তান্ আ-ম্বিউ জাহাজ থেকে নেমে গিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা জাহাজের ঘাটে দাঁড়িয়ে' ছিলেন।

বৃহস্পতিবার ২০শে অক্টোবর, ১৯২৭ সাল।—

আকাশ পরিষ্কার, সমুদ্র প্রশান্ত। কবির মনটা বেশ প্রসন্ন ব'লে মনে হ'ল। সকালে প্রাতরাশের পরে বিশ্বভারতীর আদর্শ আর কর্তব্য নিয়ে কবির সঙ্গে নানা কথা হ'ল। সঙ্গে-সঙ্গে, বন্ধুবর ডাক্তার কালিদাস নাগ প্রমুখ আমরা কয়জনে মিলে ক'লকাতায় Greater India Society বা "বৃহত্তর-ভারত পরিষদ্" ব'লে যে একটি সংস্থা ১৯২২ সালে গ'ড়ে তুলেছিলুম, যার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে ভারতবর্ষের বাইরের নানা দেশের সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের যে সাংস্কৃতিক সংযোগ গ'ড়ে উঠেছিল তার সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করা, সেই "বৃহত্তর-ভারত পরিষদ্" সম্বন্ধেও কিছু কথা হ'ল। কবি এ-বিষয়ে আমাদের খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন, আর তিনি নিজে আমাদের এই পরিষদের "পুরোধা"-পদ স্বীকার ক'রেছিলেন। কবি ব'ললেন যে আমাদের এই "বৃহত্তর-ভারত পরিষদ্" যে কাজ হাতে নিয়েছে, সেটা বেশীর ভাগই শিক্ষা আর তথ্যকে অবলম্বন ক'রে— এই পরিষদের কাজ হবে বেশীর ভাগ-ই ভারতের সংস্কৃতির আর চিন্তার প্রচারের ইতিহাস, আর ভারতের উপরে ভারতের বাইরের অন্য জাতির সংস্কৃতির প্রভাবের কথা, দুই-ই আলোচনা করা এবং সে-সম্বন্ধে বই-টই লিখে জনসাধারণের কাছে যথার্থ জ্ঞান বিতরণ করা হবে। বৃহত্তর-ভারত পরিষদের কাজ হবে educative

অর্থাৎ প্রচার আর শিক্ষাত্মক, আর বিশ্বভারতীর কাজ হবে মুখ্যতঃ creative অর্থাৎ সর্জনাধর্মী— কবির পরিচালনায় বিশ্বভারতী গঠন-মূলক কাজে হাত দেবে। এই গঠন-মূলক কাজের মুখ্য কথা হ'চ্ছে, সমগ্র মানব-জাতির সংস্কৃতিকে বুঝে তাকে সকলের জীবনে কার্য্যকরী করার চেষ্টা করা।

জাহাজে অন্য যাত্রী বেশি না থাকায়, আমাদের জাহাজের জাপানী অফিসারদের সঙ্গে একটু মেলামেশা কর্‌বার সুযোগ আমাদের হ'ল। জাপানী কাপ্তেন অতি ভদ্র, অতি সজ্জন, আর কবির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। তিনি কবিকে অনুরোধ ক'রলেন, আপনি আর একবার জাপানে চলুন, আর সেখানে ছেলেদের আর মেয়েদের কিছু উপদেশ দিন, যেন তারা জাপানের প্রাচীন যে নৈতিক আদর্শ ছিল, যে আদর্শ মানুষকে স্বার্থপর হ'তে দিত না, সেই আদর্শে যেন তারা ফিরে আস্‌তে পারে। শ্যাম আর মালয় দেশের মধ্যে Kra Isthmus বা 'ক্রা'-সংযোগভূমি কেটে যে একটা খাল করবার কথা এক সময়ে চ'লেছিল, সেটি ইংরেজ আর ফরাসীদের স্বার্থের খাতিরে চাপা প'ড়ে যায়। এই খাল হ'লে, ভারতবর্ষ থেকে শ্যাম বা জাপানে জাহাজে ক'রে যেতে গেলে, আর সিঙ্গাপুর ঘুরে যেতে হয় না। তাতে জলপথে যাত্রায় ৩।৪ দিনের সময় সাশ্রয় হয়। সুয়েজ খাল বা প্যানামা খাল বা গ্রীসের কোরিন্থ-এর খালের মতন, এই প্রস্তাবিত ক্রা-খালটিও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে লোক-চলাচলের পক্ষে বড় সহায়ক হয়। কিন্তু জাহাজের কাপ্তেন ব'ললেন, এখন সেই খাল তৈরি করার প্রসঙ্গ দূর ভবিষ্যতে গিয়ে প'ড়েছে।

জাহাজে একটি অল্প-বয়সী মহিলা যাচ্ছেন, নামটি Mrs. Kemp, মনে হ'ল মিশ্র-জাতীয়া, ইউরোপীয় ও মালয় বা চীনার মিশ্রণ। তাঁর সঙ্গে একটি বছর খানেক বয়সের শিশু-পুত্র আছে, সকলের সঙ্গেই সে এসে মেশে, কবিকে দেখেও "টা-টা" ক'রে হাত নেড়ে হাসে। সঙ্গে একজন চীনা "আমা" বা আয়া।

আজ সন্ধ্যার সময় চমৎকার সূর্য্যাস্ত দেখা গেল। আমরা সকলেই ডেকে ব'সে— কবি, সুরেন-বাবু, আমি— একেবারে সোজা চোখের সামনে পশ্চিম দিক্। মেঘের আড়ালে অপূর্ব রঙের খেলা— ফিকে নীল, ঘন নীল আর লাল রঙে রাঙানো মেঘ, সূর্য্যের মুখ ঢেকে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, তাতে লাল গোলাপী ধূসর রঙের আমেজ। কবি ব'ললেন, এই যে প্রকৃতিতে রঙের সমাবেশ দেখছি, এ বড় অদ্ভুত জিনিস, সবচেয়ে পুরানো অথচ চির-নূতন— এই দেখে-দেখে আমার সময় কাটে, আর মনে হয় এই "মায়া" নিয়েই থাকি— এ যেন এক রকম ছোটো জাহাজে চ'ড়ে বেশ চ'লেছি, বড়ো জাহাজের খবরে আমার কাজ নেই।

রাত্রে কাপ্তেন আর অফিসারদের সঙ্গে এক সঙ্গে খেতে-খেতে কাপ্তেন কবিকে জাপানে যাবার কথা আবার ব'ললেন। আমাদের অনেক পদ আহার্য্য ছিল, কিন্তু জাহাজের ডাক্তারটি অত সব খেলেন না। লোকটি সরল-প্রকৃতিক, বেঁটে-খাটো, পূরো মোঙ্গল চেহারার, মুখে হাসি লেগেই আছে।— অন্যদিনও তাঁকে খেতে দেখতুম, জাপানে তেলা চা'ল এক-রকম হয়, তার ফেন-না-গালানো ভাতে, গোটা তিনেক আধ-সিদ্ধ ডিম ফেলে, চামূচে দিয়ে ভাতের সঙ্গে এই ডিম মেখে নিয়ে, শুকনো মূলোর আচারের টাকনা দিয়ে তাঁর ভোজন-পর্ব বেশির ভাগ তিনি সমাধা ক'রতেন।

রাত্রির আহারের পরে জাপানী বন্ধুরা অনেকগুলি গ্রামোফোনের রেকর্ড শোনালেন। বেশির ভাগই পুরানো জাপানী গান, পুরানো জাপানী ধরণের সুর ক'রে কবিতা পাঠ, আর জাপানী বাজনার রেকর্ড। অনেকগুলি সুর বলিদ্বীপের সুরের মতন লাগ্‌ল। শ্রীযুক্ত Nabuo Shigematsu নাবুও শিগেমাৎসু, ইনি

জাপানের নতুন কন্সাল বা বাণিজ্যদূত হ'য়ে ক'লকাতায় যাচ্ছেন, ইনি আগ্রহ ক'রে আর ইংরিজিতে ব্যাখ্যা ক'রে-ক'রে এই জাপানী গান-বাজনার অনেক কিছু শোনালেন। রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত এই পুরাতন জাপানী সঙ্গীত শোনা গেল।

শুক্রবার, ২১শে অক্টোবর, ১৯২৭ সাল —

আজ সকালে প্রাতরাশের পরে জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার সৌজন্য করে ডেক্-গল্ফ খেলা খেল্‌তে আমাদের ডাকলেন। একটি জাপানী বৈজ্ঞানিক যাচ্ছিলেন, অধ্যাপক Shuta Kinoshita শূতা কিনোশিতা, ডি. এস্. সি, ইনি জাপানের রাজকীয় কৃষিবিদ্যা বিষয়ের গবেষণা-মন্দিরের একজন Entomolgist অর্থাৎ কীটপতঙ্গবিৎ, ক'লকাতার হবু জাপানী কন্সাল শ্রীযুত শিঙেমাৎসু, আর সহযাত্রিণী শ্রীমতী কেম্প— আমরা ক'জনে মিলে এই ভাবে ঘণ্টা দু'য়েক কাটালুম। শ্রীমতী কেম্পের হাবলা-গোবলা খোকাটিকে দেখে, খুশি হ'য়ে কবি তার সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখলেন। "বালি" সম্বন্ধে কবি যে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেটি, আর অন্য কতগুলি কবিতা, আমার খাতায় নকল ক'রে রেখেছিলুম। আজ কবি নিজের হাতে তাতে তাঁর সংশোধন আর সংযোজন লিখে দিলেন।

আজ সন্ধ্যায় কালকের মত সূর্য্যাস্ত দর্শন হ'ল। এই সূর্যাস্তের লাল, নীল, বাসন্তী, সোনালী রঙের পসার দেখে কবি ব'ললেন— এ যেন দিনের পর দিন সোনার পাতার পর পাতা খুলে খুলে যাচ্ছে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার কবির কাছে অসীম আনন্দের আর উপলব্ধির বস্তু।

বিকেলের দিকে আমি ডেকের যাত্রীদের মধ্যে একটু ঘুরে বেড়ালুম। জন বারো বাঙালী মুসলমান, সবাই সিঙ্গাপুর থেকে এই জাহাজে ফিরছে। এদের মধ্যে আছে জন পাঁচেক শ্রমিক-শ্রেণীর কলকতিয়া মুসলমান, এরা ক'লকাতা থেকে মালয়-দেশে ছাগল আর ভেড়া নিয়ে যায়, ফেরৎ টিকিটে আবার ক'লকাতায় ফিরে আসে। হাওড়ার Belilios বেলিলিয়স কোম্পানি— য়িহুদী প্রতিষ্ঠান— ক'লকাতা থেকে মালয়-দেশে আগে এই-রকম ছাগল ভেড়া চালান ক'রত, ও-দেশে মাংসের জন্য এই সব চালানি জানোয়ার কাটা হ'ত; ক'লকাতার হিন্দী-ভোজপুরী-বাঙলা মেশানো খিচুড়ী ভাষা বলিয়ে' মুসলমানেরা এই-সব জানোয়ারের তদারকে জাহাজে ক'রে যাওয়া-আসা ক'রত। বাকি মুসলমান যাত্রীরা হ'চ্ছে দর্জি আর রুটিওয়ালা। এই দর্জিদের বাড়ী ক'লকাতার কাছে মেটিয়া-বুরুজে। এরা নিজেদের বাঙালীত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। এদের একজন বিশেষ জোর দিয়ে আমাকে ব'ললেন— আমরা বাঙালী মুসলমান, খোট্টা নই। পশ্চিমা রুটিওয়ালা আর ভেড়া-বকরীর রাখালদের চেয়ে এঁরা নিজেদের একটু শিক্ষিত, ভদ্র আর উঁচুস্তরের মানুষ ব'লে মনে করেন, বাঙলা আর ক্বচিৎ ইংরিজি পড়াশুনো সকলেই জানেন, তাই ওদের দলে ভিড়বার আগ্রহ এঁদের নেই। একটি শিখ বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হ'ল, সে প্রায় ২০ বছর পরে দেশে ফিরছে। আমেরিকায় ক্যালিফোর্নিয়াতে এতদিন ছিল। চেহারাটা রোদ্দুরে আর বৃষ্টিতে বেশ পাকানো, মাথায় বিরাট পাগড়ি, লম্বা চুল, এই বিশ বছর আমেরিকায় থাকা সত্ত্বেও তার দেহাতী বা গেঁয়ো শিখ-ভাব কিছুই ছাড়ে নি। আমেরিকায় "খেতীবাড়ী" অর্থাৎ চাষ-বাসের কাজ ক'রত। প্রথমে ছিল দিন-মজুর, তারপর নিজে একটু জমি ক'রে শাক-সবজীর উৎপাদন ক'রে বিক্রি ক'রত, তাতে তার রোজগার ভালোই হ'ত। লোকটি ইংরিজি তো ভালো জানেই না, এতদিন আমেরিকায় থাকা সত্ত্বেও— উপরন্তু হিন্দুস্থানী বা উর্দ ও ভালো ব'লতে পারে না, তার একমাত্র ভাষা হ'চ্ছে

পাঞ্জাবী। অথচ সাহস ক'রে, অবলীলা-ক্রমে কালাপানি পার হ'য়ে সুদূর আমেরিকায় ভাগ্য-পরীক্ষা করতে যেতে পশ্চাৎপদ হয় নি। সে কবির কথা জাপানী খালাসীদের কাছে শুনেছে যে, ভারতবর্ষের একজন নামী জ্ঞানী আর ধার্মিক লোক এই জাহাজে যাচ্ছেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় শিখদের যে ধর্মশালা আছে, সেখানে অনেক শিখের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত। বয়স মন্দ হয় নি, তবে এখনও বিয়ে-থা ক'রতে পারে নি। তার প্রধান কারণ হ'চ্ছে, বিয়ে ক'রলেও স্ত্রীকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে দেবে না। আবার এক বছরের মধ্যে আমেরিকায় গিয়ে না পৌঁছালে, আর ফিরতেও পার্‌বে না। এই-সব অসুবিধা, অথচ তাকে একমুঠো উপায় ক'রে খেতেও হবে। আমাকে লোকটি ব'ললে, "জিথে রোটী-পানী ঠীক হোইয়া সী, উথে রহণা হোগা— দিল্ লগ্‌গে তো মুল্‌কমেঁ শাদী করাঙ্গা।"।

শনিবার, ২২শে অক্টোবর ১৯২৭ সাল।—

আজ বেলা সাড়ে-বারোটায় রেঙ্গুনে পৌঁছোলুম। রেঙ্গুন নদীর মোহনা দিয়ে রেঙ্গুন শহরে ঢুকতে প্রথমে নজরে পড়ে Shwe Dagon শোয়ে-দাগন বৌদ্ধ মন্দিরের ঘণ্টাকৃতি সোনালী রঙে রঙানো বিরাট্ চৈত্য, গম্বুজের মত। উপরে স্বচ্ছ নীল আকাশ, আর চারিদিকে গাছ-পালার ঘন সবুজ। রেঙ্গুনে আমাদের স্বাগত ক'রতে কতগুলি ভারতীয় আর অন্য ব্যক্তি এলেন। আমরা পাসপোর্ট দেখিয়ে আর চুঙ্গীর আপিস কাটিয়ে, খুব শীগ্‌গির-ই বাইরে আসতে পারলুম। মালপত্র সব জাহাজেই রইল। আমার এক ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— এঁর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুবোধ চট্টোপাধ্যায়, ইনি তেলের খনিতে Chemist বা রাসায়নিকের কাজ ক'রতেন, এখন রেঙ্গুনের Associated Press-এর সংবাদদাতা হ'য়ে আছেন, ইনি এলেন; আর একটি বাঙালী ছেলেও এসেছিলেন, আর রেঙ্গুন Daily Mail কাগজের এক সাংবাদিক। সরকারী Customs বা চুঙ্গী-বিভাগের এক অফিসারের সৌজন্যে এঁরা সরকারী লঞ্চে ক'রে আমাদের শহরে পৌঁছে দিলেন। রাত্রিটা হয়তো রেঙ্গুন শহরে থাকতে হবে, এই ভেবে আমরা সঙ্গে কিছু জিনিস-পত্র নিয়ে বেরুলুম। এখানে Indo-Burmese Federation of Fine Arts ব'লে একটি সংস্থা আছে, তার তরফ থেকে আমাদের স্বাগত করবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। এঁরা Tagore Reception Camp নাম দিয়ে, একটি বাড়ীতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করেন—New Merchant Road রাস্তায় একটি বাড়ী নিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে আমাদের নিয়ে তুলবেন, রাত্রে সেখানেই আমাদের রাখবেন, খাওয়া-দাওয়া সেখানেই হবে। কিন্তু কবির থাকবার পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা তাঁরা ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি। স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীযুক্তা সীতা দেবী ও রামানন্দবাবুর জামাতা শ্রীযুক্ত সুধীর চৌধুরী মহাশয়, এঁরা তখন রেঙ্গুনে ছিলেন। এঁদের, শান্তিনিকেতনের একটি প্রাক্তন ছাত্রের, আর অন্য বাঙালীদের খুবই আগ্রহ হয় যে, আমরা এঁদের অতিথি হ'য়ে রেঙ্গুনে-ই দু'দিন কাটাই। কিন্তু কবির শরীর-গতিকের জন্য সেটা সম্ভবপর হয় নি।

বিকেল পাঁচটায় একটি চা-পানের সভা ছিল। সভায় নানা জাতের লোকের সমাগম হ'য়েছিল। কতগুলি বাঙালী মহিলা একটি পাশের ঘরে ছিলেন, দেখলুম, জাহাজে ক'রে তাঁরা বিদেশে বর্মাতে গিয়েও বাঙ্‌লাদেশের পুরাতন চাল বজায় রেখেছেন— ঘোমটায় মুখ ঢেকে সভার মধ্যে ব'সে আছেন। একটি সুন্দরী পার্সী মহিলা এসেছিলেন, তাঁর স্বামী একজন ইংরেজ। দক্ষিণ আমেরিকার Chili চিলি-দেশ থেকে আগত, কবির দুটি ভক্ত কি ক'রে এসে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া তেলুগু, তামিল, হিন্দুস্থানী, গুজরাটী,

পাঞ্জাবী কিছু-কিছু ছিলেন। কবি সংক্ষেপে দু'চার কথা বাঙলাতেই ব'ললেন; তার পরে উপস্থিত সজ্জনদের অনেকেরই সঙ্গে তাঁকে ইংরেজীতে আলাপ ক'রতে হ'ল।

সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধীর চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে আমাদের আহার হ'ল— শুদ্ধ বাঙালী ধরণের প্রচুর আয়োজন তিনি ক'রেছিলেন, অনেকদিন পর তার সদ্ব্যবহার ক'রে আমরা তৃপ্ত হ'লুম। কবির দর্শনার্থী অনেকগুলি বাঙালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। সকলের সঙ্গে কথাবার্তা ক'রে আমরা রাত্রি সাড়ে-নটার পরে জাহাজে ফিরে এলুম। কবি বেশী ভীড় পছন্দ করেন না— বিশেষতঃ যদি তাঁকে সেই ভীড়ের মধ্যেই রাত্রে বেশী সময় কাটাতে হয়। তিনি তো জাহাজে উঠে, নদীর ধারে ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে' হাওয়ার মধ্যে ডেক্-চেয়ারে ব'সে একান্তে নিরিবিলিতে একটু আরামের নিঃশ্বাস গ্রহণ ক'রলেন।

রবিবার ২৩শে অক্টোবর, রেঙ্গুন।—

কালকের সারাদিনের ঘোরাফেরায় আর পরিশ্রমে আজ সকালেও কবি বড়ই শ্রান্ত বোধ ক'রছিলেন। তবুও সকালে রেঙ্গুন-প্রবাসী কতকগুলি বাঙালী ছাত্র আর অন্য তরুণের দল এল' কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রতে— আজ বেলা দুটো থেকে চারটের মধ্যে কোনও সময়ে রেঙ্গুন শহরে নেমে তাঁকে স্থানীয় বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আর মহিলাদের কাছে দর্শন দিতে হবে। এই ছেলেদের দল স্থানীয় Indo-Burma Federation of Fine Arts-এর সদস্য। এদের নেতা হচ্ছেন Dr. M. A. Rauf রাউফ, LL. D. (Dublin), B. A. C Oxon., Middle Temple-এর ব্যারিস্টার। ইনি গুজরাটী মুসলমান, এঁর পিতা ব্যবসায় উপলক্ষ্যে রেঙ্গুনে এসে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হ'য়ে গিয়েছেন। বিলাতে ১৯২০-১৯২৫ সালের দিকে ছিলেন, Dr. E. B. Havell-এর বন্ধু, শিল্পে ও সাহিত্যে খুব গভীর অনুরাগ। শ্রীযুক্ত রাউফ অতি চমৎকার শিক্ষিত ও সংস্কারপূত চরিত্রের মানুষ, ইনিও এদের সঙ্গে এসেছিলেন। এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে আমরা সকলেই খুব খুশী হ'লুম। ইনি সুধীর-বাবুদের ঘনিষ্ঠ মিত্র। বাঙালী ছেলে যে কয়টি সকালে এসেছিল, কবিকে আমন্ত্রণ জানাতে, তারা ঘুরে-ঘুরে জাপানী জাহাজের ব্যবস্থা আর কায়দা দেখতে লাগ্‌ল। একজায়গায় একটা ছোট বিজ্ঞাপনী লেখা ছিল ইংরিজিতে, যাত্রীদের জন্য কোনও নির্দেশ, তার ইংরিজিটায় ছিল দু-চারটে হাস্যকর ভুল। সেটা দেখে এদের মনে কৌতুক-ভাব জেগে উঠ্‌ল, এরা সেই ভুল ইংরিজি ধ'রে হাসাহাসি ক'রতে লাগ্‌ল, একজন আবার পকেট-বই বা'র ক'রে, আর পাঁচজনকে দেখাবার জন্য সেই ভুল ইংরিজিটুকু লিখে নিলে। আমি এদের ব'ললুম— "দ্যাখো, এরা আমাদের মত শুদ্ধ ইংরিজি লিখ্‌তে পারে না বটে— লিখ্‌তে হয়তো চায়ও না— কিন্তু নিজেদের স্বাধীন দেশের ঝাণ্ডা নিয়ে নিজেদের জাহাজ চালাচ্ছে, সে শক্তি তো আমাদের হয় নি— সুতরাং এদের ভুল ইংরিজিতে হাসির কিছু আছে কিনা, বিচার ক'রে দেখো।" দুই-চারিজন আমার কথা বুঝ্‌লে, একটু লজ্জিতও হ'ল।

সুধীর-বাবুর বাড়ীতে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা ডাক্তার রাউফ আর সুধীর-বাবুর সঙ্গে বেলা সাড়ে-নটায় জাহাজ থেকে নেমে রেঙ্গুনের তথা সমগ্র ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির Shwe Dagon Pagoda শোয়ে-ডাগন মন্দির দেখতে গেলুম। কবি জাহাজেই থেকে গেলেন, তাঁকে নিয়ে বেরোবার সাহস আমাদের কারো হ'ল না। শোয়ে-ডাগন মন্দির দেখে খুব ভালো লাগ্‌ল। ঠিক ভারতীয় কোনও তীর্থস্থানের মতন। মাঝখানে ঘণ্টার আকারে বিরাট্ চৈত্য, সোনার পাত দিয়ে মোড়া সমস্তটা,

রোদ্দুরে ঝক্‌ঝক্ ক'রছে। বড়ো চৈত্যের লাগাও, তার পাদতলে অনেকগুলি ছোটো-ছোটো চৈত্য, তার প্রত্যেকটিতে সাদা পাথরের বর্মী ঢঙে খোদাই করা দাঁড়ানো বা বসা বা শোয়া বুদ্ধমূর্তি। মন্দিরপথে নানা দোকানের সারি, পূজার্থী যাত্রীদের জন্য ফুল, মোমবাতি বিক্রী হ'চ্ছে, টুকিটাকি নানা মণিহারী জিনিসের বহু দোকান, মেয়েরাই জিনিসপত্রের পসরা দিয়ে ব'সেছে। খাবার জিনিসের দোকানও অনেক —চা, ভাত, তরকারী, মাছ, ঙাপ্পি, আর মেঠাইয়ের দোকান। খুব সেজেগুজে, মুখে হ'লদে 'তানাখা' বা বর্মী পাওডার মেখে, ভদ্রঘরের মেয়েরা বৃদ্ধা প্রৌঢ়া তরুণী সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও বা কোনও একটি চৈত্যের সামনে চাটাইয়ের উপরে হাঁটুগেড়ে ব'সে হাত জোড় ক'রে বর্মী উচ্চারণে পালিতে প্রার্থনা-মন্ত্র প'ড়ছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু আর ভিক্ষুণী জপমালা নিয়ে ব'সে ব'সে "বুডা, ডামা, তিঙ্গা" অর্থাৎ 'বুদ্ধ, ধম্ম, সংঘ' মন্ত্র জপ ক'রছে। এখানে বর্মী শিল্পদ্রব্য দুই-একটা কিনলুম— পিতলের সিংহের মূর্তি আর অন্য নকশার inlay অর্থাৎ পচ্চেকারী-করা ইস্পাতের জাঁতি, বর্মী চালে আঁকা বুদ্ধের জীবনীর দুই চারখানি রঙীন ছবি। দোকানে কাঠের কাজের নমুনা দেখলুম। সঙ্গে সুরেন-বাবু ছিলেন, তিনি আমার মত শিল্প-পাগলা মানুষ, এই-সব দেখেশুনে বেড়ানো তাঁরও খুব ভালো লাগ্‌ছিল।

এর পরে স্থানীয় এক বাগানে Royal Lakes ব'লে একটি মনোরম সাজানো সরোবর আছে সেটির ধার দিয়ে ঘুরে, Scott Market স্কট মারকেটে গেলুম। বর্মার বিখ্যাত শিল্প Lacquer Work লাখ বা গালার কাজ— নানা চিত্রে আর অলঙ্করণে শোভিত থালা বাটি বাক্‌স ঝুড়ি প্রভৃতির পসার দেখলুম, ছোটো-খাটো দুই-একটি জিনিসও আমরা নিলুম। তারপরে বেলা এগারোটায় জাহাজে ফিরে এলুম।

পরে কবিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে সুধীর-বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হলুম। Indo-Burma Federation of Arts-এর কতকগুলি সদস্যও উপস্থিত হ'লেন। বেলা একটা পর্যন্ত সদালাপে সময় কাটিয়ে আমাদের বাঙালী মতে অন্নাহার হ'ল। তারপরে বেলা আড়াইটেয় কবির সঙ্গে চ'ললুম Phayre Street ফেয়ার স্ট্রীটে বাঙালীদের এক বইয়ের দোকানে, Modern Publishing House-এ। এখানে কবি কতকগুলি বই কিন্‌লেন। রাস্তার ধারে ব'সে কবিকে নিয়ে গ্রুপ্-ফোটো তোলা হ'ল, তখন রাস্তার লোক-চলাচল খানিক ক্ষণের জন্য বন্ধ হ'ল।

কবিকে বাঙালী ছাত্রদের আয়োজিত সভায় আমরা নিয়ে গেলুম। অনেকগুলি বাঙালী মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। "গান্ধী হাসপাতাল" নামে পরিচিত রেঙ্গুনের বিখ্যাত রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পরিচালক স্বামী শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ এই সভায় সাগ্রহ অংশ গ্রহণ করেন, আর একজন স্থানীয় বাঙালী ভদ্রলোকও ছিলেন, তাঁর নামটি ভুলে যাচ্ছি। এ সভা বেশ জমেছিল, বাঙলা গানে আর আলাপ-আলোচনায়। কবি একটি ছোটো বক্তৃতা দিলেন, বেশ উদ্দীপনাময় ভাষায়— যাতে বর্মায় বাঙালী আর অন্য জাতীয় মানুষের মধ্যে— অন্য ভারতীয় আর বর্মী দুইই— একটা আত্মীয়তা আর একতার ভাব গ'ড়ে ওঠে।

বিকালের দিকে কবিকে একটু বিশ্রামের জন্য জাহাজে পৌঁছে দিয়ে আমরা— সুরেন-বাবু আর আমি— ডাক্তার রাউফের সঙ্গে শহরে ফিরে এলুম। Phayre Street-এ Burma National Stores-এ আমরা বর্মার কারুশিল্পের এক অপূর্ব সংগ্রহ পেলুম— পৌনে ছটা থেকে প্রায় একঘণ্টা ধ'রে নানা জিনিস আমরা দেখতে লাগ্‌লুম। আমি তিনটি ছোটো ধাতু-মূর্তি কিনলুম— একটি ব্রোঞ্জে, বর্মী মেয়ে আরসী সামনে রেখে চুল বাঁধছে, পেগুর শিল্পীর তৈরী, দাম নিলে বত্রিশ টাকা; জর্মান সিলভারে তৈরী একটি

বর্মী নর্তক, কুড়ি টাকা; আর পেতলের একটি বর্মী নাচুনি মেয়ে, আট টাকা। অল্প দামের কতকগুলি লাখের বা গালার কাজের ঢাকনওয়ালা বাটি নিলুম। স্থরেন-বাবু বিশ্বভারতী-কলাভবনের জন্য কতকগুলি জরির কাজ-করা বর্মী রেশমী কাপড় আর লাখের জিনিস নিলেন— এক শ টাকার উপর দাম পড়্‌ল।

তারপরে সন্ধ্যেবেলায় আমরা Tagore Reception Camp-এ হাজির হ'লুম— ফ্‌কোন্ পল্লীতে, এখানে Indo-Burma Federation of Arts-এর সভ্যরা মিলিত হ'য়েছিলেন। শ্রীযুক্ত স্থবোধ চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যে কারে করে কবিকে শহরে একটু ঘুরিয়ে এনে এই সভায় পৌঁছে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের এক কন্যা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার রাউফ ইন্দো-বর্মা ফেডারেশন অব আর্টস্-এর পক্ষ থেকে কবিকে স্বাগত ক'রলেন, তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রলেন। কবিও শিষ্টতার সঙ্গে তার উত্তর দিলেন। এই রকম স্বল্প অনুষ্ঠানের মধ্যে কবিকে স্বাগত করা হ'ল।

আজ রাত্রেও সুধীর-বাবুর বাড়িতে আমাদের আহারের ব্যবস্থা ছিল—রাত নটায় আহার হ'ল। ডাক্তার রাউফের সঙ্গে আলোচনা হ'ল। হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুর ইসলামী বিদ্যার অধ্যয়নের জন্য যে এক লাখ টাকা বিশ্বভারতীকে দান ক'রেছিলেন, তার জন্য উপযুক্ত অধ্যাপক কে হ'তে পারেন? লখ্‌নৌয়ের ডাক্তার তারাচাঁদের কথা হ'ল, আমাদের ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাহেদ সুহ্‌রা-ওর্দীর কথাও হ'ল।

রাত দশটায় আমরা জাহাজে ফিরলুম। ইতিমধ্যে এক ইংরেজ কাস্টম্‌স্ অফিসার, কবির অনুরাগী, এসে কবির সঙ্গে দেখা ক'রে বিদায় নিয়ে গেলেন। ডাক্তার রাউফের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে আমরা সকলেই খুব খুশী হই। জাপানী কীটতত্ত্বের অধ্যাপক, আমাদের জাহাজের সহযাত্রী আমাদের কেনা বর্মী শিল্পদ্রব্য খুঁটিয়ে দেখলেন, ভদ্রলোক খাঁটী শিল্পরসিক, জিনিসগুলির যথাযথ বিচার অনেকটা ক'রতে পারলেন— এইগুলিতে প্রাচীন সৌন্দর্য্যের আমেজ আছে, এগুলি আধুনিকগন্ধী ও নকলী, ইত্যাদি।

সোমবার, ২৪শে অক্টোবর, ১৯২৭ ৬ই পৌষ, অমাবস্যা।—

আজ কালীপূজা, দীপাবলী। আর দু দিন আর তিন রাত্রি পরেই ক'লকাতা পৌঁছুবো। ভোর ছটায় আমাদের জাহাজ রেঙ্গুন ত্যাগ ক'রলে। রেঙ্গুন নদীর মোহনায় জলে নানা রকম রঙের সমাবেশ— শহরের কাছে ঘোলা হ'লদেটে রঙ্ জলে, তারপরে ধীরে ধীরে সেটা হ'ল ফিকে সবুজ, একটু দূরে ঘন সবুজ জল, তার পরে ঘন নীল, শেষটায় কৃষ্ণাভ নীল। আজকের দিনটা শুয়ে ব'সে, বই প'ড়ে কাটানো গেল। এই যাত্রায় রচিত রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতা আমার খাতায় নকল ক'রলুম। Galsworthyর লেখা *Saint's Progress* পড়া গেল। বিকালে, প্রায় সোজা নাকের সামনে, একটু বাঁ দিকে, সূর্য্যাস্ত হ'ল, কবির পাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা গেল। টকটকে, লাল মেঘ নীল জলের উপরে ছায়া ফেলে যেন ঝলমলে 'বেগুনে' রঙের সৃষ্টি ক'রছিল।

আমার কন্যা পুঁটু (সুধা) আজ তিন বছরে প'ড়ল। আজ তার কথা বিশেষ ক'রে মনে প'ড়ছিল।

মঙ্গলবার, ২৫শে অক্টোবর ১৯২৭।—

পেনাঙ-এ জাহাজে ওঠবার পর থেকেই একটা ভীষণ আলস্যে ধ'রেছে—লিখতে প'ড়তে, নড়া-চড়া ক'রতে যেন ভালো লাগছে না। দেশের ছোঁয়াচ আজ থেকেই যেন পাচ্ছি। আজ সকাল থেকেই দেখছি—

সমুদ্রের কালো জলের উপরে থোকা-থোকা আধ-শুখনো আধ-কাঁচা কচুরীপানা ভেসে বেড়াচ্ছে— কোথাও হলদে', কোথাও এখনও সবুজ র'য়েছে। বাঙলা দেশের নদীর জল বেয়ে এই কচুরিপানা বঙ্গোপসাগরে অনেকটা দূরে এসে পড়েছে— আমরা বর্মা আর বাঙলাদেশের সাগরের এলাকার মাঝামাঝি পথেই আছি। সকালে জাহাজের অফিসারদের সঙ্গে দু দান ডেক্-গল্ফ্ খেলা গেল। জাহাজের জাপানী ডাক্তারটিও খেলায় যোগ দিলেন। জাপানীরা স্বাধীন জাতি হ'লেও ইংরিজি শব্দ খুব ব্যবহার ক'রে থাকে দেখলুম। জাহাজের ডাক্তারকে তারা 'দোক্তোর' ব'লেই ডাকছিল।

সকালে জাহাজের কাপ্তেন স্বরেন-বাবুকে আর আমাকে উপরে Bridge ব্রিজ-এ নিয়ে গেলেন, এই ব্রিজ থেকেই জাহাজ চালানো হয়। তাঁর খাস কামরায় কত যন্ত্রপাতি, কত সাগরের নক্শা— নক্শাগুলি ইংরেজিতে। অতি অমায়িক সৌজন্যের সঙ্গে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা ক'রলেন তাঁর ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে। চার্ট বা মানচিত্র, extant, রকমারি ঘড়ির আকারের যন্ত্র, কত কি। কি ভাবে জাহাজ চালায় জলের উপর সোজা পথ ধ'রে। ঝড় বা জোর-হাওয়ায় কি ক'রে এই সোজা পথ অটুট রাখার চেষ্টা করা হয়, সমুদ্রের গভীরতার মাপ নেওয়াও সঙ্গে সঙ্গে চলে— এই-সব কথা আমাদের জানাতে চেষ্টা ক'রলেন। যন্ত্রপাতি প্রায় সবই ইংলাণ্ডের তৈরী। কাপ্তেন তাঁর নিজের পাঠের জন্য যে বই সঙ্গে ক'রে এনেছেন তা দেখালেন— বিশেষ ক'রে ভারত-ভ্রমণ বিষয়ে, আর ভারতের বৌদ্ধশিল্প সম্বন্ধে তু'খানি জাপানী বই।

তুপুরে খাওয়ার আগে ডেক-প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে খানিক ঘুরে, গল্প ক'রে এলুম। কুড়ি বছরের ক্যালিফর্নিয়া-প্রবাসী শিখটির সঙ্গেও আলাপ ক'রলুম। কি আগ্রহে বা সুখে বা আশায় সে দেশে যাচ্ছে তা বুঝলুম না। বাঙালী দরজীরা খুব ফুর্তি ক'রে তাস খেলছে।

তুপুরের আহারের পরে ডেকের রেলিঙের ধারে একখানা কেদারায় ব'সে সাগরের শোভা দেখ্তে লাগলুম। পরিষ্কার নির্মেঘ আকাশ, রোদ্দুরে ঝলমল ক'রছে। তলায় উজ্জ্বল ফিকে নীল সমুদ্র। বিকালের দিকে রঙ ব'দলে ঘন কৃষ্ণ-নীল হ'ল এই রঙ। আজো সন্ধ্যার দিকে কবি এসে সূর্য্যাস্ত দেখতে ব'সলেন, আমিও দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে লাগলুম। কবি আজ আমাদের সামাজিক ব্যাপার নিয়ে একটু চিন্তার উদ্রেককর কত কথা ব'ললেন— হিন্দুদের মধ্যে একতার অভাব, জাতির ঘোঁট, জাতীয়তার অভাব। শিখদের মধ্যে তাদের সংহতিবোধের আর একতার প্রশংসা কবি ক'রলেন। এক শ্রেণীর হিন্দু গোঁড়ামিকে তিনি মুসলমান সমাজের একশ্রেণীর লোকের অসহিষ্ণু ধর্মধ্বজী গোঁড়ামির সঙ্গে এক পর্য্যায়ের বস্তু ব'লে, সে-সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য ক'রলেন।

জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার অন্য সাধারণ জাপানীর মত প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের উপাসক। মিসর-দেশের সুয়েজ-খালের ভিতর দিয়ে যাবার সময়ে তিনি খান তুই মিসরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বড়ো-বড়ো ফোটোগ্রাফ কিনে এনেছেন— প্রকৃতির রুক্ষ রূপ, মরুভূমির বালির সমুদ্রের দৃশ্য— জলের ঢেউয়ের মত বিরাট্ বিরাট্ বালির লহর, সুদূর কোণে একজায়গায় উটের পাশে আরব মরুবাসী জন তুই দাঁড়িয়ে। তাঁর নিজেদের দেশে প্রকৃতির যে দাক্ষিণ্যপূর্ণ মুখ তিনি দেখতে পান— সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্য-শষ্প-শ্যামলা তাঁর Yamato য়ামাতো-ভূমি— সূর্য্যোদয়ের দেশ, নিপ্পোন বা জাপান, এ একেবারে তার বিপরীত। ইনি এই ছবি তুখানি আজ সকালে কবির কাছে দিয়ে যান, এই অনুরোধ ক'রে যে তিনি যদি দয়া ক'রে ছবি

দুখানিতে তাঁর নাম সই ক'রে দেন, আর কবিতার আকারে দু ছত্র লিখে দেন। আজ দুপুরে কবি এঁর এই অনুরোধ পালন করেন— ছবি দুখানিতে বাঙলায় আর ইংরিজিতে তাঁর দস্তখৎ তিনি ক'রে দেন, আর বাঙলায় দুই লাইনের দুটি বিষয়োপযোগী কবিতা তার ইংরিজি অনুবাদ-শুদ্ধ ছবি দুটিতে লিখে দেন। এই কবিতা দুটি আমার বিশ্বাস তাঁর এই রকমের ছোট কবিতার সংগ্রহ 'স্ফুলিঙ্গ'তে স্থান পেয়েছে।

জাহাজের কাপ্তেনকে তাঁর প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ কবি সই-করা নিজের এক ফোটোগ্রাফ উপহার দিলেন। জাহাজের অফিসাররা আজ বিকালে কবিকে আর আমাদের নিয়ে তাঁদের সঙ্গে একসাথে এক ফোটোগ্রাফ নিলেন, তাঁদের জাহাজে সম্মানিত অতিথি-রূপে কবির ভ্রমণের স্মারক হিসাবে।

বুধবার ২৬শে অক্টোবর ১৯২৭।—

আজ জাহাজে আমাদের শেষ রাত্রি। দুপুরে কবির সঙ্গে আমাদের নানা ঘরোয়া কথার— 'বাঙালীয়ানা' নিয়ে আলোচনা হ'ল। কবি একটু জোর দিয়েই ব'ললেন, বাঙালীর পোষাকে (মাটিতে কোঁচা লুটিয়ে চলা), আচারে, ভব্যতায় একটা ঢিলেঢালা ভাব আছে, সেটাকে কাটিয়ে ওঠা দরকার— বহুস্থলে এই বাঙালীয়ানা একটা গেঁয়ো ব্যাপার মাত্র, নাগরিকতা বা শালীনতা তাতে নেই, বরং আছে একটা provincial vulgarity— ভারতের অন্য জাতের তুলনায় রেঙ্গুনে বাঙালীদের মধ্যে সেটা একটু বেশী ক'রেই তাঁর চোখে লেগেছে ব'লে তিনি ব'ললেন। কথাপ্রসঙ্গে আমাদের বাঙলা পাঁজির কথা উঠ্‌ল। আজকালকার 'স্বাস্থ্য ধর্ম গৃহপঞ্জিকা'তে ফলিত জ্যোতিষ নিয়ে বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি থাকে— এটা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। আর তা ছাড়া নানা রকম ব্যাধির বর্ণনাত্মক বীভৎসতা। কবির মতে আমাদের গৃহ-পঞ্জিকার ভদ্র সংস্করণ বা'র হওয়া উচিত।

আজ সূর্য্যাস্তের সময় রঙের বাহার তেমন নেই। সূর্য্যাস্তের সময়ে কবি যেমন ডেকের উপরে ব'সে তার প্রতীক্ষা করেন, সূর্য্যোদয়ের সময়েও তিনি প্রকৃতি দেবীর স্বাগত ক'রতে ছাড়েন না। খুব ভোরে এইজন্য তিনি ওঠেন। আমাদের তা সব দিন দেখা হয় না কারণ তখন আমরা প্রায়ই শয্যা আশ্রয় ক'রে থাকি।

আজ রাত্রে জাহাজের কাপ্তেন প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের বিশেষ ভালো ক'রে খাওয়ালেন— Sayonara Dinner বা বিদায়ী নৈশ-ভোজ হ'ল। বিদায়ের সময়ে জাপানী ভাষায় Sayonara 'সাইওনারা' শব্দটি ব্যবহার করে, ইংরিজির Goodby বা Farewell, ফরাসীর Au revoir, জরমানের Auf Wiedersehen আর আমাদের 'পুনদর্শনায়' শব্দের মত। চমৎকার ছাপা, জাপানী প্রাচীন Ukiyo-ye বা সামাজিক-চিত্র পর্য্যায়ের কাঠে-খোদা জাপানী সুন্দরীর রঙীন প্রতিকৃতি-যুক্ত মেনু-কার্ড বা ভোজ্যতালিকায় সব নাম সই করিয়ে নেবার পালা চ'ল্‌ল— এই ভোজের স্মারক হিসাবে রেখে দেবে।

রাত দশটায় আমাদের জাহাজ গঙ্গার মুখে এসে পৌছুল'। Pilot Ship পাইলট-শিপ্ বা আড়কাঠি-জাহাজ থেকে Pilot বা দিশারু গঙ্গার মধ্যে আমাদের জাহাজকে ঠিক মত চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের এই জাপানী জাহাজে এসে উঠলেন।

বৃহস্পতিবার ২৭শে অক্টোবর ১৯২৭।—

সকাল আটটায় গঙ্গামুখ থেকে জাহাজ যাত্রা করে, সারাদিনে ৯০ মাইল পথ ভাগীরথীর ভিতর দিয়ে অতিক্রম ক'রে, বিকাল সাড়ে চারটেয় ক'লকাতায় Outram আউটরাম ঘাটে আমাদের জাহাজ পৌছুল'। জাহাজ-ঘাটে কবিকে আর অন্য যাত্রীদের স্বাগত করবার জন্য আত্মীয়-মিত্র সমাগম।

এইভাবে কবির সঙ্গে আমাদের দ্বীপময় ভারত (ইন্দোনেসিয়া) ও শ্যামদেশ (ইন্দোচীন) ভ্রমণ সাঙ্গ হ'ল। এই ভ্রমণ আরম্ভ হয়েছিল ১২ই জুলাই ১৯২৭, মঙ্গলবার ; ঐদিন বিকালে কবির সঙ্গে আমরা ক'লকাতা থেকে রেলে মাদ্রাজ যাত্রা করি, পরে ১৪ই জুলাই মাদ্রাজ থেকে জাহাজে ক'রে সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরে নেমে এক মাস এক সপ্তাহ ধ'রে সমগ্র মালয়দেশ পরিভ্রমণ করে আমরা ২১শে আগস্ট রবিবার বাতাবিয়ায় যবদ্বীপে পৌছাই। যবদ্বীপ-বলিদ্বীপের ভ্রমণ শেষ ক'রে ৩০শে সেপ্টেম্বর কবি শ্যাম-যাত্রা করেন। আমরা তার পরের দিন তাঁর অনুগমন করি। ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময় ভারতে কবির অবস্থান হয়েছিল প্রায় এক মাস দশ দিন। তার পরে ৭ই অক্টোবর থেকে ১৬ই অক্টোবর পর্যন্ত দশ দিন ধ'রে শ্যামদেশ দর্শন। এই যাত্রায় কবি সাড়ে তিন মাস ধ'রে বাইরে ছিলেন।

ভারতের সঙ্গে মালয়-দেশের, দ্বীপময় ভারতের আর শ্যামদেশের সাংস্কৃতিক যোগ কবির এই ভ্রমণে এই যুগে প্রথম দৃঢ়-ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। আমার মনে হয়, আধুনিক কালে এশিয়ার তথা পৃথিবীর আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমানবিকতার বিকাশে কবির এই দেশদর্শন ও মৈত্রীস্থাপন একটি প্রধান ও লক্ষণীয় ঘটনা হ'য়েছিল। এর যে সুদূর-প্রসারী প্রভাব ভারতের, ইন্দোনেসিয়ায় আর শ্যামের ও ইন্দোচীনের সাংস্কৃতিক আর রাজনীতিক জীবনে, ভাবজগতে আর রাষ্ট্রজীবনে এসেছে, তার নিরপেক্ষ আলোচনা হওয়া উচিত। শঙ্করাচার্য্যের ভারত-পরিক্রমাকে যেমন 'শঙ্কর-বিজয়' বলা হয়, তেমনি ভারতবর্ষ থেকে আগত 'মহাগুরু' রবীন্দ্রনাথের এই 'দ্বীপান্তর' বা 'নৃসান্তর' অর্থাৎ দ্বীপময়-ভারতে ভ্রমণকে, বলিদ্বীপীয় লোকেদের কথা অনুসারে, 'মহাগুরু-বিজয়' ব'লতে পারা যায়।

রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ দ্বিতীয় পর্যায়

শ্রীসুকুমার সেন

যে বয়সে ছোট ছেলে ভৃত্যদের তত্ত্বাবধানে বাড়ির বাইরে যাবার অধিকার পায় সে বয়স পার হবার অনেককাল পরে তবেই রবীন্দ্রনাথ বাইরে যেতে এবং তারও বেশ কিছুকাল পরে তবে কলকাতার বাইরে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। বাড়ির বাইরে যাবার আগে তিনি বাইরের সঙ্গে অল্পস্বল্প পরিচিত ছিলেন শুধু জানালার ফাঁক দিয়ে। কিন্তু সে তো ঘরের বাইরে, বাড়ির বাইরে তো নয়— সে যেন 'ঘর হতে আঙিনা বিদেশ'। বাড়ির বাইরে প্রথম যাওয়া হল ইস্কুলে ভর্তি হয়ে। কিন্তু সে আর কতটুকু 'বাইরে'— কলকাতার জোড়াসাঁকো চিৎপুরের বাড়ি ঘর গলি রাস্তা।

কলকাতা ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাইরে গেলেন ইস্কুলে ভর্তি হবার দু-এক বছরের মধ্যেই। এই বহির্যাত্রা তাঁর শৈশবের বৃহৎ তাৎপর্যময় ঘটনার মধ্যে একটি। এই সুযোগে শিশু রবীন্দ্রনাথ বাংলা-দেশের পশ্চিমভাগের খানিকটা প্রথম দেখলেন। জোড়াসাঁকোয় তাঁদের বাড়ি থেকে গঙ্গা খুব কাছে। কিন্তু পেনেটি যাবার আগে রবীন্দ্রনাথ কলকাতার গঙ্গা দেখেছিলেন এমন প্রমাণ পাই নি। যদি দেখেও থাকেন তা হলে তাঁর মনে সে দেখায় কোনোই ছাপ পড়ে নি। না দেখে থাকেন তো খুবই ভালো হয়েছিল, যদিও তাঁর সময়ের কলকাতার গঙ্গা এখনকার মত এতটা শ্রীহীন ও নিরানন্দময় হয় নি। অনেক পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ পদ্মালালিত ভূভাগে দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলেন। তখন তাঁর প্রৌঢ় যৌবন এবং তখন তাঁর সৃষ্টি বিচিত্র ধারায় উৎসারিত। পদ্মার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক যে কেমনধারা ছিল তা তাঁর ছিন্নপত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি এবং কয়েকটি কবিতা থেকেও জানতে পারি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন পদ্মাতীরে বাস করতে যান (১৮৯০) তখন তাঁর মনের বাড় প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে এবং তাঁর রচনাশক্তিও সুদৃঢ় ও প্রায় পূর্ণবিকশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিশক্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা মানসীতে প্রকটিত। মানসী-রচনার পরেই তাঁর পদ্মানিবাস শুরু হয়েছিল। নর্মাল ইস্কুলে সাতকড়ি দত্ত ও গোবিন্দবাবুর ফরমাসি কবিতা লেখা থেকে মানসী রচনা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের এই যে কবিমানসের গড়নের ও মনের মার্জনার কাল এই কালে বিভিন্ন মুহূর্তে ও বিভিন্ন দৃশ্যসংস্থানে গঙ্গার প্রভাব গভীরপ্রসারী হয়ে পড়েছিল। সে প্রভাব শুরু হয়েছিল প্রথম কলকাতার বাইরে যাত্রার থেকে। এবং সেই গোড়া থেকেই এ পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ না হলেও অন্তরঙ্গ। এ হল ১৮৬৯ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে কোনো সময়ের ঘটনা। গঙ্গার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। তিনি তখন গঙ্গার উপরে অথবা গঙ্গাবক্ষ থেকে গঙ্গাকে ও গঙ্গালালিত ভূমিকে নিপুণভাবে দেখবার অবকাশ ও সুযোগ পেয়েছিলেন। সে হল ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ সালের কথা। গঙ্গার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় বারের পরিচয়কে বিদায়ের পালা বলতে পারি। তখন তিনি গঙ্গাকে দেখেছিলেন বাংলা দেশ থেকে অনেক দূরে এবং গঙ্গা থেকে উজানে একটু তফাতে থেকে। সেখানে গঙ্গা যেন তাঁর মনের দৃষ্টিতেই সর্বদা গোচর ছিল। এ হল ১৮৮৮ সালের ব্যাপার।

প্রথম ও শৈশব পরিচয় পেনেটির পালা। সেবারে কলকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের প্রবল প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। সে জ্বরের আক্রমণ এড়াবার জন্যে দেবেন্দ্রনাথের বৃহৎ পরিবারের একটা অংশ পেনেটিতে গঙ্গার ধারে এক

বাগানবাড়িতে কিছুকাল পালিয়ে এসেছিল। এই দলে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। এই তাঁর প্রথম কলকাতা ছেড়ে আসা। আধুনিককালে অর্ধসংস্কৃত রূপ নিয়ে পেনেটি নামটি হয়েছে পানিহাটি।

পেনেটিতে এসে যেন রবীন্দ্রনাথের নূতন জন্মলাভ হল। একদা মাতৃগর্ভ থেকে তিনি কলকাতায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, এখন তিনি যেন কলকাতার জঠর থেকে বাংলার মাটিতে অবতীর্ণ হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শুভদৃষ্টি হয়ে গেল গঙ্গার সঙ্গে।—

> এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটাকয়েক পেয়ারা গাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারাবনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি পাড় দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে। পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম। প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ার-ভাঁটার আসা-যাওয়া, সেই কতরকম নৌকার কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়ারা গাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোণিতপ্লাবন। এক-একদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে; ওপারের গাছগুলি কালো; নদীর উপর কালো ছায়া; দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায়-গ্রহণ করে; নদী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলার মধ্যে যা-খুশি-তাই করিয়া বেড়ায়।[১]
>
> কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। সকল জিনিসকেই আর-একবার নূতন করিয়া জানিতে গিয়া, পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুচ্ছতার আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল।· ·
>
> বাংলাদেশের পাড়াগাঁটাকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য অনেক দিন হইতে মনে আমার ঔৎসুক্য ছিল। গ্রামের ঘরবস্তি চণ্ডীমণ্ডপ রাস্তাঘাট খেলাধুলা হাটমাঠ জীবনযাত্রার কল্পনা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত টানিত। সেই পাড়াগাঁ এই গঙ্গাতীরের বাগানের ঠিক একেবারে পশ্চাতেই ছিল— কিন্তু সেখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ। আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়— এখন বসিয়াছি দাঁড়ে— পায়ের শিকল কাটিল না।

পেনেটিতে রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু পিতৃদেবের সঙ্গে থাকতেন তবে বোধ হয় শিকল তখনি কেটে যেত। একদিন তিনি অজ্ঞাতসারে অভিভাবকদের পিছু পিছু গাঁয়ের দিকে চলেছিলেন। খানিক পরে টের পেয়ে অভিভাবকরা ভর্ৎসনা করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।[২] কারণ

---

১ বালকে (১২৯২) প্রথম প্রকাশিত 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতায় এই সঞ্চিত ভাবনার ছবি আছে: 'ওপারেতে বিষ্টি এল ঝাপ্‌সা গাছপালা, এপারেতে মেঘের মাথার এক শ মানিক জ্বালা'।

২ সে হয়তো ভালোই হয়েছিল। পরে যে ক্ষুধা নিয়ে গঙ্গাতীরের দেশকে দেখেছিলেন, সে ক্ষুধা তত তীব্র হত না যদি সে দেশ আগেই দেখা থাকত।

তাঁহাদের মনে হইয়াছিল, বাহির হইবার মতো সাজ আমার ছিল না। পায়ে আমার মোজা নাই, গায়ে একখানি জামার উপর অন্য-কোনো ভদ্র আচ্ছাদন নাই— ইহাকে তাঁহারা আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলেন। কিন্তু মোজা এবং পোশাকপরিচ্ছদের কোনো উপসর্গ আমার ছিলই না, সুতরাং কেবল সেইদিনই যে হতাশ হইয়া আমাকে ফিরিতে হইল তাহা নহে, ত্রুটি সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতে আর-একদিন বাহির হইবার উপায়ও রহিল না।

সেই পিছনে আমার বাধা হইয়া রহিল কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন।[৩] পাল-তোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনা-ভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যে-সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত, ভূগোলে আজ পর্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।· ·

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আবার ফিরিলাম। আমার দিনগুলি নর্মাল স্কুলের হাঁ-করা মুখবিবরের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক বরাদ্দ গ্রাসপিণ্ডের মতো প্রবেশ করিতে লাগিল।

গঙ্গার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পরিচয়কে বলা যায় চন্দননগরের ও গঙ্গাভ্রমণের পালা। তখন তাঁর নবযৌবন-প্রারম্ভ-কাল। ১৮৮১ সালে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার বিলাতযাত্রার উপক্রম করেন। এবারে বোম্বাই থেকে সরাসরি সমুদ্রপথে নয়, কলকাতা থেকে গঙ্গাসাগর-পথে। জাহাজ মাদ্রাজ বন্দরে ভিড়লে পর রবীন্দ্রনাথকে যাত্রাভঙ্গ করে ফিরে আসতে হয়েছিল। তখন দেবেন্দ্রনাথ মসুরীতে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মসুরীতে গিয়ে পিতৃদেবের কাছে যাত্রাভঙ্গের কৈফিয়ত দিয়ে আসেন। তখন নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সপরিবারে চন্দননগরে গঙ্গাতীরে পাটের কারবারী (?) মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে গিয়ে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে যে অল্প ক'মাস ছিলেন— ঠিক কতদিন ছিলেন তা জানা নেই— সে সময়টুকু তাঁর সাহিত্যজীবনের পক্ষে যে কত গুরুতর হয়েছিল তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা বলে গেছেন এবং সন্ধ্যাসংগীতের কবিতায় আর বিবিধ-প্রসঙ্গের টুকরো রচনায় তার সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনে এই দ্বিতীয় গঙ্গাবাসের গুরুমাহাত্ম্য তাঁর নিজের কথাতেই বলি।—

বিলাতযাত্রার আরম্ভপথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন; আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত[৪], স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের কলধ্বনিকরুণ

---

৩ এখানে সম্ভ্রমসূচক ক্রিয়াপদটি লক্ষ্য করবার মতো।

৪ রবীন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের স্নেহকাতর শঙ্কাব্যাকুল মূর্তি দেখেন নি। সে প্রতিমা দেখলেন এই নিখিল বাংলাদেশের মাতৃমূর্তি গঙ্গায়। 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এখানে গঙ্গার প্রসঙ্গে যে ছবি আছে তা কলকাতার নয়, চন্দননগরের নয়, তার আধার গাজিপুরের গঙ্গার ছবি। কলকাতা থেকে জমিদারিতে যাবার যে ভূমিকাটুকু আছে তা কবিতারচনার সময়কার (কার্তিক ১২৯৯)। কবিতাটি কলকাতায় লেখা।—

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন

দিনরাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্নপরিবেষণ হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীরমন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ— তৃষ্ণার জল ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল।··

আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তখন রবীন্দ্রনাথ গঙ্গাকে অত্যন্ত কাছে পেয়েছিলেন। বাড়ির পুবদিকে বারাণ্ডা থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে, সে সিঁড়ি ছুঁয়ে গঙ্গা ছলছল করছে। দোতলা তেতলা থেকে গঙ্গা দেখাত যেন ইন্দ্রনীলমণির পাড়গাঁথা বালুচরি দ্রৌপদীর শাড়ি। নিশীথে স্রোতে-ভাসা পানসিতে শুয়ে বসে যেন গঙ্গার অগাধ আলিঙ্গন অনুভূত হয়।

চন্দননগর ছেড়ে এলেও কিছুকাল গঙ্গার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছাড়াছাড়ি হয় নি. কলকাতার উজানে কালনা-শান্তিপুর (এক-আধবার বোধকরি নবদ্বীপ-কাটোয়া) পর্যন্ত আর ভাটিতে গঙ্গাসাগরের কাছাকাছি রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বজরায়-স্টীমারে ভ্রমণ করেছিলেন (এবং জাহাজে গঙ্গা বয়ে সমুদ্র পর্যন্ত অনেকবার গিয়েছিলেন)। এমনি এক গঙ্গাভ্রমণের নাতিপ্রীতিকর কাহিনী— সে ১৮৮৪ সালে মে মাসের কথা— রবীন্দ্রনাথ একটি সমসাময়িক প্রবন্ধে হালকা ক'রে ডায়েরির রীতিতে বর্ণনা করেছিলেন। সে বর্ণনার একটু অংশ উদ্ধৃত করছি। একটু অনুধাবন করলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাসে গঙ্গার প্রভাব ও গঙ্গাভ্রমণের ফলাফল বোঝা যাবে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন জাহাজ-কোম্পানি খুলে খুলনা-বরিশালে স্টীমার চালাচ্ছেন। তাঁর স্টীমার— নাম সরোজিনী[৫]— যখন কলকাতা থেকে খুলনায় যাচ্ছিল তখন তাঁর নতুন (?) দাদা ও মেজ (?) বৌদিদি এবং রবীন্দ্রনাথ তাতে উঠেছিলেন কলকাতার গরম এড়াবার জন্যে। যাত্রায় গোড়া থেকেই বাধা পড়েছিল। স্টীমার ছাড়বার খানিকক্ষণ পরে জানা গেল যে কাপ্তেন ওঠে নি, আর মেটেবুরুজ পার হবার আগেই স্টীমারের ইঞ্জিন বিগড়ে গেল। যতক্ষণ না ইঞ্জিন চালু হল

রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা।··
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে। শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া;··

রবীন্দ্রনাথ যখন গাজিপুরে ছিলেন তখন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার বয়স দুই-আড়াই বছর।

৫ নিশ্চয়ই তাঁর সরোজিনী-নাটক থেকে এই নাম নেওয়া। অন্য স্টীমার থাকলে তার নাম কি ছিল জানি না। স্বপ্নময়ী হতে পারে, অশ্রুমতী সম্ভব নয়।

ততক্ষণ তক্তাঘাটের কাছে তাঁদের স্টীমার নঙ্গর ফেলে রইল। তাঁদেরও অচল জলযানে আটক হয়ে থাকতে হয়েছিল।—

বসিয়া বসিয়া গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে। গাছপালা ছায়া কুটীর— নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুইধারে বরাবর চলিয়াছে, কোথাও বিরাম নাই।· · একটা বা নৌকা তাহার কাছাকাছি গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার নীচে, অবিশ্রাম জলের কুলকুল শব্দে, মৃদু মৃদু দোল খাইয়া বড়ো আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার আর-এক পাশে বড়ো বড়ো গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙা ভাঙা বাঁকা একটা পদচিহ্নের পথ জল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে লইয়া জল লইতে নামিতেছে; ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে। প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির কী শোভা। মানুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা একরকম ভুলিয়া যাইতে হয়; এও যেন গাছপালার মতো গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড়ো ফাটলের মধ্য দিয়া অশথগাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইঁটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে; বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গায়ের উপরে শেয়ালা পড়িয়াছে· · এবং তাহার রং চারি দিকের শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গেছে।· · গ্রামের যে-সকল ছেলেমেয়েরা নাহিতে বা জল লইতে আসে তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা-কিছু সম্পর্ক পাতানো আছে— কেহ ইহার নাতনি, কেহ ইহার মা-মাসি। তাহাদের দাদামহাশয় ও দিদিমারা যখন এতটুকু ছিল তখন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌরীরাগিণীতে 'গেল গেল দিন' গাহিত ও গাঁয়ের দুই-চারি জন লোক আশেপাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাহারও মনে নাই। গঙ্গাতীরের ভগ্নদেবালয়গুলিরও যেন বিশেষ কী মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেবপ্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজূটবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মতো অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে।· · সূর্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিমপারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গঙ্গাতীরের যে ছবি এঁকেছেন তা এই ভ্রমণের ফল নয়, বহুবার বহু দেখার রঙে রেখায় রসে এ ছবিগুলি পরিস্ফুট হয়েছিল।

এই যে সব গঙ্গার ছবি আমার মনে উঠিতেছে, এ কি সমস্তই এইবারকার স্টীমার যাত্রার ফল? তাহা নহে। এ সব কতদিনকার কত ছবি, মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড়ো সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারি দিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি।[৬] এমনতর শোভা আর এ জন্মে দেখিতে পাইব না।

সে শোভা রবীন্দ্রনাথ কেন আর কেউই তার পর দেখতে পায় নি। তীরে রেলের বেড়ি আগে থেকেই

৬ এই গঙ্গাভ্রমণের প্রায় একমাসকাল আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী দেহত্যাগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গঙ্গাবাসের সঙ্গে বধূঠাকুরানীর স্নেহসখ্য বিজড়িত ছিল।

লাগতে শুরু হয়েছিল, সে বেড়ির প্রসার ও চাপ বেড়েই চলল। তার উপর হল পাটকলের আবির্ভাব। প্রবন্ধ লেখবার পর থেকে প্রকৃতি ও প্রকৃতিপুষ্ট মানুষ কলকাতার নিকটবর্তী গঙ্গাতীর থেকে দ্রুতপদে অন্তর্ধান করেছে। আমাদের যন্ত্রযুগের প্রথম মহড়ার প্রধান ক্যাজুয়াল্‌টি পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাতীর। এ গঙ্গাতীরের সৌন্দর্য ও মাধুর্য রবীন্দ্রনাথের লেখাতে ধরা হয়ে রইল— এইটুকু সান্ত্বনা।

রবীন্দ্ররচনায় মানুষের দুটি রূপের পরিচয় আছে। এক হল তার নিত্যরূপ— অর্থাৎ দেশকালের বাইরে মানুষের জীবলীলা, তার মনন-জীবন; আর হল তার সত্যরূপ— অর্থাৎ দেশ-কাল-ঘরসংসারের খণ্ডটুকুতে মানুষের যে রূপ আমরা দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গানে মানুষের নিত্যরূপের পরিচয় প্রাধান্য পেয়েছে, আর তাঁর গল্পে-উপন্যাসে মানুষের সত্যরূপের পরিচয় প্রকট হয়েছে। যে দৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন সে দৃষ্টির উন্মোচন হয়েছিল গঙ্গাভ্রমণে, আর সে দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল পদ্মাবাসে। গঙ্গা ও গঙ্গাতীরের সঙ্গে অন্তরের পরিচয় হলে পরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম গল্প দুটি—'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' লিখেছিলেন।[৭] গল্প দুটি সে সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল। যে প্রবন্ধ থেকে গঙ্গাদৃশ্যের বর্ণনা করেছি তার মধ্যেই গল্পদুটির বীজ নিহিত রয়েছে।

গঙ্গার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় পরিচয় হয় গাজিপুরে। রবীন্দ্র-রচনায় এই পালার প্রভাব যতটা পরিস্ফুট এমন আগেকার দুটি পালার নয়।

প্রথম পরিচয়ের বেলায় যেমন তাঁর প্রথম কলকাতার বাইরে যাওয়া এই শেষ পরিচয়ের বেলায় তেমনি তাঁর প্রথম নিজস্ব সংসার পাতা। ১৮৮৮ সালের গ্রীষ্মকালে প্রায় মাস দুয়েক রবীন্দ্রনাথ গাজিপুরে বাসা বেঁধে ছিলেন। বাড়িটি গঙ্গার উপরে নয়, অদূরেও ছিল না; গঙ্গা থেকে একটু দূরেই ছিল। কিন্তু গঙ্গা আর রবীন্দ্রনাথের বাসার মধ্যে এই দূরত্বটুকু ছাড়া কোনো ব্যবধানই ছিল না। গাজিপুরে গঙ্গা রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন যেন অন্তরালবর্তিনী, অন্তঃপুরচারিণী— সুতরাং কম মোহিনী নয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখা উদ্ধৃত করি।—

> একখানা বড়ো বাংলা পাওয়া গেল, গঙ্গার ধারেও বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইল খানেক চর পড়ে গেছে, সেখানে চরের ছোলার সর্ষের খেত; দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণটানা নৌকো চলেছে মন্থর গতিতে।··
>
> ··আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূল হস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় আমার কাব্যরচনার একটু নতুন পর্ব প্রকাশ পেল।

ওপারে শ্যাম বনরেখা এপারে ধুধু শস্যখেত আর মাঝখানে আলস্যমন্থর গঙ্গাধারা— গাজিপুরবাসের এই সম্মুখপট রবীন্দ্রনাথের কোনো গদ্যপ্রবন্ধে বর্ণিত হয় নি, কোনো কবিতায়ও সোজাসুজি আঁকা পড়ে নি। তবে মানসীর কোনো কোনো কবিতায় এ দৃশ্য বিভিন্ন রঙে ও ভাবে ঝলক দিয়েছে। যেমন, সায়াহ্নের বর্ণোজ্জ্বল চিত্রপট—

---

৭ বধূঠাকুরানীর মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের মনকে অত্যন্ত নরম ও ব্যাকুল করেছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ এই গল্প লেখার প্রবৃত্তি পেয়েছিলেন। এ এক অপূর্ব ক্যাথারসিস।

চারি দিকে শস্যরাশি চিত্রসম স্থির,
প্রান্তে নীল নদীরেখা, দূর পরপারে
শুভ্র চর, আরো দূরে বনের তিমির
দহিতেছে অগ্নিদীপ্তি দিগন্ত-মাঝারে।

শান্তির চিরন্তন ছবি—

সেই চিরকলতান উদার গঙ্গা
বহিছে আঁধার-আলোকে,
সেই তীরে চিরদিন খেলিছে বালিকা-
বালকে,
ধীরে সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে
স্বপ্নপাখির পালকে।

প্রগাঢ় সন্ধ্যায় গঙ্গাবক্ষে দেখা ভাবনা— বড় পটের ছবি—

কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ। প্রথম সন্ধ্যায়
ম্লান চাঁদ দেখা দিল গগনের কোণে।
ক্ষুদ্র নৌকা থরথরে চলিয়াছে পালভরে
কালস্রোতে যথা ভেসে যায়
অলস ভাবনাখানি আধোজাগা মনে।

এক পারে ভাঙা তীর ফেলিয়াছে ছায়া,
অন্য পারে ঢালু তট শুভ্রবালুকায়
মিশে যায় চন্দ্রলোকে—ভেদ নাহি পড়ে চোখে—
বৈশাখের গঙ্গা কৃশকায়া
তীরতলে ধীরগতি অলস লীলায়।

স্বদেশ পুরব হতে বায়ু বহে আসে
দূর স্বজনের যেন বিরহের শ্বাস।
জাগ্রত আঁখির আগে কখনো বা চাঁদ জাগে,
কখনো বা প্রিয়মুখ ভাসে;
আধেক উলস প্রাণ আধেক উদাস।

ঘনচ্ছায়া আম্রকুঞ্জে উত্তরের তীরে
যেন তারা সত্য নহে, স্মৃতি-উপবন।
তীর, তরু, গৃহ, পথ, জ্যোৎস্নাপটে চিত্রবৎ—
পড়িয়াছে নীলাকাশ নীরে
দূর মায়াজগতের ছায়ার মতন।

সোনার-তরীর 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় গাজিপুরের গঙ্গার ছবি ব্যবহারের কথা বলেছি। অনেক পরবর্তী কালেও রবীন্দ্রনাথ গাজিপুরের স্মৃতির টুকরো কবিতার গাঁথনিতে ব্যবহার করেছেন।

প্রথমবয়সে গঙ্গাতীরে বাসের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ কখনো ভুলতে পারেন নি। বোধ করি খানিকটা সেই স্মৃতির টানেই তিনি শেষবয়সে গঙ্গায় ও গঙ্গাতীরে দু-একবার বাস করেছিলেন— যেমন বাসায় খড়দায় ও বোটে চন্দননগরে। চন্দননগরে বোটে লেখা দু-একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও প্রৌঢ়যৌবনের স্মৃতি থেকে ছবি ভেসে উঠেছে।[৮]

গাজিপুরে মাস দুয়েকের বাসা বাঁধার কথা ছেড়ে দিলে রবীন্দ্রনাথকে নীড় বাঁধতে দেখি পদ্মাভূমিতে। প্রথমে কিছুকাল একলা ছিলেন, পরে সপরিবারে। শিলাইদহ থেকেই বাস উঠিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে চলে গিয়েছিলেন। পদ্মাভূমিতে রবীন্দ্রনাথ যাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের মধ্যে একজন তাঁর মনে ছাপ ফেলেছিল। সে আন্দী বোষ্টমী। তার কথা গল্পে চিঠিতে প্রবন্ধে উল্লিখিত আছে।

উপনিষদ্ পড়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজের বাল্য-অনুভবের সমর্থন পেয়েছিলেন, আন্দীকে দেখে-শুনে তিনি যেন প্রৌঢ়বয়সে সেই অনুভবের সমর্থন পেলেন। বোষ্টমীকে রবীন্দ্রনাথ যদি না দেখতেন তবে আমরা হয়তো চতুরঙ্গ পেতুম না। বালককালে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার কলকাতার বাইরে গিয়েছিলেন পিতৃদেবের সঙ্গে। সে কথা আগে উল্লেখ করেছি। সেবারে তিনি গঙ্গাহীন বাংলাদেশ— অর্থাৎ বোলপুর — দেখেছিলেন এবং বাংলাদেশের বাইরে উত্তরপশ্চিমে পঞ্জাব পর্যন্ত গিয়েছিলেন। পাহাড়ে দেশের অভিজ্ঞতাও তাঁর সেই প্রথম। এখানে একটা কথা বলে রাখি : রবীন্দ্রনাথ পরে বহুবার পাহাড়ে গিয়েছেন, থেকেছেন— কিন্তু কখনও খুব দীর্ঘকাল ধরে নয়। পাহাড় তাঁর ভালো লাগত, যেমন প্রকৃতির দৃশ্যপট সবই, কিন্তু পাহাড়ে রবীন্দ্রনাথ বেশিদিন একটানা থাকতে পারতেন না। পাহাড়ে যেন তাঁর দৃষ্টির প্রসার অবরুদ্ধ হত, তাঁর ভাবনার গতি ভঙ্গ হত। পাহাড়-দেশে আকাশের দিগন্ত পর্যন্ত উন্মুক্ত বিস্তার দুর্লভ বলেই বোধ করি রবীন্দ্রনাথের চিত্ত ক্লিষ্ট হত।

---

৮ যেমন বীথিকার 'ছায়াছবি' (চন্দননগরে লেখা, আষাঢ় ১৩৩২)—

প্রবল বরিষনে
পাংশু হল দিনের মুখ,
আকাশ যেন নিরুৎসুক;
নদীপারের নীলিমা ছায়
পাণ্ডু আবরণে।
কর্মদিন হারাল সীমা,
হারাল পরিমাণ,
বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া
উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়া
বিদ্যাপতি-রচিত সেই
ভরা-বাদর গান।

ছিলাম এই কুলায়ে বসি
আপন মন-গড়া;

হঠাৎ মনে পড়িল তবে
এখনি বুঝি সময় হবে,
ছাত্রীটিরে দিতে যে হবে পড়া।

স্তব্ধ আজি বাদল-বেলা
নদীতে নাহি ঢেউ—
অলসমনে বসিয়া আছি
ঘরেতে নেই কেউ।

তৃতীয় বার যে বাইরে যাওয়া ঘটল সে লম্বা পাড়ি। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ তখন আমেদাবাদে জজ। তিনি পিতার অনুমতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে নিয়ে চললেন সেখানে পড়িয়ে ব্যারিস্টার করে আনতে। সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী ও শিশুসন্তান-দুটি তখন বিলাতেই ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে আমেদাবাদে নিজের কাছে কয়েক মাস রাখলেন, তার পর বোম্বাইয়ে অল্প কিছুদিন। আমেদাবাদে জজের বাসা ছিল— শাজাহানের আমলের বাগানবাড়ি, সাবরমতী নদীর ঠিক উপরে। এই শাহিবাগের কথা রবীন্দ্রনাথ জীবন-স্মৃতিতে ভালো করেই বলেছেন। কলকাতায় ইস্কুলে পড়বার সময়েই রবীন্দ্রনাথ জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদাবলী পড়েছিলেন, আর মাস্টার-পণ্ডিতদের কাছে কুমারসম্ভব শকুন্তলা ইত্যাদি সংস্কৃত কাব্য-নাটক পড়েছিলেন। আমেদাবাদে এসে রবীন্দ্রনাথ যথেচ্ছ ইংরেজী বই ঘাঁটতে লাগলেন। সংস্কৃত-প্রকীর্ণ কবিতা ও উদ্‌ভট শ্লোকের সঙ্গেও এখানে তাঁর পরিচয়[৯] হল। তিনি লিখেছেন, মেজদাদার

> লাইব্রেরিতে আর-একখানি বই ছিল, সেটি ডাক্তার হেবর্লিন কর্তৃক সংকলিত শ্রীরামপুরের ছাপা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহগ্রন্থ। এই সংস্কৃত কবিতাগুলি বুঝিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের[১০] মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।

আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথ যতদিন ছিলেন ততদিন যেন কলকাতার ভাবের পরিমণ্ডলেই ছিলেন। বাইরের প্রভাব মনের মধ্যে নতুন রঙ ধরায় নি, কেবল বাড়িটি ছাড়া। শাহিবাগের বাদশাহী মর্মরপ্রাসাদে বাস তাঁর কল্পনাকে বেশ একটু নাড়া দিয়েছিল এবং আরব্য-উপন্যাসের রোমান্‌সের হাওয়া তাঁর মনকে ছুঁয়েছিল। বোধ করি এই রোমান্টিক পরিবেশের জন্য এইখানে থাকতেই রবীন্দ্রনাথ নিজের সুর লাগানো গান রচনা শুরু করেছিলেন—

> শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর-একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম।

আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথ যেন একাকী ছিলেন এবং নিজের মনে ভালোই ছিলেন। তার পর তাঁকে কিছুদিন বোম্বাইয়ে রাখা হয় বিলাতে গিয়ে সেখানকার সমাজের কায়দাকানুনে রপ্ত করাবার জন্যে। বোম্বাইয়ে সত্যেন্দ্রনাথের এক বন্ধু-পরিবারে থেকে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম নিঃসম্পর্কীয় মেয়েদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েছিলেন। একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য হয়েছিল। মেয়েটি ইংরেজীতে কিছু কবিতা লিখত। মেয়েটি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু তাঁর লাজুক স্বভাব ঘনিষ্ঠতা করতে দেয় নি। রবীন্দ্রনাথের লাজুকতা ও কুণ্ঠা অনেক সময়েই রক্ষা-কবচের কাজ করত। সৌজন্যে যে বাধা তিনি দিতে পারতেন না সে বাধা সংকোচ জুগিয়ে দিত। তবে ভিতরে ভিতরে একটু দুর্বলতাও সঞ্চিত হয়েছিল। সে হল বিরূপ

---

৯ রবীন্দ্রনাথের মতো সংস্কৃত প্রাচীন কবিতা ও উদ্‌ভট শ্লোকের ভালো সমঝদার সেকালের ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে ছিল না। প্রজাপতির-নির্বন্ধে ও অন্যত্র তার প্রমাণ মিলবে।

১০ তুলনা করুন, "তাহার পর আর-একবার ভালো করিয়া কিরণের দিকে তাকাইয়া দেখিল। দেখিল, সেই তন্বী এখন তো তন্বী নাই, কখন মোটা হইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউয়ের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমরুশতকের কবিতাগুলাও বনোয়ারির অন্য সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জন দেওয়া ভালো।"

সমালোচনায় অন্তরকে অবিচলিত রাখা। বাইরে অবশ্য তাঁর ধৈর্য সর্বদা অটুট থাকত। বোম্বাইয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশিদিন থাকেন নি। সেখান থেকে শীঘ্রই বিলাতে রওনা হলেন ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮। নানা কারণে বিলাতে যাবার আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের খুব বেশি ছিল না। শৈশবকাল থেকে নিঃসঙ্গ থাকার অভ্যাস হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ যেখানেই থাকতেন সেখানে তিনি নিজের মানসিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বাস করতেন, তাই অপরের সঙ্গ তাঁর খুব প্রয়োজন হত না। তবে তাঁর পরিমণ্ডলে বাইরের হাওয়ার সংস্পর্শ নিরুদ্ধ ছিল না। বোম্বাই বন্দরে জাহাজে ওঠবার সময় রবীন্দ্রনাথের মন যে বেশ প্রসন্ন ছিল না সে স্বীকৃতি তাঁর 'য়ুরোপপ্রবাসী বঙ্গীয় যুবকে'র পত্রাবলীর প্রথম চিঠির গোড়াতেই আছে।—

> আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তট-রেখা মিলিয়ে গেল। চারি দিকের লোকের কোলাহল সহিতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। গোপন করবার বিশেষ প্রয়োজন দেখছিনে, আমার মনটা বড়ই কেমন নির্জীব অবসন্ন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু দূর হোক্‌গে এসব করুণ রসাত্মক কথা লেখবার অবসরও নেই ইচ্ছেও নেই।

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রা পুরোপুরি জলপথে হয় নি। সুয়েজে জাহাজ থেকে নেমে রেলপথে আলেকজান্দ্রিয়া, সেখান থেকে আবার জলপথে ব্রিণ্ডিসি, সেখান থেকে রেলপথে ইটালী ও ফ্রান্স উত্তীর্ণ হয়ে ইংলণ্ডে পৌঁছনো। সুতরাং ইংলণ্ডে পৌঁছবার আগেই রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের চাক্ষুষ পরিচয় কিছু পেয়েছিলেন। তাতে তাঁর মনের অবসন্নতা দূর হয়েছিল, কিন্তু অপ্রসন্নতা ঘোচে নি। রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে পৌঁছলেন মনের অপ্রসন্নতা নিয়েই। তাই সেখানকার— প্রধানত লণ্ডনের— জন ও জীবনযাত্রা তাঁর প্রথমে মোটেই ভালো লাগে নি—

> ··মনে করেছিলেম, যেখানে যাই-না কেন, intellectual আমোদ নিয়েই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বুঝি উন্মত্ত; কিন্তু তাতে আমি ভারি নিরাশ হয়েছি। মেয়েরা বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে তেমনি চলছে, কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে যা-কিছু কোলাহল শোনা যায়। ·এখানে দ্বারে দ্বারে মদের দোকান। আমি রাস্তায় বেরোলে জুতোর দোকান, মাংসের দোকান, খেলনার দোকান রাশরাশ দেখতে পাই, কিন্তু বইয়ের দোকান দুটো দেখতে পাই নে— আমি তো একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমাদের একটি শেলীর কবিতা কেন্‌বার আবশ্যক হয়েছিল, কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে বইয়ের দোকান না দেখে একজন খেলনা-ওয়ালাকে সেই বই আনিয়ে দিতে হুকুম করতে হয়েছিল। আমি আগে জানতেম, এ দেশে একটা কসাইয়ের দোকান যেমন দরকারী একটা বইয়ের দোকানও তেমনি!
>
> ··এ দেশের ছোটলোকদের দেখলে মনে হয় না তাদের কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব আছে— তারা যেন পশু থেকে একধাপ উঁচু। তাদের মুখ দেখলে— নিদেন তাদের মধ্যে এক একজনের মুখ দেখলে আমার কেমন গা শিউরে ওঠে।··আর, তারা যে ময়লা তা আর কি বলব।
>
> —য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র, দ্বিতীয় পত্র

সুরূপ, সুঠাম, সুকণ্ঠ, সুরুচি, সুসামাজিক এবং সলজ্জ কিশোর রবীন্দ্রনাথ বিলাতে— লণ্ডনে ও ব্রাইটনে— মেয়েমহলে প্রথম থেকেই সমাদর পেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁর মন ভরে নি। সেখানকার জীবনস্রোতে যোগ দেবার বাধা ছিল দুটো। প্রথম, তাঁর বিবিক্ত ও মুখচোরা লাজুকভাব; দ্বিতীয়, বিলাতি

মেয়েদের শ্রীহীনতা, সাজসজ্জার কুশ্রীতা, আচরণে অশালীনতা এবং ব্যবহারে চটকদার মুখরতা। তাই বিলাতে গিয়ে কয়েকমাস পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ মেয়েসমাজে বেশ অস্বস্তিতে কাটিয়েছিলেন। যদি তাঁর মেজ-বৌদিদি ও তাঁর ছেলেমেয়ে তখন সেখানে না থাকত তা হলে বোধহয় রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গেই দেশে পালিয়ে আসতেন। তৃতীয় পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন —

> সত্যি কথা বলতে কী, আমার নাচের নেমন্তন্নগুলো বড়ো ভালো লাগে না। অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে ও রকম পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াতে আমার আদবে ভালো লাগে না। যাদের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ আছে তাদের সঙ্গে নাচতে আমার মন্দ লাগে না।· · আমি একবার একটি সুন্দরী partuer পেয়েছিলেম, তাঁর সঙ্গে না নাচতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেম। কিন্তু গৃহকর্ত্রী আমাকে বিশেষ করে নাচতে অনুরোধ করলে, পীড়াপীড়ির পর নাট্যশালায় অবতরণ করলেম— কোনো মতে নাচটা সমাপন করে দে ছুট! প্রথমে নাচের ঘরে ঢুকেই আমি একেবারে চমকে উঠেছিলেম। দেখি যে, শত শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যে আমাদের একটি ভারতবর্ষীয়া শ্যামাঙ্গিনী রয়েছেন। দেখেই তো আমার বুকটা একেবারে নেচে উঠেছিল। আমার তাকে এমন ভালো লাগল যে কি বলব!

বিলাতি সমাজে বৈঠকি আমোদপ্রমোদে ও আত্মীয়স্বজনদের অসংকোচ মেলামেশা রবীন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথম ও সব চেয়ে সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল করেছিল। দেশের জন্যে মন-কেমনের ভাব দূর হলে পর রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—

> মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়। আমরা অনেক জিনিস না দেখলে দূর থেকে কল্পনা করতে পারি নে, এমন-কি বিশ্বাস করতে পারি নে। এখেনে যতগুলি ভারতবর্ষীয় এয়েছেন, সর্বপ্রথমেই তাদের চোখে কি ঠেকেছে?— এখানকার সমাজের সুখ ও উন্নতি-সাধনে মহিলাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা। যাঁরা স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, এখেনে এসে নিশ্চয়ই তাঁদের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে।

বিলাতি সমাজের এই প্রশংসা ছাপা হওয়া থেকে ভারতীর পৃষ্ঠায় বড়ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ও ছোটভাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হল। রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠ পত্র— যাতে উপরে উদ্‌ধৃত অংশটি আছে তা যখন ভারতীতে ছাপা হল তখন দেখা গেল যে পাদটীকায় সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ মন্তব্য রয়েছে। পরবর্তী তিনটি চিঠিতেও সম্পাদকের মন্তব্য পাদটীকায় আকীর্ণ ছিল। বড়দাদার সঙ্গে এই তর্কাতর্কি রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম সাহিত্যিক মসীযুদ্ধ বলা যায়। নবীন ও প্রবীণ দুজনেই নিজের ভূমিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, দুজনেই ঠিক— এবং তাঁদের যে বিবাদ তার কোনো বাস্তব হেতু ছিল না। যে ভাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিলাতি সমাজের ভালোটুকু দেখেছেন ও প্রশংসা করেছেন তাতে হয়তো কিছু অতিভাষণ ছিল কিন্তু তাঁর বয়স বিবেচনা করলে তা খুব অন্যায় বোধ হবে না, আর দ্বিজেন্দ্রনাথও দেশী সমাজের পক্ষ যেভাবে সমর্থন করেছেন তাও খুব অন্যায্য নয়। উপরে রবীন্দ্রনাথের যে উক্তি উদ্‌ধৃত করেছি তার উত্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথের দীর্ঘ মন্তব্যের সারাংশ তাঁর কথাতেই উদ্‌ধৃত করছি।

> স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে অতি সাবধানে কথাবার্তা কহা উচিত।· · ইংলণ্ডের জলবায়ু স্বতন্ত্র, ইংলণ্ডের পুরাবৃত্ত স্বতন্ত্র, ইংলণ্ডের জনসমাজের রুচি স্বতন্ত্র;· ·অনতিপূর্বে বহুতর ইংলণ্ডীয় স্ত্রী সমারোহের

মধ্যে তিনি যখন একজনের মুখে দেশীয় স্ত্রীলোকোচিত মাধুর্য ও ভাবভঙ্গী অবলোকন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার কেন এত ভাব লাগিয়াছিল? তখন তো বহিশ্চারিণী বহুভাষিণী ব্যাপিকা সমাজ-রাজ্ঞী অপেক্ষা অন্তঃপুরচারিণী মৃদুভাষিণী লজ্জাশীলা গৃহলক্ষ্মীর সৌন্দর্য তাঁহার চক্ষে ভালো লাগিয়াছিল, এখন কি তাঁহার সেভাব অন্তর্হিত হইয়াছে? তাহা তো বোধ হয় না, তিনি একদিকে অধিক ঝোঁক দেওয়াতে লেখনীর বেগ ধারণ করিতে পারেন নাই, ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। শুধু কেবল স্বাধীনতা হইলেই যদি স্ত্রীলোকের আর কোনো গুণের প্রয়োজন না হইত তাহা হইলে আমরা লেখকের মতে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা তো নহে· ·

পরের চিঠির গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ আগেকার চিঠিতে সম্পাদকের নোটের উল্লেখ করে একটু খোঁচা দিয়েছিলেন, 'যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে তা সম্পাদকমহাশয়ের লেখনীর অযোগ্য'। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য: 'লেখকমহাশয় আমার মুখে কতকগুলো কথা গুঁজে দিয়েছেন, যা আমি একেবারেই বলিনি'। সম্পাদক এর উপর নোট দিলেন, 'যথার্থ যদি এরূপ হইয়া থাকে তবে সে কথা-গুলা লেখকের উচিত ছিল উদ্‌ধৃত করিয়া দেওয়া'।[১১]

আমার মনে হয়, এই তর্কাতর্কির ফলে রবীন্দ্রনাথের বিলাতবাসের অবসান ঘনিয়ে এসেছিল।

বিলাতবাসের ফলস্বরূপ একটি মহৎ লাভ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। দেড় বছর বিদেশ-বাসের সময়ে তিনি মেজদাদার শিশু-পুত্রকন্যার সঙ্গে বয়স্যভাবে মিশেছিলেন। তার ফলে তখনই তাঁর মনে বাৎসল্যপ্রীতি ও শৈশব-রসভাব অঙ্কুরিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শিশু-প্রীতির ও বাৎসল্যের প্রকাশ যত আগে হয়েছিল এমন আর কোনো কবির রচনায় দেখা গিয়েছে বলে জানি না।

দেড় বছর পূর্ণ হবার মুখে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন! পিতৃদেবের সঙ্গে প্রথম ভ্রমণের পর তবে বালক রবীন্দ্রনাথ অন্তঃপুরে স্থান পেয়েছিলেন, এবং বিদেশে ভ্রমণের পর এখন কিশোর তিনি সংসারে ও বিদ্বৎসমাজে স্থান পেলেন। রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে বিদেশী সংগীত শিখে এসেছেন। তাঁর লাজুকতার ভাবও অনেকটা কেটে গেছে। এখন বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিয়ে গানের ও অভিনয়ের রীতির পথ দেখালেন, বাংলায় গীতনাট্যের নতুন রূপ ও রস সৃষ্টি করলেন। বাল্মীকিপ্রতিভার উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রকাশ্যে দেখা দিলেন। তাঁর এই প্রথম দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কলকাতার জ্ঞানীগুণী প্রায় সবাই ছিলেন।

চেহারা কণ্ঠ ও সৌজন্য—এই দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর দর্শকদের মন প্রথমেই অনায়াসে হরণ করেছিলেন। তাঁর রচনা তখন সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের তুলনায় যতই উৎকৃষ্ট হোক, তার মূল্য নির্ণয় করবার তখনও দেরি ছিল। বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয়ের পর থেকে মাঝে মাঝে তাঁর ডাক পড়তে লাগল— প্রকাশ্য সভার প্রবন্ধ পড়বার জন্যে ও সেই সঙ্গে গান করবার জন্যে। সেখানে আসল আকর্ষণ ছিল তাঁর গানের।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার বিলাত গিয়েছিলেন ১৮৯০ সালে, কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নয় শুধু বেড়াবার জন্যে, আর

---

১১ নবীন-প্রবীণের এই মতদ্বৈধের সমাধানে কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই অগ্রসর হয়েছিলেন। বালক-পত্রিকায় (১২৯২ সালে) যে 'চিঠিপত্র' বার হয়েছিল তাতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই পিতামহ ও পৌত্রের ভূমিকা নিয়ে কলম ধরেছিলেন। —দ্র° রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড।

পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা ও আলাপের জন্যে; এবং কর্মাঞ্চল ইউরোপের নাড়ী টিপে সে দেশের রোগ-অরোগ নির্ণয় করতে। এবারেও সঙ্গে ছিলেন মেজদা, অধিকন্তু ছিলেন প্রথম-বিলাত-বাসের বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত। এ ভ্রমণ অতিশয় অল্পকালের। ২০ সেপ্টেম্বর তাঁর জাহাজ বোম্বাই ছেড়েছিল, ৪ নভেম্বর তাঁর জাহাজ বোম্বাইয়ে তাঁকে নামিয়ে দিয়েছিল। এবারেও রবীন্দ্রনাথ ব্রিণ্ডিসি হয়ে স্থলপথে ইউরোপের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। তবে পথে দু-চার দিন প্যারিসে কাটিয়েছিলেন। লণ্ডনে পৌঁছেই তাঁর পরিচিত বাড়িতে পুরানো বন্ধুদের খোঁজ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা ইতিমধ্যে কে কোথায় ছিটকে পড়েছেন তা কেউ জানে না। তাঁদের দেখা না পেয়ে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে আর তিষ্ঠতে পারলেন না। দাদা ও বন্ধু সেখানে রইলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরবার জন্যে জাহাজে চড়লেন। এই ক্ষণভ্রমণের তিনি ডায়েরি রেখেছিলেন। তার থেকে বিদেশে এই ক্ষণভ্রমণে তাঁর বিশেষ প্রতিক্রিয়া কিরকম হয়েছিল তার সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি।

যাবার পথে এডেন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বন্ধুর সঙ্গে ডেকে শুয়ে বসে আলাপ আলোচনায় জাহাজে দিনগুলি কাটিয়েছিলেন।

> জাহাজে আমরা দীর্ঘদিন দুজনে মুখোমুখি চৌকি টেনে বসে পরস্পরের স্বভাব চরিত্র জীবনবৃত্তান্ত এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল সত্তা সম্বন্ধে যার যা-কিছু বক্তব্য ছিল সমস্ত নিঃশেষ করে ফেলেছি। আমার বন্ধু চুরোটের ধোঁয়া এবং বিবিধ উড্ডীয়মান কল্পনা একত্র মিশিয়ে সমস্তদিন অপূর্ব ধূম্রলোক সৃজন করেছেন।
>
> ··বাহ্য আকৃতি থেকে আমাদের দুটিকে দিবসের পেচকের মতো যতটা আধ্যাত্মিক দেখায়, আমাদের আলোচনাতে সকল সময়ে ততটা সাত্ত্বিক সৌরভ থাকে না। সকলের জানা উচিত যদিচ আমরা ভারতসন্তান কিন্তু তবু আমাদের বয়স এখনও ত্রিশ পেরোয় নি। এখনও আমাদের সন্ন্যাসাশ্রমের সময় আছে।··মনের মধ্যে এখনো কিঞ্চিৎ উত্তাপ আছে। এই জন্যে আমরা দুই যুবক গতকল্য রাত্রি দুটো পর্যন্ত কেবল ষড়্‌চক্র-ভেদ, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ত্রিগুণাত্মিকা-শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা না করে সৌন্দর্য প্রেম এবং নারীজাতির পরম কমনীয়তা সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করছিলুম।

বন্ধুর মানসিক প্রকৃতি কেমন তা রবীন্দ্রনাথ কৌতুকচ্ছলে বলেছেন—

> ··এক দিকে তাঁর যেমন কাব্যাকাশে উধাও হয়ে ওড়বার উদ্যম, অন্য দিকে তেমনি তন্ন তন্ন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের··প্রবৃত্তিটা অধিকাংশ সময়েই তাঁর চুরোটের পশ্চাতে ব্যাপৃত থাকে।

এডেন থেকে রবীন্দ্রনাথেরা বড় জাহাজে উঠলেন। সে জাহাজে নানা বয়সের যাত্রী বিস্তর এবং নাচগান প্রমোদের আয়োজনও প্রচুর ছিল। এ জাহাজে কয় দিন থেকে রবীন্দ্রনাথের কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ১০ সেপ্টেম্বর লণ্ডনে পৌঁছেছিলেন, মাস পূর্ণ হবার আগেই ৬ অক্টোবর তিনি দেশে ফেরবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হলেন। এ উৎকণ্ঠা মন-কেমন নয়, এ হল মনোভঙ্গ ও চিত্তবিভ্রান্তিজনিত শ্রান্তি। ডায়েরিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

> ··আমি আর এখানে পেরে উঠছি নে। বলতে লজ্জা বোধ হয়, আমার এখানে ভালো লাগছে না। সেটা গর্বের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়— সেটা আমার স্বভাবের ত্রুটি।

কিন্তু পরেই তিনি যে কথা লিখেছেন তাতে 'স্বভাবের দোষ' বলতে কি মনে করেছিলেন তা বুঝতে পারি।

> ··য়ুরোপের যে ভাবটা আমাদের মনে জাজল্যমান হয়ে উঠেছে, সেটা সেখানকার সাহিত্য প'ড়ে।

অতএব সেটা হচ্ছে 'আইডিয়াল' য়ুরোপ। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ না করলে সেটা প্রত্যক্ষ করবার যো নেই। তিন মাস, ছ মাস কিম্বা ছ বৎসর এখানে থেকে আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার কেবল হাত-পা নাড়া দেখতে পাই মাত্র।··সে যতই বিচিত্র যতই আশ্চর্য হোক্-না কেন, তাতে দর্শককে শ্রান্তি দেয়।··

··এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি : সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা করতে পারি, সহজে ভালোবাসতে পারি। যেখানে আসল মানুষটি আছে সেখানে যদি অবাধে যেতে পারতুম, তা হলে আপনার স্বজাতীয়কে দেখে এ স্থানকে আর প্রবাস বলে মনে হত না। কিন্তু তোমাদের সাহিত্যের মধ্যে যাদের সঙ্গে প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয় তোমাদের সমাজের মধ্যে তাদের দর্শন পাওয়া দুর্লভ।

বিলাতে সমাজের পুটক ভেদ করে মানুষের অন্তরের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ এবারে রবীন্দ্রনাথ পান নি। তার কারণ শুধু সময়ের অল্পতাই নয়, তখন তাঁর মনের বিশেষ ভাব। দেশের রাষ্ট্রিয় অবস্থা তখন রবীন্দ্রনাথের মনকে ভারাক্রান্ত করেছিল ; শুধু তাই নয়, দেশের শিক্ষিত সমাজের রিঅ্যাক্‌শনারি মনোভাব— যেমন এজ অব কন্‌সেণ্ট বিলের বিরুদ্ধাচরণ— তাঁকে আশঙ্কিত করেছিল। ইংরেজকে তখন তিনি ভারতবর্ষের শাসক, এবং সহানুভূতিশীল শাসক, বলেই দেখছেন- -বাইরে থেকে। য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারির প্রথম খণ্ডে (অর্থাৎ ভূমিকায়) তাঁর সে সময়ের এ মনোভাবের ও চিন্তাধারার বিশ্লেষণ রয়েছে। একদিকে মূঢ়তা নিরুদ্যম ও বাগাড়ম্বর স্তূপ হয়ে জমে উঠেছে অপর দিকে 'গোরাদের মোটা মোটা মুষ্টি, প্রচণ্ড দাপট এবং নিষ্ঠুর অসহিষ্ণুতা' বেড়ে চলেছে— এই দেখে রবীন্দ্রনাথ তখন ভাবনায় পড়েছিলেন।

আমরা কার সঙ্গে যুদ্ধ করব ? রূঢ় মানবপ্রকৃতির চিরন্তন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে! যীশুখৃষ্টের পবিত্র শোণিতস্রোত যে অনুর্বর কাঠিন্যকে আজও কোমল করতে পারে নি সেই পাষাণের সঙ্গে! প্রবলতা চিরদিন দুর্বলতার প্রতি নির্মম, আমরা সেই আদিম পশুপ্রকৃতিকে কী করে জয় করব ? সভা ক'রে ? দরখাস্ত ক'রে ? আজ একটু ভিক্ষা পেয়ে কাল একটা তাড়া খেয়ে ? তা কখনোই হবে না।

তবে, প্রবলের সমান প্রবল হয়ে ? তা হতে পারে বটে। কিন্তু যখন ভেবে দেখি, য়ুরোপ কতখানি প্রবল, কত দিকে প্রবল, কত কারণে প্রবল— যখন এই দুর্দান্ত শক্তিকে একবার কায়মনে সর্বতোভাবে অনুভব করে দেখি তখন কি আর আশা হয় ? তখন মনে হয়, এসো ভাই, সহিষ্ণু হয়ে থাকি এবং ভালোবাসি।[১২] পৃথিবীতে যতটুকু কাজ করি তা যেন সত্যসত্যই করি।·· অক্ষমতার প্রধান বিপদ এই যে, সে বৃহৎ কাজ করতে পারে না বলে বৃহৎ কাজের ভাণকে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে। জানে না যে, মনুষ্যত্বলাভের পক্ষে বড়ো মিথ্যার চেয়ে ছোটো সত্য ঢের বেশি মূল্যবান।

আমরা প্রাচীন সভ্যজাতি, আমাদের অতীতের চিন্তা ও কর্ম একদা মহৎ ফল প্রসব করেছিল। সে ফলের ভালো মন্দ দুইই আমরা বর্তমানকালেও ভোগ করে চলেছি। সে ফলের বীজ নিয়ে আমরা নতুন

১২ অর্থাৎ পরস্পরকে সহ্য করে ভালোবাসি এবং সেই ভালোবাসাতে আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ হই। ১৮৯১ সালে উচ্চারিত এই কথার দাম কি আমরা এখনও বুঝতে পেরেছি ?

আবাদ করে নতুন ঋতুর টাটকা ফসল আদায় করব, সেদিকে আমাদের হুঁশই নেই। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

> এখানে ছেলেমেয়েরা সারাদিন খেলা করে কিন্তু জানে না তা খেলা, এবং বয়স্ক লোকেরা নিশিদিন স্বপ্ন দেখে কিন্তু মনে করে তা কর্ম।· · আবশ্যক এবং অনাবশ্যক, ব্রহ্ম এবং মৃৎপুত্তল, ছিন্নমূল শুষ্ক অতীত এবং উদ্ভিন্নকিশলয় জীবন্ত বর্তমান সমান সমাদর লাভ করেছে।

আমাদের জীবন জালজঞ্জালে অচল হয়ে পড়েছে বলেই ভাবনা। চলার শেষ হলেই জড়ত্বের ধ্বংসের শুরু। 'হয় অবিশ্রাম চল এবং জীবনচর্চা কর, নয় বিশ্রাম কর এবং বিলুপ্ত হও— পৃথিবীর এইরকম নিয়ম'।

জীবন যেখানে অত্যন্ত সবল সেই ইউরোপে গিয়ে সে জীবনের পরিচয় নিতে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা করেছিলেন। তিনি কিছু শিখতে, কিছু আদায় করতে যান নি। তবে সে জীবনের যতটুকু পরিচয় তিনি মনে ধরে নিয়ে এলেন তা তাঁর খুব কাম্য বোধ হল না। তাঁর মনে হল, প্রচণ্ড জীবন চেষ্টা সত্ত্বেও 'য়ুরোপীয় সভ্যতা হয়তো বা তলে তলে জড়ত্বের এক প্রকাণ্ড মরুভূমি সৃজন করবে'।

> নতুবা যে সভ্যতা পরিবারবন্ধনের অনুকূল, সে সভ্যতার মধ্যে কি নাইহিলিজ্‌ম্‌-নামক অতবড়ো একটা সর্বসংহারক হিংস্র প্রবৃত্তির জন্মলাভ সম্ভব হয়? সোশ্যালিজ্‌ম্‌, কম্যুনিজ্‌ম্‌ কি কখনো পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নী পুত্রকলত্রের মধ্যে এসে প'ড়ে নখদন্ত বিকাশ করতে পারে?

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন তা অত্যন্ত মূল্যবান। এখনকার দিনে যাঁরা সহজপ্রাপ্ত স্বাধীনতার গরবে ইংরেজিকে উড়িয়ে দিতে অত্যুৎসাহী তাঁরা রবীন্দ্রনাথের এই কথা যেন ভেবে দেখেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বহিরাগত বলেই ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

> সৌভাগ্যক্রমে আমরা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছি তাও আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগত নয়। এই জন্যে আশা করছি এই নূতন শক্তির সমাগমে আমাদের বহুকালের একভাবাপন্ন জড়ত্ব পরিহার করতে পারব,· · আমাদের মানসিক রাজ্য সুদূরবিস্তৃতি লাভ করতে পারব।

এবারে বিলাত থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাঠক-শ্রোতাদের কাছে আরও সংকোচমুক্ত হলেন এবং তাঁর ব্যক্ত ও অব্যক্তবাক্‌ নিন্দুকদের সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা— অবশ্য কিছু ঘুরিয়ে— বলতে সাহস পেলেন:

> অল্পদিন হল আমার কোনো লেখা যদি আমার দুরদৃষ্টক্রমে কারো অবিকল মনের মতো না হত তিনি বলতেন আমি তরুণ, আমি কিশোর, এখনো আমার মতের পাক ধরে নি। আমার এই তরুণ বয়সের কথা আমাকে এতকাল ধরে এতবার শুনতে হয়েছে যে শুনতে শুনতে আমার মনে এই একটা সংস্কার অজ্ঞাতসারে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, এই বাংলাদেশের অধিকাংশ ছেলেই বয়স সম্বন্ধে প্রতিবৎসর নিয়মিত ডবল প্রোমোশন পেয়ে থাকে, কেবল আমিই পাঁচজনের পাকচক্রে কিম্বা নিজের অক্ষমতা-বশতঃ কিছুতেই কিশোরকাল উত্তীর্ণ হতে পারলুম না।
>
> এই তো গেল পূর্বের কথা। আবার সম্প্রতি যদি আমার স্বভাব-বশতঃ আমার কোনো রচনায় আমি এমন একটা বিষম অপরাধ করে বসি যাতে করে কারও সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য হয়ে পড়ে তা হলে তিনি বলেন আমি সম্পদের ক্রোড়ে লালিত পালিত, দরিদ্র ধরাধামের অবস্থা কিছুই অবগত নই।

আমার সম্বন্ধে এই প্রকারের অনেকগুলো কিম্বদন্তি প্রচলিত থাকাতে আমি সাধারণের সমক্ষে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত ভাবেই আছি। এই জন্য উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করে অসংকোচে উপদেশ দেবার চেষ্টা আমার মনে উদয় হয় না।

এর আগে রবীন্দ্রনাথ কখনও সাধারণ পাঠক-শ্রোতার সঙ্গে নিজের মতবিরোধের উল্লেখ প্রকাশ্যে করেন নি। যে রচনায় এ অংশ আছে (য়ুরোপযাত্রীর ডায়াবির ভূমিকা) তা প্রথমে চৈতন্য লাইব্রেরির এক বিশেষ অধিবেশনে তিনি পড়েছিলেন।

আনন্দবর্ধন ও রসপ্রস্থান

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

১

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণতঃ ভরতাচার্যের 'রস-প্রস্থান' (Rasa School) এবং আচার্য আনন্দবর্ধন প্রবর্তিত 'ধ্বনি-প্রস্থান' (Dhvani School)— এই দুটিকে পৃথক্‌ভাবে বিচার করা হইয়া থাকে। ইহাতে সাধারণ পাঠকসমাজের হৃদয়ে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয় যে, ভরতমুনি প্রবর্তিত কাব্যনয়ের সহিত আচার্য আনন্দবর্ধন প্রবর্তিত ধ্বনিবাদের বোধ হয় মৌলিক কোনও বিরোধ আছে। কিন্তু এই ধারণা যে নিতান্তই ভিত্তিহীন এবং ভ্রান্ত, তাহা ভরতমুনির মতবাদের সহিত ধ্বনিকারের সমীক্ষার তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা অতি সহজে প্রতিপাদন করিতে পারা যায়। এমনকি, আমরা এপর্যন্তও বলিতে পারি যে এই দুই আচার্যের মতবাদের মধ্যে কোনও মৌলিক বিরোধ তো নাই-ই, বরং আচার্য আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদ ভরতমুনির রসবিষয়ক সিদ্ধান্তেরই পরিপূরক। ধ্বনিকারের আবির্ভাবের ফলে কবিকর্মের সহিত রসতত্ত্বের যে নিগূঢ়, ব্যাপক এবং সার্বভৌম সম্বন্ধ বর্তমান, তাহা আমরা যেরূপ অভ্রান্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহা অন্যথা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। রসপ্রস্থানের সুপরিশীলিত বিচারের পক্ষে আচার্য আনন্দবর্ধনের সমীক্ষার মূল্য যে কতখানি, তাহা বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করাই বর্তমান আলোচনার প্রধান লক্ষ্য।

২

'নাট্যশাস্ত্রে'র ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় যথাক্রমে রসাধ্যায় ও ভাবাধ্যায় নামে পরিচিত। ভরতমুনি এই অধ্যায়-দ্বয়েই প্রধানত রস ও ভাবের স্বরূপ বিচার করিয়াছেন। ষষ্ঠাধ্যায়ের অন্তর্গত 'বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ'— এই প্রসিদ্ধ রসসূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই ভাষ্যকার অভিনবগুপ্তপাদাচার্য রসের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্পর্কে পূর্বাচার্যগণের বিভিন্ন মতবাদ উপস্থাপন করিয়া আপনার অভিব্যক্তিবাদের ভূমিকা রচনা করিয়াছেন। অতএব ভরতের 'রসসূত্র'ই পরবর্তীকালে রসতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় যাবতীয় আলোচনার মূল উৎস স্বরূপ— ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ষট্‌ত্রিংশদধ্যায়াত্মক সুবিশাল ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের বিস্তৃত পরিধির মধ্যে রসবিষয়ক আলোচনা অপেক্ষাকৃত স্বল্প স্থানই অধিকার করিয়া আছে বলিতে হইবে। ভরতাচার্য স্বয়ং ষষ্ঠাধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত কারিকাগুলিতে নাট্যবেদ সম্পর্কিত আলোচনার আনন্ত্য ব্যাপকতা ও গহনতা সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন—

> ন শক্যমস্য নাট্যস্য গন্তুমন্তং কথঞ্চন।
> কস্মাদ্ বহুত্বাজ্‌জ্ঞানানাং শিল্পানাং বাপ্যনন্ততঃ॥
> একস্যাপি নবৈ শক্যস্তন্তো জ্ঞানার্ণবস্য হি।
> গন্তুং কিং পুনরন্যেষাং জ্ঞানানামর্থতত্ত্বতঃ॥
> কিন্ত্বল্পসূত্রগ্রন্থার্থমনুমানপ্রসাধকম্।
> নাট্যস্যাস্য প্রবক্ষ্যামি রসভাবাদিসংগ্রহম॥

বিস্তরেণোপদিষ্টানামর্থানাং সূত্রভাষ্যয়োঃ।
নিবন্ধো যঃ সমাসেন সংগ্রহং তং বিদুর্বুধাঃ॥
রসা ভাবা হ্যভিনয়াঃ ধর্মী বৃত্তিপ্রবৃত্তয়ঃ।
সিদ্ধিঃ স্বরাস্তথাতোদ্যং গানং রঙ্গশ্চ সংগ্রহঃ॥[১]

অতএব মুনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, নাট্যবেদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহাকে অভিনয়, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, স্বর, আতোদ্য, গান, রঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি রস ও ভাব সম্পর্কেও আলোচনা করিতে হইয়াছে— কিন্তু তাহা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত 'সংগ্রহ' আকারে। সুতরাং অধ্যাপক কাণে যথার্থই বলিয়াছেন— "Even in Bharata's Nāṭyaśāstra, *rasa* is not the principal subject treated of, but it is dealt with therein because of its relation to dramatic representation." [১ক]

কিন্তু অলংকারশাস্ত্রের পরবর্তী ইতিহাসে রসতত্ত্বের আলোচনা কেবল দৃশ্যকাব্যের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই— 'নাট্য-রসে'র ন্যায় 'কাব্য-রস'ও সমানভাবেই প্রাধান্য অর্জন করিয়াছে। আনন্দবর্ধন স্বভাবতই কাব্যের ক্ষেত্রে রসতত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভরতাচার্যের নাট্যরসবিষয়ক সিদ্ধান্তের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন— এবিষয়ে কোনও বৈমত্য থাকিতে পারে না। ধ্বনিকার স্বয়ং ভরতমুনি-প্রণীত শাস্ত্রের নিকট তাঁহার ঋণ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

এতচ্চ রসাদিতাৎপর্যেণ কাব্যনিবন্ধনং ভরতাদাবপি
সুপ্রসিদ্ধমেব।[২]

এই প্রসঙ্গে আমরা ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য বলিয়া মনে করি—

The Dhvanikāra, however, in his exposition of *rasa-dhvani*, seems to have been greatly influenced by the dramaturgic Rasa School. Bharata declared that the business of the drama was to evolve one or more of the eight Rasas ; and therefore a more or less elaborate psychology of human sentiments had been analysed in the service of the dramatic art. Bharata's ideas on these psychological processes and on Rasa, which is the final internal experience consisting in the consciousness of a

১ দ্র° K. M. Varma : *Seven Words in Bharata* : *What Do They Signify* (Orient Longmans, 1958).

১ক Mm. Dr. P. V. Kane : *History of Sanskrit Poetics*, p. 341. (Edn. 1951). অপি চ "....In the *Nāṭyaśāstra* the largest portion is devoted to matters specially concerning the dramatist and the actor, while the analysis of the emotional effect desired to be produced and actually produced on the audience is dealt with mainly in chapters 6 and 7. It may be noted here that according to the *Kāvyamīmāṁsā* p. 1 Bharata dealt with *rūpakas* and Nandikeśvara with *rasas*. But the present Nāṭyaśāstra deals with both these subjects and no ancient work of Nandikeśvara on *rasa* has come down to us."— ঐ. পৃ. ৩৪২।

২ দ্র° ধ্বন্যালোক, ৩. ৩৩ (বৃত্তি)। কাশী সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

certain objective condition of the ego, were elaborated by his commentators and followers till the Dhvanikāra, followed by Ānandavardhana and Abhinavagupta, came into the field. From the earlier drama and dramatic theory, therefore, the idea of Rasa was taken over to poetry and poetic theory ; and as the transition from the naïve to the sentimental poetry was accomplished, the theorists went a step further and erected Rasa into one of its essential aesthetic foundations......In other words, what was already well established in the drama by Bharata and others thus found its way into poetry, profoundly modifying, as it did, the entire conception of Kāvya.... [৩]

কিন্তু ভরতমুনির নিকট আনন্দবর্ধনাচার্যের ঋণ স্বীকার করিয়া লইলেও কবিকর্মের সহিত রসতত্ত্বের যে অঙ্গাঙ্গিভাব সম্পর্ক বর্তমান, সেই মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটিকে ভিত্তি করিয়া কাব্যবিচারের একটি ব্যাপক, সুপরিকল্পিত এবং সামগ্রিক শৈলী নির্ধারণ করিবার কৃতিত্ব একমাত্র আনন্দবর্ধনাচার্যেরই প্রাপ্য। একমাত্র তিনিই প্রথম রসতত্ত্বকে শুদ্ধমাত্র দৃশ্যকাব্যে নহে, পরন্তু দৃশ্য-শ্রব্য নির্বিশেষে সর্ববিধ কবিকর্মের কেন্দ্রমূলে যেমন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেইরূপ সেই কেন্দ্রীয় রসতত্ত্বের ভিত্তিতে কবিকর্ম-সম্পর্কিত যাবতীয় উপাদান 'কাব্যলক্ষণ' শাস্ত্রে প্রচলিত আছে, সে-সকলের নূতনভাবে তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে অভিনব মূল্য নিরূপণের প্রাথমিক কৃতিত্ব ও গৌরবও তাঁহারই প্রাপ্য। এইভাবে একদিকে তিনি যেমন ভরতাচার্যেরই বিশ্বস্ত অনুগামী, অন্যদিকে তিনি অভিনব কাব্যবিচারশৈলীরও প্রবর্তক। সুতরাং অধ্যাপক কাণে যে বলিয়াছেন—"The *dhvani* theory is only an extension of the *rasa* theory" [৪]—ইহা যেমন সত্য, অনুরূপভাবে সত্য তাঁহার অপর এক উক্তি—"The relation of *rasas* to poetry in general was not systematically dealt with till the Dhvanyāloka was composed." [৫]

আমরা এক্ষণে অধ্যাপক কাণের শেষোক্ত উক্তিটির যাথার্থ্য বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব।

৩

ভরতমুনি তাঁহার 'নাট্যশাস্ত্রে' সর্বকালীন ও সর্বজনীন সাহিত্যের মূল্য নিরূপণের একটি শাশ্বত মানদণ্ড নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—"ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে।" তিনি বলিয়াছিলেন—

যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ ॥

রসই যে কাব্যের বীজ কবির কাব্যসৃষ্টির দিক হইতে, এবং সহৃদয়ের আস্বাদনের দিক্ হইতে রসই যে কাব্যের ফল—এই চিরন্তন সত্যের ধীর গম্ভীর ঘোষণা নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সর্বত্র সুপরিস্ফুট। অবশ্য ভরতের রসসিদ্ধান্ত প্রধানতঃ অভিনেয় বা দৃশ্য কাব্যের প্রসঙ্গেই অবতারিত হইয়াছিল। কিন্তু 'দশরূপক' তো

৩ Dr. Sushil Kumar De : *Some Problems of Sanskrit Poetics*, p. 189 (Calcutta, 1959).

৪ P. V. Kane : *HSP.*, p. 369.

৫ ঐ, p. 341.

সর্ববিধ সাহিত্য কর্মের সারভূত বলিয়াই মনীষিগণ কর্তৃক স্বীকৃত।[৬] সুতরাং 'দশরূপক' বা দৃশ্যকাব্যসম্পর্কে ভরতমুনির যে-সকল মৌল সিদ্ধান্ত, সেগুলি সামান্যতঃ সর্ববিধ বাঙ্ময়াত্মক কবিকর্ম সম্বন্ধেই অবিকৃতভাবে প্রযোজ্য হওয়াই সঙ্গত। আচার্য আনন্দবর্ধনই দৃশ্য-শ্রব্য নির্বিশেষে সর্ববিধ কবিকর্মে রসের এই সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য অবিকম্পিত কণ্ঠে সর্বপ্রথম উদ্ঘোষিত করেন। প্রথমোদ্দ্যোতের পঞ্চম কারিকায় ধ্বনিকার বলিতেছেন—

কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥

তৃতীয়োদ্দ্যোতে বৃত্তিগ্রন্থে আনন্দবর্ধন স্পষ্টতই বলিয়াছেন—

ইদানীন্তনানাং তু ন্যায্যে কাব্যনয়ব্যবস্থাপনে ক্রিয়মাণে নাস্ত্যেব
ধ্বনিব্যতিরিক্তঃ কাব্যপ্রকারঃ। যতঃ পরিপাকবতাং কবীনাং রসাদি-
তাৎপর্য বিরহে ব্যাপার এব ন শোভতে।

পরিণতপ্রজ্ঞ কবিগণ একমাত্র রসাদিপ্রধান কাব্যসৃষ্টিতেই আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখেন। কিন্তু সকলেই তো আর বাল্মীকি, ব্যাস বা কালিদাস নহেন।[৭] তাঁহারা আপন আপন ব্যুৎপত্তি, শিল্পকৌশল, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রভৃতি প্রকাশ করিবার জন্য কাব্যসৃষ্টির সেই পরম-রহস্যভূত রসতত্ত্ব হইতে আপনাদের দৃষ্টি অন্যত্র সংক্রামিত করিয়া থাকেন। তখন তাঁহাদের লেখনী হইতে যে প্রবন্ধ নির্গত হয়, তাহার মধ্যে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের বিচিত্র নিদর্শন ইতস্ততঃ বিরাজমান থাকিলেও, সেই আত্মভূত রসের অস্তিত্ব কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। আনন্দবর্ধন এই বিষয়ে সম্যক্‌ভাবে অবহিত ছিলেন। তাই তৃতীয়োদ্দ্যোতে বৃত্তিগ্রন্থের এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন—

দৃশ্যন্তে চ কবয়োঽলঙ্কারনিবন্ধনৈকরসা অনপেক্ষিতরসাঃ
প্রবন্ধেষু।

৪

এইভাবে দেখিতে পাই যে আনন্দবর্ধন সাহিত্যসমালোচনাক্ষেত্রে একটি গুরুতর সমস্যার সমাধানকল্পে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। একদিকে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্যের আপাতবিভিন্নতার অন্তরালে একটি সমন্বয়াত্মক সূত্র আবিষ্কারের জন্য তিনি যেমন উন্মুখ ছিলেন, অপরদিকে সেইরূপ কাব্য-সৌন্দর্যের মূল নিদান আবিষ্কারকরতঃ পূর্বাচার্যগণ-কর্তৃক প্রবর্তিত 'প্রসিদ্ধপ্রস্থান'-সম্মত কাব্যবিচারের পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তসমূহকে খণ্ডন করিয়া সর্ববিধ কবিকর্মের সামান্যলক্ষণ নির্দেশ ও অনন্ত বৈচিত্র্যশালী কবিকর্মের অনুভবসিদ্ধ উৎকর্ষ ও অপকর্ষের কারণ নিরূপণ দ্বারা একটি যুক্তিসিদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ (classification) প্রবর্তনও তাঁহার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দুরূহ কর্তব্য সাধনকল্পে তিনি কতকগুলি সিদ্ধান্ত axiom বা স্বতঃসিদ্ধরূপে মানিয়া লইয়াছিলেন। প্রথমেই কাব্যসৃষ্টির অব্যভিচারী হেতুরূপে তিনি 'প্রতিভা'র (Poetic Intuition) উল্লেখ করিয়াছেন। মহাকবিগণের এই 'অলোকসামান্য

---

৬ দ্র° 'সন্দর্ভেষু দশরূপকং শ্রেয়ঃ।'— বামনাচার্য্য : কাব্যালংকারসূত্র ১. ৩. ৩০

৭ "ন হি সর্বো বাল্মীকির্ব্যাসঃ কালিদাসো ভট্টেরাজো বা"— অভিনবগুপ্ত।

প্রতিভাবিশেষই সকল কাব্যসৃষ্টির আদিনিদান। এই প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ কি? 'অপূর্ববস্তুনির্মাণ-ক্ষমত্ব' যেমন ইহার লক্ষণ, সেইরূপ 'রসাবেশ-বৈশদ্য'ও তুল্যরূপে ইহার অসাধারণ লক্ষণ। কবিদৃষ্টি যেমন 'অপূর্ববস্তুদর্শনক্ষমা', তেমনই 'নব-রসাস্বাদনসমর্থা'। সেইজন্যই আনন্দবর্ধনাচার্য স্বরচিত একটি শ্লোকে কবিদৃষ্টির স্বরূপবর্ণনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা দৃষ্টি।

আনন্দবর্ধনাচার্যের প্রতিভার এই লক্ষণের সহিত মহাকবি রাজশেখরের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটির ঘনিষ্ঠ সাজাত্য লক্ষণীয়—

আদ্যঃ কন্দো বেদবিদ্যালতানাং
জৈহ্বং চক্ষুর্নির্নিমেষং কবীনাম্।
যো যেনার্থী তস্য তৎ প্রক্ষরন্তী
বাঙ্‌মূর্তির্মে দেবতা সন্নিধত্তাম্॥[৮]

সুতরাং 'রসাবেশ-বিবশতা'ও কবিপ্রতিভার স্বরূপলক্ষণ। এবং প্রতিভা ব্যতিরেকে যখন কাব্যসৃষ্টি অসম্ভব বা অকিঞ্চিৎকর[৯], তখন ইহা যুক্তিসিদ্ধ যে সর্বজাতীয় কাব্যের মূল প্রেরণা কবিচিত্তের রসতন্ময়ীভবন। এখন আমরা বুঝিতে পারিব প্রতিভাসম্বন্ধীয় আনন্দবর্ধনের এই সিদ্ধান্তের সহিত ভরতমুনির—'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে'—এই সিদ্ধান্তের নিগূঢ় যোগ কোথায়। কবিকর্ম রসপরিপূর্ণ কবিচিত্তেরই 'পরীবাহ' স্বরূপ— 'যাবৎ পূর্ণো ন চৈতেন তাবন্নৈবমত্যমুম্'। রামায়ণী কথা মহর্ষি বাল্মীকির শোকাবেশ-বিবশ হৃদয়েরই উচ্ছলনমাত্র— ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে: রস-সম্বন্ধে ভরতমুনির সিদ্ধান্তের সহিত ধ্বনিকারের দৃষ্টিভঙ্গীর যখন এইরূপ ঘনিষ্ঠ সাজাত্য বর্তমান, তখন ধ্বনিপ্রস্থানকে রসপ্রস্থান হইতে পৃথক্‌রূপে গণনা করার হেতু কি? সত্য বটে, রসের প্রাধান্য বিষয়ে ধ্বনিকার রসপ্রস্থানের পরমাচার্য ভরতমুনিরই অনুগামী। তথাপি, এইটুকুই ধ্বনিকারের যথেষ্ট পরিচয় নয়। কেননা, ভরতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠাধ্যায়স্থ 'রসসূত্রে'—"বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ"— এই উক্তির দ্বারা 'রসনিষ্পত্তির' যে পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বৈমত্যের বহু অবকাশ আছে। এবং এই রসসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য ভরতমুনির কিরূপ অভিপ্রেত ছিল, তাহা আমাদের নিকট বর্তমানে দুর্জ্ঞেয়। আমরা কেবল পরবর্তী লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যান হইতে ঐ সূত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের কথঞ্চিৎ অনুধাবন করিতে পারি মাত্র। কিন্তু বিভিন্ন ভাষ্যকারের পরস্পরবিরোধী বিচারশৈলী সাধারণ জিজ্ঞাসু পাঠককে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। এই প্রসঙ্গে চিরন্তন আলঙ্কারিক উদ্ভটের একটি উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি তাঁহার

৮ রাজশেখর-কৃত 'প্রচণ্ড-পাণ্ডব' নাটক: ১ম অঙ্ক, তৃতীয় শ্লোক।

৯ তু° "শক্তিঃ কবিত্ববীজরূপঃ সংস্কার বিশেষ; যাং বিনা কাব্যং ন প্রসরেৎ, প্রসৃতং বা উপহসনীয়ং স্যাৎ।"— কাব্যপ্রকাশ: ১ম উল্লাস, ৩য় কারিকা-বৃত্তি।

'ভামহ-বিবরণ' নামক লুপ্ত নিবন্ধে রস সম্বন্ধে বলিয়াছেন— 'পঞ্চরূপা রসাঃ।' কিন্তু রসের এই পঞ্চরূপত্ব কিরূপ? তাহার উত্তর আমরা উদ্ভটেরই 'কাব্যালংকারসারসংগ্রহ' নামক গ্রন্থের একটি কারিকার মধ্যে পাই। তিনি 'রসবৎ' অলংকারের লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

রসবদ্ দর্শিতস্পষ্টশৃঙ্গারাদিরসোদয়ম্।
স্বশব্দ-স্থায়ি-সঞ্চারি-বিভাবাভিনয়াস্পদম্॥
শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥

—উদ্ধৃত কারিকাদ্বয় হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, উদ্ভট প্রমুখ প্রাচীন আচার্যগণ স্থায়ী, সঞ্চারী, বিভাব, অভিনয় এবং স্বশব্দ—এই পাঁচটিকে সমষ্টিগত বা ব্যষ্টিগতভাবে রসের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতেন। এই মতবাদ অতি প্রাচীন এবং ধ্বনিকার যে এই প্রাচীন সিদ্ধান্তের সহিত সুপরিচিত ছিলেন, তাহা ধ্বন্যালোকের সর্বত্র পরিস্ফুট। কিন্তু ধ্বনিকার তাঁহার সহজাত মনীষার সাহায্যে একটি চরম কাব্যসত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাহা হইতেছে এই যে, কাব্যের যাহা সারভূত অর্থ, তাহা কখনও সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারা কবিগণ প্রকাশ করেন না, তাহা সর্বদাই পরোক্ষভাবে, প্রচ্ছন্নভাবে, আভাসে, ইঙ্গিতে সূচিত হইয়া থাকে। কাব্যের ক্ষেত্রে অতিস্ফুটতা অর্থের চারুত্বের পক্ষে ক্ষতিকর; অনতিস্ফুটত্বই কাব্যার্থের চারুত্বের মূল হেতু। এই শেষোক্ত অর্থই 'ব্যঙ্গ্য' বা 'প্রতীয়মান' রূপে অলঙ্কার শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ধ্বনিকার ধ্বন্যালোকের তৃতীয়োদ্দ্যোতের বৃত্তিগ্রন্থের একস্থলে বলিয়াছেন—

বস্তুচারুত্বপ্রতীতয়ে স্বশব্দানভিধেয়ত্বেন যৎপ্রতিপাদয়িতুমিষ্যতে তদ্ ব্যঙ্গ্যম্।

অপিচ— সারভূতো হ্যর্থঃ স্বশব্দানভিধেয়ত্বেন প্রকাশিতঃ সুতরামেব শোভামাবহতি। প্রসিদ্ধিশ্চেয়মস্ত্যেব বিদগ্ধবিদ্বৎপরিষৎসু যদভিমততরং বস্তু ব্যঙ্গ্যত্বেন প্রকাশ্যতে ন সাক্ষাৎ শব্দবাচ্যত্বেন।

ধ্বনিকারের নিকট এই সত্য স্বতঃসিদ্ধ, ইহা স্বানুভববেদ্য। তাহাই যদি হয়, তবে কাব্যের যাহা পরম সারভূত অর্থ রসতত্ত্ব, তাহা যে কোনও কালেই স্বশব্দবাচ্য হইতে পারে না, সে বিষয়ে বৈমত্যের অবকাশ কোথায়? রস সর্বদাই ব্যঙ্গ্য, কখনই স্বশব্দবাচ্য নয়। ব্যঙ্গ্যত্বই ইহার অসাধারণ লক্ষণ। ব্যঙ্গ্যত্বের অভাবে রসের রসত্ব বা আস্বাদ্যমানতাই ব্যাহত হইবে। ধ্বনিকারের এই সিদ্ধান্তের সহিত মিলাইয়া পড়িলে—"বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ"— ভরতমুনির এই রসসূত্রে বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের সহিত রসের যে সংযোগসম্বন্ধ খ্যাপন করা হইয়াছে তাহা যে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবাতিরিক্ত হইতে পারে না, ইহা তো অবশ্য-স্বীকার্য। তবে এইটুকু মনে রাখা দরকার যে, ধ্বনিকার শুধু রসবিষয়ক ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই তাঁহার এই মহাগ্রন্থ রচনা করেন নাই। ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি ব্যাপার শুধুই সাহিত্যিক রসের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নহে। ইহা মহাবিষয়। ধ্বনিকার এই ব্যঞ্জনা ব্যাপারের স্বরূপ নানাবিধ যুক্তি ও প্রমাণ উপন্যাসের দ্বারা, পরমতখণ্ডনপূর্বক, বিবিধ উদাহরণ প্রত্যুদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এবং বাচকত্বব্যতিরিক্ত ব্যঞ্জকত্বও যে শব্দের একটি অতিরিক্ত শক্তি (function) রূপে অবশ্য স্বীকরণীয়, তাহা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও রসবিষয়ক ব্যঞ্জকত্বই যে ব্যঞ্জনাব্যাপারের মূর্ধাভিষিক্ত উদাহরণ, সে বিষয়ে কাহারও বৈমত্য থাকিতে পারে না, এবং আচার্য আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকের নানা স্থলে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে খ্যাপন

করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। এই প্রসঙ্গে ধ্বন্যালোকের চতুর্থ উদ্দ্যোতের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত কারিকাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়—

ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবেঽস্মিন্ বিবিধে সম্ভবত্যপি।
রসাদিময় একস্মিন্ কবিঃ স্যাদবধানবান্॥

পূর্বাচার্যসম্মত রসের স্বশব্দবাচ্যত্ব সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাহা ধ্বন্যালোকের প্রথমোদ্দ্যোতের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত বৃত্তিগ্রন্থেও আচার্য আনন্দবর্ধন সংশয়াতীতভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন —

··তৃতীয়স্তু রসাদিলক্ষণঃ প্রভেদো বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তঃ প্রকাশতে, নতু সাক্ষাচ্ছব্দব্যাপারবিষয় ইতি বাচ্যাদ্ বিভিন্ন এব। তেন হি বাচ্যত্বং তস্য স্বশব্দনিবেদিতত্বেন বা স্যাৎ, বিভাবাদিপ্রতিপাদনমুখেন বা। পূর্বস্মিন্ পক্ষে স্বশব্দনিবেদিতত্বাভাবে রসাদীনামপ্রতীতিপ্রসঙ্গঃ। ন চ সর্বত্র তেষাং স্বশব্দনিবেদিতত্বম্। যত্রাপ্যস্তি তৎ তত্রাপি বিশিষ্টবিভাবাদিপ্রতিপাদনমুখেনৈবৈষাং প্রতীতিঃ। স্বশব্দেন সা কেবলমনূদ্যতে, নতু তৎকৃতা। বিষয়ান্তরে তথা তস্যা অদর্শনাৎ। নহি কেবল শৃঙ্গারাদিশব্দমাত্রভাজি বিভাবাদিপ্রতিপাদনরহিতে কাব্যে মনাগপি রসবত্ত্বপ্রতীতিরস্তি। যতশ্চ স্বাভিধানমন্তরেণ কেবলেভ্যোঽপি বিভাবাদিভ্যো বিশিষ্টেভ্যো রসাদীনাং প্রতীতিঃ। কেবলাচ্চ স্বাভিধানাদপ্রতীতিঃ। তস্মাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামভিধেয়সামর্থ্যাক্ষিপ্তত্বমেব রসাদীনাম্। ন ত্বভিধেয়ত্বং কথঞ্চিৎ ইতি তৃতীয়োঽপি প্রভেদো বাচ্যাদ্ ভিন্ন এবেতি স্থিতম্।

এইভাবে ব্যঞ্জনাব্যাপারের প্রতিষ্ঠাপনের দ্বারা আচার্য আনন্দবর্ধন রসসূত্রের অভিনব সমীক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া লোচনকার অভিনবগুপ্তাচার্য প্রবর্তিত অভিব্যক্তিবাদের সূচনা করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং রসসূত্রের নিপুণতম ভাষ্যকার অভিনবগুপ্তের কৃতিত্বের গৌরব যে বহুলাংশে ধ্বনিশাস্ত্রের প্রবর্তক আনন্দবর্ধনাচার্যেরই প্রাপ্য, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। আচার্য আনন্দবর্ধন যে উদ্ধৃত সন্দর্ভে রসের স্বশব্দবাচ্যত্ব নিরাকরণ করিয়া ব্যঞ্জনামাত্রবেদ্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই যে অভিনবগুপ্তাচার্যের অভিব্যক্তিবাদের ভূমিকা রচনা করিয়াছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। 'লোচন'-গ্রন্থে অভিনবগুপ্তের নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি উক্তিই তাহার সাক্ষ্য—

··যস্তু স্বপ্নেঽপি ন স্বশব্দবাচ্যো ন লৌকিকব্যবহারপতিতঃ, কিন্তু শব্দসমর্প্যমাণহৃদয়সংবাদ-সুন্দর-বিভাবানুভাবসমুচিতপ্রাগ্‌বিনিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমারস্বসংবিদানন্দচর্বণাব্যাপাররসনীয়রূপো রসঃ, স কাব্যব্যাপারৈকগোচরো রসধ্বনিরিতি, স চ ধ্বনিরেবেতি, স এব মুখ্যতয়াঽত্মেতি।

অপি চ—

বস্ত্বলঙ্কারাবপি শব্দাভিধেয়ত্বমধ্যাসাতে তাবৎ। রস-ভাব-তদাভাস-তৎপ্রশমাঃ পুনর্ন কদাচিদভিধীয়ন্তে, অথ চাস্বাদ্যমানতাপ্রাণতয়া ভান্তি। তত্র ধ্বননব্যাপারাদৃতে নাস্তি কল্পনান্তরম্।

৬

ধ্বনিকারের পূর্ববর্তী প্রাচীন আলংকারিকগণ— যেমন ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট, বামন প্রভৃতি সকলেই রসকে কাব্যের অন্যতম উপাদানরূপে যে স্বীকার করেন নাই, তাহা নহে। কিন্তু রস-সম্বন্ধে ধ্বনিকারের দৃষ্টিভঙ্গী

প্রাচীন আলংকারিকগণের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ভামহ প্রভৃতি আচার্যগণ 'রস'কে হয় গুণ,[১০] অথবা অলংকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি শব্দার্থালংকার যেমন কাব্যদেহের সৌন্দর্যসম্পাদক কয়েকটি উপাদান মাত্র, তদতিরিক্ত কিছু নহে, আনন্দবর্ধনের মতে কিন্তু রস সেরূপ নহে। পূর্বাচার্যগণের 'রসবদ্' অলংকার অন্যান্য অগণিত বাগবিকল্পেরই সগোত্র মাত্র, ইহার কোনও পৃথক্ সত্তা তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই। কাব্যবর্ণিত অর্থের দ্বারা যেখানে শৃঙ্গারাদি রসের বোধ জন্মায়, সেইখানেই 'রসবদ্' অলংকারের অস্তিত্ব তাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন।[১১] এইরূপ শঙ্কা তাঁহাদের মনে একবারের জন্যও উদিত হয় নাই যে, অলংকারের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসাধন। কিন্তু এই সৌন্দর্যসাধন কাহার? কাব্যের শরীরভূত শব্দ ও অর্থের? আত্মা না থাকিলে নিষ্প্রাণ শরীরের আবার শোভা কি? সুতরাং শব্দ ও অর্থ হইতে অতিরিক্ত এমন কোনও পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যাহার শোভা সম্পাদনই শব্দ ও অর্থের বিচিত্র অলংকার যোজনার একমাত্র উদ্দেশ্য। এবং 'রস' ভিন্ন আর কোন্ পদার্থকে কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায়? অতএব রসই কাব্যের আত্মা; সেই রসাধিষ্ঠিত শব্দার্থরূপী কাব্যশরীরে বিভিন্ন অলংকার যোজনার দ্বারা রসেরই উৎকর্ষ সাধিত হয়। সুতরাং কাব্যের অন্তরঙ্গতম আত্মভূত রসতত্ত্বকে কি করিয়া শরীরভূত শব্দ ও অর্থের ধর্ম অলংকাররূপে স্বীকার করা যায়? যাহা আত্মা তাহা কিরূপে শরীরবৃত্তি ধর্ম হইতে পারে? অঙ্গী কিরূপে অঙ্গের সহিত সমান হইবে? রস অলংকার্য— তাহা কিরূপে অলংকাররূপে গণিত হইবে? ধ্বনিকারই সর্বপ্রথম পূর্বাচার্যসম্মত রসবদ্-অলংকারের সুনিপুণ সমীক্ষা করিয়া 'রসে'র অলংকার্যত্ব স্থাপন করিলেন। তবে রসপ্রতীতির মধ্যেও গুণপ্রধানভাব আছে। 'রস' যেখানে প্রধানরূপে অভিব্যক্ত হইয়া আস্বাদগোচর হইয়া থাকে, সেইখানেই প্রকৃতপক্ষে 'রস' আত্মা বা অঙ্গী বা অলংকার্য। অপর পক্ষে রসপ্রতীতি যদি অর্থান্তরপ্রতীতির প্রতি গৌণ বা অপ্রধান হইয়া থাকে, তবে সেখানে 'রস'কে অলংকাররূপে গণনা করা সমীচীন। তবে সেইরূপ স্থলে ধ্বনিকার 'রসবদ্' অলংকার স্বীকার না করিয়া তাহার পরিবর্তে 'রসালংকার' এইরূপ সংজ্ঞাই প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রধানেঽন্যত্র বাক্যার্থে যত্রাঙ্গং তু রসাদয়ঃ।
কাব্যে তস্মিন্নলংকারো রসাদিরিতি মে মতিঃ॥

ধ্বন্যালোকের দ্বিতীয়োদ্দ্যোতের অন্তর্গত এই কারিকায় এবং তদুপরি বৃত্তিগ্রন্থে আচার্য আনন্দবর্ধন রসধ্বনির সহিত রসবদ্ অলংকারের ভেদ যুক্তি ও উদাহরণের সাহায্যে স্থাপন করিয়া প্রাচীন অলংকারিক আচার্যগণের সহিত তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য সন্দেহাতীতরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্তাচার্যের লোচন টীকা হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

অয়ং ভাবঃ— উপমাদীনামলঙ্কারত্বে যাদৃশী বার্তা তাদৃশ্যেব রসাদীনাম্। তদবশ্যমন্যেনালংকার্যেণ ভবিতব্যম্।‥ এতদুক্তং ভবতি— উপময়া যদ্যপি বাচ্যোঽর্থোঽলংক্রিয়তে, তথাপি তস্য তদেবালংকরণং যদ্

১০ "Some ālaṁkārikas, like Vāmana, regard *rasa* not as an *alaṁkāra*, but as a *guṇa* in poetry." —Hiriyanna. দ্র° বামনাচার্যঃ কাব্যালংকারসূত্র° ৩.২.১৪।

১১ তু° 'যত্র হি রসস্তত্রাবশ্যং রসবদলংকার ইতি পরমতম্।…'—লোচন, পৃ. ২০০।

ব্যঙ্গ্যার্থাভিব্যঞ্জনসামর্থ্যাধানমিতি বস্তুতো ধ্বন্যাত্মৈবালংকার্যঃ। কটককেয়ূরাদিভিরপি হি শরীরসমবায়িভিশ্চেতন আত্মৈব তত্তচ্চিত্তবৃত্তিবিশেষৌচিত্যসূচনাত্মতয়াঽলংক্রিয়তে। তথাহি— অচেতনং শবশরীরং কুণ্ডলাদ্যুপেতমপি ন ভাতি, অলংকার্যস্যাভাবাৎ। যতিশরীরং কটকাদিযুক্তং হাস্যাবহং ভবতি, অলংকার্যস্যানৌচিত্যাৎ। ন হি দেহস্য কিঞ্চিদনৌচিত্যম্ ইতি বস্তুত আত্মৈবালঙ্কার্যঃ, অহমলংকৃত ইত্যভিমানাৎ।...

ধ্বনিকার প্রবর্তিত এই নব্য মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক হিরিয়ানার মন্তব্যও গুরুত্বপূর্ণ—

The logical consequence of such a view is to exclude the Rasavadalaṁkāra from the sphere of poetics altogether, for it is a self-discrepant conception representing an *alaṁkārya* as an *alaṁkāra*. And that is what the later school has, in effect, done. But Indian thinkers do not ordinarily discard an old concept, even when they come to see that it is not strictly legitimate, if they can profitably utilise it in any other way. Now an *alaṁkāra*, by its very nature, forms a subsidiary category. It is what contributes to, or enhances, the beauty of something else. And it so happens that, even though *rasa* is intrinsically primal in character, it is sometimes found to subserve other suggested poetic elements— another *rasādi* or *vastumātra*, (more correctly, only *rasādi*) ; and then it may be *secondarily* described as an *alaṁkāra*. It is thus, not in its original sense that the name 'Rasavad alaṁkāra' survives in the later view, but only in an *upacarita* or figurative sense. . . . . . [১২]

সুতরাং অপ্রধান অলংকারের পর্যায় হইতে উদ্ধার করিয়া রসকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার গৌরব ধ্বনিকারেরই প্রাপ্য— এই বিষয়ে বিবাদের কোনও অবকাশ থাকিতে পারে না।

৭

ধ্বনিকার প্রবর্তিত কবিকর্মের শ্রেণীবিভাগও তাঁহার অপরূপ প্রজ্ঞা ও সাহিত্যরুচির নিদর্শন। প্রথমতঃ, তিনি কাব্যপ্রতিপাদ্য অর্থকে বাচ্য ও প্রতীয়মান— এই দুইটি শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমোক্ত অর্থ প্রাকৃতজনবেদ্য ; কিন্তু কাব্যের প্রকৃত চারুত্ব প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্য অর্থের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল। নারীদেহের যেরূপ লাবণ্য, কাব্যশরীরের সেইরূপ প্রতীয়মানার্থই সৌন্দর্যের নিদান। ইহাই কাব্যের আত্মা। প্রতীয়মান অর্থকেও ধ্বনিকার দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন। প্রতীয়মান অর্থের প্রাধান্য স্থলে 'ধ্বনিকাব্য' ও যেখানে উহার অপ্রাধান্য বা গুণীভাব সেইস্থলে 'গুণীভূতব্যঙ্গ্য'-সংজ্ঞক কাব্য ধ্বনিকার কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। প্রতীয়মান অর্থও আবার মূলতঃ দ্বিবিধ হইতে পারে— লৌকিক এবং অলৌকিকরূপে। লৌকিক ভেদের

১২ M. Hiriyanna রচিত *The Problem of the Rasavadalaṁkāra* শীর্ষক সুচিন্তিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। তু° "চন্দ্রাদিনা বস্তুনা যথা বস্ত্বন্তরং বদনাদ্যলংক্রিয়তে তদুপমিতত্বেন চারুতরাবভাসাৎ। তথা রসেনাপি বস্তু বা রসান্তরং বা উপস্কৃতং সুন্দরং ভবতি ইতি রসস্যাপি বস্তুন ইবালংকারত্বে কো বিরোধঃ? ননু রসেন কিংকুর্বতা প্রকৃতোঽর্থোঽলঙ্ক্রিয়তে? তর্হি উপময়াঽপি কিং কুর্বত্যাঽলঙ্ক্রিয়তে? ননু তয়া উপমীয়তে প্রস্তুতোঽর্থঃ। রসেনাপি তর্হি সরসীক্রিয়তে সোঽর্থ ইতি স্বসংবেদ্যমেতৎ।"— লোচন, পৃ. ১৯৪।

অন্তর্গত (১) শুদ্ধ অলংকৃত বস্তুমাত্র এবং (২) সালংকার বস্তু। রস ভাব প্রভৃতি অলৌকিক ভেদের অন্তর্গত। প্রতীয়মান অর্থের এই দ্বিবিধ প্রভেদের মধ্যে একটি মৌলিক তারতম্য লক্ষণীয়। বস্তু বা অলংকাররূপ লৌকিক প্রতীয়মান অর্থ কখনও কখনও বাচ্য বা স্ব-শব্দাভিধেয়ও হইতে পারে। তবে যখন উহা ব্যঙ্গ্যত্বদশা প্রাপ্ত হয়, তখন বাচ্য বস্তু বা বাচ্য অলংকার হইতে উহার চারুত্ব নিবন্ধন প্রাধান্য এতই অনুভবসিদ্ধ যে ধ্বনিকার প্রতীয়মান বস্তু ও অলংকারকেও কাব্যের আত্মা রূপে স্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছেন। অপরপক্ষে, রসাদিরূপ অলৌকিক প্রতীয়মানার্থ কখনও কোনও কারণেই বাচ্য হইতে পারে না—স্বপ্নেও উহার স্বশব্দ-বাচ্যত্ব কল্পনার অযোগ্য।[১৩] অতএব রসধ্বনিই প্রকৃত ধ্বনি, কাব্যের মুখ্য আত্মা। ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য স্থলে আনন্দবর্ধন ধ্বনির ত্রৈবিধ্য স্বীকার করিয়াছেন বটে—বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনি -রূপে; তথাপি রসধ্বনি-প্রধান কাব্যই যে মুখ্য ধ্বনিকাব্য, উহাই যে একমাত্র কাব্য—তাহাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রচার করিতে তিনি কিছুমাত্রও দ্বিধা অনুভব করেন নাই। ধ্বন্যালোকের প্রথমোদ্দ্যোতের পঞ্চম কারিকা—

> কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
> ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥

—ইহার ব্যাখ্যায় লোচনকার অভিনবগুপ্তপাদাচার্য সেইজন্য ধ্বনিকারের সিদ্ধান্তের সংগতিপ্রদর্শনপ্রসঙ্গে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয়—

> এবং 'প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব' ইতীয়তা ধ্বনিস্বরূপং ব্যাখ্যাতম্। অধুনা কাব্যাত্মত্বমিতিহাসব্যাজেন চ দর্শয়তি—কাব্যস্যাত্মেতি। স এবেতি প্রতীয়মানমাত্রেঽপি প্রক্রান্তে তৃতীয় এব রসধ্বনিরিতি মন্তব্যম্, ইতিহাস-বলাৎ প্রক্রান্তবৃত্তিগ্রন্থার্থবলাচ্চ। তেন রস এব বস্তুত আত্মা, বস্ত্বলংকারধ্বনী তু সর্বথা রসং প্রতি পর্য্যবস্যেতে ইতি বাচ্যাদুৎকৃষ্টৌ তৌ-ইত্যভিপ্রায়েণ ধ্বনিঃ কাব্যস্যাত্মেতি সামান্যেনোক্তম্॥

বস্তুধ্বনি এবং অলংকারধ্বনি শেষ পর্যন্ত রসধ্বনিতেই পর্যবসিত হয়, অতএব প্রত্যেক কবিকর্মের রসই পার্যন্তিক মুখ্য ফল। প্রশ্ন হইতে পারে: ধ্বনিকার তাহা হইলে কিজন্য বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনি -প্রধান কাব্যকে উত্তমকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন? ইহার একমাত্র সমাধান এই হইতে পারে যে, ধ্বনিকার বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনিকে আপেক্ষিক দৃষ্টিতে (relative viewpoint) উত্তমকাব্যের মর্যাদা দিয়াছেন; নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে (absolute viewpoint) রসই ধ্বনিকাব্যের একমাত্র উদাহরণ।

---

১৩ দ্র° "তত্র প্রতীয়মানস্য তাবদ্ দ্বৌ ভেদৌ—লৌকিকঃ কাব্যব্যাপারৈকগোচরশ্চেতি। লৌকিকো যঃ স্বশব্দবাচ্যতাং কদাচিদ্ অধিশেতে, স চ বিধিনিষেধাদ্যনেকপ্রকারো বস্তুশব্দেনোচ্যতে। সোঽপি দ্বিবিধঃ—যঃ পূর্বং ক্বাপি বাক্যার্থেঽলংকারভাব-মুপমাদিরূপতয়াঽন্বভূৎ; ইদানীং ত্বনলঙ্কাররূপ এবান্যত্র গুণীভাবাভাবাৎ স পূর্বপ্রত্যভিজ্ঞানবলাদলংকারধ্বনিরিতি ব্যপদিশ্যতে ব্রাহ্মণশ্রমণন্যায়েন। তদ্রূপতাঽভাবেন তূপলক্ষিতং বস্তুমাত্রমুচ্যতে। মাত্রগ্রহণেন রূপান্তরং নিরাকৃতম্। যস্তু স্বপ্নেঽপি ন স্বশব্দবাচ্যো ন লৌকিকব্যবহারপতিতঃ…রসঃ, স কাব্যব্যাপারৈকগোচরো রসধ্বনিরিতি, স চ ধ্বনিরেবেতি, স এব মুখ্যতয়াত্মেতি।" —লোচন, পৃ. ৫০–৫২।

অপিচ—"বস্ত্বলংকারাবপি শব্দাভিধেয়ত্বমধ্যাসাতে তাবৎ। রস-ভাব-তদাভাস-তৎপ্রশমাঃ পুনর্ন কদাচিদভিধীয়ন্তে, অথ চাস্বাদ্যমানতাপ্রাণতয়া ভান্তি। তত্র ধ্বননব্যাপারাদৃতে নাস্তি কল্পনান্তরম্।…"—ঐ. পৃ. ৭৮।

পূর্বে বলা হইয়াছে, কবিকর্মে প্রতীয়মান অর্থের দ্বৈবিধ্য সম্ভব : কোনও ক্ষেত্রে উহা প্রধান, কোথাও বা উহা অপ্রধান। প্রতীয়মান অর্থের প্রাধান্যের স্থলে ধ্বনিকাব্য বা উত্তমকাব্যের স্বরূপ আমরা এইমাত্র বিচার করিলাম। কিন্তু যেখানে উহার অপ্রাধান্য, সেখানে উহাকে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে? ধ্বনিকার ঐ জাতীয় স্থলে কবিকর্মকে মধ্যম কাব্য বা গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যরূপে পরিগণিত করিয়াছেন।[১৪] কিন্তু এখানেও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যেক বাগ্‌বিন্যাসই প্রতীয়মান অর্থের সহিত কোনও-না-কোনও রূপে সংসৃষ্ট। কেননা, লোকব্যবহারেই হউক অথবা অলৌকিক কবিকর্মের ক্ষেত্রেই হউক শব্দ-সমষ্টিরূপ বাক্যের বাচ্যার্থ হইতে অতিরিক্ত একটি অর্থের আভাস তাহার সহিত জড়িত হইয়া থাকিবেই। তাহা হইলে, প্রত্যেক বাগ্‌বিন্যাসকেই তো ধ্বনি অথবা গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যের উদাহরণ রূপে গণনা করিতে হয়? ইহার উত্তর এই যে, চারুত্বপ্রতীতিই কাব্যের আত্মা। সুতরাং ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মানার্থকৃত চারুত্ব যদি সহৃদয়ের উপলব্ধিগোচর না হয়, তবে কোনও বাগ্‌বিন্যাসকেই কাব্যসংজ্ঞার দ্বারা চিহ্নিত করিতে পারা যাইবে না। ব্যঙ্গ্যার্থ যেখানে বাচ্যার্থ হইতে গৌণ অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যার্থের সংস্পর্শজনিত কাব্যদেহের সৌভাগ্য সেখানে সকল সহৃদয়েরই অনুভবসিদ্ধ, তাহাকেই ধ্বনিকার গুণীভূতব্যঙ্গ্য আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন—

তদয়ং ধ্বনিনিস্যন্দরূপো দ্বিতীয়োঽপি মহাকবিবিষয়োঽতিরমণীয়ো লক্ষণীয়ঃ সহৃদয়ৈঃ।…

মুখ্যা মহাকবিগিরামলংকৃতিভৃতামপি।
প্রতীয়মানচ্ছায়ৈষা ভূষা লজ্জেব যোষিতাম্॥[১৫]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুণীভূতব্যঙ্গ্য রসধ্বনিতেই পর্যবসিত হয়। কেননা, অর্থমাত্রই— তাহা বাচ্যই হউক অথবা ব্যঙ্গ্যই হউক,— বিভাব, অনুভাব অথবা ব্যভিচারিভাবের অন্তর্ভুক্ত হইবেই, এবং বিভাবাদির সমবায়ে সহৃদয়চিত্তে রসের অভিব্যক্তি যে ঘটিয়া থাকে, তাহা তো আর অপহ্নব করিতে পারা যায় না। অতএব তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে রসধ্বনিতেই সমগ্র কাব্যের পর্যবসান।—

প্রকারোঽয়ং গুণীভূতব্যঙ্গ্যোঽপি ধ্বনিরূপতাম্।
ধত্তে রসাদিতাৎপর্য্যপর্য্যালোচনয়া পুনঃ॥[১৬]

—ধ্বন্যালোকের তৃতীয়োদ্দ্যোতস্থ এই কারিকাটিতে রসধ্বনিই যে সকল কাব্যের আত্মস্বরূপ, তাহা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আনন্দবর্ধন ঘোষণা করিয়াছেন।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য : রসধ্বনিই যদি কাব্যের একমাত্র আত্মা হয়, তবে ধ্বনিকার কি উদ্দেশ্যে বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কি কারণেই বা গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যকে দ্বিতীয় কাব্য-

১৪ তু° "ব্যঙ্গ্যস্য হি ক্বচিৎ প্রাধান্যং বাচ্যস্যোপসর্জনভাবঃ, ক্বচিদ্ বাচ্যস্য প্রাধান্যম্ অপরস্য গুণভাবঃ। অত্র ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যে ধ্বনিরিত্যুক্তমেব; বাচ্যপ্রাধান্যে তু প্রকারান্তরং নির্দেক্ষ্যতে।"—ধ্বন্যালোক-বৃত্তি : তৃতীয় উদ্দ্যোত, পৃ. ৪২১-২২। "প্রকারান্তরমিতি গুণীভূতব্যঙ্গ্যসংজ্ঞিতম্" —ঐ. লোচন টীকা, পৃ. ৪২২।

১৫ ধ্বন্যালোক, তৃতীয় উদ্দ্যোত, কারিকা ৩৭।

১৬ ধ্বন্যালোক ৩·৪০। তু° "এতদেব নির্বাহয়ন্ কাব্যাত্মত্বং ধ্বনেরেব পরিদীপয়তি— প্রকার ইতি।"—ঐ. লোচন-টীকা। অপিচ,… অতএবেয়তি যদ্যপি বাচ্যস্য প্রাধান্যং তথাপি রসধ্বনৌ তস্যাপি গুণতেতি সর্বস্য গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য প্রকারে মন্তব্যম্। অতএব ধ্বনেরেবাত্মত্বমিত্যুক্তচরং বহুশঃ।"—লোচন. পৃ. ৪৬১ (৩য় উদ্দ্যোত)।

প্রকাররূপে পরিগণনা করিয়াছেন? ইহার একমাত্র সমাধান এই: সত্যই রসধ্বনি-প্রধান কাব্যই একমাত্র কাব্য, রসধ্বনিই মুখ্যতঃ কাব্যের আত্মা। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত তখনই সত্য হইতে পারে, যখন কোনও একটি কবিকর্মকে অখণ্ডভাবে আমরা বিচার করিয়া দেখিব, উহার সামগ্রিক আবেদনটুকুই আমরা কেবলমাত্র পর্যালোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের মহাকাব্যদ্বয়—রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে আনন্দবর্ধনের সুনিপুণ সমীক্ষা সহৃদয়মাত্রেরই সম্মতি ও সমর্থন লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই—

> প্রবন্ধে চাঙ্গী রস এক এব উপনিবধ্যমানোঽর্থবিশেষলাভং ছায়াতিশয়ং চ পুষ্ণাতি। কস্মিন্নিবেতি চেৎ—যথা রামায়ণে যথা বা মহাভারতে। রামায়ণে হি করুণো রসঃ স্বয়মাদিকবিনা সূত্রিতঃ 'শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ'-ইত্যেবংবাদিনা। নির্ব্যূঢ়শ্চ স এব সীতাত্যন্তবিয়োগপর্যন্তমেব স্বপ্রবন্ধমুপরচয়তা। মহাভারতেঽপি শাস্ত্ররূপং কাব্যচ্ছায়ান্বয়িনি বৃষ্ণিপাণ্ডববিরসাবসানবৈমনস্যদায়িনীং সমাপ্তিমুপনিবধ্নতা মহামুনিনা বৈরাগ্যজননতাৎপর্যাং প্রাধান্যেন স্বপ্রবন্ধস্য দর্শয়তা মোক্ষলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ শান্তো রসশ্চ মুখ্যতয়া বিবক্ষাবিষয়ত্বেন সূচিতঃ।...[১৭]

কিন্তু এই অখণ্ড সামগ্রিক দৃষ্টি তো অকস্মাৎ সংঘটিত হয় না। কাব্যের অখণ্ডরূপটিকে উপলব্ধি করিতে হইলে খণ্ড খণ্ড অংশের আলোচনা ছাড়া গত্যন্তর নাই। যেমন বর্ণ, পদ, বাক্য—ইহাদের ক্রমভাবী জ্ঞানের দ্বারাই পরিণামে মহাবাক্য বা প্রবন্ধের পূর্ণ স্বরূপ ভাসমান হইয়া উঠে, তুল্যরূপে কাব্যান্তর্বর্তী বিচ্ছিন্ন পদ, পদসংঘাতরূপ বাক্য, বাক্যসংঘাতরূপ মহাবাক্যের পূর্বাপর স্বরূপ-উপলব্ধি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই অখণ্ড কবিকর্মের পরিপূর্ণ নির্বিভাগ তাৎপর্য-উপলব্ধির অবর্জনীয় সোপান। বৈয়াকরণ দার্শনিকগণ যেমন স্বরূপজ্যোতিঃ সূক্ষ্মা বাক্ বা স্ফোটতত্ত্বকেই পরমার্থ সত্যরূপে স্বীকার করিয়াও বর্ণ, পদ, বাক্য, প্রকৃতি, প্রত্যয় প্রভৃতি তত্ত্বের আবিদ্যক অস্তিত্ব বা সংবৃতিসত্যতা মানিয়া লইয়াছেন, কাব্যবিচারের ক্ষেত্রেও সেই একই রীতি অবশ্য স্বীকার্য। কাব্যদেহের খণ্ডিত বিশ্লেষণপ্রধান আলোচনা কাব্যের আত্মভূত অখণ্ড তাৎপর্যের উপলব্ধির একমাত্র উপায়। অবিদ্যাকল্পিত অসত্য মার্গই পরিণামে পরমার্থ-সত্যভূত কাব্যাত্মার স্বরূপোপলম্ভের সহায়। এই প্রসঙ্গে ভগবৎপাদ আচার্য ভর্তৃহরির নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি প্রত্যেক তত্ত্বজিজ্ঞাসুর হৃদয়ে অনপনেয়ভাবে মুদ্রিত থাকিবে—

> উপায়াঃ শিক্ষ্যমাণানাং বালানামুপলালনাঃ।
> অসত্যে বর্ত্মনি স্থিত্বা ততঃ সত্যং সমীহতে॥[১৮]

নিম্নভূমি হইতে প্রজ্ঞাপ্রাসাদশীর্ষে আরোহণ করিতে হইলে সোপান-পরম্পরার সাহায্য উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সেইজন্যই যদিও তত্ত্বদৃষ্টিতে ধ্বনিই একমাত্র পরমার্থসৎ কাব্যতত্ত্ব, তথাপি আপেক্ষিক দৃষ্টিতে গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যের সত্যতাও অনপহ্নবনীয়। অতএব সামান্যতঃ কাব্যমাত্রেরই চারুত্বের একমাত্র হেতু প্রতীয়মানার্থসংস্পর্শ—মুখ্যভাবেই হউক অথবা গৌণভাবেই হউক—ইহাই ধ্বনিকারের সিদ্ধান্ত।

---

১৭ ধ্বন্যালোক-বৃত্তি, ৪.৫ (পৃ. ৫২৯-৩০)।

১৮ তু° "...যেঽপ্যবিভক্তং স্ফোটং বাক্যং তদর্থং চাহুঃ, তৈরপ্যবিদ্যাপদপতিতৈঃ সর্বৈয়মনুসরণীয়া প্রক্রিয়া। তদুত্তীর্ণত্বে তু সর্বং পরমেশ্বরাদ্বয়ং ব্রহ্মেত্যস্মচ্ছাস্ত্রকারেণ ন ন বিদিতং তত্ত্বালোকগ্রন্থং বিরচয়তেত্যাস্তাম্।"—লোচন-টীকা, ছ. ৬৭। অপিচ—"এতদুক্তং ভবতি—বৈয়াকরণানাম্ ব্রহ্মপদে নাস্থৎ কিঞ্চিদিচ্ছন্তি। তত্র কা কথা বাচকত্বব্যঞ্জকত্বয়োঃ। অবিদ্যাপদে তু তৈরপি ব্যাপারান্তরমভ্যুপগতমেব।..."—লোচন, পৃ. ৪৪৪ (৩য় উদ্দ্যোত)।

> সর্বথা নাস্ত্যেব সহৃদয়হৃদয়হারিণঃ কাব্যস্য স প্রকারো যত্র
> ন প্রতীয়মানার্থসংস্পর্শেন সৌভাগ্যম্। তদিদং কাব্যরহস্যং
> পরমিতি সূরিভির্বিভাবনীয়ম্।[১৯]

ধ্বনিকারের এই সিদ্ধান্ত যদি অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তবে ব্যঙ্গ্যসংস্পর্শশূন্য বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধান কবিকর্মকে কাব্যরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া অসম্ভব। ধ্বনিকারও তাঁহার প্রবর্তিত কাব্যনয়ে প্রতীয়মানার্থবিরহিত কবিকর্মের কাব্যত্ব আদৌ স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

> প্রধানগুণভাবাভ্যাং ব্যঙ্গ্যস্যৈবং ব্যবস্থিতে।
> উভে কাব্যে ততোঽন্যদ্ যৎ তচ্চিত্রমভিধীয়তে॥

—এই চিত্রকাব্য শব্দালংকার ও অর্থালংকারপ্রধান রচনা। যেখানে কবির রসাবেশবিহ্বলতা হইতে উহার জন্ম হয় নাই, সহৃদয়চিত্তে রসোদ্রেকও যাহার লক্ষ্য নহে, তাহাকে ধ্বনিকার কাব্যরূপেই গণনা করেন নাই; তাহা 'কাব্যানুকার' মাত্র— "ন তন্মুখ্যং কাব্যং কাব্যানুকারো হ্যসৌ।"[২০] প্রশ্ন হইতে পারে: যদি শব্দালংকার ও অর্থালংকারপ্রধান রচনাকে কাব্যের পরিধির বহির্ভূত বলিয়াই গণনা করা হয়, তবে কিজন্য 'চিত্র' সংজ্ঞক তৃতীয় শ্রেণীর কাব্যের উল্লেখই বা করা হইয়াছে? তাহার উত্তরে ধ্বনিকার বলিয়াছেন: সত্য বটে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে রসভাবাদি তাৎপর্যশূন্য 'চিত্রকাব্য' অকাব্যই; কিন্তু বিশৃঙ্খলবাক্ কবিগণ চিত্রকাব্য রচনাতেও স্ব স্ব অভিনিবেশ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ কাব্যরচনায় প্রবৃত্তি দর্শনেই 'চিত্রকাব্য'কেও সামান্যতঃ কাব্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা পরিপাকবান্ পরিণতপ্রজ্ঞ কবি তাঁহাদের পক্ষে রসধ্বনি ব্যতিরিক্ত কোনও কাব্যপ্রকারেরই অস্তিত্বকল্পনা অসম্ভব—

> এতচ্চ চিত্রং কবীনাং বিশৃঙ্খলগিরাং রসাদিতাৎপর্যমনপেক্ষ্যৈব কাব্যপ্রবৃত্তিদর্শনাদস্মাভিঃ পরিকল্পিতম্। ইদানীন্তনানাং তু ন্যায্যে কাব্যনয়ব্যবস্থাপনে ক্রিয়মাণে নাস্ত্যেব ধ্বনিব্যতিরিক্তঃ কাব্যপ্রকারঃ। যতঃ পরিপাকবতাং কবীনাং রসাদিতাৎপর্য্যবিরহে ব্যাপার এব ন শোভতে।[২১]

---

১৯ ধ্বন্যালোক-বৃত্তি,৩. ৩৬ (পৃ. ৪৭৪-৫)। 'ব্যক্তিবিবেক'-কার মহিমভট্টও 'প্রতীয়মানার্থ'-সংস্পর্শই (তাঁহার মতে 'অনুমেয়ার্থ') একমাত্র কাব্যত্ব-প্রযোজক বলিয়া স্বীকার করিয়া ধ্বনিকার-পরিকল্পিত কাব্যের প্রকারত্রয়-নিরূপণ অযথার্থ বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন —"কিঞ্চ কাব্যস্য স্বরূপং ব্যুৎপাদয়িতুকামেন মতিমতা তল্লক্ষণমেব সামান্যেনাখ্যাতব্যম্, যত্র বাচ্যপ্রতীয়মানয়োর্গম্যগমকভাবসংস্পর্শস্তৎ কাব্যমিতি। যত্তু তদনাখ্যায়ৈব তয়োঃ প্রধানেতরভাবকল্পনেন প্রকারত্রয়মুক্তং তদপ্রযোজকমেব।…"— ঐ. ১ম বিমর্শ।

২০ তু° অত্রোচ্যতে সত্যং ন তাদৃক্ কাব্যপ্রকারোঽস্তি, যত্র রসাদীনামপ্রতীতিঃ। কিন্তু যদা রসভাবাদিবিবক্ষাশূন্যঃ কবিঃ শব্দালংকারমর্থালংকারং বোপনিবধ্নাতি তদা তদ্বিবক্ষাপেক্ষয়া রসাদিশূন্যতার্থস্য পরিকল্প্যতে। বিবক্ষোপারূঢ় এব হি কাব্যে শব্দানামর্থঃ। বাচ্যসামর্থ্যবশেন চ কবিবিবক্ষাবিরহেঽপি তথাবিধে রসাদিপ্রতীতির্ভবন্তী পরিদুর্বলা ভবতীত্যনেনাপি প্রকারেণ নীরসত্বং পরিকল্প্য চিত্রবিষয়ো ব্যবস্থাপ্যতে। তদিদমুক্তম্—

> রসভাবাদিবিষয়বিবক্ষাবিরহে সতি।
> অলংকারনিবন্ধো যঃ স চিত্রবিষয়ো মতঃ॥
> রসাদিষু বিবক্ষা তু স্যাত্তাৎপর্য্যবতী যদা।
> তদা নাস্ত্যেব তৎ কাব্যং ধ্বনের্যত্র ন গোচরঃ॥— ধ্বন্যালোক-বৃত্তি, ৩. ৪১-৪২

২১ ধ্বন্যালোক-বৃত্তি, ৩.৪৫

পাঠকসমাজেরও কোনও কোনও অংশ দুষ্কর যমকাদিপ্রধান 'শব্দচিত্র' কাব্য, অথবা উপমারূপকাদি অর্থালংকারশোভিত 'অর্থ চিত্র' কাব্য পাঠে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।' মহাকবি ভারবির নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

স্তুবন্তি গুর্বীমভিধেয়সম্পদং বিশুদ্ধিমুক্তেরপরে বিপশ্চিতঃ।
ইতি স্থিতায়াং প্রতিপূরুষং রুচৌ সুদুর্লভাঃ সর্বমনোরমা গিরঃ॥

এই শ্রেণীর কবিকুল এবং পাঠককুল— উভয়কেই যদি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়, তবে কবিসমাজ শীর্ণ হইয়া যাইবে, কাব্যের পরিধিও সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। বস্তুস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাও সমীচীন নয়।[২২]

ধ্বনিকার-পরিকল্পিত এই কাব্যপ্রকার মম্মট, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতি পরবর্তী খ্যাতনামা আলংকারিকাচার্য্যগণও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। উপরিবর্ণিত কাব্যভেদকল্পনা যে রসধ্বনিকে কেন্দ্র করিয়াই উদ্ভূত হইয়াছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র বৈমত্যের অবকাশ নাই।

৮

এই প্রসঙ্গে কাব্যে অলংকারের স্থান সম্বন্ধে ধ্বনিকারের মতবাদের আলোচনা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। ধ্বনিকারের পূর্ববর্তী কাব্যবিচারকগণ শব্দ ও অর্থের চারুত্বহেতু অনুপ্রাস ও উপমাদি কতকগুলি উপাদানকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। ভামহ তাঁহার 'কাব্যালংকার'-নিবন্ধে তো স্পষ্টই বলিলেন—

ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতাননম্।

বামনাচার্য্য যদিও রীতিপ্রস্থানের প্রবর্তক, তথাপি তিনিও তাঁহার কাব্যনয়ে অলংকারের প্রাধান্য অকুণ্ঠিত-ভাবেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কাব্যস্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ। সৌন্দর্য্যমলংকারঃ।

অতএব দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাহিত্যসমালোচনাক্ষেত্রে ধ্বনিকারের পূর্বে কাব্যবিচারকগণ গড্ডরিকা-প্রবাহন্যায়ে অলংকারসমূহকে কাব্যের অপরিহার্য উপাদানরূপে পরিগণনা করিয়াছেন। এই প্রসিদ্ধ চিরাচরিত সরণি হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া এবং সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদের প্রবর্তন করা কম কৃতিত্ব নহে। ধ্বনিকারের প্রথম কর্তব্য হইল— রীতি গুণ অলংকার বৃত্তি প্রভৃতি কাব্যের সর্ববাদিসম্মত প্রসিদ্ধ উপাদান হইতে ধ্বনির পার্থক্য প্রতিপাদন করতঃ তাহারই প্রাধান্য স্থাপন করা। তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিলেন যে, যদি কোনও কবিকর্ম গুণালংকারাদি সর্ববিধ শোভাহেতু ধর্মবিরহিতও হয়, অপরপক্ষে যদি উহা ধ্বনিসম্পদে বিভূষিত হয়, তবে তাহা উত্তম কাব্যরূপে স্বীকৃত হইবার যোগ্য। এই সম্পূর্ণ অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করার জন্য তাঁহাকে সমসাময়িক রসজ্ঞসমাজের নিকট যে নানাপ্রকারে উপহাসভাজন হইতে হইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য ধ্বন্যালোকের প্রথমোদ্দ্যোতে বৃত্তিগ্রন্থে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকটি—

---

২২ 'রসগঙ্গাধর-কার পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বিশ্বনাথ-কৃত কাব্যলক্ষণের সমালোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়— "যত্তু 'রসবদেব কাব্যম্' ইতি সাহিত্যদর্পণে নির্ণীতম্, তন্ন। বস্ত্বলংকারপ্রধানানাং কাব্যানামকাব্যত্বাপত্তেঃ। ন চেষ্টাপত্তিঃ, মহাকবি-সম্প্রদায়স্যাকুলীভাবপ্রসঙ্গাৎ। তথা চ জলপ্রবাহবেগনিপতনোৎপতনভ্রমণানি কবিভির্বর্ণিতানি কপিবালাদি-বিলসিতানি চ।..."— রসগঙ্গাধর : ১ম আনন।

তথা চান্যেন কৃত এবাত্র শ্লোকঃ—

যস্মিন্নস্তি ন বস্তু কিঞ্চন মনঃপ্রহ্লাদি সালংকৃতি
ব্যুৎপন্নৈ রচিতং চ নৈব বচনৈর্বক্রোক্তিশূন্যং চ যৎ।
কাব্যং তদ্ ধ্বনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্যা প্রশংসঞ্জড়ো
নো বিদ্মোঽভিদধাতি কিং সুমতিনা পৃষ্টঃ স্বরূপং ধ্বনেঃ॥

অতএব ধ্বনিকারের মতে অলংকারশূন্য কাব্যও অসম্ভব নহে যদি তাহাতে 'ধ্বনি'রূপ আত্মার সদ্ভাব থাকে। ভারতীয় সাহিত্যসমালোচনাক্ষেত্রে ইহা এক বৈপ্লবিক মতবাদ। তাই বলিয়া ধ্বনিকার কাব্যদেহ হইতে অলংকারকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিতও করেন নাই। তিনি অলংকারকে তাহার যথাযথ স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাকে অনুচিত প্রাধান্য দেন নাই। কাব্যের 'অঙ্গী' বা আত্মা হইতেছে—ধ্বনি বা রসধ্বনি। 'অঙ্গ' হইতেছে শব্দ ও অর্থ। শব্দ ও অর্থ এমনভাবে কবিকে প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে রসের অভিব্যক্তির পক্ষে কিছুমাত্র বিঘ্ন না হয়; এবং অলংকারসমূহ যখন শব্দ ও অর্থেরই ধর্ম, তখন তাহাদেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত রসাভিব্যক্তির আনুকূল্য সম্পাদন করা। শব্দালংকার বা অর্থালংকার যখন স্বতই প্রধান হইয়া উঠে, তখন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় ব্যাহত। অতএব কবি যখন কাব্য নির্মাণ করিবেন, তখন তাঁহাকে অলংকারসন্নিবেশ বিষয়ে সবিশেষ অবধানবান্ হইতে হইবে। যে-সকল অলংকার রসাভিব্যক্তির অনুকূল সেইগুলিকেই কাব্যদেহে স্থান দিতে হইবে; যে-অলংকার যে-রসের অনুকূল তদতিরিক্ত সকল অলংকারকেই বর্জন করিতে হইবে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, শৃঙ্গারপ্রধান কাব্যে যমক অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালংকার সর্বদা বর্জনীয়। রসসমাহিত কবিচিত্ত হইতে শব্দ ও অর্থের আবির্ভাবের সমকালেই কোনও পৃথক্ যত্ন ব্যতিরেকেই যে সকল বাগ্‌বিকল্প উৎসারিত হইয়া আসে, সেই সকলই কাব্যের প্রকৃত অলংকাররূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। অনেক প্রতিভাবান্ কবিও কখনও কখনও প্রমাদবশতঃ অলংকারসন্নিবেশ বিষয়ে অসংযমের পরিচয় দিয়াছেন; তাহার ফলে তাঁহাদের রচনার সৌন্দর্য ব্যাহতই হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধন রসধ্বনিপ্রধান কাব্যে—আর আমরা তো পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, ধ্বনিকারের মতে রসধ্বনিই একমাত্র কাব্যের আত্মা—অলংকারযোজনা বিষয়ে যে পদ্ধতি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক কবিযশঃপ্রার্থীরই শিক্ষণীয়। তিনি বলিয়াছেন—

ধ্বন্যাত্মভূতে শৃঙ্গারে সমীক্ষ্য বিনিবেশিতঃ।
রূপকাদিরলংকারবর্গ এতি যথার্থতাম্॥

এষা চাস্য বিনিবেশনে সমীক্ষা—

বিবক্ষা তৎপরত্বেন নাঙ্গিত্বেন কদাচন।
কালে চ গ্রহণত্যাগৌ নাতিনির্বহণৈষিতা॥
নির্ব্যূঢাবপি চাঙ্গত্বে যত্নেন প্রত্যবেক্ষণম্।
রূপকাদেরলংকারবর্গস্যাঙ্গত্বসাধনম্॥

এইভাবে কাব্যের সহিত অলংকারের যথার্থ সম্পর্ক কি হওয়া উচিত, তাহাও ধ্বনিকারই সর্বপ্রথম সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, এবং রসতত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়াই তিনি অলংকারের যোগ্যতা বিচার করিয়াছেন। পরবর্তী নব্য আলংকারিকগণ যদিও ধ্বনিকারের মত অনুসরণ করিয়া রসকেই কাব্য-

বিচারে মুখ্য আসন দান করিয়াছেন, তথাপি চিরাচরিত অলংকারের মোহ হইতে তাঁহারা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিতে পারেন নাই এবং অলংকারসন্নিবেশবিষয়ে ধ্বনিকারের ন্যায় নির্মোহ স্বচ্ছ দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয়ও তাঁহাদের নিকট হইতে প্রত্যাশা করা যায় না।[২৩]

৯

ভরতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে রস ও ভাব সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন বটে, তথাপি রসবিরোধ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টতঃ সুসম্বদ্ধ কোনও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু কবিকর্মে— তাহা মহাপ্রবন্ধই হউক অথবা মুক্তকই হউক,— যখন একটি মাত্র রসই অঙ্গী বা প্রধানরূপে নিবেশনীয়, তখন রসান্তরের সহিত সেই মুখ্য অঙ্গী রসের কিরূপ সম্পর্ক হওয়া সমীচীন, তাহা কাব্যসমালোচকগণের পক্ষে অবশ্য বিচার্য। কেননা, সমগ্র প্রবন্ধের মধ্যে একটি রসের প্রাধান্য স্বীকৃত হইলেও, রসান্তরের সমাবেশও সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা অসম্ভব এবং অনভিপ্রেতও বটে। সুতরাং এমনভাবে বিভিন্ন রসগুলির সমাবেশ করা উচিত, যাহাতে অঙ্গী রসের অভিব্যক্তি বা আস্বাদন বিষয়ে কোনও প্রতিবন্ধক না ঘটে।[২৩] এই উদ্দেশ্যে কবিকে কাব্যে সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন রসের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হইতে হইবে।

কাব্যে বা নাট্যে যে আটটি বা নয়টি রস স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সহাবস্থান সম্ভব নয়। কোনও কোনও রস পরস্পর একই আশ্রয়ে অবস্থান করিতে পারে না; আবার কোনও কোনও রসের পরস্পর নিরন্তর অভিব্যক্তিও সহৃদয়ের উদ্বেগজনক। আনন্দবর্ধনই সর্বপ্রথম যুক্তিপূর্বক রসসমূহের পরস্পরবিরোধের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া সেই বিরোধ পরিহারের উপায় নির্দেশ করিলেন। ভরতমুনি পরিগণিত রসগুলিকে আনন্দবর্ধনাচার্য্য প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ, কতকগুলি রস পরস্পর অবিরোধী— যেমন, বীর ও শৃঙ্গার, শৃঙ্গার ও হাস্য, রৌদ্র ও শৃঙ্গার, বীর ও অদ্ভুত, বীর ও রৌদ্র, রৌদ্র ও করুণ, এবং শৃঙ্গার ও অদ্ভুত। ইহাদের মধ্যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব সম্ভব। অপরপক্ষে, এমন কতকগুলি রস আছে, যেগুলি পরস্পর বাধ্যবাধকভাবাপন্ন, সুতরাং তাহাদের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। যেমন— শৃঙ্গার ও বীভৎস, বীর ও ভয়ানক, শান্ত ও রৌদ্র, এবং শান্ত ও শৃঙ্গার।[২৪] এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত

---

২৩ তু° 'তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি।'…ক্বাপীত্যনেনৈতদাহ যৎ সর্বত্র সালংকারৌ। ক্বচিত্তু স্ফুটালংকার-বিরহেঽপি ন কাব্যত্বহানিঃ।'— কাব্যপ্রকাশ : ১ম উল্লাস, ৪র্থ কারিকা ও বৃত্তি। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তব্য দ্রষ্টব্য: The *Kāvyaprakāśa* of Mammaṭa with the commentary of Śrīdhara, Part II, Postscript, pp. xvi-xvii. (Calcutta Sanskrit College Research Series, No. XV, Calcutta 1961).

২৪ তু° প্রসিদ্ধেঽপি প্রবন্ধানাং নানারসনিবন্ধনে।
একো রসোঽঙ্গী কর্তব্যস্তেষামুৎকর্ষমিচ্ছতা॥— ধ্বনিকারিকা, ৩. ২১।

তু° "ননু যেষাং রসানাং পরস্পরাবিরোধঃ যথা— বীরশৃঙ্গারয়োঃ শৃঙ্গারহাস্যয়োঃ রৌদ্রশৃঙ্গারয়োর্বীরাদ্ভুতয়োর্বীররৌদ্রয়োঃ রৌদ্র-করুণয়োর্বা শৃঙ্গারাদ্ভুতয়োর্বা তত্র ভবত্বঙ্গাঙ্গিভাবঃ। তেষাং তু কথং স ভবেদ্ যেষাং পরস্পরং বাধ্যবাধকভাবঃ। যথা শৃঙ্গারবীভৎসয়োর্বীর-ভয়ানকয়োঃ শান্তরৌদ্রয়োঃ শান্তশৃঙ্গারয়োর্বা।…"— ধ্বন্যালোক-বৃত্তি, ৩. ২৩।

উদ্ধৃত বৃত্তিগ্রন্থের ব্যাখ্যায় লোচনকার অভিনবগুপ্তের মন্তব্য হইতে অনুমান করা যায় যে আনন্দবর্ধন মূলতঃ ভরতের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়াই বিরোধী ও অবিরোধী রসের বর্গীকরণ করিয়াছিলেন। দ্র° "শৃঙ্গারেণ বীরস্যাবিরোধো যুদ্ধনয়পরাক্রমাদিনা কন্যারত্নলাভাদৌ।

বিরোধী রসগুলিকেও আনন্দবর্ধন দুইটি অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি আশ্রয়ৈক্যবিরোধী, অপর কয়েকটি নৈরন্তর্যবিরোধী। একই অধিকরণ বা আশ্রয়ে যে দুইটি রস পরস্পর অবস্থান করিতে পারে না, তাহাদিগকে ঐকাধিকরণ্যবিরোধী বা আশ্রয়ৈক্যবিরোধী বলা হয়। যেমন, বীর ও ভয়ানক। কবিকল্পিত যে পাত্র বীররসের আশ্রয়, তাহাই ভয়ানক রসেরও আশ্রয় হইতে পারে না। অর্থাৎ একই ব্যক্তি যুগপৎ বীর ও ভীরু হইতে পারে না। এই জাতীয় বিরোধ পরিহারের উপায় —উভয়রসের আশ্রয়-ভেদ কল্পনা। বীররসের আশ্রয় যদি কথানায়ক হন, তবে প্রতিনায়কনিষ্ঠ ভয়ানক রসের বর্ণনার দ্বারা এই বিরোধপরিহার সম্ভব। নৈরন্তর্যবিরোধী রসের উদাহরণস্বরূপে শান্ত ও শৃঙ্গার রসের উল্লেখ করিতে পারা যায়। কেননা, একই আশ্রয়ে এই দুই রসের অভিব্যক্তি সম্ভব এবং নির্দোষ হইলেও এই দুই রসের অভিব্যক্তির মধ্যে যদি অন্তর বা ব্যবধান কল্পিত না হয়, তবে পরস্পর বাধ্যবাধকভাব উদ্রিক্ত হইয়া সহৃদয় সামাজিকগণের প্রতীতিবিঘ্ন উৎপাদন করিবে। এই জাতীয় নৈরন্তর্যবিরোধী রসদ্বন্দ্বের একই আধারে সমাবেশ প্রদর্শন করিতে হইলে এমন কোনও একটি তৃতীয় রসের দ্বারা ইহাদিগকে ব্যবহিত করিতে হইবে, যাহার সহিত দুইটির একটিরও বিরোধ নাই। অতএব শান্ত ও শৃঙ্গারের অন্তরালে যদি অদ্ভুতরসের অভিব্যক্তি বর্ণিত হয়, তবে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বিরোধবর্জন সুকর হইয়া উঠে। বিরোধ পরিহারের এই পদ্ধতি ধ্বনিকার নিম্নোদ্ধৃত কারিকাদ্বয়ে সংক্ষেপে সূচনা করিয়াছেন—

বিরুদ্ধৈকাশ্রয়ো যস্তু বিরোধী স্থায়িনো ভবেৎ।
স বিভিন্নাশ্রয়ঃ কার্যস্তস্য পোষেঽপ্যদোষতা॥
একাশ্রয়ত্বে নির্দোষো নৈরন্তর্যে বিরোধবান্।
রসান্তরব্যবধিনা রসো ব্যঙ্গ্যঃ সুমেধসা॥[২৫]

আচার্য মম্মট, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ প্রভৃতি পরবর্তী প্রখ্যাত কাব্যমীমাংসকগণ রসবিরোধ ও তাহার পরিহার সম্পর্কে ধ্বনিকারের উপরি-বর্ণিত সমীক্ষা সর্বতোভাবে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন।

"আশ্রয়ৈক্যে বিরুদ্ধো যঃ স কার্যো ভিন্নসংশ্রয়ঃ।
রসান্তরেণান্তরিতো নৈরন্তর্যেণ যো রসঃ॥"[২৬]

—মম্মটাচার্যের এই উক্তি যে অক্ষরশঃ ধ্বনিকারের উদ্ধৃত কারিকাদ্বয়েরই অনুবাদমাত্র তাহা পাশাপাশি মিলাইয়া পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও রসবিরোধ আলোচনা প্রসঙ্গে

হাস্যস্য তু স্পষ্টমেব তদঙ্গত্বম্। হাস্যস্য স্বয়মপুরুষার্থস্বভাবত্বেঽপি সমধিকতররঞ্জনোৎপাদনেন শৃঙ্গারাঙ্গতয়ৈব তথাত্বম্। রৌদ্রস্যাপি তেন কথঞ্চিদবিরোধঃ। যথোক্তম্—'শৃঙ্গারশ্চ তৈঃ প্রসভং সেব্যতে।' তৈরিতি রৌদ্রপ্রকৃতিভিঃ রক্ষোদানবোদ্ধতমনুষ্যৈরিত্যর্থঃ। কেবলং নায়িকাবিষয়মৌগ্র্যং তত্র পরিহর্তব্যম্। অসম্ভাব্যপৃথিবীসম্মার্জনাদিজনিতবিস্ময়তয়া তু বীরাদ্ভুতয়োঃ সমাবেশঃ। যথাহ মুনিঃ—'বীরস্য চৈব যৎ কর্ম সোঽদ্ভুতঃ'ইতি। বীররৌদ্রয়োর্বীরোদ্ধতে ভীমসেনাদৌ সমাবেশঃ ক্রোধোৎসাহয়োরবিরোধাৎ। রৌদ্রকরুণয়োরপি মুনিনৈবোক্তঃ—

"রৌদ্রস্যৈব চ যৎ কর্ম স জ্ঞেয়ঃ করুণো রসঃ'— ইতি।"— ধ্বন্যালোক, পৃ. ৩৮০-১।

২৫ ধ্বন্যালোক, ৩. ২৫-২৬।

২৬ কাব্যপ্রকাশ, ৭. ৬৪।

ধ্বনিকারেরই পদানুসরণ করিতে কিছুমাত্র কুন্ঠিত হন নাই।[২৭] কেননা, তিনিও ধ্বনিকারকে 'আলংকারিকসরণি-ব্যবস্থাপক' বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন— 'ধ্বনিকৃতামালংকারিকসরণিব্যবস্থাপকত্বাৎ।'

এই প্রসঙ্গে রসদোষ বিষয়ে ধ্বনিকারের সমীক্ষাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি নিম্নোদ্ধৃত কারিকাসমূহে রস-দোষ সম্পর্কে যে সাধারণ কয়েকটি লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

বিরোধি-রসসম্বন্ধিবিভাবাদিপরিগ্রহঃ।
বিস্তরেণান্বিতস্যাপি বস্তুনোঽন্যস্য বর্ণনম্ ॥
অকাণ্ড এব বিচ্ছিত্তিরকাণ্ডে চ প্রকাশনম্।
পরিপোষং গতস্যাপি পৌনঃপুন্যেন দীপনম্।
রসস্য স্যাদ্বিরোধায় বৃত্ত্যনৌচিত্যমেব বা ॥[২৮]

—পরবর্তী অলংকারনিবন্ধকারগণ সে বিষয়ে তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশের সপ্তমোল্লাসে রসবিরোধ বিচারপ্রসঙ্গে মম্মটের উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

ব্যভিচারি-রস-স্থায়িভাবানাং শব্দবাচ্যতা।
কষ্টকল্পনয়া ব্যক্তিরনুভাববিভাবয়োঃ ॥
প্রতিকূলবিভাবাদিগ্রহো দীপ্তিঃ পুনঃ পুনঃ।
অকাণ্ডে প্রথনচ্ছেদাবঙ্গস্যাপ্যতিবিস্তৃতিঃ ॥
অঙ্গিনোঽননুসন্ধানং প্রকৃতীনাং বিপর্যয়ঃ।
অনঙ্গস্যাভিধানং চ রসে দোষাঃ স্যুরীদৃশাঃ ॥[২৯]

—ইহা ধ্বনিকারের সমীক্ষারই হুবহু প্রতিধ্বনি ভিন্ন আর কিছু নহে।

ধ্বনিকার রসকেই কাব্যের মুখ্য আত্মা রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে যাহা কিছু রসপ্রতীতির বিঘ্নসম্পাদক বা অপকর্ষসাধক, তাহাই কাব্যের মুখ্যতঃ দোষরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। শ্রুতিদুষ্টত্ব প্রভৃতি দোষ যেহেতু সর্বত্র রসের ক্ষেত্রে অপকর্ষহেতু নহে, প্রত্যুত শৃঙ্গারাদিরসের অভিব্যক্তির বিঘ্নসম্পাদক হইলেও যেহেতু ইহারা বীর রৌদ্র প্রভৃতি রসান্তরের অভিব্যক্তির প্রতি সহায়তাচরণ করিয়া থাকে, সেইহেতু ধ্বনিকারের মতে ঐগুলিকে অনিত্য দোষরূপে স্বীকার করা উচিত। তবে কতকগুলি দোষ আছে, যেগুলি সর্ববিধ রসের ক্ষেত্রেই অপকর্ষ-হেতু— অতএব ধ্বনিকারের মতে সেগুলি নিত্যদোষ। এইভাবে রসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই কাব্যান্তর্বর্তী ধর্মসমূহের দোষত্ব বা গুণত্ব বিচার করিতে হইবে। ধ্বনিকার স্পষ্টতই বলিয়াছেন—

শ্রুতিদুষ্টাদয়ো দোষাঅনিত্যা যে চ দর্শিতাঃ।
ধ্বন্যাত্মন্যেব শৃঙ্গারে তে হেয়া ইত্যুদাহৃতাঃ ॥[৩০]

---

২৭ তু° 'এতেষাং পরস্পরং কৈরপি সহাবিরোধঃ কৈরপি বিরোধঃ।...' ইত্যাদি— রসগঙ্গাধর প্রথমানন, পৃ. ৫৬-৬১ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ, ১৯৩৯)।

২৮ ধ্বন্যালোক, ৩. ১৮-১৯।

২৯ কাব্যপ্রকাশ, ৭. ৬০-৬১।

৩০ ধ্বন্যালোক, ২. ১১। তু° "এবমস্মৎপক্ষ এব গুণালঙ্কারব্যবহারো বিভাগেনোপপদ্যত ইতি প্রদর্শ্য নিত্যানিত্যদোষবিভাগোঽপ্যস্মৎপক্ষ এব সঙ্গচ্ছত ইতি দর্শয়িতুমাহ— শ্রুতিদুষ্টাদয় ইত্যাদি।..."— ঐ. লোচন টীকা।

ধ্বনিকারের মত অনুসরণ করিয়াই মম্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি পরবর্তী সাহিত্য-মীমাংসকগণও একমাত্র রসাপকর্ষক ধর্মসমূহকেই দোষশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। মম্মটাচার্য বলিয়াছেন—

মুখ্যার্থহতির্দোষো রসশ্চ মুখ্যঃ……

সেইজন্য ধ্বনিকার সামান্যতঃ অনৌচিত্যকেই—তাহা যেরূপই হউক না কেন, রসভঙ্গহেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—

অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণম্।
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা॥[৩১]

মহিমভট্টের ন্যায় ধ্বনিকারের তীব্র সমালোচকও তাঁহার এই মতবাদ নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছেন। কেননা, ব্যক্তিবিবেকের দ্বিতীয় বিমর্শের উপোদ্ঘাতে তিনি বলিয়াছেন—

ইহ খলু দ্বিবিধমনৌচিত্যমুক্তম্—অর্থবিষয়ং শব্দবিষয়ং চেতি।
তত্র বিভাবানুভাবব্যভিচারিণাং যথাযথং রসেষু যো বিনিযোগস্তন্মাত্র-
লক্ষণমেকমন্তরঙ্গমাদ্যৈরেবোক্তমিতি[৩২] নেহ প্রতন্যতে।
অপরং পুনর্বহিরঙ্গং বহুপ্রকারং সম্ভবতি। তদ্যথা—বিধেয়াবিমর্শঃ,
প্রক্রমভেদঃ, ক্রমভেদঃ, পৌনরুক্ত্যং, বাচ্যাবচনং চেতি।…
এতে চ বিধেয়াবিমর্শাদয়ো দোষা ইত্যুচ্যন্তে। তানিদানী-
মখিলান্ খলা ইব ব্যাখ্যাস্যামঃ।…

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কাব্যদোষের আলোচনায় ধ্বনিকারই সর্বপ্রথম যে নূতন সরণির প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহার দ্বারা রসের মুখ্য কাব্যাত্মত্বই সমধিকতরভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

১০

এইভাবে গুণ, রীতি, বৃত্তি, ঔচিত্য প্রভৃতি অলংকারশাস্ত্রসম্মত বিভিন্ন কাব্যতত্ত্বের সহিত কাব্যাত্মভূত রসতত্ত্বের যথাযথ সম্পর্ক সুনিপুণভাবে বিচার করিয়া আচার্য আনন্দবর্ধন ভরতমুনিপ্রবর্তিত রসপ্রস্থানকে একটি সর্বতোভদ্র মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন। ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিবাদের প্রবর্তনই তাঁহার মনীষার শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইলেও, ধ্বনিকার তাঁহার এই বিস্তৃত সন্দর্ভের কোনও স্থলেই সেজন্য আপনার কৃতিত্ব দাবী করেন নাই। বরং বারংবার তিনি এই কথাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পরিণতপ্রজ্ঞ কবি ও সহৃদয়ের মানসভূমিতে যে কাব্যতত্ত্ব চিরপ্রসুপ্তকল্প অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, তিনি তাহাকেই যুক্তির আলোকে পরিস্ফুট করিয়াছেন মাত্র—

অস্ফুটস্ফুরিতং কাব্যতত্ত্বমেতদ্ যথোদিতম্।
অশক্নুবদ্ভির্ব্যাকর্তুং রীতয়ঃ সম্প্রবর্তিতাঃ॥”

৩১ তু° 'অনৌচিত্যং তু রসভঙ্গহেতুত্বাৎ পরিহরণীয়ম্।…
তথা চাহুঃ—'অনৌচিত্যাদৃতে…' ইতি। যাবতা ত্বনৌচিত্যেন রসস্য পুষ্টিস্তাবত্তু ন বার্যতে, রসপ্রতিকূলস্যৈব তস্য নিষেধ্যত্বাৎ।”—রসগঙ্গাধর: প্রথমানন।

৩২ 'আদ্যৈরিতি ধ্বনিকারপ্রভৃতিভিঃ। তদুক্তম্—'অনৌচিত্যাদৃতে—ইত্যাদিনা।' —রুয্যক-কৃত 'ব্যক্তিবিবেকব্যাখ্যান'।

অপিচ— "সৎকাব্যতত্ত্বনয়বর্ত্ম চিরপ্রসুপ্ত-
কল্পং মনঃসু পরিপক্বধিয়াং যদাসীৎ।
তদ্ ব্যাকরোৎ সহৃদয়োদয়লাভহেতো-
রানন্দবর্ধন ইতি প্রথিতাভিধানঃ॥

ভরতমুনিপ্রতিপাদিত রসতত্ত্বই সেই 'চিরপ্রসুপ্তকল্প সৎকাব্যতত্ত্ব', যাহা দীর্ঘকাল অবজ্ঞাত হইয়াছিল। আচার্য আনন্দবর্ধন তাহাকেই যোগ্য মর্যাদা দান করিয়া কাব্য-বিচারের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। 'ব্যক্তিবিবেক'কার অবশ্য বলিয়াছেন—

"কাব্যস্যাত্মনি সংজ্ঞিনি রসাদিরূপে ন কস্যচিদ্ বিমতিঃ।"

—কিন্তু কবি ও সহৃদয়ের এই রুচিপরিবর্তন যে ধ্বনিকারের মনীষারই দান, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তৃতীয়োদ্দ্যোতের বৃত্তিগ্রন্থে ধ্বনিকার যে কয়টি পরিকর শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

মুখ্যা ব্যাপারবিষয়াঃ সুকবীনাং রসাদয়ঃ।
তেষাং নিবন্ধনে ভাব্যং তৈঃ সদৈবাপ্রমাদিভিঃ॥
নীরসস্তু প্রবন্ধো যঃ সোঽপশব্দো মহান্ কবেঃ।
স তেনাকবিরেব স্যাদন্যেনাস্মৃতলক্ষণঃ॥

—নীরস প্রবন্ধ কবির অযশের হেতু। সুতরাং ঐ জাতীয় কাব্যরচনায় কোনও প্রকৃত সৎকবির প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। রসস্পর্শ থাকিলে প্রাচীন প্রবন্ধের ইদানীন্তন সংস্কৃতরূপও যে অভিনব রমণীয়তা লাভ করিয়া থাকে, তাহা যে নীরস অনুকরণমাত্রে পর্যবসিত হয় না, তাহাও আনন্দবর্ধনই বলিয়াছেন—

দৃষ্টপূর্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ।
সর্বে নবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ॥

এই ভাবে যে দিক্ দিয়াই আলোচনা করা হউক না কেন, আমরা দেখিতে পাইব যে ধ্বনিকারের বৈপশ্চিতী দৃষ্টি কখনই কবিকর্মের কেন্দ্রীয় তত্ত্ব রস হইতে বিক্ষিপ্ত বা অন্যত্র সঞ্চারিত হয় নাই। সুতরাং তিনি যে ভরতমুনি প্রবর্তিত সুপ্রাচীন রসপ্রস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিসংস্কারক, সে বিষয়ে কোনও বৈমত্যই থাকিতে পারে না এবং ধ্বন্যালোক গ্রন্থ রচনার দ্বারা তিনি সহৃদয়হৃদয়ে যে শাশ্বত প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহাও এই কারণেই সম্ভব হইয়াছে যে তিনি কাব্যবিচারের এমন এক মানদণ্ড নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন যাহা সর্বকালে, সর্বদেশে, সর্বজনের সমান আদরণীয়, যাহা অব্যভিচারী ও শাশ্বত। আমরাও অভিনবগুপ্তপাদাচার্যের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিব—

"আনন্দ ইতি চ গ্রন্থকৃতো নাম। তেন স আনন্দবর্ধনাচার্য এতচ্ছাস্ত্রদ্বারেণ সহৃদয়হৃদয়েষু প্রতিষ্ঠাং দেবতায়তনাদিবদনশ্বরীং স্থিতিং গচ্ছত্বিতি॥"

কোম্পানির আমলে বাংলাভাষা

শিশিরকুমার দাশ

আহার-কালে যাঁরা অঙ্গুলিকে ঘৃণা, স্নান-কালে তৈলকে ঘৃণা এবং কথোপকথন কালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা করতেন বঙ্কিম তাঁদের বাবু আখ্যা দিয়েছিলেন। এই বাবু-সম্প্রদায়ের আগে এবং পরেও বাংলাভাষাকে তার যথোচিত মর্যাদার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। যতদূর মনে হয় পৃথিবীতে আর কোনো ভাষাকে নিজের দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত হবার জন্য এত দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হয় নি। ইংলণ্ডেও একদা ইংরেজিভাষা অবহেলিত ছিল, জার্মানীতেও জার্মানভাষা অসম্মানিত ছিল, রাশিয়াতে অভিজাত সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ফরাসীভাষায় বাক্যালাপ করতে অভ্যস্থ ছিলেন, সমগ্র ইউরোপেই ল্যাটিনের প্রভুত্ব ছিল ; কিন্তু বাংলাভাষার মত সুদীর্ঘকাল কোনো ভাষাকেই অন্যভাষার প্রভুত্ব সহ্য করতে হয় নি, কোনো ভাষাই সেই দেশের লোকের কাছ থেকে এত উদাসীনতা পায় নি। এই প্রবন্ধে বাংলাভাষার মর্যাদার ক্রমিক বিবর্তনের ইতিহাস -রচনার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকে সিপাহী যুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই মর্যাদার সংগ্রামের পরিচয় দেবার প্রয়াস পেয়েছি। এ সম্পর্কে ধারাবদ্ধভাবে কোনো রচনা এখনও রচিত হয় নি।[১] প্রধানত এই আলোচনায় কলকাতা শহরের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখা হয়েছে— কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে কলকাতা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকেন্দ্র হয়ে উঠল, কলকাতা থেকেই চিন্তাধারা বাংলাদেশের সর্বত্র সঞ্চারিত হয়েছে। যেখানেই সম্ভব কলকাতার বাইরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

১

১৭৫৭ - ১৮০০

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশে, বিশেষ করে শহরগুলিতে, সংস্কৃত ও পারশীর চল ছিল। সংস্কৃত হিন্দুরা ব্যবহার করতেন ধর্মকার্যে ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে। পারশী রাজভাষা, বিচারালয়ের ভাষা। শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এই ভাষা শিখতেন। এই ভাষা না শিখলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকত। ভারতচন্দ্র পারশী না শিখে সংস্কৃত শিখছিলেন বলে তাঁর অগ্রজরা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কারণ পারশী না শিখলে উপার্জন করা যায় না।[২] ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেন তখনও পারশী প্রধান ভাষা। কোনো ইউরোপীয় ভাষার প্রাধান্য তখনও বাংলাদেশে হয় নি। পারশীর

১ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৩৬২ মাঘ ১২) 'ভাষার মুক্তি' নামে একটি প্রবন্ধে বাংলাভাষাকে কিভাবে সংস্কৃত পারশী ইংরেজি ও বর্তমান কালের অন্যান্য ভাষার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে— লিপিবদ্ধ করেছিলেন। অতঃপর প্রবন্ধটি 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা' (১৩৬৮) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ সম্পর্কে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও অসংখ্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন T. W. Clark. প্রবন্ধটির নাম THE LANGUAGES OF CALCUTTA (1760-1840), Bulletin of School of Oriental & African Studies, 1956, XVIII/3, pp. 453-474.

২ বঙ্গভাষার লেখক, পৃ. ২০৩

সঙ্গে সঙ্গে আরবীর চর্চাও অব্যাহত ছিল, তবে বলাই বাহুল্য পারসীর মত ব্যবহারিক মূল্য আরবীর না থাকায় তা পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যে ইউরোপীয় ভাষা প্রচলিত হয় তা পোর্তুগীজ। ইংরেজরা বাংলাদেশে ক্ষমতা পাবার বহু আগে থেকেই পোর্তুগীজ ভাষা বাংলাদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং দক্ষিণ-বঙ্গে এইটি ছিল তখন সাধারণ ভাষা বা Lingua Franca। সাধারণত এই ভাষাতেই ইউরোপীয়রা দেশীয় লোকদের সঙ্গে কথা বলতেন, এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির পরস্পরের সাধারণ ভাষা ছিল পোর্তুগীজ। অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যে চার্টার দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে একটি নির্দেশ ছিল এক-একটি সৈন্যদলের প্রধানেরা ভারতবর্ষে পৌছবার বারো মাসের মধ্যে অবশ্যই যেন পোর্তুগীজ শেখে। লর্ড ক্লাইভ কোনো ভারতীয় ভাষাতেই দক্ষতা অর্জন করতে পারেন নি— কিন্তু তিনিও পোর্তুগীজ ভাষা অনর্গল বলতে পারতেন।[৩] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যে ভাষা প্রায় এক শতাব্দী ধরে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে তার চিহ্নমাত্র ছিল না। তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ হ্যালহেডের ব্যাকরণ। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালহেড সাহেব তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখেছেন যে, 'সংস্কৃত ছেড়ে দিলে আরও তিনটি উপভাষা বাংলাদেশে বলা হয়, অবশ্য সব-ক'টি সমান ভাবে চলে না। পারশিক হিন্দুস্থানী আর খাঁটি বাংলা—এই তিনটি ভাষাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং কোনো একটিকে বাদ দেওয়া চলে না, কোনো একটিকেই গ্রহণ করা চলে না।"[৪]

হিন্দুস্থানী ভাষা যে অষ্টাদশ শতকের শেষে বাংলাদেশে, বিশেষ করে কলকাতা অঞ্চলে, চলত তার নানা প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা হিন্দুস্থানীর উপর কিছুটা নজরও দিয়েছিলেন। শুধু হিন্দী নয়, উর্দুও এ সময় কলকাতায় চলত। হ্যালহেড তার ব্যাকরণে হিন্দুস্থানী ভাষার দুটি রূপ লক্ষ্য করেছিলেন—যদিও তিনি 'হিন্দী' ও 'উর্দু' এই শব্দ দুটি ব্যবহার করেন নি তবু তাঁর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় আমরা আধুনিক কালে হিন্দুস্থানীর সেই দুটি রূপকে হিন্দী ও উর্দু নাম দিয়েছি। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে হিন্দুরা হিন্দী ভাষায় সংস্কৃত শব্দ প্রচুর ব্যবহার করে, মুসলমানরা করে পারশিক। কিন্তু ব্যাকরণের নিয়মগুলি মূলত এক এবং ভাষার গঠনপ্রকৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যাই হোক, মূল কথা হল এই সময় থেকেই কলকাতা বহু ভাষাময় অঞ্চল হয়ে উঠছিল। উইলসন তাঁর সুবৃহৎ আইন ও রাজস্ব সম্পর্কিত অভিধানের ভূমিকায় হিন্দুস্থানী সম্পর্কে লিখেছেন, "যদিও বাংলাই বাংলাদেশের ভাষা এবং বিভিন্ন জেলাতেই তা প্রচলিত তবু কলকাতায় এবং সদর বিচারালয়গুলিতে হিন্দুস্থানী চলে,...

---

৩ দ্রষ্টব্য *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward* ইত্যাদি : John Clark Marshman, Vol. I (1859) pp. 21-22; বাংলাভাষায় পোর্তুগীজ ভাষার স্থান সম্পর্কে : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : *The Origin and Development of the Bengali Language* Vol. I— বাংলা শব্দভাণ্ডার প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। এবং J. J. A. Campos : *History of the Portuguese in Bengal,* Calcutta, 1919, Chap. XVII, pp. 204-227, *History of Bengal,* Vol. 2 (Dacca University)র Dr. S. N. Sen লিখিত পোর্তুগীজ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক সম্পর্কিত অধ্যায়টিও দ্রষ্টব্য।

৪ Nathanial Brassey Halhed : *A Grammar of the Bengali Language* : Printed at Hooghly in Bengal, 1778, Introduction, page vii.

কাজেই হিন্দী বাংলাদেশের পক্ষেও অপরিহার্য"[৫] তখন বলাই বাহুল্য Presidency of Bnegal বললে এক বৃহৎ ভৌগোলিক খণ্ডকে বোঝাত— তার মধ্যে হিন্দীভাষী অঞ্চলও ছিল। তবু বাংলাদেশের অনেক জেলাতেই যে হিন্দী বলা হত তার অভ্রান্ত প্রমাণ উইলসনের লেখা থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। তিনি আরো বলেছেন মুসলিম আমলে আইন ও রাজস্বের ভাষা ছিল পারশী, আরবী ভাষা থেকে প্রচুর শব্দ ঋণও করেছিল। কিন্তু বহু শত বৎসরের ব্যবহারে পারশী দেশীয় ভাষাগুলির প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারে নি। এবং হিন্দুস্থানীর এই ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি, সম্ভবত এক-তৃতীয়াংশ শব্দদান।[৬]

তা হলে দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত, পারশী, আরবী, হিন্দী এবং উর্দু এই পাঁচটি ভাষা এই সময়ে বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে বাংলার স্থান কোথায়। মর্যাদা কতটা। এর উত্তর, বাংলা ভাষার কোনো মর্যাদা ছিল না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা চিরকালই বাংলাকে ঘৃণা করে এসেছেন এবং সংস্কৃত চর্চা করেছেন। ভারতচন্দ্রের আত্মীয়স্বজন তাঁকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন 'শুধু সংস্কৃত শিখিলেই কি দিন যাইবে?… চাকুরি করিতে হইলে পারশী না শিখিলেই চলিবে না'। অতএব বাংলা শিখে ও চর্চা করে পরমার্থও হয় না, অর্থও হয় না। কাজেই বাংলার সম্মান হবারও কোনো কারণ নেই। সংস্কৃত ও পারশী উভয়ের চাপে বাংলা অবনত হয়ে রইল। ক্লার্ক ঠিকই লিখেছেন যে ১৭৬০এ কলকাতায় এবং তার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত বাংলাভাষার স্থান ছিল খুবই নিচুতে। শাসন বা বাণিজ্যিক পদের উচ্চ কর্মচারীরা ইংরেজি, পোর্তুগীজ বা পারশী শিখতেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী হিন্দুরা অন্তত পারশী জানতেন। আর পণ্ডিতেরা সংস্কৃতে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা চিরকাল বাংলাকে অসভ্য ভাষা বলে এসেছেন, এখনও বললেন। হিন্দু সমাজের প্রধানরাই যখন বাংলাকে অবহেলা করলেন তখন বাংলাভাষার দাবি বা তার যে কোনো সম্মান আছে সেটুকুও স্বীকার করার লোক ছিল না।[৭]

হ্যালহেডের সময় অনেকে (সম্ভবত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা) জানত না যে বাংলা বলে একটা আলাদা ভাষা আছে। এবং গিলক্রাইস্ট সাহেব এই ধারণা তৈরি হওয়ায় কিছুটা সাহায্য করেছিলেন। তিনি ছিলেন উর্দুর ভক্ত। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উর্দু অভিধান প্রকাশ করেন এবং তার পরে অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থও সম্পাদনা করেন। তিনি এই ভুল ধারণা কিছুটা সৃষ্টি করেন যে বাংলা একটা 'patois' মাত্র এবং উর্দুই দেশীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে কথাবার্তার একমাত্র ভাষা।[৮]

কোম্পানির রাজত্ব যখন আরম্ভ হল তখন বাংলাদেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্যোগ চলছিল।[৯] সেসব কথা বিস্তারিত লেখার দরকার নেই। কিন্তু এটুকু জানলেই হবে যে রাজনৈতিক অরাজকতা, সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ, দেশী ও বিদেশী ক্ষমতাশালীর লালসা সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটাচ্ছিল। তখন শিক্ষাব্যবস্থা-ভাষাব্যবস্থায় কেউ মনোযোগী হয় নি। ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যের কথা কলকাতার শিক্ষিত লোকেরা ভুলে গেল। পুঁথিগুলি গ্রামে আবদ্ধ রইল। নবীন

---

৫ ও ৬ *A Glossary of judicial and revenue terms*— H. H. Wilson (1855) Introduction, page xx.

৭ Clark: পূর্বে উল্লিখিত। ৮ Calcutta Review (1850), p. 143.

৯ "Over a Society divorced from the State hung the whim of gods and local lords which confined thought by fatalism and action within the simple need of the day."
—*Trade and Finance in Bengal Presidency*: A. Tripathi (Orient Longmans) 1956, pp. 256-9.

মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে লাগল। এই সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা বুঝলেন যে দেশের ভাষা শেখা দরকার। বিলাতে প্রতিষ্ঠিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজে প্রাচ্যভাষা শেখানো শুরু হয়েছিল। কিন্তু আইনের ক্ষেত্রে জটিলতা এড়াবার জন্য ভাষা শেখা যে কত জরুরি তা তাঁরা বুঝতে পারলেন। হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই ধর্মীয় মানুষদের মধ্যে বহুকাল থেকে অজস্র আইন চলে আসছে, তার সঙ্গে রোমান আইনের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিদের যোগ অল্প ছিল। তাই অবিচার ও ভুল বিচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আইন অনুবাদ আরম্ভ হল। ১৭৮১ খৃস্টাব্দে Judicial Code পারশী ও বাংলা ভাষায় অনুবাদ হল।[১০] আইন না জানার জন্য অনেক বিশৃঙ্খলা হচ্ছিল। হ্যালহেড তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। নন্দকুমারের বিচারের সময় বিচারপতিরা কোনো ভারতীয় ভাষা জানতেন না। তা ছাড়া ভাষা না জানার ফলে বিচার হতে অনেক বিলম্ব হত। ভুল বিচারের সম্ভাবনাও কম ছিল না।[১১]

আইন সংক্রান্ত গোলমাল থেকে মুক্তি পাবার জন্য ১৭৯৩ সালে আইন সংস্কার হল— তাতে দেখা গেল বিচারালয়ে বাংলার স্থান কিছুটা বেড়েছে। এবার থেকে বিচারালয়ের নির্দেশ এবং বিবরণী পারশী কিংবা বাংলায় লেখাও হতে পারে, ছাপা হতে পারে। তা ছাড়া সদর দেওয়ানি আদালতে কিছু কিছু বাংলা-জানা লোকেরও আমদানী হল।[১২]

হেস্টিংস সাহেব ভারতীয় সাহিত্যে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ১৭৮১ সালে তিনি কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে অক্সফোর্ডে পারশী ভাষার একটি অধ্যাপকপদ সৃষ্টি হোক। এ নিয়ে তিনি কোম্পানিদের বড় কর্তাদের সঙ্গে লেখালেখিও করেছিলেন।[১৩] কোম্পানির প্রথম আমলে পারশী-জানা লোক খুবই দরকার। রামমোহন রায়ও কিছুদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে কাজ করেছেন।[১৪] প্রচুর মৌলবী ও পণ্ডিত তখন কলকাতায় অর্থোপার্জনের জন্য এসে জমায়েত হয়েছিলেন।[১৫] হেস্টিংস সংস্কৃত সম্পর্কেও উৎসাহী ছিলেন কারণ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের সম্পর্ক তাতে দৃঢ়তর হবে।[১৬] সাহেবরা সংস্কৃতচর্চাতেও মনোযোগী হলেন। সংস্কৃত ভাষা শিখে মুগ্ধ হলেন। বিদেশে তার মহিমাকীর্তন করলেন। এ দেশে সংস্কৃতচর্চার আরেক নতুন ধারা সৃষ্টি হল। সংস্কৃত শিখতে অবশ্য সাহেবদের কষ্ট পেতে হয়েছিল কারণ ব্রাহ্মণরা বড় সহজে শেখাতে রাজী হন নি। হ্যালহেড লিখেছেন, হিন্দুদের এইসব শাস্ত্র শুধুই উচ্চবর্ণে সীমাবদ্ধ ছিল, তাদের ধর্মগ্রন্থকে তারা নিজেদের মধ্যে গোপন করে রাখতে চাইত। বিদেশীর কাছে ভাষা বা ধর্ম শেখালে সমাজেও অপ্রিয় হতে হত।[১৭] শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "আমার পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বাগ্রে ইংরাজ গবর্নমেন্টের অধীনে পণ্ডিতী কর্ম লইয়া সকলের

---

১০ *The Central Administration of the East India Company*, 1772-1834, B. B. Misra, Manchester, 1959, page 25.

১১ *The Judicial Administration of the East India Company in Bengal*, 1765-1782, B. B. Misra, pp. 519-20. (লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত থিসিস ১৯৫৭)

১২ Misra : *Central Administration* : পূর্বে উল্লিখিত পৃ. ২৪৮, ২৪৮এর পাদটীকা

১৩ Misra : *Central Administration* : পৃ. ৩৩৮

১৪ সাহিত্যসাধকচরিতমালা ১, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৯

১৫ সাহিত্যসাধকচরিতমালা ১, পৃ. ৪৯ ১৬ Misra : *Central Administration*. পৃ. ৩৯৩

১৭ Halhed : পূর্বে উল্লিখিত x-xi.

অপ্রিয় হইয়াছিলেন।"[১৮] অর্থাৎ পণ্ডিতেরা তখন সংস্কৃত ভাষার পবিত্রতা রক্ষার জন্য খুব ব্যগ্র ছিলেন বোঝা যায়।

এহেন সময়ে হ্যালহেডই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলা ভাষার পক্ষে ওকালতী করতে এলেন। ইনি প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলা ভাষার সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছিলেন। ইনি সিভিলিয়ানদের বাংলা শিখতে অনুরোধ করলেন। সরকারকে বললেন, পারশী পরিত্যাগ করে বাংলা গ্রহণ করো। অন্যসব বৈষয়িক কারণ ছেড়ে দিয়েও যে কারণের উপর হ্যালহেড জোর দিলেন তা হল বাংলা ভাষার ধর্মের উপর। বললেন, পারশীর অতিপল্লবিত বাক্য ও অতিদীর্ঘায়ত জটিল পদবন্ধের চেয়ে বাংলার সরলতা সংক্ষিপ্ত এবং নিয়মিত পদগঠনের ক্ষমতা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও কর্মক্ষেত্রের উপযোগী।[১৯] ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ বাংলা দেশের ইতিহাসে এই কারণেই স্মরণীয়। আরো স্মরণীয় যে এই বছর যে ব্যাকরণ ছাপা হল তাতে বাংলা অক্ষরও ছাপা হল। উইলকিন্স অক্ষরগুলি তৈরি করেছিলেন। হ্যালহেড উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁকে। হ্যালহেডের ব্যাকরণে সব উদাহরণ কবিতা। গদ্য উদাহরণ আছে—একটিমাত্র চিঠি। এই অবহেলিত ভাষাকে হ্যালহেড প্রথম রাজসম্মান দিলেন সন্দেহ নেই।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নর্থহ্যামটনের এক গ্রামের মুচির পুত্র উইলিয়াম কেরী বাংলাদেশে বেআইনী ভাবে গিয়ে হাজির হলেন। এই অসামান্য মনীষীর কাছে বাঙালি সংস্কৃতি নানাভাবে ঋণী। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে এই বহুভাষাবিদ্ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ খ্রীষ্টান মিশনারী বাংলাদেশে উপস্থিত হলেন। হ্যালহেডের বক্তব্যকে ইনি শুধু মানলেন তাই নয়, ইনি এক ভবিষ্যদ্বাণী করলেন :

"যদি বাংলাভাষা যথার্থভাবে চর্চা করা হয় তবে যে সমস্ত ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ও ভাববাঞ্জক তাদেরই পাশে তার স্থান হবে"।[২০]

২

১৮০১ - ১৮১৬

লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮০১ ৪ঠা মে তারিখে উইলিয়াম কেরী এই কলেজে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন। এই তারিখ নানা কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয়। ওয়েলেসলির উদ্দেশ্য ছিল সাধু। বাংলাদেশে সদ্য আগত সিভিলিয়ানরা যাতে এই দেশ সম্পর্কে জানে সেই ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন তিনি। দেশের ভাষা সাহিত্য ইতিহাস সবকিছুর সঙ্গে তাদের যোগ হোক, সেইসঙ্গে সাধারণ ভাবে অন্যান্য নানা বিষয়েও তাদের বুদ্ধি নিয়োজিত হোক এই ছিল তাঁর আশা। কিছু কালের জন্য ওয়েলেসলির এই ইচ্ছা

---

১৮ আত্মচরিত (সিগনেট সংস্করণ) ১৩৫৯; পৃ. ১২

১৯ Halhed : পূর্বে উল্লিখিত —xvii . . "it is much better calculated both for public and private affairs by its plainesss, its precision and regularity of construction; than the flowery sentences and modulated periods of the Persian."

২০ W. Carey : *A Grammar of the Bengali Language* (Serampore, 1801) preface, p. iv. "Were it properly cultivated, would be deserving place among those which are accounted the most elegant and expressive."

পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বড় কর্তারা কোনোদিনই এই মহৎ উদ্দেশ্য বোঝেন নি, হয়তো বুঝতে চান নি। তাঁরা বাধা দিয়েছেন, অক্লান্ত উদ্যমে ওয়েলেসলি এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন—তাঁর একটি চিঠিতে তিনি ব্যাকুল হয়ে লিখেছেন "এই কলেজকে রাখতেই হবে, তা না হলে আমাদের সাম্রাজ্যও থাকবে না"[১]; কেরীও তাঁর সংস্কৃত-ভাষণে বলেছিলেন এই প্রতিষ্ঠান ইংরেজ শাসনের সহায়ক, দেশীয় মানুষের সঙ্গে শাসকদের বিভেদের প্রাচীর ভেঙে ফেলবে এই প্রতিষ্ঠান। যাই হোক এইখানে বাংলাভাষা-শিক্ষার প্রথম সুচারু ব্যবস্থা হল। দেশের সেরা পণ্ডিতরা এসে বসলেন। বাংলাভাষায় গদ্যরীতির পরীক্ষা শুরু হল। প্রায় বছর-বারোর মধ্যে বাংলা গদ্যরীতির একটা আদর্শ কাঠামো তৈরি করলেন রামরাম বসু, চণ্ডীচরণ, রাজীবলোচন ও মৃত্যুঞ্জয় মিলে! রামরামের দুর্বল গদ্য মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিকায় অসাধারণ সফলতা অর্জন করল। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বিভিন্ন চরিত্রের মুখের ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করলেন মৃত্যুঞ্জয়। কলেজের মধ্যে যখন কেরী আর তাঁর সহকর্মীরা বাংলাভাষার গদ্যরীতি গড়ছেন তখনও বাংলার সম্মান কতটা, মর্যাদা কতটা? কলেজের মধ্যেও ছাত্রমহলে তার বিশেষ সম্মান ছিল না, "কেরীর পক্ষে ক্লাস করাও কঠিন হত"[২]। এবং বলাই বাহুল্য সাধারণ বাঙালিরা বাংলা শিক্ষা বা বাংলা সাহিত্য নিয়ে চর্চা করার কথাই ভাবত না। আসলে বাংলা সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙালির বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। রামমোহন তাঁর বাংলা ব্যাকরণে বাংলা কবিতা সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন তা বিশেষ উৎসাহজনক নয়। যদিও এই ব্যাকরণ ১৮৩৩এ প্রকাশিত তবুও এই সময়কার বাঙালির মনোভাব যে এর থেকে কিছু আলাদা ছিল তা মনে করার কোনো কারণ নেই। ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যে পারশী এবং উর্দুর প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাইরে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান বাংলাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিল। প্রথমেই স্মরণীয় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস (১৮০০), পরে যার নাম হয়েছে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস। কোনো সন্দেহ নেই ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যই ছিল মুখ্য, কিন্তু এ কথা বলেই এই প্রেসের মূল্য ছোট করা যায় না, এখান থেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থগুলিও প্রকাশিত হচ্ছিল। এস. পিয়ার্স কেরী তাঁর গ্রন্থে লিখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন যে কেরী বাংলা-ভাষায় উৎসাহ জাগাবার কাজে প্রধান পথিক।[৩] এ কথা পুরোপুরি সত্য।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বাইবেল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং ১৮১৭ খৃস্টাব্দে স্কুলবুক সোসাইটি। এই সব প্রতিষ্ঠানই বাংলাভাষাকে বিশেষভাবে অবলম্বন করেছিলেন। মিশনারীরা ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশীয় খ্রীষ্টান শিশুদের বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব করলেন এবং সেখানে বাংলাভাষাকে একটি অন্যতম বিষয় বলে মনে করা হল।[৪] বিভিন্ন মিশনারী সম্প্রদায় এই সময়ে কলকাতা ও তার আশে পাশে স্কুল খোলার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। এবং ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কলকাতা অঞ্চলে প্রায় দুশোটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল এবং সেগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হল বাংলা।[৪]

১ Marshman : পূর্বে উল্লিখিত পৃ. ১৭০

২ Calcutta Review (1850), p. 132.

৩ S. Pearce Carey : *William Carey* (London, 1923) p. 204 "Rabindranath Tagore told the author in 1921".

৪ Clark : পূর্বে উল্লিখিত

অন্য ভাষাগুলির অবস্থা দেখা যাক। পারশী এখনও অচল অটল অবস্থায় আছে। কোর্টে এখনও তার প্রতিষ্ঠা। কলকাতায় বিভিন্ন মাদ্রাসায় এখনও তার শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট। বলাই বাহুল্য তখনও পারশী ভাষা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই শিখছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তার প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে। আরবীর চর্চাও অব্যাহত আছে, যদিও পূর্ববৎ আর্থিক কারণেই কিছুটা সীমাবদ্ধ। উর্দু এবং হিন্দী উভয় ভাষাই কলকাতায় মোটামুটি আগের মতই আছে। শুধু বাংলার মর্যাদা কিঞ্চিৎ বেড়েছে। এবং সব চেয়ে লক্ষণীয় যে, সংস্কৃত পণ্ডিতদের মনোভাব কিছুটা বদল হতে আরম্ভ করেছে। কারণ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সংস্কৃত পণ্ডিতরা যোগদান করেছেন এবং বাংলাভাষা-রচনাতে অগ্রণী হয়েছেন। পারশীর প্রভাব এখন বাংলা গদ্যে যথেষ্ট পড়তে শুরু করেছে। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র থেকে একটু উদাহরণ দিই—

পৃ. ৩-১২	সংস্কৃত শব্দসংখ্যা	২৭৩	পারশী শব্দসংখ্যা	৪০
পৃ. ২৮-৩৮	সংস্কৃত শব্দসংখ্যা	২১২	পারশী শব্দসংখ্যা	৫১
পৃ. ৭৪-৮৫	সংস্কৃত শব্দসংখ্যা	৩৩৩	পারশী শব্দসংখ্যা	২৭

অন্যপক্ষে সংস্কৃত পণ্ডিতরা এখন বাংলা লিখতে শুরু করেছেন, ফলে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য হতে আরম্ভ করল। কারণ সংস্কৃত পণ্ডিতরা যে বাংলাকে শ্রদ্ধা করেন তা নয়, তাঁরা বাংলাকে সংস্কৃতজাত ভাষা হিসেবে, অর্থাৎ বংশগত খাতিরে, তাকে সম্মান দিতে চাইলেন, সেইসঙ্গে স্থির করলেন যে সংস্কৃত শব্দবাহুল্যই বাংলাভাষাকে মহিমা দিতে পারে। অতি শক্তির অধিকারী মৃত্যুঞ্জয়ও তাই মনে করতেন। গত শতকে পণ্ডিতেরা বাংলাকে অবহেলা করেছিলেন, এই শতকে তাঁরা বাংলাভাষাকে তাঁদের খুশিমত গড়ে নিতে চাইলেন। এবং এখনও সংস্কৃত ভাষাই তাঁদের চরম শ্রদ্ধা ও পরম গৌরবের বিষয়।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো কাশী হিন্দু কলেজ পুনর্গঠন করার বিষয় এক খসড়া তৈরি করলেন। এবং অন্যত্রও এই ধরণের কলেজ করতে চাইলেন। তাতে তিনি বললেন[৫] যে "বৃটিশ সাম্রাজ্য যদি এই সাহিত্য বিষয়ে হিন্দুদের আগ্রহশীলতায় উৎসাহ দিতে না পারে এবং ইউরোপের জ্ঞানীগুণীর কাছে এই সাহিত্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে না পারে তবে তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।" এই চিঠির পর সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য প্রচুর অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা হয়েছিল। অর্থাৎ কোম্পানি সংস্কৃত শিক্ষা ও পারশী শিক্ষার জন্য অর্থসাহায্যে অগ্রণী হয়েছিল, কিন্তু বাংলার শত শত গ্রাম যে তিমিরে সেই তিমিরে। কলকাতা শহর গড়ে উঠছিল। ইংরেজি ভাষা তখন সবে লোকের সামনে এসেছে। তখনও ইংরেজি-পাঠ চালু হয় নি। ইংরেজি শিক্ষার চিন্তাও কোম্পানি করছে না। তখন ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে কাজ চলে যাচ্ছে! রাজনারায়ণ বসু এসময়কার ইংরেজির অবস্থা ভালো বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন "তখন পারশী পড়ার বড় ধূম··· কেহ কেহ আরবী ব্যাকরণ একটু

৫ *Minutes on Education from Indian Education in Parliamentary Papers*, pt. I (A. N. Basu) 1952, p. 145. ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে India Act-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় শিক্ষার বিস্তার ও পুনর্জাগরণের দায়িত্ব গ্রহণ করল। ১৮১৫তে কিছু টাকা ভারতীয় সমাজের ভদ্র ব্যক্তিদের প্রতি ব্যয়িত হবার ইঙ্গিত দেওয়া হল। দ্রষ্টব্য *Intellectuals and Society in 19th Century India*: S. S. Tangri (Comparative Studies in Society and History, Vol. III, No. 4, July, 1961, Holland), p. 369.

একটু পাঠ করিতেন।" আর বিবাহসভায় ইংরেজি জ্ঞানের পরীক্ষা হত "কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন How do you spell Nebuchadnezzar? কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন How do you spell xerxes?" আর ইংরেজি জ্ঞানের যে অপূর্ব বহর তখনকার কেরানিকুল দেখাতেন তার রসোজ্জ্বল গল্পগুলি রাজনারায়ণ একালের পাঠককে শুনিয়েছেন।[৬] রাজনারায়ণের ছেলেবেলাতেই যখন সাধারণ মানুষের ইংরেজি জ্ঞান বেশিদূর এগোয় নি, তখন বলাই বাহুল্য আমাদের আলোচ্য সময়ে তা ছিল আরো অনেক কম। অর্থাৎ পারশী আর সংস্কৃতের দাপট চলছিল। তবে লোকে বুঝে ফেলেছিল যে ইংরেজি শিখলে পয়সা হয়, কাজেই নিতান্ত আর্থিক কারণেই ইংরেজি শেখার আগ্রহ বাড়ছিল।

১৮১৬ মে মাসে কলকাতার ব্রাহ্মণরা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ হাইড ইস্টএর সঙ্গে দেখা করে বলেন যে কলকাতার হিন্দুরা তাঁদের ছেলেদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান চান, যেখানে ইউরোপীয় শিক্ষা-পদ্ধতিতে তাঁদের সন্তানেরা শিখবেন এবং এই ব্যাপার নিয়ে একটি সভা করতে বলেন। ১৮১৬ ১৪ই মে সার্ হাইড কলকাতার প্রধান ব্যক্তিদের একটি সভা আহ্বান করেন। সেখানে তিনি বলেন যে "এই সভায় প্রধান আলোচ্য বিষয় হল বিশেষভাবে বাংলা ও ইংরেজির চর্চা, তার পর হিন্দুস্থানী, তার পর পারশী...।"[৭] এই সময়ে কলকাতার হিন্দুদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছিল। তারই প্রকাশ হল হিন্দু কলেজ।

এই সময়ের আর দুটি ঘটনা উল্লেখ করলে বাংলা ভাষার অবস্থা আরো স্পষ্ট হবে। রামমোহন রায় সর্বপ্রথম বাংলাভাষাকে তার দুর্বলতার অপবাদ থেকে মুক্তি দিলেন বাংলাভাষায় বেদান্ত সম্পর্কে আলোচনা করে (১৮১৫-১৮১৬)। তিনি প্রমাণ করলেন অতি কঠিন ও জটিল বিষয় বাংলাভাষায় আলোচনা করা সম্ভব এবং যথেষ্ট ভালোভাবেই করা সম্ভব। শুধু তাই নয়, তিনি বাংলাভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করে পণ্ডিতদের রক্ষণশীলতায় আর-এক বার আঘাত করলেন। ঠিক এই সময়ই (১৮১৬) জশুয়া মার্শম্যান ঘোষণা করলেন যে মাতৃভাষায় শিক্ষা না দেওয়ার মত মূঢ়তা আর নেই। মার্শম্যান বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা-দানের যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তার বিবরণ তাঁর বৃহৎ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে।[৮]

১৮০১ থেকে ১৮১৬ এই সময় পর্যন্ত দেখা গেল বাংলাভাষার যে সামান্য উন্নতি হয়েছে তা মূলত বিদেশীদের চেষ্টায়, এবং তার ফলে বাংলার সামান্য সম্মানও বেড়েছে। এর পরবর্তী ইতিহাস আরো বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক।

৩

১৮১৭ - ১৮৩৫

এই আঠারো বছর বাংলা দেশের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। এই কলেজ থেকে যে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় তৈরি হল তারা উনবিংশ শতাব্দীর এবং কিছু পরিমাণে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ আরও স্মরণীয়, কারণ দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পরে পারশীভাষা কোর্ট থেকে উঠে গেল। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইতিমধ্যে

৬ সেকাল আর একাল (১৮৭৪ এ প্রকাশিত)— সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণ, পৃ. ৪, ২৩, ২৬-২৭, ৫৩ বিশেষ দ্রষ্টব্য

৭ R. C. Mazumdar: *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century* (Calcutta, 1900). পৃ. ২৫

৮ Marshman: পূর্বে উল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২, পৃ. ৫১-৫২

কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যারা এই সময়েই বাংলা সংস্কৃতিকে গড়ে তোলায় বিশেষ সাহায্য করেছে। ১৮১১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা বাইবেল সোসাইটি'কে কেউ কেউ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওয়াইক্লিফের ইংরেজি ভাষার প্রতি বা লুথারের জার্মান ভাষার প্রতি দানের তুলনা করেছিলেন বিশেষ করে ভাষাগুলিকে মর্যাদা দানের দিক থেকে।[১] 'ক্যালকাটা বুক সোসাইটি' ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হল।[২] 'চার্চ মিশনারী সোসাইটি' (১৮২১) ও 'ক্রিস্টিয়ান নলেজ সোসাইটি' (১৮২২) প্রতিষ্ঠিত হল।

এখন বাংলার স্থান অন্যান্য ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যেতে পারে। সংস্কৃতভাষার সম্মান অক্ষুণ্ণই ছিল এবং গত দুটি সময় -কালের মতই সংস্কৃত শিক্ষা মূলত অর্থাগমের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তবে উনবিংশ শতাব্দীর আগে থেকেই বিভিন্ন বিদেশী মনীষী সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে থাকেন। বিদেশে সংস্কৃতের কথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তার ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল রত্নকোষের প্রতি যেমন বিদেশীরা আকৃষ্ট হতে থাকেন, তেমনই বিশেষ বিশেষ জ্ঞানশাখায় বিপ্লবের সঞ্চার হয়। ইতিহাস এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এই বিপ্লবের ঢেউ সর্বপ্রথম অনুভূত হয়। ১৭৮৪ ১৫ই জানুয়ারি সার্ উইলিয়ম জোন্স 'দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠা করেন। তার ফলে সংস্কৃতের আন্তর্জাতিক খ্যাতি যেমন ছড়িয়ে পড়ে তেমনই সংস্কৃত পণ্ডিতের আত্মকেন্দ্রিকতা অনেক পরিমাণে ভেঙে যেতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই অনেক ব্রাহ্মণ সাহেবদের সংস্কৃত পাঠ দিতে স্বীকৃত হন ও প্রথম যুগের বাংলা গদ্য তাঁরাই রচনা করতে এগিয়ে আসেন। ১৮১৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চার্টারে বিশেষভাবে সংস্কৃত ও আরবী ইত্যাদি ভাষার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এই পর্বেও সংস্কৃত তার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। এবং এর চরম বিকাশ হল ১৮২৪ ১লা জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠায়।

পারশী এখনও রাজভাষা কিন্তু তার প্রতিপত্তি কমতে শুরু করেছে। বাঙালি হিন্দুরা ইংরেজি শিখতে শুরু করেছেন। এবং ইংরেজি বেশ ভালোই লিখতে পারছেন। তার প্রমাণ রামমোহন।[৩] অ্যাডামএর রিপোর্ট থেকে পারশী ও বাংলা জানা লোকের একটি আনুপাতিক সম্পর্ক জানা যাচ্ছে :[৪]

পারশী জানা	ও	বাংলা জানা লোকের অনুপাত	১ : ১২$\frac{৩}{৬}$ বা ১২$\frac{১}{২}$
পারশী জানা মুসলমান	ও	বাংলা জানা হিন্দুর অনুপাত	১ : ১৯ বা ১৯$\frac{৩}{৬}$
বাংলা জানা মুসলমান	ও	বাংলা জানা হিন্দুর অনুপাত	১ : ২৩$\frac{১}{২}$ বা ২৪
পারশী জানা মুসলমান	ও	পারশী জানা হিন্দুর অনুপাত	১$\frac{৩}{৬}$: ১
পারশী জানা মুসলমান	ও	বাংলা জানা মুসলমানের অনুপাত	১$\frac{৩}{৬}$: ১
পারশী জানা হিন্দু	ও	বাংলা জানা হিন্দুর অনুপাত	১ : ৩১$\frac{৩}{৪}$ বা ৩২$\frac{১}{৪}$

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে পারশী বিদ্যার চর্চা কিছুটা কমেছে। যদিও এর থেকে পারশীচর্চা

১ Calcutta review (1850), p. 139 . . . "in point of craning up their respective tongues to a certain status."

২ Calcutta Review (1850), p. 141 : লেখক লিখেছেন ১৮১৭য় ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই বছরেই 'উলাবিবি' নামে একটি দেবী হিন্দুদের দেবদেবীর তালিকায় প্রবেশ করেন।

৩ দ্রষ্টব্য *The English Works of Raja Rammohan Ray,* edited by J. C. Ghose, Calcutta 1901.

৪ Calcutta Review (1850), p. 140.

কেমন ছিল তা বোঝবার মত গাণিতিক প্রমাণ আমাদের হাতে নেই, তবু এ কথা স্পষ্ট যে ইংরেজির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে পারশীর চর্চা কমছিল, এতেও কোনো সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিকেরা তখনকার বিভিন্ন পত্রিকাগুলি দেখলে হয়তো এর প্রমাণ পাবেন। টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর (১৮৫৮) মধ্যে বাবুরামবাবুর সন্তানের শিক্ষাব্যবস্থার কথা যদি সহৃদয় পাঠক দেখেন তা হলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন রাজনারায়ণ বসুর কাহিনীগুলির সঙ্গে তাঁর আন্তরিক মিল আছে। সাহিত্যপরিষদ সংস্করণে (পৃ ১১) ইংরাজি শিক্ষার প্রাথমিক অবস্থার ছবি যেমন আছে— তেমনই (পৃ. ৪) একটি ছত্র আছে যে বাবুরামবাবু তাঁর দুলালটির জন্য ফারসী-শিক্ষার ব্যবস্থা করে "পরে ভাবিলেন যে ফার্সির চলন উঠিয়া যাইতেছে, এখন ইংরাজী পড়ান ভাল"।

কিন্তু "উঠিয়া যাইতেছে" এ কথা সত্য হলেও তখনও তার শেষ রেশ মিলায় নি। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা স্কুলবুক সোসাইটির বার্ষিক সভার বিবরণী ইংরেজি এবং পারশী উভয় ভাষাতেই পঠিত হয়েছিল। ১৮৩৮এর তৃতীয় রিপোর্টে অ্যাডাম বাংলাদেশের যে বিদ্যালয়ের তালিকা দিয়েছিলেন তা স্বভাবতই পরবর্তী পর্ব সম্পর্কে সত্য তবু তার থেকে পারশীর স্থান কিছুটা আন্দাজ করা যাবে।[৬]—

জেলা	থানা সংখ্যা	বাংলা স্কুল	ওড়িয়া স্কুল	পারশী স্কুল	ইংরেজি	হিন্দী	সংস্কৃত	আরবী
মেদিনীপুর	১৭	৫৪৮	১৮২	৪৮	১	-	-	-
মুর্শিদাবাদ	২০	৬২	-	৩৭	২	৫	২৪	২
বীরভূম	১৭	৪০৭	-	৭১	২	৫	৫৬	২
বর্ধমান	১৩	৬২৯	-	৯৩	৩	-	১৯০	১১

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তথা বাংলা সামাজিক আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয় দিগ্‌দর্শন। এখনও পর্যন্ত বাংলা ভাষাকেই চরমভাবে সংবাদপত্র-বাহন করা হয় নি। এই পত্রিকাটি দ্বিভাষিক— ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত। এই সময় থেকে বাংলাদেশে দ্বিভাষিকতার উৎপত্তি। শুধু পত্রপত্রিকার মধ্যেই নয় হিন্দু কলেজ থেকে যে নতুন ইংরেজিশিক্ষিত শ্রেণী জন্ম নিল তারাই বাংলাদেশে প্রায় এক শত বছরেরও বেশি এই দ্বিভাষিকতার ধারক ও বাহক। বাংলাদেশে প্রায় একশত বছরেরও বেশি এই দ্বিভাষিকতা চলেছিল, এবং এখনও তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। এই পত্রিকাগুলি বাংলাভাষার বিকাশকে যেমন ত্বরান্বিত করল তেমনই বাংলার জনমতগঠনে সাহায্য করল। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৫এর মধ্যে বাংলা পত্রিকা চারটি এবং পারশী পত্রিকা দুটি প্রকাশিত হল। এই দুটি কাগজের প্রত্যেকটির প্রায় ১০০ জন গ্রাহক ছিল এবং স্বভাবতই পাঠকসংখ্যা আরও বেশি ছিল।[৭] ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা ট্র্যাক্ট সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হল। তারা ১৮২৩

---

৫ Calcutta Review (1850), p. 144-45.

৬ *Third Report on the State of Education in Bengal etc.* By William Adam, Calcutta (1838), pp. 37-38.

৭ Calcutta Review (1850), p. 153.

থেকে ১৯৩৫এর মধ্যে নিম্নলিখিত ভাষায় বই প্রকাশিত করলেন। তার বিবরণ এই "টেবল" থেকে পাওয়া যাবে :[৮]

ভাষা	ট্র্যাক্ট সংখ্যা	পৃষ্ঠা সংখ্যা	কপির সংখ্যা	সমূহ পত্র সংখ্যা
বাংলা	৭৮	৩,২২২	৩৩১,৭০০	৭,৫৯৩৫০০
হিন্দুস্থানী	৩০	১,০০৩	১০০,০০০	৩,০৪৩০০০
হিন্দী	১০	২৬৫	৪২,১৫০	৫৯১,৩০০
ওড়িয়া	২	৯২	৫,৫০০	১৫৪০০০

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাভাষায় মোট ৩০টি বই প্রকাশিত হয়েছিল, প্রত্যেকটি সংখ্যা ১০০০ ক'রে। ৩০,০০০ কপি এক বছরেই বিক্রি হয়েছিল। অর্থাৎ পত্রিকা বই বিক্রি এবং মিশনারীদের ট্র্যাক্ট ছাপা থেকে বোঝা যায় যে তখন ক্রমশই বাংলা পাঠক বাড়ছিল। কিন্তু সম্ভবত তারা শিক্ষিত বাঙালি (অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষিত) পাঠক নয়।

সব চেয়ে বড় ঘটনা হল ইংরেজি শিক্ষা ও প্রাচ্যশিক্ষার দ্বন্দ্ব। এর উপরেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ভাগ যেমন নির্ভর করছিল তেমনই বাংলাভাষার মর্যাদাও নির্ভর করছিল। লর্ড বেণ্টিঙ্ক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পক্ষে ছিলেন এবং মেকলে ও রামমোহন রায় দুইজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পক্ষে; অন্য দিকে প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষে এক বিরাট দল। আজ এই ঘটনাটির তাৎপর্য যতখানি— সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে এর দাম আরো বেশি ছিল। ১৮৩৩ পর্যন্ত বোঝাই যাচ্ছিল না কে এই দ্বন্দ্বে জয়লাভ করবে।[৯] ইংরেজি ক্রমশই জনচিত্তে রেখাপাত করেছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি পড়াবার ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা তা ভালোভাবে গ্রহণ করে নি। অন্য দিকে সরকার চাইছিল ইংরেজিকে ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশে শিক্ষা ও শাসনের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে। অর্থাৎ স্পষ্টই তখন তিনটি স্রোত দেখা দিয়েছিল: একটি সরকারের ইচ্ছা; অন্যদিকের জনগণের ইচ্ছা দুটি স্রোতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল— একদল চেয়েছিল প্রাচ্য শিক্ষা— অন্যদল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা। উইলসন বা প্রিন্সেপ একদলের মনোভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু বেণ্টিঙ্কের দৃঢ় ইচ্ছা এবং কোর্ট অব্ ডিরেকটারদের সংকল্প এবং মেকলের ও রামমোহনের চেষ্টা সফল হল। ১৮৩৫ মার্চ মাসে ঘোষণা করা হল যে ইংরেজিরই মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাই দেওয়া হবে। অর্থাৎ কোম্পানি সংস্কৃত ও পারশীর যে পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন তা সম্পূর্ণভাবে শেষ হল। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের এক অংশ এই ব্যবস্থাকে খুশিমনে গ্রহণ করতে পারলেন না। ১৮৩৫ সালে সংস্কৃত কলেজে চিকিৎসাবিদ্যার এক শাখা খোলা হয় এবং তাতে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়, তাকে সংস্কৃত পণ্ডিতেরা ভালোভাবে গ্রহণ করতে

৮ Calcutta Review (1850), p. 153.

৯ Clark : পূর্বে উল্লিখিত

পারেন নি। ইংরেজি ভাষার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। ১৮৩৫এর এই চরম সংকল্পে বাংলাভাষার বিকাশের ইতিহাসের আর-একটি জটিল পর্ব শুরু হল।

পূর্বেই বলেছি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই ইংরেজি-জানার ঝোঁক বাঙালি ছাত্রদের মধ্যে ক্রমেই বাড়ছিল। এই পর্বে তা আরও বাড়ে। ভয়াবহ রূপেই বাড়ে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল একটি কাগজে সর্বপ্রথম একদল বাঙালি চেয়েছিলেন যে একটি ইংরেজি ব্যাকরণ ও অভিধান লেখা হোক।[১০] এই পর্বে বাঙালির ইংরেজি শেখার ঝোঁক চরমে উঠেছে। তার ভালো ও মন্দ দুইই ছিল। সে সব কথা পরে হবে।

সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি পড়ানো নিয়ে সমাচার দর্পণ বিশেষভাবে আপত্তি করেছিল কারণ "সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ইংরেজি পড়িলে উভয়ভ্রষ্ট হইয়া একেবারে নষ্ট হইবেক"।[১১] অন্য দিকে হিন্দু কলেজে ইংরেজি ভাষার প্রতি অতি তীব্র আসক্তি দেখা দিয়েছে। সমাচার দর্পণ ইতিমধ্যে ইংরেজিকে আদালতের ভাষা করার জন্য মতামত দিয়েছে।[১২] হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে মনঃপ্রাণ নিবেদন করেছে তারও নানা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ইংরেজি স্কুল খোলারও সাড়া পড়ে গেল। অ্যাডামএর রিপোর্ট থেকে তার ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে। এবং এখনকার ইংরেজি শেখা আর শুধুই "কেরানির পদপ্রাপনার্থে" নয়; "ইংগ্লণ্ডীয় অতিশয় কঠিন পুস্তকও গূঢ় বিদ্যা আক্রমণ করিতে সাহসীক হইয়াছে"।[১৩] সার্ যদুনাথ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। একজন বিদেশী মোটরলঞ্চে করে যাচ্ছিলেন, তাঁর হাতে ছিল একটি ইংরেজি বই। একদল ছাত্র সেই বইটি দেখে সেটি তাঁর কাছে চাইল। অগত্যা তিনি একটি মাসিক পত্রের একটি একটি প্রবন্ধ খুলে সকলের হাতে দিলেন। তারাও খুশি হয়ে সেই ইংরেজি লিখিত প্রবন্ধ পড়তে লাগল।[১৪] সমস্ত ঘটনা থেকে বোঝা গেল যে এইবার বাংলাদেশে দুই ভাষার লড়াই— ইংরেজি ও বাংলা। ইংরেজিভাষা প্রধানভাষা হিসেবে আইনত স্বীকৃত শুধু নয়, জনচিত্তের স্বীকৃতিও পেল। আর বাংলাভাষার ধীরে ধীরে মর্যাদা বাড়ছিল। এই পর্বে বাংলা সম্পর্কে শিক্ষিত চিত্তের কিছুটা কৌতূহল বাড়ল। তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ যে সমাচার দর্পণে বহুলোক বাংলাভাষা সম্পর্কে নানা চিন্তার প্রকাশ করেছেন। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র ১ম খণ্ডে "সাহিত্য ও ভাষা" অধ্যায়ে তার সুবিস্তৃত পরিচয় আছে। অন্য দিকে মৃত্যুঞ্জয় তাঁর প্রবোধচন্দ্রিকা লিখে বাংলাভাষার বিভিন্ন ভাষারীতির পরিচয় দিলেন; শুধু তাই নয়, বাংলাগদ্যের একটি বড় সড়ক তৈরি করে দিলেন। আর খ্রীষ্টধর্ম-ব্রাহ্মধর্ম-হিন্দুধর্ম— এই তিন ধর্মের লড়াই শুরু হল বাংলা পত্রিকাগুলির মধ্যে, সৌভাগ্যক্রমে বাংলাভাষাই হল সেই লড়াইএর ভাষা। ফলে ১৮৩৫এর মধ্যেই বাংলা গদ্যের অভাবনীয় উন্নতি হল— রীতির দিক থেকে পাঠযোগ্য উৎকৃষ্ট বই অবশ্য খুব বেরোয় নি, কিন্তু ছাপাখানার দৌলতে নানাধরণের বই ছাপা হতে শুরু

১০ Selections from the Calcutta Gazette, Sec. 11. 497.

সার্ যদুনাথ সরকার তাঁর *Indian Renaissance* গ্রন্থে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। "We humbly beseach any gentleman will be so good as to take the trouble of making a Bengali Grammar and Dictionary, in which we hope to find all the common Bengali country words made into English."

১১, ১২ ও ১৩ সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ১৩৫৬,

১৪ Sir Charles Trevelyn: *On the Education of the People of India* 1836, p. 82.

করল। ফলে বাংলা গ্রন্থের কিছুটা প্রসার হল। তবে বাবু-সম্প্রদায়ের কাছে বাংলা এখন সংস্কৃত পণ্ডিতদের চেয়েও বেশি ঘৃণিত হল। সংস্কৃত-ওয়ালাদের ঘৃণা ছিল অনেকটা নীচভাষা বলে, আর ইংরেজি-ওয়ালাদের ঘৃণা হল 'কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত' নেটিভ বাঙালির ভাষা বলে। এদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে লাগল। এদেরই দেখা পেলাম আমরা পরবর্তী পর্বে আরও স্পষ্ট করে। এ যুগের বাবুদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন তোমার নাম কি— সে উত্তর দেয় ডাটারেম গোষ অর্থাৎ দাতারাম ঘোষ।[১৫] এর পরবর্তী-কালে বাংলার সংগ্রাম যতটা না ইংরেজির সঙ্গে তার চেয়ে বেশি এই "ডাটারেম গোষ"এর দলের সঙ্গে।

৩

১৮৩৫ - ১৮৫৭

১৮৩৫এর মধ্যেই বাংলাদেশে সংস্কৃত শিক্ষা সম্মানিত, কিন্তু শুধু বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। পারশী পড়া প্রায় উঠে যেতে লাগল। আরবী এবং হিন্দী বা উর্দুও আর বিশেষ ভাবে চর্চা করা হল না। এখন বাংলাদেশের প্রধান ভাষা ইংরেজি ও বাংলা। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সংবাদপত্র-সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে লাগল। বাংলাভাষার চর্চা তার ফলে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই মর্যাদা পেল। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় তার প্রতি অনুকূল নন। 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে এক লেখক আবেগের সঙ্গে লিখেছেন যে "লর্ড ওয়েলেসলির রাজত্বকালে প্রাচ্য সংস্কৃতির চর্চা হয়েছে, বেন্টিঙ্কের রাজত্বকালে ইংরেজির উত্থান সূচিত হয়েছে, এইবার আমরা বিশ্বাস করি লর্ড ড্যালহৌসির সময় দেশীয় ভাষা চর্চায় চিহ্নিত হবে"।[১] একই লেখক বলছেন যে "আমাদের দেশীয়দের ইংরেজি স্কুলগুলির দিকে তাকিয়ে মনে হয়, ইংরেজি শিক্ষার জন্যও বাংলাভাষা ভালো করে শেখা বিশেষ উপযোগী"।[২] তিনি আরও বলছেন যে "গর্বিত ব্রাহ্মণদের মতই 'নব্যবাংলা' যখন এই 'ইতর ভাষা'কে ঘৃণা করে তখন আমাদের লকের সমকালীন ইংরেজ বাবুদের কথা মনে পড়ে, যারা লাতিন কবিতা রচনা করতে পারতেন, যদিও শুদ্ধ ইংরেজি লিখতে পারতেন না। সাধারণত এই ঘৃণাকে সমর্থন করার জন্য যুক্তি দেখানো হয় যে বাংলার পাঠযোগ্য গ্রন্থ কিছুই নেই। এ কথা যদি স্বীকারও করা যায়, তা হলেও মনে রাখতে হবে যে দান গ্রহণ করার চেয়ে দান করার মধ্যেই অধিকতর মর্যাদার প্রকাশ, এবং সে কারণেই যারা অন্যভাষার ঐশ্বর্য লাভ করেছে তাদের উচিত মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করা। ড্যান্টে বা চসার কি তাঁদের মাতৃভাষাকে দরিদ্র বলে ঘৃণা করতেন? না, বরং সে কারণেই তাঁরা মাতৃভাষার দারিদ্র্য মোচনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।" এই তীক্ষ্ণ মর্মভেদী বাক্য যিনি লিখেছিলেন তিনি প্রাতঃস্মরণীয়। এ বাক্যের প্রয়োজন আজও ফুরোয় নি। যাই হোক, হিন্দু কলেজ তথা অন্যান্য ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের বাংলা সম্পর্কে এই যে ধারণা তা বহুকাল ধরেই চলে এসেছে, এখনও শেষ হয় নি। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে এই সমাজের ছাপ আছে। এই ঘৃণার ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত (ইংরেজি শিক্ষিত নয় যারা, তারাও এর

---

১৫ সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১, পৃ. ১১৪

১ Calcutta Review: Vol. XXII, 1854, p. 293.

২ Calcutta Review, Vol. XXII, 1854, p. 295.

মধ্যে) এক ব্যবধান রচিত হল। বঙ্কিম বহুদিন পরে 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে ফটিকচাঁদ এস্কোয়ারদের এ কথা শোনাবার চেষ্টা করেছিলেন, আরও একযুগ পরে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধেও গ্রাম ও শহরের শিক্ষার ব্যবধানের কথা বলেছিলেন। এই যুগ থেকে সেই চরম ব্যবধানের সূচনা হল; আধুনিক কালের ইংরেজিশিক্ষিত বাবু-সম্প্রদায় তৈরি হলেন। এদেরই একদল ত্রৈলোক্যনাথের 'মিঃ গোমেশে'র দল; আর একদল অতটা উগ্রমূর্খ না হলেও বাংলাভাষা সম্পর্কে উদাসীন, তার গঠন সম্পর্কে চিন্তাহীন। ক্যালকাটা রিভিউএর লেখক সেই সময়ে বসেই বলেছেন, "ইংরেজি ভাষাজ্ঞান কয়েকটি শহরে এবং কয়েকটি ইংরেজিভাবাপন্ন বাবুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ. সমস্ত দেশ থেকে মাতৃভাষার অস্তিত্ব কি তাতে মুছে যাবে?" তাই তিনি প্রস্তাব করেছেন ইংরেজি হোক "বাণিজ্যিক ভাষা" আর বাংলা হোক "হৃদয়ের ভাষা"।[৩]

বেন্টিঙ্কের আদেশে অ্যাডাম মাতৃভাষা শিক্ষা সম্পর্কে তিনবার বিবরণী পেশ করেন— ১৮৩৫, ১৮৩৬, ১৮৩৮। কিন্তু ১৮৫৪ পর্যন্ত অ্যাডামের কোনো নির্দেশই সরকার গ্রহণ করেন নি। অ্যাডামের নির্দেশের সঙ্গে মার্শম্যান এবং পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতের মূল ঐক্য আছে। ইংরেজি ভাষা যেমন চলছে চলুক, তাতে সমাজের উপরতলা যেমন লাভবান হচ্ছে হোক; কিন্তু বাংলাদেশের অসংখ্য গ্রামের ছেলে বা যে সব লোক ইংরেজি ভাষা শিখতে পারল না তারা কেন শুধু সেই ভাগ্যদোষে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে।[৪] তাদের জন্য থাক বাংলা ইস্কুল। সরকার এ নির্দেশে খুব কান দেন নি— কারণ তাঁদের দরকার ছিল না। আর বাবুরা খুশি হয়েছিলেন, তাদের এখন অত কথা ভাবার সময় ছিল না। তাই ইংরেজি-জানা ছেলেরা যখন মোটা মোটা চাকরি পাচ্ছিল তখন বাংলা শেখা ছেলেরা দেখছিল তাদের সামনে 'cul-de-sae.'।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের কর্তারা বাংলা স্কুল খোলার কথা ভাবলেন— বাংলার মাধ্যমে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শেখানো হবে। ১৮৪২ সালে বেঙ্গল কাউন্সিল অফ এডুকেশনএর মিটিংএ বাংলা ইতিহাস ইত্যাদি গ্রন্থের জন্য একদফা আলোচনা হল। ১৮৪৫ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ বাংলাদেশের ৩৭টি জেলায় ১০১টি স্কুল বসানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই হল না। ১৮৫৩ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেরা বাংলা জানা ছাত্রকে ১০০ টাকার পুরস্কার দেওয়া হবে, বাংলা গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারি বীডন সাহেব জানালেন। এই সময়ে মিশনারীদের বাংলা স্কুলে প্রায় সাত হাজার ছাত্র হয়েছে। লর্ড ড্যালহৌসি সংস্কৃত কলেজের মেডিকাল স্কুলে বাংলায় বক্তৃতা দেবার আয়োজন করেন। এজন্য সরকার ৫০টা স্কলারশিপ দেন। বিখ্যাত মধুসূদন গুপ্ত 'অ্যানাটমি' সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন।

১৮৫৪ থেকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শিক্ষার উপর নজর একটু ফিরল। ইতিমধ্যে অ্যাডামের রিপোর্টগুলি বেরিয়েছে, দেশে কিছু কিছু লোকের চোখ খুলেছে। তা ছাড়া ১৮৫৪ সালে সার্ চার্লস উড

৩ Calcutta Review, p. 298, 300.

৪ "The Council of Education gives 8,000 rupees annually for his (বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের) education, while the wealthy merchants and zamindars have four lakhs spent on theirs— not that we grudge the latter, no, we would it were doubled, but why leave the peasant without the bread of elementary education, while the rich have the luxuries of Bacon and Milton."— Calcutta Review, Vol. XXII, p. 310.

"অল্পসংখ্যক লোকের জন্য শিক্ষা"র আদর্শের বিরুদ্ধে অভিমত জানালেন এবং ব্যক্তিগত মিশনারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বাংলা ইস্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করার কথা উঠল।

অন্য দিকে ইংরেজি শিখলেই চাকরী মেলে তাই বাঙালি ছেলে সাহেবের পাল্কীর পিছনে পিছনে ছুটত যদি সাহেব দয়া করে ইংরেজি স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে' এর ছবি আছে। আলেকজাণ্ডার ডাফ্ লিখেছেন, "পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রতি তীব্র আকর্ষণ এখনও অব্যাহত। তারা রাস্তায় আমাদের অনুরোধ করে, তারা পাল্কীর দরজা খুলে ফেলে, তারা সকরুণ আগ্রহে প্রার্থনা করে, সেই বেদনার্দ্র মুখ দেখলে পাষাণের হৃদয়ও গলে যায়।"[৫]

এখন বাংলার মর্যাদা দিতে পারতেন শুধু সংবাদপত্র আর বাংলা-সাহিত্যিক। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সত্যিকারের বাংলাসাহিত্য রচিত হয় নি— সবই মোটামুটি সংবাদ-সাহিত্য। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সার্ চার্লস মেটকাফ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিলেন প্রচুর। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটন আবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলেন। এই সময়ের মধ্যে সংবাদপত্রই বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার চেষ্টা করছিল। অন্য দিকে সংবাদপত্র এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে আশ্রয় করে বাংলাভাষা ও মাতৃভাষা সম্পর্কে জনমত তৈরি হচ্ছিল। এ ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপ্রভাকর ও ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সর্বোপরি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই চারজন প্রধান ব্যক্তিই এই যুগে মাতৃভাষার সম্মান ও মর্যাদা যেমন বুঝতেন, তেমনই চেষ্টা করেছেন তার গৌরব বাড়াতে, পুনরুদ্ধার করতে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাগজেই বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর হাতে-খড়ি হল। বিদ্যাসাগর এক আশ্চর্য ভাষায় বাংলা কথাসাহিত্যের সূত্রপাত করলেন। পণ্ডিতের সংস্কৃতচর্চার অহংকার বিদ্যাসাগর ভেঙে দিলেন, তাঁর বাংলার সারল্য পণ্ডিতদের পছন্দ হয় নি— তাঁরা বিদ্যাসাগরী বাংলাকে তাই ঠাট্টা করতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর যে পাকা সড়ক তৈরি করলেন তার উপরেই ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এক অশ্বারোহী পুরুষ ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন। কিন্তু সে পরের কথা। এই পর্ব হল প্রস্তুতির পর্ব। এখন বাংলাভাষার প্রতি নব্যবাংলার দৃষ্টি আকর্ষণের কাতর মিনতি চলছে। পরবর্তী পঞ্চাশ বছর তার ক্রমিকউন্নতি ও মর্যাদা-বৃদ্ধি হয়েছে দেশের মানুষের কাছে। মনে রাখতে হবে দেশের মানুষই এই অবহেলার জন্য দায়ী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে যখন বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাস সংগ্রহ শুরু করেন তখনও "বাঙ্গালাভাষার যে আবার একটা সাহিত্য আছে এবং তাহার যে আবার একটা ইতিহাস আছে, ইহা কাহারও ধারণাই ছিল না।· · বাঙ্গালাদেশে যে এত কবি, এত পদ ও এত বহি ছিল, কেহ বিশ্বাস করিত না"।[৬] দীনেশচন্দ্র সেনও ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছেন "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে এখনও শিক্ষিত সম্প্রদায় একরূপ উদাসীন আছেন"।[৭] এই উদাসীনতা এই পর্বে আরো অনেক বেশি ছিল। ১৮৫৭ সালের পর থেকে এই উদাসীনতা ক্রমশই কমতে থাকে। বাংলাভাষার মর্যাদার আর-একটি ক্ষেত্র প্রসারিত হল ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। এখানে বাংলার মর্যাদার জন্য প্রায় আরও ষাট-সত্তর

৫ Mazumdar : পূর্বে উল্লিখিত : পৃ. ৩৬

৬ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধগান ও দোহা, সাহিত্যপরিষদ গ্রন্থাবলী ৫৫। মুখবন্ধ, পৃ. ১। ১৩২৩

৭ দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৮৯৬, ভূমিকা

বছর ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও সার্ আশুতোষের কথা পরবর্তী সময়-পর্বের। তাই এখানে শুধু তার উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হলাম।

এক শতাব্দীর ইতিহাসের একটি খসড়া এখানে প্রস্তুত করা হল। এর পরবর্তী ইতিহাসও ঘটনাবহুল; কিন্তু তখন মোটামুটি বাংলার ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং বাঙালী শিক্ষিত সমাজ সচেতন হচ্ছিল। দাসত্ব আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে বহুদিনের। ভাষার দাসত্বও নূতন নয়। তবে নিজের ভাষাকে নিজের হাতে অপমানের ইতিহাস আমাদের দেশে ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি। যে বিভিন্ন ভাষা বাংলাকে অবনত করে রেখেছিল তার প্রত্যেকটির কাছেই বাংলা নানা ভাবে ঋণী— তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু ক্ষতির পরিমাণও বড় কম নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গৌরবোজ্জ্বল অভ্যুদয়কে যখন আমরা বারবার সবিস্ময়ে অভিনন্দন জানাই তখন মনে রাখি না যে মূঢ়ম্লান মূক মুখের ভাষা যতটা শক্তিহীন তার চেয়েও বেশি সত্য যে তার শক্তি রুদ্ধ, আর লজ্জা এই যে তার জন্য আমাদের নিজেদের দায়িত্ব বিদেশী শাসকদের চেয়ে কম ছিল না।

স্কুল অব ওরিএন্টাল অ্যাণ্ড অ্যাফ্রিক্যান স্টাডিজ
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতবর্ষীয় সভা পূর্বকথা : প্রতিষ্ঠা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভারতবর্ষীয় সভা বলিতে বর্তমানে আমরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে বুঝি। এই সভাটির পূর্বে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে আর-একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপিত হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাস তৃতীয় ভাগ পুস্তকে শেষোক্ত সভাকেই 'ভারতবর্ষীয় সভা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কালে এই সভা বিলুপ্ত হয়। আমরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকেই পরে ভারতবর্ষীয় সভা নামে আখ্যাত করি। বর্তমান আলোচনায় বাংলা নামটিই গৃহীত হইবে।

ভারতবর্ষীয় সভা সে যুগের একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। 'রাজনৈতিক' হইলেও দীর্ঘকাল যাবৎ এই সভা স্বদেশের সামগ্রিক কল্যাণচিন্তায় নিয়োজিত ছিল। এ জন্য ইহার গুরুত্ব সমধিক। গত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া পঁচিশ বৎসরকাল ইহা একক ভাবে কি রাষ্ট্রীয় কি অন্যবিধ সকল বিষয়েই চিন্তা ও কর্মে লিপ্ত থাকে। শতাব্দীর চতুর্থ পাদে বঙ্গদেশে ভারতসভা এবং সর্বভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ায় ইহার কর্মপ্রণালী ক্রমশ সীমিত হইয়া যায়। তথাপি ভারতের জাতীয়-আন্দোলন তথা স্বাধীনতার ইতিহাসে ভারতবর্ষীয় সভার প্রথম দিককার কৃতিত্বের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে। এখানে এই সময়ের কথা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিব। তবে সভাপ্রতিষ্ঠাকালীন এবং ইহার পূর্ববর্তী ঘটনা সমূহের সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। এই কথাই আগে বলি।

ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপিত হয় ইংরেজি ১৮৫১ সালের শেষ দিকে। ইহার প্রায় তিরিশ বৎসর পূর্ব হইতেই আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক বিষয়ে ভাবিতে শুরু করেন। আর প্রায় আরম্ভ হইতেই এই ভাবনা তাঁহাদিগকে কর্মেও উদ্‌বুদ্ধ করে। এখানে কর্ম বলিতে আমরা সংবাদপত্রে লেখালেখি ও সরকারের নিকট আবেদনপত্রাদি পেশ, ক্বচিৎ কখনও সভা-সমিতির মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনা বুঝিব। এই ধরণের ভাবনা বা চিন্তা ও কর্মের পুরোভাগে ছিলেন রামমোহন রায়। বাদশাহের নিকট হইতে তিনি 'রাজা' উপাধি পান বহু বৎসর পরে। ভারতবর্ষে মরাঠাদের পতনের পর (১৮১৮) হইতেই কোম্পানির স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের নিরঙ্কুশ মনে করিতে থাকেন। তাঁহারা দেশশাসনকল্পে বহু নূতন নূতন নিয়ম অবলম্বন করেন। বঙ্গদেশে তাঁহাদের শাসনকেন্দ্র স্থাপিত— কাজেই এখানেই এই-সকল বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত হয়। তাঁহারা দেখিলেন, বাংলা দেশে যে পরিমাণ ভূমি রহিয়াছে তাহার এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক নিষ্কর। দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর জাইগীর পূর্ব হইতেই এই-সকল নামে বহু লোকে নিষ্কর সম্পত্তি ভোগ করিত। কর্তৃপক্ষের নজর ইহার উপর পড়িতে বিলম্ব হইল না। এই ধরণের নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অভিপ্রায়ে তাঁহারা প্রথমে ১৮১৯ সালে এবং পরে ১৮২৮ সালে আইন বিধিবদ্ধ করেন। তবে ইহা লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হয় কয়েক বৎসর পরে। এ বিষয়টি পরে বলিতেছি।

কোম্পানির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভারতীয়দের বিরোধ বাধে অপর একটি ব্যাপার লইয়া। তখন কোনো

আইন-পরিষদ বা সভা ছিল না। সরকারের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা বা সমালোচনার একমাত্র ক্ষেত্র ছিল সংবাদপত্র। কর্তৃপক্ষ এই-সকল সমালোচনা প্রায়ই বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। সংবাদপত্রের অধিকার সংকোচনের নিমিত্ত তাঁহারা মধ্যে মধ্যে 'রুল' বা নিয়ম জারি করিতেন। ইহাতেও কিন্তু আর কুলাইল না। ইংরেজি-বাংলা-ফারসী সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিবার উদ্দেশ্য 'রেগুলেশন' জারি করেন। আইনকে তখন ইংরেজিতে এই নামেই বুঝানো হইত। তখনকার দিনে বড়লাট আইন জারি করিলেই ইহা চালু হইত না, সুপ্রীম কোর্টের অনুমতির জন্য এক মাস অপেক্ষা করিতে হইত। বলা বাহুল্য কোর্ট প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাঁহাদের অনুমোদন প্রদান করিতেন। এই আইন লইয়াই আমাদের দেশে প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয় বলিতে পারি। রামমোহন রায় কয়েকজন অনুবর্তী বন্ধু সহ প্রথমে বড়লাটকে এই আইন বাতিল করিয়া দিবার জন্য আবেদন করেন। এই আবেদনে ফল না হইলে তাঁহারা ইংলণ্ডের রাজাকে এ উদ্দেশ্যে একখানি লিপি পাঠান। আবেদনে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে রামমোহন্ পন্থী দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্বদেশের হিতকর রাজনৈতিক ও অনুরূপ আন্দোলন সমূহে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। বস্তুতঃ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হন্তারক উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময় (১৮২৩) হইতেই এ দেশে জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হয়। অস্থায়ী বড়লাট চার্লস্ থিয়োফিলাস মেটকাফ ১৮৩৬ সালে এই আইন তুলিয়া দেন। ইহাতে বিগত দশ বার বৎসর পূর্বে আরব্ধ প্রযত্নের সুফল ফলিল, এরূপ আন্দোলনের সার্থকতাও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপন্ন হইল।

এই সময়ে আর-একটি বিষয় লইয়াও ভারতীয় সমাজে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে জুরি আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনে 'গ্রাণ্ড' জুরি মাত্রেই খ্রীষ্টান হইবেন এবং সাধারণ জুররগণের মধ্যে শুধু খ্রীষ্টানেরাই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের বিচারের ক্ষমতা পাইবেন বলিয়া স্থির হয়। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমান মাত্রই খ্রীষ্টানদের বিচার-ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হন। রামমোহন রায় এই বৈষম্যমূলক আইনের ঘোর প্রতিবাদ করেন। হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের পক্ষে ইহার প্রতিবাদে একখানি আবেদন পত্র পাঠানো হয় বিলাতের পার্লামেণ্টে। ভারতীয়দের এজেণ্ট জন ক্রফোর্ড এই আবেদন পত্রখানি পার্লামেণ্টে পেশ করেন। কিছুকাল পরে হইলেও আন্দোলনে ফল হইয়াছিল। ১৮৩২ সালের ১লা জুলাই জুরি আইন রদ হইয়া যায়।

কিন্তু ১৮৩৬ সালের পর হইতেই একটি কারণে নেতৃবৃন্দ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে আরম্ভ করেন। নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ ক্রমান্বয়ে দুইটি আইন বিধিবদ্ধ করেন বটে, কিন্তু এতদিন তাহা কার্যকর করার চেষ্টা হয় নাই। এই বৎসরেই এ আইন চালু করার জন্য সরকার কতকগুলি নিয়ম প্রচার করেন। ভূম্যধিকারীগণ স্বতঃই ইহাতে চঞ্চল হইয়া উঠেন। প্রাথমিক উদ্যোগ-আয়োজনের পর তাঁহারা একটি সভা স্থাপন করিতে সক্ষম হইলেন (১৯ মার্চ ১৮৩৮)। ইহার নাম দেওয়া হইল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি বা জমিদার-সভা। এই সভার একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। শুধু হিন্দু-মুসলমান সমাজের নেতৃবৃন্দই ইহাতে যোগ দেন নাই, বিশিষ্ট ইউরোপীয়গণও ইহাতে যোগ দেন। ইহার কারণও ছিল। ভারতবর্ষের কাজ-কারবার, নীলচাষ প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকিলেও শ্বেতাঙ্গেরা ভূমি ক্রয় করিয়া এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইতে পারিত না।

তাহাদিগকে এই অধিকার দেওয়া হয় ১৮৩৩ সালের চার্টার বা সনন্দর দ্বারা। এই সময় হইতে তাহারা শহরে ও মফস্বলে বিস্তর ভূসম্পত্তিরও মালিক হইতে থাকে। জমিদার-সভার সভাপতি হইলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, সম্পাদক প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং 'ইংলিশম্যান'-সম্পাদক জনকব হারি। কার্যনির্বাহক সভা ভারতীয় ও ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দ লইয়া গঠিত হয়। নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রতিবাদে এই সভার জন্ম। প্রথম হইতেই সভা এ নিমিত্ত নানা ভাবে আন্দোলন উপস্থিত করে।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। ভূস্বামীগণ টোল চতুষ্পাঠী এবং মক্তব মাদ্রাসা যাহাতে স্থায়ী ভাবে চলে তাহার নিমিত্ত পণ্ডিত ও মৌলবীগণকে আবশ্যক পরিমাণ নিষ্কর ভূমি প্রদান করিতেন। বাজেয়াপ্তির ফলে স্বদেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করা হইল— এরূপ সম্ভাবনার কথাও জমিদারগণ বলিতে ভুলেন নাই। সরকার কিন্তু ইহাতে নিরস্ত হইলেন না। তাঁহারা দ্রুত কার্য হাসিল করিয়া লইলেন। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন, তাঁহার পিতা রামমোহন-শিষ্য নন্দকিশোর বসু ছিলেন বাজেয়াপ্তি আপিসের বড়বাবু; অসাধুতার প্রশ্রয় দিলে তিনি একজন বড়লোক হইতে পারিতেন। সভার আন্দোলনের ফলে কিছু সুবিধা অবশ্য হয়। লোকে দশ-বারো বিঘা পরিমিত নিষ্কর ভূমির অধিকারী হইতে পারিতেন।

প্রধানতঃ জমিদারদের সভা হইলেও ইহা তৎকালে জমিদার-প্রজা উভয়েরই হিতকারক বহু বিষয়ের আলোচনায় লিপ্ত হয়। রাজস্ব পুলিস প্রভৃতি এই-সকল আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার ইহাকে একটি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দান করেন। বিবিধ আইন সম্পর্কে সভার মতামত তাঁহারা পূর্বাহ্ণে জানিয়া লইতেন। জমিদার-সভা আর-একটি বিষয়েও খুব উৎসাহী হইয়া উঠে। রামমোহন-বন্ধু উইলিয়াম অ্যাডাম বিলাতে পৌঁছিয়া ১৮৩৯ সালের মাঝামাঝি কয়েকজন ভারতহিতৈষী ইংরেজের সঙ্গে একযোগে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন করেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য ও খবরাদি ব্রিটিশ জনসাধারণের নিকট প্রচার করা। শাসন-সংক্রান্ত অনাচার ও দুর্নীতি বিদূরিত করিয়া ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের উপায় করাও ছিল ইহার অন্যতম লক্ষ। জমিদার-সভা একটি বিশেষ অধিবেশনে বিলাতের এই নূতন সভাটিকে অভিনন্দিত ক'রে ভারত-সংক্রান্ত যথাযথ তথ্য পরিবেশনে প্রতিশ্রুতি দেন। বিলাতের সভাকে অর্থসাহায্য করা হইবে বলিয়াও অঙ্গীকার করা হয়। ভারতবর্ষীয় বিষয়াদি রীতিমত ব্রিটিশ জনসাধারণের গোচরীভূত করার জন্য 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাড্‌ভোকেট' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা উক্ত সোসাইটি ১৮৪১ সনের প্রথম হইতে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহার সম্পাদনার ভারও পড়ে উইলিয়ম অ্যাডামের উপর। মানব-হিতৈষী বাগ্মীবর ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদ কল্পে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ জর্জ টমসন বিলাতস্থ সভার সঙ্গে অবিলম্বে যোগ দিলেন। তিনি মফস্বলে ঘুরিয়া ভারতবাসীর হীনাবস্থা সম্পর্কে ইংরেজ জনসাধারণের নিকট বক্তৃতা দিতে লাগিয়া যান।

জমিদার-সভার প্রতিষ্ঠার মূলে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে দেখি পুরোভাগে। ধনে-মানে-প্রতিপত্তিতে তাঁহার জুড়ি তখন বড় কেহ ছিলেন না। প্রতিনিয়ত ব্যবসায়-কর্মে লিপ্ত থাকিলেও স্বদেশের হিতচিন্তা তাঁহার মনের একটি বিশেষ স্থান জুড়িয়া ছিল, এবং বিবিধ ব্যাপারে তাঁহার দানও ছিল প্রচুর। কলিকাতায় তখন হিন্দু কলেজে এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ে -পড়া একদল

প্রগতিকামী যুবকের উদ্‌ভব হয়। স্বদেশের ও সমাজের সকল রকম হিতসাধনই ছিল এই-সকল যুবকের ঐকান্তিক লক্ষ্য। রাষ্ট্রীয় উন্নতির মূলে যে-সব কার্য রসদ যোগায় তাহাতেও এই যুবকদল অগ্রণী হইয়াছিলেন। তাঁহারা তখনই 'ইয়ং বেঙ্গল' বা নব্যবঙ্গ নামে অভিহিত হন। দ্বারকানাথ নব্য-বঙ্গের হালচালের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহাদের দ্বারা স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধন যে সম্ভব এ বিশ্বাসও ক্রমে তাঁহার মনে বদ্ধমূল হয়। তিনি ১৮৪২ সালের প্রথমে বিলাত যান। সে সময়ও স্বদেশ এবং এই নব্যবঙ্গের কথা তাঁহার মনে জাগরূক ছিল।

ঐ সনের শেষে দ্বারকানাথ স্বদেশে ফিরিলেন। সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন জর্জ টমসনকে। দ্বারকানাথ অবিলম্বে ভারত-হিতৈষী টমসনকে নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। নব্য-দলের এই নেতাদের অগ্রণী ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি। তাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই একটি সভা স্থাপন করিয়া শিক্ষিত যুব-সমাজের মধ্যে স্বদেশের বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ১৮৪২ সালের মাঝামাঝি 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' নামে ইংরেজি বাংলা দ্বিভাষী পত্রিকাও এই উদ্দেশ্যে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কি উক্ত সভা কি পত্রিকা কোনোটিই মুখ্যত রাজনীতি বিষয়ে আলোচনায় তখন পর্যন্ত রত হয় নাই। তবে অন্যান্য বিষয়ের মতো এটির আলোচনাও উহা হইতে বাদ যাইত না। জর্জ টমসনের আগমনের পর হইতেই তাঁহারা একটি রাষ্ট্রীয় সভা স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। টমসনের সঙ্গে এই মিলনে যেন মণি-কাঞ্চনের যোগ হইল।

নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ টমসনকে দিয়া প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করিলেন। প্রথমে মানিকতলাস্থিত শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাটীতে এবং পরে চিৎপুরে ফৌজদারী বালাখানায় সাধারণ সভার আয়োজন করিতে লাগিলেন। টমসন বিভিন্ন বক্তৃতায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজ জাতির মনোভাব, স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত যথাযথ তথ্য ইংলণ্ডে পরিবেশন, নব্যশিক্ষিত ভারতীয়দের পক্ষে রাষ্ট্রনীতি চর্চার প্রয়োজনীয়তা, বিগত সনন্দের (১৮৩৩) মূল বিষয়গুলি কতটুকু কার্যে পরিণত করা হইয়াছে সে বিষয়ে আলোচনা প্রভৃতির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই নেতৃবৃন্দ টমসনের সভাপতিত্বে একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপনে কৃতসংকল্প হন। ১৮৪৩, ২০ এপ্রিল পূর্ব নির্ধারিত পাঁচটি প্রস্তাব লইয়া একটি প্রকাশ্য অধিবেশনে এই সভা স্থাপিত হয়। বিলাতের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির আদর্শে স্থাপিত হয় বলিয়া সভ্যগণ ইহার নাম দিলেন বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। বাংলা দেশের কলিকাতা ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষের শাসন-কেন্দ্র। এইজন্যেই হয়তো উক্ত 'বেঙ্গল' কথাটি সংযোজিত হইয়া থাকিবে। তবে উক্ত প্রস্তাবসমূহে উদ্দেশ্য যেরূপ বিবৃত হইয়াছে তাহাতে নব-প্রতিষ্ঠিত এই সভাটিকে সর্বভারতীয় প্রথম রাজনৈতিক সভা বলিয়া ন্যায়তই উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ যাবৎ টমসন বিবিধ বক্তৃতায় যে-সকল বিষয়ের অবতারণা করেন সভার উদ্দেশ্য মধ্যে তৎসমুদয় বিধৃত হয়। সভার মুখপত্র হইল 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'। পূর্বেই বলিয়াছি ভূদেববাবু সভাটির বাংলা নামকরণ করেন 'ভারতবর্ষীয় সভা'। ভারতবর্ষীয় কথাটি তখনই সার্থক হইয়াছিল।

এটি মুখ্যত রাজনৈতিক সভা ছিল বটে, তথাপি স্বদেশের কল্যাণকর অন্যান্য বিষয়েরও আলোচনা হইত এখানে। কৃষি শিল্প শিক্ষা স্বাস্থ্য পৌরসভা প্রভৃতি বহু বিষয় সভার আলোচনার অঙ্গীভূত

ছিল। এক কথায় বলা যায় রাষ্ট্রীয় বিষয়াদির সঙ্গে গঠনমূলক কার্যের প্রতি গোড়া হইতেই নেতৃবৃন্দ মনোযোগী হইয়াছিলেন। শুধু আলোচনায়ই পর্যবসিত না হইয়া কাহারও কাহারও (যেমন রামগোপাল ঘোষের) অর্থদানে এ ধরণের কার্য ত্বরান্বিত হইতেছিল। পূর্বেকার জমিদার-সভার মতো এই হিতকারক 'জাতীয়' সভাটিও দুই-তিন বৎসর মাত্র চলিয়া একরূপ উঠিয়া যায়। ইহারই মধ্যে কিন্তু একটি বিষয় খুবই প্রকট হইয়া পড়িল। জমিদার-সভায় ইউরোপীয়েরা সোৎসাহে যোগ দিয়াছিলেন। এবারে কিন্তু সেরূপ উৎসাহ আর দেখা গেল না। বরং তাঁহারা ভারতবাসীদের প্রতি বিদ্বিষ্ট ভাবই পোষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখপত্রগুলিও নব্যবঙ্গের নূতন প্রতিষ্ঠানটির প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে নিরস্ত হইল না।

জর্জ টমসন যখন সাধারণ সভায় জোরালো বক্তৃতা দিয়া সমাজকে খুব উদ্বুদ্ধ করিতে থাকেন তখন 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' একটি সংখ্যায় এরূপও লিখিলেন যে, ভারতবর্ষের দুই দিকে কামানের গর্জন শোনা যাইতেছে— পশ্চিমে বালাহিসারে এবং কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানায়! নব্যবঙ্গের নেতা রামমোহন-শিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং তাঁহার বন্ধুবর্গকে লক্ষ্য করিয়া আর-একটি পত্রিকা ইহার নাম দিল 'চক্রবর্তী ফ্যাকশন' বা চক্রবর্তী-পরিচালিত উপদল।

এরূপ হইবার যথেষ্ট কারণও ছিল। এখানে দু-একটি দৃষ্টান্ত মাত্র উল্লেখ করি। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দের পর হইতে ইউরোপীয়েরা এ দেশে ভূমিতে স্বত্ববান হইবার অধিকার লাভ করে। পূর্বে তাহারা নীল চাষে রত থাকিলেও ভূমির মালিক হইতে পারিত না, এখন অর্থ মূল্যে ইহার মালিক হইয়া বসে। তাহাদের অত্যাচার-উৎপীড়নও ক্রমশ বাড়িয়া যায়। ইহার একটি কারণ— মফস্বল আদালত ফৌজদারি মোকর্দমায় ইউরোপীয়দের বিচার করিতে আইনত অক্ষম ছিল। খুন-খারাপির দায়ে পড়িয়াও ইউরোপীয়েরা অনায়াসে নিষ্কৃতি পাইত, কারণ তাহাদের বিচার হইত কলিকাতাস্থ সুপ্রীম কোর্টে। দরিদ্র ফরিয়াদি অতদূরে গিয়া মোকর্দমা করিবার কথা অনেক সময় ভাবিতেও পারিত না। ভারতবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে লাগিল। আবার শিক্ষিত ভারতবাসীরা শাসন-সংক্রান্ত বিষয়াদি পরখ করিয়া দেখিতে থাকায় সরকারপক্ষও তাঁহাদের এড়াইয়া চলিতে ব্যগ্র হন। ক্রমে সরকারি ও বেসরকারি ইউরোপীয় সমাজ সাধারণের অলক্ষিতেই যেন ভারতবর্ষের জনস্বার্থের বিরোধী হইয়া উঠিল।

পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যে, ১৮৪৯-৫০ সালে এমন কোনো কোনো ব্যাপার ঘটে যাহাতে এতাদৃশ বিরোধী মনোভাব প্রকট হইয়া পড়িল। ইউরোপীয় ও ভারতবাসীদের মধ্যেকার বিচার-বৈষম্য রহিত করিবার উদ্দেশ্যে তৎকালীন ব্যবস্থাসচিব বেথুন সাহেব কয়েকটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া বিজ্ঞাপিত করেন। খসড়াগুলি প্রকাশ হইবামাত্রই ইহার বিরুদ্ধে ইউরোপীয়েরা ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করে। সরকার-পক্ষ বেগতিক দেখিয়া এ বিষয়ে আর অগ্রসর হইলেন না। ও দিকে আবার তাঁহারা এমন-একটি আইন করিয়া বসিলেন যাহাতে হিন্দু সমাজে ভীষণ বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। দেশীয় খ্রীষ্টানদের পিতৃপুরুষের জমি-জমায় উত্তরাধিকার দান ছিল একটি আইনের উদ্দেশ্য। নব্যবঙ্গের অন্যতম নেতা রামগোপাল ঘোষ ১৮৫০ সালে নীলকরদের অত্যাচার -সম্পর্কিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। ইহাতে ইউরোপীয়দের কি ক্রোধ! রামগোপাল কৃষি-সমাজের (এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি) সহকারী সভাপতি ছিলেন। কৃষি সমাজের অধিকাংশ সদস্যই ইউরোপীয়। তাঁহারা একদিনের সভায় ভোটের জোরে রামগোপালকে সহকারী সভাপতির পদ হইতে বরখাস্ত করিলেন।

এই সময় হইতেই সমাজের প্রবীণ ও নবীন হিতৈষীবৃন্দ একটি সুগঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবিতে বিশেষ করিয়া উদ্বুদ্ধ হইলেন। সরকারি এবং বেসরকারি ইউরোপীয়েরা নানাভাবে জাতীয় সংহতির পথে বিঘ্ন ঘটাইতে থাকে, এই মাত্র তাহা আমরা জানিয়াছি। এ দিকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা ও ইহার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মাধ্যমে ধর্ম সমাজ শিক্ষা সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য আলোচনা শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়ে বন্ধুবর্গের সহযোগে সার্থকভাবে প্রায় এক যুগ ধরিয়া প্রযত্ন করিতেছিলেন। রাজনৈতিক না হইয়াও ঐ সভাটি ছিল সর্বপ্রকারে জাতীয় প্রতিষ্ঠান। রাজনীতি-বহির্ভূত বিষয়ে যখন সম্ভব,— রাজনৈতিক বিষয়ে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্ভব হইবে না কেন? ঐ সময়ে যখন সরকার বিবিধ আইন বলে ভারতীয়দের অধিকার সংকোচনে উদ্‌গ্রীব এবং রাজনীতি-বহির্ভূত অন্যান্য বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতে ব্যস্ত তখন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় সভা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। প্রতি কুড়ি বৎসর অন্তর বিলাতের পার্লামেন্ট কোম্পানিকে ভারত-সম্পর্কে একটি সনন্দ প্রদান করিতেন। এই সময় উহার শাসন ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত কার্যসমূহ লইয়া বিচার-আলোচনা চলিত। ১৮৫৩ সনে এইরূপ নূতন সনন্দ পাইবার কথা! এ সময়েও পূর্ববৎ বিচার আলোচনা চলিবে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ দেখিলেন, এ সময়ে যদি তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে পার্লামেন্টে তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ এবং ভারতবর্ষ সুশাসন সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন তাহা হইলে স্বদেশের কল্যাণ সাধন সম্ভব। এই-সকল বিবেচনা করিয়াই দেখিতেছি ১৮৫১ সনের ১৪ সেপ্টেম্বর তাঁহারা কলিকাতা-পাইকপাড়াস্থ প্রতাপচন্দ্র সিংহের ভবনে ঐ উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হইয়াছেন। ঐ সভায় জমিদারগণই বেশি সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন এ কারণ সংবাদপত্রে এটিকে পূর্বেকার জমিদার-সভার পুনরুজ্জীবন বলিয়া উল্লিখিত হয়।

পূর্বে যেরূপ বলিয়াছি তদনুসারেই সভার উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হইল। ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজশাসন বিলুপ্ত হয় এরূপ সম্ভাবনার কথা ভারতীয় শিক্ষিত সাধারণ তখন কল্পনাও করিতে পারিতেন না। এ জন্য ভারতশাসন সুসংস্কৃত হইলে ইউরোপীয়-ভারতীয় উভয়েরই যথার্থ কল্যাণ হইবে, উদ্দেশ্য-মধ্যে এই কথাই তাঁহারা বিবৃত করিলেন। আপাতত তিন বৎসরের জন্যই তাঁহারা এই সভার কার্য পরিচালনা করিতে মনস্থ করেন। সভার নাম দেওয়া হয়, ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন বা জাতীয় সভা। উদ্দেশ্য যেরূপ তাহাতে ইহা বাস্তবিকই 'ন্যাশনাল' বা জাতীয়। 'সমাচার দর্পণে' (তখন পুনঃপ্রকাশিত) ইহার বাংলা নাম দেওয়া হইল 'দেশহিতার্থী সভা'। তবে কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ন্যাশনাল কথাটির যোগ যতদূর জানিতে পারি, এই আমরা প্রথম পাই। তখনই নেতৃবৃন্দের মনে ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষের সকল অংশকে লইয়াই ন্যাশনাল বা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা জাগরূক হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। এবারকার এই রাষ্ট্রীয় সভাটির স্থায়িত্ব সম্পর্কে লোকের মনে সন্দেহ আর রহিল না। 'বেঙ্গল হরকরা' এমনও লিখিলেন, যে উদ্যোগের ভিতরে প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রহিয়াছেন তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোনো সন্দেহই নাই।

এই সভা প্রতিষ্ঠার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপিত হয়। আগেকার ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনের যে ইহা পরিণতি তাহা বুঝিতে আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। পূর্বেকার সভার কর্মকর্তারাই যতদূর মনে হয় নিয়মপত্র রচনার পর এইরূপ নামকরণ করা স্থির করেন। কেননা এই নামটির মধ্যে 'ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারত' এইরূপ নাম রাখাই অধিকতর সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। আর এ জন্য তাঁহারা নূতন করিয়া একটি প্রকাশ্য সভা আহ্বান করেন ১৮৫১ সনের

২৯ অক্টোবর তারিখে। এই সভায় প্রকাশ্যভাবে পূর্ব রচিত নিয়মপত্র উপস্থাপিত ও গৃহীত হইল। সভার নাম যে উক্তরূপ করা সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাও এবারে বুঝা গেল। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তৃসভা গঠিত হয় এই-সকল অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের লইয়া :

(রাজা) প্রতাপচন্দ্র সিংহ, (রাজা) সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, দুর্গাচরণ দত্ত, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন সেন, আশুতোষ দেব, রামগোপাল ঘোষ। সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক হন যথাক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দিগম্বর মিত্র (পরে, রাজা)।

এইবারে দেখা গেল, জাতীর কল্যাণকল্পে একই স্থলে প্রাচীনপন্থী প্রবীণদের সঙ্গে নব্যপন্থী নবীনেরা হাত মিলাইয়া একযোগে কার্য করিতে অগ্রসর হইতেছেন। সভাপতি এবং সহকারী সভাপতির পদ প্রথম সভায় শূন্য রাখা হয়। স্থির হয় যে, উক্ত পদ দুইটি গ্রহণের জন্য যথাক্রমে রাজা রাধাকান্ত দেব এবং রাজা কালীকৃষ্ণকে অনুরোধ করা হইবে।

সভায় গৃহীত নিয়মপত্র সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা দরকার। নিয়ম ছিল সর্বসাকুল্যে ৪৭টি। চারটি ধারার মধ্যে সভার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়। গুরুত্ববিধায় এই ধারা ক'টি উদ্ধৃত হইল :

"2. The great aim and object of this Association shall be to promote the improvement and efficiency of the British Indian Government by every legitimate means in its power, and thereby to advance the common interest of Great Britain and India, and ameliorate the condition of the native inhabitants or the subject country.

"3. As an object of Primary importance the Association shall make such respectful but earnest representations to the Imperial Parliament of Great Britain, on the occasion of the ensuing discussion of the East India Company's Charter, as may be calculated to remove the existing defects in the laws and civil administration of this country, and to promote the general welfare and interest of its people.

"4. This Association shall also from time to time memorialize the authorities here or in England, for the removal of existing and prevention of proposed injurious measures, or for the introduction of enactments which may tend to promote the general interests of all connected with this country.

"5. This Association shall be at liberty to render assistance to the individuals labouring under grievances which involve a general principle, in order that appeals may be made to the proper authorities and redress obtained.. "[১]

এখানে চারিটি কার্যের কথা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কোনো কোনোটির মর্ম আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। সভা নূতনবিধি প্রণয়ন সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দিবেন, এবং কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে

---

১ The Citizen, November 18, 1851 "British Indian Association". এই সংখ্যায় প্রথম সভার কার্য বিবরণের সঙ্গে সাতচল্লিশটি নিয়মও মুদ্রিত হইয়াছে।

নির্যাতিত হইলে তাহার সপক্ষে ইহা দাঁড়াইবে যদি ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে—এইরূপ কথাও আমরা প্রথম পাইলাম। নিয়মপত্রে সভার সভ্য গ্রহণ, পরিচালনার রীতি-পদ্ধতি, আর্থিক সংস্থান প্রভৃতির বিষয় স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত হয়। এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে, প্রত্যেক সাধারণ সভ্যকেই পঞ্চাশ টাকা হারে বার্ষিক চাঁদা দিতে হইবে বলিয়া ধার্য হয়। এই বিষয়টি লইয়া প্রায় বিশ বৎসর পরে বেশ একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

রাজা রাধাকান্ত দেব এবং রাজা কালীকৃষ্ণ সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্রদ্বারা তাঁহাদের নিজ নিজ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবেন্দ্রনাথকে সভার কার্যক্রম সম্পর্কে কয়েকখানি পত্র লেখেন। এ পত্রগুলি বহু বৎসর পূর্বে আমি অন্যত্র প্রকাশিত করি। সভাপতি পদ গ্রহণে সম্মতি জানাইয়া তিনি সম্পাদককে যে পত্রখানি লেখেন তাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানি নিম্নে দিলাম।

"I beg to acknowledge the receipt of your letters of the 31st ultimo, and the 6th instant, and to state in reply, that, although my age will not permit me to take an active part in the proceedings of the Society, yet as I cannot forego the pleasure of participating in an undertaking so laudable and conducive to the future interest and prosperity of the country, I request you to inform the Society that I shall feel myself honoured by their proposing me as Honorary member and President of the Institution.

The necessity of the formation of a well-organised Society, to represent the wants and grievances of our country before the British Parliament, has too long been felt ; but it grows imperative on so momentous an occasion as the termination of the East India Company's Charter. The noble objects, therefore, contemplated by the Society cannot but receive my hearty concurrence.

As the attempts which have hitherto been made by one countrymen in furtherance of the above views, have proved abortive, I trust the Society will be guided by such sound principles as to secure its permanent existence and give efficacy to all its proceedings.

Calcutta
The 7th November, 1851

I have etc.
Sd/. Radhakant"

পত্রখানিতে ভারতবর্ষের কল্যাণমূলক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে রাধাকান্ত দেবের আকূতি লক্ষণীয়। প্রতিষ্ঠার পর হইতেই সভা প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্যে লিপ্ত হইল। ভারতবাসী তথা বাঙালি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার এই যে সূচনা হইল তাহা ক্রমে মহামহীরুহে পরিণত হইয়া আমাদিগকে ব্রিটিশ পাশমুক্ত স্বাধীনতা দান করিয়াছে। সভার কার্যকলাপ পরে আলোচ্য।

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি-উৎসব উপলক্ষে ১৩৬৮-৬৯ বঙ্গাব্দে (১৯৬১-৬২) বাংলা ভাষায় যে-সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এখানে তার বিবরণ প্রকাশ করা হল। নূতন গ্রন্থ এবং পুরাতন গ্রন্থের নূতন সংস্করণ এই বিবরণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গ্রন্থপঞ্জী সম্পূর্ণ করার চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু বই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে থাকতে পারে, সে-সব বই সম্বন্ধে সংবাদ পেলে পরবর্তী কোনো সংখ্যায় তার উল্লেখ করা হবে। এই বিবরণ সংকলন করেছেন শ্রীবিজয় সেনগুপ্ত।

সাময়িক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার উল্লেখ এখানে করা হল না।

অজয়কুমার রায়

রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ। কলিকাতা, এ. মুখার্জী, ১৩৬৮। ১২ + ১৮৭ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ৪.০০।

অনিলকুমার সিংহ, সম্পাঃ

সূর্যাবর্ত। কলিকাতা, নতুন সাহিত্য ভবন, ১৯৬১। ৮ + ১৯৯ পৃ। ২৪ সে. মি.। ৬.০০।

অনিলচন্দ্র ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ। শতবার্ষিকী সং। কলিকাতা, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৯৬১। ২ + ১৮ পৃ। ২৭ সে. মি.। ১.০০।

অনিলচন্দ্র ঘোষ ও অনিল দাস

রবীন্দ্রনাথ। ৩য় পরিবর্ধিত সং। কলিকাতা, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৯৬১। ১০৩ পৃ। ১৮ সে. মি। ১.২৫।

অপর্ণা সেন

নোবেল প্রাইজ ও রবীন্দ্রনাথ। ভবেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত। কলিকাতা, বিচিত্রা, ১৯৬১। ১৭ পৃ। ২২ সে. মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই।

অমল হোম

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ। ৩য় সং। কলিকাতা, এম. সি. সরকার, ১৩৬৮। ২১৯ পৃ। ১৮ সে. মি.। ৩.৫০।

অমিয়কুমার সেন

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬১। ৮ + ২৪৮ পৃ। ২২ সে. মি.। ৫.০০।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'। কলিকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৬১। ৮ + ৯৭ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ৩.০০।

অরবিন্দ পোদ্দার

রবীন্দ্রনাথ। শতবর্ষ পরে। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ানা, ১৩৬৮: ৯৫ পৃ। ২২ সে. মি.। ২৫০।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-বিতান। কলিকাতা, এ. মুখার্জী, ১৩৬৮। ৩+২৫+২৩২ পৃ। ২১˙৫ সে. মি.। ৫˙০০।

রবীন্দ্র-মনীষা। কলিকাতা, ক্লাসিক প্রেস, ১৩৬৮। ১০+১৬৪ পৃ। ২১˙৫ সে মি.। ৫˙০০।

রবীন্দ্র-সমীক্ষা। কলিকাতা, এ. মুখার্জী, ১৩৬৮। ৮+১৪৮ পৃ। ২১˙৫ সে. মি.। ৩˙০০।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাঃ

রবীন্দ্র-স্মারক গ্রন্থ। হাওড়া, রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতি, জেলা শাসক ভবন, ১৯৬১। ১০৪ পৃ। ২৪˙৫ সে. মি.। ১˙০০।

আদিত্য ওহদেদার

সমালোচক রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, এভারেস্ট বুক হাউস, ১৩৬৮। ১০+২০২ পৃ। ২২ সে. মি.। ৭˙০০।

ইন্দিরা দেবী

আবির্ভাব। কলিকাতা, শরৎ পুস্তকালয়, ১৩৬৮। ৪+১১৬ পৃ। ২১˙৫ সে. মি.। ৩˙০০।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

মানসী-পরিক্রমা। কলিকাতা, দি বুক এক্সচেঞ্জ, তারিখ নেই। ১০৯ পৃ। ১৮ সে. মি.। ২˙৫০।

উমা রায় ও সুজাতা চৌধুরী, সম্পাঃ

রবীন্দ্র-শতায়ন: বেথুন বিদ্যায়তন স্মারক গ্রন্থ। কলিকাতা, বেথুন কলেজ, ১৯৬১। ৪+১৩৬ পৃ। মূল্যের উল্লেখ নাই।

কমলাপতি দে ও বাসব সরকার, সম্পাঃ

দেশবিদেশে রবীন্দ্রনাথ: সংকলন। কলিকাতা, বসু প্রকাশনী, ১৩৬৮। ১৮+৪২+১১৮ পৃ। ২১˙৫ সে. মি.। ৩˙৫০।

কানাই সামন্ত

রবীন্দ্রপ্রতিভা: কবি শিল্পী সুরকার রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১৩৬৮। ১২+৪১৬ পৃ। ২২ সে. মি.। ১০˙০০।

ক্ষিতিমোহন সেন

বলাকাকাব্য-পরিক্রমা। ৩য় সং। কলিকাতা, এ. মুখার্জী, ১৯৬২। ২১৮ পৃ। ২১˙৫ সে. মি.। ৫˙০০।

ক্ষুদিরাম দাস

রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়। ২য় প্রকাশ। কলিকাতা, বুকল্যাণ্ড, ১৯৬১। ১৪+৩৫৪ পৃ। ২১ সে. মি.। ১০˙০০।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

রবীন্দ্র-শিশুসাহিত্য-পরিক্রমা। কলিকাতা, নবারুণ প্রকাশনী, ১৯৬১; ১২+২১৬ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ৫.০০।

গীতা মুখোপাধ্যায়

ছোটদের রবীন্দ্রনাথ। পুনর্মুদ্রিত। কলিকাতা, নবারুণ প্রকাশনী, ১৯৬১। ৪+৬৯ পৃ। ১৮ সে মি.। ১.০০।

গোবিন্দমোহন গুপ্ত

একশো রবির ছড়া ছবি। কলিকাতা, কে. এন. পাবলিশিং, ১৯৬১। ১৬ পৃ। ২৩ সে মি.। ১.০০।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনমৃত্যুর ছন্দে ছন্দে রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, মুখার্জী বুক হাউস, ১৯৬১। ৪+৭৬ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ১.৫০।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবিরশ্মি: পশ্চিমভাগে (ক্ষণিকা হইতে তাসের দেশ পর্যন্ত)। কলিকাতা, এ. মুখার্জি, ১৯৬২। ১২+৪০২ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ৭.৫০।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

কবি-স্মরণে। কলিকাতা, বসুধারা প্রকাশনী, ১৯৬১। ৬+৮৪ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ২.০০।

রবি-প্রদক্ষিণ। কলিকাতা, বসুধারা প্রকাশনী, ১৯৬১। ১০+৩৬৬ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ৭.৫০।

শতবার্ষিক জয়ন্তী-উৎসর্গ। কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রশতাব্দীজয়ন্তী সমিতির পক্ষে বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভা, ১৯৬১। ৮+৩৯৩ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ৫.০০।

চিত্তজিৎ দে ও শ্যামাপ্রসাদ সরকার

প্রণাম নাও। কলিকাতা, শ্রীপ্রকাশ ভবন, ১৯৬১। ২২২ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ৪.০০।

চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি

রবীন্দ্র-রচনা-কোষ, ১ম খণ্ড, ১ম পর্ব। কলিকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৯৬১। ২৪+২৩৯ পৃ। ১৮ সে. মি.। ৬.৫০।

জগদীশ ভট্টাচার্য

কবিমানসী। ১ম খণ্ড: জীবনভাষ্য। কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৬২। ১৭+৫১১ পৃ। ২১.৫ সে মি.। ১২.৫০।

জনমেজয় দাস

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ। চন্দননগর, দেবকুমার সরকার, ১৯৬১। ২৮ পৃ। ১৮.৫ সে. মি.। ০.৫০।

জসিমুদ্দিন

ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায়। কলিকাতা, গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯৬১। ২+১৮২ পৃ। ২১.৫ সে. মি। ৩.৭৫।

জ্যোতিপ্রসাদ দাস

রবিপ্রভা। তমলুক, টাউন প্রেস, ১৩৬৮। ১৫+১৫৯+৪৭ পৃ। ২১.৫ সে. মি। ৪.০০।

রবিপ্রভা : ১ম খণ্ডের পরিশিষ্ট। তমলুক, বীণা প্রেস, ১৩৬৮। ১৩+৯৬ পৃ। ১৮ সে. মি। ২.০০।

জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ, সম্পাঃ

মহামানবের সাগরতীরে। কলিকাতা, নিখিলভারত বঙ্গভাষা-প্রসার সমিতি, ১৯৬১। ১৬+১৮০ পৃ। ২২ সে. মি। ৪.০০।

ডীজ, জে. এল.

রবীন্দ্রনাথ ও আমেরিকা। কলিকাতা, ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিস, ১৯৬১। ৪৬ পৃ। ২৩ সে. মি। মূল্যের উল্লেখ নাই।

তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী, সম্পাঃ

রবীন্দ্রপ্রবাহ। এলাহাবাদ, টেগোর সেন্টিনারি সেলিব্রেশনস্ কমিটি, ১৯৬১। ২৬৪ পৃ। ২২ সে. মি। ২.৫০।

১-৯৬ পৃ বাংলায় লেখা। বাকী অংশ ইংরেজী ও হিন্দী।

ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সমিতি, আগরতলা

রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা : রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ। আগরতলা, ১৯৬১। ২৪+৪৮৪+২ পৃ। ২৪ সে. মি। ১৫.০০।

দক্ষিণ-কলিকাতা রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ছাত্রকমিটি

রবীন্দ্রশতজন্মজয়ন্তী-উৎসব। কলিকাতা, ১৯৬১। ৪০ পৃ। ২৪ সে. মি। মূল্যের উল্লেখ নাই।

দক্ষিণারঞ্জন বসু

শতাব্দীর সূর্য : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনী, ধর্ম ও কর্মের আলোচনা। ৪র্থ সংশোধিত সং। কলিকাতা, এ. মুখার্জী, ১৯৬১। ১২+২২৭ পৃ। ২১ সে. মি। ৫.০০।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, ইস্টলাইট বুক হাউস, ১৯৬১। ৬+৩৩৫ পৃ। ২২ সে. মি। ১০.০০।

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক -সমিতির শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ধীরানন্দ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা। কলিকাতা, বুকল্যাণ্ড, ১৯৬২। ৮+৩৩৮+১৫৫ পৃ। ২১ সে. মি। ১২.০০।

রাবীন্দ্রিকী। কলিকাতা, বুকল্যাণ্ড, ১৩৬৮। ৬+১৯৫ পৃ। ২১ সে. মি। ৪.৫০।

ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

'রক্তকরবী'র তত্ত্ব ও তাৎপর্য। ২য় সং। কলিকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৬২। ১০+৮৬ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ২.০০।

ধীরেন্দ্রলাল ধর

আমাদের রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৯৬১। ৭+৩২০+১৬০ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ৮.০০।

নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়

মুক্তিসাধনায় রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, মালবিকা দেবী, ১৯৬১। ১৩৬ পৃ। ১৮ সে. মি.। ৩.০০।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রচর্চার ভূমিকা। কলিকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৯৬১। ২+৪+১৭৮ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ৪.০০।

নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

তরুণ রবি। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৬১। ৭+২৬০ পৃ। ১৯ সে. মি.। ৪.০০।

নরেশচন্দ্র ঘোষ

ভারত-আত্মা রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, সাধনা প্রকাশনী, ১৯৬২। [৬]+১১৩ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ৩.০০।

নলিনীকান্ত গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ। পরিবর্ধিত সং। কলিকাতা শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৩৬৮। ৮+১৬২ পৃ। ১৮ সে. মি.। ৩.৫০।

নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী

রবীন্দ্র-নির্দেশিকা। কলিকাতা, ক্লারিয়ন পাবলিকেশনস্‌, ১৯৬২। ১৪+২৯৬ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ১০.০০।

নীরেন্দ্র গুপ্ত

রবি-কাহিনী। কলিকাতা, কল্পনা রায়চৌধুরী, ১৯৬১। ২+৭৯ পৃ। ১৮ সে. মি.। ১.৫০।

নীলরতন সেন, সম্পাঃ

রবীন্দ্র-বীক্ষা। কলিকাতা, এশিয়া পাবলিশিং কোং, ১৯৬২। ৪+৯+১৩৩+২৩২ পৃ। ২১ সে. মি.। ১২.০০।

নেপাল মজুমদার

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ। ১ম খণ্ড। কলিকাতা, বিদ্যোদয়, ১৯৬১। ১১+৪৫৩ পৃ। ২২ সে. মি.। ১০.০০।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

রবীন্দ্রকাব্যের নতুন কথা। ১ম খণ্ড: রবীন্দ্রকাব্যে মীস্টিসিজম্। কাঁচরাপাড়া, শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায়, তারিখ নেই। ১৬+৫৩ পৃ। ১৮·৫ সে. মি.। ১·৭৫।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী: শ্রদ্ধাঞ্জলি। কলিকাতা, কংগ্রেস-ভবন, ১৯৬১। [১৬]+৯—৪৬ পৃ। ২৪·৫ সে. মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই।

পুলকেশ দে সরকার

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস। কলিকাতা, সাহিত্য, ১৯৬১। ১২২ পৃ। ২২ সে. মি.। ৩·৫০।

পুলিনবিহারী সেন, সম্পাঃ

রবীন্দ্রায়ণ। কলিকাতা, বাক্ সাহিত্য, ১৩৬৮। দুই খণ্ড। ২৪·৫ সে. মি.। প্রতি খণ্ড ১০·০০।

প্রতিভা গুপ্তা

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৯৬১। ৪+২৭২ পৃ। ২২ সে. মি.। ৬·০০।

প্রদ্যোতকুমার ঘোষ, সম্পাঃ

কবিগুরু-স্মরণে। কলিকাতা, শিল্পায়ন, ১৯৬১। ৮+৪২ পৃ। ২২ সে. মি.। ১·০০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রীয় চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় কলিকাতার কতিপয় ছাত্র কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রফুল্লকুমার দাস

রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ। ১ম খণ্ড। কলিকাতা, কালিকলম, ১৯৬১। ৮+১৫০ পৃ। ২২ সে. মি.। ৩·৫০।

প্রফুল্লচন্দ্র দাস, সংকলক

আলোর কবি রবীন্দ্রনাথ। অনুবাদক পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কটক ও কলিকাতা, মনমোহন বুক শপ্, ১৯৬১। [৬]+১৭৬ পৃ। ১৮ সে. মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই।

প্রবোধচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা। কলিকাতা, জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৬১। ১২+১৮৮ পৃ। ১৮ সে. মি.। ৫·০০।

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্লাসিক-আলোকে রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, সান্যাল অ্যাণ্ড কোং, ১৯৬১। ১৬+১৯৩ পৃ। ২২ সে. মি.। ৬·০০।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রজীবনকথা। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬১। ৮+৩২৩ পৃ। ২২ সে মি.। ৮·০০।

রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক। ২য় খণ্ড, পরিবর্ধিত ৩য় সং। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬১। ১৬+৫৬৮ পৃ। ২৪·৫ সে. মি.। ১৫·০০।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক। ৩য় খণ্ড, ২য় সং। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬১। ১৬+৫৪৫ পৃ। ২৪.৫ সে. মি.। ১৫.০০।

রবিকথা। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১৯৬১। ৬+১২৫ পৃ। ২২ সে. মি.। ৩.৫০।

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

রবিচ্ছবি। কলিকাতা, গীতবিতান, ১৯৬১। ৬+২১০ পৃ। ২২ সে. মি.। ৬.০০।

প্রমথ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ। রণজিৎকুমার সেন সম্পাদিত। কলিকাতা, বর্তিক, ১৩৬৮। ৭৪ পৃ। ১৮ সে. মি.। ২.০০।

প্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ। নতুন সং। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬২। দুই খণ্ড। ২২ সে. মি.। ১০.০০।

রবীন্দ্র-বিচিত্রা। ৩য় প্রকাশ। কলিকাতা, ওরিয়েণ্ট বুক কোং, ১৯৬১। ৮+২৪২ পৃ। ২২ সে. মি.। ৫.৫০।

রবীন্দ্রসরণী। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬২। ৬+৪১০ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ১০.০০।

বঙ্গ-সংস্কৃতি-সম্মেলন

রবীন্দ্রস্মারক গ্রন্থ ১৯৬১। কলিকাতা, ১৯৬১। ১৯৮+১০ পৃ। ২৪ সে. মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই।

বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভা

রবীন্দ্রনাথের উপর রচিত পুস্তকের তালিকা: ১৯৬১ সাল পর্যন্ত। কলিকাতা, ১৯৬২। ১২ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

নবীন রবির আলো। কলিকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৬১। ৬৩ পৃ। ২৪ সে. মি.। ১.৭৫।

প্রভাত রবি। ২য় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সং। কলিকাতা, গুপ্ত প্রকাশিকা, ১৯৬১। ৮+২০৮ পৃ। ২২ সে. মি.। ৪.৫০।

রবীন্দ্র-চরিত। কলিকাতা, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভা, ১৯৬১। ৬+১১০ পৃ। ২২ সে. মি.। ১.৫০।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথ। ৩য় সং। কলিকাতা, বাণী নিকেতন, ১৯৬১। ১০+৬৮ পৃ। ২২ সে. মি.। ৩.০০।

বিবেক ভট্টাচার্য

বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ। জিতেন্দ্রকুমার গুপ্ত কর্তৃক ইংরেজী হইতে অনূদিত। দিল্লী, মেট্রোপলিটান, ১৯৬১। ১০৭ পৃ। ১৮.৫ সে. মি.। ৪.০০।

বিভা সরকার

লহ প্রণাম। কলিকাতা, এম. সি. সরকার, ১৯৬১। ২+৪১ পৃ। ২২ সে. মি.। ১.২৫।

বিমলকুমার দত্ত

রবীন্দ্রসাহিত্যে গ্রন্থাগার। কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্‌, ১৯৬২। ১৪+৮৩+৫ পৃ। ১৮ সে. মি.। ২.০০।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রকথা। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১৯৬২। [৮]+৭৯ পৃ। ২০.৫ সে. মি.। ২.০০।

বিমানবিহারী মজুমদার

রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান। কলিকাতা, বুকল্যাণ্ড, ১৩৬৮। ১০+২১১ পৃ। ২১ সে. মি.। ৬.০০।

বিশু মুখোপাধ্যায়

কবিপ্রণাম। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১৯৬১। ১৬+১৮১ পৃ। ২২ সে. মি.। ৫.০০।

বিশ্বনাথ দে, সম্পাঃ

রবীন্দ্রস্মৃতি। কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬১। ১২+৩৫২ পৃ। ২১.৫ সে মি.। ৩.৫০।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ: উত্তরপক্ষ। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ানা, ১৯৬১। ১৩৬ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ৪.০০।

ব্রজেন মজুমদার

অতলান্ত। কলিকাতা, পি. এল. মজুমদার ১৯৬১। ৪+৪৭ পৃ। ২২ সে. মি। ১.৫০।

ভবেশ দাশগুপ্ত, সম্পাঃ

রবীন্দ্রজীবনপঞ্জী ১৮৬১-১৯৪১। কলিকাতা, বিচিত্রা, ১৯৬১। ১৬ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই।

ভারতীয় তথ্যকেন্দ্র, ঢাকা

রবীন্দ্র শতবর্ষ: রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতা। ঢাকা, ভারতীয় তথ্যসরবরাহ কেন্দ্র, ১৯৬১। ৬+৫২ পৃ। ২০.৫ সে. মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই।

ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ

রবীন্দ্রমানসে নারী। কলিকাতা, ১৯৬১। ৬+৬৮ পৃ। ২১ সে মি.। ০.৫০।

মদনমোহন গোস্বামী

রবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়। কলিকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর কালচারাল ফ্রীডম, ১৯৬২। ১০+৬৯ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। বিনামূল্যে।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের মানসী। কলিকাতা, লিপিবন্ধন, ১৯৬১। ৮+৮৪ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ২.০০।

মনোরঞ্জন জানা

রবীন্দ্রনাথ : কবি ও দার্শনিক। কলিকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৯৬২। ৪+৬৫৩ পৃ। ১৯ সে. মি.। ১২.৫০।

মীরা ভট্টাচার্য

বালক। কলিকাতা, অশোক বুক সেণ্টার, ১৯৬১। ৬+৫৬ পৃ। ১৮.৫ সে. মি.। ১.৫০।

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, দেবসাহিত্য কুটীর, ১৯৬১। ১০০ পৃ। ১৮ সে. মি.। ১.৫০।

রণজিৎকুমার সেন

ভারতভাস্কর রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, এ. মুখার্জী, ১৯৬১। ১০+২৪২ পৃ। ১৯.৫ সে. মি.। ৪.০০।

রমেন দাস

অনেক মানুষ একটি মন (রবীন্দ্রনাথ)। কলিকাতা, এশিয়া, ১৯৬২। ৯৫ পৃ। ২২ সে. মি.। ২.০০।

রমেন দাস, সম্পাঃ

রবীন্দ্রপ্রণাম। কলিকাতা, এশিয়া, ১৯৬১। ৬+১১০ পৃ। ২০.৫ সে. মি.। ৩.০০।

রবীন মুখোপাধ্যায়

ছোট রবি। কলিকাতা, বসু প্রকাশনী, ১৯৬১। ৮+৪৮ পৃ। ১৮ সে মি.। ১.০০।

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সমিতি, করিমগঞ্জ

রবিপ্রকাশ : রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ। সুখময় বসু ও সুধীর সেন সম্পাদিত। ১৩৬৮। ৬+১২৮ পৃ.। ২৪.৫ সে. মি.। ২.০০।

রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সমিতি, শান্তিপুর

রবীন্দ্রস্মারকগ্রন্থ। শান্তিপুর, ১৯৬১। ৬+১১১ পৃ। ২৪ সে. মি.। মূল্যের উল্লেখ নাই।

রাণাঘাট রবীন্দ্রশতবার্ষিকী কমিটি

রবিতর্পণ। রাণাঘাট, ১৯৬১। ৫৮ পৃ। ২৭ সে. মি.। ১.০০।

লীলা মজুমদার

এই যা দেখা। কলিকাতা, ত্রিবেণী প্রকাশন, ১৯৬১। ৪+১১৯ পৃ। ২২ সে. মি.। ৩.০০।

কবিকথা। নূতন দিল্লী, সাহিত্য আকাদমি, ১৯৬১। ১৪ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ০.৫০।

শক্তিব্রত ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ : কালিম্পঙএর দিনগুলি। কলিকাতা, ক্লারিয়ন পাবলিকেশনস্‌, ১৯৬১। ১২+৮০ পৃ। ২১.৫ সে. মি.! ৩.০০।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬১। ৬+১২০ পৃ। ১৯ সে. মি.। ৩.০০।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস। কলিকাতা, এ. মুখার্জী, ১৯৬১। ৮+২৬৮ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ৭.৫০।

টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬২। ৬+১৯৪ পৃ। ২২ সে. মি.। ৫.০০।

শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

বাহিরবিশ্বে রবীন্দ্রনাথ। ২য় সং, পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত। কলিকাতা, রীডার্স কর্নার, ১৯৬১। ৮+১২৯ পৃ। ২২ সে. মি.। ৩.৭৫।

শিশিরকুমার ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য। কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৯৬১। ৬+৩০০ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ৮.০০।

শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬২। ৭+২৮৫ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ৬.৫০।

শ্যামল দাশগুপ্ত

বালক রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, মাতৃপ্রকাশনী, ১৯৬১। ৪+৫৫ পৃ। ২১.৫ সে. মি.। ১.৫০।

শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী

রবীন্দ্রায়ণ : লোকপ্রিয় পয়ার ছন্দে রবীন্দ্র-জীবন-গাথা। তমলুক, লেখক, ১৯৬১। ৮৮ পৃ। ১৮.৫ সে. মি.।

সতীকুমার নাগ

হাজার বছর পরে আমাদের কবি। কলিকাতা, টি. এস. বি. প্রকাশন, ১৯৬১। ১৬ পৃ। ২২ সে. মি.। ০.৫০।

সত্যেন্দ্রনাথ জানা

রবিতর্পণ। পরিবর্ধিত শতবার্ষিকী সং। কলিকাতা, প্রবর্তক পাবলিশার্স, ১৯৬১। ১২+১২২ পৃ। ২০.৫ সে. মি.। ৩.০০।

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার। কলিকাতা, র‍্যাডিকাল বুক ক্লাব, ১৯৬১। ৬+১২৮ পৃ। ২২ সে মি.। ৩.০০।

সন্তোষকুমার দে

রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, বিচিত্রা, ১৯৬১। ৪+৬০ পৃ। ১৮ সে. মি.। ১.০০।

সবুজ সাথী (রমেন দাস)

রবির আলো। কলিকাতা, এশিয়া পাবলিশিং কোং, ১৯৬১। ৬+৩৪ পৃ। ২২ সে. মি.। ১'০০।

সমীরণ চট্টোপাধ্যায়

গুরুদর্শন। কলিকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৯৬১। ৪+১৩৭ পৃ। ১৮'৫ সে. মি.। ২'৫০।

সুকুমার সেন

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড [রবীন্দ্রনাথ]। ৩য় সং। কলিকাতা, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৬১। ১০+৫২৬ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ১৫'০০।

রবীন্দ্ররচনা: ভূনির্দেশিকা। বর্ধমান, সাহিত্যসভা, ১৯৬২। ১৮ পৃ। ২১'৫ সে মি.। ১'০০।

সুখময় মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসাহিত্যের নবরাগ। কলিকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৯৬১। ১২+১৫৯ পৃ। ১৯ সে. মি.। ৫'০০।

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২। ৬+১৬২ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ৪'৫০।

সুধীর চক্রবর্তী, সম্পাঃ

রবীন্দ্রনাথ: মনন ও শিল্প। কলিকাতা, অচলায়তন প্রকাশনী, ১৩৬৮। ১৩+২০৮ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ৫'০০।

সুধীরচন্দ্র কর

রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র-পরিচয়। কলিকাতা, ভারতী লাইব্রেরী, ১৯৬১। ১৬৭ পৃ। ২২ সে. মি.। ৩'৫০।

সুনন্দা দত্ত

রবীন্দ্রকাব্য-ভাষা। কলিকাতা, ইস্টান পাবলিশার্স, ১৯৬১। ১০+৩০৫ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ৭'৫০।

সুবোধচন্দ্র প্রামাণিক

রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা। কলিকাতা, শতাব্দী গ্রন্থভবন, ১৯৬২। ১২+১৬১+২ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ৪ ৫০।

সুশীলকুমার গুপ্ত

রবীন্দ্র-নাট্য-প্রসঙ্গ: কাব্যনাটক। কলিকাতা, স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, ১৩৬৮। ১৮৪ পৃ। ২১'৫ সে. সি.। ৪'০০।

সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়

পঁচিশে বৈশাখ: রবীন্দ্রজীবনকথা। শান্তিনিকেতন, শান্তিনিকেতন পুস্তকপ্রকাশ সমিতি, ১৯৬১। ২+৬৮ পৃ। ১৮ সে. মি.। ১'০০।

সৃজনী। কলিকাতা, রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসব সমিতি, নতুন মহাকরণ ভবন, ১৯৬১। ২১৮ পৃ। ২৪ সে. মি.। ৮'০০।

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি স্মারক সংকলন।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

রবীন্দ্র-অভিধান। কলিকাতা, বুকল্যাণ্ড, ১৯৬১-৬২। দুই খণ্ড। ২১ সে. মি.। ১২'০০।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের গান। কলিকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৬১। ১৬+১৭৭ পৃ। ২১ সে. মি.। ৩'০০।

হরপ্রসাদ মিত্র, সম্পাঃ

রবীন্দ্রচর্চা। কলিকাতা, সুরভি প্রকাশনী, ১৯৬১। ৪+২২৭ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ৫'০০।

হিজ মাস্টারস্‌ ভয়েস এবং কলম্বিয়া

রবীন্দ্রসংগীত। কলিকাতা গ্রামোফোন কোং, ১৯৬১। ১৮+১৬ পৃ। ১৮'৫ সে. মি.।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রদর্শন। কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ্‌, ১৯৬২। ১১৫ পৃ। ২১'৫ সে. মি.। ২'৫০।

হীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল

রবীন্দ্রসাহিত্যের অভিধান। কলিকাতা, লেখক, ১৯৬১। ২৬৪ পৃ। ১৮ সে. মি.। ৪'৫০।

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : প্রথম খণ্ড। বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২। রয়্যাল ৫৪৮ পৃ। সাড়ে বারো টাকা।

আধুনিক বাংলাদেশ ও বাঙালীর সৃষ্টি ও গড়ন উনবিংশ শতকে। মোটামুটিভাবে এ কথা বললে খুব অন্যায় বলা হয় না। কাজেই উনবিংশ শতক সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীর ইতিহাস-জিজ্ঞাসার ক্রমবর্ধমান প্রসার খুব সহজবোধ্য। এই জিজ্ঞাসার সূত্রপাত দেখা দিয়েছিল গত শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ পাদেই ; কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ব্রিটিশ শাসকদের ক্রিয়াকলাপ, যুদ্ধবিগ্রহ, প্রশাসন-সংক্রান্ত বিধিবিধান, সংস্থা-সংগঠন এবং কতিপয় বাঙালী মনীষীর ব্যক্তিগত জীবন, চিন্তা ও কর্ম, কিছু শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত গোষ্ঠীপ্রচেষ্টা, কলকাতা শহরের কিছু কিছু টুকরোটাকরা তথ্য ইত্যাদি ছাড়া বিশেষ কিছুই আমাদের জানা ছিল না। তথ্যসংগ্রহের কোনো চেষ্টাও বিশেষ-কিছু হয় নি। একমাত্র রমেশচন্দ্র দত্ত ছাড়া ঐতিহাসিক তথ্য -সংগ্রহ ও -ব্যাখ্যার সার্থক ও ব্যাপক প্রচেষ্টা আর কেউই করেন নি বললেই চলে। এদিকটাতে আমাদের দৃষ্টিপাত ঘটতে শুরু হয়েছে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে। ব্রিটিশ এম্পায়ারের ইতিহাসের সীমার বাইরেও যে বাংলাদেশ ও বাঙালীর একটা ইতিহাস গড়ে উঠেছে, ধর্মার্থকামমোক্ষ এই চতুবর্গ নিয়ে একটা সমগ্র নূতন জীবন জন্মলাভ করেছে এবং লালিতপালিত হয়েছে ; এক কথায় সংকীর্ণ রাজকীয় এবং প্রশাসনিক ইতিহাস ছাড়া বৃহত্তর অর্থে বাঙালীর একটি সামাজিক (সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক এই সামাজিকের অন্তর্গত) ইতিহাস যে আছে, এই সচেতনতার বয়স মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর।

যাই হোক, এই চেতনার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ধরা পড়ল যে, শুধু সরকারি দলিলপত্রের উপর নির্ভর করে এই সামাজিক ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। নানা ধরণের বেসরকারি ও ব্যক্তিগত কাগজপত্র, বিচিত্র মামলামোকদ্দমার নথিপত্র, সমসাময়িক সংবাদ ও সাময়িক পত্র, ব্যবসায়ীদের ও মঠ-মন্দির-আখড়ার পুঁথিপত্র ইত্যাদির মধ্যেও যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ লুকিয়ে আছে, ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই চেতনা দেখা দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে এইসব উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ ও সংকলনের চেষ্টাও শুরু হল। সে চেষ্টা আজও চলছে এবং বহুকাল চলবে, তবে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, চেষ্টাটার গতি মন্থর এবং প্রকৃতি খুব ব্যাপক ও সামগ্রিক নয়।

বাংলাদেশে এ-ধরণের কাজের সূত্রপাত করেছিলেন স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এবং তা শ্রদ্ধেয় আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নির্দেশে। তাঁর কাজের পরিধি সীমিত ছিল সংবাদপত্রের মধ্যে ; শ্রীরামপুর মিশনারীদের পরিচালিত 'সমাচার দর্পণে'র ফাইল ঘেঁটে প্রচুর পরিশ্রম করে তিনি 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নামে দুই খণ্ডে একখানা মূল্যবান রচনা-সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। ব্যক্তি ও পরিবার -গত পত্র-সংকলনের কাজ এখানে-সেখানে একটু-আধটু আগেই আরম্ভ হয়েছিল ; দৃষ্টান্তস্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -প্রকাশিত স্বর্গত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের একটি মূল্যবান সংকলনগ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ও কোচবিহার-রাজবংশের একটি মূল্যবান পত্রদলিল-সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে। বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন

মণ্ডল মহাশয়ও এ-ধরণের পত্রসংকলনের কাজ কিছু করেছেন 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' নামে প্রকাশিত গ্রন্থে। কিন্তু তার পর অনেকদিন এ-ধরণের কাজ আর হয় নি। সম্প্রতি আমার সতীর্থ বন্ধু সুপরিচিত লেখক ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলাদেশ সম্বন্ধে উৎসাহী অনুসন্ধানী শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মহাশয় ব্রজেন্দ্রনাথ-সূচিত কর্মক্রিয়াটি নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন, এবং 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' পাঁচটি বৃহৎ খণ্ডে বাঙালী-পরিচালিত বাংলা প্রধান প্রধান পত্রিকাগুলির রচনা-সংকলন প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন। সম্প্রতি প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত -সম্পাদিত 'সংবাদ-প্রভাকর'এর রচনা-সংকলন নিয়ে। বাকি চার খণ্ডে থাকবে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' 'বিদ্যাদর্শন' 'সম্বাদ ভাস্কর' 'সর্বশুভকরী' ও 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার রচনা-সংকলন। পরিকল্পনাটি বৃহৎ এবং সুকঠিন। এই সংকলন-সমষ্টিতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাঁচ-ছয় দশকের বাংলাদেশের যে ছবি ধরা পড়বে তা কোনো সরকারি কাগজপত্রে মিলবে না। প্রথম খণ্ডটি দেখে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে, এ-ধরণের কাজে যে শ্রম ও নিষ্ঠা, যে বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য, বিচারবুদ্ধি ও সমাজদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন, বিনয়বাবুর তা আছে, এবং পরিকল্পনাটি তিনি সার্থক করে তুলতে পারবেন।

বিনয়বাবুর সংকলনের পিছনে তাঁর সামাজিক ও ঐতিহাসিক মন সক্রিয়। 'সংবাদ-প্রভাকর'এর রচনাগুলি তিনি বিষয়ভেদে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন: প্রথম, আর্থিক; দ্বিতীয়, সামাজিক; তৃতীয়, শিক্ষাসংক্রান্ত; ও চতুর্থ, বিবিধ। প্রত্যেকটি শ্রেণীর গোড়ায় বিষয়ের একটি বিশদ পরিচয় দেওয়া হয়েছে; এই পরিচয়টি মূল্যবান। সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপনেও সমসাময়িক সমাজের কিছু কিছু নক্‌শা ধরা পড়ে; সেজন্য 'সংবাদ-প্রভাকর'এরই কিছু কিছু অর্থবহ বিজ্ঞাপনও একটি অধ্যায়ে সংকলন করা হয়েছে। তা ছাড়া, শেষ অধ্যায়ে পঞ্চাশ পৃষ্ঠা জুড়ে নানা প্রাসঙ্গিক তথ্যেরও একটি মূল্যবান সংকলন করা হয়েছে। গ্রন্থের গোড়ায় ভূমিকাস্বরূপ বিনয়বাবু 'সংবাদ-প্রভাকর ও সেকালের বাঙালী সমাজ' নামে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লিখেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ-পঞ্চম দশকে কলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি কুঞ্চিকা এই নিবন্ধটি।

বিগত শতাব্দীর বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের যাঁরা অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষক তাঁদের পক্ষে বইটি অপরিহার্য। এই গ্রন্থটির প্রতি সবিনয়ে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

নীহাররঞ্জন রায়

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস। শ্রীঅজিত দত্ত। জিজ্ঞাসা। বারো টাকা।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা। শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ। ভারতী লাইব্রেরী। চৌদ্দ টাকা।

বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগে 'হাস্যরস' নিয়ে একই সঙ্গে দুখানি বৃহৎ আকারের গ্রন্থের আবির্ভাব পাঠক-সাধারণের কাছে বিস্ময়কর হলেও তৃপ্তিকর সংবাদ। শ্রীঅজিত দত্ত তাঁর গ্রন্থের প্রথমে একটি অধ্যায়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিভিন্ন মনীষী প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল অবধি হাস্যরসের বিভিন্ন দিক, বিশেষতঃ হিউমার ও স্যাটায়ার, সম্পর্কে যেসব মত ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তাদের একটি যুক্তিপূর্ণ তুলনামূলক বিচার দ্বারা শেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 'উঁচুদরের সাহিত্যসৃষ্টিতে হাস্যরস ও করুণ রসকে সম্পূর্ণরূপে

পৃথক করে রাখা প্রকৃতই শক্ত'। বলা বাহুল্য, এ সিদ্ধান্ত হিউমার সম্বন্ধে সত্য, স্যাটায়ার সম্পর্কে নয়। কেননা স্যাটায়ারের মধ্যে একটি আঘাতদান-প্রবৃত্তি যে-কোনো ভাবেই বিদ্যমান থাকে। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে হাস্যরসের যে-নির্দেশ আছে শ্রীদত্ত তারও আলোচনা করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে দ্বিধাহীন ভাবে মেনে নিতে পারি যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যে 'হাস্যরস' নিয়ে যে-ধরণের সূক্ষ্ম ও মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে, হাস্য ও করুণের যে মিশ্রণ-তত্ত্বের সন্ধান মিলেছে আমাদের দেশের আলংকারিকেরা ততদূর যেতে পারেন নি। এই সংজ্ঞাগত আলোচনার পর শ্রীদত্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সম্পর্কে একটি অধ্যায় বিন্যাস করেছেন। তার পরিধি অনধিক কুড়ি পৃষ্ঠা।

অন্যদিকে শ্রীঅজিত ঘোষ পরিকল্পনার দিক থেকে একটু ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছেন। তিনি এই গ্রন্থের প্রথম অংশের নামকরণ করেছেন 'হাস্যতত্ত্ব'। এই পর্যায়ে তিনি হাসির শারীরতত্ত্ব, ইতর প্রাণী, অসভ্য জাতি, শিশু ও বয়স্কদের হাসির আলোচনার সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের হাসির কারণ নির্দেশ করেছেন। হাস্যরস আলোচনায় তিনি প্রত্ন-প্রস্তর যুগ থেকে আণবিক যুগের প্রান্ত অবধি উল্লেখ করেছেন অথচ তাঁর সিদ্ধান্ত 'কিন্তু সভ্যতার সহিত মানুষের অন্তর-প্রকৃতি বিশেষভাবে বদলাইয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না'— রুচিমান পাঠকের কাছে অস্বীকৃত হবে। শ্রীঘোষ তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের নাম দিয়েছেন 'হাস্যরস' এবং Wit, Humour, Satire, Fun এর প্রতিশব্দ বসিয়েছেন যথাক্রমে করুণ হাস্যরস, বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হাস্যরস, ব্যঙ্গরস ও কৌতুকরস। তিনি এখানে প্রধানত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতামতগুলি উপস্থিত করেছেন, তাদের বিস্তৃত বিচার করেন নি এবং 'ব্যঙ্গরস' সম্পর্কে আলোচনাকালে ব্যঙ্গকার বা স্যাটায়ারিস্টকে 'পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত' হতে দেখেছেন! অথচ ভলতেয়র, আনাতোল ফ্রাঁস, বার্নাড্‌শ' বা গোগল সম্পর্কে দুনিয়ার কেউই 'পৈশাচিক উল্লাসের' অভিযোগ আনেন নি। এবং আঘাতদান-প্রবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও বিদ্রূপাত্মক রচনার লেখকদের 'Sadist' বলে অভিহিত করা অন্যায়। শ্রীঘোষ তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় অংশকে 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' নামে অভিহিত করেছেন। তিনি এই অধ্যায়ে বাঙালীর জাতিগত ভাবপ্রবণতাকে হাস্যের স্বল্পতার কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। তাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু তার জন্য এ কী ভাষা! 'সে স্বদেশ-অনুরাগে উত্তেজিত হইয়া উঠে, রুদ্র অত্যাচারের সম্মুখে বুক পাতিয়া দেয়, পরের বেদনায় কাঁদিয়া অস্থির হয়, আবার প্রেমে ব্যর্থ হইয়া লেকের জলে ডুবিয়া মরে এবং গোঁপের কালো রেখা দেখা যাইবার পূর্বেই অদ্বিতীয় প্রেমের কবি হইয়া পড়ে।'— পৃ ৪৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-ডিগ্রীপ্রাপ্ত গ্রন্থে এই ভাষা সমর্থনযোগ্য নয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সম্পর্কিত আলোচনায় শ্রীদত্ত লিখেছেন মাত্র কুড়ি পৃষ্ঠা এবং শ্রীঘোষ ব্যয় করেছেন দু শো পৃষ্ঠা। শ্রীদত্ত সঙ্গত ভাবেই চর্যাগীতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্জন করেছেন। আমাদের মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে নারীগণের পতিনিন্দা, বাসরঘরের কৌতুক, অতিভোজনের বৃহৎ তালিকা, অঙ্গ-বিকৃতি, ভাষা-বিকৃতি প্রভৃতি নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির পরিচয় আছে, সেগুলির মধ্যে সূক্ষ্মতার পরিচয় নেই। শ্রীদত্ত সেজন্য উক্ত প্রসঙ্গগুলির গতানুগতিক বর্ণনার পৌনঃপুনিক ব্যবহার অনুল্লেখিত রেখে পাঠকদের খুশিই করেছেন। তিনি যোগ্য বিচারের দ্বারা মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের রচনায় গতানুগতিকতার গণ্ডি-ভাঙা নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন।

এ ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আমার মতের মিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সতেজ জীবনবোধ, জীবন্ত

চরিত্র সৃষ্টি, শিল্পীর কাম্য নির্লিপ্তি এঁদের রচনাতেই ধরা পড়েছে। মুরারি শীল, ফুল্লরা, ভাঁড়ু দত্ত, দুর্বলা, লহনা প্রভৃতি পূর্ব-প্রচলিত চরিত্রগুলিতে মুকুন্দরাম প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছেন। ভারতচন্দ্রের সমগ্র কাব্যের মধ্য দিয়ে যে-বিদ্রূপফল্গু বহে চলেছে তার সদৃশ রূপ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় না। তিনি স্বয়ং তাঁর কাব্যোদ্যানের 'বিস্তর ঠাটের' হীরামালিনী— তাঁর বাক্‌শৈলী সম্বন্ধে আমরা স্বতঃই বলতে পারি 'কথায় হীরার ধার' এবং তিনি তাঁর সমকালীন অরসিক শ্রোতৃবৃন্দের কাছে তাঁর রচনার উপযুক্ত সমাদর হয় নি বলেই বোধ করি লিখেছিলেন 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার'। ভারতচন্দ্রের রচনায় আমরা খাঁটি 'wit' বা বুদ্ধি-উজ্জ্বল বাক্‌চাতুর্যের সন্ধান পাই। কিন্তু শ্রীঘোষ চর্যাগীতি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, রামায়ণ-মহাভারত, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদ, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, হেঁয়ালী, কবিগান, যাত্রা, মায় গোপাল ভাঁড় কিছুই বর্জন করেন নি। ফলে এই অংশটি প্রাচীন ও মধ্যযুগে রচিত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার কৌতুক অংশগুলির এক দীর্ঘ ক্লান্তিকর সংকলনে পর্যবসিত হয়েছে। এবং কোনো পাঠকই এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে বিরক্তি বোধ না করে পারেন না। মনে হয়, চর্যাপদে হাস্যরস অনাবিষ্কৃত থাকলে ক্ষতি ছিল না। অন্যদিকে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ভাঁড়ু ও মুরারি শীলের চরিত্রে মুকুন্দরাম 'বিদ্রূপবাণ বিদ্ধ' করেছেন বলে শ্রীঘোষের মন্তব্য 'সহৃদয়-সামাজিকে'রা স্বীকার করেন না। ভারতচন্দ্রের হাস্যরসসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যও শ্রীঘোষের গ্রন্থে ভালোভাবে ধরা পড়ে নি, শ্রীদত্তের গ্রন্থে এই ত্রুটি নেই। শ্রীঘোষ তাঁর 'অবতরণিকা'য় লিখেছেন, 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের উদ্দীপনাতে একঘেয়েমি ও গতানুগতিকতা আমরা লক্ষ্য করি। যে হাস্যরস আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে রহিয়াছে তাহা স্থূল, গ্রাম্য ও অশ্লীল' অথচ আশ্চর্যের বিষয় কার্যকালে তিনিই দুশো পৃষ্ঠা ধরে তারই দৃষ্টান্তপুঞ্জ উৎকলন করে চলেছেন : যার মধ্যে বিশল্যকরণীর সন্ধান মেলে না।

আধুনিক যুগের সাহিত্যে হাস্যরসের আলোচনা -অংশে শ্রীদত্তের অধ্যায়-বিভাজন-কৌশল শ্রীঘোষের গ্রন্থের তুলনায় প্রশংসনীয়। কেননা শ্রীদত্ত যথাক্রমে কবিতা নাটক ও গদ্য সাহিত্যকে পৃথকভাবে আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন এবং তারপর এনেছেন রবীন্দ্রপরবর্তী লেখক গোষ্ঠীকে। ফলে গ্রন্থের বর্ণিত ও আলোচিত প্রসঙ্গগুলি ধারাবাহিকভাবে জানবার ও বুঝবার সুবিধা আছে ; অন্যদিকে শ্রীঘোষের সাধু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর অধ্যায়-বিভাজন সুন্দর হতে পারে নি। যেমন তিনি ঈশ্বর গুপ্তের পর এনেছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কালানুক্রম মানলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পূর্বে তাঁর স্থান হওয়া উচিত ছিল। এবং তার পর উপস্থিত করেছেন প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহকে। ধরে নেওয়া গেল নক্‌শাধর্মী কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এঁদের আলোচনা পর-পর হওয়া ভালো। কিন্তু নাটকে অকস্মাৎ মধুসূদনকে অনালোচিত রেখে দীনবন্ধুতে এসে পৌছান অনৈতিহাসিক। অবশ্য শেষের দিকে 'হাস্যরসাত্মক নাটক ও প্রহসন' অধ্যায়ে তিনি রামনারায়ণ তর্করত্ন সম্পর্কে দুটি অনুচ্ছেদ এবং মধুসূদন দত্তের প্রহসন দুখানি সম্পর্কে মাত্র পঁচিশ পংক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন। মধুসূদনের প্রহসন আরও বেশি স্থান পাবার অধিকারী বলে আমার মনে হয়। কেননা দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী' উভয় নাটকের উপরই মধুসূদনের প্রহসনের প্রভাব আছে। শ্রীঘোষের তুলনায় শ্রীদত্ত মধুসূদনের প্রতি সুবিচার করেছেন মানতে হবে। দীনবন্ধু মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে আমার মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ অদ্যাবধি শ্রেষ্ঠ আলোচনা। উভয় গ্রন্থের লেখকই তাঁদের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের

চেয়ে নতুন কিছু বলেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর সম্পর্কে শ্রীদত্ত বিস্তৃত মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন, কমলাকান্তের চরিত্রটিকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীঘোষ কমলাকান্তকে শেক্‌সপীয়র-সৃষ্ট Fool ও Touchstone -এর সঙ্গে তুলনা করে অযৌক্তিক প্রসঙ্গ করেছেন, তিনি কমলাকান্তের ট্রাজিক রূপ ধরতে পারেন নি। গদ্যসাহিত্যের অন্যান্য রচয়িতাদের মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায় শ্রীদত্ত 'নববাবুবিলাস' বইখানিকে 'বর্ণনার গুণে অত্যন্ত সরস ও কৌতুকাবহ হয়ে উঠেছে' বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তিনি 'নববিবিবিলাস' গ্রন্থকে ভবানীচরণের রচনা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর যুক্তি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অপর পক্ষে শ্রীঘোষ 'নববিবিবিলাস'কে ভবানীচরণের রচনা বলে নির্বিচারে স্বীকার করেছেন। তাতে দুঃখ ছিল না, কিন্তু 'দূতী বিলাসের' মত অশ্লীল রচনায়ও ভবানীচরণের কৌতুকবিলাসী 'বিদগ্ধমনের চমৎকার স্বাক্ষর' পেয়েছেন দেখে আশ্চর্য হতে হয়। হুতোম পেঁচার নকশায় উভয় লেখকের মোটামুটি মতৈক্য আছে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের হুতোম-বিরোধী মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে উভয়েই ভালো কাজ করেছেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গেও শ্রীদত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। 'বঙ্গবাসী'গোষ্ঠীর ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্র তীব্র ব্রাহ্মবিদ্বেষী ছিলেন ও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের পক্ষভুক্ত বলে তাঁদের রচনায় প্রকৃত শিল্পদৃষ্টি অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজ তথা সমাজের প্রগতিশীল অংশকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কটাক্ষ করাটা তাঁদের কাছে 'মিশন' (mission) বলে গণ্য হয়েছিল। এই ধরণের উগ্রতা থাকলে শিল্পসৃষ্টি রুচিদুষ্ট ও ভ্রষ্ট হতে বাধ্য। ব্যঙ্গরচনায় ইন্দ্রনাথের দক্ষতা ছিল এবং তিনি তাঁর যুগের গোঁড়া সমাজের (কখনও বঙ্কিমচন্দ্র বা এমন-কি বিদ্যাসাগরের) কাছ থেকে হাততালি পেলেও স্বীকার অবশ্যই করতে হবে আজ তাঁর রচনাবলী আমাদের আকর্ষণ করে না। শ্রীঘোষ ঠিকই লিখেছেন, 'ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গরস তৎকালীন স্বাধীন ভাববিরোধী প্রাচীন আদর্শনিষ্ঠ সমাজের কাছে যতই প্রীতিকর হউক না কেন, চিরকালীন বিচিত্র রুচি ও ভাববিশিষ্ট লোকের কাছে কখনও আদরণীয় হইতে পারে না।'— পৃ ৩৩৭। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু সম্পর্কেও তাঁর মত সমর্থনযোগ্য—'লেখকের মাত্রাতিরিক্ত গোঁড়ামি এবং বিপক্ষ মতের প্রতি অসংবৃত বিদ্বেষের ফলে তাঁহার ব্যঙ্গোৎসারিত হাসি অনেকস্থানেই শুকাইয়া নিছক গালাগালি অথবা নীরস তত্ত্বকথায় পর্যবসিত হইয়াছে।'— পৃ ৩৪৮। এই লেখকদ্বয়ের দৃষ্টি ও সৃষ্টি সম্পর্কে শ্রীঘোষের সঙ্গে শ্রীদত্তের মতের মিল লক্ষিত হয়।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সর্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র, এমন বিস্ময়কর জীবন আর কেউ যাপন করেন নি, এমন অপূর্ব রচনাও সেকালে বা একালে কেউ লেখেন নি ; fact ও fantasyর অপরূপ মিশ্রণ যেমন তাঁর রচনায় কৌতুকহাস্যচ্ছটা বিকিরণ করেছে তেমনি তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা, নিপুণ বাস্তবাভিজ্ঞতা ও সর্বপ্রকার ভণ্ডামির বিরোধিতা তাঁর রচনাবলীতে সুস্পষ্ট। 'নব্যহিন্দুত্বে'র আন্দোলন এবং 'স্বদেশী' আন্দোলনের নামে ভণ্ডামি দুই-ই তাঁর হাতে হাসির কষাঘাত লাভ করেছে। তিনি আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণীর, ধর্মের পাণ্ডার, স্বদেশী ধ্বজাধারীদের অন্তঃসারশূন্যতা ও নীচতায় ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তার মূলে ছিল তাঁর সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি, সংস্কারমুক্ত মন। গড়গড়ি মহাশয়ের জবানীতে ত্রৈলোক্যনাথ নিজের মনের কথাটি ব্যক্ত করেছেন, 'ভালোরূপ লেখাপড়া জানি না, শাস্ত্র জানি না, জানি কেবল এই যে— সত্য ও পরোপকার— ইহাই ধর্ম, ইহাই কর্ম'— একদিকে অন্যায়ের প্রতি ক্ষমাহীন ব্যঙ্গ

অন্যদিকে উৎপীড়িতের প্রতি সীমাহীন সহানুভূতি এই দুইয়ের সম্মিলনে ত্রৈলোক্যনাথ আমাদের সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিউমারিস্ট ও স্যাটায়ারিস্ট। এই আলোচনায় শ্রীদত্ত অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথকে উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছেন। শ্রীঘোষ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের আলোচনায় বহু পৃষ্ঠা ব্যয় করায় স্বভাবতঃই আধুনিক কালের আলোচনায় তাঁর ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সীমিত হয়েছে। অন্যদিকে শ্রীদত্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যকে সংক্ষেপে আলোচনা করায় আধুনিক কালের বেলায় প্রসঙ্গগুলিকে সুযোগ মত বাড়িয়ে লিখতে পেরেছেন।

শ্রীঘোষ ও শ্রীদত্ত দুজনেই রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা দিকে হাস্যরসের উৎস আমাদের দেখিয়েছেন। তবে শ্রীঘোষ লিখেছেন যে 'সোনারতরী' কাব্যের 'হিং টিং ছট' কবিতাটি 'সামান্য বিষয় লইয়া যাহারা গুরু-গম্ভীর শব্দাড়ম্বর সৃষ্টি করে এবং নানা জটিল দার্শনিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া পাণ্ডিত্য ফলাইতে যায়' তাদের বিদ্রূপ করে লেখা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নব্যহিন্দুত্বের ও 'আর্যামি'র আন্দোলনকে তথা তার নেতা শশধর তর্কচূড়ামণিকে বিদ্রূপ করে এই কবিতা রচিত হয়েছে (কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্মবিদ্যুৎ/ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত)। তিনি 'লিপিকা'র রচনাগুলিতে বিদ্রূপাত্মক রচনার ক্ষেত্রে 'কর্তার ভূত' ও 'তোতাকাহিনী'র উল্লেখ করেছেন কিন্তু অবিস্মরণীয় রচনা 'ঘোড়া' উপেক্ষিত হল কেন? 'সে' গ্রন্থখানির আলোচনায় শ্রীদত্ত আমাদের পরম তৃপ্ত করেছেন। তিনি আর-একটি বিষয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছেন— এই আলোচনায় অধুনাবিস্মৃত হরিদাস হালদার ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে অন্তর্ভুক্ত করে। শ্রীঘোষ এঁদের নামোল্লেখও করেন নি। অজিত দত্ত মহাশয় আর-একটি ভালো কাজ করেছেন সুকুমার রায় সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করে। অজিতকুমার ঘোষ মহাশয় যেখানে সজনীকান্ত দাস এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় সম্পর্কে যথাক্রমে আট ও তিন পৃষ্ঠা লিখেছেন সেখানে সুকুমার রায়ের নামটি শুধু আছে। এই সূত্রে বলা দরকার যে, বাংলা ছোটগল্প একদা যাঁর হাতে অতুলনীয় কৌতুকহাস্যে মণ্ডিত হয়েছিল সেই প্রভাতকুমারের নামটি মাত্র আছে সুকুমার রায়ের সঙ্গে উপসংহার অংশে, অথচ শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে বারো পৃষ্ঠা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই হারে দীর্ঘ আলোচনা চালিয়ে যাবার দরকার নেই। শ্রীদত্তের গ্রন্থ সম্পর্কে কোনো সমালোচক অভিযোগ করতে পারেন যে, লেখক হাস্যরসের আলোচনায় আলোচিত সাহিত্যিকদের জীবন ও অন্যান্য শিল্পকর্মের প্রসঙ্গ কেন এনেছেন। এ সমালোচনার জবাবে বলা যায়, কোনো কোনো স্থলে ঈষৎ বাহুল্য বোধ হলেও এ ধরণের আলোচনা অযৌক্তিক বলা যায় না। যেমন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু বা দীনবন্ধু মিত্র কিংবা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি লেখকদের বহুমুখী পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল। হাস্যরসসৃষ্টি একজন লেখকের ব্যক্তিত্বেরই অন্তর্গত। শুধু হাস্যরসের অংশটুকু বর্ণনা বা বিচার করলে লেখকের প্রকৃত পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। বোধ করি তিনি সেজন্যই এই রীতি গ্রহণ করেছেন।

আলোচ্য বই দুখানি বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত হাস্যরস সম্পর্কে পাঠকদের বহু অপরিচিত তথ্যের সঙ্গে পরিচয়সাধন করাবে। এবং উভয়ের দুরূহ শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টার জন্য সকলেই তাঁদের সাধুবাদ জানাবেন। তবে পড়বার দিক থেকে অজিত দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থ যে অধিকতর উপাদেয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি জাত-লিখিয়ে এবং গবেষণা-উপাধির দিকে চোখ না রেখে লিখেছেন বলেই বোধ করি রচনা এত সুখপাঠ্য হয়েছে। কিন্তু অজিতকুমার ঘোষ মহাশয় যদিচ

গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে লিখেছেন, 'হাসির আলোচনা যদি নীরস ও ভারগ্রস্ত হয় তবে তাহার মূল্য নাই। এজন্য আমার আলোচনা যথাসম্ভব সরস ও উপভোগ্য করিতেই চেষ্টা করিয়াছি।'

তবে, যখন পড়ি— 'স্ত্রীসমাজকে ব্যঙ্গ করিলে পুরুষসমাজ পরুষ হাসি হাসিবে এবং পুরুষসমাজকে বিদ্রূপ করিলে স্ত্রীসমাজের কোমলকণ্ঠ হাস্য-কলিত হইয়া উঠিবে। পুঁজিবাদী হাসিলে সাম্যবাদী কাশিবে এবং সাম্যবাদী হাসিলে পুঁজিবাদী কাশিবে,'— তখন মনে হয়, এর প্রয়োজন ছিল কি ?

দেবীপদ ভট্টাচার্য

যদি হায়   জীবন পূরণ নাই হল মম তব অকৃপণ করে,
মন তবু জানে—
চকিত ক্ষণিক আলোছায়া তব আলিপন আঁকিয়া যায়
ভাবনার প্রাঙ্গণে ॥
বৈশাখের শীর্ণ নদী ভরা স্রোতের দান না পায় যদি
তবু সংকুচিত তীরে তীরে
ক্ষীণ ধারায় পলাতক পরশখানি দিয়ে যায়,
পিয়াসি লয় তাহা ভাগ্য মানি ॥

মম ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে
যততুকু পাই রয় উচ্ছলিতে।
দিবসের দৈন্যের সঞ্চয় যত
যত্নে ধরে রাখি
সে যে রজনীর স্বপ্নের আয়োজন ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

গানটি মীড়-প্রধান। তার-যন্ত্রে মধ্যলয়ে গেয়

জ্ঞা জ্ঞা II জ্ঞা -মা -পা -ধা । -ণা -ধা -ণা -া I ণা -র্সা র্সা র্সা । ণা -া ধণধা ণা I
য দি   হা ০ ০ ০   ০ ০ ০ য়্   জী ০ ব ন   পূ ০ র০ ণ

I ণা -র্সা র্সা -ণা । র্সণা -দা২ দ২পা পা I পা ধা ণা ণর্সা । র্সণা ণদা দপাদ -মপমা I
না ই হ ০   ল ০ ম০ ম   ত ব অ কৃ০   প ণ০ ক ০০

I মা -জ্ঞা -া -া । -া -া জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা -মা -পা -ধা । -ণা -ধা -ণা -ণদা২ I
রে ০ ০ ০   ০ ০ য দি   হা ০ ০ ০   ০ ০ ০ ০

I -পা -া -া -া । -া -া -া -া I সা জ্ঞা জ্ঞা মা । মা -পা পা -ধা I
০ ০ ০ ০   ০ ০ ০ য়্   ম ন ত বু   জা ০ নে ০

I ণা -দা২ ণদা২ -া । -পা -া -া -া I পর্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা -া I
জা ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ চ কি ত ক্ষ ণি ক আ ০

I র্সা -র্রা র্রা -র্সা । র্রর্সা -ণা ণা ণা I ণা ণর্সা র্সা র্সা । নর্সা -ণা ণা -া I
লো ০ ছা ০ য়া ০ ত ব আ লিং প ন আঁ ০ কি ০

I ণা -দা২ ণদা২ -পা । পা ধা ণা ণর্সা I ণা -ধা -ণা ণদা । পা -া পা মা I
য়া ০ যা য়্ ভা ব না রং প্রা ০ ঙ্ গ ণে ০ য দি

I জ্ঞা -মা -পা -ধা । -ণা -ধা -ণা -ণদা২ I -পা -া -া -া । -া -া -া -া I
হা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I {পা -া পা -মা । পমা -জ্ঞা -া মা I পা -না না না । র্সা -া -া -া I
বৈ ০ শা ০ খে ০ ০ র শী র্ ণ ন দী ০ ০ ০

I র্সা র্সজ্ঞা র্রজ্ঞা -র্রা । র্রজ্ঞা -র্রা জ্ঞা -া I জ্ঞা -র্মা র্মা -জ্ঞা । জ্ঞর্ঋা -া র্সর্সা -া} I
ভ রাং স্রো ০ তে র্ দা ন্ না ০ পা য়্ যং ০ দি ০

I র্সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা -র্ঋা । জ্ঞর্ঋা জ্ঞর্ঋা সর্সা -া I র্সর্ঋাঃ -র্সঃ র্সা -া । র্সর্ঋাঃ -র্সঃ র্সা -া I
তং বু স ঙ্ কু চি ত ০ তীং ০ রে ০ তীং ০ রে ০

I র্সর্ঋাঃ -র্সঃ র্সা র্সর্ঋর্সা । র্সণা -া -া -া I জ্ঞা জ্ঞা মা মা । মা পা পা পা I
ীং ০ ণ ধাং০ রাং ০ ০ য়্ প লা ত ক প র শ খা

I পা -ধা ণা ধা । ণসণা -া -া -ধপা I পা ধা ণা -া । পণা -া ণা দা২ I
নি ০ দি য়ে যা০০ ০ ০ ০য়্ পি য়া সি ০ ল য়্ তা হা

I পা -ধা ণা ণদা । পা -া পা মা I জ্ঞা -মা -পা -ধা । -ণা -ধা -ণা -ণদা২ I
ভা গ্ গ মা নি ০ য দি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[মজ্ঞা -মা মা -পা]
I -পা -া -া -া । -া া সা সা I {সা -পা পা -া । পা পা পদা২ পা I
০ ০ ০ ০ ০ য়্ ম ম ভী ০ রু ০ বা স না০ র

I মা -পমা জ্ঞা জ্ঞরা । সা -া -া -া I (র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা -া র্সা -র্রা I
অ ০ন্ জ লি তে ০ ০ ০ য ত টু কু পা ই র য়্

I ণর্সাঃ -ণঃ ণা ণধা । সণা -দা২ দ২পা পা)}I পা পা পা পমা । মা -জ্ঞা জ্ঞা মা I
উ চ্ ছ লি০ তে ০ ম০ ম দি ব সে র০ দৈ ন্ নে র

I পা -না না না । না -র্সা র্সা -া I র্সা -না র্সা -র্জ্ঞা । র্জ্ঞা -র্ঋা র্ঋা -র্সা I
স ন্ চ য় য ০ ত ০ য ত্ নে ০ ধ ০ রে ০

I র্সা -না র্সা -া । -া -া (-া -া)} I র্সা র্সনা I র্সা র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞর্ঋা । জ্ঞর্ঋা -র্সা র্সা র্সা I
রা ০ খি ০ ০ ০ ০ ০ সে যে০ র জ০ নী র০ স্ব প্ নে র

I নর্সা -ণা ণা -দা২ । ণদা২ -পা পা ধা I ণা -র্সা র্সা র্সা । ণা -া ধণধা ণা I
আ ০ য়ো ০ জ ন্ য দি জী ০ ব ন পূ ০ র০ ণ

I ণা -র্সা র্সা -ণা । র্সণা -দা২ দ২পা পা I পা ধা ণা ণর্সা । র্সণা ণদা২ পাদ -মপমা I
না ই ´ হ ০ ল ০ ম০ ম ত ব অ ক্ক০ প ণ০ ক ০০

I মা -জ্ঞা -া -া । -া -া জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা -মা -পা -ধা । -ণা -ধা -ণা -দা২ I
রে ০ ০ ০ ০ ০ য দি হা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -পা -া -া -া । -া -া -া -া II II
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

সংশোধন। বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৪ : পৃ ৪৯৪ স্বরলিপি-ছত্র ৫ না -া র্সা -া I / মে শা ০ ০ স্থলে না -া র্সা -া I / মে ০ শা ০

সম্পাদকের নিবেদন

বিশ্বভারতী পত্রিকা উনবিংশ বর্ষে পদার্পণ করল।

এই বর্ষের এই প্রথম সংখ্যাটি আমরা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনার দ্বারা আরম্ভ করলাম। ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধ লেখার সময়ে বিভিন্ন ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যেসব কবিতাকণা রচনা করেন 'ছন্দ-কণিকা' নামে সেগুলি মুদ্রিত হল। এ বিষয়ে আমরা আমাদের মন্তব্য ঐ রচনাগুলির শেষে নিবেদন করেছি।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্গে, এই সংখ্যায় একটি গ্রন্থনির্ঘণ্ট মুদ্রিত হল। রবীন্দ্রশতপূর্তি-উৎসব উপলক্ষে নানা ভাবে রবীন্দ্রচর্চার উৎসাহ নানা দিকে নূতন উদ্যমে দেখা গিয়েছে। সভাসমিতি ও আনন্দানুষ্ঠানের সঙ্গে গ্রন্থরচনার উৎসাহও লক্ষ করা যায়। ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্ররচনার অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থও বেরিয়েছে; ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষাতেও রবীন্দ্ররচনা-অনুবাদ ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেসবের সংখ্যা নিরূপণ করা এখনই সম্ভব নয়। আমরা যে নির্ঘণ্ট প্রকাশ করলাম সে কেবল বাংলা বইয়ের। অনেক পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ঐ সময়ে প্রকাশিত হয়েছে, কিছুটা সময়ের ও কিছুটা স্থানের অভাবে আমরা সেসবের বিষয় এখানে উল্লেখ করতে পারি নি। আমরা আশা করি, রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী উৎসাহী কর্মীরা তার পূর্ণবিবরণ কোনো সময়ে প্রস্তুত করতে পারবেন। যে বইগুলির উল্লেখ আমরা করেছি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মতই তা বিচিত্র বিষয় নিয়ে রচিত; বিষয় অনুসারে না সাজিয়ে গ্রন্থসূচীটি লেখকের নামের বর্ণানুসারে সজ্জিত হয়েছে। কোনো বই এর থেকে বাদ গিয়ে থাকলে এবং সেসব বই আমাদের দৃষ্টিগোচর হলে ভবিষ্যতে আমরা সেগুলির উল্লেখ করব।

বিষয় অনুসারে আমরা সজ্জিত করি নি, কিন্তু আমাদের আশা আছে আমরা সামগ্রিকভাবে এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে একটি আলোচনা শীঘ্রই যখন প্রকাশ করতে পারব তখন তা বিষয়ানুসারেই করা হবে। প্রত্যেক বই সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা সম্ভব নয় বলে আমরা এইরূপ আলোচনার কথা ভেবেছি।

স্বীকৃতি

রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকণা 'ছন্দ-কণিকা' সংগ্রহ করেছেন শ্রীঅমিয়কুমার সেন।

শ্রীনন্দলাল বসু -অঙ্কিত 'ভাবিনী' চিত্র শ্রীবিশ্বরূপ বসুর সৌজন্যে মুদ্রিত।

অষ্টাদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় মুদ্রিত 'বিচিত্রা'র আমন্ত্রণলিপির আলোকচিত্র শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেন -কর্তৃক গৃহীত।

বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রচ্ছদপট অঙ্কন করেছেন শ্রীসত্যজিৎ রায়।

•

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

এই সকল পরস্পর-বিরোধী গুণের
একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

নিবে কালি শুকায় না;
কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায়।

রঙের যথেষ্ট গভীরতা; তবু
অবাধে লেখা এগিয়ে চলে।

লেখা ধুয়ে-মুছে যায় না;
অথচ কলম পরিষ্কার রাখে।

সুলেখা কালি

অন্য কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে।

SULEKHA WORKS LTD. CAL

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা • দিল্লী • বম্বে • মাদ্রাজ

দেশের প্রয়োজন মেটাতে

আরও বেশী পাইপ

IISCO

ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেডের কুল্‌টি কারখানায় দ্বিতীয় একটি প্লাণ্ট স্থাপনার ফলে স্পান আয়রন পাইপের উৎপাদন বছরে ৬০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ টনে উঠেছে। বড় ব্যাসযুক্ত মেইন পাইপের জন্য ভারতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটান ছাড়াও উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ার ফলে প্রতি বছর ভারতের বহু কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা বাঁচবে। আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ও কারিগরি কৌশল নিয়োগ করে 'ইস্কোর' কুল্‌টি কারখানা ৩" থেকে ৩০" ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত স্পান আয়রন পাইপ এদেশে প্রথম তৈরি করে।

দি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিঃ

দক্ষিণ ভারতে এজেন্ট : দি সাউথ ইণ্ডিয়ান এক্সপোর্ট কোং লিঃ, মাদ্রাজ ২

IIC-818 BEN

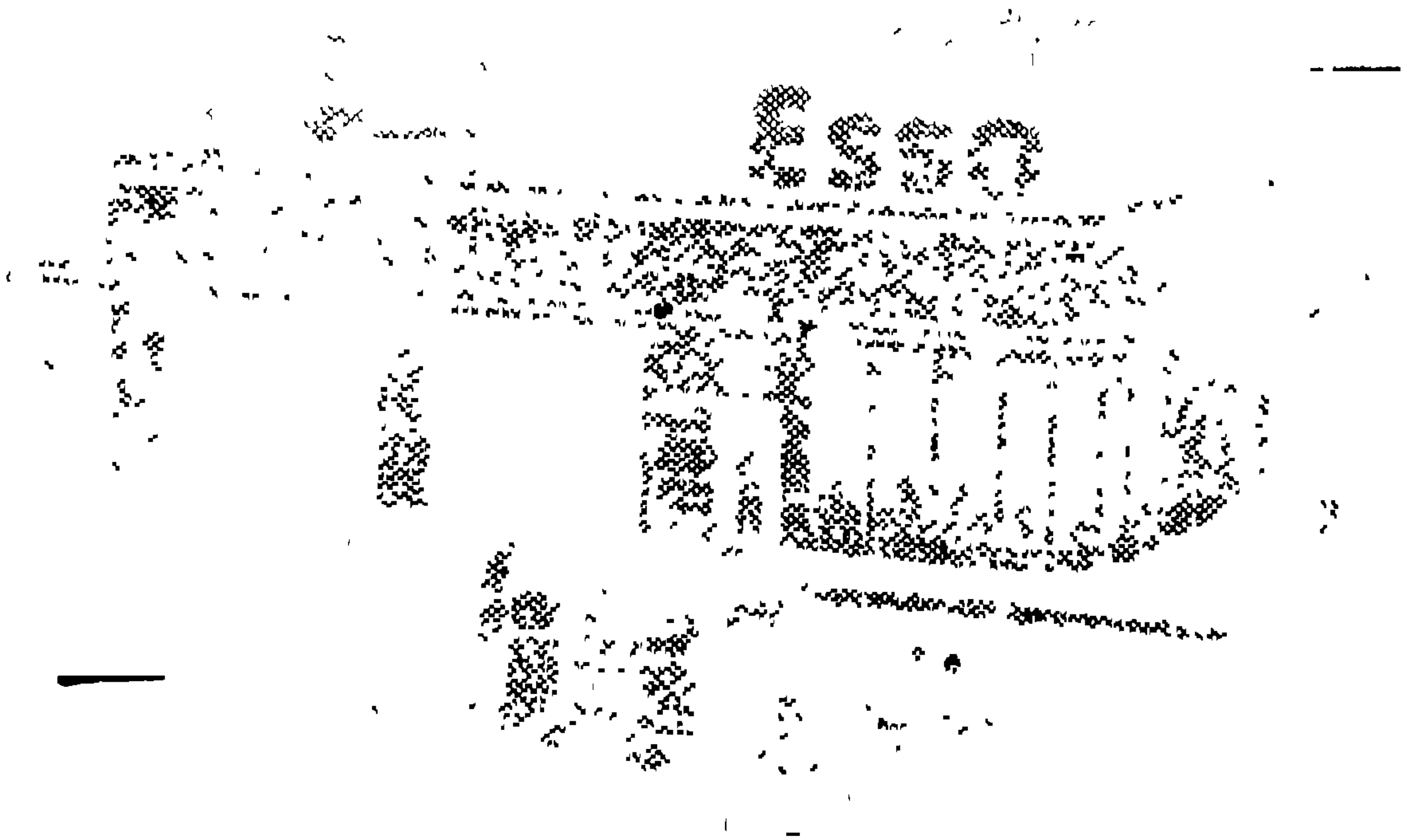

Your NEW SIGN of Petroleum Energy

Esso

This is the ESSO sign—world-recognised symbol of outstanding petroleum products, true research! This is your ESSO sign—backed by the world's greatest resources of petroleum knowledge and experience.

ESSO brings better standards of living, serving industry, transportation, agriculture, the home.

Esso research works wonders with oil!

ESSO STANDARD EASTERN, INC. INCORPORATED IN U.S.A. WITH LIMITED LIABILITY

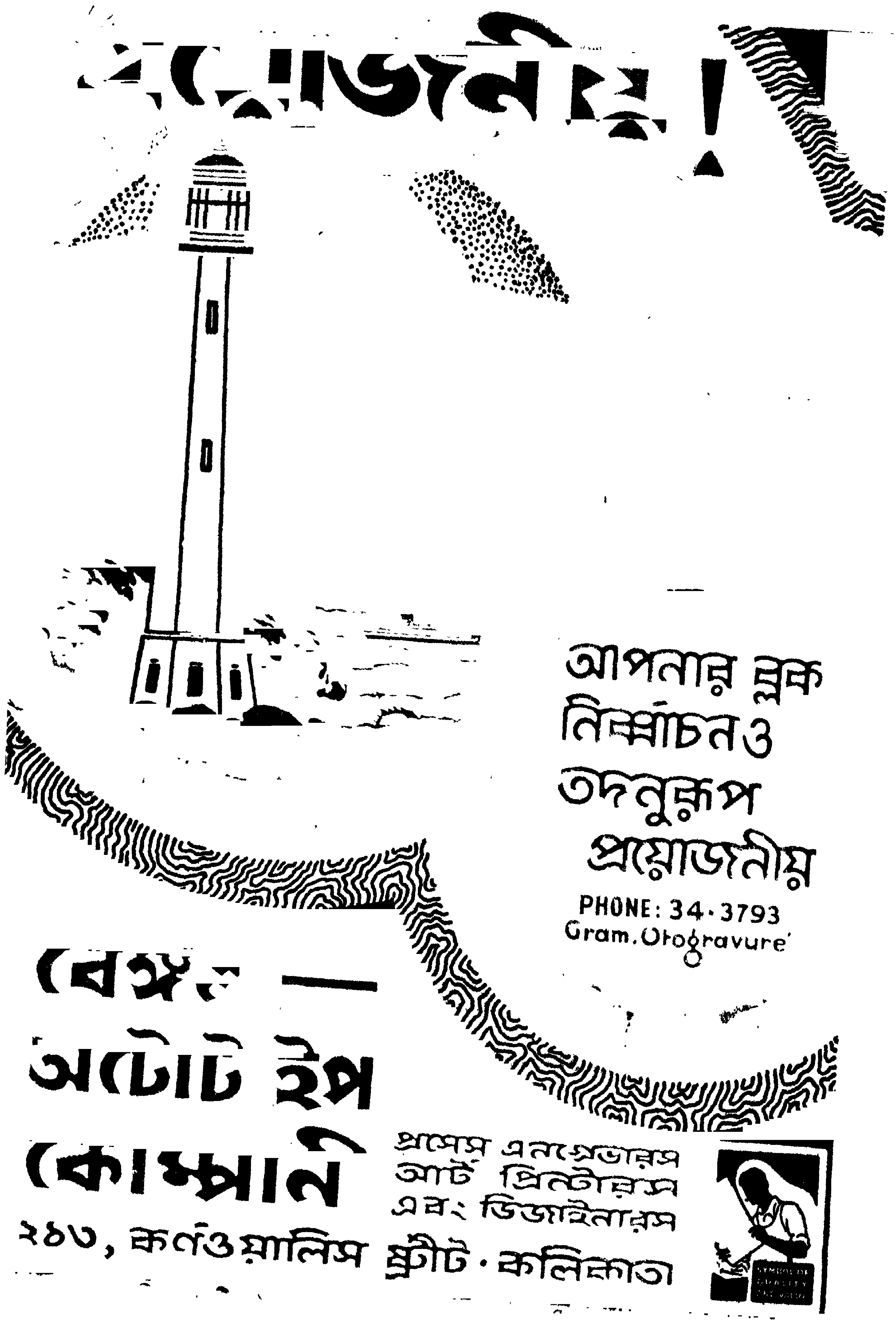
প্রয়োজনীয়!
আপনার ব্লক
নির্ব্বাচন ও
তদনুরূপ
প্রয়োজনীয়
PHONE: 34-3793
Gram. 'Otogravure'
বেঙ্গল —
অটোটাইপ
কোম্পানি
প্রসেস এনগ্রেভারস
আর্ট প্রিন্টারস
এবং ডিজাইনারস
২১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট · কলিকাতা

বরষার পথে ভরসা

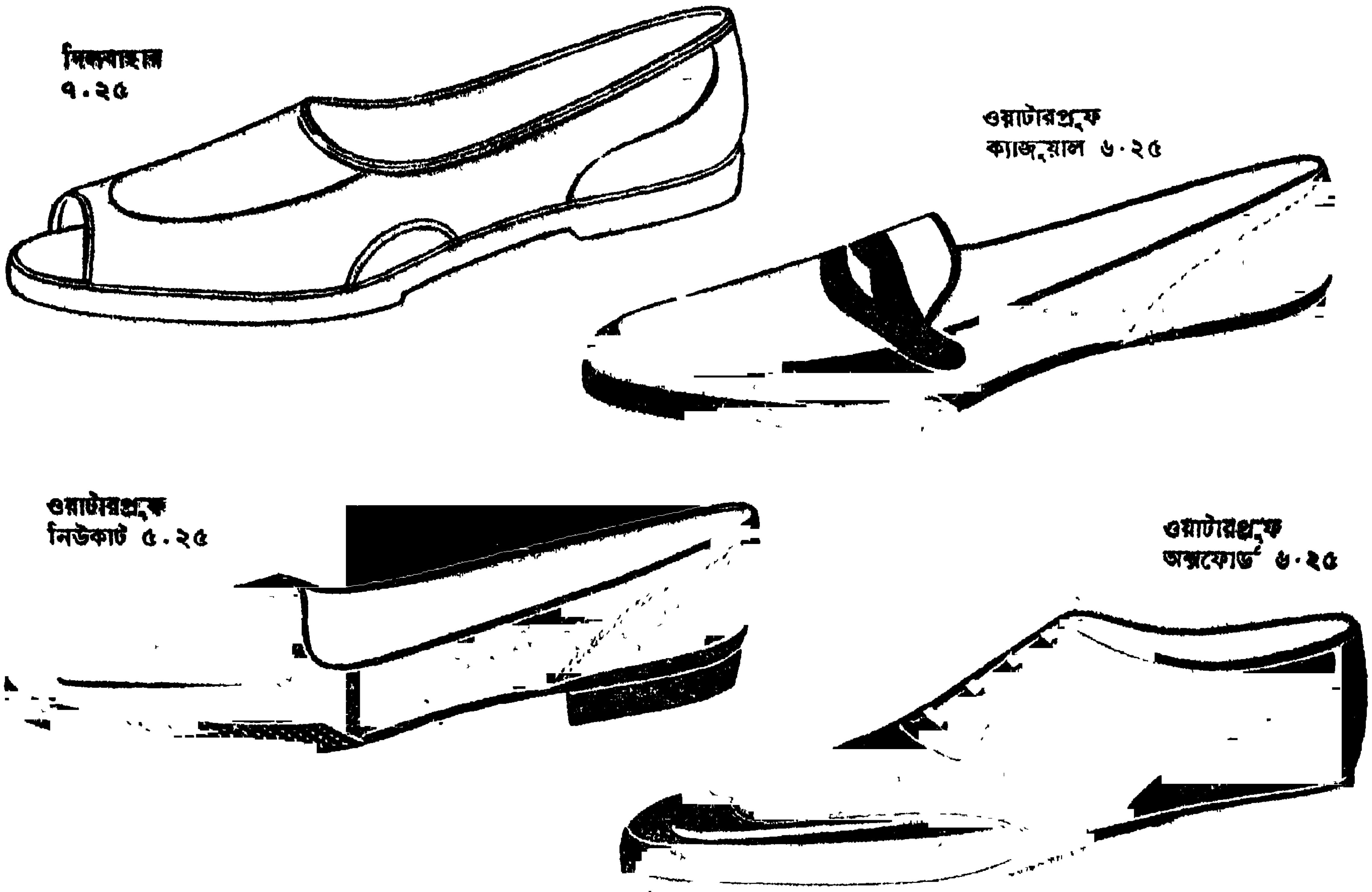

বৃষ্টি ধোয়া পথে সমস্যা শুকনো পায়ে চলা।
এই সমস্যার সমাধান বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো।
রবারের জুতো আগাগোড়া ছিদ্রহীন, তাই জলের প্রবেশপথ বন্ধ।
এই ধরনের জুতোয় প্রয়োজন উৎকৃষ্ট রবার, বাটার জুতোয় তা পাবেন।
মসৃণ চিক্কণ রবার, বহু ব্যবহারেও কেনার প্রথম দিনের মতো আনকোরা, ছিমছাম।
আরামের জন্য জালি কাপড়ের লাইনিং।
তাছাড়া, সোল্ আর হিল্-এ এমন নকশার কৌশল,
যা পারতপক্ষে হড়কাবে না।

Bata

কেশ সজ্জা ও কবরী রচনা ...

যুগ যুগ ধরে নারীর মনে জেগে রয়েছে একটী আকাংখা—নিজেকে আরও রমণীয় ক'রে তোলা।

অর্ধ শতাব্দীর বেশী বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল অভিজাত মহিলাগণের কেশ সৌন্দর্য বর্ধনে ও কেশ স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য সমাদৃত হয়ে আসছে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যান্থারাইডিন

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

সুন্দর থেকে সুন্দরতম...
অলঙ্কার শিল্পী ও স্বর্ণ রৌপ্য ব্যবসায়ী
১১৭/২, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২
ফোন:: ৩৪-৪৭৬০

SPENCER WILL ANSWER!
if you like
which aerated waters assure at every draught
SPENCERS
FRUIT DRINK
"VITO"
Fresh cheer for mind?
Soothing ease for stomach?
Luxury of taste for purse?

নূতন-পুরাতনের সহযোগিতা…

চল্লিশ বছর আগে, ১৯২১ সালে ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানার দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্যে সুদক্ষ কারিগর গড়তে টাটা স্টীল জামশেদপুরে একটি টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুট প্রতিষ্ঠা করে। তার কিছুদিন পরে, নিপুণ কারিগর ও অন্যান্য কর্মী তৈরী করতে টাটা স্টীল হাতেকলমে শিক্ষা চালু করে।

গত চার বছর ধরে জামশেদপুর টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুট হিন্দুস্থান স্টীলের জরুরী প্রয়োজন মেটাতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা চালু করেছে। রাউরকেলা, ভিলাই, দুর্গাপুরের সরকারি ইস্পাত কারখানাগুলি থেকে ১৮০০'র ওপর টেকনিশিয়ান এসে জামশেদপুরে টাটা স্টীলের শিল্প-শিক্ষাদানের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধে নিয়েছেন … জামশেদপুরে শিল্প শুধু জীবিকা অর্জনের উপায় নয়, জীবনেরই অঙ্গ।

ইস্পাত নগরী

The Tata Iron and Steel Company Limited

JWTTN 5463

দেশবিদেশের খবরের জন্য

১। উইক্‌লী ওয়েষ্টবেঙ্গল—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা ; ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

২। কথাবার্তা—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ১'৫০ টাকা।

৩। বসুন্ধরা—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। শ্রমিক বার্তা—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১ ৫০ টাকা, ষাণ্মাসিক '৭৫ নঃ পয়সা

৫। পশ্চিমবাঙ্গালা—নেপালী ভাষায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা ; ষাণ্মাসিক ১'৫০ টাকা।

৬। মগরেবী বংগাল—সচিত্র উর্দ্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা ; ষাণ্মাসিক ১'৫০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—ক। চাঁদা অগ্রিম দেয় ঃ

খ। বিক্রয়ার্থ ভারতে সবত্র এজেণ্ট চাই ;

গ। ভি পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক

রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—

এই ঠিকানায় প্রচার অধিকর্তার নিকট লিখুন।

করপুটে লীলাকমল যাদের
কালো কেশে গাঁথা কুন্দ কচি।
লোধ্র পরাগ স্মিতমুখে যেথা
পাণ্ডু কান্তি দিয়েছে রচি।
—কালিদাস
ঘন কুঞ্চিত কালো কেশ ফুলদলের মতো বিকশিত করে নারীর সৌন্দর্য্য। যুগ যুগ ধ'রে বিশ্বের নারীরা কেশ বিন্যাসের জন্য **অলিভ অয়েল** মেখে আসছেন। ক্যালকেমিকোর ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল **ক্যান্থারলে** আছে কেশের পক্ষে হিতকারী বিশুদ্ধ সেই **অলিভ অয়েল**। তাই আজও আধুনিকারা পরম আগ্রহে এই কেশ তৈল ব্যবহার করেন।
Kantharol
PERFUMED CANTHARIDINE HAIR OIL
ক্যান্থারল
সুরভিসম্পৃক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

کیلی پھمب کتئ پننیوٗ اَتھوٗ
کونگ کوٗئ رنگ کرنا ویلو
زاوِل شال دونیو پننیوٗ اَتھوٗ
کونگ کوٗئ رنگ کرنا ویلو

"আমি এটি জাফরাণ রঙ্গে রাঙ্গিয়ে নেবো এবং এই রঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে একটি শালও আমি বুনবো।"

মনোরম জাফরাণ রং

কাশ্মীরী নববধূটি তাঁর নতুন ঘর সাজানোর কাজে মগ্ন থেকে মনে মনে স্থির করলো যে সে নিজের হাতে একটি পশমিনা বুনবে।

হাতের তাঁতের বস্ত্রসামগ্রী

ALL INDIA HANDLOOM BOARD

একটি জাতীয় উত্তরাধিকার

DA 61/502

বাঙলা সাহিত্যের মণিমুক্তা

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের নবতম অর্ঘ্য-উপাচার

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল এম, এস, সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

(রহস্য-রোমাঞ্চের স্বর্ণখনি) মূল্য চার টাকা

মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবা ন জানন্তি। অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনায় সত্যঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ রূপায়ণ। বাংলা দেশের নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। পড়তে পড়তে বই শেষ না ক'রে ওঠা যায় না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা। উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

সোনার বাঙলার সোনার কাব্য

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

অসংখ্য বহুবর্ণ চিত্র

মূল্য আট টাকা

ভক্তির মন্দাকিনী—প্রেমের অলকানন্দা

স্বর্ণপত্রে সুসজ্জিত

দেবেন্দ্র বসু বিরচিত

শ্রীকৃষ্ণ

মূল্য পনেরো টাকা

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত

ভক্তগণের কণ্ঠহার, তুলসীমালা সদৃশ

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

মূল্য চারি টাকা

শ্রীজয়দেব গোস্বামী বিরচিত

শ্রীগীতগোবিন্দম্

ভক্তজন মনোলোভী সুধাধারা

মূল্য দুই টাকা

আর্যকীর্তির অক্ষয় ভাণ্ডার

কাশীদাসী মহাভারত

সরঞ্জিত চিত্রের সমাবেশে পূর্ণ

কাশীরাম দাসের জীবনী সহ

১ম ৬৲ ২য় ৬৲

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা

শ্রীরূপ গোস্বামীর

বিদগ্ধমাধব (টীকা সহ)

মূল্য তিন টাকা

মহাকবি কালীদাসের গ্রন্থাবলী

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত বঙ্গানুবাদ ও মূল সহ রঘুবংশ : মালবিকাগ্নিমিত্র : ঋতুসংহার : শৃঙ্গার-তিলক : পুষ্পবাণবিলাস : শৃঙ্গার রসাষ্টক : কুমার-সম্ভব : নলোদয় মেঘদূত : শকুন্তলা : বিক্রমোর্বশী : শ্রুতবোধ : দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা : কালিদাস-প্রশস্তি। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ।

প্রতি খণ্ড তিন টাকা

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষায় অনূদিত

মহাভারত ১ম, ২য় : প্রতি খণ্ড

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা দিগ্বিজয়ী

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

নন্দরাণীর সংসার : রাবণ : পরিণীতা : সীতা : বিষ্ণুপ্রিয়া : মহামায়ার চর ও পূর্ণিমা মিলন। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খণ্ড দুই টাকা মাত্র।

মহাকবি সেক্সপীয়ারের গ্রন্থাবলী

ম্যাকবেথ : মনের মতন : এণ্টনি ক্লিওপেট্রা : রোমিও জুলিয়েট : ভেরোনার ভদ্রযুগল : জুলিয়াশ সিজার : ওথেলো : মার্চেণ্ট অব ভেনিস : মেজার ফর মেজার : সিম্বেলিন : কিং লিয়র : টুয়েলফথ নাইট। দুই খণ্ডে।

প্রতি খণ্ড আড়াই টাকা

সাহিত্যসম্রাট, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিম গ্রন্থাবলী

সমগ্র সাহিত্য :: সমগ্র উপন্যাস

তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ :: তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ

প্রতি খণ্ড মূল্য দুই টাকা

বঙ্কিম উপন্যাসের নাট্যরূপ

চন্দ্রশেখর ২৲ রাজসিংহ ১৲ দেবী চৌধুরাণী ১৲ সীতারাম ১৲ কপালকুণ্ডলা ১৲ ইন্দিরা ও কমলাকান্ত ১৲ কৃষ্ণকান্তের উইল ১৲ প্রত্যেকটি অভিনয় উপযোগী।

পাঠাগার ও লাইব্রেরীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। পুস্তক বিক্রেতাগণের জন্য শতকরা কুড়ি টাকা কমিশন।
পুস্তক তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ভিঃ পি অর্ডারের সঙ্গে অর্ধেক অগ্রিম প্রেরণীয়।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির ॥ কলিকাতা-১২

সহজ কিস্তির সুযোগ

কোনও বাড়তি খরচ নেই ..

- এই সুযোগ শুধু অল্পকালের জন্য পাবেন।
- মনে রাখবেন, প্রত্যেকটি উষা সিলিং ফ্যান ডবল্ বল-বেয়ারিং যুক্ত—সেই জন্য এই ফ্যান অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী।
- নিকটতম উষা বিক্রেতার কাছে কিস্তির বিবরণ জেনে নিন।

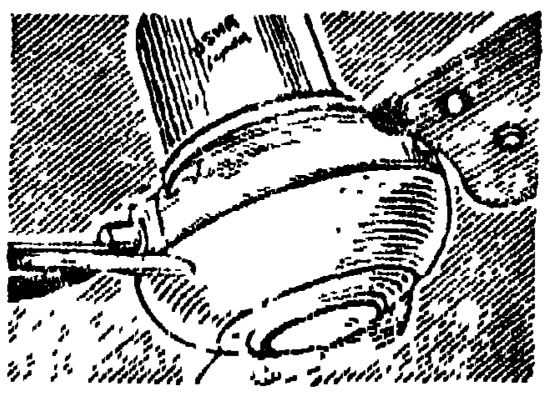

উষা

আজই কিনুন বাজারের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্যান

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড, কলিকাতা-৩১

UE-47 BEN

॥ ওরিয়েণ্টের সাহিত্য সম্ভার ॥

• রবীন্দ্র-সাহিত্য •

ডঃ তারকনাথ ঘোষ
রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ৫·০০

প্রমথনাথ বিশী
রবীন্দ্র-বিচিত্রা ৫·৫০
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১ম ৫·০০
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ২য় ৫·০০

প্রতিভা গুপ্ত
শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ৬·০০

সমীরণ চট্টোপাধ্যায়
শারোদৎসব-দর্শন ২·০০
গুরু-দর্শন ২·৫০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ ৩·২৫

ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা ১২·০০
রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ১২·০০

রেণু মিত্র
রবীন্দ্র-হৃদয় ৫·০০

• জীবনচরিত •

নগেন্দ্রকুমার গুহরায়
ডাঃ বিধান রায়ের জীবনচরিত ৮৲

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
আত্ম-চরিত ১২·০০

প্রকাশচন্দ্র রায়
অঘোর-প্রকাশ ৫·০০
[বিধানচন্দ্রের পিতা-মাতার আত্ম-চরিত]

স্বামী অমিতানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের যারা এসেছিল সাথে ৪·০০

স্মরণীয়

সুশীল রায়

বাংলাদেশের মণীষীদের জীবনা-লেখ্য। বাংলাদেশের ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে প্রত্যেকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে তাঁদের জীবন-পরিক্রমার কাহিনী শুনে নিয়ে সুশীল রায় রচনা করেছেন এই মহাগ্রন্থ।

এতে যাঁদের জীবনকথা আছে—

যোগেশচন্দ্র রায়, চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, বসন্তরঞ্জন রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, সুনয়নী দেবী, সরলাবালা সরকার, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন, রাজশেখর বসু, বিধানচন্দ্র রায়, অনুরূপা দেবী, শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু, শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, যোগেন্দ্রনাথ বাগচী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীসুশীল-কুমার দে, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

প্রত্যেকের স্বাক্ষর ও চিত্র -সম্বলিত

মূল্য আট টাকা

• ভ্রমণ-কাহিনী •

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর ৮৲

কল্যাণী প্রামাণিক
দুনিয়া দেখছি [২য় মুদ্রণ] ৫·০০

জ্যোতিষচন্দ্র রায়
কেদার-বদরী ৪·৫০

রামনাথ বিশ্বাস
ভারত-ভ্রমণ ৫·০০

বার্তাবহ
মহাচীনে শ্রীনেহেরু ৩·৫০

• কাব্য ও কবিতা •

প্রমথনাথ বিশী
শ্রেষ্ঠ-কবিতা ৬·০০

কল্যাণী প্রামাণিক
শিশু-তরু ২·০০
খোকনবাবু ২·০০

প্রবন্ধ ও সমালোচনা

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী
ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ৬·০০

যোগেশচন্দ্র রায়
কি লিখি? ৩·৫০

অনন্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থ
বৈভাষিক দর্শন ২০·০০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
বাংলা-গ্রন্থ বর্গীকরণ ১০·০০

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক ৯·০০

॥ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা ১২ ॥

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য...

চারু ও কারুশিল্প, ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলার কী অন্তহীন বৈচিত্র্যই না রয়েছে আমাদের স্বদেশে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে এই বিচিত্র ভারতভূমি গঠিত। রেলপথ প্রতিষ্ঠার আগে যে সব অঞ্চল ছিল বিচ্ছিন্ন ও দুরধিগম্য তাদেরই একসূত্রে গ্রথিত ক'রে এক বিচিত্রবর্ণ পুষ্পহারের সৃষ্টি করেছে আমাদের রেলপথ—ভৌগলিক সান্নিধ্যে তাদের অন্তরঙ্গ করেছে। ভৌগলিক অখণ্ডতাকেও অতিক্রম ক'রে যে আত্মিক ঐক্যে আজ সারা ভারতবর্ষ প্রাণময়—তা' আন্তঃআঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সংযোগের জন্যই সম্ভবপর হয়েছে।
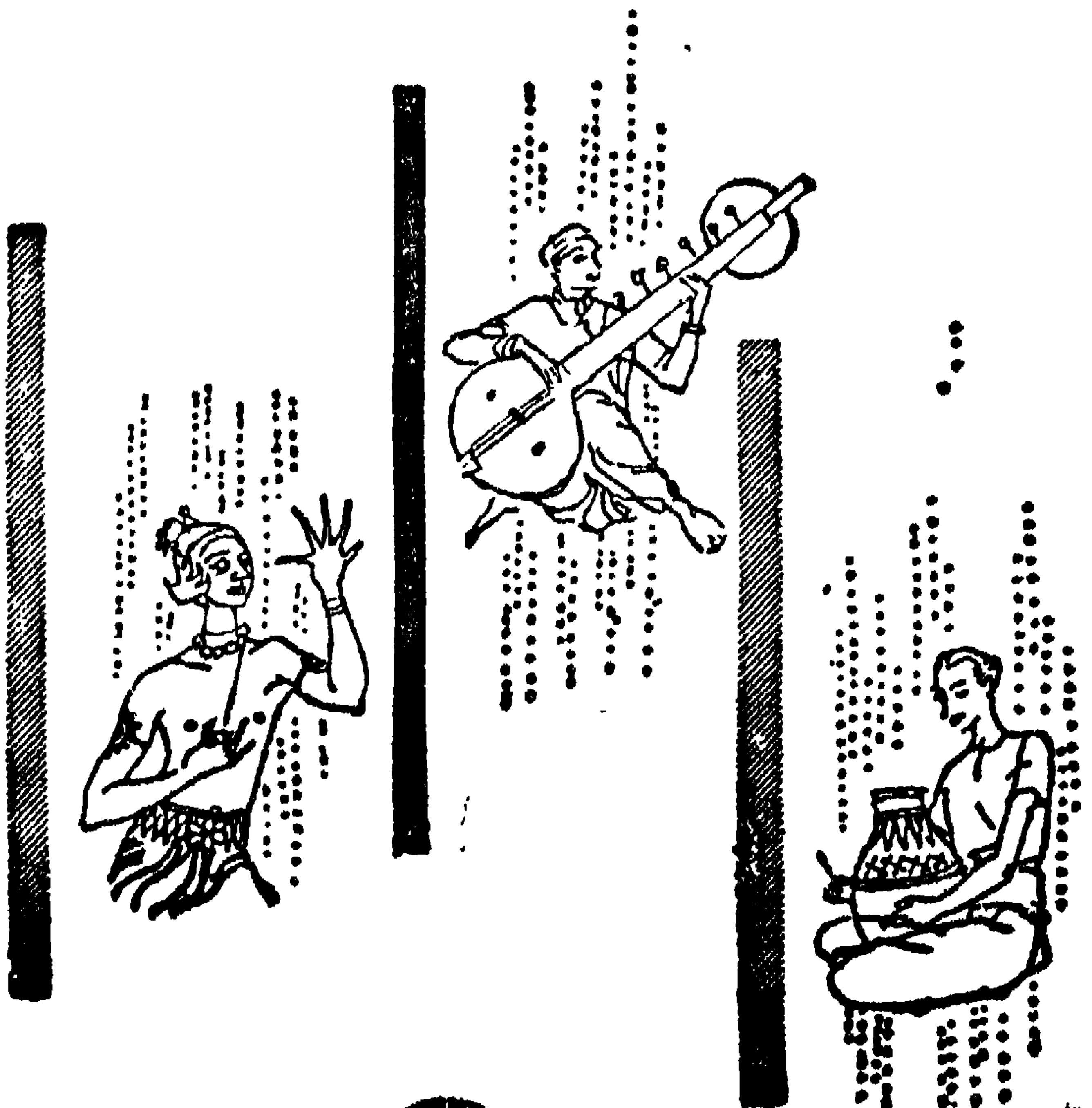
পূর্ব রেলওয়ে

ER/PA/6

রবীন্দ্র-গীতির নতুন অর্ঘ্য............

—৩৩১/৩ আর. পি. এম্. লং-প্লেয়িং রেকর্ডে—

বিশ্বকবির চির-মধুর গীতি-নাট্য

—চণ্ডালিকা—

ECLP 2273

তত্ত্বাবধান : শান্তিদেব ঘোষ পরিচালনা : সন্তোষ সেনগুপ্ত

—শ্রেষ্ঠাংশে—

সুচিত্রা মিত্র, সুপ্রীতি ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন চৌধুরী, সন্তোষ সেনগুপ্ত ও অন্যান্য শিল্পী।

—৭৮ আর. পি. এম্. রেকর্ডে—

॥ কলম্বিয়া ॥

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

GE 25092 কেন চোখের জলে
আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে

বনানী ঘোষ

GE 25093 আমার দিন ফুরালো
এখনো তারে চোখে দেখিনি

শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও বাসবী নন্দী

GE 25094 নয় নয় নয় এ মধুর খেলা
আজি যত তারা তব আকাশে

প্রসূন দাশগুপ্ত

GE 25095 এসো এসো ওগো শ্যামছায়া
কেন আমায় পাগল করে যাস

পূরবী মুখোপাধ্যায়

GE 25090 এ মণিহার আমায় নাহি সাজে
তুমি আমায় ডেকেছিলে

শ্যামল মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন ও বাসবী নন্দী

GE 25091 ওই ঝঞ্ঝার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে
বাঁধ ভেঙে দাও

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

GE 30504 দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়
ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়

॥ হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস ॥

কবিগুরুর তিরোধান-তিথি স্মরণে
গেয়েছেন :

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

N 82979 পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই
ওরে আগুন আমার ভাই

সুচিত্রা মিত্র

N 82966 আজ আকাশের মনের কথা
আমার আপন গান

শ্রীপর্ণা ঘোষ

N 82967 তুমি যেয়ো না এখনি
ছাড় গো তোরা ছাড় গো

মঞ্জু গুপ্ত ও তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

N 82969 সুরের গুরু দাও গো
বসন্তে বসন্তে তোমার

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়

N 82970 ও কি এলো ও কি এলো না
বলি ও আমার গোলাপ-বালা

পঙ্কজকুমার মল্লিক

P 11964 আজি ঝড়ের রাতে
আমায় দু'জনায় মিলে

সম্পূর্ণ তালিকা ডীলারের কাছে দেখুন ঃ

দি গ্রামোফোন কোং লিঃ ঃ কলম্বিয়া গ্রাফোফোন কোং লিঃ

(ইন্‌কর্পোরেটেড ইন্ ইংল্যাণ্ড উইথ লিমিটেড্ লায়েবিলিটি)

কলিকাতা - বোম্বাই - মাদ্রাজ - দিল্লী

প্রকাশক শ্রীশরদিন্দু বসু
বিশ্বভারতী
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন • কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন • কলিকাতা ৯

চিত্র ও মলাট মুদ্রক
বেঙ্গল অটোটাইপ কোম্পানি
২১৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট • কলিকাতা ৬

বর্ষ ১৯ সংখ্যা ২ কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯

Received on 8.11.62

বিশ্ব ভারতী পত্রিকা

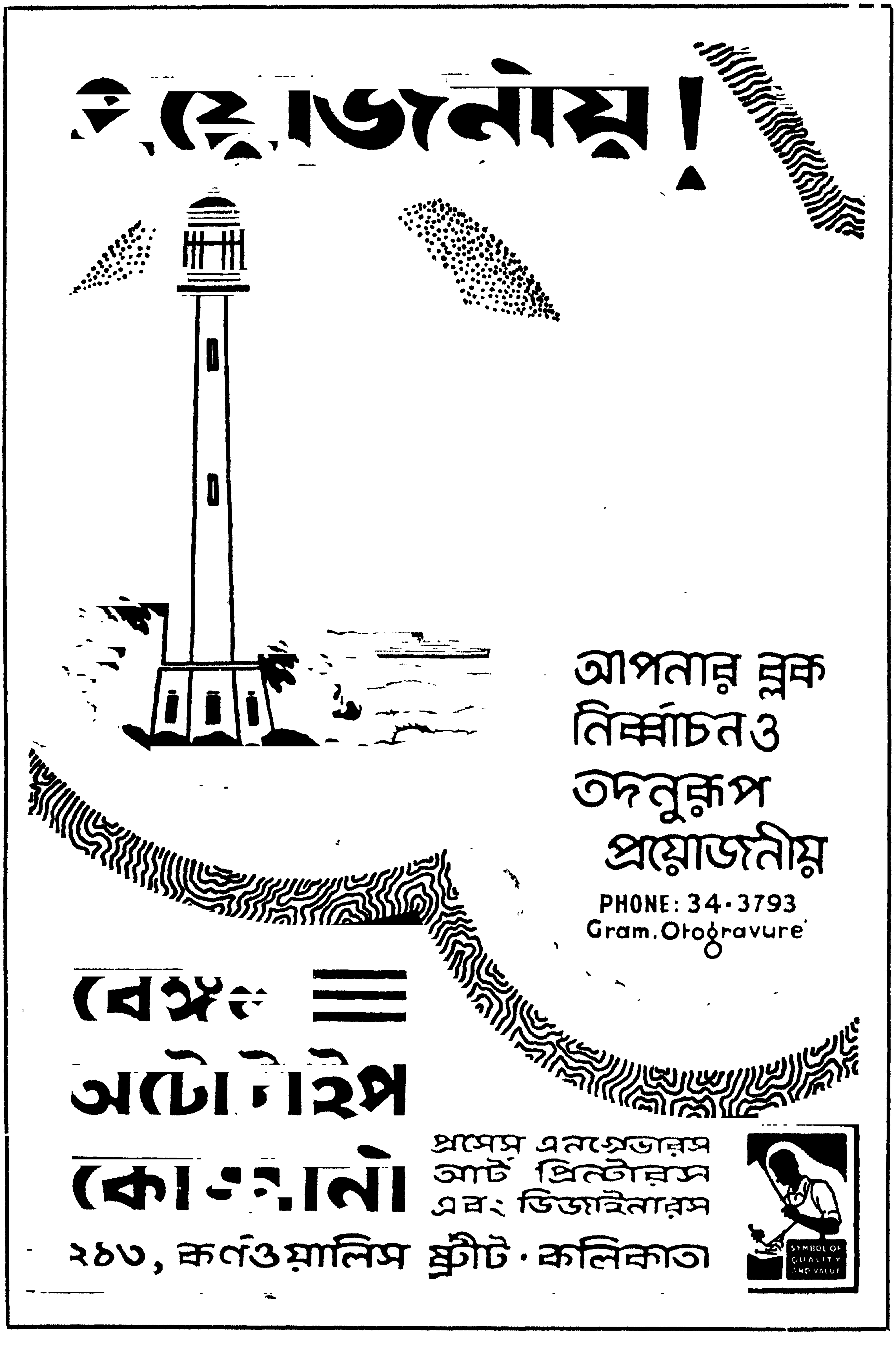
প্রয়োজনীয়!
আপনার ব্লক
নির্ব্বাচনও
তদনুরূপ
প্রয়োজনীয়
PHONE: 34·3793
Gram. Otogravure
বেঙ্গল
অটোটাইপ
কোম্পানী
প্রসেস এনগ্রেভারস
আর্ট প্রিন্টারস
এবং ডিজাইনারস
২১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট · কলিকাতা
SYMBOL OF QUALITY AND VALUE

প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের নূতন বই প্রকাশিত হয়

স্মরণীয় বই অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থতিথি

সম্প্রতি প্রকাশিত

ডীন অফ দি ফ্যাকাল্টি অফ ড্রামা, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ;
মেম্বার, বোর্ড অফ স্টাডিজ ইন থিয়েটার আর্টস্, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় ;
১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের গিরিশ লেকচারার

নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর

নিজেরে হারায়ে খুঁজি ১৬·০০

[সেকালের নট ও নাট্যমঞ্চের বহু চিত্রে ও তথ্যে সমৃদ্ধ সুবৃহৎ গ্রন্থ]

"......নাট্যমঞ্চ বা ছায়াছবির কর্মশালায় বা নাট্য আকাদমির দেব-দেউলেই সব অঞ্জলি আমার নিঃশেষ হয়ে যায়নি। যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে মঞ্চ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে এলাম, সেদিনও ভাবিনি, আমার শিল্পী-জীবনের শেষ যবনিকাখানি পড়ে যেতে এখনো অনেক বাকি আছে। শিল্পী-জীবনের যবনিকা টেনে দিয়ে মর-জীবনের যবনিকা পতনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবো পঠন-পাঠন নিয়ে, এই তো অভিলাষ ছিলো! কিন্তু দেখা গেল, আমার শিল্পী-জীবনের নিয়ন্তা আমি নই, সেখানে আরও এক অমোঘ শক্তির প্রচণ্ড অভিলায় অনুক্ষণ তার লীলা-সঞ্চালন করে চলেছে।

"পাদ-প্রদীপের আলো থেকে আত্মগোপনের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতে গিয়েও দেখতে পেলাম, আরেক আলো এখানে জ্বলে উঠেছে। পাদ-প্রদীপ এখানে এসে স্মৃতির প্রদীপ হয়ে জ্বলতে শুরু করেছে। দিনের পর দিন সেই কম্পমান স্মৃতি-শিখার দিকে তাকাতে-তাকাতে মনে হল,—আমিও যে মিশে আছি স্মৃতির রাজ্যে—স্মৃতির মানুষগুলির সঙ্গে! মনে হলো,—আমি নিজেও তো এক স্মৃতি! এবং সেই স্মৃতির ছায়াছবিরা আর তো কোনদিন ফিরে আসবে না।..."

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের

স্মৃতিচারণ (১ম খণ্ড) ১২·০০ ॥ **স্মৃতিচারণ** (২য় খণ্ড) ৬·৫০

প্রথম খণ্ডে আছে : দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, লোকন পালিত, সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাচরণ মিত্র, কবি বিজয়চন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রোমাঁ রোলাঁ, বার্টরাও রাসেল, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, গোপীনাথ কবিরাজ প্রভৃতি...এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আছে : রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্দ্র ঘোষ, কাশী নরেশ, এস. ডোরাস্বামী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণের বৃত্তান্ত।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে
কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

'রবীন্দ্রজীবনী'-কার

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

রবি-কথা ৩·৫০

[রেখাঙ্কনে জীবন-কথা বহুলাংশে কবির নিজের কথায় বিধৃত]

শ্রীকানাই সামন্তের

রবীন্দ্র-প্রতিভা ১০·০০

[গবেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ। ১৪ খানা আর্ট প্লেটে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর, তাঁর আঁকা ছবি ও পেন্সিল স্কেচ, ফটোগ্রাফ ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ]

কাজী আবদুল ওদুদের

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১২·০০

[রবীন্দ্রকৃতির সুবিস্তীর্ণ আলোচনা। রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র কাব্য-সাহিত্য—দর্শনের বিশ্লেষণমূলক বিপুল গ্রন্থ]

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কবি-প্রণাম ৫·০০

[কবিগুরুকে নিবেদিত বাংলার কবিদের কাব্য-সংকলন]

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ ৩·৫০

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্র-কথা ২·০০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রাম : কালচার ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস

রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় ১০.০০

রবীন্দ্র সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা—নূতন দিক-দর্শনরূপে খ্যাত। এই গবেষণামূলক গ্রন্থের জন্য গ্রন্থকার এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা সাহিত্যের প্রথম ডি. লিট্ উপাধি পাইয়াছেন।

ডঃ শান্তিকুমার দাসগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য ১০.০০

রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকগুলি নিয়ে এই প্রথম বাংলা সাহিত্যে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হল। প্রতীক নাটকগুলির প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক আলোচনায় সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি রবীন্দ্র অনুরাগী ও নাট্যানুরাগীদের দ্বারা সমাদৃত হবে।

ধীরানন্দ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা ১২.০০

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের জগতে রবীন্দ্রনাথ গদ্য-কবিতার স্রষ্টা। তাঁর এই যুগান্তকারী সৃষ্টির সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই প্রথম। ছন্দ বিষয়ে নিপুণ লেখক রবীন্দ্রনাথের গদ্য কাব্যগুলির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

রাবীন্দ্রিকী ৪.৫০

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার

রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান ৬.০০

বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ, রবীন্দ্রনাথের উপর বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব, রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর প্রয়োগের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ের তথ্যপূর্ণ সরস আলোচনা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী ৫.০০

প্রবীণ গ্রন্থকারের নিপুণ আলোচনায় ও ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রানুরাগীদের অবশ্য পাঠ্য।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

রবীন্দ্র অভিধান (১ম ও ২য় খণ্ড)

প্রতি খণ্ড ৬.০০

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি গান, গল্প, কবিতা, গ্রন্থের চরিত্রের উৎস, রচনাকাল, শিল্প-সৌন্দর্য, সমকালীন সমালোচনা ও যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যে সমৃদ্ধ।

সূর্যসনাথ ৪.০০

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালিদাসের কাব্যে ফুল ৪.০০

ক্লাসিক সাহিত্যের ক্লাসিক আলোচনা।

ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান ৬.০০

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

লিপিবিবেক ৬.০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২.৫০

উচ্চ প্রশংসায় বিভূষিত বৈষ্ণব সাহিত্যের সমালোচনা গ্রন্থ।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

বিদেশী ভারত সাধক ৩.৫০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

ইডেনে শীতের দুপুর ৩.৫০

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প ৩.০০

বিভূতিভূষণের শিল্পিসত্তার প্রায় সম্পূর্ণ আবিষ্কার।

গোপালদাস চৌধুরী ও প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত

প্রবাদ-বচন ৬.০০

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

অনুন্নত দেশের অর্থনীতি ৪.০০

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড : ১ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা-৬

শাখা : এলাহাবাদ, পাটনা : গ্রাম : বাণীবিহার : ফোন : ৩৪-৪০৫৮

॥ 'বেঙ্গল'এর বই মানেই শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর সার্থক সৃষ্টি ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের

রাশিয়ার ডায়েরী

ইতালিয়ান আর্ট পেপারে ছাপা ১৭৫ খানা এক রঙ ও ১৫ খানা বহুবর্ণ চিত্রাবলী এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ

॥ পঁচিশ টাকা ॥

রিপোর্টারের চক্ষু নয়, দ্রষ্টব্য দৃশ্যের ক্লান্তিকর তালিকা নয়, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ভ্রমণ নয়—এই গ্রন্থ একজন পরিব্রাজকের স্বাচ্ছন্দ বিহারের ইতিবৃত্ত। রাষ্ট্রের প্রধান থেকে শুরু করে পথের ঝাড়ুদার : তাঁর আলাপ-আলোচনা সকল শ্রেণীর মধ্যে ঘুরেছে। বিগত ৫৫ বৎসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। এই বিরাট গ্রন্থ সোভিয়েট ইউনিয়নের জীবন-মহাকাব্যের মতো।

দেবতাত্মা হিমালয় ১ম খণ্ড (১০ম মুঃ) ৯.০০। ২য় খণ্ড (৬ষ্ঠ মুঃ) ১০.০০

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বৈদেশিকী পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সচিত্র সংস্করণ ৫.৫০

বীরেন্দ্রমোহন আচার্যের

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ২য় মুঃ ৭.৫০

প্রখ্যাত সাহিত্য-কর্মী ও গবেষক বিনয় ঘোষ -কৃত

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১ম খণ্ড ১২.৫০

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১ম খণ্ড : ৩.০০ ॥ ২য় খণ্ড : ৭.০০ ॥ ৩য় খণ্ড : ১২.০০

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা থেকে নির্বাচিত রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তথ্য এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ১৮৪০ থেকে প্রায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিষয়ানুক্রমিক সন্নিবেশ, বিস্তারিত ভূমিকা, সম্পাদকীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযোজিত।
উনিশ শতকের অন্যান্য বাংলা পত্রিকা থেকে অনুরূপ সংকলন খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবে। বর্তমান গ্রন্থ প্রথম খণ্ড।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের আশুতোষ-অধ্যাপক অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত।
প্রায় ৬০৫ পৃষ্ঠার রয়াল অক্টাভো সাইজের বই, আর্ট প্লেট ও বোর্ড বাঁধাই সহ।

॥ উল্লেখযোগ্য বই ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর
চতুরঙ্গ ১৪শ মুঃ ৪.৫০

প্রমথনাথ বিশী ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কাব্য বিতান ১০.০০

দেবেশ দাশের
রাজসী ২য় মুঃ ৩.০০

শিবনাথ শাস্ত্রীর
ইংলণ্ডের ডায়েরী ৪.০০

হুমায়ুন কবিরের
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ৩য় মুঃ ৩.৫০

বীরেন্দ্রমোহন আচার্যের
আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব (২য় সং) ৭.৫০

শশিভূষণ দাশগুপ্তের
ব্যান ও বন্যা ৩.০০

বুদ্ধদেব বসুর
হঠাৎ আলোর ঝলকানি ২য় মুঃ ২.৫০

শ্রীনিবাস ভট্টাচার্যের
প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ৪.০০

নারায়ণ চৌধুরীর
বাংলার সংস্কৃতি ৩.০০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
চরণিক ৩.০০

অশোক মিত্রের
ভারতের চিত্রকলা ১৫.০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আমার সাহিত্য জীবন ২য় মুঃ ৪.০০

নলিনী দাশগুপ্তের
বৈদিক ও বৌদ্ধশিক্ষা ৩.০০

যোগেশচন্দ্র বাগলের
বিদ্রোহ ও বৈরিতা ২.০০

বিনায়ক সান্যালের
রবি-তীর্থ ৪.০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

জওহরলাল নেহরুর
"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার। সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় গৃহীত মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন যুগের ক্রমিক চিত্রাবলী নিয়ে লিখিত একখানা শাশ্বত গ্রন্থ। জে. এফ. হোরাবিন -অঙ্কিত ৫০খানা মানচিত্রসহ প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ॥

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
আত্মচরিত
সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ : ১০·০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
ভারতকথা
দাম : ৮·০০ টাকা

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন
সচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ : ৭·৫০ টাকা

আর. জে. মিনির
চার্লস চ্যাপলিন
সচিত্র দাম : ৫·০০ টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ
তৃতীয় সংস্করণ : ২·৫০ টাকা
অনাগত। উপন্যাস : ২·০০ টাকা
ভ্রষ্টলগ্ন। উপন্যাস : ২·৫০ টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য। কবিতা-সঞ্চয়ন : ৩·০০ টাকা

ত্রৈলোক্য মহারাজের
গীতায় স্বরাজ। দ্বিতীয় সং : ৩·০০

মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে : ২·৫০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লি.
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্রেমের গল্প ৪·০০
তিন শূন্য ৩·৫০

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
রূপসী রাত্রি ৫·০০
যে যাই বলুক ৬·০০
প্রচ্ছদপট ৩·৫০
প্রেমের গল্প ৪·০০

শ্রীসুবোধ ঘোষের
ভারত প্রেমকথা ৬·০০

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
সারা রাত ৪·০০
মনের মানুষ ৩·০০
প্রেমের গল্প ৪·০০

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের
তিন দিন তিন রাত্রি ৫·০০
ময়ূরী ৩·০০

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারীর
রবীমানসের উৎস-সন্ধানে ৩·৫০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের
বিবেকানন্দ চরিত। ১০ম সং : ৬·০০
ছেলেদের বিবেকানন্দ। ৬ষ্ঠ সং : ১·২৫

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের
চিন্ময় বঙ্গ। তৃতীয় সং : ৪·০০

সরলাবালা সরকারের
গল্পসংগ্রহ ৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি.
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কৃত

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নাম সাহিত্য জগতে সকলেরই অতি পরিচিত। তাঁর মতো গবেষক, সমালোচক ও স্রষ্টার আবির্ভাব এদেশে খুব কমই ঘটেছে। প্রাচীন ভারতকে জানতে হলে এ গ্রন্থটি অপরিহার্য। ছাত্র, গবেষক, স্থিতধী-পাঠক সকলেই এ গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত বলে মূল্য আশাতীত সুলভ হলো। বহু প্রামাণ্য চিত্র শোভিত ও উৎকৃষ্ট ছাপা বাঁধাই। ২'০০

ভিনদেশী কৃত

কুলীন কলিকার পাঁচালি

বর্তমান সমাজ পরিস্থিতির এর চেয়ে নিপুণ ব্যাঙ্গচিত্র ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। ২'০০

ভক্তি দেবী কৃত উপন্যাস

যদি জানতেম

মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালীন আলোড়ন এনেছিল। ৩'০০

অবনীভূষণ ঘোষ কৃত

জানলে পরে ভাঙবে ভুল

ছোটদের উপযোগী বিজ্ঞান-ভিত্তিক মনোরম গল্প। বড়রা পড়েও আনন্দ পাবেন। বহু চিত্র শোভিত। ১'০০

(অন্যান্য গ্রন্থের জন্য তালিকা চেয়ে পাঠান)

ভারতী লাইব্রেরী। ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২

রাজশেখর বসু

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (অনুবাদ) ৩'৫০

চলন্তিকা (৯ম সং) ৮'৫০

রামায়ণ ৮'০০

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন প্যালেস্টাইন ৬'০০

প্রাচীন ইরাক ৬'০০

মহাচীনের ইতিকথা ৭'০০

প্রাচীন মিশর ৫'০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

প্রথম খণ্ড ৫'০০ দ্বিতীয় খণ্ড ৫'০০

অপূর্বরতন ভাদুড়ী

মন্দিরময় ভারত

প্রথম খণ্ড ৫'০০ দ্বিতীয় খণ্ড ৬'০০

বিশু মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত বিচারকাহিনী (২য় সং) ৩'৫০

বুদ্ধদেব বসু

জাপানি জর্নাল ৩'৫০

যেদিন ফুটলো কমল (২য় সং) ৪'০০

শোণপাংশু ৪'০০

শেষ পাণ্ডুলিপি ৩'২৫

একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু ৩'০০

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস

মনে রেখ ৬'০০

বিমল মিত্রের উপন্যাস

অন্যরূপ (২য় সং) ৫'৫০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর উপন্যাস

জীবন-যৌবন ৩'০০

সুশীল রায়ের উপন্যাস

ত্রিনয়না ৫'০০

প্রকাশিত হ'ল

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

দিনান্তের রঙ ৬'৫০

প্রতিভা বসুর উপন্যাস

অতল জলের আহ্বান ৩'৫০

মধ্যরাতের তারা ৩'২৫

দীপক চৌধুরীর উপন্যাস

মালদা থেকে মালাবার ৩'০০

ঝড় এলো ৫'০০ **শঙ্খবিষ** ৫'৫০

প্রাণতোষ ঘটকের উপন্যাস

রাজায় রাজায় ৯'০০

সুলেখা সরকার

টক ও মিষ্টি রান্না ১'৫০

রান্নার বই (৩য় সং) ৫'০০

বিভা সরকার

পথের টানে (ভ্রমণ) ৩'৫০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সজনীকান্ত দাসের বই

পান্থ-পাদপ (কাব্য) ৩৲
মানস-সরোবর (কাব্য) ২৲
অজয় (উপন্যাস) ২৲
মধু ও হুল (ব্যঙ্গ-গল্প) ২॥০
রাজহংস (কাব্য) ৩৲
কলিকাল (সচিত্র গল্প) ৪৲
কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল (কাব্য) ২॥০
ভাব ও ছন্দ (কাব্য) ২॥০
পঁচিশে বৈশাখ (কাব্য) ১॥০
কবিতা-সংগ্রহ (যন্ত্রস্থ)

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

দশকুমার চরিত

দণ্ডীর মহাগ্রন্থের অনুবাদ। প্রাচীন যুগের উচ্ছৃঙ্খল ও উচ্ছল সমাজের এবং ক্রূরতা, খলতা, ব্যভিচারিতায় মগ্ন রাজপরিবারের এবং বিকারগ্রস্ত অতীত সমাজের চির-উজ্জ্বল আলেখ্য। ৪·০০

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎ-পরিচয়

শরৎ-জীবনীর বহু অজ্ঞাত তথ্যের খুঁটিনাটি সমেত শরৎচন্দ্রের সুখপাঠ্য জীবনী। শরৎচন্দ্রের পত্রাবলীর সঙ্গে যুক্ত 'শরৎ-পরিচয়' সাহিত্যরসিকের পক্ষে তথ্যবহুল নির্ভরযোগ্য বই। ৩·৫০

বসুধারা গুপ্ত

তুহিন মেরু অন্তরালে

সরস ভঙ্গীতে লেখা কেদার-বদ্রী ভ্রমণের মনোজ্ঞ কাহিনী। বাংলার ভ্রমণ-সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ৩·০০

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

তা হয় না

কুশলী কথাসাহিত্যের কয়েকটি বিচিত্র ধরণের গল্পের সংকলন। গল্পগুলিতে বৈঠকী আমেজ থাকায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ২·৫০

মণীন্দ্রনারায়ণ রায়

বহুরূপে

আমাদের সাহিত্যে হিমালয়ভ্রমণ নিয়ে বহু কাহিনী রচিত হয়েছে। 'বহুরূপে—' নিঃসন্দেহে এদের মধ্যে অনন্যসাধারণ। 'প্রবাসী'তে 'জটার জালে' নামে ধারাবাহিক প্রকাশিত। ৬·৫০

সুশীল রায় : আলেখ্যদর্শন

কালিদাসের 'মেঘদূত' খণ্ডকাব্যের মর্মকথা উদ্ঘাটিত হয়েছে নিপুণ কথাশিল্পীর অপরূপ গদ্যসুষমায়। মেঘদূতের সম্পূর্ণ নূতন ভাষ্যরূপ। বঙ্গসাহিত্যে নতুন আশ্বাস ও আস্বাদ। ২·৫০

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

সপ্ত-সতী

কাব্যে গদ্যে নাটকে লিখিত শাস্ত্রোক্ত সাতজন মহীয়সী সতী নারীর অনবদ্য জীবনকথা। সুন্দর প্রচ্ছদে উপহারোপযোগী বই। দাম চার টাকা।

সুবোধকুমার চক্রবর্তী রচিত

রম্যাণি বীক্ষ্য

ভ্রমণের সরসতার সঙ্গে ইতিহাসের তথ্যকথার অপূর্ব সমাবেশ। দক্ষিণ-ভারতের সচিত্র মনোরম ভ্রমণ-কাহিনী। রেক্সিনে বাঁধাই ত্রিবর্ণ জ্যাকেট। দাম সাত টাকা।

সুশীলচন্দ্র সিংহ
সাগর ও ঊর্মি ১·৫০

যোগেশচন্দ্র বাগল
বিদ্যাসাগর পরিচয় ২·০০

কুমারেশ ঘোষ
যদি গদি পাই ২·০০

সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

চন্দ্র-সূর্য-তারা ৩·০০
অমলেন্দু চৌধুরী

উলঙ্গ রাজা ২·৫০
দেবী খান

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস : ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭

প্রকাশিত হইল !

সজনীকান্ত দাসের

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস

…বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সজনীকান্তের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অপরিসীম। ঐতিহাসিক তথ্যান্বেষণের ইহাই তাঁহার আন্তরিক প্রেরণা, যাহা আজ বহুরূপী বিদূষককে বহুসন্ধানী গবেষককে পরিণত করিয়াছে। এই পরিণতি যে নিষ্ফল হয় নাই, তাহার নিদর্শন বর্তমান গ্রন্থেই পাওয়া যাইবে। গ্রন্থের পিছনে গ্রন্থকারের যে নিবিষ্টতা ও নিষ্ঠা রহিয়াছে তাহাই ইহার সত্যকার পরিচয় বহন করিতেছে।

—সুশীলকুমার দে

বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্রসহ পরিবর্ধিত সংস্করণ—১৪·০০

সদ্য প্রকাশিত !

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

শ্রা ব ণী

শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে লেখা এই লেখকের **ইস্পাতের স্বাক্ষর** একদিন বাংলা সাহিত্য-জগতে আলোড়ন এনেছিল। বুদ্ধিজীবী মানুষদের কাহিনী এই বিরাট গ্রন্থ পূর্বগ্রন্থেরই ন্যায় অসাধারণ সাহিত্যসৃষ্টি।

…স্বীকার করতে দ্বিধা নেই 'ইস্পাতের স্বাক্ষরে'র পর 'শ্রাবণী' তাঁর আর একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

—যুগান্তর

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানাদিক

…উভয়েই তাঁরা গুরুদেবের সঙ্গীত বিষয়ে কিছু বলার অধিকারী। নিজেদের বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুদেবের গানকে তাঁরা যেভাবে দেখেছেন বা বুঝেছেন, তা পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন এই বইয়ে। —শান্তিদেব ঘোষ

মিত্রালয় : ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

বাসবদত্তার

গৃহস্থবধূর ডায়েরী ৭·০০

যুগোপযোগী উপন্যাস

মোহিতলাল মজুমদারের

কাব্য-মঞ্জুষা (সম্পূর্ণ ও টীকা সম্বলিত) ১০·০০

ডঃ মনোরঞ্জন জানার

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ৮·০০

(সাহিত্য ও সমাজ)

রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক) ১২·৫০

নারায়ণচন্দ্র চন্দের

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ৭·০০

ঋষি দাসের

রত্নদীপ ২·৮০

সুনীল দত্তের

বর্ণ-পরিচয় ২·৫০

মৃণালকান্তি দাশগুপ্তের

পরমারাধ্যা শ্রীমা (৪র্থ সং) ২·৫০

রূপ হতে অরূপে ২·৫০

মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ৬·০০

মুক্তিপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা ৬·০০

সন্তোষকুমার কুণ্ডুর

বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ৪·০০

সুখময় মুখোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্র-সাহিত্যের নবরাগ ৫·০০

বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর :

স্বাধীন সুলতানদের আমল ১৩·৫০

ভূতনাথ ভৌমিকের

স্বামী বিবেকানন্দ ৩·০০

(বিদ্যাসাগরের জীবনী অবলম্বনে নাটক)

অধ্যাপক রমণীমোহন চক্রবর্তী

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কাল ৫·০০

ভারতী বুক স্টল ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ Dial 34-5178

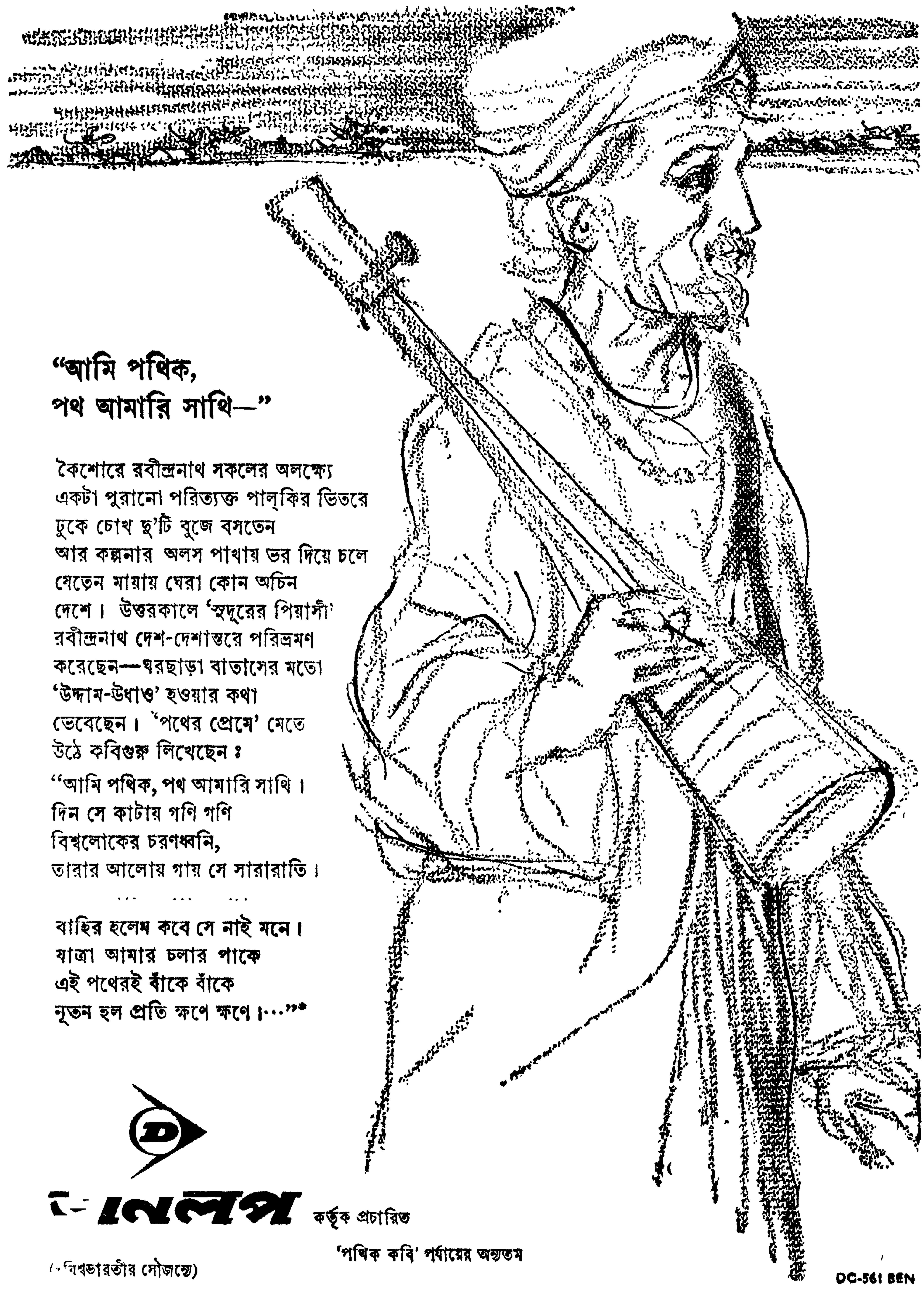

"আমি পথিক,
পথ আমারি সাথি—"

কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ সকলের অলক্ষ্যে
একটা পুরানো পরিত্যক্ত পাল্‌কির ভিতরে
ঢুকে চোখ দু'টি বুজে বসতেন
আর কল্পনার অলস পাখায় ভর দিয়ে চলে
যেতেন মায়ায় ঘেরা কোন অচিন
দেশে। উত্তরকালে 'সুদূরের পিয়াসী'
রবীন্দ্রনাথ দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ
করেছেন—ঘরছাড়া বাতাসের মতো
'উদ্দাম-উধাও' হওয়ার কথা
ভেবেছেন। 'পথের প্রেমে' মেতে
উঠে কবিগুরু লিখেছেন :

"আমি পথিক, পথ আমারি সাথি।
দিন সে কাটায় গনি গনি
বিশ্বলোকের চরণধ্বনি,
তারার আলোয় গায় সে সারারাতি।

... ...

বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।..."*

ডানলপ কর্তৃক প্রচারিত
'পথিক কবি' পর্যায়ের অন্যতম

(*বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

DC-561 BEN

শ্রীরানী চন্দ

গুরুদেব

রবীন্দ্রজীবনের শেষ কয় বছরের কাহিনী।

কবির অন্তরঙ্গ জীবনের আলেখ্য।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

মূল্য ৫·০০ টাকা

•

পূর্ণকুম্ভ

তীর্থভ্রমণের কাহিনী। ডায়েরির ভঙ্গিতে লেখা।

১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত।

মূল্য ৫·০০ টাকা

শোভন সংস্করণ ৬·০০ টাকা

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

বাক্‌-সাহিত্যের বই

এ-বছরের রবীন্দ্র-ভারতী পুরস্কারপ্রাপ্ত

শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত

রবীন্দ্রায়ণ

রবীন্দ্রসাহিত্যের সমুদয় বিভাগ, রবীন্দ্র-দর্শন ও মননের যাবতীয় দিক সম্বন্ধে স্বীকৃত পণ্ডিতদের উৎকৃষ্ট রচনাবলীর আদর্শ সংকলন। অসংখ্য বহুবর্ণ ও একবর্ণ চিত্রে সমৃদ্ধ। দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ॥ প্রতি খণ্ডের দাম দশ টাকা

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সাংস্কৃতিকী

সংস্কৃতি, কোল-জাতির সংস্কৃতি, যবদ্বীপের মহাভারত, রামায়ণ, তাও, সূফী অনুভূতি ও দর্শন, অল্‌ বিরূণী ও সংস্কৃত, দরাফ খাঁ গাজী ইত্যাদি বিবি: বিষয়ে বিশ্ববিশ্রুত ভাষাতাত্ত্বিকের মূল্যবান আলোচনা। দাম—৫·৫০

বিনয় ঘোষের নতুন বই

সূতানুটি সমাচার

বিখ্যাত ইংরেজ ও ফরাসী প্রত্যক্ষদর্শী পর্যটকদের স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনী অবলম্বনে রচিত প্রায় দুশো বছর আগেকার কলকাতা শহরের বিচিত্র সমাজচিত্র। একুশখানি দুষ্প্রাপ্য আর্টপ্লেট সম্বলিত সুবৃহৎ গ্রন্থ। দাম—১২·০০

বিদ্রোহী ডিরোজিও

বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ইতিহাসে তরুণ ফিরিঙ্গি শিক্ষক ভিভিয়ান ডিরোজিও উনিশ শতকের প্রথম পর্বে এক বিস্ময়কর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর বিস্ময়কর জীবনকাহিনী বাংলা ভাষায় প্রথম এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। দাম—৫·০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত

সাহিত্য-সংস্কৃতি-সময়

বিগত ও বর্তমান কালের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে মননশীল লেখকের নিরপেক্ষ আলোচনা ও বিশ্লেষণ আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্যের গর্বের বস্তু। দাম—৪·০০

বীরেন্দ্রমোহন আচার্য প্রণীত

আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ ও পদ্ধতি

আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ ও পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ লেখকের সুচিন্তিত আলোচনা। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বিশেষ ক'রে শিক্ষণ-শিক্ষার্থীদের অবশ্য প্রয়োজনীয় বই। দাম—৯·০০

বাক্‌-সাহিত্য

৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

বাংলা সাহিত্যের কয়েকখানি বরণীয় গ্রন্থ

॥ সাহিত্য-বিষয়ক ॥

বিমানবিহারী মজুমদার : **ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য** ১৫.০০ ; **পাঁচ শত বৎসরের পদাবলী** ৭.৫০ ॥ অজিত দত্ত : **বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস** ১২.০০ ॥ মদনমোহন গোস্বামী : **ভারতচন্দ্র** ৩.০০ ॥ ভবতোষ দত্ত : **চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র** ৬.০০ ॥ রথীন্দ্রনাথ রায় : **সাহিত্য-বিচিত্রা** ৮.৫০ ॥ নারায়ণ চৌধুরী : **আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন** ৩.৫০ ॥ অরুণ মুখোপাধ্যায় : **উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য** ৮.০০ ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ : **আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য** ৮.০০ ॥ সত্যব্রত দে : **চর্যাগীতি-পরিচয়** ৫.০০ ॥ অরুণ ভট্টাচার্য : **কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল** ৪.০০ ॥ প্রশান্ত রায় : **সাহিত্য দৃষ্টি** ৪.০০ ॥ সাধনকুমার ভট্টাচার্য : **রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা** ৬.০০ ; **নাটক ও নাটকীয়ত্ব** ২.৫০ ; **নাটক লেখার মূলসূত্র** ৫.০০ ॥ আজ্‌হারউদ্দীন খান্ : **বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল** ৫.০০ ॥

॥ জীবনী সাহিত্য ॥

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য : **বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-কাহিনী** ১.৫০ ॥ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : **বঙ্গের প্রাচীন কবি** ১.০০ ॥ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : **ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ** ৫.০০ ; **শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে** ৫.০০ ॥ বলাই দেবশর্মা : **ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়** ৫.০০ ॥ প্রভাত গুপ্ত : **রবিচ্ছবি** ৬.০০ ॥ খাজা আহম্মদ আব্বাস : **ফেরে নাই শুধু একজন** ৪.০০ ॥ মণি বাগচি : **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ** ৪.৫০ ; **মাইকেল** ৪.০০ ; **কেশবচন্দ্র** ৪.৫০ ; **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র** ৪.৫০ ; **রামমোহন** ৪.০০ ॥ **রমেশচন্দ্র** ৫.০০ ॥

॥ বিবিধ গ্রন্থাবলী ॥

প্রবোধচন্দ্র সেন : **রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি** ৩.০০ ॥ অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় : **সমসাময়িক মনোবিজ্ঞান** ৪.০০ ॥ রাধাকৃষ্ণণ : **হিন্দু সাধনা** ৩.০০ ॥ তারাপ্রসন্ন দেবশর্মা : **রামায়ণতত্ত্ব** ৪.৫০ ॥ দীনেশচন্দ্র সেন : **রামায়ণী কথা** ৪.০০ ॥ ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী : **রামায়ণের কথা** ১.২৫ ; **ভারততজিজ্ঞাসা** ৩.০০ ; **মনোবিদ্যা ও দৈনন্দিন জীবন** ২.৫০ ॥ শিশিরকুমার নিয়োগী : **সহজ কৃত্তিবাসী রামায়ণ** ৩.৫০ ॥ বিশ্বেশ্বর মিত্র : **পৃথিবীর ইতিহাস প্রসঙ্গ** ৩.৫০ ॥ কল্যাণী কার্লেকর : **ভারতের শিক্ষা** ১ম খণ্ড ২.৫০ ; ২য় খণ্ড ৫.৩০ ॥ প্রফুল্লকুমার দাস : **রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রসঙ্গ** ১ম খণ্ড ৩.৫০ ॥ সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় : **আফ্রিকার চিত্র** ১.৫০ ॥ সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় : **লাইবেরিয়ার উপকথা** ১.৫০ ॥ সুনীলকুমার গুহ : **স্বাধীনতার আবোল তাবোল** ৫.০০ ॥ সত্যকিঙ্কর সাহানা : **হিন্দুধর্ম** ১.৫০ ; **বিবিধ প্রবন্ধ** ২.৫০ ; **বিচিত্র প্রবন্ধ** ২.৫০ ॥ মণীন্দ্র সমাদ্দার : **প্রবাসী বাঙালীর কথা** ১.৫০ ॥ মানবেন্দ্রনাথ রায় : **মার্কসবাদ** ১.৫০ ; **দর্শন ও বিপ্লব** ১.৫০ ॥ শ্রীজ্ঞানান্বেষী : **দেশবিদেশের শিক্ষা** ৪.০০ ॥

॥ গল্প ও উপন্যাস ॥

বুদ্ধদেব বসু : **আমার বন্ধু** ২.০০ ; **চারদৃশ্য** ২.৫০ ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : **লক্ষ্মী** ২.০০ ; **হাসি** ২.০০ ॥ বাণী রায় : **শূন্যের অঙ্ক** ২.৫০ ॥ সুবোধ মজুমদার : **অন্তর ও বাহির** ২.০০ ; **পলাতক** ৩.০০ ॥ বিদ্যুৎবাহন চৌধুরী : **অনুস্মৃতি** ২.৫০ ॥ কল্যাণী কার্লেকর : **কন্যা ও কুমার** ১.৭৫ ॥ সুধীররঞ্জন গুহ : **ময়নানদী** ৩.০০ ॥ সুবোধ বসু : **মানবের শত্রু নারী** ২.০০ ; **স্বর্গ** ২.০০ ; **পুনর্ভব** ২.৫০ ; **ঊর্ধ্বগামী** ৩.০০ ; **চিমনি** ৩.০০ ; **ইঙ্গিত** ২.৫০ ; **পদ্মা প্রমত্তা নদী** ৩.৭৫ ; **গল্পলতা** ৪.০০ ; **পদ্মানদীর ডাক** ১.৭৫ ॥ সুকুমার রায় : **কয়েকটি গল্প** ১.০০ ॥

জিজ্ঞাসা ॥ ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ : ১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

করপুটে লীলাকমল যাদের
কালো কেশে গাঁথা কুন্দ কচি।
লোধ্র পরাগ স্মিতমুখে যেথা
পাণ্ডু কান্তি দিয়েছে রচি।
—কালিদাস

ঘন কুঞ্চিত কালো কেশ ফুলদলের মতো বিকশিত করে নারীর সৌন্দর্য্য। যুগ যুগ ধ'রে বিশ্বের নারীরা কেশ বিন্যাসের জন্য **অলিভ অয়েল** মেখে আসছেন। ক্যালকেমিকোর ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল **ক্যান্থারলে** আছে কেশের পক্ষে হিতকারী বিশুদ্ধ সেই **অলিভ অয়েল**। তাই আজও আধুনিকারা পরম আগ্রহে এই কেশ তৈল ব্যবহার করেন।

ক্যান্থারল

সুরভিসম্পৃক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

বিমল মিত্রের ক্লাসিক উপন্যাস
কড়ি দিয়ে কিনলাম
১ম খণ্ড—১৬৲ : ২য় খণ্ড—১৪৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
বৃহত্তম উপন্যাস
কাল, তুমি আলেয়া ১২৷৷০

সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা ৬৲

আশাপূর্ণা দেবীর নূতন উপন্যাস
সোনার হরিণ ৫৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
মুখোশ ৫৷৷০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নূতন উপন্যাস
আলোর ভুবন ৫৲

আলডুস হাক্সলের
এপ য়্যাণ্ড এসেন্স ৪৲

অবধূতের নবতমা
সীমন্তিনী সীমা ৪৲

মনোজ বসুর
গল্পপঞ্চাশৎ ১০৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
হিমালয়ের দুরধিগম্য অঞ্চলের ভ্রমণকাহিনী
হিমালয়ের পথে পথে ৬৷৷০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নবতম উপন্যাস
পা বাড়ালেই রাস্তা ৫৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
চন্দনবাঈ ৫৲

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ভালো কাগজের
দরকার থাকলে

এই ঠিকানায়
অনুসন্ধান করুন

দেশী বিদেশী বহু বিচিত্র
কাগজের ভাণ্ডার

এইচ. কে. ঘোষ
অ্যাণ্ড কোম্পানী

২৫এ সোয়ালো লেন। কলিকাতা
টেলিফোন ॥ ২২-৫২০৯

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি অর্ঘ্য

১২·০০

সম্পাদনা : **ডক্টর নীলরতন সেন**

"শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ ও সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, 'রবীন্দ্রবীক্ষা' তন্মধ্যে অন্যতম।" —দেশ

"আলোচ্য গ্রন্থটি একটি উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। নানাদিক থেকে এই সংকলন গ্রন্থটি মামুলি সংকলনের চলতি পথের যাত্রী নয়। এই গ্রন্থের সম্পাদনার পশ্চাতে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত ছিল যার ফলে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, তাঁর জীবনের ভিত্তিভূমি, আদর্শ, ব্যপ্তি ও গভীরতাকে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠকের কাছে বইটি বিশেষ ভাবে সমাদৃত হবে।" —যুগান্তর

পঁচিশ জন সাম্প্রতিক কবি ৪·০০
সম্পাদনা ॥ **দিনেশ দাস**
পঁচিশ জন কবির কবিতা সংকলন

শরৎচন্দ্র দেশ ও সমাজ ২·০০
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি তরু দত্ত ২·৫০
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
সাহিত্য ও জীবনী আলোচনা

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ১·০০
রাখাল ভট্টাচার্য

উইলিয়াম ফক্‌নার ১·০০
কৃষ্ণগোপাল চট্টোপাধ্যায়

রবার্ট ফ্রস্ট ১·০০
বাণী রায়

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট : কলিকাতা-বারো
ডায়াল : ৩৪-২৩৮৬

অকাল বোধন

রামায়ণে বর্ণিত আছে, রাবণের স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী অম্বিকা নিজেই রাবণের রথে বসলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দেবীকে দেখে বিস্মিত রাম ধনুর্বাণ ফেলে দেবীকে মাতৃজ্ঞানে প্রণাম করলেন। রাবণ-বধ অসম্ভব, এ কথা ভেবে শুধু রামচন্দ্র নন, দেবতারাও বিষণ্ণ হলেন। তখন,

বিধাতারে কহিলেন সহস্রলোচন।
উপায় করহ বিধি যা হয় এখন॥
বিধি কন, বিধি আছে চণ্ডী-আরাধনে।
হইবে রাবণ-বধ অকাল-বোধনে॥

প্রচলিত প্রথা অনুসারে বসন্তকালই দেবী-পূজার শুদ্ধি সময়। বিধাতা নিজেই শ্রীরামচন্দ্রের সন্দেহ নিরসন করলেন, শরৎকালে ষষ্ঠী কল্পেতে বোধনের নির্দেশ দিয়ে। 'বন পুষ্প ফলমূল দিয়ে' সাগরের তীরে শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডীপাঠ সমাপন করে দুর্গোৎসব আরম্ভ করলেন।—সেই থেকে ভারতের ঘরে ঘরে শরৎকালে আগমনীর সুর বেজে উঠল!

কে. সি. দাস প্রাইভেট লিমিটেড

ক লি কা তা

আবিষ্কারক : রসোমালাই

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

গ্রন্থটি রচনার জন্য ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য একাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫৲]

রামায়ণ : কৃত্তিবাস বিরচিত

পূর্ণাঙ্গ রামায়ণটির বহুবর্ণ চিত্র সমন্বিত যুগরুচিসম্মত অনিন্দ্য প্রকাশন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। [৯৲]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলন, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের আধুনিকতম আকরগ্রন্থ। [২৫৲]

রবীন্দ্র-দর্শন

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্রজীবনবেদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা [২া০]

জীবনের ঝরাপাতা

রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবীচৌধুরানীর আত্মচরিত। ঠাকুরবাড়ির আলেখ্য। [৫৲]

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান

পরিবর্ধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। [৮া০]

Samsad Anglo-Bengali Dictionary

বহু প্রশংসিত উচ্চমানবিশিষ্ট ইংরাজী-বাঙ্গালা আধুনিক শব্দকোষ। [১২া০]

বঙ্কিম-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪ খানি একত্রে) তৃতীয় মুদ্রণ বাহির হইল। [১২৲]

দ্বিতীয় খণ্ড সমগ্র সাহিত্য-অংশ একত্রে [১৫৲]

রমেশ-রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস একত্রে [৯৲]

উভয় রচনাবলীই শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও লেখকদিগের সাহিত্যকীর্তি আলোচিত।
উপহারে ও গ্রন্থাগারে অপরিহার্য।

পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন :

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ॥

গীত-ভানু

('দক্ষিণী' পরিচালিত শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র)

১৩২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯

নূতন-শিক্ষাবর্ষ

জানুয়ারী মাস থেকে গীত-ভানু'র নূতন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। ডিসেম্বর মাস থেকেই নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা আরম্ভ হবে। ৩৬টি রাগরাগিণী ও ১২টি তালকে কেন্দ্র করে আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য শ্রেণীতে বিভক্ত হয় বৎসরের শিক্ষাক্রম। এ ছাড়া ঔপপত্তিক ও স্বরলিপি পাঠ অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে নির্দিষ্ট। কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত ও সেতার শিক্ষাদান করা হয়। শিক্ষা-পরিষদ : শচীন দাশ মতিলাল, মণিলাল নাগ, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, সতীশ নায়ক ও দীপক মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষাগ্রহণ ও ভর্তির সময় : শনিবার ৪—৭ ও রবিবার সকাল ৮—১১

রবীন্দ্রনাথের দেখা রাশিয়া

সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ

আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন সোভিয়েত দেশে। খোলা চোখে দেখা সে-দেশ সম্পর্কে খোলা মনে লেখা তাঁর পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছে অনেক বছর আগেই—"রাশিযাব চিঠি" নামে। "রাশিয়ার চিঠি"র প্রধান পত্রাবলী ও সে-দেশে তাঁর বিভিন্ন ভাষণ, বিভিন্ন আলাপ আলোচনার অনুলিপি আর সেই সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্যে লেখা সে-দেশের কবিতা, বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চিঠিপত্র আর বিভিন্ন সংঘ-সংগঠনের অভিনন্দন লিপি স্থান পেয়েছে।

বহু চিত্র শোভিত ১৮২ পৃষ্ঠার বই মূল্য ০.৮৭

বিজ্ঞানের বই

পৃথিবী ও আকাশ

ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা

ছোটদের জন্যে লেখা জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই। আমাদেব গ্রহ ও নক্ষত্রলোকের অনুসন্ধানের ইতিহাস থেকে অনেক তথ্যে ভরা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিকট ভবিষ্যতের কথা—মহাকাশ-যাত্রার ও অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে বাস্তব পরিচয়ের কথা বলা হয়েছে। পাতায় পাতায় ছবি ॥ ৩.৫০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২ ॥ ১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

প্রাচীন ও আধুনিক
মতে অনুমোদিত
লিলি
বার্লি
LILY BRAND
PEARL
BARLEY
LILY BARLEY MILLS LIMITED
খাদ্যপ্রাণযুক্ত
খাদ্য, পথ্য ও পানীয়
LILY BRAND
BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ
লিকাতা-৪

শিলাধৃত ইতিহাস

প্রাচীন স্মৃতিসৌধগুলি আজ ইতিহাসের পর্য্যায়ে উন্নীত। খণ্ড খণ্ড শিলার গ্রন্থনায় রচিত এদের প্রত্যেকটি অতীত ভারতের উদ্যমশীলতা আর কল্পনাশক্তির অমর নিদর্শন হয়ে আছে। প্রতিদিন ভারতের নানা অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ যাত্রীকে পৌঁছে দিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারাকে পারস্পরিক শুভেচ্ছার দৃঢ়তম বন্ধনে গ্রথিত ক'রে চলেছে রেলপথ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

IPB

পূজোয়
নতুন জুতো

দেশের

ও

দশের সেবায়—

দি ইণ্ডিয়ান টিউব কোম্পানি (১৯৫৩) লিমিটেড

টাটা-স্টুয়ার্টস্ অ্যাণ্ড লয়েডস্-এর যৌথ প্রতিষ্ঠান

সুন্দর থেকে সুন্দরতম...
অলঙ্কার শিল্পী ও স্বর্ণ রৌপ্য ব্যবসায়ী
১১৭/২, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২
ফোন:: ৩৪-৪৭৮০

SPENCER WILL ANSWER!
if you like
which aerated waters assure at every draught
SPENCER'S FRUIT DRINK
"VITO"
Fresh cheer for mind?
Soothing ease for stomach?
Luxury of taste for purse?

দেশের প্রয়োজন
মেটাতে
আরও বেশী পাইপ

ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেডের কুল্‌টি কারখানায় দ্বিতীয় একটি প্লাণ্ট স্থাপনার ফলে স্পান আয়রন পাইপের উৎপাদন বছরে ৬০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ টনে উঠেছে। বড় ব্যাসযুক্ত মেইন পাইপের জন্য ভারতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটান ছাড়াও উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ার ফলে প্রতি বছর ভারতের বহু কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা বাঁচবে। আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ও কারিগরি কৌশল নিয়োগ করে 'ইস্কোর' কুল্‌টি কারখানা ৩" থেকে ৩০" ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত স্পান আয়রন পাইপ এদেশে প্রথম তৈরি করে।

IISCO

দি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিঃ

বানপুর ও কুলটিতে কারখানা

বিক্রয়কেন্দ্র। ১২ মিশন রো, কলিকাতা ১

ম্যানেজিং এজেণ্টস—মার্টিন বার্ন লিমিটেড

মার্টিন বার্ন হাউস, কলিকাতা

শাখা: নিউদিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

দক্ষিণ ভারতে এজেণ্ট : দি সাউথ ইণ্ডিয়ান এক্সপোর্ট কোং লিঃ, মাদ্রাজ ২

IIC-818 BEN

এন. আর. বোস অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলিকাতা-৬
[কাগজ সরবরাহক]

ফোন—৫৫-৪৪০০
পোষ্ট বক্স—১১৪৪৬
গ্রাম—পেপার গুডস্।

জগদীশবাবুর গীতা

মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-রহস্য ভূমিকাসহ অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ৬.০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম — শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা ৫.০০
ভারত-আত্মার বাণী — ভারতের শাশ্বতবাণী বিশ্বমৈত্রীর কথা ৫.০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১.৫০
কর্মবাণী ১.২৫

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী ২.০০
বাংলার ঋষি ৩.০০
বীরত্বে বাঙালী ১.৫০
বাংলার মনীষী ১.২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী ৪.০০
বাংলার বিদুষী ২.০০
আচার্য জগদীশ ২.০০
রাজর্ষি রামমোহন ১.৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১.৫০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১.৫০
জীবন গড়া .৭৫
রবীন্দ্রনাথ ১.২৫

ব্যবহারিক শব্দকোষ
প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান বহুল পরিবর্ধিত ও বহু পরিশিষ্ট-সংবলিত ৯.৫০

STUDENTS' OWN DICTIONARY
OF WORDS, PHRASES & IDIOMS
প্রয়োগমূলক নূতনধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান। এই দুই যুগান্তকারী সুসঙ্কলিত সর্বদা-ব্যবহার্য অভিধান প্রত্যেকের অপরিহার্য। ৭.৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী· ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

দেশ-বিদেশের খবরের জন্য
নিয়মিত পড়ুন

কথাবার্তা

সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক ও অর্থনীতি বিষয়াদি সম্পর্কিত বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা। গল্প কবিতা ও প্রবন্ধাদি নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

বার্ষিক—৩·০০ : ষাণ্মাসিক—১·৫০

●

বসুন্ধরা

গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি ও
সমবায় সম্বন্ধীয় বাংলা
মাসিক পত্র

বার্ষিক—৩·০০

শ্রমিকবার্তা

শ্রমিককল্যাণ সংক্রান্ত
বাংলা-হিন্দী
পাক্ষিক পত্রিকা

বার্ষিক—১·৫০

●

উইক্‌লি ওয়েস্ট বেঙ্গল

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

বার্ষিক—৬·০০ : ষাণ্মাসিক—৩·০০

[বিঃ দ্রঃ—(১) চাঁদা অগ্রিম দেয় ; (২) বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই ; (৩) ভিঃ পিঃ ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না]

প্রচার-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১
এই ঠিকানায় গ্রাহক হইবার জন্য পত্র জন্য লিখুন

উদ্যমীর উন্নতি ...

১৯২০ সালে, পি, কে, চ্যাটার্জী ইস্কুল থেকে বেরিয়েই শিক্ষানবীস ড্রাফট্‌সম্যান হিসাবে টাটা স্টীলে যোগদান করেন।

তাঁর উন্নতি করবার আর শেখবার অদম্য উৎসাহ ছিল। কাজে ঢুকে তিনি টাটা স্টীলের সবে চালু টেকনিক্যাল স্কুলে যোগদান করেন। কারিগরী শিক্ষার তিন বছরের কোর্স যে সব ছেলে প্রথম পাশ করে তিনি তাঁদের মধ্যে একজন।

চ্যাটার্জী ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্টে উত্তরোত্তর উন্নতি করেন এবং গোড়া থেকেই দেখা যায় ব্লাস্ট ফার্নেসেই তাঁর প্রবল ঝোঁক। তিনি জামশেদপুর কারখানার ব্লাস্ট ফার্নেসগুলোকে ঢেলে সাজতে সাহায্য করেছেন। এর মধ্যে দৈনিক ১,০০০ টন লোহা গলানোর একটি ব্লাস্ট ফার্নেস তাঁর পরিকল্পনা মত নতুন করে তৈরী করা হয়েছে। আমাদের দেশে এধরণের প্রচেষ্টা এই সর্বপ্রথম।

চ্যাটার্জী এখন বিশেষ পরিকল্পনা বিভাগে এ্যাসিস্টেণ্ট চীফ ইঞ্জিনীয়ার। কার্যোপলক্ষে চ্যাটার্জী সারা পৃথিবী ঘুরেছেন এবং পৃথিবীর সব জায়গার ব্লাস্ট ফার্নেস বিশেষজ্ঞরা তাঁকে জানেন এবং শ্রদ্ধা করেন।

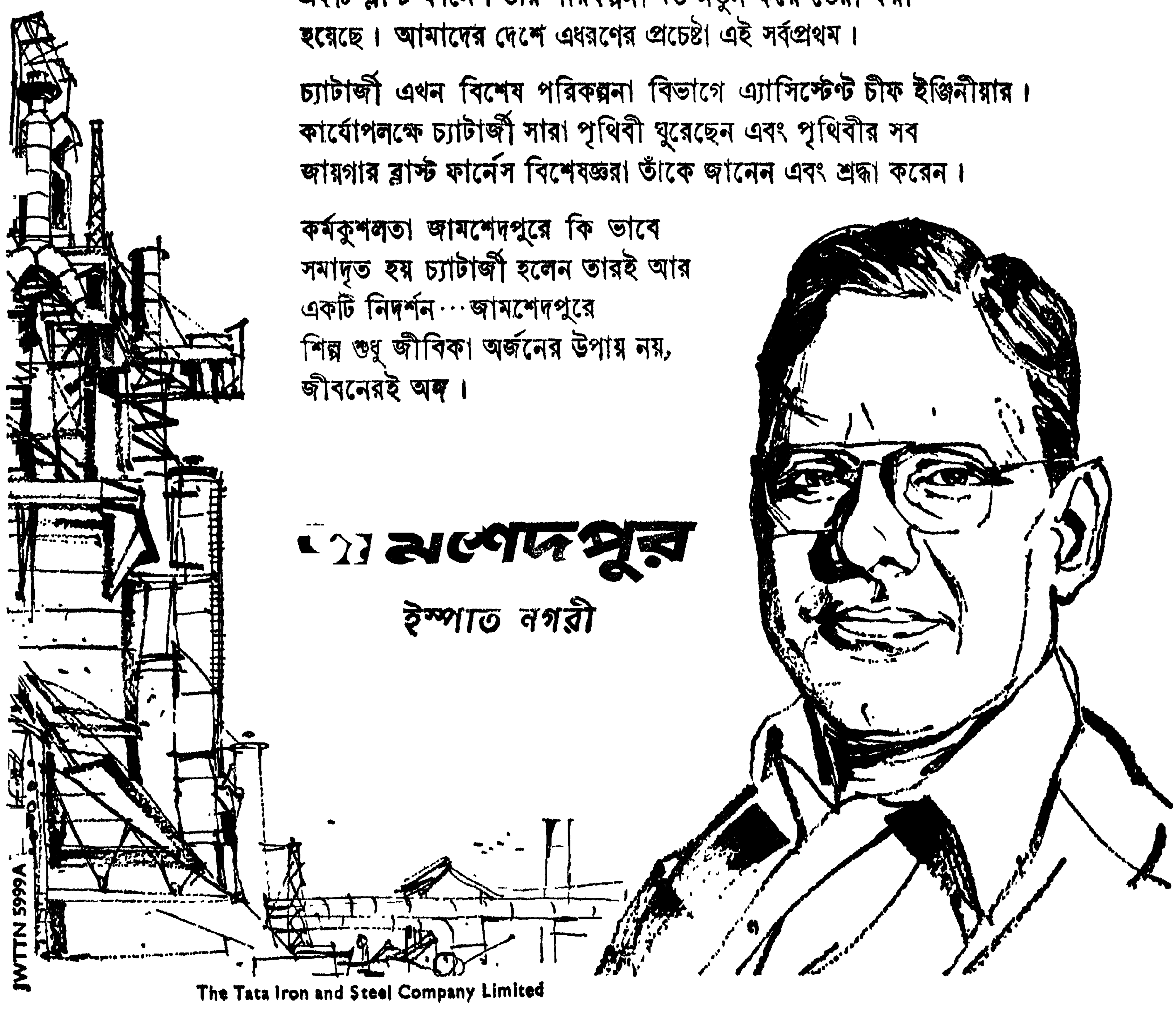

কর্মকুশলতা জামশেদপুরে কি ভাবে সমাদৃত হয় চ্যাটার্জী হলেন তারই আর একটি নিদর্শন···জামশেদপুরে শিল্প শুধু জীবিকা অর্জনের উপায় নয়, জীবনেরই অঙ্গ।

জামশেদপুর

ইস্পাত নগরী

JWTTN 5999A

The Tata Iron and Steel Company Limited

বিশ্বভারতী পত্রিকা

পুরাতন সংখ্যা

বিশ্বভারতী পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা কিছু আছে। যাঁরা সেট সম্পূর্ণ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁদের অবগতির জন্য বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হল—

¶ প্রথম বর্ষের মাসিক বিশ্বভারতী পত্রিকার চার সংখ্যা পাওয়া যায়। একত্র ১'০০।

¶ তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১'০০।

¶ পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১'০০।

¶ অষ্টম বর্ষের প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১'০০।

¶ নবম বর্ষের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১'০০।

¶ ষষ্ঠ, সপ্তম, দশম, একাদশ ও চতুর্দশ বর্ষের সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যায়। প্রতি সেট ৪'০০, ডাকে ৬'০০।

¶ দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ বর্ষ নিঃশেষিত।

¶ পঞ্চদশ বর্ষের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১'০০।

¶ ষোড়শবর্ষের প্রথম সংখ্যা নিঃশেষিত ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্ত-সংখ্যা, মূল্য ৩'০০, ডাকে ৪'০০।

¶ সপ্তদশ বর্ষের চারিটি সংখ্যা একত্রে একটি খণ্ডে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা-রূপে প্রকাশিত হয়। এখনও কয়েকটি খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে ; মূল্য ৪'০০।

¶ অষ্টাদশ বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১'০০।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কলকাতার গ্রাহকবর্গ

স্থানীয় গ্রাহকদের সুবিধার জন্য কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত ক্রেতারূপে নাম রেজিস্ট্রি করবার এবং বার্ষিক চার সংখ্যার মূল্য চার টাকা অগ্রিম জমা নেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এইসকল কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা উল্লিখিত হল—

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
৩৩ কলেজ রো

ভবানীপুর বুক ব্যুরো
২বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড

যাঁরা এইরূপ গ্রাহক হবেন, পত্রিকার কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হলেই তাঁদের সংবাদ দেওয়া হবে এবং সেই অনুযায়ী গ্রাহকগণ তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। এই ব্যবস্থায় ডাকব্যয় বহন করবার প্রয়োজন হবে না এবং পত্রিকা হারাবার সম্ভাবনা থাকে না।

মফস্বলের গ্রাহকবর্গ

যাঁরা ডাকে কাগজ নিতে চান তাঁরা বার্ষিক মূল্য ৫'৫০ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলিকাতা ৭ ঠিকানায় পাঠাবেন যদিও কাগজ সার্টিফিকেট অব পোস্টিং রেখে পাঠানো হয়, তবুও কাগজ রেজিস্ট্রি ডাকে নেওয়াই অধিকতর নিরাপদ। রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানোর জন্য অতিরিক্ত ২ৎ লাগে।

কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে আশুফলপ্রদ, কুলকুচি ও মুখ ধোয়ায় কার্যকরী। ঘর, মেঝে ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত রাখতে অত্যাবশ্যক।

৫৫, ১১০, ৪৫০ মিলি বোতলে ও ৪.৫ লিটার টিনে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী।

আপনার গৃহের শ্রীবৃদ্ধি

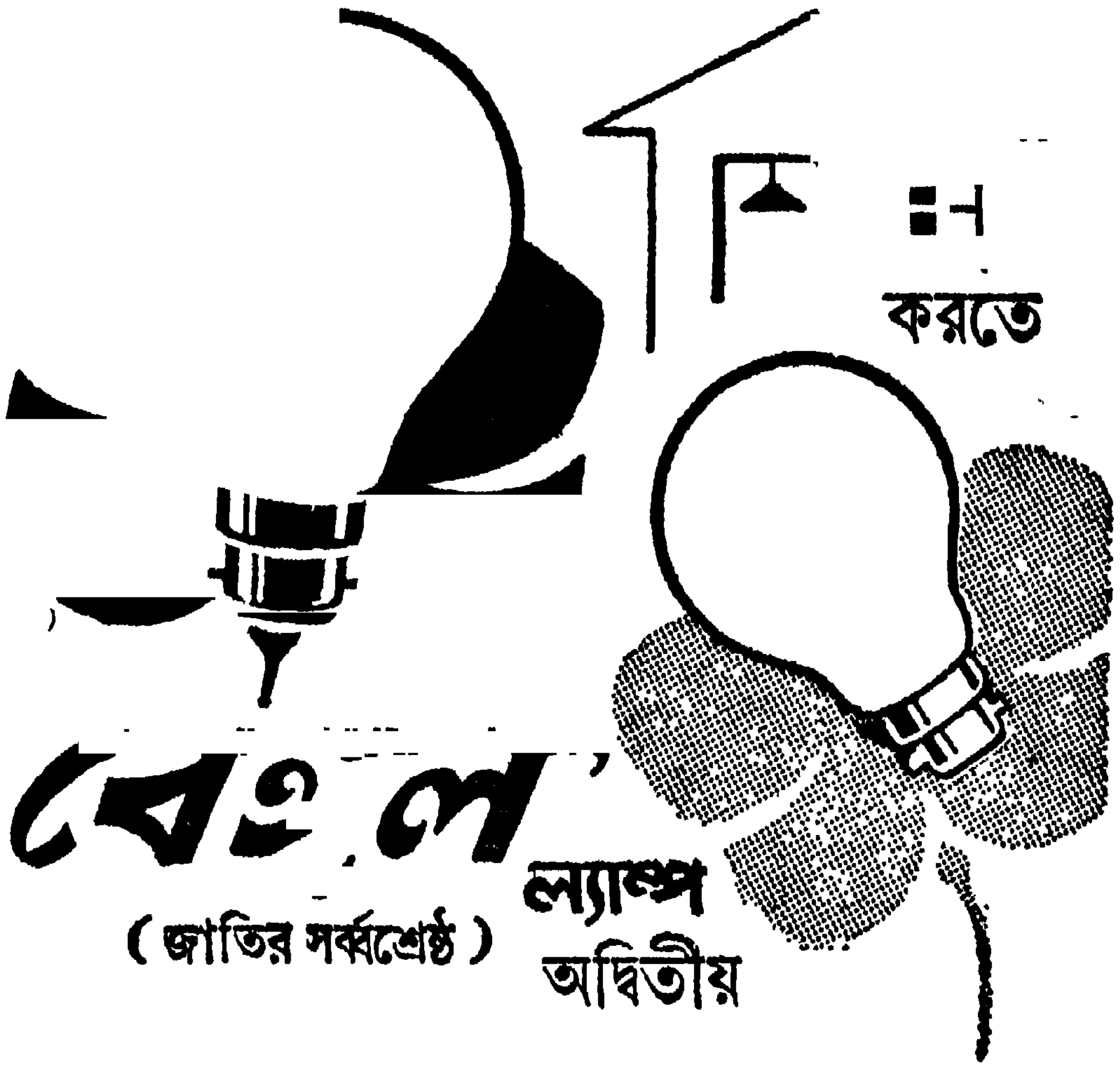

করতে

বেঙ্গল ল্যাম্প

(জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) অদ্বিতীয়

৩০ বৎসরের ল্যাম্প-উৎপাদন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ

দি বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস্ লিঃ
৭, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

তনুরেখা

তনুরেখাকে আশ্রয় ক'রেই সৌন্দর্যের প্রকাশ।
লীলায়িত অঙ্গ-ছন্দে নারীরূপের চিরন্তন আকর্ষণ।
কিন্তু সুন্দর কেশ-ই রূপকে দেয় নিটোল
মুক্তোর মত এক দীপ্ত সম্পূর্ণতা।
'কেশরঞ্জন' আপনাকে সেই সন্ধানই দেবে।

কেশরঞ্জন

অসাধারণ কেশতৈল

কবিরাজ এন, এন, সেন
এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
কেশরঞ্জন কার্য্যালয়
কলিকাতা—১

K-D/60

উপচীয়মান উপহার

ভারি খুশী ওর নিজের নামে ব্যাঙ্কের পাশ বই পেয়ে;
গর্বিত ও! যত ওর বয়স বাড়বে উপহারটিও
বাড়তে থাকবে আর কাজে আসবে সময়মতো।

অপ্রাপ্তবয়স্কের নামেও অ্যাকাউন্ট খোলা হয়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
হেড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
সেবার প্রতীক
ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ হয়

শারদোৎসবে
আমাদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও অভিবাদন
গ্রহণ করুন।

হাওড়া মোটর কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
• • কলিকাতা • •

প্রকাশিত হইয়াছে

আত্মজীবনী

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী একখানি অপূর্ব গ্রন্থ। অতুল ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাসের দ্বারা বেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও কিরূপে তাঁহার মন বৈরাগ্যের অনলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, ঈশ্বরের জন্য একটি প্রবল পিপাসা কিরূপে তাঁহাকে অধিকার করিয়া ক্রমে তাঁহার সুখশান্তি হরণ করিল এবং কিরূপে পরে সেই পিপাসা তৃপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনে একটি পরম সার্থকতার অনুভূতি আনিয়া দিল— এই গ্রন্থে তিনি স্বীয় অতুলনীয় ভাষায় তাহা বিবৃত করিয়াছেন।"

আত্মজীবনীর এই সংস্করণে পরিশিষ্ট অংশে মহর্ষির জীবনের আরও অনেক তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে, এবং মহর্ষির যুগ-সম্পর্কিত কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সংযোজিত হইয়াছে।

বিষয়সূচী ও বংশলতিকা সন্নিবিষ্ট
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্র

মূল্য ১২·০০ টাকা

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতে প্রকাশিত বিশিষ্ট শ্রদ্ধাঞ্জলি-গ্রন্থ

রবিচ্ছবি ॥ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ৬·০০

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ॥ তোমার লেখা 'রবিচ্ছবি' বইখানা আমি পড়েছি। বিধান-সংসদে আমার বক্তৃতায় বইটি থেকে কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃতও করেছি। বেশ লেখা হয়েছে।

প্রতিমা দেবী ॥ আপনার বইখানি (রবিচ্ছবি) পেয়ে খুশি হলুম। এর সমস্তই সুন্দরভাবে সুগ্রথিত হয়েছে। আমি পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি এবং সকলেই পাবেন বলে মনে হয়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ বহু তথ্য ও তত্ত্ব পেয়েছি। ভালো লেগেছে।

অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন ॥ আপনার 'রবিচ্ছবি' আমি ইতিমধ্যে বার-দুয়েক পড়েছি। খুব ভাল লাগল। রবীন্দ্রনাথ মানুষটি কেমন ছিলেন এবং তাঁর সান্নিধ্যের সুগন্ধ কেমন বইত তার বেশ একটুখানি পরিচয় আপনার লেখায় পেলুম।

সজনীকান্ত দাস ॥ বহু বিচিত্র তথ্য চমৎকার শৃঙ্খলার সহিত প্রদত্ত হইয়াছে।

গীতবিতান পত্রিকা ॥ সম্পাদক ॥ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা ৮·০০

"প্রায় সাড়ে তিনশত পৃষ্ঠার এই জয়ন্তী সংকলনটিতে বিশ্বকবি সম্পর্কে শুধু নূতন তথ্যই পরিবেশিত হয়নি, পরন্তু বহুমুখী রবীন্দ্রপ্রতিভার একাধিক সৃষ্টিধারার নূতন দৃষ্টিভঙ্গীসম্বলিত ব্যাপক আলোচনা এতে রয়েছে।···প্রথমভাগে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সংগীত, নৃত্য, নাট্য সম্পর্কিত আলোচনা আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তথ্যমূলক স্মৃতিকথা।···রবীন্দ্রশতাব্দীপূর্তিতে এমন একটি সার্থক স্মারকগ্রন্থ জাতিকে উপহার দেওয়ায়···আমরা অভিনন্দন জানাবো। ঘরে বাইরের যে কোন শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্রে এর যথোচিত সমাদর না হয়ে পারে না।"—**দৈনিক বসুমতী**

"গীতবিতান পত্রিকায় এমন লেখা বেরিয়েছে যেগুলি বহুদিন ধরে রবীন্দ্র-গবেষকদের কাজে লাগবে।"

—কালিদাস নাগ

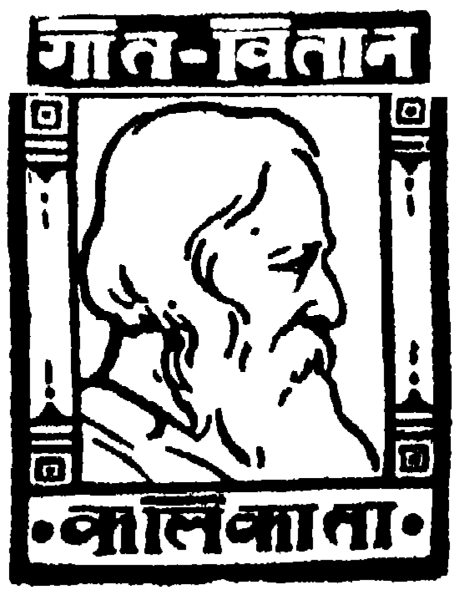

গীতবিতান ২৫বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৫

একমাত্র পরিবেশক আর, ডি, এম, এণ্ড কোং ২১৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৯ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯ · ১৮৮৪ শক

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বিষয়সূচী

ছন্দ-ধাঁধা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১৯
চিঠিপত্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২৫
শুভযাত্রা	ক্ষিতিমোহন সেন	১২৬
আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত সংগীত	শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র	১৩২
আমাদের জীবনীসাহিত্য	শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার	১৪৫
ভারতবর্ষীয় সভা	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	১৫৩
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীবিজিতকুমার দত্ত	১৬৪
রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ		
'ছন্দ-ধাঁধা'-পরিচয়	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন	১৮৮
প্রকাশবাদ ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাসা	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়	১৯৫
নোবেল পুরস্কার		
ইভো আন্দ্রিচ	শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	২১১
স্যাঁ-জন প্যার্স	শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত	২১৫
আলোচনা		
'বাংলা ভাষার স্বর ও ছন্দ'	শ্রীশিশিরকুমার দাশ	২২০
	শ্রীপুণ্যশ্লোক রায়	২২১
গ্রন্থপরিচয়	শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস	২২৬
স্বরলিপি : 'হে নিরুপমা· ·'	শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার	২৩০

চিত্রসূচী

নটীর পূজা	শ্রীনন্দলাল বসু	১১৯
আইন-ই-আকবরীর একটি পৃষ্ঠা		১৩৩
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		১৬৬
ইভো আন্দ্রিচ		২১৪
স্যাঁ-জন প্যার্স		২১৫

মূল্য এক টাকা

নটীর পূজা
শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৯ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯ · ১৮৮৪ শক

ছন্দ-ধাঁধা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম পর্যায়

কবি-কাহিনী

When the evening steals on western waters,
    Thrills the air with wings of homeless shadows ;
When the sky is crowned with star-gemmed silence,
    And the dreams dance on the deep of slumber ;
When the lilies lose their faith in morning
    And in panic close their hopeless petals,
There's a bird which leaves its nest in secret,
    Seeks its song in trackless path of heaven.

কি ছন্দ বল্ দেখি ? একটা বাংলা ছন্দে লিখেছিলুম কিন্তু ইংরেজি ছন্দেও পড়া যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়

ক

১ ভোর হোলো
কুসুমগুলি তোলো।
আনো ফুলের ডালা
গাঁথো মালা।

২ আকাশ ঢেকেছে মেঘে
বাতাস বহিতেছে বেগে।

৩ মুখে কিছু নাহি বলে
নয়ন ছুটি ভরিল জলে।

৪ শোনো না তবুও আপনার মনে
কথা বলে যাই কত,

বধির তীরের নিকটে রাত্রিদিবস
নদীর ধ্বনির মত।

*৫ সারা রাত তারা যতই জ্বলে
রেখা না রাখে আকাশের তলে ॥২৪০

*৬ চাষের সময় কিছু করি নাই হেলা
ভুলে ছিলাম ফসল কাটিবার বেলা।

*৭ রাতের বাদল মাতে তমালের শাখে
পাখিদের বাসায় আসিয়া জাগো জাগো ডাকে ॥২১৯

খ

১ সকালে অধীর বাতাস এল
বৃথাই শুধু বনেরে বকালে।
চেয়ে দেখি দিনশেষে
মাটি ঝরা ফুলে ছেয়ে
লতারে ঠকালে কাঙাল করে।

আ দ র্শ

তৃতীয়বার চাঁদখানি বাঁকা সে
আপনারে চেয়ে দেখে ফাঁকা সে।
তারাদের পানে চায়
বিদেশী জনের প্রায়
জুড়ি না খুঁজিয়া পায় আকাশে।

*২ শিশির-বাতাস লেগে শরতে
উদাসী মেঘে জল ভরে আসে।
তবু কেন বরষণ হয় না,
যেন চেয়ে রয়েছে ব্যথা নিয়ে।

আ দ র্শ

*ভেসে-যাওয়া ফুল ধরিতে নারে
ধরিবারে ঢেউ ছুটায় তারে ॥১৮৩

*৩ যে দুর্ভাগার মাটিতে বাসা ভেঙেছে,
উচ্চ করি সে আকাশে আশা গাঁথিছে ॥১৮৭

আ দ র্শ

*বর্ষণগৌরব তার গিয়েছে চুকি,
রিক্ত মেঘ দিক্‌প্রান্তে মারিছে উঁকি ॥১৫৬

*৪ অপরাজিতা ফুটিল লতিকার গর্ব নাহি ধরে
যেন আকাশের আপন অক্ষরে লিপিকা পেয়েছে ॥১০

আ দ র্শ

*যখন গগনতলে আঁধারের দ্বার গেল খুলি
সোনার সংগীতে উষা চয়ন করিল ফুলগুলি ॥ ১৯৯

৫ রংমশালীর দলে ভিড় করেছে
তারা কেউ বা জলে, কেউ বা স্থলে।
অজানা দেশ, রাত্রিদিনে
পায়ের কাছের পথটি চিনে (ভুল নয়)
তারা দুঃসাহসে এগিয়ে চলে।

গ

১ ঢাক বাজনা গোড়াতেই,
তার কাজ না কাজ করা।

আ দ র্শ

শকতিহীনের দাপনি
আপনারে মারে আপনি।

২ তোমার হাসিতে আমারে আপনমাঝে জাগালো,
মোর স্বপনের সুরেতে পায়ের নূপুর বাজে।

৩ যাহা কিছু কাঙালের মতো পাস
তাহারে পেয়ে হারাস।
যাহা সব চেয়ে চাবার তাহারে
চেয়ে চেয়ে ফিরিস না।

৪ যে কথা কোনোদিন আর আমার
বলা হয় নি
তাই কারে বলিবারে নাহি জানে
উতলা করে।

*৫ মোর কুঞ্জতলে অনেক মালা গেঁথেছি,
সকাল বেলার অতিথিরা গলে পরল।
কে আজ ঐ সন্ধ্যেবেলায় ডালা আনলো গো
হায় জীর্ণ পাতায় কি শুকনো মালা গাঁথব ॥৬

ঘ

১ কুসুম ফুটেছে নিশীথে শেফালি-বনে,
গন্ধে কখন ভরিল বাতাসের ঘুম।

২ উন্মত্ত প্লাবনে ছুটিয়া চলে তটিনী।
ঝরে অজস্র বর্ষণ অশ্রান্ত শ্রাবণে ॥

আদর্শ

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন
সকল ক্ষীণতা মোর করহ ছেদন।[১]

৩ দুটি কিশোরী বালিকা ফুল নিয়ে
সুখে বকুলতলে মালা গাঁথে।

আদর্শ

অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।[২]

৪ আকাশতলে চলে ভাসিয়া
তপন তারকা শশী।

আদর্শ

নীরবে কেন আঁচলে হেন
নয়ন আছে আবরি।

৫ শতদল দুলিছে সুনীল সরোবরে
নিষেধে পলে পলে মধুকরে ক্ষোভিছে।

আদর্শ

হৃদয় আজি মম কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।[৩]

---

১ নৈবেদ্য, ৯১-সংখ্যক কবিতা।

২ বিহারীলাল : বঙ্গসুন্দরী ৩।১।

৩ প্রভাতসংগীত : প্রভাত-উৎসব।

৬ মোর জীবন-অঙ্গনে একা
একদা দাঁড়াইল অতিথি।
আমার বাতায়নে চাহিয়া
বাহু শূন্য পানে বাড়াইল।

আ দ র্শ

তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।[৪]

৭ হয়েছে মোদের ঘরে দীপজ্বালা
হৃদয়ে বাঁশির ধ্বনি এসে লাগে।

আ দ র্শ

বিদায়পথে কে দেয় মোরে বাধা
পিছন হতে করুণ অনুনয়ে।

৮ মুখের পানে যেমনি তার চাওয়া
উতলা হাওয়া প্রদীপ নিবাইল।

আ দ র্শ

বলিতে গিয়ে কথা নীরবে কাঁদে
চলিতে পায়ে পায়ে চরণ বাধে।

৯ নবীন ফুলে আজি ঐ কে
সাজি সকালবেলা সাজায়
পেতে আঁচলখানি বনের ছায়ে।

গাছের পাতা যেমন কাঁপে
দখিন বায়ে মধুর তাপে
তেমনি মম কাঁপিছে সারা প্রাণ।

১০ তুমি আঁধারে প্রদীপ জ্বেলে
আজি দেখিতে এলে কাহারে,
সে তার ভাবনা মেলে আছে
সুদূর গগনে।

৪ স্মরণ : ১৩-সংখ্যক কবিতা।

আ দ র্শ

বিহানবেলা আঙিনাতলে
এসেছ তুমি কি খেলা-ছলে,
চরণ-দুটি চলিতে ছুটি
পড়িছে ভাঙিয়া।[১]

ঙ. সহজ

১ জলে নয়ন ভাসিয়া যায়
পলে পলে ফিরিয়া তাকায়।

আ দ র্শ

কাননপথের পাশে পাশে
শিশির ঝলিছে ঘাসে ঘাসে।

২ দেবালয়ে সাঁঝবেলা
সে ভয়ে ভয়ে চলিছে।

আ দ র্শ

মেয়েরা নাহিছে ঘাটে
ছেলেরা সাঁতার কাটে।

৩ কেহ মা-হারা ছেলেকে
যদিবা স্নেহ না করে
আনন্দমনে তবু সে খেলে।

আ দ র্শ

হই দুঃখী হই দীন
কাহারো রাখি না ঋণ
কারো কাছে পাতি নাই হাত।[২]

'ছন্দ-ধাঁধা'-পরিচয় এই সংখ্যার অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

১ শিশু : খেলা।
২ শিশু : পূজার সাজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

সুহৃদ্বর,

আমি বিপন্ন, আমাকে দয়া করবেন। সম্প্রতি কয়েকবার পরধর্ম্ম ভয়াবহ আমাকে আক্রমণ করেছিল। হার মানতে হয়েছিল, পাব্লিক সভার মঞ্চে চড়েছি, সেই কর্ম্মফলের বোঝা কাঁধ থেকে নামতে চায় না, কিন্তু আমার কাঁধ সে জন্য তৈরী হয় নি। এতে আমার স্বভাবকে পীড়িত করে, দেহমন ক্লিষ্ট হয়, নিজের কাজের ক্ষতি ঘটে। হাতে সময় আর অধিক নেই, অথচ একদা যে কর্ত্তব্যের দায় গ্রহণ করেছি —শক্তি যত কমছে তার ভার তত বেড়ে উঠছে। · · দুরূহ কর্ত্তব্য দুর্গম পথ বেয়েই বহন করে চলতে হচ্ছে— সম্প্রতি · · নিঃসহায়তা বিপুল প্রবল হয়ে আমার পথরোধ করেছে। অন্য কিছুতে মন দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব— দিলেও তার ক্লান্তি ও ক্ষতি দূর করতে সময় লাগে। তাই সবিনয়ে ক্ষমা চাচ্চি। স্বদেশের কাছে · · শুধু বিশ্রাম চাই। মাঝে মাঝে আপনাদের আমন্ত্রণ অস্বীকার করতে যদি বাধ্য হই সেটাকে আমার অসৌজন্য বলে গণ্য করবেন না— তাতে আমার নিরতিশয় অক্ষমতারই প্রমাণ হয়, সেই অস্বীকৃতিকে আপনারা করুণার সঙ্গেই গ্রহণ করবেন। ইতি ৮ মার্চ্চ, ১৯৩৪

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিধানচন্দ্র রায়ের পত্র

36, WELLINGTON STREET
CALCUTTA
৩ মার্চ্চ, ১৯৩৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আগামী ২৩ মার্চ্চ All Bengal Tuberculosis Association -এর বার্ষিক অধিবেশন হইবেক, আমি উক্ত কমিটীর চেয়ারম্যান, এ যাবত এইরূপ বার্ষিক অধিবেশনে গবর্নরগণই সভানেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে আমার একান্ত ইচ্ছা এই প্রথার পরিবর্ত্তন হয়। কেননা এই নিদারুণ রোগ দিন২ যেরূপ প্রবলভাবে বিস্তৃত হইতেছে তাহাতে ইহার প্রতিরোধকল্পে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া অতীব প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। টাউন হলে আপনার নেতৃত্বে উক্ত সভা হইলে বহু লোক সভায় যোগদান করিবেক এবং সভার কার্য্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি ও সহানুভূতির উদ্রেক হইবেক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তজ্জন্য আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যদ্যপি বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে আপনি উক্ত দিবসে কৃপা করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন। নিবেদন ইতি

ভবদীয়

শ্রীবিধানচন্দ্র রায়

Dr. Rabindra Nath Tagore
Bolpore

শুভযাত্রা

ক্ষিতিমোহন সেন

ভারতীয় চিত্রকরেরা পদ্মপত্রদ্বয়ের মধ্যস্থিত একটি পদ্মকোরক অঙ্কিত করিয়া জীবনের পরিচয় দিয়া থাকেন। অসীম সমুদ্র ভেদ করিয়া সীমা একটি জলবিম্বস্বরূপ উত্থিত হইয়াছে, ইহাই তাঁহাদের পরিকল্পনা। অনন্ত বারিধি-বক্ষে জলবিম্ব্ যেমন কোনো অতল হ্রদয় হইতে ভাসিয়া আবার কোনো নিভৃততম প্রদেশে নিমজ্জিত হয়, মানুষের জীবনও তেমনই কোনো অজ্ঞাত রাজ্য হইতে এই দৃশ্যমান জগতে স্বপ্রকাশ হইয়া আবার কোনো রহস্যময় জগৎ-মন্দিরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রাচ্য শিল্পীদের এই মহতী কল্পনা, তাঁহাদের এই অদ্ভুত উদ্ভাবনা সকল জাতি, সকল সাম্প্রদায়িকেরাই গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের দেশের ধর্মপ্রাণ সাধনপরায়ণ শিল্পীদিগের যশোলব্ধ হস্ত যত মঠে মন্দিরে কীর্তি ও গৌরবের রেখা রাখিয়া গিয়াছে তৎসমুদয় ক্ষেত্রেই তাঁহারা মন্দিরচূড়ায় একটি লৌহদণ্ডে বুদ্বুদাকৃতি গোলক নির্মাণ করিয়াছেন। মুসলমানদিগের মসজিদে, খ্রীষ্টানদিগের গির্জাতেও তদ্রূপ বৃহদাকৃতি গম্বুজ বিদ্যমান দেখিতে পাই। ইহারা যেন বৈরাগ্যের ধ্বজা উড়াইয়া আমাদিগকে বলিতেছে 'হে জীব, তোমাদের এ জগতের অস্তিত্ব সমুদ্রবক্ষের বুদ্বুদেরই মত ক্ষণস্থায়ী। অসীম হইতে আসিয়াছ, আবার অসীমেই বিলীন হইয়া যাইবে। বৃথা আর কালক্ষেপ করিও না, এই অনিত্য সংসারের মায়া-মোহে আর জড়িত হইও না। যাহা নিত্য যাহা চিরন্তন তাহার দিকে ধাবিত হও।' এই জীবনের অনুধাবন সকল দেশের লোকেরা একই ভাবে করিয়াছেন। আমরা সকলে এইটুকুই মাত্র পরিজ্ঞাত আছি—এক রহস্যময় জগৎ হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া আবার এক রহস্যময় জগতে প্রবেশ করিব। 'ফ্রম দি গ্রেট ডীপ টু দি গ্রেট ডীপ হি গোজ্।' মানুষের সমস্ত জ্ঞান সমস্ত বুদ্ধি ইহার অধিক অন্য রহস্য উদ্ঘাটন করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, 'দি ট্রুথ ইজ টু মি অ্যাণ্ড দ্যাট টু ইউ'।

বা ঘরকী সুধ কোঈন বতাবে
জা ঘরসে জীব আয়া হো।

যে ঘর হইতে জীব আসিয়াছে সে ঘরের সন্ধান কেহই বলে না। আমরা শুধু এইটুকুই জানি, অসীম হইতে উঠিয়াছি আবার অসীমেই মিলিব। আমরা তাহারই এক-একটি খণ্ড। অসীম পয়োধি-রাশিরই বুদ্বুদ একটা ক্ষুদ্রাংশ

দরিয়া কি লহর দরিয়ার হৈ জী
দরিয়া ঔর লহর মে ভিন্ন কোয়ম্।

নদী এবং নদীর তরঙ্গ একই ; নদী এবং তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

জলতরঙ্গ জিয়ি জলতে উপতো
ফিরজল মাঁহি রহাঈ

জলের তরঙ্গ জলেই উৎপন্ন হইয়া জলেই থাকিয়া যায়।

সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের উত্থান ও পতন তাহার নর্তনকে যেমন অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে জন্ম ও মৃত্যু তেমনই পরস্পর বিধৃতিসূত্রে গ্রথিত হইয়া ব্রহ্মের এই অনন্ত খেলাকে অনাদি সৃষ্টিকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা
যেমন চলার অঙ্গ পা তোলা পা ফেলা।

বৈদিক প্রথায় নানা বেদী রচনায় কয়েকটি মাত্র রেখাঙ্কনে জন্ম ও মৃত্যু চিহ্নিত হইয়া থাকে। পরস্পর পরস্পরকে দ্বিধাবিভক্ত দুইটি সরল রেখা তাহাদের তীরফলকের অথবা বৃক্ষপত্রের সমগ্র উপরিভাগের ন্যায় অগ্রভাগ যেন বুঝাইয়া দিতেছে, নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু তালে তালে।

শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন-চক্রেও আমরা দেখিতেছি স্বয়ং তিনি এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র চালনা করিতেছেন।

বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়াই বিশ্বের এই অপূর্ব নৃত্য চলিতেছে। মহাদেবের ত্রিশূলেও আমরা রাগ ও বৈরাগ্যের জন্ম ও মৃত্যুর ভৈরব সংগীত শুনিতে পাই। যিশুখ্রীষ্টের ক্রুশেও এই জন্ম-মৃত্যুর তাল বাজিতেছে। থিয়োসফিস্টরা একটি বৃত্তের অভ্যন্তরে একটি ত্রিভুজ অঙ্কিত করিয়া জন্ম ও মৃত্যুর ক্ষেত্র এই সংসারের প্রতিরূপ দিয়া থাকেন।

বিশ্বে বিরাট আরতি চলিতেছে— জগতের সিংহাসনে জগতের স্বামী বিরাজ করিতেছেন, ক্ষণ ও পলকের আরতি চলিতেছে, অনন্তের ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে, প্রেমের রাগ ও বৈরাগ্যে তাল বাজিতেছে, জন্ম ও মৃত্যুর তাল পড়িতেছে। জন্ম ও মৃত্যুর এখানে ভেদ নাই— জনম মরণ জহাঁ তারী পরত হৈ— যেখানে শেষ সেইখানেই আরম্ভ। শেষ না হইলে উদয় হইবে না, উদয় না হইলে শেষ হইবে না।

জনম মরণ বীচ দেখ অন্তর নহীঁ
ওর বাম যূঁ এক আহী।

জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে চাহিয়া দেখ, কোনো অন্তর নাই। দখিন ও বাম সে তো একই কথা।

ওগো মৃত্যু তুমি যদি হতে শূন্যময়
মুহূর্তে নিখিল তব হয়ে যেত লয়
তুমি পরিপূর্ণ রূপ,— তব বক্ষ কোলে
জগৎ শিশুর মতো নিত্যকাল দোলে।

আমাদের জন্মও এক বিরাট তীর্থযাত্রা। বিশ্বপিতার চরণতল হইতে আমাদের এই পুণ্যযাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত জীবন প্রদক্ষিণ করিয়া সংসারতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া বিশ্বদেবতার পূজার আয়োজন-উপচার সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছি। প্রতিদিনের কর্ম প্রতিদিনের সাধনা আমাদিগকে এই অনন্ত পথের পাথেয় জোগাইবে। নৈবেদ্য, অর্ঘ্য তীর্থসলিল পূজার উপকরণাদি সঞ্চয় করিয়াই তাঁহার কাছে পঁহুছিব। আমাদের বিলম্ব করিলে চলিবে না। তিনি আমাদের পূজা গ্রহণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। প্রতিদিনের কর্মে ও সাধনায় দেহ মন ও আত্মাকে নির্মল করিয়া তুলিতে হইবে। এই দেহকেই নৈবেদ্যস্বরূপ তাঁহাকে অর্পণ করিব, আত্মাতে তাহার অধিষ্ঠান হইবে, সমস্ত দেহমন ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা তাঁহাকে বরণ করিয়া লইব। আমারই হৃদয়সলিলে তিনি অবগাহন করিবেন— তাঁহার অভিষেক হইবে আমার অন্তরের পুণ্য প্রেমে।

তাঁহার সৃষ্টি অনাদি— আমাদের যাত্রাও অনাদি অনন্ত। এই যাত্রা জগতের পর জগতে চলিয়াছে। ব্রহ্মের দেহে জীবনের পর জীবন দিয়া আমরা সৃষ্টির মালা রচনা করিয়া চলিয়াছি। জন্ম ও মৃত্যু আমাদের গ্রন্থি। মহাতাপসদিগের মত জীবন-তপস্যাসূত্রে আমরা লোকলোকান্তরকে গ্রথিত করিয়া চলিয়াছি। আমাদের এক-একটি জীবন তপস্যামালার এক-একটি গুটিকা— জীবনসাধনার এই অক্ষগুটিকা দিয়া মালা

গ্রথিত করিয়া আমরা আমাদের আরাধ্য দেবতার গলায় পরাইয়া পূর্ণ প্রণতি করিয়া যাত্রা শেষ করিব। কবীর কহিয়াছেন

ব্যক্ত হী ফের সব ব্যক্ত পর ব্রহ্ম মেঁ
জ্ঞান কর দেখ মাল গোয়ম্।

জগতের মালাই ফিরাইতেছ, পরব্রহ্মের মধ্যে জগতের পর জগৎ মালার মত ফিরাইয়া চলিয়াছ, জ্ঞানচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ দেখ।

জন্মজন্মান্তর-পরিগ্রহ পাপের শাস্তি নহে। সে যে তাঁহারই পূজার উপচার সংগ্রহের পুণ্যযাত্রা। জীবনের কর্মে সাধনায় তপস্যায় আমার হৃদয়কে শতদলে প্রস্ফুটিত করিয়া, সেই আদি সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া ভ্রান্ত পথে বিচরণ করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি। সংসার ও কর্ম ভুল করিয়া চলিয়াছি। পরমপুরুষকে জানি না, জানিবার চেষ্টাও করি না, কর্ম কি গম্য কি জানি না। তাই তো আমাদের পথে বিঘ্ন ও বিলম্ব ঘটিতেছে অনেক। আমরা অন্তরের মন্দির হইতে সকল জালজঞ্জাল ধুলা মলিনতা মায়া মোহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার অধিষ্ঠানের উপযোগী করিয়া পূর্ণ করিয়া রাখিব। তবেই তো তিনি আমার হৃদয়মন্দিরে আসিবেন। এই ত্যাগের দ্বারাই তাঁহাকে পাইব। গঙ্গা ও যমুনার সংগমে সরস্বতী অদৃশ্য হইয়া আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। আমাদের হৃদয়েও যখন রাগ ও বৈরাগ্যের ধারার পূর্ণসংগম হইবে তখনই বিশ্বপতি আসিয়া আমাদের হৃদয়ে যুক্ত হইবেন। এই নির্মল ধারার আনন্দে যখন হৃদয়ে অমৃতরস সঞ্চারিত হইবে, তিনি যখন আমাদের হৃদয়ে অমৃতপ্লাবনে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তখন রাগ ও বৈরাগ্যের দ্বিধা ঘুচিয়া যাইবে, জন্ম ও মৃত্যুর পার্থক্যের অন্ত হইবে। কবীর গাহিয়াছেন

অধর আসন কিয়া অগম ডেরা
কহেঁ কবীর তহঁা ভর্ম ভাসৈ নহীঁ
জন্ম ঔর মরণকো মিটা ফেরা।

অসীমে করিয়াছি আসন, অগম্যে করিয়াছি ডেরা, সেখানে ভ্রম দেখাইয়া দিতে পারে না, জন্ম ও মৃত্যুর বিপর্যয় আজ মিটিয়াছে।

মানুষ দুর্বল, আনন্দের প্রাচুর্য কিম্বা দুঃখের আতিশয্য সহিয়া উঠিবার শক্তি তাহার নাই। তাহারা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে, ভয় ও আশঙ্কায় উৎপীড়িত ভবিষ্য সুখের আশায় উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিবে ইহাই তো স্বাভাবিক। লোকলোকান্তরে গমন তাঁহাদের কাছে একটা অজানার ঘরে অনিশ্চয় ভবনে পদার্পণ করা, তাহাদিগকে অনিশ্চিতের ভাবনা পীড়ন করিবে— দুর্জ্ঞেয় ভাবী অবস্থার বৈচিত্র্যে তাহারা আকুল হইয়া উঠিবেই। শর-সংযোজিত ধনু লক্ষ্যভেদের পর জ্যামুক্ত হইয়া যেন ভিন্নহৃদয় ছিন্নতন্ত্রী হইয়া পড়ে। একাগ্র তন্ময়ে ধনুকটি বেদনার ভিতর দিয়া তীর নির্গমন সহ্য করিতে পারিল না— বিদীর্ণহৃদয় হইয়া পড়িয়া রহিল। মানুষেরও দুর্বল হিয়া এই জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহের বেদনা কিম্বা আনন্দের আঘাত সহিয়া উঠিতে পারিবে কি? এই আশঙ্কায়ই তো আমরা মৃত্যু হইতে জন্মে, জন্ম হইতে মৃত্যুতে আসিয়া থাকি— অচেতনার ভিতর দিয়া। আমরা যখন এই ইহলোকে আসিলাম তখন আমরা নির্বোধ অজ্ঞান শিশু। আমাদের এই জীবনের প্রচুর আনন্দ ও পূর্ণ সৌন্দর্যের দিন ও সেই খেলাধুলার চেতনাবিহীন শৈশবকাল, আমাদের বুদ্ধি ও চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, আমরা সেই আনন্দ ও সৌন্দর্যের স্মৃতি ভুলিতে থাকি। আবার যখন আমরা

ধীরে ধীরে জীবনের সন্ধ্যায় মৃত্যুর মন্দিরের দিকে অগ্রসর হই, তখনও আবার আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি, চেতনা ও স্মৃতি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। সর্বশেষ আমরা যখন এই লোক হইতে পরলোকে মহাপ্রস্থান করিয়া থাকি, তখনও আমরা সম্পূর্ণ চেতনা ও জ্ঞান -বিলুপ্ত। আমরা এক চিরাভ্যস্ত গৃহ হইতে কোন্ এক বিচিত্র গৃহে গমন করিব, তাহার নূতনত্বের বৈচিত্র্য আমাদিগকে বিস্ময়ে ও আশ্চর্যে সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে পারে। আমাদের এই জ্ঞান ও বোধের পূর্ণবিকাশের সময় হয়তো আমরা অবস্থাবিনিময়ের বেদনা বা আনন্দের সংঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া ঐ ধনুকটির মত ছিন্ন-গুণ ভিন্ন-হিয়া মূর্ছিত-চেতন হইয়া পড়িব।

আমরা যাত্রা করিয়াছি। জীবনের পর জীবন অতিক্রম করিয়া জগতের পর জগতে চলিয়াছি। আমাদের এই মহাযাত্রার এক-একটি অধ্যায়ের আরম্ভে ও শেষে তাই চেতনাবিলুপ্তি। এই যে ভ্রূণ, তাহারও ইতিহাস কি বিচিত্র। সেও কোন্ অনাদিকাল হইতে যাত্রা করিয়া চলিয়াছে কে বলিবে? সেও জীবনের পর জীবনে চলিয়া, অবস্থার পর অবস্থান্তরে গমন করিয়া অনাদি অনন্তের গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। এখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ যাহা কিছু আছে সকলেই আমরা একই পথের যাত্রী— সকলেই অনাদি সৃষ্টির গান গাহিতে চলিয়াছি। তিনি সিংহাসনে বসিয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমরা না যাইলে তো তাঁহার চলিবে না— তিনি পূর্ণ হইবেন না। এখানে যাহা, ওখানেও তাহাই, যাহা ওখানে তাহাই এখানে। এই উভয়ের মিলন হইবে তবেই তো সকল পূর্ণ হইয়া উঠিবে। মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে পূর্ণ প্রকাশিছে।

আমরা জীবনের নৌকাটিকে দাঁড় টানিয়া সমুদ্রের দিকে বাহিয়া চলিয়াছি। আমাদের এই সুদীর্ঘ যাত্রার পথে বাধা বিপত্তি অনেক। কত ঘূর্ণাবর্ত, কত বিরুদ্ধ বায়ুস্রোত, প্রতিকূল তরঙ্গাভিঘাত আমাদের পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইবে। কত ক্ষুদ্র স্বার্থের বিক্ষিপ্ততায় কত প্রলোভনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব। এই সকল প্রতিরোধিতার হাত হইতে একাগ্র সাধনায়, একনিষ্ঠ মনের তন্ময় চিত্তের দ্বারাই আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। শরবৎ তন্ময় ভবেৎ— এই শরের ন্যায়ই তন্ময় হইতে হইবে।

নদী তাহার দুই তটকে সেবা করিয়া স্নিগ্ধ সজল রাখিয়া, পূর্ণ প্রণতি দিয়া সাগরের পানে ছুটিয়াছে। তাহার এই সেবাপরায়ণতা, তাহার এই পূর্ণ প্রেমের প্রণতি, তাহার এই পরিপূর্ণ প্রেমের দান অসীমের বক্ষে অধিষ্ঠানের পাথেয়, অর্ঘ্য, দাবি। যে স্রোতস্বিনী পথের মধ্যে নানা বিক্ষিপ্ততায় নিজেকে নিমজ্জিত করে, অসংযত উচ্ছ্বাসে চঞ্চল, অধীরতায় কূল ছাপাইয়া তীরভূমিকে জলপ্লাবিত করে তাহার সাগরে পৌঁছানো হয় বিলম্বে। আমাদিগকে নিয়মের বাঁধনে সংযমের শাসনে প্রতিদিনের কর্ম করিয়া দাঁড় টানিয়া চলিতে হইবে। প্রতিদিন কর্ম-অবসানে দৈনিক কাজের হিসাবনিকাশের। সময় যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি— যাহা হইতে সূর্য উদিত হন ও যাহাতে অস্ত যান, তাহাকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া বলিব ত্বং হি নঃ পিতা— তুমি আমাদের পিতা— যো ঽস্মাকম্ অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি। তুমি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপার উত্তীর্ণ করাইয়া দিতেছ। আবার যখন সূর্য, তাহার ভয়ে তাপ প্রদান করিবেন— 'ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ' তখন প্রভো,তুমি প্রকাশ পাইতেছ বলিয়া সমস্ত প্রকাশ পাইতেছে—তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্।

তোমাকে স্মরণ করিয়াই অদ্যকার যাত্রা আরম্ভ করিলাম। তাহাকে এই নিবেদন করিয়া পরিপূর্ণ একটি নমস্কার করিয়া তরণী বাহিয়া চলিব।

আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু এখন ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক ফিরব না গো আর
তোমারে করি নমস্কার।

তবেই আমাদের যাত্রা সফল হইয়া উঠিবে, সার্থক হইবে, সত্য হইবে। তাঁহার এই ব্রহ্মতেজ দ্বারা বিশুদ্ধ হইলে, অগ্নিতে যেমন তৃণ ভস্মীভূত হইয়া যায়, তেমনই ভয় বিঘ্ন বাধাবিপত্তি সকলই বিনষ্ট হইবে। আমাদের পথ সহজ সরল হইয়া উঠিবে।

সমুদ্রগামিনী নদী তাহার একনিষ্ঠ প্রেমের দ্বারা বহিতে বহিতে সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়। তখন তাহার নাম ও রূপ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া সমুদ্র বলিয়াই অভিহিত হইতে থাকে। আমরাও তেমনি প্রেমে ও নিষ্ঠায়, সাধনা ও সংযমে সেই শুক্রম্ অকায়ম্ অব্রণম্ অস্নাবিরম্, শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্‌কে জানিয়া সেই পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইব— সীমা অসীমের ভিতর পরিপূর্ণরূপে গিয়া লাগিবে, তখন আমাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া সেই পুরুষ নামেই অভিহিত হইবে।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপ বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎপরম্, পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

প্রবহমান নদীসমূহ যেমন নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্তগত হয়, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেইরূপ নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষের নিকট গমন করেন।

আমি যাত্রা করিয়াছি— আমার দেবতা আমার জন্য সতৃষ্ণ প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রিয়তমের সঙ্গে আমার মিলন চাই। পিতার ঘর আর ভালো লাগে না, তাঁহার সহিত হোরি খেলিতে হইবে। আমি ক্ষুদ্র কিন্তু

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা।

এই রসের খেলায়, এই প্রেমের লীলাক্ষেত্রে আমার মূল্য তো সামান্য নহে। তিনি যে আমার স্বামী, আমি যে তার একমাত্র পত্নী— আমা-বিহনে তাঁহার প্রেমের খেলা চলিবে না। আমি তাঁহার একমাত্র নিমন্ত্রিত, একমাত্র উপাস্য। তিনি যে আমাতে 'বান্ধা' আমাকেই ভোগ করিবেন, আমার হৃদয়রস পান করিয়াই তাঁহার প্রেমের তৃষা মিটিবে। তিনি আমারই হৃদ্‌কমলের লোভী ভ্রমর। আমাকে লইয়াই তাহার লীলা পূর্ণ, সৃষ্টি পূর্ণ, তিনি পূর্ণ। যদি তিনি তাহাতেই পূর্ণ থাকিতেন, তবে আমার প্রয়োজন ছিল না— সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না।

আমার যে এত বড় স্বামী— তিনিও আমারই জন্য বাসরঘরে উদ্‌বিগ্ন হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, দিবারাত্রি জাগিয়া রহিয়াছেন। আমি কি আর স্থির থাকিতে পারি। আমাকে ত্বরা করিতে হইবে। উৎকণ্ঠা ও আবেগে তাড়িত হইয়া তিনি যে আমার অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে।

তাঁহার অনন্তস্বরূপে তিনি তো আমার নিকট আসিতে পারেন না। তাই তিনি বিশেষরূপে আমার নিকট প্রকাশিত হইতেছেন। তাঁহার নানা লীলায় নানারূপে আমি তাহাকে পাইয়া ধন্য হইতেছি। সংসারের অন্ত প্রেমে, অন্ত স্নেহে, তিনি তাঁহার অপার করুণা অনন্ত প্রেম প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে পুষ্ট রাখিতেছেন। তিনিই পিতামাতার স্নেহে, ভ্রাতা ভগ্নীর ভালোবাসায়, পত্নীর প্রেমে, বন্ধুর সৌহার্দে অভিব্যক্ত হইয়া পড়িতেছেন।

আমরা লোকে লোকে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার দিকে যাত্রা করিতেছি। তিনিও আবার কালে কালে আমার হস্তে নব নব প্রসাদ বিতরণ করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন। নব নব ঋতুতে সবুজ প্রাণশক্তিতে নব নব পুষ্পপত্ররাশির অর্ঘ্য সাজাইয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার ব্যাকুলতা জানাইতেছেন। এই যে বিশ্বে আনন্দের একটি অপূর্ব সংগীত শ্রুত হইতেছে, বিরাট আরতি চলিয়াছে, অযুত নক্ষত্রশোভিত আকাশ-চন্দ্রাতপ দীপ্তি পাইতেছে, প্রচ্ছন্ন পতাকা উপলব্ধ হইতেছে, প্রচ্ছন্ন ঘণ্টার নিনাদ আসিতেছে, সমস্ত ব্যোমমণ্ডল ধ্বনিত হইতেছে, সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহার জ্যোতি প্রেমের দীপক হইয়া জ্বলিতেছে, বায়ুমণ্ডল ধূপ বিকিরণ করিতেছে, সমস্ত মহীতল গন্ধ প্রদান করিতেছে, সমগ্র পয়োধি অর্ঘবারি হইয়া রহিয়াছে, সমগ্র পৃথিবী ভরিয়া নিরন্তর পুষ্পকুল প্রস্ফুটিত হইয়া বরণের ডালা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে— ইহাই আমারই স্বামীর মন্দিরে আমারই অভ্যর্থনার আয়োজন— আমাদেরই মিলনের অপূর্ব রাগিণী।

১৯১১ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের প্রথম অধিবেশনের উদ্‌বোধনী ভাষণ।

আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত সংগীত

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

আইন-ই-আকবরীর সংগীতাধ্যায় পরিসরে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সংকলনটি মূল্যবান। বস্তুতঃ সামান্য কয়েকটি পৃষ্ঠায় উত্তর-ভারতীয় সংগীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। আবুল ফজলের অসামান্য সম্পাদনকৌশলে তথ্যগুলি ঐতিহাসিক বিন্যাসে রক্ষিত হয়েছে। সংস্কৃত সংগীত -সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয় ফার্সী সংগীত -সাহিত্যের প্রভেদ বিষয়বস্তুর বিন্যাস এবং বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে ঐতিহাসিক ক্রম সম্বন্ধে সচেতনতা স্বল্প, কিন্তু ফার্সী সাহিত্যে এই দিকে বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণনার বহুল্য থেকে মূল বস্তুটিকে উদ্ধার করতে অনেক সময় ক্লেশ পেতে হয়, ফার্সী সাহিত্যে বর্ণনা সহজ ও সুবোধ্য। ফার্সী লেখকগণ প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় উক্তি করেছেন, কিন্তু বক্তব্য বিষয়টি যাতে সুপরিস্ফুট হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ রেখেছেন। ফার্সীতে রচিত সংগীতবিষয়ক গ্রন্থাদির আর-একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিমিতিবোধ। বর্ণনীয় বিষয় সম্বন্ধে কতটুকু বলা দরকার সেটি তাঁরা চমৎকার বুঝতেন। এই কারণে ফার্সী গ্রন্থগুলি ইতিহাস ও তথ্যের দিক দিয়ে আমাদের বিশেষ সহায়তায় এসেছে।

আইন-ই-আকবরীর একাধিক ইংরেজী অনুবাদ বর্তমান। এর মধ্যে H. S. Jarret -এর অনুবাদটি যদুনাথ সরকার মহাশয় সম্পাদন করে গিয়েছেন। এই অনুবাদ থেকে বিষয়বস্তু অনায়াসেই বোঝা যায়; তা ছাড়া পাদটীকায় অনেক শব্দের স্পষ্টতর ব্যাখ্যাও সিন্নিবিষ্ট হয়েছে। তথাপি, তথ্যান্বেষী ব্যক্তি এমন কতকগুলি অভাব বোধ করেন যা একমাত্র মূল গ্রন্থই পূরণ করতে পারে। এমন বহু শব্দ আছে যার যথাযথ ব্যাখ্যা সাংগীতিক দিক থেকে বিশেষ পর্যালোচনা না করলে দেওয়া সম্ভব নয়। এইগুলি নির্ধারণ করে পুনর্বার এই গ্রন্থের মূল্যায়ন প্রয়োজন— এ কথা বোধ করি বলাই বাহুল্য।

আবুল ফজল সংগীত সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটি প্রধানত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছ থেকে আহরণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সমসাময়িক অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও তাঁকে সাহায্য করেছেন। এই অধ্যায়ের তথ্যাদি তিনি সাজিয়েছেন এবং সম্পাদন তিনি করেছেন।

আবুল ফজল এই অধ্যায়ের নাম দিয়েছেম 'সংগীত'। সংগীত-শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণে তিনি বলেছেন— সংগীত হচ্ছে বিভিন্ন নাঘ্‌মা (গীত), সাজ্‌ (বাদ্য) ও রক্‌স্‌ (নৃত্য) এবং এতদ্ব্যতীত এই-জাতীয় অপরাপর বিষয় সম্পর্কীয় বিদ্যা। আমাদের তৌর্যত্রিক শব্দকে ফার্সী ভাষায় এইভাবে বোঝানো হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেছেন যে এতদুদ্দেশ্যে সাতটি অধ্যায় পরিকল্পিত হয়েছে। প্রথমে স্বর-অধ্যায়, অর্থাৎ 'আওয়াজ' সম্পর্কীয় তত্ত্ব; স্বর অর্থে 'আওয়াজ' শব্দটি যথাযথ এবং আজ পর্যন্ত গায়ন-সম্প্রদায়ে এই শব্দটিই প্রচলিত আছে। এটি দুই প্রকার: অনাহত— এমন-একটি আওয়াজ যা কারণ দ্বারা ঘটে না; এটি এক এবং শাশ্বত (কদীম্‌) বলে পরিজ্ঞাত। কোনও ব্যক্তি যখন আঙুল দিয়ে দুটি কান বন্ধ করে তখন ভিতরে একটি ধ্বনি শুনতে পায়। এই কারণেই এর অনাহত নাম দেওয়া হয়েছে। এটি ব্রহ্মাসম্ভূত বলে ধারণা। এর পরিচয় যখন অভ্যাসের দ্বারা পাওয়া যায় এবং বিনা মধ্যস্থতায় এটি শ্রুত হয় তখন মুক্তি হয়ে থাকে। কোনও

قسم چهارم • شهنا - بفارسي سرنا گويند • مُشک - دو ني پارهٔ كه بقاعدهٔ سوراخها دارد بدو پيوندند • و در فارسي زبان نيِ انبان گويند • مُرلي (بضمّ ميم و سكونِ را و كسرِ لام و سكونِ ياي تحتاني) نيِ آسا • اَپنگ (بضمّ همزه و فتحِ باي فارسي و نونِ خفي و سكونِ كاف) نئي است ميانه خالي بدرازاي يک گز و ميانهٔ آن بالا سوراخي كنند و دران باريک ني برگذارند •

هفتم نرتيااوهيناي (بكسرِ نون و سكونِ را و كسرِ تاي فوقاني و ياي تحتاني و الف) در چندي و چگونگيِ رقص •

• شمارهٔ نغمه‌سرايان •

چون لختي نغمه و سازگذارش يافت اندكے از گروهِ خوانندگان مي‌سرايد • سرايندگان نقشِ قديم را كه در هيچ بومے دگرگون نشود بيكار گويند (بفتحِ با و سكونِ ياي تحتاني و كاف و الف و را) • آموزندگانِ اين طرز را سهكار خوانند (بفتحِ سين و سكونِ ها و كاف و الف و را) •

كلاونت (بفتحِ كاف و لام و الف و فتحِ همزه و نونِ خفي و تاي فوقاني) - زبان‌زدِ روزگار بجاي همزه واو بيشتر • دهرپد سرايند •

ڈهاڈهي (بفتحِ دالِ هندي و هاي خفي و الف و كسرِ دالِ هندي و هاي خفي و سكونِ ياي تحتاني) نغمه‌سازانِ پنجاب • سازِ ڈهڈه و كنگره را نوازند - بيشترے در رزمگاه ستايشِ رادِ مردان گويند و عرصهٔ پيكار را گرمي ديگر بخشند • قوّال ازين گروه اند ليكن بيشتر طرزِ دهلي و جونپور سرايند • بدان روش فارسي شعر خوانند •

هُركيه (بضمّ ها و سكونِ را و كسرِ كاف و فتحِ ياي تحتاني و هاي مكتوب) • مردانِ سازِ هرک كه آوج گويند نوازند و زنان تال نگاه دارند • و خنياگري نيز نمايند • در باستان سازِ كرنه سرايندے و اكنون دهرپد و مانند آن • بسيارے زنانِ اين گروه‌را نكوروئي پيرايهٔ هنرپردازي گردد •

دف‌زن • بيشتر زنان ڈهاڈهي دف و دهل نوازند و دهرپد و سوهله كه براي كدخدائي و تولّد نقش بلدند بآئينِ شايسته خوانند • بيشتر در محاملِ عورات حاضرشدے و امروز در مجالسِ مردان نغمه‌سرائي كنند •

سيزده‌تالي • مردانِ ايشان دفهاي بزرگ با خود دارند و زنان سيزده تال بيكبا زدن بآوا درآرند - دو بربندِ هر دو دست و دو بر بندِ آرنج و دو بر بندِ كتف و دو بر بندِ هر دو شانه و يكے بر سينه و دو در بانگشتانِ دو دست • بيشتر در ديارِ گجرات و مالوه باشند •

---

(۱) [ت] چنگ ؟ !!

আইন-ই-আকবরীর একটি পৃষ্ঠা

কারণ সহযোগে একটি আওয়াজের উৎপত্তি হলে তাকে আহত বলে। বাক্যের মত এটিও বায়ুপ্রেরিত ঘটনা বলে অনুমান করা হয় এবং আঘাতজনিত কার্য থেকে এর অভ্যুদয়। এই রকম ধারণা আছে যে নিম্নজঠর (শিকম্), গলা (গলু) এবং মস্তিষ্কের শীর্ষ (তারক্)—এই অঙ্গগুলিতে ভগবৎপ্রভাবে বাইশটি নাড়ি (রগ্) বিস্তৃত রয়েছে। নাভিদেশ থেকে মনোহর গতিতে বায়ুপ্রবাহ উত্থিত হয় এবং এর বিস্তারগত প্রকৃতির আধিক্য বা মন্থরতা অনুসারে এই আওয়াজ জাগ্রত হয়। কথিত আছে যে, পঞ্চম ষষ্ঠ অষ্টাদশ ও উনবিংশ—এই চারিটি নাড়িতে বায়ুপ্রবাহ পৌছয় না। বাকি আঠারোটিতে যে আওয়াজ জাগ্রত হয় তাকে সাত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বিভাগটি এইরূপ—

ষড়্জ—ময়ূরের আওয়াজ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, চতুর্থ নাড়ি থেকে এর অভ্যুদয়। ঋষভ (আবুল ফজল একে 'রিঘ্‌বে' অর্থাৎ রেখাব বলেছেন)—পাপিয়ার আওয়াজে সূচিত হয়, সপ্তম থেকে দশম নাড়ি পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। গান্ধার—পুং-ছাগের আওয়াজ থেকে গৃহীত, নবম থেকে ত্রয়োদশতম নাড়ি পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। মধ্যম—সারসের (কুলংগ্) শব্দ থেকে এটি পরিচিত হয়েছে, ত্রয়োদশতম থেকে ষোড়শতম নাড়ি পর্যন্ত এর গতি। পঞ্চম—কোয়েলের সুরেলা কণ্ঠ থেকে গৃহীত; এই কথাটি 'জম্‌জমা-ই-কোয়েল' এই ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে, 'জম্‌জমা' শব্দটি আমাদের সংগীতে টপ্পার দানাদার তান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, আসলে জম্‌জমা (zamzama) শব্দের অর্থ স্বর করে পড়া; ইংরেজিতে যাকে chant বলে সেই রকম। জম্‌জমা-পর্‌দাজ্, জম্‌জমা-সন্‌জ্ জম্‌জমা-গুইয়ান্, জম্‌জমানাক্—এইসব শব্দে গায়ক বোঝায়, এটি সপ্তদশ নাড়ি পর্যন্ত অধিকার করে আছে। ধৈবত—ভেকের আওয়াজ থেকে গৃহীত, মুদ্রিত গ্রন্থে রয়েছে অষ্টম (হশ্‌তম্) থেকে দ্বাবিংশতিতম নাড়ি পর্যন্ত এর গতি। এই অষ্টমটি হয় মুদ্রণপ্রমাদ নতুবা লিপিকারের ভ্রম। কেননা ইতিপূর্বেই সপ্তদশ নাড়ির উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বিংশ থেকে দ্বাবিংশ হলে হয়ত সংগত হত। নিষাদ (নিখাদ)—হাতির আওয়াজ থেকে পরিকল্পিত, দ্বাবিংশ থেকে পরবর্তী মণ্ডলীর তৃতীয় পর্যন্ত বিস্তৃত, প্রতিটি সপ্তক পর পর তিনটি পর্যায় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। অবশ্য এই তিন সপ্তকের অবস্থিতির মধ্যে নিখাদ বাইশটির বেশি ব্যাপ্তি অধিকার করবে না।

এই বর্ণনায় শ্রুতির উল্লেখ নেই। অবশ্য বাইশটি নাড়ির শাস্ত্রীয় সমর্থন রয়েছে—

হৃদ্যূর্দ্ধনাড়িসংলগ্নানাড্যোদ্বাবিংশতির্মতাঃ।
তিরশ্চ্যস্তাস্থ তারত্যঃ শ্রুতয়ো মারুতাহতে॥
উচ্চোচ্চতরতাযুক্তা প্রভাবন্ত্যত্তরোত্তরম্।
এবং কণ্ঠে তথা শীর্ষে শ্রুতির্দ্বাবিংশতির্মতাঃ॥

—সংগীতরত্নাকর: স্বরাধ্যায়

বলা বাহুল্য সংক্ষেপ করবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতির মূল তত্ত্বটুকুই দেওয়া হয়েছে।

আবুল ফজল সপ্তক এবং রাগ—দুই অর্থেই 'নাঘ্‌মা' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। বস্তুত এই শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নাঘ্‌মা বলতে মিষ্ট স্বর, সুর-সহযোগে পাঠ, সুরলহরী, গীত, গমক প্রভৃতি অনেক কিছু সাংগীতিক প্রক্রিয়া বোঝায়। একপ্রকার গীতকেও নাঘ্‌মা বলা হয়। অতঃপর বলা হয়েছে যে প্রত্যেক সপ্তকে সাতটির প্রত্যেকটি স্বর থাকলে তাকে সম্পূর্ণ বলা হয়। যদি ছ'টি

থাকে তা হলে প্রধান স্বরটি অবশ্য প্রকাশিত থাকবে। একে খাড়ো (খাড়ব বা ষাড়ব) বলে। বিশেষজ্ঞেরা পাঁচটি স্বর থাকলে তাকে বলেন ঔড়ব (ঔড়ুব), এতেও প্রধান স্বরটি অবশ্য প্রকাশিত থাকবে। কোনো রাগে এর চেয়ে কম ব্যবস্থা থাকবে না। কিন্তু, তানের বেলায় এটি একটি বিশেষ প্রক্রিয়া হওয়াতে তুটি স্বরের সংযোগেও সম্পূর্ণ বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় রাগবিবেক অধ্যায়

রাগরাগিণী সম্বন্ধে আবুল ফজল বলছেন—দর্ রঙ্গারঙ্গ্ মোকাম ও সুবা; অর্থাৎ এরা নানাপ্রকার মোকাম ও সুবার অন্তর্গত। সাধারণ অর্থে মোকাম বলতে অবস্থান ও সুবা বলতে বিভাগ বোঝায়। এর অপর সাংগীতিক অর্থ আছে। পারসীক সংগীতে বারোটি মোকাম ও প্রত্যেকটি মোকামের তুটি সুবার অস্তিত্ব আছে। এই মোকাম আমাদের রাগ ও সুবা আমাদের রাগিণীর অনুরূপ। পরবর্তীকালে তুহ্‌ফাতুল্ হিন্দ্ গ্রন্থে (১৬৭৫) এটি স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে: এই কারণেই আবুল ফজল রাগ ও রাগিণীর প্রসঙ্গে মোকাম ও সুবার কথা বলেছেন। মহাদেব এবং পার্বতী থেকে এদের উৎপত্তি। মহাদেবের পঞ্চমুখ। প্রত্যেকটি থেকে একটি সুর (নাঘ্‌মা) আবির্ভূত হয়েছে। এর ধারাটি এইরকম: শ্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরোঁ, পঞ্চম, মেঘ ও পার্বতী কর্তৃক গীত নটনারায়ণ। এই ছটির প্রত্যেকটিকে হিন্দী ভাষায় রাগ বলা হয়। Jarret এই অংশের তর্জমা করেছেন— Each of these modes is called in Sanskrit *Raga*। এখানে হিন্দী না বলে সংস্কৃত বলবার কোনও কারণ দেখা যায় না। আবুল ফজল বলছেন—হর্ শশ্ নাঘ্‌মারা ব্-হিন্দী জবান্ রাগ গুয়েন্দ্। বস্তুত আকবরের সময়ে হিন্দী ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এটা এই উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয়। এই ছটি রাগই ঈশ্বরমত বলে পরিচিত। সংস্কৃত সংগীতদর্পণ গ্রন্থে এই মতের উল্লেখ আছে। এই রাগগুলিকেই মূল বলে গণনা করা হয়। এর যে-কোনোটির অনেকগুলি শাখা বর্তমান। শ্রীরাগকে সম্পূর্ণ বলে স্বীকার করা হয়। এতে ব্যবহৃত রেখাব অষ্টম নাড়িতে এবং পরবর্তী গান্ধার দশম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মধ্যম ত্রয়োদশ থেকে উৎপন্ন হবে। ধৈবত একবিংশ শ্রুতি পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। নিখাদ কেবল একটিতে ব্যাপ্ত থাকবে। এইরূপে সমুদয় প্রকারভেদেই নানারূপ পরিবর্তন হয়ে থাকে।

প্রথম অর্থাৎ শ্রীরাগের প্রকারভেদ —

মালবী, ত্রবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী ও বিহারী।

ঈশ্বর বা শিবমত অনুসারে মালবীর স্থানে মালশ্রী হবার কথা এবং বিহারী পাহাড়ী হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় বসন্তের প্রকারভেদ :—

দেশী, দেওগিরী, বরাটী, টোড়ী, ললিতা এবং হিন্দোলী।

তৃতীয় ভৈরোঁর প্রকারভেদ —

মধ্যমাদি, ভৈরবী, বঙ্গালী, বরাটিকা, সৈন্ধবী ও পুনর্জ্জেঁয়া (পুনর্গেয়া)।

ঈশ্বরমতের পরিবর্তে এখানে হনুমন্মত বর্ণনা করা হয়েছে। এই মত অনুসারে প্রতি রাগের সঙ্গে পাঁচটি রাগিণী যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে পুনর্জ্জেঁয়া (বা পাঠভেদে পুনর্গেয়া) একটি ভিন্ন রাগ হতে পারে না। এইটি ভ্রমক্রমে যোজিত হয়েছে। ঈশ্বরমতে এই প্রকারভেদটি এই রকম হবে—ভৈরবী, গুর্জরী, রামকিরী, গুণকিরী, বঙ্গালী এবং সৈন্ধবী।

চতুর্থ রাগপঞ্চমের প্রকারভেদ —

বিভাস, ভূপালী, কানরা বড়হংসিকা, মালশ্রী এবং পটমঞ্জরী।

ঈশ্বরমত অনুযায়ী মালশ্রীর স্থানে মালবী হওয়া উচিত ছিল।

পঞ্চম মেঘরাগের প্রকারভেদ —

মল্লার, সৌরঠী, আসাওরী, কৈশিকী, গান্ধারী ও হরশৃঙ্গারী।

ষষ্ঠ নটনারায়ণের প্রকারভেদ —

কামোদী, কল্যাণ, আহিরী, শুধ্-নাট, সালক, নট-হাম্বীর।

যেহেতু এগুলি রাগিণী সেহেতু সংগীতদর্পণে কল্যাণী, নাটিকা (শুধ্-নাট), সারঙ্গী এবং নট্ট-হম্বীরা (নট-হাম্বীর) বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে সারঙ্গকে সালক বলা হয়েছে। অনেক গ্রন্থে সালক বা সালেক রাগের উল্লেখ আছে। এটি সারঙ্গ ভিন্ন অপর রাগ নয়— এইটাই অনুমান করতে হয়।

অতঃপর আবুল ফজল বলছেন— কোনো কোনো সম্প্রদায় প্রত্যেকটি রাগের পাঁচটি করে রাগিণী নির্দেশ করেন; এবং অন্য নানারকম প্রকারভেদেও হয়ে থাকে। অনেকে বসন্ত পঞ্চম ও মেঘ— এই তিনটির স্থানে মালকোস্‌ক্ (মালকোশ), হিন্দোল (হিন্দোল-কোশ) ও দীপক— এই তিনটিকে স্থাপন করেন এবং এই ছটি রাগের প্রত্যেকটির জন্য পাঁচটি প্রকারভেদের উল্লেখ করেন। কেহ কেহ এর মধ্যেও পরিবর্তন সাধন করে থাকেন। কোনো সম্প্রদায় দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম রাগের স্থানে শুধ্-ভৈরোঁ হিন্দোল·দেশকার ও শুধ্-নাটের উল্লেখ করে থাকেন।

সংগীতপ্রসঙ্গে আবুল ফজল বলেছেন যে গায়নশিল্পীরা (নাঘ্‌মা-সুরাই) যে গান করেন তাকে দুই পর্যায়ে গণনা করা হয়। একটির নাম মার্গ। এই শ্রেণীর গীত দেবতা ও ঋষিদের সৃষ্টি বলে গণ্য। দেশভেদে এই গীতের পরিবর্তন হয় না। এটি শ্রেষ্ঠ সংগীত বলে পরিগণিত। এই সংগীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দক্ষিণাংশে অধিকসংখ্যক বর্তমান (সনাসন্দেগান-ই-আন্ দর্ দিয়ার-ই-দকন্ ফরওয়ান্)। এই সংগীত ছয় প্রকার এবং এর আরও বেশি প্রকারভেদ হতে পারে। মার্গসংগীতের কয়েকটি আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন। যথা —

সূর্যপ্রকাশ, পঞ্চতালেশ্বর, সর্বতোভদ্র, চন্দ্রপ্রকাশ, রাগকদম্ব, ঝোমরা ও স্বরবর্তনী।

আইন-ই-আকবরীতে উপরোক্ত গীতগুলির বর্ণনা দেওয়া হয় নি। সূর্যপ্রকাশ বারোটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। এটি সূর্যের স্তুতিসূচক গীত। রাগ তাল প্রভৃতি সহকারে এটি গাওয়া হত। চন্দ্রপ্রকাশ এরই অনুরূপ। এটি চন্দ্রের স্তুতিসূচক গীত। এটি ষোল খণ্ডে বিভক্ত ছিল। পঞ্চতালেশ্বর রাগালাপ সহযোগে বিভিন্ন প্রাচীন তাল অবলম্বন করে গাওয়া হত। এই তালগুলির মধ্যে ছিল চচ্চৎপুট, চাচপুট, ষট্‌পিতাপুত্রক সম্পক্কেষ্টক এবং উদ্‌ঘট্ট। পরবর্তীকালে অর্থাৎ মোগল আমলে এই সব তালের ব্যবহার ছিল না। তালগুলি সম্ভবত পালটে গিয়েছিল। এই গীতে পাঁচটি পদ বিভিন্নভাবে গাওয়া হত। সর্বতোভদ্র নামক গীতটিতে আটটি অক্ষরে একটি পাদ রচিত হত, এর প্রথম চারটি অক্ষর উল্টোপাল্টাভাবে আবর্তিত হত। এর একটি উদাহরণ সোমেশ্বর তাঁর মানসোল্লাস গ্রন্থের গীতবিনোদ অধ্যায়ে প্রদান করেছেন। ঝোমরা নামক গীত সম্বন্ধে রাগদর্পণ (১৬৬৬) নামক ফার্সী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে এর চারটি কলি ছিল এবং দেবতাদের প্রশংসায় এই গীত রচিত হত। উক্ত গ্রন্থে স্বরবর্তনী সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এটিও

প্রশংসাসূচক গীত। রাগকদম্ব নামক গীতে বিভিন্ন ছন্দ ও তাল প্রযুক্ত হত। প্রসিদ্ধ গায়ক গোপাল নায়ক স্বরবর্তনী এবং রাগকদম্ব গাইতেন। সংগীত-রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ লিখেছেন যে গোপাল বত্রিশটি রাগ-তাল-যুক্ত ভ্রমর নামক একশ্রেণীর রাগকদম্বক গীতের অনুষ্ঠান করতেন। রাগদর্পণ রচয়িতা ফকীরুল্লা জানিয়েছেন যে আমীর খুশ্রু-র সঙ্গে দ্বন্দ্বে গোপাল স্বরবর্তনী নামক গীতেরও অনুষ্ঠান করেছিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গীতকে দেশী বলা হয়। এটি একটি বিশিষ্ট স্থানের প্রচলিত গীত। যেমন—ধ্রুপদ। এই গীত রাজধানী আগ্রা, গোয়ালীয়ার, বারী ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে প্রচলিত। পূর্বকালে এই অঞ্চলে বড় বড় গান গাওয়া হত। যখন গোয়ালীয়ারের রাজা মান সিং শাসনে নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি উত্তম কলাকার যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে নায়ক বখ্শু, মাছু ও ভানুর সহযোগিতায় এক বিশেষ সর্বস্বীকৃত রীতি (তর্‌জ্) নির্বাচনপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বখ্শু ও মাছু গুজরাটের সুলতান মাহ্মুদের অধীনে অবস্থান করেন। এই সময়ে তাঁদের পসার ফিরে গেল এবং এই রীতিটি (রওইশ্) সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হল (বর্‌ফরাজ-ই-রওয়ায়ী বর্ আওর্‌দ্)।

ধ্রুপদ সংগঠনের তথ্যটি মূল 'মানকুতূহল' নামক গ্রন্থ থেকে আহরিত হয়েছে বলে মনে হয়। পরে এই গ্রন্থটি ১৬৬৩ থেকে ১৬৬৬ সালের মধ্যে ফকীরুল্লা নামক একজন সংগীতজ্ঞ বিশেষ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী কর্তৃক ফার্সীতে অনূদিত হয়। এই অনুবাদের নাম দেওয়া হয় 'রাগদর্পণ'। ধ্রুপদের বর্ণনা সম্পর্কে আইন-ই-আকবরী ও রাগদর্পণের ভাষাগত ঐক্যও লক্ষ্যগোচর হয়। ফকীরুল্লা তাঁর বর্ণনায় বলেছেন যে রাজা মান নায়ক বখ্শু, নায়ক ভানু, মাহ্মুদ, করণ ও লোহঙ্গের সহায়তায় ধ্রুপদ সংগঠিত করেন। আইন্-ই-আকবরীতে যাঁকে মাছু বলা হয়েছে তিনি সম্ভবত মাহ্মুদ হবেন। আবুল ফজল অপর দুই গায়কের উল্লেখ করেন নি।

ধ্রুপদের আকৃতি সম্পর্কে আবুল ফজল বলছেন যে ধ্রুপদ চারটি ছন্দোপবদ্ধ পংক্তির সমষ্টি এবং এর শব্দ ও বর্ণাদি যে সব সময়েই সমান হবে এমন নয়। এতে প্রেমের বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় এবং এর সৌন্দর্য চিত্তহারী।

অতঃপর অপরাপর সংগীত সম্পর্কে বলা হয়েছে। দক্ষিণ দেশে দ্রাবিড়ী ভাষায় প্রচলিত গীত চন্দ্ নামে পরিচিত। এই গীত তিনটি বা চারটি পংক্তির সমষ্টিতে রচিত হয়। এতে প্রশংসাসূচক ভাবই অধিক পরিমাণে থাকে। তিলঙ্গ এবং কর্ণাটকের ভাষায় রচিত গীতকে ধরু বলা হয়। এই গীতে প্রেমিকদের কোমল মিনতির বাণীই উচ্চারিত হয়। যে গীত বাংলায় প্রচলিত তাকে বঙ্গ্লা বলে। যে গীত জৌনপুরে প্রচলিত তাকে চুট্‌কলা বলে। দিল্লীতে যে গীত গাওয়া হয় তার নাম কওল্ ও তরানা। আমীর খুশ্রু দহ্লবী সমুত ও তাতার নামক দুজন গায়কের মুখে শোনা তাঁদের ভাষার গীত ভেঙে এই ধরণ দুটির প্রবর্তন করেন এবং এই উদ্দেশ্যে ফার্সী, সাউং নক্শ্ এই সকল গীতপদ্ধতি এবং হিন্দী-গীতপদ্ধতি অবলম্বন করেন। এতে এই গীত দুটি অধিকতর মনোহারিত্ব অর্জন করে।

চুট্‌কলা, কওল্ ও তরানা সম্বন্ধে ফকীরুল্লা তাঁর রাগদর্পণ গ্রন্থে আরও কিছু অধিক বিবরণ দিয়েছেন। চুট্‌কলা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে এটি দুটি কলিতে গঠিত। এটি তালে গাওয়া হত না (বে-কাফিয়া) এর প্রথম কলিতে গীতাংশ এবং দ্বিতীয় কলিতে কাব্য আবৃত্তি করা হত। অবশ্য এই আবৃত্তিও সুরেই করা হত। সংস্কৃত গ্রন্থে চুট্‌কলাকে ক্ষুদ্র গীতের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। ঘনশ্যাম দাস -সংকলিত সংগীত-

সারসংগ্রহ[১] গ্রন্থে চুট্‌কলার (ছটিকিল) একটি উদাহরণও দেওয়া হয়েছে।। এই-জাতীয় গীতকে ধ্রুবপদের একটি রূপ বলা হয়েছে।

আমীর খুশ্‌রু সাউং ও নক্‌শ্‌ এই দুই পারসিক পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পরে অমল্‌, নক্‌শ্‌, সাউং প্রভৃতি গীত পারস্য এবং তুর্কী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কওল, ঘজ্‌ল, তরানা এগুলিও পারসিক নওবা-র অন্তর্গত ছিল (*History of Music*, Oxford)। আমীর খুশ্‌রু চাতুর্যের সঙ্গে এইগুলি ভারতীয় সংগীতে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন। রাগদর্পণকার আমীর খুশ্‌রুর সঙ্গে নায়ক গোপালের যে দ্বন্দ্ব হয়েছিল সেই বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে নায়কের গাওয়া গীতগুলির প্রত্যুত্তরে তিনি কওল্‌ রচনা করেছিলেন। গোপাল গেয়েছিলেন গীত, মান এবং স্বরবর্তনী। আমীর শুনিয়েছিলেন কওল্‌ এবং বসিৎ। রাগদর্পণে বলা হয়েছে যে নক্‌শ্‌ নামক গীতে গদ্য (নস্‌র্‌) অংশ ছিল আর এর সঙ্গে তা তা তানি প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করা হত। ফার্সী-পদ্ধতি সম্বন্ধে রাগদর্পণে বলা হয়েছে যে এতে কতিপয় বয়েৎ-এর সঙ্গে ঘজল্‌, কসিদা গাওয়া হত। মাঝে মাঝে তালসহযোগে গীতাংশ অনুষ্ঠিত হত।

এর পর আবুল্‌ ফজল বলছেন যে মথুরায় প্রচলিত যেসব গান আছে তাদের বলে বিষণপদ। এতে চার ছয় বা সাতটি লাইন থাকে। এর বিষয়বস্তু কৃষ্ণের স্তুতি। সিন্ধু দেশে প্রচলিত গানের নাম কানী বা কালী। রাগদর্পণ এটিকে কাবী (কাব্য ?) বলেছেন। এতে প্রেমভাবের বাহুল্য দেখা যায়। তিরহুতের ভাষায় প্রচলিত গানকে লহচারী বলে। এই গানগুলি বিদ্যাপতির রচনা এবং উদ্বেলিত প্রেমসংগীত। লাহোর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের গানকে ছন্দ্‌ বলে। এ সম্পর্কে রাগদর্পণকার ফকীরুল্লা বলেছেন যে এটি কয়েকটি কলিতে নিবদ্ধ। শেখ্‌ বাহাউদ্দীন জ্যাকেরিয়া মুলতানী ফার্সীতে এর নামকরণ করেন চন্দ্‌। এটিও প্রেম এবং তজ্জনিত হতাশাব্যঞ্জক সংগীত। এতেও গানের মাঝে কাব্য আবৃত্তি করা হয়। গুজরাটে যে গান গাওয়া হয় তাকে জক্‌রী বলে। যুদ্ধস্থলে এবং বীরগণের প্রশংসায় আচরিত গানকে করৃকা বলে। এগুলিকে সাদ্‌রা-ও বলা হয়। এই গানগুলি চার বা ছটি (পাঠান্তর ছয় বা আট) ছত্রে গঠিত এবং বিভিন্ন ভাষায় গাওয়া হয়ে থাকে। রাগদর্পণ এগুলির সঙ্গে আর-এক প্রকার সাদ্‌রার (সাধ্‌রা) উল্লেখ করেছেন। এটি একপ্রকার চুট্‌কলা। এর আবিষ্কর্তা জৌনপুরের সুলতান হোসেন শর্কী।

এই গীতগুলি ব্যতীত অন্যান্য বহু ধরণের (তর্‌জ) গীত শোনা যায়, যেমন— সারঙ্গ, পূর্‌বী, ধনাশ্রী, রামকলী, কুড়ায়ী— মহামান্য সম্রাট একে সুভ্রায়ী বলে থাকেন। সুভ্রায়ী শব্দটি ফার্সী নয়। বোধ করি সুঘ্রাণযুক্ত এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে সুঘ্‌রাই-কানাড়া নামে একটি রাগ প্রচলিত আছে। অপরাপর শ্রেণীর মধ্যে সুহু, দেশকাল ও দেশাক্‌ এই তিনটির নাম করা হয়েছে। এগুলি সবই রাগ হিসাবে খ্যাত। কিন্তু আবুল্‌ ফজলের বর্ণনা থেকে মনে হয় একদা এইগুলি একপ্রকার গীতগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এর পর তৃতীয় প্রকীর্ণ অধ্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রকীর্ণ নামটি সংগীতরত্নাকর থেকে

১. সংগীতসারসংগ্রহ— স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সম্পাদিত

সংগৃহীত। আবুল ফজল বলছেন যে এতে 'আলাপ'-এর রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। এটি বর্ণনা সম্পর্কীয় ব্যাপার (নাসেরখানী, অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ নয়)। এটি তুইপ্রকার— একটি রাগালাপ; এটিতে রাগের অনুষ্ঠান হয়, প্রচলিত ভাষায় একে বলা হয়— আদা এবং তাসেরূরুফ্; অপরটি রূপ-আলাপ— এটি কাব্যময় (মনজুম্-manzum) রূপের অনুষ্ঠান এবং কতকগুলি আবেগপূর্ণ উচ্চারণে এই অংশটি অনুষ্ঠিত হয়। আদা এবং তাসেরূরুফ্ এই তুটি শব্দ ব্যবহারের কারণ বোধ হয় এই যে আদা শব্দে সৌন্দর্য এবং তাসেরূরুফ্ অর্থে অধিকার অর্থাৎ রাগের মূল ভাবটিকে অধিকার করা বোঝায়।

তার পর চতুর্থ প্রবন্ধ অধ্যায়। এর বিষয়বস্তু গীতবন্ধনের প্রণালী। কাব্যরচিত এবং রাগে অনুষ্ঠিত একটি প্রবন্ধ ছটি অঙ্গে নিবদ্ধ— স্বর; বিরুদ-প্রশংসা (সিতাইশ্); পদ-নাম অর্থাৎ বিষয়বস্তুর অনুষ্ঠান। আবুল ফজল একে বলেছেন— নাম-ই-মামদুহ্-এর অর্থ নামের স্তুতি। পদ বলতে এইরকম কিছু বোঝায় না। এই অংশটিকে ভ্রমাত্মক বলতে হবে। পদ বলতে গেয় বস্তু বোঝায়। তনা (সংস্কৃতে-তেনক) এতে তন্-তনা এইরকম উচ্চারণ করা হয় এবং এই উচ্চারণে স্বন্দর কাব্যময় পংক্তি রচনা করা হয় (ফেক্‌রাৎ আদা করদন্)। পাট পূর্বোক্ত তন্ তনা জাতীয় উচ্চারণ। তিন থেকে বিশ হরফে এই উচ্চারণ করা হয়। এই উচ্চারণও বিশেষ ঢঙে বার বার কবিতার চরণের মত অধিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আসলে পাট-শব্দে বাদ্যাক্ষর অর্থাৎ মৃদঙ্গজাতীয় বাদ্যের বোল বোঝায়। আবুল ফজলের পণ্ডিতগণ এইটিও ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন নি। তাল-একে জরব্ (zarb) বলা হয়। জরব্-ই-উসূল্ শব্দে তাল দেওয়া বোঝায়। এই ছটি অঙ্গে নিবদ্ধ হলে সেই গীতকে মেদিনী বলে। এই অঙ্গাদির একটির অবর্তমানে তাকে বলে আনন্দিনী (আন্দ্‌নী); তুটি না থাকলে দীপনী; তিনটি না থাকলে ভাবনী; চারটি না থাকলে তারাবলী বলে। তুটি অঙ্গে নিবদ্ধ হলে গীত উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায় না।

উক্ত চারিটি অধ্যায়ে স্বরের নানারকম বৈচিত্র্য (নাইরঙ্গী) বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম-তাল-অধ্যায়। এতে ছন্দরক্ষার্থে আঘাতের প্রকৃতি এবং পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে। আবুল ফজল তাল সম্বন্ধে কোনো বর্ণনা দেন নি।

এর পর ষষ্ঠ বাদ্য অধ্যায়। এর বিষয়বস্তু বাদ্যাদির প্রকারভেদ ও তৎসম্পর্কীয় আলোচনা। এটি চার প্রকার: তত— যেগুলি তারে বাজানো হয়; বিতত— যেগুলি চর্মে আঘাত করে বাজানো হয়; ঘন— তুটি কঠিন বস্তু যাদের সংঘাতে আওয়াজ উৎপন্ন হয়; সুষির (সুখির)— যেগুলি ফুৎকারযোগে বাজানো হয়। এই প্রত্যেকটির অনেকগুলি প্রকারভেদ আছে। আবুল ফজল এর কয়েকটির উল্লেখ করেছেন।

প্রথম পর্যায়ের বাদ্য।—

যন্তর— কাষ্ঠনির্মিত; লম্বায় এক গজ; ভিতরটা ফাঁপা। তুদিকে তুটি লাউ যুক্ত থাকে। যন্ত্রের উপরদিকে কাষ্ঠখণ্ডের পর্দা সংযুক্ত থাকে এবং এর উপর দিয়ে পাঁচটি লোহার তার তুদিক থেকে দৃঢ়ভাবে বাঁধা থাকে।

'যন্ত্র' শব্দে একসময় ত্রিতন্ত্রী বীণা বোঝাত। সংগীত রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ বলেছেন— ত্রিতন্ত্রীকৈব লোকে জন্ত্রশব্দেনোচ্যতে।

বীণ— যন্তরের মত কিন্তু এতে তিনটি তার বর্তমান।

আবুল ফজল এর বর্ণনায় বলছেন— সেহ্‌তার দারদ্‌। সম্ভবতঃ বীণ-সেহ্‌তার থেকে বর্তমান সেতার শব্দের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জনশ্রুতি আছে যে আমীর খুশ্‌রু সেতারের প্রবর্তন করেন। আমীর খুশ্‌রু অবশ্য এ-জাতীয় বাদ্য বাজাতেন কিন্তু তাকে বলা হত ডাণ্ডী, অপর নাম— দম্‌-ঘজ্‌ঘা বা কজ্‌কা। সুর রাখবার জন্য তিনি এই বাদ্যের সহায়তা গ্রহণ করতেন। এ সম্পর্কে রাগদর্পণের বিবরণ দ্রষ্টব্য। তবে উক্ত গ্রন্থে সেতার নামক যন্ত্রের উল্লেখ নেই।

কিন্নর— বীণের মত, কিন্তু দণ্ডটি ঈষৎ বেশি লম্বা এবং তিনটি লাউ ও দুটি তার থাকবে।

সুরবীণ— বীণের মত কিন্তু এতে পর্দা থাকে না।

অমৃতী (অম্বরতী)— এর দণ্ডটি সুরবীণের দণ্ড অপেক্ষা ছোট। একটি ছোট লাউ উপরের দিকে একটু নিম্নভাগে সংলগ্ন থাকে। একটি লোহার তারে অপরিবর্তিতভাবে সব-ক'টি পর্দা বাজানো যায়।

রবাব— এতে ছ'টি তাঁতের তার থাকে। কোনো কোনো যন্ত্রে বারোটি এবং কোনোটিতে আঠারোটি তারও থাকে।

স্বরমণ্ডল— 'কানুন'-এর মত যন্ত্র। এতে একুশটি তার থাকে। অনেকে লোহার তার ব্যবহার করেন, কেহ কেহ তামার তার; কোনো সম্প্রদায় তাঁতের তার ব্যবহার করেন।

এটি পাশ্চাত্য dulcimer or psaltery-র অনুরূপ। আমাদের দেশেও প্রাচীনকাল থেকে এই বাজনাটি চলে এসেছে। সংস্কৃত শাস্ত্রের এর অপর নাম— মত্তকোকিলা।

সারেঙ্গী— আকৃতিতে রবাবের চেয়ে ছোট। ঘীচকের মত বাজান হয়।

ঘীচক বাদ্যটিও আকবরের সময় ভারতে দেখা যেত। এই বাদ্যটি পারস্যদেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল। এটি Viol জাতীয় বাদ্য, ছড়ি দিয়ে বাজানো হত।

পিনাক— একে সুরবিতানও বলা হয়। কাষ্ঠনির্মিত। আয়তনে ধনুকের মত এবং ঈষৎ বক্র। ধনুকের ছিলের মত স্নায়ুনির্মিত একটি পাকানো তার এর উপরে বাঁধা থাকে। কাষ্ঠনির্মিত পেয়ালার মত একটি বস্তু এই বাদ্যের দুদিকে নিম্নমস্তকে অর্থাৎ উলটোভাবে বসানো থাকে। এই যন্ত্রটিও ঘীচকের মত বাজানো হয় কিন্তু বাঁ হাতে একটি ছোট লাউ রাখা হয় এবং এটি বাজাবার কাজে লাগে।

সংগীত রত্নাকরেও পিনাকী বীণার অনুরূপ বর্ণনা দেওয়া আছে। বাম হস্তে একটি তুম্ব অর্থাৎ লাউ দিয়ে গুণ বা তন্ত্রীটিকে পীড়ন করা হত এবং ডান হাতে ছড়ি দিয়ে যন্ত্রটিকে বাজানো হত। বাম হস্তে তুম্বের পরিবর্তে আর্দ্রচর্মকৃত শুষ্ক পেশীও তন্ত্রীপীড়নের জন্য ব্যবহৃত হত।

অধিটি— এতে একটি লাউ এবং দুটি তার থাকে।

কিঙ্গিরা— বীণের মত, কিন্তু দুটি স্নায়ুনির্মিত তন্ত্রী এবং ছোট ছোট কয়েকটি লাউ থাকে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বাদ্য।—

পাখোয়াজ— মোটা কাঠ থেকে হরিতকীর মত আকৃতিতে তৈরি করা হয়। এর মাঝখানটা ফাঁপা থাকে। লম্বায় এক গজের কিছু বেশি। যদি এর মধ্যভাগ বগলের ভিতর দিয়ে ধরা যায় তা হলে দুই হাতের আঙুল একত্র মিলবে। এর মাথা দুটি কলসীর মুখের চেয়ে কিছু চওড়া হয়। এদের চামড়া দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়। এর চারি দিকে নাকাড়ার মত চামড়ার পাত টানা থাকে। চারটি কাঠের

টুকরো একহাতের কিছু কম দূরে বাঁদিকে পাখোয়াজের বৃত্তে লাগানো থাকে। এই কাঠের টুকরোগুলিকে মুচড়ে স্বর নামানো-চড়ানো হয়।

আওয়াজ— একটি ফাঁপা কাঠ থেকে তৈরি হয়। দুটি ছোট চর্মবাদ্যের মুখ একত্র করলে যেরকম হয় সেরকম।

দুহুল— এটি বিশেষ পরিচিত।

আমরা একেই 'ঢোল' বলি।

ঢাডা— এটি দুহুল বা ঢোলের মত কিন্তু খুব ছোট।

অর্ধাওয়াজ— আকৃতিতে আওয়াজ নামক যন্ত্রের অর্ধেক।

দফ্— এটি বিশেষ পরিচিত।

একটি গোল ফ্রেমের একদিকে চামড়া ছাওয়া থাকে। বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে বাজানো হয়। বর্তমানে 'ডফ্' বলে। অনেক যন্ত্রে ধাতব চাকৃতিও থাকে।

খন্জর— এটিকে ছোট দফ্ বলা যায়। ভিতরে রণনাত্মক ঘণ্টি থাকে। এর মুখ কলসীর মুখের মত চওড়া।

তৃতীয় পর্যায়ের বাদ্য।—

তাল— মুখ দুটি সমান করে গঠন করা হয়, বিস্তৃত ওষ্ঠযুক্ত পেয়ালার মত। অর্থাৎ এর কানাটি চওড়া হবে। আমাদের বর্তমান করতাল।

কাঠতাল— আকৃতিতে ছোট মাছের মত। চারটি করে থাকে। কাঠের বা পাথরের তৈরি।

চতুর্থ পর্যায়ের বাদ্য।—

শাহ্না— ফার্সীতে এটি 'সুর্ণা' নামে পরিচিত।

এটি আমাদের বর্তমান শানাই।

মশক্— এতে দুটি ছোট বাঁশি থাকে এবং তাতে নিয়মানুসারে কয়েকটি ছিদ্র থাকে। এই বাঁশি দুটি মশক্ অর্থাৎ চামড়ার থলিতে মিলিত হয়। ফার্সী ভাষায় একে নাইয়ে অম্বন (অর্থাৎ বাঁশরীযুক্ত ব্যাগ) বলে।

এটি ব্যাগ-পাইপ বলে পরিচিত।

মুরলী— নাই-এর অনুরূপ।

নাই শব্দের অর্থ হচ্ছে বাঁশি।

উপাঙ্গ্— একপ্রকার নাই বা বাঁশি, ভিতরটা ফাঁপা, লম্বায় এক গজ। এর উপরের দিকে মধ্যস্থানে একটি ফুটো থাকে। এই ফুটোর ভিতরে একটি সরু বাঁশি বসানো থাকে।

এই প্রকার বাঁশি এখনও কোথাও কোথাও বাজানো হয়। বীরভূমে জয়দেবের মেলায় এইরকম বাঁশি বাজাতে দেখেছি।

সপ্তম-নৃত্যাধ্যায়। এর বিষয়বস্তু বিভিন্নপ্রকার নৃত্য। আবুল ফজল এর বর্ণনা দেন নি।

গীতশিল্পীদের সংখ্যা নিরূপণ

গীত এবং বাদ্য সম্বন্ধে কিছু বলবার পর আবুল ফজল আবৃত্তিকার ও গীতশিল্পীদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলেছেন। প্রাচীন গীতকলার (নক্‌শ্-ই কদীম্) শিল্পীদের ভিন্ন ভিন্ন দেশ অনুসারে সম্প্রদায়গত প্রকারভেদ হয় না। এঁদের বলা হয় বৈকার (সং-বৈখরী)। এই গীতশিল্প যাঁরা শিক্ষা দেন তাঁদের বলা হয় সহকার।

কলাবন্ত— বর্তমানে সুপরিচিত। এঁরা ধ্রুপদ গান করেন।

ঢাডী— এই বাদ্যসহ গীতটি পঞ্জাবে প্রচলিত। এতে ঢাডা এবং কিঙ্গিরী বাজানো হয়। প্রধানতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরপুরুষদের প্রশংসায় এই সংগীত অনুষ্ঠিত হয় এবং যুদ্ধকালে উৎসাহ সঞ্চার করে। কাওয়াল এই শ্রেণীর অন্তর্গত, তবে এঁরা অধিকাংশ দিল্লী এবং জৌনপুরের চালে গান করেন। এর সঙ্গে ফার্সী ছন্দোবদ্ধ পদ (শায়ের্) আবৃত্তি করা হয়।

হুরকিয়া— পুরুষগণ হুরুক বা আওয়াজ নামে পরিচিত উক্ত বাদ্য বাজান, স্ত্রীলোকেরা তালের দিকে লক্ষ রাখেন এবং গায়নবৈশিষ্ট্যও প্রদর্শন করেন। পূর্বে এঁরা কর্‌কা নামক বাদ্যের সঙ্গে গাইতেন। বর্তমানে এঁরা ধ্রুপদ ও তজ্জাতীয় গান গেয়ে থাকেন। এই গোষ্ঠীর অধিকাংশ স্ত্রীলোক সুন্দরী এবং কৌশলাভিজ্ঞা ও বিদগ্ধা (হুনর্-পরদাজী) হয়ে থাকেন।

আবুল ফজল যাকে 'হুরুক' বলছেন সেটি 'হুড়ুক্কা' নামক একটি চর্মবাদ্য। একে 'আওয়াজ'ও বলা হত। সংগীত-রত্নাকর হুড়ুক্কার বর্ণনায় বলেছেন— লক্ষ্যজ্ঞাস্ত্বাবজং প্রাহুরিমাং স্কন্ধাবাজং তথা। অর্থাৎ, অভিজ্ঞগণ এই বাদ্যকে আবজ (আওয়াজ) বা স্কন্ধাবজ (স্কন্ধ-আওয়াজ) বলে থাকেন। 'করকা' শব্দটিকে সংস্কৃত সংগীত সাহিত্যে 'কুড়ুক্কা' বলা হয়েছে। এটি হুড়ুক্কার অনুরূপ তবে এটি হুড়ুক্কার মত অর্গলবদ্ধ হত না। এর সঙ্গে সংগত সহযোগে গান গাওয়া হত। আবুল ফজল সাজ্-কর্‌কা অর্থাৎ কর্‌কা-বাদ্য বলেছেন। এর পরেই 'সুরায়েন্দ্' অর্থাৎ গাওয়া এই শব্দটি রয়েছে। করখা একটি গীতরূপ হিসাবেও পরিচিত ছিল। রাগদর্পণে এর বর্ণনা আছে।

দফ্‌জন্— ঢাডীর অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ স্ত্রীলোক এই শ্রেণীতেও আছেন। তাঁরা দফ্ ও দুহুল বাজান এবং ধ্রুপদ গান করেন। বিবাহ উপলক্ষে এঁরা 'সোহ্‌লা' গান করেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার উপলক্ষে এঁরা বিচিত্র প্রশংসাসূচক (নক্‌শ্) গীত রচনা করে কৃতিত্বের সঙ্গে গেয়ে থাকেন। পূর্বে কেবলমাত্র স্ত্রীসমাজেই এঁরা গাইতেন, বর্তমানে পুরুষদের মজলিশেও আসেন।

সেজ্‌দা তালী— এই গোষ্ঠীর পুরুষেরা বড় বড় দফ্ নিজেরা বাজান আর স্ত্রীলোকগণ এক পায়ের আঘাতে সেজ্‌দা তাল-এর (অর্থাৎ তেরটি তাল যন্ত্রে) ঝঙ্কার তোলেন। এঁদের দুটি মণিবন্ধে দুটি তাল, দুই হাতের কনুইয়ে দুটি, দুই কাঁধের সন্ধিতে দুটি, দুই কাঁধে দুটি, বক্ষদেশে একটি, প্রত্যেক হাতের দুটি আঙুলে দুটি করে তাল বাঁধা থাকে। এঁরা প্রধানত গুজরাট ও মালব অঞ্চলের বাসিন্দা।

এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে মেয়েদের একটি পায়ের নিয়মিত আঘাতে একটা নৃত্যভঙ্গী প্রদর্শিত হত। পুরুষেরা দাঁড়িয়ে থাকতেন আর মেয়েরা নিয়মিত পদক্ষেপে ধাতুনির্মিত করতালের ঝঞ্জনা উৎপন্ন করতেন।

নটুয়া— এঁরা চমৎকার নৃত্য প্রদর্শন করেন এবং মূলরূপের বিভিন্ন পদ্ধতি দেখিয়ে থাকেন। এঁরা গীতও সম্পাদন করেন। এঁদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে পাখোয়াজ রবাব ও তাল বাজানো হয়।

কীর্তনীয়া— এঁরা উপবীত ধারণ করেন। এঁদের বাদ্যগুলি সাবেক ধরণের। এঁদের অনুষ্ঠানে মসৃণমুখযুক্ত ব্যক্তিদের স্ত্রীলোকদের পোশাক পরিয়ে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও লীলা অভিনয় করানো হয়।

এটি বাংলায় প্রচলিত কীর্তনের বর্ণনা বলে মনে হয় না। বৃন্দাবন অঞ্চলে এই ধরণের অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল— এখনও আছে বলে শুনেছি।

ভগ্‌তিয়া (ভক্তিয়া ?)— এঁদের গীতানুষ্ঠান পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানের অনুরূপ ; তবে এঁরা নানারকম বেশ ধরে চমৎকার নকল করতে পারেন। এঁদের অভিনয় রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়।

ভানুইয়া— শেষোক্ত শ্রেণীর অনুরূপ ; তবে এঁরা রাত্রিতে এবং দিবসে অনুষ্ঠান প্রদর্শন করেন। একটি চক্রাকার পাত্র (তবক্) যাকে হিন্দীতে 'থালী' বলে তার পরিধির মধ্যে বসে দাঁড়িয়ে এঁরা নানারকম অনুষ্ঠানরীতি প্রদর্শন করেন এবং গান করেন আর চমৎকার কৌশল দেখান।

ভাণ্ড্ (ভাঁড়)— এঁরা ঢুহুল ও তাল বাজিয়ে থাকেন এবং গানও করেন। এরা মানুষ ও জানোয়ারের নকল করেন। এঁরা নৃত্য করেন এবং নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গির সময় শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত করেন। রাস্তা থেকে জল নিয়ে এঁরা নাকে মুখে নিক্ষেপ করেন, একটি লোহার শিক মুখ থেকে পেট পর্যন্ত প্রবেশ করিয়ে দেন। কয়েকপ্রকার দানা একসঙ্গে গলাধঃকরণ করবার পর সেগুলি এঁরা আলাদা আলাদা করে বের করেন। এঁরা আরও নানাপ্রকার চমকপ্রদ কার্যাদি সম্পাদন করেন।

কন্‌জরী— এতে পুরুষেরা পাখোয়াজ, রবাব ও তাল বাজান এবং স্ত্রীলোকগণ গীত নৃত্যানুষ্ঠান করেন। জগতের অধীশ্বর— সম্রাট আকবর— এঁদের কাঞ্চনী বলে অভিহিত করেন।

নট— এঁরা দড়ির খেলা দেখান এবং বিস্ময়করভাবে ঝুলন্ত অবস্থার কৌশলাদি প্রদর্শন করেন। এঁরা তাল এবং ঢুহুল বাজিয়ে থাকেন।

বহুরূপী— এঁরা প্রতিদিন নানা বেশ ধারণ করে উপস্থিত হন। যেমন একজন যুবাপুরুষ সুন্দরভাবে বৃদ্ধের রূপ ধারণ করেন। বুদ্ধিমান পরীক্ষক এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকেও এঁরা ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেন।

বাজীগর— এঁরা হাতের কৌশলে প্রশংসার সহিত ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। এঁদের বঞ্চনার প্রভাবে দৃষ্টিতে রূপের বৈলক্ষণ্য প্রতিভাত হয়। যেমন— একটা ভারি পাথর কাঁধে বহন করতে দেখা যায় অথচ ধরে নেই এমন হালকা বলে মনে হয়। এঁদের একজন লোককে খণ্ড খণ্ড করে কেটে আবার যথাযথভাবে গঠিত করতে দেখা যায়। এঁদের কৌশলচমৎকারিত্বের বর্ণনা দেওয়া সাধ্যাতীত। এঁরা প্রত্যেক ব্যাপারেই বিশেষ রীতির গান গেয়ে থাকেন।

আখারা— এটি একটি আমোদ পরিবেশক সমাজ। অভিজাত গৃহের অন্তঃপুরের সীমানাতেই এঁদের অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। কয়েকজন অন্তঃপুরের পরিচারক পরিচারিকাকে গান বাজনা শেখানো হয়। এতে চারজন সুন্দরী স্ত্রীলোক নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন এবং চমৎকারভাবে আসল নাচের ভঙ্গি প্রদর্শন করেন ; অপর চারজন সংগীতে নিযুক্ত হন ও সহযোগী চার জন গানের রীতি অনুযায়ী তাল বাজান। অনুষ্ঠানে দুটি পাখাওয়াজ এবং দুটি উপাঙ্গ্ ব্যবহৃত হয়। এক একজন করে দক্ষিণী রবাব বীণ ও যন্ত্র বাজান। উৎসবে ব্যবহৃত প্রদীপ ব্যতীত দুটি স্ত্রীলোক হাতে প্রদীপ ধরে এই শিল্পীচক্রের পরিধির নিকট দণ্ডায়মান

থাকেন। এই সংখ্যার কিছু অধিকও এই অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অধিকক্ষেত্রে নটুয়া গোষ্ঠীর সহযোগিতায় এই সমাজের পরিচালন সম্পন্ন হয় এবং এঁরা তরুণী ক্রীতদাসীদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কখনো কখনো নটুয়ারা তাঁদের স্ত্রীলোকদের শিক্ষা দিয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের নিকট নিয়ে যান এবং অভীষ্ট পুরস্কারলাভ করেন।

এই বর্ণনায় 'রবাব-ই-দথন্' বা দক্ষিণের রবাব সম্বন্ধে আলোকপাত করা শক্ত, কেননা দক্ষিণদেশীয় রবাবের পরিচয় আমাদের জানা নেই। মূল মুদ্রিত গ্রন্থে দেখা যায় এই শব্দের পাঠ নিয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ রয়েছে। ফুটনোটে 'রবাব ও ঘন্' বা 'রবাব ও ধোলক (ঢোলক)' এই দুটি পাঠান্তর দেওয়া আছে।

সংগীতাধ্যায়ের সমাপ্তিতে আবুল ফজল বলেছেন যে জগতের অধীশ্বর (সম্রাট আকবর) সংগীতের বর্ণিত বিষয় ছাড়াও বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞ। যে সংগীত পৃথিবীর ধনী ব্যক্তিদের নিদ্রাকর্ষণের জন্য নিয়োজিত হয় তা সম্রাটের কাছে বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করে।

আইন-ই-আকবরীর যে অংশে রাজকীয় সম্ভ্রম -চিহ্নাদির বর্ণনা করা হয়েছে সেখান থেকেও জানা যায় যে আকবর পারসিক সংগীতেও অভিজ্ঞ ছিলেন এবং দুইশতাধিক সংগীত রচনা করেছিলেন খোরাসমীয় (Khwa razm) রীতিতে; এর মধ্যে জলালশাহী, মহামীরকরকং ও নওরোজী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। আকবরের দরবারে ভারতীয় শিল্পী ব্যতীত ইরান তুরান অঞ্চল থেকেও অনেক শিল্পী তাঁদের গুণপনার পরিচয় দিতেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডের বহু অঞ্চল থেকেও এইভাবে ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে যোগ স্থাপিত হয়েছিল আকবরের জীবিতকালে এবং প্রযুক্ত সংগীত নানাদিক থেকে সমৃদ্ধিলাভ করেছিল।

আমাদের জীবনীসাহিত্য

সুনীলচন্দ্র সরকার

মানুষের সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য মানুষেরই জীবন—এ কথা বলতে যাওয়াই অনেকটা বাহুল্য বলে মনে হয়। পৃথিবীর আদি মহাকাব্যগুলির মধ্যেই সুচিরক্ষিত হয়ে রয়েছে মানুষের জীবনের বিস্তৃত বিচিত্র অনুধাবন বা স্টাডির দৃষ্টান্ত, যা দেখে আজও সেই আদি কবিদের লোকোত্তর মনীষার কথা ভেবে স্তম্ভিত হতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত মানুষের জীবনকে একটা স্বতন্ত্র ও পূর্ণ মূল্য দেওয়ার সাধনা অনেক পরিমাণে আধুনিক। আর তা যখন আরম্ভ হল তখনও সত্যকার জীবন-উপাদানের সঙ্গে কল্পনা সংস্কার জনশ্রুতি ব্যক্তিগত মতবাদ বা বিশ্বাস মিশিয়ে তৈরি হতে লাগল নানা ধরণের সাহিত্যশিল্প এবং আজ পর্যন্ত তাই চলে আসছে। আঠারো শতকের ইয়োরোপীয় উপন্যাস-শিল্পই বোধ হয় প্রথম আগেকার রোমান্স্‌এর ছায়ালোক থেকে উদ্ধার ক'রে মানুষের জীবনসত্যকে লোকচক্ষুর সামনে স্পষ্টরেখায় ধরে দেবার চেষ্টা করল। যে সব লোকের জীবন তাঁদের কর্মজীবনের বৈশিষ্ট্য বা প্রতিভার অনন্যতার জন্য লোকসাধারণের কৌতূহল জাগায়, তাঁদের—যেমন অভিনেতা দেশ-আবিষ্কর্তা বৈজ্ঞানিক সাধুসন্ত ইত্যাদির—জীবনী বা আত্মজীবনী লেখার একটা মরসুম এল। কিন্তু এই ধরণের রচনার উদ্দেশ্য থেকে গেল বহু বিচিত্র। অপরিচিত জীবন-পরিবেশ ও ঘটনা-প্রবাহ, অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও উত্তেজনাময় পরিস্থিতির নিপুণ বিবরণের যে একটা সার্থকতা আছে তাতে সন্দেহ নেই। আজও দেখি কোনো হিমালয়যাত্রী বা যুদ্ধ-বিপ্লবের সাক্ষী, কোনো গুপ্তচর বা আর্মি-নেভি-এয়ারফোর্স ইত্যাদির উচ্চপদস্থ কর্মচারী যদি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা লিখতে আরম্ভ করেন তৎক্ষণাৎ তা বহু চিত্তকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হবে জীবনীর সত্যকার সাহিত্যমূল্য এই ধরণের প্রচেষ্টার মধ্যে তেমন আশা করা যায় না।

অন্তরঙ্গ কিন্তু অপক্ষপাত ভাবে ব্যক্তিজীবনকে লক্ষ ক'রে তার একটি সাহিত্যিক প্রতিকৃতি তৈরি করা মোটেই সহজ কাজ নয়। কোন্‌ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনটিকে দেখা হচ্ছে, কি উদ্দেশ্যেই বা তার আলেখ্য তৈরি করা হচ্ছে—এর উপরই নির্ভর করবে ফলাফলের প্রকৃতি। উপন্যাস থেকে 'সত্য'কে স্বতন্ত্র করা—এইটে সব রকমের জীবনী ও আত্মজীবনীর সাধারণ উদ্দেশ্য স্বীকার করে নিলেও দেখা যায় কোনো ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের জন্য জীবনী হয়ে উঠেছে শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্য -আহরণ; তাতে প্রয়োজনায় অনেক কথা অবিসম্বাদিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু চরিত্র-প্রতিমাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নি। কিংবা হয়তো চরিত্রটিকে এমনভাবে গ'ড়ে তোলা হয়েছে যাতে তা থেকে বিশেষ কতকগুলি নৈতিক সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়। এই রকম নৈতিক শিক্ষার দিক থেকে যে-কোনো মানুষের জীবনই যে আলোচনার যোগ্য—এই মত প্রকাশ করেন ডাঃ জন্‌সন্‌ তার RAMBLER পত্রিকায়। তিনি চান, যেন খুঁটিনাটি তথ্য যতটা সম্ভব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত হয় এবং তার পর সেই তথ্যগুলির উপর বুদ্ধিবিচার (reason) প্রয়োগের ফলে চরিত্রটির ও সাধারণভাবে মানবচরিত্র ও প্রকৃতির গূঢ় সত্যগুলি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। জন্‌সনের এই নীতিই পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ জীবনীসাহিত্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে দেখা যায়। কিন্তু এই নৈতিক আদর্শের চেয়েও সূক্ষ্মতর ও মহত্তর আদর্শও নিশ্চয় আছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন বললেন,

'the proper study of mankind is man'—মানুষের সত্যকার জানবার বস্তু হচ্ছে মানুষই—তখন তিনি এই জানাকে শুধু নৈতিক স্তরেই রাখলেন না। তিনি তাঁর লুসিকে, মাইকেলকে, জোঁক-সংগ্রাহককে (leech-gatherer) যে দৃষ্টিতে দেখলেন তা বাস্তবানুগ হয়েও কাব্যচেতনায় উদ্ভাসিত। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য হিসাবে to study the mind of man -এর যে পরিকল্পনা উপস্থিত করেছেন তার অর্থ ব্যক্তি-মানুষের মধ্য দিয়ে তার চারিত্রিক বিশেষত্ব তো বটেই, তা ছাড়াও বিশেষ সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব এমন কি বিশ্বমানবের চিরন্তন সত্য সন্ধানেরও সম্ভাবনা তিনি আশা করেন।

কবির চোখে যেমন ধরা পড়ে জীবনের গভীর সত্য, অনতিপ্রত্যক্ষ সৌন্দর্য ও মর্যাদা, জীবন-সমালোচক ও স্যাটায়ারিস্ট্ বা ব্যঙ্গরসিকের চোখে তেমনি ধরা পড়ে একই জীবনের মধ্যে ভালোমন্দের বৈষম্য আদর্শ ও আচরণের নানা অসঙ্গতি, যুগজীবনের নানা প্রভাব ও প্রেরণার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এইভাবে দেখলে অনেক মহৎ জীবন তার মহত্ত্ব হারিয়ে জীবনের রহস্য বা irony নির্দেশের উপযোগী প্রতীক মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক জীবনীকারদের মধ্যে লিটন স্ট্র্যাচির রচনা এই পর্যায়ে পড়ে।

এই হল ইংলণ্ডে সেই আঠারো শতকের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত নানা উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য জীবনীরচনার একটা মোটামুটি বিবরণ। সেখানে ও অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশে জাতীয় প্রচেষ্টায় সমস্ত কৃতী ও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী মানুষদের জীবনবিবরণীর সংকলন তৈরি করা অনেকদিন হল শুরু হয়ে গেছে। আমাদের দেশে ব্যক্তিজীবনের এই মূল্যবোধ কখনো তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। ভারত চিরকাল অনহংবাদী, ইতিহাস-চেতনার দিকে দুর্বল। তার শিল্পসাহিত্যের কত শ্রেষ্ঠ কীর্তি রচয়িতার নামবহনের দায়িত্ব স্বীকার করে নি। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম ঢেউ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি এসেছে ব্যক্তিজীবন সমাজজীবন সম্বন্ধে একটা নূতন আগ্রহ, ঘটনা ও চরিত্রকে দেখে চিনে ধরে রাখবার একটা চেষ্টা। বলা যেতে পারে শ্রীচৈতন্যের জীবনকাব্যগুলিতেই বাংলার জীবনী-সাহিত্যের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। কথাটা স্বীকার করে নিলেও বলতে হবে ঐ-সব রচনার আদর্শকে আধুনিক যে আদর্শের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার অনুরূপ বলা চলে না।

জীবনীরচনার প্রধান সমস্যাই হল দুটি। এক দিকে জীবনকথাকে রূপকথা ও উপন্যাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখা, অন্যদিকে ইতিহাসের বর্ণবৈচিত্র্যহীন সাধারণ দৃশ্য-পরম্পরা থেকে উদ্ধার ক'রে তার মধ্যে আনা ব্যক্তি-রূপের বৈশিষ্ট্য, চরিত্রের বেগ, প্রত্যক্ষ অনুভবের সরসতা। এই চেষ্টার প্রথম সার্থক রূপ দেখা যায় আঠারো শতকের ইয়োরোপে নয়, প্রাচীন গ্রীসে—যার প্রেরণায় আঠারো শতকের ক্লাসিক্যাল নবসাধনার শুরু। এই কারণে গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুটার্কের *Lives* একটি অনুপমকীর্তি হিসাবে স্মরণীয়—পরবর্তী বহু সাহিত্যিক কবি নাট্যকার এমনকি শেক্‌স্‌পীয়রও—যাঁর কাছে ঋণী। বাংলায় এই আদর্শের প্রথম রূপায়ণ দেখি বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রে। প্লুটার্কের মতই এ গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের আলেখ্য সৃষ্টি। এই কাজ তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে করেছেন, তা ছাড়া এই কাজ করতে গিয়ে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতি তিনি প্রয়োগ করেছেন প্লুটার্কের যুগে তার অস্তিত্ব ছিল না, বঙ্কিমের সমকালীন ইয়োরোপেই সেই পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা চলেছিল। কাজেই বঙ্কিমের মধ্যে প্লুটার্কীয় কল্পনা-উজ্জীবন ও বিবেক-বিশ্লেষণ পদ্ধতির সঙ্গে একেবারে আধুনিক তথ্যসংকলনরীতি ও পরীক্ষাপ্রমাণ -এর সমস্ত কৌশলের সমন্বয় দেখা যায়। তিনি নিজেই তাঁর কৃষ্ণচরিত্র রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন :

"সমালোচকের [এ ক্ষেত্রে জীবনীকারের] কার্য প্রয়োজনানুসারে দ্বিবিধ : এক প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাস, অপর সত্যের সংগঠন।" এই প্রক্রিয়া প্রয়োগের দ্বারা যে শেষ সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হলেন তা তাঁরই ভাষায় : "কৃষ্ণ সর্বত্র সর্বসময়ে সর্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল ; তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্মনির্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র অমানুষ।" শুধু আমাদের বাংলার জীবনীসাহিত্যে নয়, পৃথিবীর জীবনীসাহিত্যে বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র একটি সম্মানের স্থান পাবার যোগ্য।

জীবনীর এই বিশেষ ধারাটির অনুবর্তন করবার মত লোক বাংলায় ছিলেন। যেমন ধরা যাক রমেশচন্দ্র দত্ত। কিন্তু শিবাজী, রাণা প্রতাপের সাহিত্য-রসায়িত জীবনী না লিখে তিনি লিখলেন উপন্যাস। দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল চমৎকার ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি, চরিত্রপুনরুজ্জীবন ক্ষমতা ; তিনিও জীবনীকার না হয়ে হলেন নাট্যকার। শুধু দেখি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে চরিত্র-প্রতিলিপির কিছু স্মরণীয় উদাহরণ উপস্থিত করলেন দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর রামায়ণী কথায়।

শুধু প্রাচীন নয়, সমকালীন জীবনচিত্র -রচনায়ও বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের পথ-প্রদর্শক। তিনি এ কাজে হাত দেবার আগেই অবশ্য প্রকাশিত হয়েছিল ঈশ্বর গুপ্তের কবিজীবনী, কিন্তু এই গ্রন্থে ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকা সংগ্রাহকের— জীবনীকারের নয়। প্রতিটি জীবন সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছেন তাই সাজিয়ে দিয়েছেন, সেই তথ্যকে বুদ্ধি-বিচারের দ্বারা অগ্নিশুদ্ধ করা বা সেইগুলির সংশ্লেষণে কোনো জীবন্ত রূপের সৃষ্টি করা ছিল তাঁর ইচ্ছা ও সাধ্যের বাইরে। কবিদের যে-সব রচনা তিনি সংকলন করেছিলেন সেগুলি পরিবেশন করবার জন্য উচ্ছ্বাসময় প্রশংসবচন ছাড়া আর কোনো তত্ত্বালোচনা বা মূল্যায়ন তিনি দরকার মনে করেন নি। ডাঃ জন্‌সন্ তাঁর বিখ্যাত *Lives of the Poets* -এ সাহিত্যিক মূল্যবোধের সঙ্গে মিলিয়ে কবিচরিত্রের রেখাচিত্র অঙ্কনের যে আদর্শের সূত্রপাত করেন তার কিছুটা সার্থক অনুসৃতি দেখা যায় বঙ্কিমে— দীনবন্ধু মিত্র, ঈশ্বর গুপ্ত, সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশের যে ভূমিকা-লিপিগুলি তিনি লিখেছিলেন তার মধ্যে।

দীনবন্ধু সম্বন্ধে বঙ্কিমের এই উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে : "তিনি নিজে সুশিক্ষিত, এবং নির্মলচরিত্র, তথাপি তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রবল দুর্দমনীয় সহানুভূতিই তাহার কারণ। যাহার সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি, যাহার চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন, তাহার সমুদায় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত।"

ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ সম্বন্ধে : "মেকির উপর রাগ আছে বটে। তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ, কেবল ঘোর ইয়ারকি।· ·কবির লড়াই ঐ রকম শত্রুতাশূন্য গালাগালি। ঈশ্বর গুপ্ত কবির লড়াই-এ শিক্ষিত— সে ধরণটা তাঁহার ছিল।"

সঞ্জীবচন্দ্রের সম্বন্ধে বঙ্কিমের রচনা থেকে একটু বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া হল। এর থেকে জীবনীরচনার আর্ট সম্বন্ধে তাঁর ধারণারও খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে :

"কোন্ কারণে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ইহার প্রকৃত নাম সঞ্জীবনচন্দ্র, কিন্তু সংক্ষেপানুরোধে সঞ্জীবচন্দ্র নামই ব্যবহৃত হইত) তাঁহার জীবিতকালে, বাঙ্গালা সাহিত্যসভায় তাঁহার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা এ জীবনী পাঠে পাঠক বুঝিতে পারেন।· ·

"জীবনী লিখিবারও আমি উপযুক্ত পাত্র নহি। যাঁহার জীবনী লেখা যায়, তাঁহার দোষগুণ উভয়ই কীর্তন

না করিলে, জীবনী লোকশিক্ষার উপযোগী হয় না— জীবনী লেখার উদ্দেশ্য সফল হয় না। সকল মানুষেরই দোষগুণ দুইই-থাকে, আমার অগ্রজেরও ছিল। কিন্তু তাঁহার দোষ কীর্তনে আমার প্রবৃত্তি হইতে পারে না; আমি তাঁহার গুণকীর্তন করিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, ভ্রাতৃস্নেহজনিত পক্ষপাতের ভিতর ফেলিবে। কিন্তু তাঁহার জীবনের ঘটনা সকল আমি ভিন্ন আর কেহ সবিশেষ জানে না— সুতরাং আমিই লিখিতে বাধ্য।"

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই এমন এক মহৎ ব্যক্তিত্বের শোভাযাত্রা বাংলার জীবন-অঙ্গনে দেখা দিল যে জীবনীরচনার প্রয়োজন ব্যাপকভাবে অনুভব করলেন অনেকেই। রামমোহন বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র— এঁদের জীবনকথা লেখবার একটা প্রয়াস দেখা গেল। এবং এখনো এঁদের জীবনকথার পুনর্লিখন-চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। এই-সব জীবনীতে তথ্যসংকলনের, সত্যাসত্য নিরূপণের কাজ অনেক পরিমাণে করা হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে সাহিত্যপদবাচ্য জীবনীর সংখ্যা খুবই কম। সে গৌরব দাবি করতে পারেন শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' যা কোনো একজনের জীবনী নয়, জীবনীমালা। শিবনাথের ছিল এক অপক্ষপাত দৃষ্টি, একই চরিত্রে আপাত-বিরোধী গুণ বা লক্ষণকে সমান উদারতার সঙ্গে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা, এমনকি মহৎ-জীবনের পরিবেশেও যে ছোটখাট খুঁটিনাটি ঘটনার বা তথ্যের একটা মূল্য আছে, রস আছে— সেই দুর্লভ জ্ঞান। আদর্শ জীবনী-রচয়িতার প্রতিভা ও প্রস্তুতি শিবনাথের ছিল। দুঃখের বিষয়, তিনি কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখেন নি। এটা আমাদের সাহিত্যের একটা ক্ষতি।

১৮৮৫ সালে রামমোহনের স্মৃতিসভা উপলক্ষে লেখা ও চারিত্রপূজায় সংকলিত রবীন্দ্রনাথের রামমোহন রায় প্রবন্ধ পড়লে জীবনীরচনায় এই তরুণ কবির অদ্ভুত প্রতিভা ও প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। অনেক পরে লেখা বিদ্যাসাগর ও মহর্ষি সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধগুলিও আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে অন্ততঃ একটিও পূর্ণাঙ্গ জীবনী তিনি লিখলে আমাদের জীবনীসাহিত্য সমৃদ্ধতর হত। তবে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে হলে যে অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাশক্তির দরকার তা সব সময়েই দুর্লভ। এর প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় রামমোহন সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য: "তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়; আবার তিনি যাহা না করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আরও প্রকাশ পায়।" আর বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে চণ্ডীচরণ ও শম্ভুচন্দ্রের জীবনীর উপর নির্ভর করেই তিনি যেমনভাবে দেখিয়েছেন যে "দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব"— তার থেকেও বোঝা যায় রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথে চলবার মত লোক পাওয়া কত শক্ত। পরবর্তী লেখকদের মধ্যে একজনের নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তিনি হলেন অজিত চক্রবর্তী। তাঁর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে তথ্য সংকলন ও বিশ্লেষণের আধুনিক গবেষণা-সম্মত অক্লান্ত প্রয়াসের সঙ্গে মিলেছে চরিত্রের মর্মোদ্ঘাটনের ক্ষমতা।

বিংশ শতাব্দীতে জীবনীরচনায় হাত দিয়েছেন অনেকে। যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল মধুসূদন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী, গিরিজাপ্রসন্ন চৌধুরীর শ্রীঅরবিন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বিবেকানন্দচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ খ্যাতিলাভ করেছে। নূতন তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী প্রকাশে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিনয় ঘোষ। এ ছাড়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ ব্যক্তিদের উৎসাহে প্রকাশিত

সাহিত্যসাধকচরিতমালা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই-সব রচনার মূল আদর্শ মনে হয় বিলাতে Morleyর *English Men of Letters* পর্যায়ের রচনা। গবেষণার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চরিত্ররূপ গঠনের প্রয়াস। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সত্যসন্ধানের পরিশ্রম ও প্রক্রিয়া জীবনরসকে ব্যাহত করেছে। জীবনীসাহিত্য মূল্যবান্ কিন্তু নীরস গবেষণা গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

স্মৃতিকথা লেখারও একটা বহুল প্রচলন সম্প্রতি হয়েছে। এর অনেকগুলিই বেশ সুখপাঠ্য। স্থায়িত্বের দাবি করতে পারে এমন লেখা ঘরোয়া, জোড়াসাঁকোর ধারে, ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর কিছু-কিছু লেখা, দিলীপকুমার রায়ের স্মৃতিসাহিত্যের কিছু কিছু অংশ।

জীবনীরচনার একটি বিশ্ববিখ্যাত আদর্শ হচ্ছে বস্‌ওয়েলের *Dr Johnson*। বাংলা সাহিত্যের অশেষ সৌভাগ্যক্রমে কোনো সাহিত্যপ্রয়াসের অভিমান না রেখে সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রেরণায় শ্রী ম রামকৃষ্ণ কথামৃত রচনা করে ঐ আদর্শের একটি অমূল্য নিদর্শন বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন। নিরপেক্ষ নিরভিমান অথচ মহত্ত্বের সমস্ত ইঙ্গিতের প্রতি উন্মুক্ত যে সাক্ষীমানসের তিনি পরিচয় দিয়েছেন তা পৃথিবীর জীবনীসাহিত্যেও দুর্লভ। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন পাঠক-প্রয়োজনের উপযোগী ও বিভিন্ন মূল্যস্তরের অনেক বই লেখা হয়েছে। কিন্তু স্থায়ী মর্যাদার দিক থেকে রামকৃষ্ণকথামৃতের সমান কোনোটিই নয়। এর থেকে একটা জিনিস প্রমাণিত হয়। নিপুণ শব্দালংকার ও ভাবোচ্ছ্বাসে জীবনী-রসকে দ্রুত বহু জনপ্রিয় ক'রে তোলা যেতে পারে, তা। হয়তো দরকারও আছে। কিন্তু তাতে জীবনী-সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থায়ী সাহিত্যিক সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব নয়। তার উদাহরণ হিসাবে সম্প্রতি প্রকাশিত কোনো কোনো বহু জনপ্রিয় জীবনীগ্রন্থের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

জীবনীর চেয়ে আত্মজীবনীতেই মনে হয় বাংলা সাহিত্য আরও বেশি সমৃদ্ধ। দুঃখের বিষয়, রামমোহন যে আত্মকথাটুকু লিখেছিলেন তা ইংরেজিতে। ঈশ্বরচন্দ্রও লিখেছিলেন একটি সংক্ষিপ্ত আত্মচরিত যা তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখার ধরণটি সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক, উচ্ছ্বাসহীন। কিন্তু এই আত্মাভিমানলেশহীন রচনাটি শুধু একটি চরিত্র-সংস্পর্শ-রহিত ঘটনাপঞ্জী বলে মনে করলে ভুল হবে। এর মধ্যে সহজেই আবিষ্কার করা যায় ঈশ্বরচন্দ্রের কঠোর সত্যানুরাগ, নিরভিমান আত্মপ্রত্যয়, উদার কৌতুকবোধ, সদয় অথচ খরধার তাঁর sense of irony বা ব্যঙ্গচেতনা। তিনি লিখেছেন: জন্মসময়, পিতামহদেব, পরিহাস করিয়া আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল। আর সময়, সময়, কার্য দ্বারাও এঁড়ে গরুর পূর্বোক্ত লক্ষণ আমার আচরণে বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।"

বঙ্কিম আত্মজীবনী লেখেন নি। কিন্তু তাঁর কমলাকান্ত পর্যায়ের রচনা পড়লেই বোঝা যায় এ ক্ষেত্রে কি বিচিত্র ঐশ্বর্য তাঁর লেখনী থেকে আমাদের সাহিত্য লাভ করতে পারত। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তকেও বলা যায় প্রচ্ছন্ন জীবনী। উপন্যাস-সাহিত্যের লাভ এ-সব ক্ষেত্রে জীবনীসাহিত্যের প্রাপ্য হরণ করেছে। প্রমথ চৌধুরীর মত লেখক memoirs বা আত্মকথা লিখলে তা এক নতুন উৎকর্ষের সূচনা করত নিশ্চয়। তিনি এমনকি তাঁর পরিণত জীবনের দীর্ঘ অবকাশের মধ্যেও তা করলেন না কেন, যদিও অতীত স্মৃতি ও আলোচনা তাঁর কথোপকথনের প্রধান উপাদান ছিল?

এর পর আমরা পাই দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী। ধর্মজীবনের ব্যাকুল অনুসন্ধিৎসার দিক থেকে

হয়তো এর সঙ্গে তুলনা করা যায় St. Augustineএর *Confessions*এর। St. Augustineএর প্রথমজীবনের সমস্যা ছিল তাঁর খেলাধুলায় আসক্তি, ধর্মগ্রন্থের চেয়ে গ্রীকোরোম্যান্ সাহিত্যের জৌলুসের দিকে আকর্ষণ— এক কথায় অন্তর্জীবনের গভীর সম্পদের চেয়ে বাইরের জীবনের কৃতিত্ব ও যশের আকাঙ্ক্ষা। মহর্ষিও বর্ণনা করেছেন তাঁর জীবনে বিলাস ও বৈরাগ্যের দ্বন্দ্ব। এই প্রথমজীবনের পরিবর্তন বর্ণনায় দুই মহাত্মার আত্মজীবনীতে একটা সাদৃশ্য দেখা যায় যদিও প্রত্যেকের মনোভঙ্গি ও প্রকাশরস আলাদা। কিন্তু তা ছাড়া দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের ও শিল্পীমনের যে মৌলিক দিকগুলি তাঁর আত্মজীবনীতে প্রকাশলাভ করেছে তার কোনো তুলনা *Confessions*এ নেই। সত্যসন্ধানে মহর্ষির ঋজুতা ও দার্ঢ্য, ভাবগ্রাহিতায় তাঁর অকপট উদারতা, অপক্ষপাত বিচারক্ষমতা, সর্বানুভূতির সাধনায় তাঁর উচ্ছ্বাসহীন সংহত আবেগময়তা তাঁর রচনায় এমন-একটি সাহিত্যশ্রী এনে দিয়েছে যা দুর্লভ। অথচ, মনে হয়, এই বই বাংলা সাহিত্যে পূর্ণ স্বীকৃতি আজও লাভ করে নি। প্রকৃতিসম্ভোগরস, আর মৌলিক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ সার্বিক আবেদনের যে ঐশ্বর্য এই বইয়ে ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথ যে তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিছু-কিছু উদ্ধৃতি থেকে এ কথা বোঝা যাবে।

"সন্ধ্যার সময়ে আমি এই বাগানে গঙ্গাতীরে বন্ধুদের সঙ্গে বসিতাম। বর্ষার ঘন মেঘ আমার মাথার উপরে আকাশ দিয়া উড়িয়া উড়িয়া চলিয়া যাইত। সেই নীল নীরদ আমাকে তখন বড়ই সুখ দিত, বড়ই শান্তি দিত, মনে করিতাম ইহারা কেমন কামচার, কেমন মুক্তভাবে যেখানে সেখানে ইচ্ছামত চলিয়া যাইতেছে। আমি যদি ইহাদের মত কামচার হইতে পারি, ইচ্ছামত যেখানে সেখানে চলিয়া যাইতে পারি, তবে আমার বড়ই আনন্দ হয়।"

আবার আর একদিন হিমালয়ের পথে পথ-হারানোর অভিজ্ঞতার বর্ণনা: "সেই অন্ধকারের দীপ হইয়া অর্ধচন্দ্র আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। কোনো দিকে কোনো সাড়াশব্দ নাই, কেবল পায়ের শব্দ পথের শুষ্ক পত্রের উপর খড়্খড়্ করিতেছে। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কি এক গম্ভীর ভাব হইল। রোমাঞ্চিত শরীরে সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের চক্ষু দেখিলাম— আমার উপর তাঁহার অনিমেষ দৃষ্টি রহিয়াছে।"

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী লেখা শেষ হয় ১৮৯২ সালের মধ্যে। প্রকাশিত হয় অনেক পরে, তাঁর মৃত্যুর পর। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত লেখা হয় আরও আগে, হয়তো ১৮৭৪।৭৫ এর মধ্যে, প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে, এই বইটির মূল্য অনেক কারণে। তখনকার সেই ধর্ম ও সমাজ -সংস্কারের দিনে লেখক নিজের চিন্তা ও কর্মের একটা বিবরণী এতে দিয়েছেন, সম্পূর্ণ নিস্পৃহভাবে নিজের মত ও দানের বিষয় যেটুকু জানানো দরকার জানিয়েছেন। এইটিই এই বইএর প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে অকপটে নিজ চরিত্রের দোষগুণ প্রকাশ, সেই সময়কার নানা সামাজিক রীতির বর্ণনা ও নানা বিখ্যাত ব্যক্তির চরিত্রের সরস নিপুণ চিত্রণের সমন্বয়ে বইটির সাহিত্যমূল্য অনেক বেড়ে গেছে। এক দিকে যেমন আমরা জানতে পারি ব্রাহ্মধর্মে প্রেমের প্রবর্তন রাজনারায়ণেরই কৃতিত্ব, স্বদেশী মেলার প্রেরণাও প্রথম তিনিই দেন, অপর দিকে দেখি কেমনভাবে তাঁর পিতা তাঁর অপরিমিত সুরাসক্তি দূর করবার চেষ্টা করছেন, ভীরু বাঙালীপনার জন্যে বন্দুক ছুঁড়তে তাঁর কত ভয়, মাছের ঝোল-ভাত কয়েক দিন খেতে না পেয়ে তাঁর কি কষ্ট। তাঁর এই রচনায় দেবেন্দ্রনাথের অনেক দিক থেকে চরিত্রচিত্র পাওয়া যায়। মধুসূদন একবার

নিমন্ত্রণ ক'রে সস্ত্রীক তাঁকে আপ্যায়িত ক'রে তার পর যা করলেন তা হচ্ছে এই— "মধু প্রচুর মদ্যপান করিলেন। বিদায় লইবার সময় তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কষে ক্রমাগত মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। মধুর যাহা দোষ থাকুক না কেন কিন্তু হৃদয় একেবারে প্রেম ও স্নেহে পূর্ণ ছিল।"

Mill তাঁর *Autobiography*তে যেমন তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও জীবন-আদর্শের একটা সমর্থন দেবার চেষ্টা করেছেন, রাজনারায়ণও প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্যের দ্বারাই প্রভাবিত। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে আমরা পাই সত্যিকার আত্মজীবনীর রস। Samuel Pepysএর যে বিখ্যাত Diary তার অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গি, তার অকপট অথচ আতিশয্যহীন আত্মপ্রকাশ -ক্ষমতার জন্য এতদিন রসিকচিত্তের প্রশংসা পেয়ে এসেছে সেই আদর্শেরই একটি সুন্দর নিদর্শন দেখি শিবনাথের আত্মচরিতে। সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্যভাবে, অথচ গভীর সহানুভূতির সঙ্গে অল্পকথায় কেমন করে এক-একটি চরিত্রচিত্রকে জীবন্ত করে তোলা যায় তার অনেক দৃষ্টান্ত তিনি দেখিয়েছেন। সত্য কথা বলতে কি, উনিশ শতকের বাংলার জীবন-চিত্রশালার প্রধান জানলাটিই আছে এই শিবনাথের রচনার মধ্যে। তাঁর রচনা না থাকলে তখনকার অনেক বিখ্যাত চরিত্রই— যেমন ধরা যাক কেশবচন্দ্র সেন— আমাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যেত। তা ছাড়া শিবনাথের নিজের জীবনের সাধনাটিরও মূল্য কম নয়। তাঁর পরিজনের ছবি যেমন ফুটেছে তাঁর লেখায়, তেমনি তাঁর নিজের আদর্শনিষ্ঠা ও আত্মদানের রূপটিও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যদিও তিনি বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নি আত্মপ্রচারের।

নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' একটু স্বতন্ত্র ধরণের। অবজেক্টিভ বা তথ্যকেন্দ্রিক না বলে একে বলা যায় সাবজেক্টিভ বা আত্মকেন্দ্রিক, ক্লাসিকাল না বলে বলা উচিত রোম্যান্টিক। এর মেজাজ অনেকটা রুশোর বিখ্যাত *Confessions*এর মত। এই বইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা তখনকার দিনের রাজকর্মচারীদের জীবনের সমস্যা, বাঙলার পথঘাট প্রান্তর ও লোকজীবন, বাঙালী পরিবারের নানা বৃত্তান্তের অতি সরস বর্ণনা পাই। তা ছাড়া পাই নবীনচন্দ্র সেনের নিজের হৃদয়-মনের পরিচয়। তাঁর কাব্য যুগ-পরিবর্তনের ফলে তার আবেদন হয়তো অনেক পরিমাণে হারিয়েছে। কিন্তু তাঁর এই জীবনী এখনো সাক্ষ্য বহন করছে উদার কবিহৃদয়ের, তাঁর মনুষ্যত্বের, তাঁর প্রতিভার।

আরো যে দুখানি সেরা আত্মজীবনী পেয়েছি আমরা আমাদের বাংলা সাহিত্যে তা হল রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' ও রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'। দেখা যাবে, শুধু একটা তথ্যচেতন নিরপেক্ষতা নয়, একটা আধ্যাত্মিক নিরাসক্তিই এই দুটি রচনাকে আত্মপক্ষপাত থেকে মুক্ত করেছে। শুধু বুদ্ধিময়তা হৃদয়কে অনেকটা আচ্ছন্ন করতে ও কঠোর সংযমে বাঁধতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই দুই গ্রন্থে দেখি গভীর ভাবানুভূতিও আছে, আবেগও আছে— কিন্তু একটা উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনাসক্তিই কোথাও আতিশয্যকে প্রশ্রয় দেয় নি। তাই রাসসুন্দরীর পারিবারিক জীবনের বর্ণনা এত সুন্দর হয়ে ফুটেছে। "রাত্রে পাকসাক করাতেই ভারি রাত্রি হইয়া পড়ে। তখন ঐ সকল কাজ মিটিতে না মিটিতেই ছেলেপিলেগুলি জাগিয়া উঠিয়া বসে। তখন লেখাপড়া করিবার আর সময় থাকে না। সুতরাং ঐ লেখা পাতাটি আমি কেমন করিয়া পড়িব?" আবার লিখছেন রাসসুন্দরী— "ঐ ১২৭৫ সালে কর্তাটির মৃত্যু হয়। আমার শিরে স্বর্ণমুকুট ছিল, কিন্তু এতকাল পরে সেই মুকুটটি খসিয়া পড়িল।" এরই সঙ্গে মাঝে-মাঝেই লেখিকার এই ধরণের উক্তি আছে: "১২১৬ সালে আমার জন্ম হইয়াছে, এইক্ষণে আমার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর। ভারতবর্ষে আমি

অনেক দিবস আসিয়াছি। এত দিবস এখানে বসিয়া কি করিয়াছি?" এর উত্তর এই যে, লেখিকা নিজের চেষ্টায় তখনকার দিনে লেখাপড়া শিখেছেন এবং তাঁর সময়কার বাঙালী পরিবারের সুখদুঃখের এমন-একটি বিবরণ রচনা করে গিয়েছেন যা আমাদের সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে শুধু কিছু ইঙ্গিতই এখানে দেওয়া যেতে পারে। সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ রোম্যান্টিক ও ক্লাসিকাল আদর্শের যে মিলনের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, যার প্রথম নিদর্শন দেখি দেবেন্দ্রনাথে, তারই পূর্ণ প্রস্ফুটন রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে। ব্যক্তিজীবন অন্তর্জীবনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানবজীবনের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা আছে রবীন্দ্রনাথেরও। কিন্তু তা একটি সহজ নিরাসক্তির পরিমিতির মধ্যে বাঁধা। লেখক আবার যখনই নিজের অন্তর্লোক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন বাইরের জগতে, বাইরের লোকের দিকে, তখন এমন দৃশ্য এমন চরিত্র অল্পকয়েকটি রেখা ও রঙের টানে মূর্তিলাভ করেছে যা অবিস্মরণীয়। আর নিজের ব্যক্তিত্বকে কোথাও সরাসরি সামনে উপস্থিত করবার চেষ্টা না করা সত্ত্বেও জীবনস্মৃতির প্রতি ছত্র রবীন্দ্রচরিত্ররসে পূর্ণ। পড়তে আরম্ভ করলেই পৌঁছাতে হয় একেবারে তাঁর চৈতন্যলোকে।

এ ছাড়া স্বগতচিন্তা বা চৈতন্য-প্রবাহের অনুলিপি লেখাও একধরণের আত্মজীবনী, যার একটি চমৎকার নিদর্শন পাই আঁদ্রে জিদ -এর জার্নালে। এ ক্ষেত্রে কাজ করেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র এই ধরণের আত্মজীবনীরচনায় তাঁর যে কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে এক গ্যেটের আত্মজীবনী ছাড়া আর কোথাও নেই!

ভারতবর্ষীয় সভা জাতিসংগঠনে ও স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

প্রতিষ্ঠার পর হইতেই ভারতবর্ষীয় সভা স্বীয় উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কার্য করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ষীয়ান্ রাজা রাধাকান্ত দেব সভার সভাপতি এবং কর্মকুশল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক। অধ্যক্ষ-সভায় সে যুগের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সদস্য। কাজেই সভার কার্য যে অতিশয় তৎপরতার সহিত অনুষ্ঠিত হইতে থাকে তাহা বলাই বাহুল্য। রাজা রাধাকান্ত দেব বার্ধক্যহেতু অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারিলেও পত্রদ্বারা পরামর্শ প্রদান করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ১৩ ডিসেম্বর ১৮৫১ তারিখে সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁহার পত্রের কিয়দংশ এই—

As the main object of the Association is to remove the existing defects in the laws and civil administration of the country by representing them to Parliament on the occasion of the ensuing discussion on the East India Company's charter I beg to suggest that it would be advisable to procure a copy of the present charter with the view of examining how far the local Government have acted up to those of its articles which have any relation with the welfare of this country and which of them have proved beneficial and which injurious.

I beg further to suggest that a person thoroughly acquainted with the manners and customs of our country, well-versed in jurisprudence and the Enactments of our Legislative Council, possessing powers of eloquence and mastery in the English language and bearing a respectable and an unimpeachable character should be qualified for the post of an agent who may be appointed for the object stated in Rule 44th. He should be furnished with full informations of the existing grievances of our country which it ought to be the duty of the Managing Committee first of all to collect.[১]

অধ্যক্ষ-সভা সভাপতির উপদেশমত অবিলম্বে কার্যে অগ্রসর হইলেন। তখন সরকার আমাদের জাতীয় জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পক্ষপুট বিস্তার করিতেছিলেন। রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় সামাজিক অর্থনৈতিক এমন কোনো বিষয় ছিল না যাহাতে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে বিরত হইতেন। নব্যশিক্ষা ভারত-সন্তানদের

১ সমগ্র পত্রখানি, এবং বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ সংখ্যায় মুদ্রিত প্রবন্ধে প্রদত্ত রাধাকান্ত দেবের পত্র এবং আরও একখানি পত্রসমেত ১১ জুলাই ১৯৪২ তারিখের *The Calcutta Municipal Gazette* সাপ্তাহিকে Pre-Mutiny Political Institutions of Calcutta : Early History of The British Indian Association প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করি। সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত এই অমূল্য পত্র তিনখানি রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগারে তাঁহার চিঠিপত্রের পাণ্ডুলিপির মধ্যে পাই।—লেখক

তখন নূতন আশায় উদ্দীপিত করে। এই সময়ে ভারতীয় জীবনে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন শাসনপদ্ধতি নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার পথে বিঘ্ন ঘটাইতেছিল। শাসনে ভারতীয়দের কোনো কথা খাটিত না। প্রতি কুড়ি বৎসর অন্তর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট হইতে কোম্পানি সনন্দ লাভ করিত। ইহার নূতন সনন্দ পাইবার সময় আসন্ন। এ কারণ ভারতীয় শাসনব্যবস্থার দোষত্রুটি দেখাইয়া তাহার সংস্কার ও উন্নতি -সাধনে যতটা সম্ভব প্রয়াসী হইতে হইবে। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই তিন বৎসরের জন্য ভারতবর্ষীয় সভার প্রতিষ্ঠা। অবশ্য ইহার অন্যান্য উদ্দেশ্যও ছিল। বস্তুত জাতিগঠনমূলক বিবিধ বিষয়ে সভা কার্য করিতে অগ্রসর হইলেন। যেসব আইনকানুন ও বিধিব্যবস্থা ইহার পথে অন্তরায় তাহার বিদূরণে এবং যেসব ব্যবস্থা কল্যাণকর তাহার সমর্থনে সভা রত হন। বহু বিষয়েই এই সময় সভা মন, সংযোগ করিয়াছিলেন। সব কথা বলিবার অবকাশ নাই। মূল বিষয়গুলি সম্বন্ধেই এখানে কিছু বলিব।

প্রথমেই একটি কথা বলা দরকার। সে যুগে ভারতবর্ষীয় সভা যেসব গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এতদিন বড়ই ভাসা-ভাসা ছিল। প্রধান প্রধান সদস্যের জীবনীগ্রন্থ হইতে আমরা কোনো কোনো বিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম। বারো-তেরো বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষীয় সভার প্রথম পঁচিশ বৎসরের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে গিয়া একটি অমূল্য আকরের সন্ধান পাই। সভার প্রথম সাত-আট বৎসরের সাধারণ মাসিক অধিবেশনের বিস্তারিত কার্যবিবরণ সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্থান পাইত। এই সকল কার্যবিবরণ হইতে ঐ সময়কার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলন করিতে তখন সমর্থ হই। তাহারই ভিত্তিতে এখানে সভার মূল কার্যাবলীর কথা বলিতে প্রয়াস পাইব।

অধ্যক্ষ-সভা প্রথমাবধি কোনো কোনো প্রস্তাবিত ও বিধিবদ্ধ সরকারি আইনের— যেমন চৌকিদারি ও পুলিস আইনের— প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু আসল কার্যের দিকেও তাঁহারা সমান অবহিত থাকেন। প্রথমেই সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ কোম্পানির আসন্ন সনন্দ পুনঃপ্রাপ্তির কালে ভারতবাসীদের ইতিকর্তব্য নির্ধারণকল্পে মাদ্রাজ বোম্বাই ও আগ্রার নেতৃবৃন্দকে ১৩ ডিসেম্বর ১৮৫১ তারিখে একখানি পত্র[২] লেখেন। পত্রে বলা হয় যে ঐ ঐ প্রদেশে যাহাতে অবিলম্বে রাজনৈতিক সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সম্ভব হইলে ভারতবর্ষীয় সভার সঙ্গে একযোগে ভারতশাসনের সংস্কার ও উন্নতি সম্পর্কে তাঁহারা পার্লামেণ্টে অচিরে আবেদন প্রেরণ করেন সেইজন্য যেন বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। ঐকমত্য প্রকাশের নিমিত্ত সকলের একযোগে একখানি লিপি প্রেরণ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়াও দেবেন্দ্রনাথ জানাইলেন। তিনি আরও লেখেন যে, এরূপ কার্যে খরচের দিক হইতেও তাহাদের বিশেষ লাভ হইবে, কেননা বিলাতে তাহাদের পক্ষে একজন এজেণ্ট বা উকিল রাখিলেই চলিবে। এই পত্রে বিশেষ কাজ হইল। পুণা হইতে বিষ্ণু মোরেশ্বর বিনায়ক এইরূপ সভা স্থাপনে তাঁহাদের ঐ অঞ্চলবাসীর সংকল্পের কথা ভারতবর্ষীয় সভাকে জানাইলেন। ১৮৫২ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে ভারতবর্ষীয় সভার আদর্শে পুণায় 'ডেকান অ্যাসোসিয়েশান', বোম্বাইএ 'বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশান' প্রতিষ্ঠিত হইল। মাদ্রাজবাসীরা ভারতবর্ষীয় সভার শাখা-স্বরূপ সেখানে একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপন করিলেন। সম্মিলিতভাবে আবেদনপত্র প্রেরণের

২ দেবেন্দ্রনাথের এই পত্রখানি *Rise and Growth of the Congress in India*: Andrews and Mukherjee গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রস্তাবে কিন্তু তাঁহারা রাজী হইতে পারিলেন না। তবে স্থানীয় সমস্যাগুলি সন্নিবেশিত করিলেও তাঁহারা ভারতবর্ষীয় সভার আবেদনপত্রের আদর্শেই নিজ নিজ পত্র রচনা করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় সভা কালবিলম্ব না করিয়া বিলাতে ১৮৫২ জানুয়ারি নাগাদ জি জে. গর্ডনকে নিজস্ব এজেণ্ট বা উকিল নিযুক্ত করিলেন। গর্ডন ছিলেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ, ভারতহিতৈষী বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁহার বার্ষিক বেতন হইল এক হাজার পাউণ্ড এবং আপিস-খরচার জন্য বার্ষিক আড়াই শত পাউণ্ড দেওয়া স্থির হইল। সভার সদস্যগণ বর্ধিতহারে চাঁদা দিয়া এই খরচ মিটাইবেন ইহাও ধার্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে আবেদনপত্র রচনারও তোড়জোড় পড়িয়া গেল। সভার বিশিষ্ট সদস্যগণ ইহা রচনায় ব্যাপৃত হইলেন। যতদূর জানা যায়, সম্পাদক বাদে রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সহকারী সম্পাদক দিগম্বর মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ এজন্য খুবই শ্রমস্বীকার করেন। এপ্রিল মাসের মধ্যেই আবেদনপত্রের খসড়া প্রস্তুত হইল।[২] ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের উপর ইহাতে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়। শুধু দোষত্রুটি দেখাইয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, যাহাতে ভারতীয় প্রজাসাধারণের হিতকল্পে যথোপযুক্ত সংস্কার ও সংশোধন হইতে পারে তাহারও উপায়নির্দেশ দেওয়া হয় ইহার মধ্যে। আবেদন-পত্রখানি সম্বন্ধে 'বেঙ্গল হরকরা' ৮ মে ১৮৫২ তারিখে লেখেন—

We understand that the Calcutta British Indian Association have drawn up a bulky and voluminous Code of suggestions relative to the future Government of India to be presented at the ensuing Parliamentary discussion on the subject of the expiration of the East India Company's current charter. The document is going round of the members for their consideraion and approval. The alterations that it suggests are nearly similar in design to those recommended in the pamphlet by "A Friend of India" who was lately noticed in this Journal. The Association also urged the justice and the expediency of the total abolition of the Board of Control, which so much clog the wheels of the improvement of this country. We have heard of the proceeding, on the part of the Association long since . . . .

সদস্যদের নির্দেশমত সংশোধনান্তে আবেদনপত্রের একটি খসড়া প্রস্তুত করা হইল এবং শহরে ও মফস্বলের অধিবাসীদের স্বাক্ষরের নিমিত্ত প্রেরিত হইতে লাগিল। যাহাতে অধিকতর বিলম্ব না হয়, সেজন্য সভা ইহার একখানি প্রতিলিপি ১৮৫২ সালের ৮ আগস্ট হিন্দুস্থান জাহাজযোগে বিলাতে গর্ডনের নিকট পাঠাইলেন। উহা প্রাপ্তিমাত্র গর্ডন পার্লামেণ্টের বিশিষ্ট সদস্যগণকে, পার্লামেণ্ট-নিযুক্ত কমিটিগুলিকে এবং ভারতহিতৈষী বন্ধুবর্গের গোচরে ইহা পেশ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, ইহার পরে

২ রামগোপাল সান্যাল *Bengal Celebrities* পুস্তকে আবেদনপত্রখানি রচনায় একমাত্র হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা দিগম্বর মিত্রের ইংরেজি জীবনীগ্রন্থে লেখক ভোলানাথ চন্দ্র ইহার দৃঢ় প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, এই বিখ্যাত আবেদনপত্রের রচনায় বহু সদস্য মনীষীরই হাত ছিল। কোনো একক ব্যক্তিকে এই সম্মান দেওয়া মোটেই সমীচীন নয়। সভার কার্যবিবরণে দেখিতেছি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ভারতবর্ষীয় সভার সাধারণ সদস্য হন। সুতরাং তাঁহার সদস্য হইবার দুই-তিন মাস পূর্বেই এই আবেদনপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। আমি রামগোপাল সান্যালের উক্তির উপর নির্ভর করি এবং হরিশ্চন্দ্র আবেদনপত্র রচনায় একান্তভাবে ব্রতী হইয়াছিলেন বলিয়া কোনো কোনো পুস্তকে ইতিপূর্বে ভ্রমক্রমে উল্লেখ করিয়াছি।—লেখক

তিনি মারা যান। তবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মি. ম্যাকফারসনও সভার সপক্ষে আন্তরিকভাবে কার্য করিতে থাকেন। অন্যান্য প্রদেশ হইতেও এই বৎসরের সেপ্টেম্বর নাগাদ আবেদনলিপি বিলাতে যথাস্থানে প্রেরিত হয়। ভারতবর্ষীয় সভার সংশোধিত মূল আবেদনপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া পাঠাইতে ঢের বিলম্ব হইয়া যায়। সভার সভাপতি সম্পাদক সদস্যবৃন্দ এবং বহু সহস্র অধিবাসীর স্বাক্ষর সম্বলিত হইয়া এখানি বিলাতে পৌঁছিল এবং উভয় পার্লামেন্টে পেশ করা হইল ১৯ এপ্রিল ১৮৫৩ তারিখে। তবে আগেকার পাঠানো আবেদনপত্রেই ঢের কাজ হইয়াছিল।

জাতীয় সংগঠনে, তথা জাতির সর্ববিধ উন্নতিকল্পে, শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ একান্ত আবশ্যক এই ভাবনার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই ভারতবর্ষীয় সভা আবেদনপত্রখানি-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ কারণ ইহা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়াকার দিকের একখানি প্রকৃষ্ট দলিল।[৩] এই আবেদনপত্রে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা হয় তাহার কয়েকটি সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আবশ্যক। এতদিন ভারতবর্ষের শাসক ও ব্যবস্থাপক বা আইনপ্রণেতা ছিলেন স-কৌন্সিল বড়লাট। সভা আবেদনপত্রে ইহার অপকারিতা সম্বন্ধে প্রথমেই উল্লেখ করেন। তাঁহারা প্রস্তাব করেন, শাসন-পরিষদ্ এবং সভা সম্পূর্ণ আলাদা হইবে। শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় আইন-প্রণয়নের ভার থাকিবে আইনসভার উপর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অপরাপর ক্রাউন কলোনির মত এখানেও আইনসভাকে প্রতিনিধিমূলক করিতে হইবে আইন-সভা প্রস্তাব করেন, মোট সতেরো জন সদস্য লইয়া আইনসভা বা পরিষদ্ গঠিত হইবে এবং এই সদস্যদের নয় জন হইবেন ভারতীয়। বাংলা বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রত্যেকটি প্রদেশ হইতে তিন জন করিয়া সদস্য গ্রহণ করিতে হইবে। বড়লাট প্রথমে মনোনয়ন এবং পরে নির্বাচনের উপায় নির্ধারণপূর্বক সদস্যদের ঠিক করিয়া লইবেন। আইনসভায় গৃহীত কোনো বিধি সম্পর্কে বড়লাটের সম্মতি পাইলেই তবে উহা আইনে পরিণত হইতে পারিবে।

শতবর্ষ পূর্বে ভারতবর্ষে প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা ভারতবর্ষীয় সভার কর্তৃপক্ষ কিরূপ গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন এই প্রস্তাবটি হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। শাসনসংস্কারবিষয়ক অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে কোম্পানির সনন্দের মেয়াদ কুড়ি বৎসর হইতে অন্তত দশ বৎসরে কমানো, বিলাতের বোর্ড অব কন্ট্রোলের বিলুপ্তি, কোম্পানির ডিরেক্টর-সভার সম্প্রসারণ, বাংলাদেশকে বড়লাটের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে না রাখিয়া ইহাকে একজন লেফটেন্যান্ট গবর্নরের শাসনাধীন করা, শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, উচ্চতন কর্মচারীদের বেতন হ্রাস করিয়া নিম্নতন কর্মচারীদের বেতন-বৃদ্ধি, বিচার-বিভাগের সংস্কার, সুপ্রীম কোর্ট ও সদর আদালতগুলি একীভূত করিয়া হাইকোর্ট গঠন, সমাজস্থিতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনবিধি প্রণয়ন, লবণ ও অহিফেনের একচেটিয়া ব্যাবসার বিলোপসাধন, শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে ব্যাপক ব্যবস্থা— এই বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

৩ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এই আবেদনপত্রখানি ১৮৫২-৫৩ খ্রীস্টাব্দের Parliamentary Papers এর মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। ইহার কিয়দংশ শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার *History of Political Thought from Rammohan to Dayananda* (1934) গ্রন্থের পরিশিষ্টে উদ্‌ধৃত করিয়াছেন।

আবেদনপত্রখানি বিলাতে পাঠাইয়াই সভা ক্ষান্ত হইলেন না, ইহার বাংলা ও উর্দু অনুবাদ করাইয়া সাধারণের মধ্যে প্রচারেরও ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহারা ১৮৫৩ সালের ২৯ জুলাই ইহার সমর্থনে কলিকাতা টাউন হলে একটি জনসভারও অনুষ্ঠান করেন। এই বৎসরের গোড়ার দিকে ভারতহিতৈষী কয়েকজন পার্লামেণ্ট-সদস্য এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি মিলিয়া লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া রিফর্ম সোসাইটি' স্থাপন করেন। ইহারও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, আসন্ন সনন্দকে যথোপযুক্তভাবে ভারতবাসীর অনুকূল করিয়া তোলা। ভারতবর্ষীয় সভা এই নবগঠিত সোসাইটিকে শুধু অভিনন্দন করিয়াই বিরত হইলেন না। প্রচারকার্য পরিচালনার নিমিত্ত ইহাকে অর্থ-সাহায্যও মঞ্জুর করিলেন। অধিকতর অর্থ প্রেরণের উদ্দেশ্যে সভা কলিকাতায় ২৬ জুন ১৮৫৩ তারিখে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে একটি জনসভাও আহ্বান করেন। লণ্ডনস্থ সভার সভাপতি পার্লামেণ্ট-সদস্য ড্যান্‌বি সিমুর এই বৎসরের প্রথমে স্বচক্ষে ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিবার জন্য ভারতপর্যটন করিলেন। পার্লামেণ্ট-নিযুক্ত কমিটিগুলিতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে সব সদস্য সাক্ষ্য দেন তাঁহারা সকলেই শ্বেতাঙ্গ। ভারতহিতৈষী ইংরেজগণ ভারতবর্ষীয় সভার আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্য ও যুক্তির উপর বেশি করিয়া নির্ভর করিয়াছিলেন উঁহাদের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদানের সময়ে, ভারতবর্ষীয় সভার অন্যতম অধ্যক্ষ প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিত ভারতবর্ষের পক্ষাপক্ষ সকল সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্তসার মন্তব্যসহ ইংরেজিতে একখানি পুস্তকে প্রকাশিত করেন, -*Notes on the Evidence on Indian Affairs*। ৩১ জুলাই ১৮৫৩ উভয় পার্লামেণ্টে নূতন সনন্দ পাস হইয়া পরবর্তী ২৭ আগস্ট রাজকীয় সম্মতি লাভ করে এবং যথাবিধি আইনে পরিণত হয়।

নূতন সনন্দ আইন এ দেশে পৌঁছিলে ভারতবর্ষীয় সভা তাঁহাদের আবেদনপত্রের নিরিখে ইহাকে যাচাই করিয়া লইতেও কালবিলম্ব করিলেন না। তাঁহাদের প্রস্তাবগুলি কোনোটি অংশত এবং কোনোটি সম্পূর্ণ গৃহীত হয়। আবার কোনো কোনো বিষয় তাহাদের প্রস্তাব আদৌ টিকে নাই। বড়লাটের শাসন-পরিষদ্ হইতে আইনসভা পৃথক করা হইল বটে, কিন্তু ইহাতে একজনও ভারতীয় গ্রহণের ব্যবস্থা হইল না। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সনন্দ আইন চালু হইবার পর বড়লাটের বিবেচনার উপরেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বোর্ড অব কণ্ট্রোল (পরবর্তীকালের 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিল') উঠিয়া গেল না বটে, তবে ডিরেক্টর-সভার খানিকটা সংস্কারের ব্যবস্থা হইল। বাংলাদেশ একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্তার অধীনে আনিবার প্রস্তাবও পুরাপুরি গৃহীত হয়। সভা সনন্দ আইনের একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন। ইহাতে স্থির হয় যে, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট কোনো সময় নির্দিষ্ট না করিয়া প্রয়োজন হইলেই যে কোনো সময়ে কোম্পানির সনন্দ তথা কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারিবেন। একটু আগেই বলিয়াছি সভার মূল প্রস্তাব ছিল, কোম্পানির সনন্দপ্রাপ্তির কাল কুড়ি বৎসর হইতে কমাইয়া দশ বৎসর করা। ইহার পর প্রতি বৎসরই ভারতশাসন সম্পর্কে পার্লামেণ্টে আলোচনা হইতে শুরু হয়।

পৃথকীকৃত আইনসভা বা পরিষদ্ মোট এই বারোজন সদস্য লইয়া গঠনের কথা হইল—সপরিষদ্ বড়লাট লইয়া পাঁচজন (ইহার মধ্যে জঙ্গীলাটও একজন), বাংলার লেফটেনাণ্ট গবর্নর, বাংলা মাদ্রাজ বোম্বাই ও আগ্রা হইতে একজন করিয়া সিবিলিয়ান (অন্যূন দশ বৎসরকাল কার্যে লিপ্ত), এবং কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অপর একজন বিচারপতি। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লইয়া ভারতবর্ষীয় সভা কিছুকাল পরেই পুনরায় আন্দোলন শুরু করিয়া দেন। এ কথা একটু পরে বলিতেছি। ভারতীয় সিবিল

সার্ভিসের দ্বার এতদিন সাধারণের নিকট রুদ্ধ ছিল, কোম্পানির ডিরেক্টরদের সুপারিশেই সিবিলিয়ান কর্মচারিগণ বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিতেন। নূতন সনন্দে ইহার দ্বার সাধারণের নিকট উন্মুক্ত হইল বটে, কিন্তু ইহা কার্যকর করার যে রকম ব্যবস্থা হয় তাহাতে শুধু ইংরেজ সন্তানদেরই সুবিধা হইল। ভারতবাসীরা যথাপূর্ব ইহার সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইলেন। ভারতবর্ষীয় সভা এতাদৃশ ব্যবস্থায় বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন, আর এ বিষয়ে আন্দোলন করিতেও তাঁহারা অবিলম্বে অগ্রসর হন। দেখা যাইতেছে, কংগ্রেস প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে শাসনে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে যেসকল আন্দোলন পরিচালনায় মনঃসংযোগ করেন, এই সময়ে ভারতবর্ষীয় সভার কার্যের মধ্যেই তাহার বীজ উপ্ত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় সভা প্রথমে মাত্র তিন বৎসরের জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যেই ইহার কার্যকলাপ এতই সুফলপ্রদ হইয়া উঠে যে সদস্যগণ সভাটিকে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে কৃতসংকল্প হন। দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক সভায় (১৩ জানুয়ারি ১৮৫৪) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অবৈতনিক সম্পাদক -পদে ইস্তফা দেন এবং তাঁহার স্থলে পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন। ভারতবর্ষীয় সভা একান্তভাবে ভারতবাসীর একটি জাতীয়-প্রতিষ্ঠান। এই সময় ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কলিকাতাস্থ আরমেনিয়ান এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে চাহিলেও ঐ কারণে তাঁহারা উহা হইতে পারেন নাই।

নূতন সনন্দ আইন প্রবর্তিত হয় ১৮৫৪ সালের ১ মে হইতে। ভারতীয় আইন পরিষদও যথারীতি গঠিত হইল। ভারতবর্ষীয় সভা আইন পরিষদের সূচনায়ই এইরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন—১. পরিষদের অধিবেশনগুলিতে আবশ্যক নিয়মাদিসাপেক্ষে দর্শক এবং প্রেস তথা সংবাদপত্র -প্রতিনিধিগণকে উপস্থিত হইতে অনুমতি দিতে হইবে, ২. সংবাদপত্রে প্রতিটি অধিবেশনের কার্যবিবরণ প্রকাশ করিতে হইবে, এবং ৩. নিয়মতান্ত্রিকভাবে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণকে প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে মতামত এবং সমাজকল্যাণকর বিষয়সমূহ পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পেশ করিবার অনুমতি দিতে হইবে। সভার প্রস্তাবের প্রথম ও তৃতীয় অংশ গৃহীত হয় নাই, দ্বিতীয়টি অনুমোদন লাভ করে এবং প্রতিটি অধিবেশনের কার্যবিবরণ যথানিয়মে অতঃপর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। আইন-পরিষদের আইনকানুনের খসড়া তৈরির নিমিত্ত সরকার একজন ক্লার্ক ও একজন ক্লার্ক অ্যাসিস্টাণ্ট নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয় পদটি পাইলেন ভারতবর্ষীয় সভার স্বনামখ্যাত সদস্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর। সভা এই উপলক্ষে তাঁহার গুণপনার উল্লেখ করিয়া ১৪ জুলাই ১৮৫৪ তারিখে সাধারণ মাসিক অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন :

That this Association, having been informed of the retirement of Baboo Prosunno Coomer Tagore, beg to record their deep sense of the loss of the assistance he has hitherto rendered to the Association. The members of the Association wish to record unanimously their appreciation of his extensive experience, ardent zeal and uncommon ability which were so cheerfully used for the interests of the Association.

বাংলার মনীষী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ— যেমন কাশীপ্রসাদ ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত,

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি— একে একে ইহার অধ্যক্ষ-সভার সদস্য নিযুক্ত হইলেন। কাশীপ্রসাদের 'হিন্দু ইনটেলিজেন্স!' এবং কিছু পরে হরিশ্চন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সভার মুখপত্ররূপে সবকিছু প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষীয় সভার মর্যাদা বাংলায় এবং বঙ্গেতর প্রদেশসমূহে দিন দিন বাড়িয়া চলিল। গবর্নমেণ্টও ইহার গুরুত্ব অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

গণতান্ত্রিক নিয়মে গঠিত পার্লামেণ্ট বা আইন-পরিষদে একটি 'অপোজিশন' বা বিরোধী দল থাকেন। ভারতবর্ষের আইনসভা গণতান্ত্রিক নিয়মে গঠিত হয় নাই, ভারতবাসী জনসাধারণের হইয়া দুটা কথা বলিতে পারে এমন কোনো ভারতীয় সদস্যের স্থান ইহাতে ছিল না। অথচ আইনসভা চালু হইবার পর ইহা চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমন-সব আইনপ্রণয়নে বা প্রস্তাবগ্রহণে রত হইলেন যাহা ভারতীয় জনস্বার্থের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত। ভারতবর্ষীয় সভা বাহির হইতে যতটা সম্ভব এইসব আইন বা প্রস্তাবের আলোচনা-পর্যালোচনায় রত হইলেন। অবশ্য আইন-পরিষদের পক্ষে কোনো কোনো বিষয়ে তাঁহাদের মতামতও যাচ্ঞা করা হইত। এখানে বলা যায় ভারতবর্ষীয় সভা স্বেচ্ছায় বেসরকারিভাবে উক্ত 'অপোজিশন' দলের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ভারত সরকারের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট বা পি. ডব্লিউ. ডি. খোলা হইল। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত করা, নদী জলাশয় প্রভৃতির সংস্কার ও পুনরুদ্ধার, বাঁধ তৈরি— এই ধরণের বিবিধ কার্যের ভার এই বিভাগের উপরে পড়ে। কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় সভার মতামত চাহিলে তাঁহারা একটি বিশেষ সভায় বিষয়টির বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। তাঁহারা বলেন, এই বিভাগ কি কি কার্যে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক, পূর্বাহ্নে তাহা জানাইয়া দিলে জনসাধারণের বিশেষ উপকার হইবে। এই বিভাগ পরিচালনার ভার একটি বোর্ডের উপরে অর্পিত হউক, সভা এরকমও মন্তব্য প্রকাশ করেন। অভিযোগকারী এবং বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট, এ কারণ তথাকথিত অপরাধী ব্যক্তিদের পক্ষে ঐ একই লোকের নিকট হইতে সুবিচার পাওয়া প্রায়ই সম্ভবপরও ছিল না। বহুস্থলে বিচারের নামে অবিচার এবং অনাচার সংঘটিত হইত। সভার গোচরে যখনই এরূপ কোনো ঘটনা আসিত তখনই তাঁহারা সরকারের নিকট প্রতিবাদপত্র পাঠাইতেন। নদীর তীরে বাঁধনির্মাণে প্রজা-সাধারণের অনেক সময় অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। হুগলি হাওড়া বর্ধমান এবং ২৪-পরগনার অধিবাসীরা সভার নিকটে ইহার প্রতিকার চাহিলে সরকারকে এই মর্মে লেখেন যে, এ ক্ষেত্রেও যাহার উপর বাঁধনির্মাণকার্যের ভার তিনিই আবার বিচারক হওয়ায় বিস্তর অনর্থের সৃষ্টি হইতেছে। শাসক এবং বিচারক একজন হওয়া কোনো মতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

সকল সরকারি আইন প্রস্তাব বা কার্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় সভার মতামত এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়, মাত্র দুইটি বিষয়ের কথা বলি। ১৮৫৬ সন নাগাদ চৌকিদারি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহার প্রস্তাবেই ভারতবর্ষীয় সভা চৌকিদারি প্রথার আনুপূর্বিক ইতিহাস এবং ইহার কার্যকারিতা বিবৃত করিয়া সরকারকে একখানি লিপি প্রেরণ করেন। চৌকিদার এযাবৎ স্থানীয় ভূস্বামী বা মোড়ল কর্তৃক গ্রামবাসীদের সম্মতিক্রমে নিযুক্ত হইত। শুধু রাত্রে পাহারা দেওয়া নয়, গো-মহিষাদির উৎপাত হইতে শস্যাদি রক্ষা, গৃহস্থের বিপদ-আপদের সময় সাহায্য দান— এইরূপ নানা কাজই তাহাকে করিতে হইত। এ কাজে পরিবারের স্ত্রী পুরুষ সকলেই তাহার সহায় হইত। চৌকিদারের বেতন গ্রামবাসীদের পক্ষে ভূস্বামী দিয়া দিতেন। গ্রামবাসীরাও তাহাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দরকারমত যোগান দিত। সরকারি

ব্যবস্থায় এই প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করা হইল। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট হইলেন চৌকিদারের নিয়োগকর্তা। গ্রামবাসীদের চেয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই তাহার চাকুরী বজায় থাকিবে। যে এতদিন ছিল গ্রামের সেবক, এখন হইতে সে হইবে সরকারের আজ্ঞাবহ ভৃত্য। ভারতবর্ষীয় সভার ঘোরতর প্রতিবাদ সত্ত্বেও আইন-পরিষদে চৌকিদারি আইন পাস হইয়া যায়।

দ্বিতীয়টি হইল কলিকাতায় গ্যাসের আলোর প্রবর্তনকল্পে ট্যাক্স ধার্য করা সম্বন্ধে। ভারতবর্ষীয় সভার মতামত চাওয়া হইল। তাঁহারা লিখিলেন যে, কলিকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী, এজন্য ইহার গুরুত্ব সমধিক। কিন্তু এরূপ একটি শহরের অবস্থা নিতান্তই দুঃখজনক। খুচরা সংস্কার বা কোনো সুবিধার ব্যবস্থা দ্বারা ইহার উন্নতি সাধিত হইবে না। একটি সুগঠিত পৌরসভার উপর পুরাতন রাস্তা সংস্কার, নূতন পথ নির্মাণ, নর্দমা পরিষ্কার, জলনিকাশের ব্যবস্থা, ময়লা ও আবর্জনা দূরীকরণ, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ— এই রকম বিবিধ কার্যের ভার দিলেই কলিকাতার আসল উন্নতি করা সাধ্যায়ত্ত। ইহাতে যে অর্থের প্রয়োজন হইবে— সরকার তাহা ঋণ করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করুন। প্রয়োজনীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিতহারে কর দিতে কলিকাতাবাসীরা রাজি হইবেন এবং এই ঋণ কিস্তিমত শোধ করিতে মোটেই কষ্ট হইবে না। সভার প্রস্তাব সরকার তখনই গ্রহণ করেন নাই বটে, তবে পরবর্তী উন্নয়নকার্যে ইহা সার্থকতা লাভ করে।

জাতির সংগঠনকার্যের মূলে শিক্ষার বিস্তৃতি বা প্রসার। ভারতবর্ষীয় সভার অধ্যক্ষেরা অধিকাংশই নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে ইতিপূর্বেই উদ্যোগ-আয়োজন করিতে-ছিলেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জুলাই বিলাত হইতে ডিরেক্টর-সভা এ দেশে একটি শিক্ষা-ডেস্‌প্যাচ বা বিধানপত্র পাঠাইলেন— ইহাতে প্রদত্ত নির্দেশ-অনুসারে ব্রিটিশ-অধিকৃত বিভিন্ন প্রদেশে যাহাতে আশু কার্য আরম্ভ হয় তাহার নিমিত্ত। ভারতবর্ষীয় সভা পূর্বে শিক্ষা-বিষয়ে আলোচনা করিয়া সরকার পক্ষে ইংরেজি ও এদেশীয় ভাষাগুলি শিক্ষার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। নবাগত নির্দেশপত্রে ভারতবর্ষে প্রথমে কলিকাতায় ও বোম্বাইয়ে এবং পরে মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় সত্বর স্থাপনের কথা ছিল। বিলম্বিত হইলেও সভা এজন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভার্নাকুলার বা এদেশীয় ভাষাসমূহের পাঠশালা অধিক সংখ্যায় স্থাপনের প্রস্তাব ছিল এই বিধানপত্রে। ইহাও সভা সানন্দে সমর্থন করিলেন। কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে তাঁহারা বিরূপ মন্তব্য করিতে বাধ্য হন। বিভিন্ন প্রদেশে ডিরেক্টর (বা আধুনিক পরিভাষায় শিক্ষা-অধিকর্তা) এবং ইনস্পেক্টর -সমূহ নিয়োগে বিস্তর অর্থব্যয় হইবে। এরূপ বিপুল আয়োজনের আবশ্যকতা নাই। এইসব কমাইয়া যে অর্থ বাঁচিবে তাহা দ্বারা অধিক সংখ্যায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে তাহাতে দেশবাসীর বিস্তর উপকার হইবে। বিদ্যালয়ে সরকারি সাহায্য দান সম্বন্ধে যেরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা নূতন নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে না বলিয়াও সভায় মত প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশে একজন সিবিলিয়ান ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সভা এই কারণেই বোধ হয় বলিয়াছিলেন যে, শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তাপদে কোনো সিবিলিয়ানকে নিযুক্ত করিলে ফল ভালো হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। ইহা যে কতখানি সত্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বাংলাদেশের প্রথম সিবিলিয়ান শিক্ষা-অধিকর্তার মধ্যে অবাঞ্ছিত বিরোধেই তাহা অল্পকাল পরে প্রমাণিত হইয়াছিল। সভার মতে কোনো প্রধান শিক্ষাবিদ্ বা অভিজ্ঞ বহুদর্শী শিক্ষাব্রতীকে এই পদে নিযুক্ত

করা সরকারের কর্তব্য। সভার সহকারী সম্পাদক চন্দ্রশেখর দেব বিধানপত্রের একটি গুরুতর ত্রুটির কথা উল্লেখ করেন। ইহাতে সংস্কৃত শিক্ষার কথা আদৌ ছিল না। অথচ ইহা একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিদ্যা বলিয়া পাশ্চাত্য দেশসমূহে তখনই স্বীকৃত হইয়াছিল। চন্দ্রশেখর বলেন— ইউরোপের জার্মানি ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষাদানের ইতিমধ্যেই বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি অবশ্য ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেন নাই। তবে তিনি আরও বলেন, বিলাতে ভারতীয় সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায়ও সংস্কৃতকে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষ সংস্কৃতের জন্মভূমি,— এখানে ইহা শিক্ষাদানের সরকারি ব্যবস্থা থাকিবে না— ইহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন যে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অন্যান্য বিদ্যার মতো সংস্কৃতকেও অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া ধার্য করিতে হইবে। পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী যুদ্ধ -জনিত অর্থকৃচ্ছ্রতা হেতু সরকার সংস্কৃত কলেজ তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিলে ভারতবর্ষীয় সভা তখনও ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

আর-একটি বিষয়েও সভার সুচিন্তিত অভিমতের আভাস আমরা পূর্বে পাইয়াছি। ইহা হইল সিবিল সার্ভিস সম্পর্কে। নূতন সনন্দ-আইন বলে বিলাতে একটি বোর্ড গঠিত হইল। ইহার পুরা নাম Board of Commissioners for the Affairs of India ইহার প্রথম সভাপতি ছিলেন সুবিখ্যাত টমাস বেরিংটন মেকলে (এই সময়ে লর্ড)। বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল সিবিল সার্ভিস এবং অনুরূপ পদস্থ কর্মপ্রার্থীদের পরীক্ষার নিয়মপ্রবর্তন, পরীক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি। সিবিল সার্ভিসকে 'Covenanted' বা চুক্তিবদ্ধ সার্ভিসও বলা হইত। এ দেশে আগত চুক্তিবদ্ধ সিবিলিয়ানদের নিম্নপদস্থ কর্মচারীগণকে 'uncovenanted' বা অচুক্তিবদ্ধ সার্ভিসের পর্যায়ে ফেলা হইত। বিলাতে বসিয়াই শাসনসম্পর্কিত সিবিলিয়ান বাদে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে, যেমন— চিকিৎসাবিদ্যা ভূতত্ত্ব নৃতত্ত্ব প্রভৃতির কর্মচারিও নির্দিষ্ট পরীক্ষা-অন্তে ভারতবর্ষের জন্য নিযুক্ত করা হইত। ভারতবর্ষীয় সভা ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে এইরকম চুক্তিবদ্ধ সার্ভিসে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে বিলাতে উক্ত বোর্ডের নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন।

আবেদনপত্রে এই মর্মে লেখা হয় যে, সিবিল সার্ভিস এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক সার্ভিস জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা বলিতে গেলে শুধু ব্রিটিশ জনসাধারণেরই জন্য। কেননা কালাপানির পারে এ দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান সন্তানেরা যাইতে নানা কারণে সক্ষম হইবেন না। তাহাদের অভিভাবকগণও সংস্কারের অধীন হইয়া তাঁহাদিগকে যাইতে দিতে নারাজ। উপরন্তু বিদেশ-বিভুঁয়ে অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের পাঠাইতে তাঁহারা আরও নানা কারণে সম্মত হইবেন না। জন্মগত সংস্কার, শিক্ষা, সামাজিক আচার— আচরণ সবই ইংরেজ হইতে তাঁহাদের আলাদা। হ্যালিবারি ও এডিসকম্বের স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া তবে এইসব পরীক্ষা দিতে হয়। ভারতবাসীর পক্ষে সেখানে যাইয়া শিক্ষালাভ করা হয়তো মোটেই সম্ভব হইবে না। এইসকল কারণ দেখাইয়া সভা বলেন যে, সত্য সত্যই যদি ঐসব পদ ইংরেজ ও ভারতবাসীর নিকট সমভাবে উন্মুক্ত রাখিতে হয় তাহা হইলে এ দেশে বসিয়াই ভারতসন্তানদের উক্ত পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক। সভা প্রস্তাব করেন যে, কলিকাতা মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে এইরূপ পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষীয় সভার এইরূপ যুক্তিপূর্ণ আবেদনলিপি কিন্তু কমিশনারগণ গ্রহণ করেন নাই। উত্তরে তাঁহাদের অসম্মতিই জ্ঞাপন করিলেন। ভারতবর্ষীয় সভার এই প্রস্তাব বহু পরে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসও গ্রহণ করিয়া প্রতি বৎসর এই উদ্দেশ্যে একটি করিয়া প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাস করাইয়া লইতেন। সেযুগে

নেতৃবৃন্দের এই বিশ্বাস ছিল যে, সিবিল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে পারিলে ভারত-শাসনে ভারতীয়েরা যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবেন এবং ইহার ফলে শাসনযন্ত্রকে ভারতবাসীর কল্যাণমুখী করিয়া তোলা যাইবে। এই জন্যই তাঁহারা এই ব্যাপারটিকে অতখানি গুরুত্ব দেন।

উক্ত আবেদনপত্র প্রেরণের কয়েক মাস পূর্বে ৮ এপ্রিল ১৮৫৬ তারিখে ভারতবর্ষীয় সভা আইন-পরিষদ্ পুনর্গঠন করা যে আশু আবশ্যক তাহা প্রতিবাদন করিয়া একখানি নূতন আবেদনপত্র উভয় পার্লামেণ্টে পেশ করিবার জন্য পাঠাইলেন। হাউস অব লর্ডসে ইহা পেশ করিবার ভার দেওয়া হয় লর্ড মণ্টেগ্রীলের উপর; হাউস অব কমন্সএ ইহা পেশ করিলেন বোম্বাইয়ের প্রাক্তন গবর্নর তৎকালীন পার্লামেণ্ট-সদস্য ভারতবন্ধু সার্ এর্‌স্কিন পেরী। এই আবেদনপত্রখানি যে কত প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী হইয়াছিল পূর্বাপর ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করিলে আজিকার দিনে তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইবে।

নিখিল ভারতীয় প্রতিটি ব্যাপারে ভারতবর্ষীয় সভা অন্যান্য প্রদেশের সভাসমিতি ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একযোগে কার্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন বরাবর। কিছুকাল পূর্বে সভা পুনরায় তাঁহাদিগকে এই মর্মে লেখেন যে এইসকল উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে একযোগে কার্য করিতে হইবে। তাঁহারা যে, একতাবদ্ধ তাহা কর্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, তবেই তাঁহাদের প্রযত্ন সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিবে। এবারেও কিন্তু দেখিতেছি সভা ভারতীয় আইন পরিষদ পুনর্গঠন বিষয়ে এককভাবেই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে আবেদন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আবেদনপত্রে প্রথমেই সভা আইন-পরিষদের চারিটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির কথা উল্লেখ করেন—১. পরিষদে কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি নাই, ভারতবাসীদের অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এক কথায় তাহাদের মনোভাব প্রকাশের বা সরকারপক্ষে ইহা জানিবার উপায় নাই, ২. আইন প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধ হইবার মধ্যে এরূপ যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় না যাহাতে এ সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে বিচার আলোচনা চলিতে পারে, ৩. পরিষদসদস্যগণ সংখ্যাল্পতাহেতু বিভিন্ন বিষয়ে বিচার-আলোচনায় খুব কমই সময় দিতে পারেন, ৪. পরিষদ সম্পূর্ণভাবেই সরকারি কর্মচারীদের লইয়া গঠিত। হয় তাহারা ব্রিটিশরাজ কর্তৃক নিযুক্ত অথবা তাহার প্রতিভূস্বরূপ কোম্পানি তাহাদের নিয়োগ করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষীয় সভা আবেদনপত্রের প্রথমেই এইসকল ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়া কি উপায়ে ইহার আশু সংশোধন করা যায় সে সম্বন্ধেও লিখিলেন। তাঁহারা ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে উচ্চতন ইংরেজ কর্মচারিদের কোনো কোনো উক্তির তীব্র প্রতিবাদও করেন। ভারতবাসীরা 'political freedom' বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে আদৌ আগ্রহশীল নন, তাহাদের ভিতরে আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব ও ঈর্ষা বিদ্যমান এইরূপ উক্তিগুলির অসারতা সম্বন্ধেও সভা নিজ অভিমত প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। আবেদনপত্রের উপসংহারে তাঁহারা লেখেন—

It is perhaps unnecessary but scarcely irrelevant for your petitioners here to contend before your Lordships that the natives of India, although slow to agitate or to make any organised resistance, are deeply sensible of the value of political freedom, even new approach to which they have ever baited with gratitude, as deeply do they feel degraded by any badge (real or apparent) of political servitude, especially when they contrast it, as they cannot but do, with the happier lot of their fellow subjects, natives of the soil of Britain.

What your petitioners at present earnestly desire and ask for, is, that some provisions be made with no avoidable delay for duly representing whether by

appointment of the Governor General, by nomination of the Legislative Council itself, or by some carefully graded electoral scheme the various classes and interests which, although they are the special care and concern of the legislature, are now wholly unrepresented ; it is needless to particularise the landed, the commercial, and the industrial interests, throughout the vast regions and among the numerous races of India.

ভারতবর্ষীয় সভা এখানে এই সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিলেন যে, ভারতবাসীরা আন্দোলন-পরিচালনায় বা প্রতিরোধব্যবস্থা-অবলম্বনে তেমন অগ্রসর না হইলেও তাহারা যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আওতায় থাকিয়া ব্রিটেনের অধিবাসীরা যেসব সুখসুবিধা সম্ভোগ করিতে পারিতেছেন তাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া ভারতবাসীরা তাহাদের দাসত্বজনিতহীনতা দূরীকরণে একান্ত উদ্‌গ্রীব। ভারতবর্ষীয় সভা এই মর্মে লেখেন যে, আইন-পরিষদে যেন অবিলম্বে ভারতীয়দের প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয়। তিনটি উপায়ে এখনই ইহা করা যাইতে পারে— বড়লাট তাহাদের নিয়োগ করিবেন, আইন-পরিষদ্‌ স্বয়ং মনোনীত করিতে পারেন অথবা এমন কোনো নির্বাচনী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহা দ্বারা প্রতিনিধিগণ পরিষদে নির্বাচিত হইয়া আসিতে পারিবেন। যাহাদের জন্য আইন প্রণয়ন হইতেছে সেইসকল ভারতীয় শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের পরিষদে প্রতিনিধি না থাকা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। সভার সময়োচিত আবেদনে বিলাতের কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করিলেন না। ইহা যে কতখানি মারাত্মক হইয়াছিল তাহা অল্প পরেই প্রমাণিত হয়।

এই প্রসঙ্গে পাদ্রী লঙের একটি অভিজ্ঞতার কথাও এখানে উল্লেখ করি। তিনি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে উর্দু বই-পুঁথির অন্বেষণে দিল্লীর অলিগলিতে ঘুরিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়া আশ্চর্য হন যে, তথাকার মুসলমানেরা ব্রিটিশের প্রতি শুধু বিদ্বেষভাবই পোষণ করেন না, তাহাদের সাহিত্যেও ইহা অনুপ্রবেশ করিতেছে। ভারতবাসীর মনোভাব বুঝিবার জন্য যেসব উপায় বর্তমান স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাহার কোনোটিই এই সময় অনুধাবন করেন নাই।

ভারতবর্ষীয় সভা রায়ত তথা প্রজাসাধারণের অবস্থা সম্যক্‌রূপে অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটি কমিশন গঠনের কথাও কর্তৃপক্ষকে একখানি আবেদনপত্রে জানান। খ্রীষ্টান মিশনরীরা গ্রামে গ্রামে যাইতেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহারাও প্রজাকুলের দুঃখদুর্দশা-মোচনের নিমিত্ত বিলাতের কর্তৃপক্ষকে আবেদন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে গঠিত নীল কমিশন কালে প্রজাদের দুর্গতির কথা বিশেষ করিয়া সাধারণের গোচরীভূত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে এই সময়ে সরকারের মতিগতি সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে চলিয়াছিল। তাঁহাদের শাসনপ্রণালী বিধি-ব্যবস্থা জনসাধারণের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার উদ্রেক করিতেছিল তাহা জানিবার প্রয়োজনই তাঁহারা মনে করিতেন না। ভারতবর্ষীয় সভা যথাসময়ে তাঁহাদের এ বিষয়ে অবহিত করিয়া দেন। সভা-কর্তৃপক্ষের দূরদৃষ্টি অতীব প্রশংসার্হ। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষীয় সভার অবলম্বিত কর্মপদ্ধতি যে আমাদের জাতীয়-সংগঠনে এবং স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল তাহা অবশ্যই বলা চলে। অন্ততঃ তাঁহাদের আরব্ধ কার্য এ দুইটি বিষয়ের গোড়াপত্তনে তখন বিশেষ সহায় হইয়াছিল।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৫-১৯৩০

শ্রীবিজিতকুমার দত্ত

আমাদের ইতিহাসে দৈন্যের অবধি নেই। পুরাণ-ইতিহাস যমজ ভাইয়ের মর্যাদা পেয়েছে। জনশ্রুতি, গালগল্পগুলি তথ্যের অভাবে 'অথরিটি'র মূল্য লাভ করেছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি মনীষীবৃন্দ অতথ্যকে দূর করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কেবল খনন-আবিষ্কারেই তাঁদের সময় অতিবাহিত হয় নি বলেই, কুলজী সাহিত্যের পরিবর্তে আমরা পেয়েছি বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ ইতিহাস। মুসলমান আমলের ইতিহাস মোটামুটিভাবে মুসলমান ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু হিন্দু যুগের ঐতিহাসিক উপাদানের নিতান্ত অভাব ছিল। ভারতবাসীর কাছে কিছু কাল আগেও হিন্দুযুগ ছিল কল্পনার বস্তু ধ্যানগম্য আদর্শ। এ বস্তু ঐতিহাসিকদের কাছে নিন্দিত। অতএব তাম্রশাসন, শিলালিপির উপর নির্ভর করতে হল। খননকার্য চলতে লাগল সর্বত্র। রাখালদাসের এ বিদ্যায় আগেই হাতে-খড়ি হয়েছিল। তিনি সে শিক্ষা এবং অদম্য তৃষ্ণা নিয়ে আবিষ্কার করলেন মহেঞ্জোদরোর পুরাকীর্তি। এ আবিষ্কারে তাঁর আত্মপ্রসাদ নিশ্চয়ই ছিল। তিনি বলেছেন, It comes once in an age—এ উক্তি অহমিকার নয়, সত্যের।

তথাপি ইতিহাস রচনা করবার সময় উপাদানের অভাব রাখালদাস নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করার পক্ষে উপাদানের অভাব লেখককে পীড়িত করেছিল। তিনি বলেছেন, "যে দেশে শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রাচীন মুদ্রা ও সাহিত্যে লিপিবদ্ধ জনপ্রবাদ ব্যতীত ইতিহাস রচনার অন্য কোনো বিশ্বাসযোগ্য উপাদান আবিষ্কৃত হয় নাই, সে দেশে ইতিহাসের কঙ্কাল ব্যতীত অন্য কিছু আশা করা যাইতে পারে না।"[১] উপন্যাস রচনা করে তিনি এ অভাব দূর করতে চেয়েছিলেন। রাখালদাসের কৃতিত্ব এখানে যে তিনি তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসের কঙ্কালে মেদ মাংস যোজনা করেছেন। প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বর্তমান কালে অর্থাৎ রাখালদাসের মৃত্যুর প্রায় তিরিশ বছর পরে এই কৃতিত্বের উপলব্ধি সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। কেননা নূতন গবেষণার আলোকে আমরা আজ বিস্মৃতযুগকে মোটামুটিভাবে জানতে পেরেছি। কিন্তু রাখালদাসের পথ ছিল দুরূহ এবং দুর্গমও বটে। ইতিহাসকে তিনি পলিটিক্সের সেবাদাসী[২] করেন নি। ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে রাখালদাসের পার্থক্যটি লক্ষ্য করবার মতো। পাশ্চাত্যজগতে ইতিহাসচর্চার অপ্রতুলতা নেই। এমন-কি এক-এক যুগের অস্ত্রশস্ত্রের আকার প্রকার নিয়ে পর্যন্ত সূক্ষ্ম গবেষণা হয়েছে। স্কটের উপন্যাসে তীরের মাপ নিয়ে পর্যন্ত আলোচনার বিরাম নেই। সুতরাং ইতিহাসের এই দৈন্য যখন আমাদের দেশে আকাশপ্রমাণ সেখানে কল্পনার আশ্রয়ে একটি যুগকে জীবন্ত করে তুলতে হয়।

কিন্তু কেবলমাত্র ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করবেন এই আকাঙ্ক্ষাটুকুই যথেষ্ট নয়। রাখালদাসের জীবনী

১. বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম ভাগ) ভূমিকা

২. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়', শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৩৬৪

থেকে জানতে পারি উপন্যাস রচনার সময়ে তিনি তাঁর বন্ধুবর্গ কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন। এ তিরস্কার লেখক নীরবে হজম করেন নি। রাখালদাসের মনে ছিল ম্যাসপেরোর (G. Maspero) আদর্শ। ম্যাসপেরো যেমন এক দিকে প্রাচীন মিশরের ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন তেমন অন্য দিকে সেই সমস্ত উপাদানের সাহায্যে প্রাচীন মিশরকে উপন্যাসাকারে উপস্থাপিত করেছেন। রাখালদাস এই পথের পথিক।

রাখালদাসের আগে বিশেষভাবে মোগল-রাজপুত দ্বন্দ্ব নিয়েই উপন্যাস রচিত হয়েছিল। রাখালদাস হিন্দুযুগকে আশ্রয় করে সে যুগের পরিবেশ রচনা করলেন। সে যুগের রাজনীতি, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। এই পরিচয়ের সূত্রে তিনি সৃষ্টি করলেন তাঁর প্রথম তিনখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস।

এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে চাই। রাখালদাস যে প্রবল স্বদেশপ্রেরণা থেকে তাঁর উপন্যাসগুলি রচনা করেন—সে প্রেরণা উদ্দীপনা প্রাচীন কালে প্রসারিত হয়েছে। কেউ কেউ এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন। কেননা পারসিকরা যখন গ্রীস দেশ আক্রমণ করে তখন প্রবল স্বদেশী উদ্দীপনাই দেশকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল।[৩] এই স্বদেশী প্রেরণাই হেরেডোটসের মতো ঐতিহাসিকের জন্ম দিয়েছিল। গুপ্তযুগে হূন আক্রমণ এ রকম একটি ঘটনা। রাখালদাস হূনদের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের অভিযানকে বৃহত্তর পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন। দেশের সত্তা হূন আক্রমণে আলোড়িত, দেশবাসী স্বদেশ রক্ষার জন্যে উদ্দীপিত। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের অভিযান মহৎ গৌরবে চিত্রিত। প্রশ্ন হল সে যুগে এরকম কোনো স্বদেশপ্রেরণা ছিল কি? এর উত্তরে বলা যায় নিশ্চয়ই ছিল। তবে সেইটি গ্রীসবাসীর অনুরূপ কি না তা বলা দুরূহ। রাখালদাস উপন্যাসে সে যুগের ইতিহাসকে সমসাময়িক দৃষ্টিতে বৃহত্তর করে দেখেছেন। তিনি বাংলার হেরেডোটস।

রাখালদাসের ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় আছে,[৪] কিন্তু সেইসব গ্রন্থে তিনি দেশের সামাজিক অবস্থা নিয়ে বিশেষ পর্যালোচনা করেন নি। উপন্যাসগুলিতে তিনি সে অভাব পূরণ করেছেন। সেকালের কেবল যুদ্ধবর্ণনা নয়—মানুষের সুখ দুঃখ ভালোবাসার ছবিও এঁকেছেন। এই হিসেবে তাঁর উপন্যাসগুলি ইতিহাসের পরিপূরক।

রাখালদাসের উপন্যাসেও দৈবজ্ঞের গণনা, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস দেখি। এগুলি পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের প্রভাব।

আরও একটি কথা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দুখানি উপন্যাস[৫] এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম তিনখানি উপন্যাস[৬] মিলিয়ে নিলে আমরা বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা থেকে পতনের একটা পূর্ণ পরিচয় পেতে পারি। অর্থাৎ অশোকের সময় থেকে মুসলমান আক্রমণ-পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের একটি পূর্ণরূপ এই উপন্যাসগুলিতে পাওয়া যাবে। গুরু হরপ্রসাদের সঙ্গে রাখালদাসের এই আর-এক যোগ।

৩. A. B Keith: *History ol Sanskrit Literature.*

৪. রমাপ্রসাদ চন্দ, 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়'— প্রবাসী, ১৩৩৭

৫. কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে

৬. শশাঙ্ক, ধর্মপাল, করুণা

পাষাণের কথা

রাখালদাসের পাষাণের কথা প্রথম 'হেমকণা' নামে প্রবাসীতে বার হয় ১৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে। পরে মানসীতে রচনাটি ছাপা হয়। পুস্তক প্রকাশের কাল ২১ বৈশাখ ১৩২১। 'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশে লেখক বলেছেন, "পাষাণের কথা "আর্যবর্তে" প্রকাশের জন্য প্রেসিডেনসি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে লিখিত হইয়াছিল। তিনি সংক্ষেপে পত্রিকার নামের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু তাহা একটি দীর্ঘ ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধে পরিণত হইয়াছিল।" লেখবার সময় জগদীশচন্দ্র বসু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সাহায্য নিয়েছিলেন লেখক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উৎসাহ ও প্রেরণা তো ছিলই। পাষাণের কথা আর্যাবর্তের ইতিহাস। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মুসলমান বিজয়ের পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের ইতিহাস। মুসলমান আক্রমণের কথাও একেবারে বাদ যায় নি।

পাষাণের কথা উপন্যাস নয়। গল্পাকারে ইতিহাস। কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস আলোচনায় এ বইটির মূল্য অপরিসীম। কেন তার কারণ বলছি।

শশাঙ্ক ধর্মপাল করুণা এই তিনটি উপন্যাসের অন্তর্নিহিত ঐক্য কারও দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবক্ষয় থেকে ধর্মপালের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে নানা উত্থান পতন লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বই তিনটিতে হিন্দুবৌদ্ধ দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ। দ্বন্দ্বের স্বরূপ নিয়ে যথাস্থানে আলোচনা করেছি। পাষাণের কথাকে যদি লেখকের ভাষণ বলে ধরে নিই তবে উপন্যাসগুলিকে তার ভাষ্য বলব। আসলে রাখালদাসের প্রথম তিনটি উপন্যাসের ভূমিকা হচ্ছে পাষাণের কথা। রাখালদাসের হিন্দুবৌদ্ধ যুগের উপন্যাসগুলির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের পতনের কথা বারবার উল্লিখিত হয়েছে আরও একটু অগ্রসর হয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বেণের মেয়েকে এ পর্যায়ের গ্রন্থ ধরে নিলে লেখকদ্বয়ের ইতিহাসের সম্বন্ধে মৌলিক ধারণাটি স্পষ্ট হবে। বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না থাকলেও চরিত্রগুলির আলোচনা করলে দেখা যাবে গুরু শিষ্য বৌদ্ধদের পতনের চিহ্নটিই বৃহত্তর করে দেখেছেন। বৌদ্ধদের অধঃপতনের জন্যেই যে রাজনৈতিক কলহ, অশান্তি, বিবাদ এ কথা এঁরা মানতেন। যা তাঁরা মানতেন তারই পরিচয় পাষাণের কথায় আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও নানা প্রবন্ধে সে কথা বলেছেন।

কুমারগুপ্তের অবস্থা বিশ্লেষণ পাষাণের কথায় আছে—"বৃদ্ধ কুমারগুপ্ত তরুণীর রূপজমোহে আবদ্ধ হইয়াছেন, পঞ্চাশৎবর্ষীয় বৃদ্ধ চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া উন্মত্ত হইয়াছেন, এবং স্কন্দগুপ্তের মাতা ক্রোধে ও ক্ষোভে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।" রাখালদাস হূন অভিযানের কথাও বলেছেন পাষাণের কথায়। সেই সময়ের বৌদ্ধপ্রসঙ্গ এ রকম "ইহারা সকলেই নিরক্ষর, বুদ্ধ অপেক্ষা উদরের প্রতি অধিক ভক্তিপরায়ণ, নির্বাণ লাভাপেক্ষা তরুণী লাভের জন্য অধিক লোলুপ।" এরই উদাহরণ হিসেবে করুণাতে পাই হরিবল, ইন্দ্রলেখা, মদনিকা। পাষাণের কথাতে এর পর লেখক বৌদ্ধধর্মের পতনে দেশের অবস্থা কি রকম দাঁড়িয়েছিল তার এক চিত্র এঁকেছেন। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কথাও তিনি বলতে ভুলেন নি। বৌদ্ধ পতনের পর স্কন্দগুপ্তেরই এক অনুচর যশোধর্ম আবার বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটান। কিন্তু সে অবস্থাও বেশি দিন চলে নি। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে লেখক পাষাণের

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখ দিয়ে বলেছেন—"তাহার পরদিন মনুষ্যজাতির প্রতি ও সদ্ধর্মের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মিয়াছিল।" তান্ত্রিকতার যথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলতা সমস্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের গ্রাস করেছিল। "শ্রুত হইল, জনৈক বৃদ্ধ কোন তরুণী নাগরিকার অঙ্গে হস্তক্ষেপণের জন্য তাহার স্বামী কর্তৃক আহত হইয়াছেন, একজন বোধিসত্ত্ব জনৈক নাগরিকের কন্যাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইয়া রজনীর অন্ধকারে প্রস্থান করিতেছেন, রক্ষিগণ তাঁহাদিগের অনুসন্ধানে নির্গত হইয়াছে, কয়েকজন ভিক্ষু বেষ্টনীর মধ্যে অর্থাপহরণ করায় মহাপ্রতীহার কর্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে, কয়েকজন ভিক্ষু, শক্তি ও শিল্পবিপণী হইতে বিনামূল্যে দ্রব্য গ্রহণ করায় মহাপ্রতীহার কর্তৃক বৌদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে।" আধুনিক কালে আমরা এ ব্যাখ্যা হয়তো মানতে পারি না। কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে ব্যাখ্যাও নিছক কাল্পনিক নয়। এ ব্যাখ্যায় কল্পনা আছে কিন্তু একে কল্পনা-সর্বস্ব রচনা কোনও রকমেই বলা যায় না।

ইতিহাসের এ ব্যাখ্যার ফলে উপন্যাসগুলিতে এক দিকে ত্রুটিবিচ্যুতি যেমন দেখি অন্য দিকে পরিবেশ রচনার একটি নবতর দিকের সাক্ষাৎ পাই। ত্রুটির কথা বলি: হিন্দুবৌদ্ধ বিরোধটি উপন্যাসে আত্যন্তিক হওয়াতে অনেক সময়েই লেখক তার উদ্দেশ্যের কথা বিস্মৃত হয়েছেন। এ ত্রুটি সর্বাপেক্ষা বেশি পাই শশাঙ্ক উপন্যাসে। শশাঙ্ককে লেখক বাংলার ইতিহাসের আদি শাসনকর্তার মূল্য দিয়েছেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরিকল্পনায় শশাঙ্ক বাংলাদেশের অধীনে সমগ্র উত্তরাপথকে করতলগত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ বিরোধের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় শশাঙ্ক উপন্যাসের নিহিতার্থটি অস্পষ্ট থেকে গেছে। গ্রন্থের পটভূমিকা শশাঙ্কের শৌর্যবীর্যকে গ্রাস করে ফেলেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিক থেকে লেখক যদি তদানীন্তন জনসাধারণের অন্যতর বৃত্তিগুলির উপরও নজর দিতেন তবে সে যুগের পরিবেশটি আরও উজ্জ্বল হতে পারত। কিন্তু অপর দিকে আংশিক হলেও ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থাটিও রাখালদাস হিন্দুবৌদ্ধ বিরোধকে কেন্দ্র করে রূপায়িত করেছেন। উপন্যাসগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই। বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাখালদাসের কোনো বিরূপ মনোভাব ছিল না। তার অন্যতম প্রমাণ পাষাণের কথার প্রথম দিকে বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণে, বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে।

শশাঙ্ক

শশাঙ্ক রাখালদাসের প্রথম উপন্যাস। বইটি প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালে। উপন্যাসটি রাখালদাসের শিক্ষাগুরু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে উৎসর্গীকৃত। 'পাষাণের কথা' থেকেই বুঝতে পারি লেখক ইতিহাসকে জনপ্রিয় করে তোলবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। ভূমিকাতে লেখক লিখেছেন, 'পাষাণের কথা' মনীষিগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু সাধারণের বোধগম্য হয় নাই। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া দুই বৎসর পরে 'শশাঙ্ক' আরব্ধ হইয়াছিল।' এবারে আর গল্পাকারে ইতিহাস নয় খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করলেন রাখালদাস।

প্রত্নতত্ত্বের বন্ধুর পথ পরিত্যাগ করে কথাসাহিত্যের 'প্রশস্ত সমতল বর্ত্ম' আশ্রয় করার কারণ হিসেবে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নজির দেখিয়েছেন। মৃণালিনী ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ঘটনাসংস্থান মুসলমান বিজয়ের পরবর্তীকাল। 'মুসলমান কর্তৃক বিজিত হইয়া আমরা মরিয়াছি। ভারতবাসীর জীবনকালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বনে উপন্যাস রচনা হইতে পারে, ইহারই নিদর্শন স্বরূপ

শশাঙ্ক রচিত হইল।' শশাঙ্ক সম্বন্ধে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম মৌলিক অনুমানগুলি করেন। কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাসে (১ম ভাগ) তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন তাঁর আলোচনা সিদ্ধান্তের স্তরে পড়ে না। অতএব কল্পনার একান্ত প্রয়োজন। নিছক কল্পনা ঐতিহাসিক তথ্যবিচারে অশ্রদ্ধেয় এবং বর্জনীয়। সম্ভবত এই কারণেও লেখক উপন্যাসের আশ্রয় নিয়েছিলেন। লক্ষীয়, লেখক উৎসর্গ-পত্রে লিখেছেন, 'যাঁহার অপূর্ব শিক্ষা ব্যতীত হিন্দুবৌদ্ধ দ্বন্দ্বযুগের ইতিহাস অবলম্বনে উপাখ্যান রচিত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ'—এই থেকে বোঝা যায় শশাঙ্ককে লেখক এই ধর্মকলহের একজন নেতারূপে দেখেছেন। অর্থাৎ উপন্যাসের মধ্যে তিনি হিন্দুবৌদ্ধ যুগকে ফুটিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করেছিলেন।

শশাঙ্কের একস্থানে লেখক বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে'র উল্লেখ করেছেন[৭], আবার হিউয়েন সাঙএর অপব্যাখ্যাকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন অন্যত্র। তথাপি মনে হয় লেখক তাঁর উপন্যাস রচনায় এ দুইটি বইয়ের সাহায্য নিয়েছিলেন। শশাঙ্ক সম্বন্ধে রাখালদাসের উল্লেখযোগ্য গবেষণা অবশ্য বাঙ্গালার ইতিহাসে (১ম ভাগ) আগেই পেয়েছি। শশাঙ্ক উপন্যাস রচনায় প্রধানত শিলালিপি তাম্রশাসনগুলিই রাখালদাসের অবলম্বন ছিল।

রাখালদাস বলেছেন, 'শশাঙ্ক কে? তিনি কোন্ বংশজাত, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। বাণভট্ট প্রণীত হর্ষচরিত, চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও দুইখানি খোদিতলিপি হইতে আমরা শশাঙ্ক নামক গৌড়েশ্বরের অস্তিত্ব ও স্থানীশ্বররাজের সহিত তাহার বিবাদের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বঙ্গ ও মগধের নানা স্থানে শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রাদিত্য নামাঙ্কিত সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।'[৮] একটি তাম্রশাসনে সৈন্যভীতি মাধববর্মা নামে সামন্ত নরপতির উল্লেখ আছে। এইটি শশাঙ্কের কালের ইতিহাস। এই সূত্র ধরেই লেখক মাধববর্মার সঙ্গে শশাঙ্কের সম্বন্ধ আবিষ্কার করেছেন। শিলালিপিটি রোহিতাশ্ব দুর্গের গায়ে পাওয়া যায়। উপন্যাসে যশোধবলের বিস্তৃত পরিচয় এবং তার কাহিনী এই ইঙ্গিত থেকেই রাখালদাস গ্রহণ করেছেন। যশোধবল রোহিতাশ্ব দুর্গের অধিপতি। রাখালদাস বলেছেন, 'যখন ইহা খোদিত হইয়াছিল, তখন শশাঙ্ক স্বাধীন রাজা নহেন।' 'কেননা এতে লেখা আছে "শ্রী মহাসামন্ত শশাঙ্কদেবস্য"। উপন্যাসেও মহাসেনগুপ্তের সময়ে যশোধবল শশাঙ্ককে যুবরাজ রূপেই দেখেছেন।

শশাঙ্কের বংশপরিচয় উপযুক্ত তথ্যের অভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে রাখালদাস মনে করেন শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি। আবার গুপ্ত সাদৃশ্যে নরেন্দ্রগুপ্তকে গুপ্তবংশীয় বলেই সাব্যস্ত করতে হয়। শশাঙ্কের নামে যে সমস্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির সঙ্গে গুপ্ত সম্রাটদের মুদ্রার প্রায় মিল দেখা যায়। এই থেকেও লেখক অনুমান করেছেন শশাঙ্ক গুপ্তসম্রাটদেরই বংশধর। এর পর লেখক শশাঙ্ককে মহাসেনগুপ্তের পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র বলেছেন। উপন্যাসে শশাঙ্ক মহাসেনগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র। উপন্যাসে শশাঙ্কের কনিষ্ঠ মাধবগুপ্তের উল্লেখ আছে। মাধবগুপ্ত হর্ষবর্ধনের যুদ্ধজয়ে সহায়তা করেন।

---

৭ "Historically we may say that the work is of minimal value, though in our paucity of actual records it is something even to have this!"—A. B. Keith: *History of Sanskrit Literature.*

৮ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার, ইতিহাস ১ম ভাগ।

শশাঙ্কের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ তিনিই। ইতিহাসে কিন্তু এঁর অন্য পরিচয় পাই। কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্তকে মালবদেশ থেকে প্রভাকরবর্ধন নিয়ে আসেন এবং হর্ষবর্ধনের সঙ্গী করে দেন। উপন্যাসে পাই প্রভাকর-বর্ধনের মাতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তাঁকে রাজ্যের অধিনায়করা প্রভাকরবর্ধনের নিকট প্রেরণ করেন। মাধবগুপ্ত মহাসেনগুপ্তের পুত্র কিনা এই সম্বন্ধে কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। গ্রহবর্মা নিহন্তা দেবগুপ্তও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। দেবগুপ্ত গুপ্তবংশজাত। শশাঙ্ক গুপ্তবংশজাত বলেই দেবগুপ্তের সহায়তা করেছিলেন এইটি রাখালদাসের অনুমান।

শশাঙ্কে মৌখরি রাজবংশের কথা পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের সমর্থনও রয়েছে। ঈশানবর্মা থেকেই এই বংশের বিজয়যাত্রা শুরু। মহাসেনগুপ্তের পিতা দামোদরগুপ্ত মৌখরিদের পরাজিত করেন। এই মৌখরি বংশেরই কোনো এক শাখার যজ্ঞবর্মার পৌত্র, শার্দূলবর্মার পুত্র অনন্তবর্মার পরিচয় আছে। উপন্যাসে শশাঙ্ক এবং অনন্তবর্মা সখ্যসূত্রে আবদ্ধ। অনন্তবর্মা নানা সৎকার্য করেছিলেন। শশাঙ্কের সঙ্গে অনন্তবর্মার কোনো যোগসূত্র রাখালদাস তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে দেন নি। দামোদরের কন্যা মহাসেনগুপ্তা আদিত্যবর্মার পত্নী। আদিত্যবর্মার পুত্র প্রভাকরবর্ধন। এই সূত্রে শশাঙ্ক এবং প্রভাকরবর্ধন মামাতো পিসতুতো ভাই। উপন্যাসে এই তথ্যটি লেখক অবিকৃত রেখেছেন।

এবারে রাখালদাসের অনুসরণে শশাঙ্কের কথা বলি। শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন, এইটি হিউয়েন সাঙের অভিমত। হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে দুষ্টাত্মা বলেছেন। শশাঙ্ক যে বোধিবৃক্ষ ছেদন করেছিলেন এ কথাও হিউয়েন সাঙ বলেছেন। এ ছাড়াও চীনীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণের রাজা বলেছেন। বাণভট্ট বলেছেন গৌড়াধিপ। হর্ষচরিতে শশাঙ্ক 'দুষ্ট গৌড়ভুজঙ্গ।' হর্ষচরিতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুপ্রসঙ্গ আছে। রাখালদাস উভয়মতের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। রাজ্যবর্ধন দুর্দান্ত হূনদের পরাজিত করেছেন, মালবাধিপকেও পরাজিত করেন। সুতরাং এই প্রবল নরপতিকে শশাঙ্ক অসহায় অবস্থায় নিহত করেছিলেন এইটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। লেখক শেষে বলেছেন দেবগুপ্তের পরাজয়ের পর শশাঙ্ক সসৈন্যে রাজ্যবর্ধনকে আক্রমণ করে নিহত করেন। শশাঙ্ক-রাজ্যবর্ধন ঘটনা নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয় নি।[৯] কিন্তু রাখালদাসের উপন্যাসে এই ঘটনাটি তাঁর নিজের মত অনুযায়ীই বর্ণিত এবং ঘটনাটি সুন্দরভাবে চিত্রিত। হিউয়েন সাঙ এবং বাণভট্ট ইত্যাদির সাক্ষ্য থেকে লেখক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে 'মগধ, গৌড়, ও রাঢ়দেশ শশাঙ্কের অধিকারভুক্ত ছিল, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।' ভাস্করবর্মার সঙ্গে শশাঙ্কের যুদ্ধের ঐতিহাসিক তথ্য বিশেষ নেই। বস্তুত রাখালদাস পান নি। লুহিবর্মার পুত্র ভাস্করবর্মা। তিনি কামরূপ অধিপতি। ভাস্করবর্মা কিছুদিনের জন্যে কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেছিলেন। শশাঙ্ক এঁকে যুদ্ধে পরাজিতও করেছিলেন। ভাস্করবর্মার সঙ্গে যে শশাঙ্কের যোগসূত্র ছিল এ কথাও রাখালদাস বলেছেন। হর্ষের সঙ্গে যুদ্ধেই যে শশাঙ্ক নিহত হন সে কথা ইতিহাসে জানা যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। হর্ষবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রী মৌখরিরাজ গ্রহবর্মার পত্নী ছিলেন। রাজ্যশ্রী সম্বন্ধে শশাঙ্কের নামে যে কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছে রাখালদাস তা বিশ্বাস করেন না।

শশাঙ্ককে নিয়ে এখন পর্যন্ত গবেষণা চলছে। এ পর্যন্ত অনেক সমস্যারই সমাধান হয় নি। নূতন তথ্যের

৯ R. C. Majumdar: *History of Bengal*, Vol. I (Appendix).

অভাবে শশাঙ্ক সমস্যা এখন পর্যন্ত অনুমানের স্তরে। অতএব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে চিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে কল্পনা ও অনুমান যথেষ্ট আছে। তথ্যবিরলতা শশাঙ্কের পূর্ণজীবনী রচনার প্রতিবন্ধক। কিন্তু রাখলদাস তথ্যের দৈন্য সত্ত্বেও শশাঙ্ককে অবলম্বন করে একটি মৌলিক ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশ করেছেন। সেইটি হচ্ছে শশাঙ্ককে নিয়ে যে ঐতিহাসিক ঘটনার নূতন অধ্যায় শুরু তার যাথার্থ্য নিরূপণে।[১০] ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে।

তবে রাখালদাসের একটি গুরুতর ভ্রান্তির দিকে ঐতিহাসিকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গৌড়াধিপ শশাঙ্ক রোটাসগড়ের শিলালিপির সাক্ষ্যে গুপ্তসম্রাটদের সামন্ত হতে পারেন স্বচ্ছন্দে কিন্তু নরেন্দ্রগুপ্ত এবং শশাঙ্ক এক ব্যক্তি নন। আর যদি এঁরা একও হন তথাপি গুপ্তসম্রাটদের সঙ্গে শশাঙ্কের বংশগত আত্মীয়তা আবিষ্কার করা দুরূহ। Mr. R. D Banerji's view that Sasanka was the son or nephew of Mahasengupta has hardly any basis to stand upon. আসলে গুপ্ত সম্রাটদের পতনের সময়ে শশাঙ্কের অভ্যুদয় ঘটে। এবং গুপ্ত সম্রাটরা যে ভাবে রাজনীতি পরিচালিত করতেন শশাঙ্কও সেইভাবে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন।[১১]

আর-একটি কথা। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বৌদ্ধসংঘের সম্মিলিত অভিযানকে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা। চীনীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এবং বাণভট্টের কথা আগে বলেছি। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে এঁদের অপব্যাখ্যাকে দূর করবার দায়িত্বও লেখক গ্রহণ করেছিলেন। বাণভট্ট আপন প্রভুকে সন্তুষ্ট করেছেন। হিউয়েন সাঙ সম্ভবত ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। রাখালদাস এই কারণে বৌদ্ধষড়যন্ত্রের কাহিনী বলেছেন। হর্ষ সম্বন্ধেও এক জায়গায় কটাক্ষ করেছেন। যেহেতু এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়[১২] সেই কারণে রাখালদাসের ব্যাখ্যাকে মেনে নিতে দ্বিধা নেই। কিন্তু একটি কথা আছে। উপন্যাসে হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘটের কাহিনীটি আত্যন্তিক হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে শশাঙ্কের বীরত্ব কাহিনী নেপথ্যে থেকে গেছে। রাখালদাস বাণভট্টকে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে কিছু পরিমাণে নির্মম হয়েছেন। এ নির্মমতা আবেগসঞ্জাত। এ কারণে তিনিও কতকটা পক্ষপাতদুষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। শশাঙ্ক স্বদেশপ্রেমিক। হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধ প্রাধান্য পাওয়াতে গ্রন্থের এই নিহিতার্থটি লক্ষ্যচ্যুত। বৌদ্ধভিক্ষু দেশানন্দ কিংবা বসুগুপ্ত -চরিত্র অঙ্কনে রাখালদাস মাত্রা অতিক্রম করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো রাখালদাসও বৌদ্ধবিহারের ধনসম্পত্তি লাভের কথাটি বলেছেন। রাখালদাস বসুমিত্রকে ভিক্ষু করার যে কারণ দেখিয়েছেন বেণের মেয়েতে মায়ায় ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনা সম্ভাবিত ছিল। তরলা যূথিকাকে

---

১০ "Beginning his life as a vassal chief, he made himself master of Gauḍa, Magadha, Utkala and Koṅgoda, and consolidated his position by defeating the powerful Moukharis" : *History of Bengal,* ed. R. C. Majumdar.

১১ "He was the first historical ruler of Bengal who not only dreamt imperial dreams, but also succeeded in realising them. He laid the foundations of the imperial fabric in the shape of realised hopes and ideals on which the Pālas built at on later age.--*History of Bengal,* Vol. I, ed. R. C. Majumdar.

১২ রমাপ্রসাদ চন্দ, গৌড়রাজমালা

বসুমিত্রের ভিক্ষু হবার কারণ বলেছে এইভাবে, 'ভিক্ষু হইলে বৌদ্ধগণের বিষয়ে অধিকার থাকে না, তাহাদিগের সম্পত্তি বৌদ্ধসংঘের হস্তে পতিত হয়। এই জন্যই চারুমিত্র একমাত্র পুত্রকে বৌদ্ধসংঘের নিকট বলি দিতেছে।' বুদ্ধঘোষ, বন্ধুগুপ্ত এবং বজ্রাচার্য (শক্রসেন) যে ভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করেছে তাতে ইতিহাসের যুক্তিনিভর তথ্যের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় পীড়ন করা হয়েছে বলে মনে করি।

প্রভাকরবর্ধনের সঙ্গে মহাসেনগুপ্তের বিরোধের ইঙ্গিতটি অনৈতিহাসিক। উপন্যাসে দেখি প্রভাকরবর্ধন পাটলিপুত্রে মহাসেনগুপ্তের কাছে এলে পাটলিপুত্রের নাগরিকদের সঙ্গে থানেশ্বরের সৈন্যের বিরোধ দেখা দেয়। মহাসেনগুপ্ত প্রভাকরবর্ধনের সঙ্গে একজন অধীন প্রজার ন্যায় ব্যবহার করেছেন। নিঃসন্দেহে প্রভাকরবর্ধন তখন একজন প্রভাবশালী নরপতি। কিন্তু কলচুরি রাজের আক্রমণের ভয়ে মহাসেনগুপ্তই প্রভাকরের রাজসভায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রভাকর পাটলিপুত্রে আসেন নি—আশ্রয় নেওয়াতে মনে হয় প্রভাকরের সঙ্গে মহাসেনগুপ্তের সম্পর্ক আত্মীয়তা সূত্রে প্রীতিরই ছিল। রাখালদাসের বর্ণনায় অনৈতিহাসিকতা সত্ত্বেও তখনকার রাজনীতির অনুসরণ করলে ঘটনাটির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি না হবারই সম্ভাবনা। বিশেষত হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের বিরোধের দিকে লক্ষ্য রেখেই রাখালদাস ঘটনাটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মহাসেনগুপ্তের রাজকার্য পরিচালনা সে যুগের অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।[১৩] শশাঙ্কের পিঙ্গলকেশের বর্ণনা ঐতিহাসিকতার দিক থেকে সমর্থনযোগ্য। বিশেষত উপন্যাসে এই তথ্যটি রোমান্সের দীপ্তি আনতে সমর্থ হয়েছে।

যশোধবলের ঐতিহাসিকতা নিয়ে আগে বলেছি। লেখক ইতিহাসের ইঙ্গিতকে অনুসরণ করে যশোধবল-বীরেন্দ্রসিংহ-লতিকার জীবনবৃত্তান্ত রচনা করেছেন। যশোধবলের মধ্যে প্রভুভক্তির চরম রূপ লক্ষিত হয়। মহাসেনগুপ্ত এবং যশোধবলের মিলনদৃশ্যটি নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতে উজ্জ্বল।

শশাঙ্কের বাল্যজীবনটি রাখালদাসের কল্পিত। এর পশ্চাতে কোনো ঐতিহাসিক পটভূমি না থাকাতে অংশটিকে দুর্বল মনে হওয়া স্বাভাবিক। শশাঙ্কের বাল্যজীবন অনেকটা অস্পষ্ট থেকে গেছে। উপন্যাসটিতে ঘটনার ভীড় অত্যন্ত বেশি। ফলে শশাঙ্কের ব্যক্তিগত দিকটি একরকম অনুদ্ঘাটিত। চিত্রার মৃত্যুর জন্যে শশাঙ্ক দায়ী এবং লতিকার ট্রাজেডির মূলেও তিনি। এ দুটি নারীর প্রতি শশাঙ্কের আচরণ উপন্যাসের যুক্তিসম্মত পথ ধরে চলে নি। চিত্রার বিবাহ বাসরে শশাঙ্কের আচরণ অনেকটা অবিশ্বাস্য ঠেকে। তবে চিত্রার চরিত্র স্বল্পপরিসরে অঙ্কিত হলেও মোটামুটি মন্দ হয় নি। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্‌বেগ-ব্যাকুলতা লেখক ফাঁকে ফাঁকে আমাদের জানিয়েছেন। শশাঙ্কর পতনের কারণ সম্বন্ধেও লেখক দুর্বল কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। সে কৈফিয়ৎ ইতিহাসসম্মত নয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর জন্যে দায়ী অদৃষ্ট। শক্রসেন শশাঙ্কের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সমগ্র ঘটনাবলীর একটা সারসংকলন করে শক্রসেন বলেছেন মোহবশে শশাঙ্কের মৃত্যু ঘটবে; তবে স্কন্দগুপ্ত বিদেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হবে আর শশাঙ্ক বিদেশে স্বদেশীদের বিশ্বাসঘাতকতায় মৃত্যু বরণ করবে। উপন্যাসটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে—শশাঙ্কের

১৩ R. C. Majumdar, H. C. Roy Choudhury and Kalikinkar Datta: *An Advanced History of India.*

রাজ্যলাভ, বিজয় অভিযান এবং মৃত্যু। ইতিহাস-বিচ্যুতি থাকলেও ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনায় লেখক সার্থক।

আগে লেখকের বৌদ্ধমনোভাব আলোচনা করেছি। এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করি। স্কটও 'আইভ্যানহো'তে স্যাক্সন জাতির বীরত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে নরম্যানদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন। Freeman স্কটের এই ইতিহাসবিচ্যুতি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। রাখালদাসের চিত্রও ঐতিহাসিকের কাছে গ্রহণীয় নয়।[১৪] তবে রাখালদাসের বর্ণনায় অতিশয্যটুকু ছেড়ে দিলে বৌদ্ধ চিত্রটিকে গ্রহণ করতে দ্বিধা নেই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী শশাঙ্ক সম্বন্ধে বলেছেন এর পনেরো আনাই কল্পনা। তথাপি তিনি এই কল্পনাকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছেন। এর কারণ বোধ করি মধ্যযুগের তথ্য-বিরলতার মধ্যেও রাখালদাস গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভগ্নদশাকে নিজ কল্পনাবলে যে ভাবে স্পষ্ট করে তুলেছেন তাতে লেখকের কৃতিত্ব সমধিক। কাহিনী বিশেষ কিছু নেই বলে এর বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। কতকগুলি খণ্ডচিত্রের সমাবেশই গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চরণাদ্রি দুর্গ, প্রতিষ্ঠান দুর্গ, শতদ্রু নদীর যুদ্ধ, মেঘনার যুদ্ধ এগুলি লেখকের মৌলিক উদ্ভাবনা।

বিপণীস্বামিনী বঙ্কিমচন্দ্রের পানওয়ালীর প্রতিরূপ। শশাঙ্ক, চিত্রা, মাধবগুপ্তের নদীতীরে বালুকাখেলা মাধবীকঙ্কণের শ্রীশচন্দ্র-নরেন্দ্র-হেমলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তরলার দৌত্য ঈষৎ তরল হলেও মন্দ নয়। নৌসৈন্যের কথা সম্ভবত রাখালদাস 'সমুদ্রাশ্রয়ান্‌' গৌড়বাণীর উল্লেখে অনুমান করিতেছেন। নবীন কৈবর্তের সৈন্যসজ্জা রামচরিতে উল্লিখিত কৈবর্তবিদ্রোহের কথা মনে করিয়ে দেয়। শক্রসেনের বৃক্ষের শাখায় শাখায় ভ্রমণ নাথযোগীদের আচরণের অনুরূপ।

ধর্মপাল

শশাঙ্কের পর ১৩২২ সালে ধর্মপাল প্রকাশিত হল। শশাঙ্ক গৌড়াধিপ হলেও তাঁর জীবনের ট্রাজেডি লেখক অঙ্কিত করেছেন। হর্ষবর্ধনের আবির্ভাবে শশাঙ্ক তাঁর মূল উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে পারেন নি। রণক্ষেত্রে লতিকার কাছে তাঁর খেদোক্তি থেকে তা বুঝতে পারা যায়। অথচ শশাঙ্ক যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্ন লেখকেরও। সুতরাং শশাঙ্কের পর বাংলার অদ্বিতীয় বীর ধর্মপালকে নিয়ে উপন্যাস রচনা করবার আকাঙ্ক্ষা লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'শশাঙ্ককে লইয়া গৌড় দেশের স্বতন্ত্র ইতিহাসের সূচনা হইয়াছে এবং ধর্মপাল হইতে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত ভারতের উত্তর সীমান্তের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়, এইজন্য "শশাঙ্কের" পরে "ধর্মপাল" লিখিত হইয়াছে।' এই উদ্দেশ্য ছাড়া শশাঙ্কের অনুরূপ ইতিহাসের সত্য প্রচারের আকাঙ্ক্ষা তো ছিলই। 'বাংলার ইতিহাসের সে যুগে জাতি নবযৌবনের স্বপ্ন দেখছিল'।[১৫] সে যুগের ইতিহাসকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করায় গ্রন্থটির মর্যাদা বেড়েছে।

---

১৪ শ্রীসুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী

১৫. শ্রীসুকুমার সেন, বিচিত্র সাহিত্য, ২য় খণ্ড। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'

"Bengal, which had lost all political homogenity and had almost been eliminated as a factor in Indian politics suddenly emerged under him at the most powerful state in Northern India." R. C. Majumdar and A. D. Pusalker : *The Age of Impetial Kanauj.*

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর বাংলার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিবরণ রমাপ্রসাদ চন্দ লিখিত 'গৌড়রাজমালা'য় পাওয়া যায়। এ ছাড়া নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'গৌড়লেখ-মালা'য়ও বাংলার ইতিহাসের এই পর্বটির বিস্তৃতবিবরণ পাচ্ছি। তবে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে'র উপর খুব বেশি আস্থা স্থাপন করেন নি। বলা বাহুল্য রাখালদাসের নিজের গবেষণাই 'ধর্মপালে' বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। কাহিনীটি এই।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনদশায় দেশে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজারা একে অপরের বিরুদ্ধে সর্বদাই কলহদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকত। আত্মকলহে জর্জরিত বাংলাদেশ তখন মরুভূমির আকার ধারণ করেছিল। লুণ্ঠতরাজ, গ্রাম পোড়ানো, নরহত্যা এই সমস্ত কাজে সামন্ত নরপতিবৃন্দের উৎসাহ সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। এই অবস্থায় দেশের জনসাধারণ একজন সুশাসকের অভাব বোধ করছিল। এমন সময়ে গৌড়দেশ অধিপতি গোপালদেব সামন্ত নরপতিবৃন্দের হাত থেকে গোকর্ণদুর্গ রক্ষা করলেন। গোপালদেবের অসীম বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে সামন্ত নরপতিরা গোপালদেবকেই তাঁদের সম্রাট হিসেবে নির্বাচিত করলেন।

গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালের মায়ের নাম দেদ্দদেবী। গোকর্ণের যুদ্ধে তিনিও ছিলেন। দুর্গস্বামিনীর কন্যা কল্যাণীকে রক্ষা করবার জন্যে তিনি তাকে নিয়ে বনপ্রদেশে চলে এসেছিলেন। কল্যাণী রক্ষাকর্তা ধর্মপালের প্রেমে পড়ল। ধর্মপালও কল্যাণীকে ভালোবাসলেন।

গোপালদেবের সময়ে রাজ্যে মোটামুটিভাবে শান্তি ফিরে এসেছিল। তিন বৎসর পর গোপালদেবের মৃত্যু হয়।

ভারতবর্ষে তখন যুদ্ধ লেগেই ছিল। গুর্জররাজ এবং রাষ্ট্রকূটপতি সে সময়ে ভারতবর্ষে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছেন। কান্যকুব্জরাজ ইন্দ্রায়ুধ গুর্জররাজের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী। ইন্দ্রায়ুধ জ্যেষ্ঠ বজ্রায়ুধের পুত্র চক্রায়ুধকে রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। চক্রায়ুধ গৌড়দেশ এলেন। তখন গৌড়াধিপ ধর্মপাল। সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দের কাছে ধর্মপাল চক্রয়ুধকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি হলেন। বিশ্বানন্দের সহায়তায় ধর্মপাল বৌদ্ধ সাহায্য পেলেন। সদ্ধর্ম এবং সদ্ধর্মীদের রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতও ধর্মপাল দিলেন। ধর্মপাল কল্যাণীর প্রণয়াসক্ত। কিন্তু বিবাহে বারবার বাধা পড়ছিল। পিতার মৃত্যু, যুদ্ধবিগ্রহ এই শুভবিবাহে প্রতিবন্ধন হয়েছিল। এর পর ধর্মপালের যুদ্ধযাত্রা। গুর্জররাজ-বাণভট্টের সঙ্গে যুদ্ধে বাঙ্গালি সৈন্য অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করলে। চক্রায়ুধ রাজত্ব পেলে। কিন্তু যুদ্ধ থামলনা। অবশেষে রাষ্ট্রকূটপতি গোবিন্দের সহায়তায় বাংলাদেশ রক্ষা পেল। যুদ্ধে সাফল্যের পর রাজা যখন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে যাচ্ছেন তখন গোবিন্দ রাষ্ট্রকূটপতির কন্যাকে গ্রহণ করার দাবি জানালেন। এ দাবি উপেক্ষিত হল। আবার যুদ্ধ বাধল। বাংলার সৈন্য শেষ সংগ্রাম করলে। গোবিন্দ বাঙ্গালি সৈন্যের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলে। কিন্তু কল্যাণী তখন মৃত্যুপথযাত্রী। দেশের মঙ্গলের জন্যে কল্যাণীর জীবন উৎসর্গীত হল। কল্যাণীর মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূটবংশের কন্যা রণ্ণাদেবীর সঙ্গে ধর্মপালের বিবাহ হল। ধর্মপালদেরের রাজত্বের বিস্তৃত ঘটনা বাহুল্যভয়েই সম্ভবত রাখালদাস বর্ণনা করেন নি।

এবারে ঐতিহাসিক তথ্যগুলির বিচার করি।

খালিমপুরের তাম্রশাসন থেকে গোপালদেবের রাজপদে বৃত হবার ঘটনাটি গৃহীত।[১৬] তাম্রশাসনটি

১৬ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। গৌড়লেখমালা

এইরকম— 'প্রজাবৃন্দ সেই বপ্যটের পুত্র নৃপতিশিরচূড়ামণি শ্রীগোপালকে রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন-দেশে মৎস্যন্যায় দূরীভূত করবার জন্য। দিগন্তে বিস্তৃত যাঁর সনাতনযশোরাশি জ্যোৎস্নাধবলিত পূর্ণিমা রজনীর দ্বারা কথঞ্চিৎ অনুকৃত হতে পারে।' মাৎস্যন্যায় বলতে সাধারণভাবে অরাজকতাকে বুঝি। প্রবলের উপর দুর্বলের অত্যাচার, রাজ্যে দণ্ডশক্তির অভাব মাৎস্যন্যায়ের পরিচয়। এর সঙ্গে তিব্বতীলামা তারনাথের বিবরণ মিলিয়ে নিলে বোঝা যায় গোপালদেবের পূর্ববর্তী গৌড় দেশের অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ছিল। অশান্তি-অরাজকতায় দেশ ছিন্নভিন্ন। রাজসভায় চক্রান্ত—অন্তঃপুরেও ব্যভিচার ষড়যন্ত্র। তার উপর পুনঃ পুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণ। এ অবস্থা থেকে মুক্তি কামনায় প্রজারা গোপালদেবকে সিংহাসনে নির্বাচিত করলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মপালে দেশের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি প্রজাদের দ্বারাই গোপালদেব নির্বাচিত হয় এই মতটি মেনে নেন নি। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী সামন্তদের দ্বারা গোপালদেব নির্বাচিত হন। এ জন্যেই গোকর্ণদুর্গের কাহিনীটি উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। সম্ভবত এইটি নূতন তথ্য বলে উপন্যাসে এ কাহিনীটি অনেক অংশ অধিকার করেছে। গোপালদেব সম্বন্ধে আর বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। একান্ত কল্পনার উপর নির্ভর করেন নি বলে গোপালদেবের কাহিনীকে রাখালদাস বিস্তৃত করেন নি। দেবদেবীর উল্লেখও ইতিহাসে আছে।

ধর্মপালদেব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রাচুর্য রয়েছে। ধর্মপালকে লেখক এইভাবে দেখেছেন, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে এবং নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড়েশ্বর ধর্মপালদেবই উত্তরাপথের প্রধান নায়ক।'[১৭] গোপালদেবের সময়েই রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হল। এই কারণে ধর্মপাল রাজ্যবিস্তারে মনোযোগ দিতে পারলেন। চক্রায়ুধ যে ইন্দ্রায়ুধের পুত্র নয়, নগেন্দ্রনাথ বসুর এই মতকে রাখালদাস নানা তথ্যপ্রমাণ সহযোগে ভ্রান্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন। রাখালদাস বলেছেন, খালিমপুরের তাম্রশাসনের সাক্ষ্যেই বোঝা যায় চক্রায়ুধ ধর্মপাল কর্তৃক রাজত্ব পান। 'তিনি মনোহর ভ্রূভঙ্গি-বিকাশে ইঙ্গিত মাত্রে ভোজ মৎস্য মদ্র কুরু যদু যবন অবন্তী গন্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালগণকে প্রণতিপরায়ণ— চঞ্চলভাবনা মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্তন করাইতে করাইতে হৃষ্টচিত্তে পাঞ্চালবৃদ্ধ কর্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকমল উদ্ধৃত করাইয়া কান্যকুব্জকে রাজ্যশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।'[১৮] এই লিপিই রাখালদাসকে বজ্রায়ুধ এবং চক্রায়ুধ ও ইন্দ্রায়ুধ প্রসঙ্গ অবতারণায় সাহায্য করেছে। রাষ্ট্রকূটপতি গোবিন্দের সঙ্গে ধর্মপালের বিরোধের কারণটি কি জানা যায় না। এই কারণটি অজ্ঞাত বলে রাখালদাস রন্না দেবীর প্রসঙ্গটিকে কৌশলে স্থাপন করেছেন। কেউ কেউ অনুমান করেন ধর্মপাল বৃদ্ধ বয়সে রন্না দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সে যাই হোক রাখালদাসের এ কল্পনা উপন্যাসের দিক থেকে সার্থক, আমাদের বাস্তববোধ জাগাতে সাহায্য করে। ইতিহাসে এ রকম ঘটনার অভাব নেই। সুতরাং ঐতিহাসিক পরিবেশের দিক থেকে ঘটনাটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ঘটনার সম্ভাব্যতার দিক দিয়েও রাখালদাসের এ কল্পনা উচ্চপ্রশংসার যোগ্য। বাণভট্ট কাহিনী নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে। কল্পনার আশ্রয় দেখতে পাওয়া যায় সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ, অমৃতানন্দ ইত্যাদির চরিত্র পরিকল্পনাতে। গুর্জররাজের সঙ্গে আর্যসংঘের কোনো সম্বন্ধ ছিল কি না সে সম্বন্ধে

১৭ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম খণ্ড

১৮ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। গৌড়লেখমালা

কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বুদ্ধভদ্র গোপনে গুর্জররাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বাংলায় গুর্জররাজ্যের আধিপত্য বিস্তৃত হোক এইটি চেয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের এই অধঃপতনের চিত্র লেখকের ইতিহাসের সম্বন্ধে বিশেষ ধারণাসঞ্জাত। বজ্রযানী, হীনযানী, মহাযানী বৌদ্ধসম্প্রদায় তখন কলহে মুখর। "কৃষ্ণসর্প" নারায়ণ ঘোষের মৃত্যু হয়েছে সম্ভবত বজ্রযানী বৌদ্ধ বলে। মহাযানী সম্প্রদায় ধর্মপালের সহায়তায় আত্মরক্ষা এবং আত্মপ্রসারে উন্মুখ, আবার বুদ্ধভদ্র ইত্যাদি বৌদ্ধরা সমস্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের আশায় গুর্জররাজ্যের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী। বুদ্ধভদ্রের ব্যর্থতার কাহিনী ধর্মপালে বিস্তৃত।

তবে ধর্মপালের কাহিনীর প্রধান অংশ যুদ্ধবিগ্রহে ব্যয় হলেও ধর্মপাল-কল্যাণী প্রসঙ্গ উপেক্ষিত হয় নি। ধর্মপালের কল্যাণীর প্রতি আসক্তির চিত্রটি বাস্তবসম্মত উপায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রশস্তি লিপির সাহায্যে ধর্মপালের চিত্রটি রাখালদাস রূপায়িত করেছেন। ধর্মপালের প্রকৃত গৌরব এবং মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কল্যাণীর আত্মত্যাগ মহৎ সম্ভাবনায় দীপ্যমান। রন্না দেবীর বিবাহ প্রসঙ্গে রাজ্যে যখন যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠল তখন সাধারণ নরনারীর কল্যাণীর প্রতি ঈর্ষা কয়েকটি দৃশ্যে সুন্দর ফুটেছে।

ধর্মপালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষিত হয়। মাৎস্যন্যায়ের ফলে অরাজকতার দৃশ্যটি আনন্দমঠের মন্বন্তরের চিত্রটি অনুকরণে রচিত। বিশ্বানন্দ, অমৃতানন্দ আনন্দমঠের চরিত্রগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষত ধর্মপালের উত্থানের মূলে বিশ্বানন্দের প্রভাব অনেকটা দায়ী। জনবল, অর্থবল দিয়ে এবং বিপদের ক্ষেত্রে নিজে অগ্রসর হয়ে বিশ্বানন্দ ধর্মপালকে সাহায্য করেছে। এ কাহিনী কল্পিত হলেও ঐতিহাসিক পরিবেশে বেমানান হয় নি।

ভীষ্মের চরিত্র আদর্শবাদের দ্বারা অনুরঞ্জিত। দেশের জন্যে তাঁর আত্মত্যাগ গৌরবদীপ্তি লাভ করেছে। ধর্মপালের ভীষ্ম পৌরাণিক ভীষ্মের কথা অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ধর্মপালে যে স্বদেশ প্রেরণা আছে সেটি করুণাতে আরও পরিস্ফুট। কেউ কেউ করুণার প্রভাব ধর্মপালে দেখতে পান।[১৯] কিন্তু এইটি অসংগত। কেননা ধর্মপাল ১৩২২ সালে ছাপা হয় আর করুণা উপাসনা পত্রিকায় ১৩২৪ সাল পর্যন্ত বেরিয়েছিল। বরং ধর্মপালের অনেক চরিত্র যেমন কল্যাণী, পুরুষোত্তম, ভীষ্মদেব, করুণায় অরুণা, ঋষভদেব এবং অগ্নিগুপ্তের উপর প্রভাব ফেলেছে।

ধর্মপালের আরম্ভটি দুর্গেশনন্দিনীর কথা মনে করিয়ে দেয়। দুর্গস্বামিনীর কন্যার প্রতি প্রেম ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি সহজ ও বহুল ব্যবহৃত উপাদান।

---

১৯ শ্রীসুকুমার মিত্র। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়— পরিচয় ফাল্গুন ১৩৬৪

গোপালদেব সম্বন্ধে আধুনিক মত— It reflects no small credit upon the political sagacity and the spirit of sacrifice of the leading men of Bengal that they rose to the occasion and selected one among themselves to be the sole ruler of Bengal to whom they all paid willing allegiance. It is not every age, it is not every nation, that can show such a noble example of subordinating private interests to the public welfare. . . The result was almost equally glorious and the great bloodless revolutioon ushed in an era of glory and prosperity such as Bengal has never enjoyed before or since. R. C. Majumdar and A. D. Pusalker : *The Age of Imperial Kanauj.*

করুণা

করুণা ধারাবাহিকভাবে উপাসনা পত্রিকায় বেরিয়েছিল। পরে ১৩২৪ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় লেখক বলেছেন 'ইহা "শশাঙ্কের" ন্যায় ইতিহাস মূলক আখ্যায়িকামাত্র, ভরসা করি কেহ ইহাকে ইতিহাস মনে করিবেন না।' গুপ্ত যুগ সম্বন্ধে লেখকের আগ্রহ ছিল প্রচুর, 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথমভাগে তিনি গুপ্ত যুগ সম্বন্ধে যথেষ্ট মৌলিক তথ্যও দিয়েছেন। তা ছাড়া নূতন নূতন শিলালিপি এবং মুদ্রা আবিষ্কারের ফলে ঐতিহাসিক বিচারের ধারা পরিবর্তিত হচ্ছিল। কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধ্যাপক থাকাকালীন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গুপ্ত যুগের একটা সামগ্রিক পরিচয়ও দিয়েছিলেন বক্তৃতাকারে। পরে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে সেইগুলি একত্রিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। এর থেকেই বোঝা যায় গুপ্ত যুগ সম্বন্ধে লেখকের তীব্র আগ্রহ ছিল এবং তাকে উপন্যাসাকারে লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম ভাগে তিনি গুপ্ত যুগকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেন? এর কারণ বাঙ্গালার ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র ভূমিকায় লেখক বলেছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে দুটি প্রকরণ, তার মধ্যে একটি উত্তরাপথের ইতিহাস। বাঙ্গালার ইতিহাস এই প্রকরণের একটি অধ্যায় মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের দিক থেকে যে সত্যটি তিনি উপলব্ধি করলেন, উপন্যাসেও তাকে যথাযথ রাখবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত ভারতেতিহাসের অন্যান্য অধ্যায়গুলির বর্ণনা করা লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক।

তা ছাড়া লেখক বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে গুপ্ত সাম্রাজ্যের যোগাযোগের অন্যতর কারণ উল্লেখ করেছেন। 'ঐতিহাসিক যুগে গৌড়, মগধ, অঙ্গ ও বঙ্গের ইতিহাস স্বতন্ত্র নহে। খৃষ্টাব্দের প্রথম ছয় শত বৎসর মগধের প্রাধান্য ছিল, এই সময়ে গৌড় বঙ্গ কখনও কখনও স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলেও তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।'[২০] সুতরাং ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করতে হলে বাঙ্গালার ইতিহাসকে বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না। স্কন্দগুপ্ত-শশাঙ্ক-ধর্মপাল এই ইতিহাসের ক্রম পরিণত রূপ।

আবার হিন্দুবৌদ্ধ বিরোধের রূপটিকেও ভুললে চলবে না। কেননা লেখক এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশি। সে আলোচনা যথাস্থানে করব। এই বিরোধের রূপটি গুপ্ত যুগ থেকে আরম্ভ এ রকম একটা ধারণা লেখকের ছিল।

কিন্তু করুণাতে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে লেখকের স্বদেশপ্রেরণা। স্কন্দগুপ্ত সম্বন্ধে লেখকের ধারণা ছিল অনুকূল। তিনি একস্থানে বলেছেন, He was the last great hero of Magadha who realised that it was his duty to defend the gates of India with the last drop of his blood. He spent his whole life in the performance of this noble task and at the end of it sacrificed himself cheerfully in the performance of this sacred duty.[২১] দেশের জন্যে এ রকম আত্মোৎসর্গ লেখককে মুগ্ধ করেছিল। রাখালদাসের এই বিস্ময়বিমুগ্ধ চেতনা থেকে করুণার সৃষ্টি।

---

২০ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, (১ম ভাগ ভূমিকা)

২১ R. D. Banerji: *The Age of the Imperial Guptas.*

কাহিনীও শশাঙ্কের মতো শিথিল নয়। প্রকৃত ঐতিহাসিক রোমান্স বলতে যা বুঝি সেই রকম প্লট করুণায় আছে।

'করুণা'র নায়ক স্কন্দগুপ্ত প্রথম কুমারগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বে বিলাসব্যসনের প্রাচুর্য ছিল। রাজশক্তির এক প্রধান অংশ এই বিলাসকলাকুতূহলে নিবিষ্ট। এমন-কি রাজা কুমারগুপ্ত পর্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে গণিকা ইন্দ্রলেখার কন্যা অনন্তদেবীর আসক্ত। বৃদ্ধ মহানায়ক দামোদরগুপ্ত রাজাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন। তিনি জালন্ধর থেকে কুমারগুপ্তের ভ্রাতা গোবিন্দগুপ্তকে ডেকে আনলেন রাজ্যের সবনাশ থেকে রক্ষা করবার জন্যে। রাজা যখন বিবাহে উদ্যত তখন তাঁর চেষ্টায় তা রোধ হল। কিন্তু এই বিবাহের পশ্চাতে ছিল এক বৃহত্তর ষড়যন্ত্র। কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর স্কন্দগুপ্ত রাজা হলে বৌদ্ধধর্মের উন্নতির আশা নেই। এই কারণে বৌদ্ধধর্মী হরিবল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে রাজার সঙ্গে অনন্তদেবীর বিবাহ দেবার বন্দোবস্ত করলে।

ওদিকে উত্তরাপথে বার বার দুর্ধর্ষ হূন জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করছিল। এই আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করবার দায়িত্ব মগধের। সুতরাং রাজধানীর গোলযোগ থামিয়ে স্কন্দগুপ্ত, গোবিন্দগুপ্ত, ভানুমিত্র ইত্যাদি সকলে হূন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত হন। বাহ্লীকতীরে, বক্ষুতীরে গুপ্ত সেনানী সমাবেশ হল। হূন আক্রমণ সময়ে বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে অগ্নিগুপ্ত দেহত্যাগ করলেন। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত অন্যান্য সেনার সাহায্যে অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করে হূন আক্রমণ প্রতিরোধ করলেন। জয়ের আনন্দে সকলে আত্মহারা। সকলে জয়লাভ করে দেশে ফিরে এল। মগধ উৎসবে ব্যসনে মেতে উঠল। পট্টমহাদেবী পুত্রের বিজয়বার্তায় আনন্দিত। তার পালিতা কন্যা করুণা এবং অরুণা। করুণা গৌড়দেশীয় সেনাপতি যুবরাজের সখা ভানুমিত্রের পত্নী। অরুণা স্কন্দগুপ্তের বাগদত্তা। আবার হূন আক্রমণ শুরু হল। অরুণাকে বিবাহ না করেই স্কন্দগুপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করলেন।

হরিবল-ইন্দ্রলেখার চক্রান্তে পুনরায় অনন্তদেবী মহারাজের সামনে এল। মহারাজের চিত্ত টলমল। পট্টমহাদেবী সব শুনলেন। তিনি আত্মহত্যা করে আত্মাবমাননা থেকে মুক্তি পেলেন। ইন্দ্রলেখার সাহায্যে যখন এই বিবাহ সংঘটিত হল তখন রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ইন্দ্রলেখার উপপতি চন্দ্রসেন অরুণার উপর অত্যাচার করতে চাইলে। ক্ষোভে-রোষে অরুণা কোনোরকমে আত্মরক্ষা করে পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করলে। এক সন্ন্যাসী অরুণাকে পলায়নে সাহায্য করলেন।

হূনযুদ্ধে যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত, গোবিন্দগুপ্ত, ভানুমিত্র অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। এমন সময়ে পাটলিপুত্রের সংবাদ নিয়ে সন্দেশবহ গোবিন্দগুপ্তের কাছে সব বললে। গোবিন্দগুপ্ত দ্রুত পাটলিপুত্র অভিমুখে রওনা হলেন। অগ্নি আগেই জ্বলেছে, এবার তার অঙ্গারের চিহ্ন লক্ষিত হবে। মহাপ্রতীহার কৃষ্ণগুপ্ত বাহ্লীকাতীরে যুবরাজকে সব জানালেন। তিনি বললেন, 'ভীষণ অত্যাচারে গুপ্তকুললক্ষ্মী বিচলিতা। গুপ্তকুলরবি, তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে আর্যাবর্তে তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই।'

রাজ্যে অশান্তি বিশৃঙ্খলা। সব অনন্তদেবীর আজ্ঞাধীন। রাজা মোহবশে অনন্তদেবীর অনুরোধে বৃদ্ধ মন্ত্রী দামোদর শর্মাকে বন্দী করবার আদেশ দিলেন। চন্দ্রসেন স্কন্দগুপ্তকে বন্দী করবার আদেশ নিয়ে বাহ্লীকে এল। হূনযুদ্ধে সেনাপতি চন্দ্রসেন। যুবরাজ বন্দী হলেন। পুরুষপুরে হূনরা আক্রমণ করে করুণাকে হরণ করলে। করুণা তার পর থেকে হূনদের কাছে দেবী রূপে পরিচিতা। স্কন্দগুপ্ত এবং ভানুমিত্র করুণার

সন্ধানে এসে বিফল হলেন। ভানুমিত্র করুণার শোকে প্রায় উন্মত্ত। শতদ্রুতীরের যুদ্ধে স্কন্দগুপ্ত পুনরায় বিজয়ী হলেন। বস্তুতীরের যুদ্ধের পর অনন্তাদেবী যুবরাজকে ডেকে পাঠালেন। কেননা গোবিন্দগুপ্তের চেষ্টায় অনন্তাদেবী এখনও আপন ক্ষমতার যথেচ্ছব্যবহার করতে পারে নি। স্কন্দগুপ্তের জয়লাভে অনন্তাদেবী এবং বৌদ্ধরা আশঙ্কিত হল।

যুবরাজ পাটলিপুত্রে এলে মগধবাসী তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনা করলে। কিন্তু মাতার মৃত্যুতে রাজ্যের অশান্তিতে যুবরাজের শান্তি ছিল না। এর পর যুবরাজ অরুণার সঙ্গে দেখা করলে। অরুণা তখন আশ্রমবালিকা। যুবরাজকে দেখে তার পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল। অরুণা এবং যুবরাজের বিবাহ হল। পাটলিপুত্রের অবস্থার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে গণিকা ইন্দ্রলেখার সখী মদনিকার ব্যবহারে। গৌল্মিক সেনাপতি দেবধর মদনিকা কর্তৃক অপমানিত। হর্ষগুপ্ত মদনিকাকে প্রহার করলেন। মদনিকার প্ররোচনায় দেবধরের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হল। দেবধর এবং তার নবপরিণীতা স্ত্রী উভয়েই আত্মহত্যা করে রাজ্যের অনাচারের দিকটি প্রকাশ করে দিলে। কুমারগুপ্ত লজ্জায় পালিয়ে গেলেন। এর পরও কুমারগুপ্তের চেতনা ফিরে আসে নি। স্কন্দগুপ্ত একের পর এক যুদ্ধ করে গেলেন। অবশেষে সকলকেই হারালেন। গল্পের ফলশ্রুতি বন্ধুবর্মা এবং মুরারিগুপ্তের কথোপকথন থেকেই বোঝা যায়— ‘স্কন্দ গিয়াছে, মহারাজপুত্র গিয়াছেন, বৈষ্ণব অভিজাতসম্প্রদায় গিয়াছে, আর্যসংঘর মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। হে সদ্ধর্মি, উন্নতির পথ নিষ্কণ্টক, দেশ, ধর্ম, পূর্বস্মৃতি বিসর্জন দিয়া, মাগধ সাম্রাজ্য অতল জলধিজলে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার পরিবর্তে আর্যসংঘ সদ্ধর্মের উন্নতির প্রার্থনা করিয়াছিল, সে প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে।’

ইতিহাসের উপাদান বিচারে লেখকের সাক্ষ্য প্রথমে গ্রহণ করি। ‘স্কন্দগুপ্ত, গোবিন্দগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, বন্ধুবর্মা, চক্রপালিত, হর্ষগুপ্ত প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, স্কন্দগুপ্তের হূনযুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু অধিক কথাই কাল্পনিক।’ তথ্য পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কল্পনার উৎস নির্ণয় করছি। এখানেও রাখালদাসের বাংলা এবং ইংরেজি বই দুখানিই আমাদের অবলম্বন।

রাখালদাস বলেছেন তিনি *Fleet's Corpusus Inscriptionum Indicarum* থেকে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, সে যুগের কবির প্রশস্তি লিপিও লেখকের সহায়ক হয়েছিল। পরবর্তী আবিষ্কারের ফলে ‘তোরমানকে এখন আর স্কন্দগুপ্তের সমসাময়িক বলিতে পারা যায় না এবং ইহা স্থির যে স্কন্দগুপ্ত জীবিত থাকিতে হূনগণ গুপ্তসাম্রাজ্য অধিকার করিতে পারে না। স্কন্দগুপ্তের দুই পুরুষ পরে তোরমান মালব অধিকার করিয়াছিল।’

পুরগুপ্তের লিপিতে স্কন্ধগুপ্তের নাম পাওয়া যায় না। এর কারণ কি? এখানে অনুমান ভিন্ন উপায় নেই। সম্ভবত পুরগুপ্তের সঙ্গে স্কন্দগুপ্তের বনিবনা ছিল না। এবং রাজ্যের অধিকার নিয়ে এঁদের মধ্যে গোলযোগ ঘটবারও সম্ভাবনা। পুরগুপ্ত তা হলে কি স্কন্দগুপ্তের বৈমাত্রেয়? এর থেকে এ অনুমান স্বাভাবিক যে কুমারগুপ্তের প্রথম মহিষীর পুত্র স্কন্দগুপ্ত অনন্তাদেবীর পুত্র। অনন্তাদেবীর পরিচয়ও ঐতিহাসিক। ইতিহাস থেকে এই সূত্রটিকে নিয়ে লেখক স্কন্দগুপ্ত এবং পুরগুপ্তের কাহিনী রচনা করেছেন। জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার বঞ্চিত করা একটু অস্বাভাবিক ঘটনা। হয়তো এর মধ্যে কুমারগুপ্তের পত্নী অনন্তাদেবীর প্ররোচনা ছিল। যদি এই প্ররোচনা থেকে থাকে তবে অনন্তদেবীর উদ্দেশ্যকে সৎ বলা যায় না। অথচ অনন্তাদেবীর নামে সে রকম কোনো কলঙ্ক ইতিহাসে নেই। সুতরাং লেখক ভিলেন ইন্দ্রলেখাকে সৃষ্টি করেছেন। অত্যাচার-

অনাচারের দায়িত্ব ইন্দ্রলেখার উপরেই এসে পড়ে। আবার কুমারগুপ্তের দীর্ঘ রাজত্বকালে এটুকু ঐতিহাসিক সত্য যে তিনি শেষজীবনে বিলাসী হয়ে পড়েন। তার সময় থেকেই বিশাল মগধ সাম্রাজ্যের অধঃপতন শুরু। কুমারগুপ্তের অধঃপতনের প্রকৃত কারণ কি তা জানা না থাকলেও লেখক-প্রদর্শিত পথকে একেবারে অবহেলা করা যায় না। সুতরাং রাখালদাসের কল্পনা উপন্যাসের বৈচিত্র্য আনতে সমর্থ হয়েছে বলে মনে করি।

ইতিহাসে স্কন্দগুপ্তের কোনো পত্নীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। যে সমস্ত মুদ্রা পাওয়া গেছে তার মধ্যে কোনো কোনো ঐতিহাসিক তার পত্নীর লেখা দেখতে পেয়েছেন। মনে করি সেই কল্পনাবলে লেখক অরুণার চিত্রটি অঙ্কন করেছেন। স্কন্দগুপ্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটির উৎসস্থল ভিটরী গ্রামের শিলালেখের অনুকরণে লিখিত। অন্তর্বেদীর যুদ্ধও ঐতিহাসিক। উপন্যাসের প্রতিপাদ্য অনেক বিষয়েই তিনি তাঁর বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতামালার তথ্যপ্রমাণ ব্যবহার করেছেন। লক্ষণীয়— আজ পর্যন্ত স্কন্দগুপ্ত সম্বন্ধে নূতন কোনো তথ্য আবিষ্কৃত হয় নি। দেবধর এবং অমিয়ার কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিকতা কিছু নেই। তবে লেখকের পরিবেশ রচনা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। রোহিতাশ্ব দুর্গ ঐতিহাসিক। এই দুর্গের অধিপতিরা যে গুপ্তসাম্রাজ্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত ছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

গোবিন্দগুপ্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন তিনি মালব দেশের অধিপতি ছিলেন।

ভানুমিত্র-করুণা কাহিনী লেখকের কল্পনাপ্রসূত। মগধের সঙ্গে গৌড়ের সংযোগসাধনের জন্যে লেখকের এই পরিকল্পনা নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবি রাখে।

গল্পের শেষে লেখক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কথা উত্থাপন করেছেন। স্থানীশ্বররাজ এবং যশোধর্মের ঐতিহাসিকতার সাক্ষ্যে লেখক এই কথা বলেছেন। এই রাজাদের সময়ে বৌদ্ধধর্ম আবার নবজীবন লাভ করে এ কথা সকলেই বলেছেন।

কাহিনীটিকে লেখক কতগুলি ভাগে সাজিয়েছেন—বোধিসত্ত্বায়, অগ্নি, অঙ্গার, ভস্ম। প্রথম ভাগকে 'বোধিসত্ত্বায়' বলায় লেখকের মূল অভিপ্রায় সম্বন্ধে একটা স্থির ধারণায় আসা যায়। সমগ্র কাহিনীটির মধ্যে কুমারগুপ্তের দুর্বলতা এবং হিন্দুসৈনিকের বীরত্বের কথা বলা সত্ত্বেও লেখক মূল কথা একে বলেন নি। গল্পের ফলশ্রুতি থেকে বোঝা যায় গুপ্তসাম্রাজ্যের ধ্বংসের জন্যে দায়ী বৌদ্ধ প্ররোচনা এবং ষড়যন্ত্র। বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যেই হরিবল-ইন্দ্রলেখা-অনন্তদেবীর আবির্ভাব। বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্যেই হিন্দুরাজত্বে অগ্নি জ্বলে উঠল। তারই অঙ্গার এবং ভস্মের চিহ্ন স্কন্দগুপ্তের পরিসমাপ্তিতে। দেখা যাবে ইন্দ্রলেখা এবং হরিবলের ষড়যন্ত্রের একটি অধ্যায়ের শিরোনামাতে আছে 'অগ্নিতে ইন্ধন', আর-একটিতে আছে 'অগ্নি জ্বলিল'। এর পর এই অনুমান স্বাভাবিক যে বৌদ্ধরাই গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের কারণ। বাহ্লীকবীর ব্রাহ্মণের কাছে হরিবল স্পষ্টত স্বীকার করেছে যে হূন আক্রমণ আসলে রাজ্যের পক্ষে অভিশাপ নয়— আশীর্বাদ। পুরুগুপ্তকে হূনদের সঙ্গে সন্ধিভিক্ষার পশ্চাতেও বৌদ্ধদের আশঙ্কা জয়যুক্ত হয়েছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণের মৌলিক দিকটি উপন্যাসেও বিস্তৃত হয়েছে। হরিবলের উক্তি থেকে জানতে পারি বৌদ্ধদের আসল শত্রু গুপ্তরাজকুল। হূন যেমন শত্রু, গোবিন্দ, দামোদর স্কন্দ আর বৈষ্ণব-অভিজাত সম্প্রদায় তেমনি শত্রু। 'শত্রুবিনাশে শত্রুক্ষয় হউক, সাম্রাজ্য রসাতলে যাউক, মগধের আধিপত্য থাকিলেই আমাদের যথেষ্ট।'

কিন্তু করুণায় এই দিকটি প্রকাশিত হলেও শশাঙ্কের মত এ বস্তু আত্যন্তিক হয়ে ওঠেনি। পূর্বে বলেছি প্রবল স্বদেশপ্রেরণা থেকেই এই কাহিনী রাখালদাস লিখেছিলেন। কতগুলি উদ্‌ধৃতির সাহায্যে এই প্রসঙ্গটিকে বিস্তৃত করি।

অগ্নিগুপ্তের আত্মত্যাগ মহৎ সম্ভাবনায় দীপ্যমান—'দেশের জন্য, ধর্মের জন্য, দেবতার জন্য, রমণী ও ব্রাহ্মণের জন্য কয়জন মরিতে পারে? যে পারে সে মানুষ নহে দেবতা।' এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই অগ্নিগুপ্ত হূনযুদ্ধে নিহত হন। দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও 'যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী হইয়া মরিব, মাতৃভূমি রক্ষা করিয়া মরিব' এইটি ছিল তার মূলমন্ত্র। গ্রহাচার্যের আকাঙ্ক্ষা আসলে রাখালদাসের নিজেরও আকাঙ্ক্ষা 'অগ্নিগুপ্ত, আবার আসিও— দেবতা ও ব্রাহ্মণ, রমণী ও শিশু রক্ষা করিতে আবার আসিও।'

অগ্নিগুপ্ত আসলে গুপ্তকুলরবি স্কন্দগুপ্তেরই অংশ। স্কন্দগুপ্তের জীবনেও অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা দেখি। মাতৃভূমি রক্ষার উদগ্র বাসনা স্কন্দগুপ্তকে মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছে। শিলালেখের সাক্ষ্যে রাখালদাসও স্কন্দগুপ্তকে নারায়ণ বাসুদেব রূপেই চিত্রিত করেছেন। দুষ্কৃতকারীর দমন এবং সাধুব্যক্তির পরিত্রাণ এইটি তাঁর জীবনের লক্ষ্য। বামাকণ্ঠের ধ্বনিতে স্কন্দগুপ্তের আসল পরিচয় পাই 'কে সে মাগধগণ, সে গুপ্তকুলপুত্র, আর্যাবর্তের পরিত্রাতা, রমণী ও শিশুর রক্ষাকর্তা, বক্ষুবাহ্লীক ও শতদ্রুর যুদ্ধজেতা। বন্ধুগণ সে মাগধ, সে পাটলিপুত্রিক, সে আমাদিগের পরমাত্মীয়, তাহার নাম স্কন্দগুপ্ত।' লেখক স্কন্দগুপ্তের জবানিতে সমসাময়িক জনচিত্তকে প্রকাশ করেছেন। সমসাময়িক বিভেদও লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি। অগ্নিগুপ্তের জবানিতে অন্তর্বিরোধ রাজ্যনাশ এই সত্যটি ব্যক্ত। 'কিন্তু যেদিন গৃহবিবাদ সূচিত হইবে সেইদিন চন্দ্রগুপ্ত বিন্দুসার ও অশোকের সাম্রাজ্য শতধাবিভক্ত হইয়া যাইবে। পুষ্যমিত্র ধূলিমুষ্টির জন্য স্বর্ণমুষ্টি পরিত্যাগ করিয়াছিল, সে কথা বিস্মৃত হইও না।' স্কন্দগুপ্তের ট্রাজেডি পাঠকের সমবেদনা আকর্ষণ করে। রাষ্ট্রনীতির কুটিলচক্রে নিবেদিত হয়েছে স্কন্দগুপ্তের পত্নী অরুণাদেবীর দেহ। দেশের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ চরিত্রটিকে অলোকসামান্য মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

দেবধর-অমিয়া কাহিনী শিথিলবদ্ধ। কিন্তু স্বামীধর্মের রূপটি পরিস্ফুট করার জন্যে এর সার্থকতা।

গ্রন্থটির নাম করুণা। এবং করুণা চরিত্র অঙ্কনে লেখকের দুর্বলতা সমধিক। করুণার উন্মত্ত অবস্থা এবং হূনদের মাতারূপে গৃহীত হবার কাহিনীটি প্রহেলিকার স্তরে উপনীত। ঋষ্যদেব সংস্কৃত বিদূষক চরিত্রের উন্নত সংস্করণ। শৌণ্ডিকালয়ের চিত্রও মৃচ্ছকটিকের আদর্শে চিত্রিত। ইন্দ্রলেখা ভিলেন জাতীয় চরিত্র। হরিবলকে রাখালদাস বলেছেন বৌদ্ধাধম। তাঁর ধারণা অনুযায়ীই এই চরিত্র অঙ্কিত।

ময়ূখ

মুসলমান বিজয়ের পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস রচনা করার পর রাখালদাসের দৃষ্টি পড়ল মোগল রাজত্বের প্রতি। মোগল ইতিহাসকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা করলেও রাখালদাস রমেশচন্দ্রের মত রাজপুত ঘটনা অবলম্বন করেন নি। ময়ূখের পটভূমিকা শাহজাহানের রাজত্বকাল। প্রধানত পর্তুগীজ অত্যাচারের কাহিনীটি বিস্তৃত করবার আকাঙ্ক্ষাই রাখালদাসের ছিল। ভূমিকাতে লেখক বলেছেন, পর্তুগীজ মিশনারিরা চট্টগ্রাম এবং হুগলি অঞ্চলে খ্রীষ্টানি ধর্মান্তরকরণের জন্যে নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার করেছে। এই অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে দেশকে মুক্ত করার ইচ্ছায়

শাহজাহান ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। ফলে হুগলি মোগলদের শাসনে আসে। তারিখ-ই-শাহজাহান লেখকের অবলম্বন ছিল। G. Keene এবং James Burgess-এর লেখাও গ্রন্থকারের সহায়তায় এসেছিল। লেখক ভূমিকাতে গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা বিচার করেছেন।

ময়ূখের কাহিনীটি এই : পর্তুগীজ অত্যাচারে বাংলাদেশ জর্জরিত। বাংলাদেশের জমিদারপুত্র ময়ূখ পিতার অধিকার থেকে বঞ্চিত। তার প্রণয়ী ললিতা। পর্তুগীজরা ললিতাকে হরণ করে নিলে। ময়ূখ যথাসাধ্য বাধা দিয়ে আহত হল। এমন সময়ে ময়ূখ সপ্তগ্রামনিবাসী বণিক গোকুলবিহারী সেনের আশ্রয় পেলে। বণিক এবং ময়ূখ পর্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে। উভয়েই দেশের এই অত্যাচার নিবারণের জন্যে সম্রাটের সাহায্যের কথা ভাবলে। গোকুলবিহারী সেনের চেষ্টায় ময়ূখ সপ্তগ্রামে এল। এখানে বাদশাহের পালিতা কন্যা গুলরুখ ময়ূখের অনুপম্ দেহকান্তি দেখে তাকে ভালোবাসলে এবং ময়ূখকে লাভ করবার জন্যে নানা উপায় চিন্তা করেতে লাগল। সপ্তগ্রামেও পর্তুগীজরা অত্যাচার নিপীড়ন করছিল। ময়ূখ নিজেও বাধা দেবার চেষ্টা করে আহত হল। ইতিপূর্বেই ময়ূখের পরিচয় সপ্তগ্রামের মোগল শাসনকর্তা আসদ খাঁ জানতে পেরেছিলেন। সপ্তগ্রামের যুদ্ধে গুলরুখও বন্দী হল। ছাড়া পেয়ে ময়ূখকে আহত অবস্থায় দেখে গুলরুখ তাকে বজরায় নিয়ে এল। ময়ূখের তখন স্মৃতিভ্রংশ। গুলরুখকে ললিতা মনে করলে। পর্তুগীজ অত্যাচারে উন্মত্ত হয়ে হুগলির কাছে বিনোদিনী বৈষ্ণবীর গৃহে আশ্রয় পেয়েছিল। ময়ূখ সেখানে এলে উভয়ের পূর্বের কথা মনে পড়ল। গুলরুখ আশ্রমে এল। বিনোদিনী বৈষ্ণবী ময়ূখ ললিতা গুলরুখ দিল্লীতে উপনীত। গুলরুখ ময়ূখকে বাদশাহের অন্তঃপুরে আনবার ব্যবস্থা করলে। ময়ূখ বাদশাহের কাছে প্রশংসা পেলে এবং মনসবদার নিযুক্ত হল। যেদিন সে মনসবদার নিযুক্ত হল সেদিনই গুলরুখের প্রেরিত লোকজন ময়ূখকে হতচেতন করে মোগল-অন্তঃপুরে নিয়ে এল। ললিতার সঙ্গে ময়ূখের বিবাহের সব ঠিকঠাক ছিল। গুলরুখ ময়ূখের কাছে প্রেমভিক্ষা করলে। তা উপেক্ষিত হল। সুতরাং প্রাণদণ্ডাজ্ঞা নির্দিষ্ট হল। ময়ূখকে যখন ফাঁসিমঞ্চে চড়ানো হল তখন নাটকীয় ভাবে মমতাজের আবির্ভাবে ময়ূখ রক্ষা পেল। শাহজাহান সমস্ত শুনতে পেলেন। গুলরুখ আপন কৃতকর্মের কথা নিবেদন করলে। এর পর ময়ূখ হুগলি-অধিকারকালে মোগলসেনার সাহায্য করলে। বিজয়ী ময়ূখ ললিতাকে বিবাহ করে সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হল মমতাজের সমাধির পাশে। মমতাজের স্মৃতি সকলের মধ্যে প্রেমের উদার ভাবনা এনে দিলে।

ময়ূখ-ললিতা-গুলরুখের কাহিনী রমেশচন্দ্রের মাধবীকঙ্কণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নরেন্দ্রের মত ময়ূখও ভাগ্যবিড়ম্বিত, পিতার অধিকারবঞ্চিত। হেমলতার জন্যে এবং পিতার রাজ্য উদ্ধার করার আশায় নরেন্দ্র মোগল-রাজপুত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল। জেলেখার আবির্ভাব নরেন্দ্রের জীবনে অবিস্মরণীয় ঘটনা। জেলেখা প্রেমবঞ্চিত, নরেন্দ্র হেমলতাতে সমর্পিতচিত্ত। ময়ূখও পর্তুগীজ-মোগল দ্বন্দ্বে নিজেকে জড়িয়েছে, গুলরুখের প্রেমকে সেও প্রত্যাখ্যান করেছে। জেলেখা মৃত্যুবরণ করে প্রেমের দীপ্তিতে ভাস্বর, গুলরুখ চোখ অন্ধ করে রূপতৃষ্ণা জয় করেছে। উভয়ের প্রেমেই মহত্ত্বের দিক আছে। সাদৃশ্য আরও আছে। হেমলতা থেকে নরেন্দ্রের মন ফিরানোর জন্যে জেলেখা নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে নি এবং সম্রাট শাহজাহানের কাছে কৃতকর্মের জন্যে সে অনুশোচনাও জানিয়েছে। মিল যেমন আছে অমিলকেও তেমনি উপেক্ষা করা যায় না। নরেন্দ্রের পরিণতি

ময়ূখের মত মিলনে নয়। জেলেখা তাতারী গুলরুখ বাদশাহপালিতা। আরও এক কথা, বৃদ্ধের প্রশ্নে ময়ূখ সম্বন্ধে গুলরুখই বলেছিল 'আমার খসম'। উক্তিটি নিঃসন্দেহে কপালকুণ্ডলার মতিবিবির উক্তির প্রতিধ্বনি।

লেখক পর্তুগীজ হার্মাদদের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। রাখালদাসের মূল উদ্দেশ্যও বোধ হয় তাই ছিল। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাসে এ বস্তু এমন কিছু নূতন নয়। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ইতিপূর্বে 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়ে' পর্তুগীজ-মগ দস্যুদের নৃশংসতার কথা বলেছেন। গঞ্জালিসের উল্লেখ প্রতাপচন্দ্রও করেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগের নরহরি সরকারের কথা জানতেন কি না জানিনা, তবে চৈতন্যদাসের নির্যাতনের কাহিনী উক্ত ঘটনারই উপন্যাসরূপ। শিষ্যকে গচ্ছিত রেখে নরহরি পর্তুগীজদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। শিষ্য লোচনদাসের প্রশংসা করে মধ্যযুগের কবি লিখেছিলেন 'গুরুর অর্থে বিকাইল ফিরিঙ্গির হাথ'।[২২] রাখালদাসও চৈতন্যদাসের উপর পর্তুগীজ পাদ্রীর অত্যাচার-নিষ্ঠুরতার জীবন্ত চিত্র দিয়েছেন। পর্তুগীজরা পরবর্তী ইংরেজ পাদ্রীদের মত শিক্ষা-উপদেশের বিশেষ ধার ধারতেন না।

তথাপি রাখালদাসের বর্ণনায় আতিশয্য লক্ষণীয়। যে সময়ে ময়ূখ বেরোয় তার অনেক আগেই পর্তুগীজদের বিবরণ বেরিয়েছিল। কিন্তু বাঙালির স্মৃতিতে মধ্যযুগের কবিবর্ণিত পর্তুগীজ-দস্যুতার বিবরণগুলিই দৃঢ়মূল হয়েছিল। রাখালদাসও এই স্মৃতির উপরে বেশি জোর দিয়েছিলেন। ফলে কিছুটা তথ্য কিছুটা কল্পনা মিশিয়ে রাখালদাস পর্তুগীজ-নৃশংসতার দিকটিকেই স্পষ্ট করেছেন। ম্যানরিকের উক্তি যে মিথ্যা সেইটি প্রমাণ করাও লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পর্তুগীজ ধর্মান্তরকরণের পাশাপাশি চৈতন্যদাসের কৃষ্ণভক্তির জয়ঘোষণা কিছুটা উদ্দেশ্যমূলকতার সাক্ষ্য বহন করে। চৈতন্যদাসের চিত্রে আদর্শবাদ থাকলেও তা বিশেষ বেমানান হয় নি। চৈতন্যদাসের ভূমিকা স্পষ্ট এবং সাহিত্যগুণোপেত।

বাঙালিবীর ময়ূখের প্রথম যুদ্ধটি রোমান্সলক্ষণাক্রান্ত। রোমান্সের আতিশয্য লক্ষিত হয় সন্ন্যাসী চরিত্র অঙ্কনে। ধর্মপালে বিশ্বানন্দ-অমৃতানন্দের চরিত্রেও এই রোমান্সপ্রবণতা জয়ী হয়েছে। ময়ূখের ভাগ্যবিচার, জাহাঙ্গীরনগরে তাঁর আবির্ভাব, সম্রাট শাহজাহানের সন্ন্যাসীর কাছে নতিস্বীকার কিছুটা আকস্মিক। চণ্ডীচরণ সেনের রামেশ্বরের আচরণ এবং সন্ন্যাসীর ব্যবহার প্রায় অনুরূপ। সম্রাটমহিষী মমতাজের আকস্মিক আবির্ভাবও অনুরূপ রোমান্স-প্রভাবিত।

কিন্তু ময়ূখের ঐতিহাসিক পরিবেশটি সুন্দরভাবে চিত্রিত। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দেশে বিধি-বিধানের প্রতি সমাজনায়কদের আত্যন্তিক আস্থা দেখি। সেইটি পরিস্ফুট হয়েছে ললিতা-অপহরণের পর পল্লীসমাজের বিচারের দৃশ্যটিতে।

২২ শ্রীসুকুমার সেন, 'মধ্যযুগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী' পৃ ৪৬

"It is a significant fact that despite their many-sided activities, the Portuguese survive in popular imagination as pirates and plunderer only and the best-known passage referring to them in the literature of the period perpetuates the memory of their ruthless ravages along the coast."—T. K. Roy Choudhury, *Bengal under Akbar and Jahangir*: pp. 229.

মোগল রাজদরবারের বর্ণনায় লেখক বঙ্কিমের প্রভাবমুক্ত। দেওয়ান-ই-খাস গোসলখানা ইত্যাদি বর্ণনায় রাখালদাস কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। পরিবেশ রচনার দিক থেকে এর মূল্য অপরিসীম। মোগল-অন্তঃপুরের বর্ণনায় লেখক রমেশচন্দ্রের অনুসরণ করেছেন। জাহানআরার স্বেচ্ছাচারিতা মাধবীকঙ্কণের জাহানারার কথা অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাতার রমণী এবং কাল্মকের বিনোদিনী বৈষ্ণবীর গৃহে হানা দেওয়ার দৃশ্যটি। এ বর্ণনায় ঈষৎ স্থূলতা আছে সত্য, কিন্তু এ স্থূলতা বাস্তবসম্মত। তাতারী রমণী সরাব পান করে, উপপতি গ্রহণে সে নির্বিচার, মোগল হারেমের নানা গুপ্ত প্রয়োজনে সে প্রধান সহায়িকা। কিন্তু কাল্মকের প্রশ্নে সে যখন বলে, 'মোগল বাদশাহের অন্দরমহলের চাকরী, আর বাঙ্গালা মুলুকের জবান, আর মরুভূমি এই তিনই সমান।' তখন এই রমণীর জীবনকাহিনীর চকিত আভাস পাঠককে সহজে আকর্ষণ করে। রমেশচন্দ্রের মোগল দাসী তাতারি জেলেখার বর্ণনা আবেগের পথ অনুসরণ করেছে— রাখালদাস লঘু চালে একই বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে শাহ্‌জাহানের পরিচয় বিশেষ নেই। ময়ূখে 'আশিক ও মাশুকে'র চিত্র কেবল ময়ূখ-গুলরুখের বর্ণনাতেই নয় শাহ্‌জাহান-মমতাজের চিত্র-রচনাতেও দীপ্যমান। এ জন্যে বোধ হয় রাখালদাস সকলের মিলনস্থলটি নির্বাচন করেছেন মমতাজের সমাধির পার্শ্বে। ললিতা, গুলরুখ, ময়ূখ, শাহজাহান, চৈতন্যদাস উদার মানবপ্রেমে এসে মিলিত হয়েছে মমতাজের সমাধিপাশে। গুলরুখের যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা যখন নির্বাপিত, তখন ময়ূখ গুলরুখের বেদনায় দীর্ণচিত্ত, ললিতাও গুলরুখের নৈকট্য অনুভব করে, চৈতন্যদাসের মানবতা উচ্চ আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়।

অসীম

রাখালদাসের পুস্তকাকারে শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'অসীম' দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবে বার হয়েছিল। পুস্তকাকারে এটি প্রকাশিত হল ১৩৩১ সালে। বইটি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অসীমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গীত।

ময়ূখের পটভূমিকা শাহজাহানের রাজত্বকাল। অসীম রচিত হয়েছে সম্রাট ফররুখসিয়রের রাজত্বের পটভূমিকায়। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'অসীম' সত্য সত্যই ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'এক অসীম ও মণিয়া ব্যতীত অধিকাংশ পুরুষ ও নারী চরিত্র সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।' শশাঙ্কের 'ভূমিকা' থেকে বুঝতে পারি মোগলশাসনের সময় বাঙালিজাতির অধঃপতন ঘটেছিল। রাখালদাসের এ মত কতটা সমীচীন সে বিচার এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু রাখালদাস সম্ভবত এই কারণেই বাঙালিবীর-চরিত্র অবলম্বন করে জাতির অধঃপতনের সময়েও দু-একটি উজ্জ্বল চিত্র রচনা করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলেন।

অসীম দীর্ঘ রচনা। অবান্তর বিষয়ের অবতারণা গ্রন্থটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাস হিসেবে বইটির আদর হয় নি। ভারতবর্ষ সম্পাদক বইটির প্রকাশ বন্ধ করে দেন।[২৩] কাহিনীটি এই—

আওরঙজেবের মৃত্যুর পর মোগল রাজ্য পতনোন্মুখ। রাজধানীর বিশৃঙ্খলা প্রদেশগুলিতেও ছড়িয়ে

২৩ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়' শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৬৪

পড়েছিল। সুবাদাররা সম্রাটের পরিবর্তনে সর্বদাই চিন্তিত থাকতেন। বাদশাহ্ আলমের পর আজীম-উশ্-শানের সম্রাট হবার সম্ভাবনা। কিন্তু আজীম উশ্ শানের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে কলহ হতে পারে। আজীম উশ্-শানের পুত্র ফররুখসিয়র বাংলার কানুনগো হরনারায়ণের ভ্রাতা অসীম এবং ভূপেন্দ্রের পরিচিত। অসীমের গৃহে শান্তি ছিল না বলে ফররুখসিয়রের সঙ্গে দিল্লির পথে পাটনা চলে আসে। পাটনায় অসীম মণিয়া বাঈয়ের সাক্ষাৎ পেলে। মণিয়া বাঈ অসীমের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। অসীম মণিয়ার প্রতি স্নেহ অনুভব করে কিন্তু প্রেমের প্রশ্নে বিচলিত হয়। ওদিকে অসীমের সংবাদ জানবার জন্যে হরনারায়ণ পাটনাতে নবীন পরামাণিক এবং সরস্বতী বৈষ্ণবীকে পাঠান। অসীমের নামে গ্রামে কুৎসা রটনা হল গ্রামের হরনারায়ণ বিদ্যাসাগরের কন্যা দুর্গাকে কেন্দ্র করে। হরনারায়ণও সমাজচ্যুত হয়ে পাটনায় চলে এলেন সপরিবারে। পাটনাতে অসীম দুর্গা মণিয়া কাহিনীর বর্ণনাই গ্রন্থের মূল বিষয়। মণিয়া অসীমকে লাভ করবার কোনো আশা নেই দেখে হরনারায়ণের উপদেশমত বৈষ্ণব আচারে দীক্ষিত হল। ঘটনাক্রমে অসীম শৈলকে বিবাহ করলে। ফররুখসিয়র সম্রাট হয়ে অসীমকে হাজার মনসবদার করে বাংলার রুকনপুরের শাসনভার দিলেন।

এর পর দশ বছর অতিক্রান্ত। দিল্লিতে সিংহাসন নিয়ে ষড়যন্ত্র লেগেই ছিল। ফররুখসিয়রের তখন চরম দুর্দশা। অসীম ও ভূপেন্দ্র রাজার এই দুর্দশার সময়ে দিল্লী এল। সম্রাট পরাজিত এবং বন্দী। ভূপেন্দ্র ফররুখসিয়রকে মুক্ত করতে গিয়ে প্রাণ হারাল। ফররুখসিয়রেরও মৃত্যু হল। অসীম মণিয়ার সঙ্গে চলল বৈষ্ণবের আরাধ্যদেবতা গোপালের সন্ধানে।

পুত্র অসীমের মৃত্যুশয্যায় রাখালদাস এই বই আরম্ভ করেছিলেন। শেষজীবনে রাখালদাস নিজেও দুঃখযন্ত্রণা পেয়েছিলেন। ধনীর সন্তান রাখালদাস দারিদ্র্যের পেষণে বাড়ি পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হন।[২৪] ব্যক্তিগত ব্যর্থতা তার মধ্যে এনে দিয়েছিল হতাশা। এজন্যে অসীম গ্রন্থে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার বাণীই বারবার শুনি। ফররুখসিয়র সম্রাটপুত্র, কিন্তু তিনি সুজার কথা স্মরণ করে কাতর হয়ে পড়েন— আশার পথ দেখতে পান না। মণিয়া পাটনার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, বাঈজী-জীবনে তার অর্থস্বচ্ছলতা অতিসহজেই ঘটতে পারত, কিন্তু অসীমের আশায় সে তার রূপকে ধিক্কার দিয়েছে, দুঃখকে চিরসঙ্গী করেছে। অন্ধ ভূপেন্দ্র ফররুখসিয়রের জন্যে মৃত্যুবরণ করেছে, দুর্গার জীবনেও বৃন্দাবন আশ্রয় হয়েছে, সর্বোপরি গ্রন্থের নায়ক অসীম রায় মনসবদার হয়েও জীবনে একটা ব্যর্থতার সুরই অনুভব করেছে। এ সব দেখে মনে হয় রাখালদাস তাঁর ব্যক্তিগত ব্যর্থতার দিকটিই বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বিস্তৃত করে দিয়েছেন। ব্যক্তিগত ভাবনার জন্যে উপন্যাসটিতে রচনাগত শিথিলতা অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকট। ইতিহাস এ কাহিনীর একটি বৃত্তরেখা মাত্র। কেন্দ্রস্থ চরিত্রগুলির মধ্যে ইতিহাসের আবর্ত লক্ষ করা যায় না। পাটনার ঘটনার অতি-বিস্তৃতি গ্রন্থটির অন্যতম ত্রুটি। এ বর্ণনায় যতটুকু সত্য আছে তা যে কোনও সামাজিক উপন্যাসে স্থান পেলে আপত্তি উঠবার কারণ থাকত না। লেখক সামাজিক উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। এ উপন্যাসে সামাজিক উপন্যাস এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভেদরেখাটি অবলুপ্ত। পূর্ববর্তী উপন্যাস ময়ূখেও সামাজিক বিশ্লেষণ আছে কিন্তু সেইটি সেখানে বেমানান হয় নি। গ্রন্থটিতে ত্রিবিক্রমের আচরণে বাস্তবতার লেশমাত্র নেই। অসীমের বিবাহও কতকটা আকস্মিক।

২৪ ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাঙ্গলার ইতিহাস' (১ম ভাগ) ভূমিকা।

আরও এক কথা, দুর্গা-অসীমের সম্বন্ধ নিয়ে হরনারায়ণের সতর্কতা এবং জালবিস্তার অতিকথনদোষে দুষ্ট। বিষয়টি ক্ষুদ্র, এর জন্যে এতটা স্থান নেবার প্রয়োজন ছিল না।

অসীমে বৈষ্ণবতার সুর লক্ষণীয়। এই বৈষ্ণবতার সুর ধ্বনিত হয়েছে হরিদাস বাবাজী, মণিয়া দুর্গা এবং অসীমের মধ্যে। এর পূর্বাভাস কিন্তু ধর্মপালের বালব চরিত্রে, ময়ূখে চৈতন্যদাসের ভূমিকায়। এই সব উপন্যাসে যা ছিল বীজাকারে অসীমে তাই পত্রপল্লবে বিস্তৃত।

লুৎফ উল্লা

রাখালদাসের লুৎফ উল্লা মাসিক বসুমতীতে ১৩৩৪ থেকে ১৩৩৬ সাল পর্যন্ত বার হয়েছিল। উপন্যাসটি বৃহৎ নয়। বসুমতীর সব সংখ্যায় লুৎফ উল্লার কাহিনী প্রকাশিত হয় নি। পূর্ববর্তী উপন্যাস অসীমে ফররুখসিয়রের কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল। এ উপন্যাসেও মোগল শাসনের শেষ দৃশ্যকে পটভূমিকা করা হয়েছে। কাহিনীটি গড়ে উঠেছে মহম্মদ শাহের রাজত্বকালকে কেন্দ্র করে।

লুৎফ উল্লার কাহিনী বিশেষ কিছু নেই। সমগ্র দৃশ্যগুলি নাদির শাহের অত্যাচারের ঘটনা, মহম্মদ শাহের কাপুরুষতা, মন্ত্রী ফৌজদারের বিশ্বাসঘাতকতা, প্রজাসাধারণের অকথ্য জ্বালাযন্ত্রণাভোগের বর্ণনা। এরই মধ্যে লেখক বাংলার আমীর আনন্দরাম, সুজাউদ্দীনের পুত্র আক্রমজমান খাঁ, নূরবাঈ এবং জগবাঈর কথা বলেছেন। আনন্দরাম ফকির শাহ লুৎফ উল্লার ছদ্মবেশে কি করে নাদির শাহের ভারত-আক্রমণের পূর্বে এবং আক্রমণের সময়ে প্রজাসাধারণের জন্যে অকাতরে সাহায্য করেছেন তার কথা বলা হয়েছে উপন্যাসটিতে। বাংলাদেশ থেকে আনন্দরাম দিল্লীতে এলে তিনি পদ্মিনী এবং লক্ষ্মীর বাড়িতে স্থান পান। এদের দয়া এবং অতিথিসেবায় আনন্দরাম মুগ্ধ হন। এই সময়ে দিল্লীর অবস্থা শোচনীয়। 'তখনও নূরবাঈ অতি সুন্দর নাচিতেছিল, কোকীজিউ গোপনে বাদশাহকে প্রেমের গান শিখাইতেছিল, সুতরাং গোলন্দাজরা কামান ছোড়া ভুলিয়া গিয়াছিল, বারুদ তৈয়ারী করা একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল, আওরঙ্গজেব আলমগীরের প্রেমের দায়ে হিন্দুরা অনেকদিন পূর্বে মোগলের রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল, সুতরাং আফগানিস্থান জয় করিতে নাদিরের বিশেষ বিলম্ব হইল না।'[২৫] আনন্দরাম বীর, পরোপকারেও তিনি উদারচিত্ত। এই কারণে লুৎফ উল্লাকে তিনি গৃহে আটক করে নিজে লুৎফ উল্লার ছদ্মবেশে রাজ্যে নাদির শাহের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অসন্তোষ জাগিয়ে তুললেন। আনন্দরাম রাজ্যের আমীর ওমরাহ, বাঈজী সকলের পরিচিত। সকলে তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ। মহম্মদ শাহ পরাজিত হয়ে নাদির শাহকে নিয়ে দিল্লীতে উপস্থিত হল। নূরবাই মুক্তি চাইলে। সে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ নর্তকী। নাদির শাহ তাকে পারস্যে নিয়ে যাবে বলে স্থির করলেন। নূরবাঈ আনন্দরামের সাহায্য প্রার্থনা করলে। আনন্দরাম নূরবাঈকে রক্ষা করলেন। কিন্তু নূরবাঈয়ের অদর্শনে রাজ্যে নাদিরশাহ অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে। তখন নূরবাঈ আপন সুখ বিসর্জন দিয়ে প্রজার মঙ্গলের জন্যে দিল্লীতে ফিরে এল। আনন্দরাম বন্দী হলেন। তাঁর বীরত্বের পরীক্ষা হল। দেখা গেল তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে এমন শক্তি নাদিরেরও নেই। এর পর নাদির দিল্লীর ধনদৌলত অসংখ্য বন্দী দাসদাসী নিয়ে পারস্য যাত্রা করবার মনস্থ করলেন। নূরবাঈ, আনন্দরাম কৌশলে অনেক প্রজাকে মথুরা অভিমুখে পাঠিয়ে দিলে। পরে আনন্দরাম আক্রমজমান খাঁ নূরবাঈ এবং পদ্মিনী নাদিরের বন্দীরূপে

---

২৫ মাসিক বসুমতী ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ।

পারস্য অভিমুখে চলল। পথে এরা বন্দীদের মুক্ত করে দিতে লাগল। নাদির এই ব্যাপার দেখে বিচারের জন্যে সকলকে আহ্বান করলেন। বিচারকালে প্রত্যেকেই নিজের উপর সমস্ত দোষ আরোপ করে শাস্তি প্রার্থনা করলে। নাদির এদের মহত্ত্ব দেখে মুগ্ধ হলেন। 'তখন শাহান শাহ নাদির শাহ নামিয়া আসিয়া নূরবাঈর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া বলিলেন, "তওয়াইফ, এমন কোকিল-বিনিন্দিতি কণ্ঠে আমার হুকুমে তলোয়ার পড়তে পারে না। দেশে ফিরে যাও। সকলে মুক্ত"।[২৬]
অসম্ভাবিত করুণায় সকল বন্দী কৃতজ্ঞতাপুত হৃদয়ে বিজেতার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। কেবল পারিল না আনন্দরাম, সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।'

রাখালদাস নাদির শাহের আক্রমণের সময়ে ভারতবর্ষের যে চিত্র এঁকেছেন তা বাস্তবসম্মত এবং ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ। চিন কিলিচ খাঁ,, সাদাৎআলির দ্বন্দ্ব, আমীর ওমরাহের কূটনীতি তখন দিল্লীতে লেগেই ছিল। বাদশাহরা আসলে মন্ত্রী, আমীরের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছিলেন। নাদিরশাহের অত্যাচারের বর্ণনা করে ঐতিহাসিক লিখেছেন, within the doomed areas, the houses were looted, all the men killed without regard for age, and all the women dragged into slavery. The destroyers set fire to many houses, and several of their victims, both dead and wounded, Hindus and Mussalmans, were indiscriminately together.[২৭]

জাট অধিবাসীদের কথাও ঐতিহাসিক।

লুৎফ উন্না নিঃশেষিত প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। যে উৎসাহ ও প্রেরণা নিয়ে রাখালদাস হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন সে প্রেরণার একান্ত অভাব এ গ্রন্থে দেখা যায়। অসীম থেকেই এই দুর্বলতার সূত্রপাত। অসীমেরই কয়েকটি চরিত্র এ গ্রন্থে নূতন ভাবে দেখা দিয়েছে। মণিয়া বাঈ নূরবাঈয়ের পূর্বসূরী, আনন্দরাম অসীমের নবসংস্করণ।

এনায়েৎউল্লার পত্নীর বিশ্বাসঘাতকতা, মহম্মদ শাহের নূরবাঈয়ের প্রতি আসক্তি এবং পরিশেষে জীবনে ব্যর্থতা 'অসীম' উপন্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মহম্মদ শাহের করুণ দিকটি রাখালদাসের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তুলনীয়।

উপন্যাস হিসেবে লুৎফ উন্না সার্থক নয়। কোনো চরিত্রের বিশেষত্ব নেই, বিকাশ নেই, কাহিনীও বিশেষ কিছু নেই। সকল চরিত্রই একঘেয়ে, গতানুগতিক। তবে নূরবাঈয়ের উদারতা মর্মস্পর্শী। দেশের প্রতি আন্তরিক প্রীতির পরিচয় পাই নূরবাঈয়ের একটি উক্তিতে। নাদির শাহ পারস্যের ঐশ্বর্য বর্ণনা করে নূরবাঈকে প্রলোভিত করবার চেষ্টা করলে নূরবাঈ বলেছিল—

'বুলন্দপনা, যা চোখে দেখি নি, তা বলতে পারি না, কিন্তু আমার হিন্দুস্থানের সব মিঠা,—জল মিঠা, হাওয়া মিঠা, ফুল মিঠা, ফল মিঠা, হয়ত এর চাইতেও মিঠা দেশ আছে জাঁহাপনা। কিন্তু সে মিঠা আমি চাহি না। আমি যে দেশে জন্মেছি, সেই দেশই আমার মিঠা, আমার কাছে এমন মিঠা আর কিছুই লাগবে না।'[২৮] জন্মভূমি যে সকল দেশের চাইতে সেরা এ সত্য বাঈজী হয়েও নূরবাঈ বুঝতে পেরেছিল।

২৬ মাসিক বসুমতী ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ।
২৭ R. C. Majumdar and others: *An Advanced History of India.*
২৮ মাসিক বসুমতী ১৩৩৪ চৈত্র।

পদ্মিনীর প্রেমের বিশেষত্ব কিছু নেই। ফকির শাহ্ লুৎফ উল্লার লচ্ছেদার রাবড়ীর প্রতি আসক্তি এবং লোভের বর্ণনায় রাখালদাসের রচনারীতির লঘুতা পীড়াদায়ক এবং বিষয়টির বিস্তৃতিও অনাবশ্যক ছিল। উপন্যাসটির লুৎফ উল্লা নামও সার্থক নয়।

ধ্রুবা

এই উপন্যাসটি প্রবাসীতে ১৩৩৮ সালের কার্তিক মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বার হয়। রাখালদাস লুৎফ উল্লার মতো এটিকেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত দেখতে পান নি। প্রবাসী সম্পাদক জানিয়েছেন, 'পরলোকগত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি প্রবাসীতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ১৩৩৫ সালে আমাদিগকে দিয়াছিলেন। তাহারও প্রায় ৬ মাস পূর্বে তিনি ইহা নাটকের আকারে আমাদিগকে প্রথম দিয়াছিলেন। তাহারও কিছুকাল পূর্বে তিনি ইহা রচনা করিয়াছিলেন। এই কাহিনীর প্রত্যেকটি কথা ঐতিহাসিক না হইলেও ইহার মুখ্য আখ্যানবস্তু ঐতিহাসিক এবং ইহার সমাজচিত্রও ইতিহাসসম্মত, এ কথা তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। এই চিত্রের মধ্যে হিন্দুরাজশক্তির পতনের অন্যতম কারণ লক্ষিত হইবে।'

বলা বাহুল্য এই উপন্যাসটি লুৎফ উল্লার আগের লেখা। গুপ্ত সাম্রাজ্য নিয়ে গবেষণা করে যে সকল তথ্য রাখালদাস পেয়েছিলেন তাই উপন্যাসাকারে ধ্রুবাতে পরিবেশন করেছেন।

উপন্যাসটিতে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের ভগ্নদশার সমাজচিত্র পাচ্ছি। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র রামগুপ্তের ভীরুতা, কাপুরুষতা রাজশক্তিকে কতখানি দুর্বল করে দিয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ধ্রুবাতে রয়েছে। অপর দিকে সমুদ্রগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রগুপ্ত এবং মাতা দত্তাদেবীর মহনীয় চরিত্রের ইতিহাস অঙ্কন করে চন্দ্রগুপ্তের মহানুভবতার দিকটিকে উদ্ঘাটিত করেছেন লেখক। শকরাজা বাসুদেবের সঙ্গে যুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের সমরকুশলতার দিকটি পরিস্ফুট। ধ্রুবা বা ধ্রুবস্বামিনীর পরিচয় ইতিহাস থেকে নেওয়া। রাখালদাস তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে *The Age of the Imperial Guptas* ধ্রুবস্বামিনীর ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন, ধ্রুবা ছিলেন রামগুপ্তের পত্নী। রামগুপ্তের মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত তাকে বিবাহ করেন। এইটি বিধবাবিবাহের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধ্রুবাকে বাসুদেবের নিকট প্রেরণ ব্যাপারটি ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ। কিন্তু উপন্যাসে লেখক বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করেন নি। রামগুপ্ত বিবাহ করতে চাইলেও ধ্রুবা চন্দ্রগুপ্তের বাগদত্তা বলে বিবাহে সম্মত হয় নি। অসহ্য নিপীড়ন সত্ত্বেও ধ্রুবা সংকল্পে অটল ছিল। রাখালদাস ধ্রুবা চরিত্রকে ইতিহাস থেকে নিয়েছেন বটে কিন্তু এই চরিত্র অঙ্কনে তিনি কল্পনার আশ্রয় নিতেও কার্পণ্য করেন নি। ধ্রুবা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীর একনিষ্ঠ প্রেমের জয় সূচিত হয়েছে।

যে যুগে রাখালদাস এই গ্রন্থ লেখেন সে যুগে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বড় বেশি ছিল। কৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও আদর্শকে রক্ষা করা জাতির অবশ্যম্ভাবী কর্তব্য ছিল। তার পরিচয় এই উপন্যাসে আছে। 'পিতা, আমাদের রক্ষা কর, পাটলিপুত্র আজ অনাথ, কেবল সাম্রাজ্য নয়, আজ ভারতবর্ষের প্রতি নগর তোমার মত বৃদ্ধের আশায় পথ চাহিয়া আছে।' এইটি গান্ধীর আদর্শে পরিকল্পিত কি? নাটকাকারে রচিত হয়েছিল বলে উপন্যাসটিতে কয়েকটি নাটকীয় আবেগময় মুহূর্তের সুন্দর উপস্থাপন দেখি।

‘ছন্দ-ধাঁধা’-পরিচয়

প্রবোধচন্দ্র সেন

প্রথম পর্যায়

এই অংশটুকু রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত একটি সচিত্র পোস্টকার্ড থেকে সংকলিত। সবটুকুই কবির স্বহস্তলিখিত।

ইংরেজি রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘মডার্ন রিভিউ’ পত্রিকায় (১৯২১ সেপ্‌টেম্‌বর, পৃ ৩৬১) *The Song* নামে। অতঃপর এটি আবার প্রকাশিত হয় ‘বিশ্বভারতী কোয়ার্‌টার্‌লি’ পত্রিকায় (১৯২৫ জানুআরি, পৃ ৩৫৯) *The Song Bird* নামে। এড্‌ওয়ার্ড টম্‌সন -প্রণীত *Rabindranath Tagore* গ্রন্থের (১৯২৬) ২০-সংখ্যক অধ্যায়ে এটি সংকলিত হয়েছে ইংরেজি ছন্দে রচিত রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি কবিতার প্রথম কবিতা-রূপে। এই গ্রন্থে কোনো কবিতারই নাম দেওয়া নেই। তাই এটিও নামহীন।

রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পোস্টকার্ডটিতে নাম দেওয়া আছে ‘কবিকাহিনী’। এই নামটি এবং ইংরেজি রচনাটির আনুষঙ্গিক বাংলা উক্তিটুকু বোধ করি কোথাও প্রকাশিত হয় নি। যাঁকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্যটুকু লেখা, পোস্টকার্ডটিতে তাঁর নাম নেই; রচনার তারিখও নেই। শোনা যায়, এটি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে লেখা। অসম্ভব নয়। পত্রিকায় প্রকাশকাল থেকে মনে হয়, এটি ১৯২১ সালে কিংবা তার আগে রচিত। বোধ হয় অধ্যাপক এণ্ডারসনের সঙ্গে ইংরেজি ও বাংলা ছন্দের প্রকৃতিগত পার্থক্য নিয়ে দীর্ঘকাল-ব্যাপী আলোচনার (১৯১৩-১৯) অন্যতম ফল এই রচনাটি।

ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রমতে এটিকে বলা যায় Trochaic Pentameter (আদিগুরু দ্বিদল পঞ্চপর্বিক) ছন্দ। বাংলা মতে এটি দলমাত্রিকবর্গীয়। অর্থাৎ ইংরেজি মতে এর প্রতিপংক্তিতে পাঁচ পর্ব (foot) ও প্রতিপর্বে দুই দল, আর বাংলা মতে এর প্রতিপংক্তিতে আড়াই পর্ব ও প্রতিপর্বে চার দল। উভয় মতেই প্রতিপর্বের প্রথম দলটি প্রস্বরিত (stressed)।

ছন্দোবন্ধ বা বহির্গঠনের বিচারে এটিকে বলা যায়—

> কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
> তাহার ’পরে নজর এত কেন ?
> পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো,
> সবার আমি একবয়সী জেনো।

এই রচনাটির ইংরেজি প্রতিরূপ। কিন্তু ইংরেজি রচনাটি মিলহীন, এটুকুও লক্ষিতব্য।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় এই যে, দীর্ঘকাল পূর্বেই (১৯১৩ সালে) অধ্যাপক এণ্ডারসন বাংলা ছন্দে রচিত ইংরেজি কবিতার একটি নমুনা উদ্‌ধৃত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁর একখানি পত্রে। দুই জনের রচনার মধ্যে পার্থক্য এই যে, এণ্ডারসন সাহেব ইংরেজি রূপ দিয়েছিলেন বাংলা ‘অক্ষরগোনা’ সাধু পয়ার ছন্দকে, আর রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে রূপান্তরিত করেছেন ‘দলগোনা’ বাংলা লৌকিক ছন্দকে। তা ছাড়া,

এণ্ডারসনের ইংরেজি রচনাটিতে মিল রক্ষিত হয়েছিল ; রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই রচনাটিতে মিল দেবার প্রয়াস করেন নি।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের মতে ধ্বনিপ্রকৃতিতে ইংরেজির সঙ্গে চলতি বাংলার যথেষ্ট মিল আছে। তাঁর এ অভিমত প্রকাশ পেয়েছে একাধিক প্রসঙ্গেই। ইংরেজি ভাষার ধ্বনি ও ছন্দের সঙ্গে বাংলা ভাষার ধ্বনি ও ছন্দের সাদৃশ্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত প্রধানতঃ প্রকাশ পেয়েছে অধ্যাপক এণ্ডারসনকে লিখিত দুখানি বাংলা ও একখানি ইংরেজি পত্রে।

রবীন্দ্রনাথের মতে ইংরেজির সঙ্গে চলতি বাংলার প্রধান সাদৃশ্য ব্যঞ্জনসংঘাতের আধিক্যে। তাঁর মতে এই দুই ভাষার ধ্বনিগত প্রধান পার্থক্য এই যে, ইংরেজি ছন্দে পর্বের আদি ও অন্ত উভয়ত্রই ঝোঁক (অর্থাৎ প্রস্বর) পড়তে পারে, কিন্তু বাংলা পর্বের আরম্ভে ছাড়া আর কোথাও ঝোঁক পড়তে পারে না। সুতরাং চলতি বাংলার দলমাত্রিক রীতির ছন্দকে ইংরেজি Trochaic (আদিগুরু দ্বিদলপার্বিক) ছন্দের রূপ দেওয়া দুঃসাধ্য নয়। এই অভিমতেরই সমর্থন পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী'-শীর্ষক ইংরেজি রচনাটিতে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'পাখি আমার নীড়ের পাখি' -গানটির সঙ্গে ইংরেজি রচনাটির ভাবগত মিল আছে।[১] কিন্তু এই গানটির সঙ্গে 'কবিকাহিনী' কাবিতাটির ভাবগত সাদৃশ্যের চেয়ে অসাদৃশ্যই বেশি মনে হয়। গানটিতে আছে 'ভোরের আলোর কানাকানি'র কথা, আর কবিতাটিতে আছে সন্ধ্যার ছায়ার কথা। বরং 'কবিকাহিনী' রচনাটি অনিবার্যভাবেই স্মরণ করিয়ে দেয় কল্পনা কাব্যের 'দুঃসময়' কবিতাটির কথা। দুটিতেই আছে সন্ধ্যার অন্ধকারে তারকাখচিত আকাশ -পথে অক্লান্ত পাখির সমুদ্রপাড়ির কথা। তা ছাড়া, '*path of heaven*' কথাটাও বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয় যে, পাণ্ডুলিপিতে 'দুঃসময়' কবিতাটির নাম ছিল 'স্বর্গপথে'[২]। 'তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর' তো কবির নিজেরই প্রতি সম্বোধন। 'কবিকাহিনী' বা '*The Song Bird*' নামের ব্যঞ্জনাও তাই। কল্পনা কাব্যের 'বিদায়' কবিতার 'পাখি উড়ে যাবে সাগরের পার' ইত্যাদি লাইগুলিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

দ্বিতীয় পর্যায়

ইস্কুলের ছোটো ছেলে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো ছাত্র পর্যন্ত কাব্যশিক্ষার্থী সকলের পক্ষেই 'ছন্দ' একটি শিক্ষণীয় ও আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিমত। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে তিনি যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ছন্দের প্রকৃতি' ও 'গদ্যছন্দ' নামে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, তাতে এ কথা অংশতঃ সমর্থিত হয়। বিশ্বভারতীতেও তিনি বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীদের কাছে ছন্দ নিয়ে আলোচনা করতেন। ১৯২৩ সালে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের কাছে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা দেন তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় ১৩৩০ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'য়। কবির এক দিনের বক্তব্য শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেন কর্তৃক অনুলিখিত হয়ে ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'ছন্দ' নামে। পরবর্তী কালে এই ছন্দবিষয়ক ভাষণপ্রবন্ধটি 'বাংলাভাষা-পরিচয়' (১৯৩৮) গ্রন্থে একাদশ অধ্যায়ের অঙ্গীভূত হয়।

---

১ *Visva-Bharati Quarterly*, Centenary Number (1962), Vol. XXVI, Nos. 3 & 4, TAGOREANA, p. v.

২ দ্রষ্টব্য 'কল্পনা'—পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত প্রতিরূপ : রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সংস্করণ), সপ্তম খণ্ড, পৃ ১২২।

অতঃপর ১৯৩৩ সালে তিনি আবার বিশ্বভারতীর ছাত্রদের কাছে ছন্দ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। তার উল্লেখ আছে তৎকালীন 'বিশ্বভারতী নিউজ' পত্রিকায় (১৯৩৩ অগস্ট)। ১৯৪০ সালে আবার দেখি আশি বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও তিনি বিশ্বভারতীর বড়ো ছাত্রদের কাছে ছন্দতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন। ছন্দ-আলোচনার সূত্রপাত হয় মানসী কাব্য পড়ানো উপলক্ষে।[৩] অতঃপর তিনি কয়েক দিন রীতিমত ছন্দের ক্লাস নিতে থাকেন। এই ছন্দের ক্লাসে যাঁরা উপস্থিত থাকতেন তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন রবীন্দ্রসদনের বর্তমান পরিচালক শ্রীমোহনলাল বাজপেয়ী। তাঁর স্মৃতির সাক্ষ্য এক্ষেত্রে লিখিত দলিলের চেয়ে কম প্রামাণিক নয়। তিনি বলেন ওই ছন্দের ক্লাসে ক্ষিতিমোহন সেন -প্রমুখ আরও অনেকেই উপস্থিত থাকতেন।

অপর পক্ষে ছোটো ছাত্রদেরও ছন্দ শেখাবার প্রয়োজন তিনি বোধ করতেন। ফলে তাদের ছন্দ-শিক্ষা দেবার জন্য তাঁকে নানা রকম উপায় উদ্‌ভাবন করতে হত। সে-রকম একটি উপায়কে প্রমথনাথ বিশী মহাশয় নাম দিয়েছেন 'মিলের খেলা'।[৪] আর-একরকম উপায় হল ছোটোদের কাছে বিভিন্ন ধরণের 'ছন্দধাঁধা' উপস্থিত করে তার মীমাংসা করতে বলা। তাকে ছন্দ-ধাঁধা না বলে 'ছন্দের খেলা'ও বলা যেতে পারে।

সে প্রসঙ্গে আসার পূর্বে ছোটোদের ছন্দ শেখানো সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত অভিমত কি ছিল তা জানা দরকার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধের প্রথম খসড়াটির উপসংহারে তিনি লেখেন—

> ছন্দ সম্বন্ধে আমার যা বলবার আছে তা শেষ হল। মূলকথাগুলো বেশি নয়, তার সন্ধান জানলে শাখাপ্রশাখা চিনে নেওয়া সহজ হয়। আমি যখন ছোটো ছেলেদের পড়াতুম তখন কাব্য পড়াবার বেলায় সবপ্রথমে কাব্যের ছন্দোরূপ নিয়ে আলোচনা করতুম। জিজ্ঞাসা করতুম বিশেষ কাব্যের লাইনে ক'টা ভাগ, আর প্রত্যেক ভাগে ক'টা মাত্রা। এই যথেষ্ট। ভালো করে বুঝিয়ে দিলে ছোটো ছেলেদের পক্ষেও এ প্রশ্ন কঠিন নয়। কিছুদিন এটা চর্চা করলে ছন্দপতন হয় কী দোষে তা তারা বুঝতে পারবে।
>
> —১৯৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি. পৃ ১৬

ছন্দের প্রাথমিক নিয়মগুলি শিখিয়ে এবং ছন্দপতন হয় কী দোষে তা বুঝিয়েই যে তিনি নিরস্ত হতেন তা নয়। ছোটোদের তিনি ছন্দসংগঠন ও ছন্দ-সংশোধনের অভ্যাসও করাতেন। এ বিষয়ে প্রথমনাথ বিশী মহাশয়ের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য।—

> আর-একটা খেলা ছিল—তিনি কবিতার একটি ছত্র বলিতেন, তাহার সঙ্গে মিল দিয়া অর্থের সংগতি রাখিয়া দ্বিতীয় ছত্র আমাদের বলিতে হইত। —রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, অধ্যায় : 'রবীন্দ্র-সান্নিধ্য'

রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর ছেলেবেলায় এই খেলায় অভ্যস্ত হয়েছিলেন। সে কথার উল্লেখ আছে তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'কাব্যরচনাচর্চা' অধ্যায়ে।

আরও একরকম খেলা তিনি উদ্‌ভাবন করেছিলেন ছোটোদের ছন্দ শেখাবার জন্য। এই খেলার নানারকম প্রকারভেদ ছিল। তার মধ্যে দুটি প্রকারভেদই প্রধান। এক, পংক্তিশেষের মিল ও কথার

---

৩ দ্রষ্টব্য 'মানসী-কাব্যের ভূমিকা' : প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন। এই অনুলিখিত ভাষণপ্রবন্ধটিতে ছন্দ সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য কথা যথেষ্ট আছে।

৪ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, অধ্যায় : 'রবীন্দ্র-সান্নিধ্য'।

ক্রম ঠিক রেখে পর্বের মাত্রাপরিমাণে কমিবেশি করে দেওয়া, আর ছোটোদের কাজ পর্বের মাত্রাসমতা পুনঃস্থাপন করা। দুই, মোট মাত্রাপরিমাণ ও মিল ঠিক রেখে পর্ববিন্যাস ভেঙে দেওয়া অর্থাৎ পংক্তির পদ্যক্রম ভেঙে দিয়ে কথাগুলিকে অনেকটা গদ্যের মতো সাজিয়ে দেওয়া, আর ছোটোদের কাজ মিল ও মাত্রাসমতা বজায় রেখে পর্বগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করা অর্থাৎ প্রত্যেক লাইনের কথাগুলিকে আবার পদ্যের আকারে সাজানো। এই খেলায় ছোটোরা আনন্দ পেত, ছন্দ শিখত, আর পদ্যরচনায় উৎসাহিত হত।

এসব খেলার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনেক দৃষ্টান্ত রচনা করতে হত। দৃষ্টান্ত রচিত হত প্রধানতঃ মুখে মুখে। সেগুলির সব না হক অধিকাংশই আজ বিস্মৃত। সুখের বিষয় এ-রকম অনেকগুলি দৃষ্টান্তের প্রতিলিপি রক্ষিত আছে রবীন্দ্রসদনে। প্রতিলিপিগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কোনো ছোটো ছেলেকে ছন্দ শেখাবার জন্য এগুলি কিস্তিতে কিস্তিতে লিখে ডাকযোগে অন্যত্র পাঠিয়েছিলেন। অন্যদেরও ছন্দ শেখাবার কাজে লাগতে পারে, সম্ভবতঃ এই বোধেই এগুলির প্রতিলিপি রাখা হয়। এই প্রতিলিপির দৃষ্টান্তগুলিই মুদ্রিত হল ছন্দ-ধাঁধা দ্বিতীয় পর্যায়-রূপে।

এগুলি কোন্ সময়ে কার উদ্দেশ্যে রচিত তা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নি। তবে এবিষয়ে কিছু পরোক্ষ প্রমাণের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। এই দৃষ্টান্তগুলির চারটি পাওয়া যায় 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায় (১৩৩৮ মাঘ) ও 'ছন্দের মাত্রা' প্রথম পর্যায়ে (১৩৩৯ কার্তিক)। আর দশটি কবিতা পাওয়া যায় স্ফুলিঙ্গ কাব্যে। সেগুলি নির্দিষ্ট হল তারকাচিহ্নের দ্বারা। দৃষ্টান্তগুলির পাশে ওই কাব্যের (১৩৬৭ সংস্করণ) রচনার সংখ্যাও দেওয়া গেল। স্ফুলিঙ্গ কাব্যে প্রাপ্ত এই দশটি রচনা কার কাছ থেকে বা কোন্ উৎস থেকে সংগৃহীত তা জানা গেলে এগুলির রচনাকাল ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য জানা যেতে পারে।

এস্থলে স্ফুলিঙ্গ কাব্যের তিনটি রচনার পাঠ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ছন্দ-ধাঁধা দ্বিতীয় পর্যায়ে খ-বিভাগের তৃতীয় দৃষ্টান্তের প্রথম লাইনের কবি-অভিপ্রেত পাঠ যে 'মাটিতে যে দুর্ভাগার ভেঙেছে বাসা', তাতে সন্দেহ করা চলে না। অথচ স্ফুলিঙ্গ কাব্যে আছে 'মাটিতে দুর্ভাগার ভেঙেছে বাসা'। এই পাঠ যে নির্ভুল নয় তা বলাই বাহুল্য। এই লাইন-দুটিকে নির্ভুল করা যেতে পারে দুই ভাবে।—

মাটিতে দুর্ভাগার ভেঙেছে বাসা,
আকাশে উচ্চ করি গাঁথে সে আশা।

অথবা

মাটিতে যে দুর্ভাগার ভেঙেছে বাসা,
আকাশে সমুচ্চ করি গাঁথিছে আশা।

বলা বাহুল্য, এ দুটি দুই রীতিতে রচিত। প্রথমটি রচিত সরল কলামাত্রিক অর্থাৎ কলাগোনা মাত্রাবৃত্ত রীতিতে, আর দ্বিতীয়টি রচিত বিশিষ্ট কলামাত্রিক বা অক্ষরগোনা সাধু রীতিতে। স্ফুলিঙ্গে এই রচনাটির দুই পংক্তি দুই রীতিতে রচিত। এ-রকম রচনা যে কবির অভিপ্রেত হতে পারে না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

উক্ত খ-বিভাগে তৃতীয় দৃষ্টান্তটির যে আদর্শ দেওয়া আছে সেটিও আছে স্ফুলিঙ্গ কাব্যে। কিন্তু ওই কাব্যের পাঠে ছন্দোদোষ ঘটেছে। কারণ 'ভয়ে দেয় উঁকি' পাঠে এক মাত্রা বেশি। অথচ ছন্দ-ধাঁধার আদর্শপাঠে মাত্রাসমতা অক্ষুণ্ণ আছে।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, এই রচনা-দুটির একটিতে ঘটানো হয়েছে মাত্রাহানি, আর-একটিতে ঘটানো হয়েছে মাত্রাবৃদ্ধি। দুটিতে আছে দু-রকম দোষ।

খ-বিভাগের চতুর্থ দৃষ্টান্তটিতে ঘটানো হয়েছে আর-এক রকম ত্রুটি। তাকে বলা যায় ক্রমব্যত্যয় দোষ। মাত্রাবিন্যাসের যে ক্রম শ্রুতিসিদ্ধ, তার বিপর্যয়ে যে ছন্দোভঙ্গ ঘটে তাকেই বলতে পারি ক্রমব্যত্যয় দোষ। মাত্রাবিন্যাসের দুই-তিন-তিন বা তিন-দুই-তিন ক্রমে ছন্দশ্রুতি পীড়িত হয়। স্ফুলিঙ্গ কাব্যের ১০-সংখ্যক রচনাটিতে এই উভয়প্রকার ক্রমব্যত্যয় দোষই ঘটেছে। ছন্দ-ধাঁধায় এই রচনাটির যে আদর্শ দেওয়া আছে, তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় ছোটোদের দিয়ে আদর্শের অনুসরণে এই দু-রকম ক্রমব্যত্যয় দোষ সংশোধন করানোই ছিল কবির অভিপ্রায়।

মজার বিষয় এই যে, এক্ষেত্রে ছন্দের এই বিশেষ দোষটাই বুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের কাছে একটি অভিনব গুণ বলে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর মতে 'অপরাজিতা ফুটিল' ইত্যাদি রচনাটি রবীন্দ্রসাহিত্যে দুর্লভ 'মিশ্র ছন্দের' দৃষ্টান্ত।[৫] তিনি মনে করেন, "দুটি স্বতন্ত্র ছন্দ যে এখানে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই"। তাঁর মতে এই রচনাটির মধ্যে ছয়মাত্রাপর্বের মাত্রাবৃত্ত রীতি ও অক্ষরগোনা পয়ারপদ্ধতির মিশ্রণ ঘটেছে। অর্থাৎ, তিনি এই রচনাটিকে বিশ্লেষণ করেন এভাবে—

অপ -রাজিতা ফুটিল |
লতিকার গর্ব নাহি ধরে—
যেন পেয়েছে লিপিকা |
আকাশের আপন অক্ষরে।

বলা বাহুল্য, ছন্দোরীতির এই মিশ্রণ বা সমবায় রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না। ছন্দ-ধাঁধায় এই রচনাটির যে আদর্শরূপ দেওয়া আছে, তার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপমাত্রই তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। 'অপরাজিতা' শব্দের দুই-তিন মাত্রায় বিভাজনটাও একান্তভাবেই বাংলার উচ্চারণরীতিবিরুদ্ধ। বাঙালির উচ্চারণে এই শব্দটা স্বভাবতঃই বিভক্ত হয় তিন-দুই মাত্রায়, 'অপরা-জিতা' রূপে।

এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে ছন্দ-ধাঁধা হিসাবে যে-সব দৃষ্টান্ত রচনা করেছিলেন ছোটোদের দিয়ে সংশোধন করাবার অভিপ্রায়ে, পরবর্তী কালে তারই কিছু কিছু নানা সূত্র থেকে প্রকাশিত হয়েছে কবিতাকণিকা রূপে। যে-তিনটি রচনা নিয়ে এখানে আলোচনা করা গেল সেগুলি হয়তো তারই নিদর্শন। এই দৃষ্টান্ত-তিনটি থেকে আরও বোঝা যায় যে, একই রচনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে বিন্যস্ত হয়ে নূতন নূতন ধাঁধার রূপ নিয়েছে। তা ছাড়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদর্শ রচনাটিকেও একটু আধটু বদল করে ধাঁধার রূপ দেওয়া হত বলে মনে হয়।

সব দিক ভেবে মনে হয়, ছন্দ-ধাঁধা দ্বিতীয় পর্যায়ের সব না হক কিছু কিছু দৃষ্টান্ত রচিত হয়েছিল 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধ প্রকাশের, অর্থাৎ ১৩৩৮ সালের, কাছাকাছি সময়ে। যে দশটি দৃষ্টান্ত স্ফুলিঙ্গ কাব্যে স্থান

৫ দ্রষ্টব্য 'কবিতা' ১৩৫২ পৌষ, পৃ ১২৬ এবং ১৩৫২ চৈত্র, পৃ ১৮৫ ; 'সাহিত্যচর্চা' (প্রথম সংস্করণ ১৩৬১), পৃ ১৩২-৩৩।
এই কবিতাটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয় জানি না। সম্ভবতঃ 'কৃষক' পত্রিকায় ১৩৫২ বৈশাখ ২৫ সংখ্যা।

পেয়েছে সেগুলির উৎসস্থল ও মূলরূপের সন্ধান পাওয়া গেলে এ বিষয়ে স্থিরতর সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পথ কিছুপরিমাণে উন্মুক্ত হতে পারে।

এ সম্পর্কে আর-একটি নূতন সূত্রের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের অল্পকাল পরেই জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া একটি ইস্কুল-পত্রিকায় 'রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-ধাঁধা' নামে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে উদ্‌ধৃত হল।—

আমার একটি বিশিষ্ট বন্ধু ও আত্মীয়কে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] শিশু ও কিশোর মনকে আদর্শ ছন্দানুগ করবার জন্য বা সে বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলবার জন্য কি করা যেতে পারে তার একটা পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। আমার একটি কিশোর আত্মীয়ের সশ্রদ্ধ ও সযত্ন-রক্ষিত তহবিল থেকে তার দু-তিনটি চুরি করে আমি আজ তোমাদের উপহার দিচ্ছি। চুরি স্বীকার করছি—অতএব তোমরা এবং আমার ঐ ছোট আত্মীয়টি উভয়েই আমাকে ক্ষমা করবে এবং চুরির দোষও আমাকে স্পর্শাবে না বুঝতে পারছি।

অনেক দিনের কথা। তখন তাঁর ভক্ত ও শিষ্য-দলের কতকগুলি একত্র হয়ে কলকাতায় ১০ নং কর্নওয়ালিন স্ট্রিটে আমরা বিশ্বভারতী-সম্মিলনী করতাম। কবিগুরু কলকাতায় এলে সেখানে আমাদের কবিতা ও গান শোনাতেন এবং শুনতেন। গান শেখাতেনও। তোমাদের মত যারা, তাদের মনকে ছন্দানুগ করবার জন্য তখনই এই পদ্ধতিটা দিয়েছিলেন। তোমরা সংশোধন করে আমাদের কাছে তোমাদের মিলগুলি পাঠালে পর তোমাদের ছন্দবোধের নিরিখ আমরা ঠিক করতে পারি। তাঁর দেওয়া এই ছন্দগুলিকে তোমাদের আদর্শ ছন্দে পরিণত করতে হবে।

১ জলে নয়ন ভাসিয়া যায়
পলে পলে ফিরিয়া তাকায়।

২ দেবালয়ে সাঁঝবেলা
সে ভয়ে ভয়ে চলিছে।

৩ কুসুম ফুটেছে নিশীথে শেফালি-বনে
গন্ধে কখন ভরিল বাতাসেরি ঘুম।

৪ উন্মত্ত প্লাবনে ছুটিয়া চলে তটিনী
ঝরে অজস্র বর্ষণ অশ্রান্ত শ্রাবণে॥

রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত টীকাতে আছে— "মিল বাঁচিয়ে সংশোধন করা চাই।"

—কুমার আশুতোষ ইন্‌স্টিটিউশান ম্যাগাজিন,
রবীন্দ্রস্মৃতিসংখ্যা, ১৯৪১ সেপ্টেম্বরের, পৃ ১২।

এই প্রবন্ধে উদ্‌ধৃত চারটি দৃষ্টান্তের প্রথম দুটি নেওয়া হয়েছে ছন্দধাঁধার (দ্বিতীয় পর্যায়) ঙ-বিভাগের গোড়ার দিক থেকে আর শেষ দুটি নেওয়া হয়েছে ঘ-বিভাগের গোড়ার দিক থেকে। তাতে স্বভাবতঃই মনে হয়, এই ধাঁধাগুলির মূল তালিকা রয়েছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর অজ্ঞাতনামা 'কিশোর আত্মীয়'টির সশ্রদ্ধ ও সযত্ন-রক্ষিত তহবিলে। এই তালিকা কবির নিজের হাতে লেখা কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু তালিকার আনুষঙ্গিক টীকাটুকু রবীন্দ্রনাথের 'স্বহস্তলিখিত'। সুতরাং এই তালিকাটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। যা হক, এই তালিকাটি পাওয়া গেলে এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য জানা

যেতে পারে। তা ছাড়া, জ্যোতির্ময়ী দেবীর উল্লিখিত 'বিশিষ্ট বন্ধু ও আত্মীয়'র কাছেও এই ছন্দ-ধাঁধা-রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে সন্ধান করা যেতে পারে।

ছন্দধাঁধা-প্রসঙ্গের গোড়াতেই দেখেছি শুধু ছন্দোনীতি নয়, 'ছন্দপতন হয় কী দোষে' তাও যাতে খেলাচ্ছলে আনন্দের মধ্য দিয়েই ছোটোদের আয়ত্ত হয়, তাই ছিল রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই ছন্দ-ধাঁধাগুলি পরিকল্পিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই ধাঁধাগুলির দ্বারা উক্ত দ্বিবিধ উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হতে পারে অতি সুষ্ঠুভাবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন -সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিতব্য 'ছন্দ' গ্রন্থের 'পাঠপরিচয়' বিভাগের একটি অংশ।

প্রকাশবাদ ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাসা

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

"যাকে সৃষ্টি বলি তার নিঃসংশয় প্রকাশই তার অস্তিত্বের চরম কৈফিয়ৎ"

—রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যতত্ত্ব', সাহিত্যের পথে

সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ 'প্রকাশ' কথাটার উপর প্রচুর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "সৃষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ।"— 'সাহিত্য-বিচার', সাহিত্যের পথে। এই প্রকাশ কথাটিকে ঘিরে বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-একটি বিশেষ তত্ত্বকে গড়ে তুলেছেন— যাকে বলা যেতে পারে প্রকাশতত্ত্ব— সেই তত্ত্বটিকে রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনের একটি প্রধান স্তম্ভ বলে বর্ণনা করা যায়।

প্রকাশবাদ বা এক্‌স্‌প্রেশনিজ্‌ম ইউরোপীয় শিল্পদর্শনের একটি সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত মতবাদ। সেখানেও আমরা একটি প্রকাশতত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই। সেই মত অনুসারে— আর্ট প্রকৃতির 'অনুকরণ' নয়; জগৎ বা জীবনের কোনো 'সত্যের' রূপায়ণ নয়। আর্ট হল সৃষ্টি; আর সৃষ্টি মানেই হল প্রকাশ। প্রকাশেই আর্টের বিশিষ্টতম পরিচয়; প্রকাশেই তার চরম সার্থকতা। প্রকাশের মাপকাঠি দিয়েই তার ভালোমন্দের শেষ বিচার।

রবীন্দ্রনাথও মনে করেন, আর্ট মানেই সৃষ্টি এবং সৃষ্টি মানেই প্রকাশ। তিনি বলেন "...সাহিত্য ও ললিতকলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ।"— 'তথ্য ও সত্য', সাহিত্যের পথে। সহজেই মনে হতে পারে, অন্তত এই ব্যাপারটার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য প্রকাশবাদীদের সাহিত্যতত্ত্বের সমগোত্রীয়।

রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্য অর্থে প্রকাশবাদী বলে অভিহিত করা সমীচীন কি না সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। 'অনুকরণ' জিনিসটাকে সরাসরি অস্বীকার করলেও, আর্টে জগৎ ও জীবনকে রূপায়িত করার কথা, জীবনের সত্যকে ফুটিয়ে তোলার কথা রবীন্দ্রনাথ বেশ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠেই ঘোষণা করেছেন। জীবনের মহা-শিল্পই যে শিল্পীর সামনে তাঁর শিল্পসৃষ্টির চরম আদর্শ এমন কথা বলতে রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র দ্বিধা নেই। পাশ্চাত্য প্রকাশবাদীরা কিন্তু বহুকাল পূর্বেই এসব কথা বলা ছেড়ে দিয়েছেন। শিল্পীর দিব্য প্রতিভা এবং সেই প্রতিভার আত্মপ্রকাশের রহস্যের দিকেই তাঁদের দৃষ্টি একান্তভাবে নিবদ্ধ। এইখানেই খট্‌কা লাগে। সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ কি সত্যিই পাশ্চাত্য প্রকাশবাদীদের সমধর্মী?

'প্রকাশ' কথাটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী অর্থে ব্যবহার করেছেন, তাঁর মতে সাহিত্য সত্যি সত্যি কী প্রকাশ করে, এই প্রশ্নের মীমাংসাই আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়।

২

সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য শিল্পচিন্তায় যে বিশেষ মতবাদটি অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করে আসছিল, এক কথায় তার নাম দেওয়া হয়েছে অনুকরণবাদ। নামটি সন্তোষজনক কি না সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে, কেননা অনুকরণ কথাটার অর্থ নিয়েই গোলমাল আছে।

নামের কথা যাক, মতবাদটির আসল জোর কিন্তু নিছক অনুকরণের উপরেই নয়। মতবাদটির আসল জোর সত্যের উপর— সত্যের আদর্শের উপর। প্রাচীন অনুকরণবাদে হয়তো অনুকরণের উপরেই বেশি জোর ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তা নয়। প্লেটোর অনুকরণবাদে মিথ্যার কারবারী বলে আর্ট তিরস্কৃত বটে, কিন্তু অ্যারিস্টট্‌ল এবং তাঁর অনুবর্তীদের অনুকরণবাদে— প্রকৃতপক্ষে প্লেটো-পরবর্তী সমগ্র অনুকরণবাদে সত্যের কারবারী হিসাবেই আর্টের বিশেষ সম্মান। এ শিল্পতত্ত্বের মর্মকথাটি হল এই যে, আর্ট নিজের বাইরে অপর একটি সত্তার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে। সেই সত্তা— তাকে জীবনই বলি আর প্রকৃতিই বলি— তারই আদর্শের দ্বারা আর্ট নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ আর্টের সামনে আর্টের বাইরের একটা স্বতন্ত্র আদর্শ আছে, সে আদর্শ হল জগৎ ও জীবন। আর্ট যে-জগৎকে সৃষ্টি করে তা কোনো-না-কোনো অর্থে বাস্তব জগতেরই প্রতিচ্ছবি। আর্টের কাজ জগৎ-সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করা— সে সত্য যা-ই হোক না কেন। সত্যের প্রতিফলনের গুণেই, সত্যের আবিষ্কারের গুণেই আর্টের মহত্ত্ব।

একেবারে গোড়ার দিকটাতে যাই হোক না কেন, সুগঠিত মতবাদ হিসাবে প্রকাশবাদের আবির্ভাবকে অনায়াসে অনুকরণবাদের প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিবাদ বলে গণ্য করা চলে। প্রকাশবাদের মর্মকথা হল এই যে, সৃষ্টি জিনিসটা নিজের বহিঃস্থিত কোনো সত্তার প্রতিফলন নয়, কোনো সত্যের আবিষ্কার নয়! সৃষ্টি হল মুক্ত কল্পনার বাধাহীন লীলা, কারও কাছে তার জবাবদিহি নেই। আর্ট জগৎ-সত্যকে কতখানি প্রকাশ করে, বা আদৌ করে কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। আর্ট প্রকাশ করে স্রষ্টার প্রতিভাকে, স্রষ্টার আবেগ ও অনুভূতিকে, স্রষ্টার নিগূঢ় আত্ম-রহস্যকে। নিজের বাইরের অপর কোনো সত্তার দিকে সে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে না; স্রষ্টার কল্পনাশক্তির বাইরের কোনো সত্তার আদর্শের দ্বারা সে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে না। স্রষ্টার অনুভূতিপ্রকাশের মানদণ্ড দিয়ে, স্রষ্টার আত্মপ্রকাশের মানদণ্ড দিয়ে, আর্টের উৎকর্ষ-অনুৎকর্ষের শেষ বিচার; জগৎ-সত্যের মানদণ্ড দিয়ে নয়।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনে এমন অনেক উক্তি মিলবে যা এই মতবাদকে সমর্থন করে বলে মনে হতে পারে। পুরোপুরি না হোক, অন্তত আংশিকভাবে তো নিশ্চয়ই। সে-সব উক্তি এতই সর্বজনপরিচিত যে এখানে তার বিস্তৃত উদ্ধৃতি বাহুল্য মাত্র। আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, এইটেই কি রবীন্দ্র-শিল্পদর্শনের শেষ কথা? এর সম্পূর্ণ বিপরীত কোটির কথাই কি রবীন্দ্রনাথের রচনায় খুব সুদুর্লভ? এইখানেই সমস্যা।

জগৎ-সত্যের আদর্শের কথা— জীবনের স্বহস্তরচিত শিল্পকে অনুগমন করার কথা, তাও রবীন্দ্রনাথ বেশ উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করেছেন। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, এই দুই আদর্শের মধ্যে কোন্‌টি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শিল্পদর্শনের সঙ্গে গভীরতরভাবে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারছে। প্রশ্ন ওঠে, প্রচলিত প্রকাশবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমধর্মিতা কতখানি গভীর। প্রকাশ কথাটাকে প্রকাশবাদীরা যে অর্থে ব্যবহার করে থাকেন, রবীন্দ্রনাথও কি ঠিক সেই অর্থেই ব্যবহার করেছেন? এইটেই এখানে আমাদের প্রধান বিবেচ্য।

একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার। প্রকাশবাদ আর রোমান্টিক শিল্পদর্শন হুবহু এক বস্তু নয়, এবং প্রকাশবাদের আধুনিক পৃষ্ঠপোষকদের অনেকেই রোমান্টিসিস্ট নন। কিন্তু এমন রোমান্টিসিস্ট খুঁজে পাওয়া বোধকরি কঠিন হবে যিনি কোনো-না-কোনো অর্থে প্রকাশবাদের সমর্থক নন। আমাদের বর্তমান আলোচনা রোমান্টিক-প্রকাশবাদীদের মতবাদের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কাজের সুবিধার জন্য অ-রোমান্টিক প্রকাশবাদীদের মতামতকে আমরা আমাদের বিষয়-পরিধির বহির্ভূত বলে গণ্য করব।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, পাশ্চাত্য প্রকাশবাদের প্রথম পদক্ষেপ রোমান্টিক আন্দোলনের হাত ধরেই। রেনেসাঁস-পরবর্তী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে এর যোগাযোগ মোটেই দুর্লক্ষ্য নয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, গ্যেটে শিলার শপেনহাওয়ার— এঁদের কাছ থেকেই এ মতের ভাব-বীজ রোমান্টিক আন্দোলনে প্রবেশ করে। কালক্রমে হেগেলীয়ানদের সূত্রে এ মত নানা দিকে প্রসারিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত নানান্ রকমের রূপ পরিগ্রহ করেছে। সেই-সব রূপের অনেকগুলির সঙ্গেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই।

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, খাঁটি রোমান্টিক-প্রকাশবাদীরা স্রষ্টার ব্যক্তিগত অনুভূতি- প্রকাশ বা স্রষ্টার বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তার প্রকাশের কথা যেমন যদি-কিন্তু-হীন ঋজুতার সঙ্গে ঘোষণা করেন, অ-রোমান্টিক কোনো প্রকাশবাদীর মুখে স্রষ্টার ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশের কথাটা কখনোই তেমন স্পষ্ট-উচ্চারিত নয়। রোমান্টিক-প্রকাশবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমধর্মিতার একাধিক সূত্র অনেকেরই নজরে পড়তে পারে। তিনি নিজে রোমান্টিক কবি। তাঁর শিল্পদর্শনে রোমান্টিকতার প্রভাবপাতের কথা বহুজনকথিত। সমধর্মিতার সূত্র রয়েছে বলেই পার্থক্যের প্রশ্নটা আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অ-রোমান্টিক প্রকাশবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিলের সূত্রটা এতই ক্ষীণ যে বর্তমান আলোচনায় তাঁদের প্রসঙ্গ অনায়াসে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

আর্ট কী প্রকাশ করে? রোমান্টিক-প্রকাশবাদীদের উত্তর হল— এক, আর্ট স্রষ্টার অনুভূতিকে, স্রষ্টার হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করে; দুই, আর্ট স্রষ্টার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। উত্তর দুটি আসলে খুব আলাদা নয়। কেননা, অনুভূতিপ্রকাশের মধ্যে দিয়েও ব্যক্তিত্বই প্রকাশিত হয়, আবার ব্যক্তিত্বপ্রকাশের মধ্যেও অনুভূতিপ্রকাশ অনুস্যূত— বিশেষত যদি ধরে নেওয়া যায় যে স্রষ্টৃত্বের মুখ্যতম উপাদানই হল অনুভূতি।

সে যাই হোক, আপাতত আমাদের সামনে বিবেচ্য বিষয় হল তিনটি। এক, প্রকাশ কথাটার সঠিক তাৎপর্য কী; দুই, অনুভূতিপ্রকাশ বলতে ঠিক কী বোঝায়, এবং এ বিষয়ে প্রচলিত মত বা রোমান্টিক মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের কতটুকু মিল; আর তৃতীয় হল আত্মপ্রকাশ কথাটা। এ কথাটার রোমান্টিক ব্যাখ্যাই বা কী, আর রবীন্দ্রনাথই বা এ কথাটাকে কী অর্থে গ্রহণ করেছেন।

প্রথমেই একটা কথা বলে রাখা দরকার। প্রকাশ কথাটার সঠিক অর্থ বা সঠিক তাৎপর্য যা-ই হোক না কেন, আর্টের ক্ষেত্রেই কথাটার সম্পূর্ণ দুই ধরণের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এক, প্রক্রিয়া হিসাবে; আর দ্বিতীয় হল— প্রক্রিয়াবিশেষের ফল বা পরিণতি হিসাবে। প্রকাশক্রিয়া সে-ও প্রকাশ; আবার প্রকাশিত বস্তু তাকেও বলি প্রকাশ। যেমন আর্ট কথাটা। সৃজনক্রিয়া বা ক্রিয়েটিভ প্রসেস সে-ও আর্ট; আবার শিল্পবস্তু (work of art, যাকে বলা হয় art-product বা artifact, যেমন মূর্তি, চিত্র, কবিতা, নাটক)— সে-ও আর্ট। এ রকম বলাতে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে কোনো দোষ নেই। দোষ শুধু দুটি ব্যাপারকে মিশিয়ে ফেলাতে। দোষ এই কথা ভুলে যাওয়াতে যে, প্রক্রিয়া আর ফল এক নয়, সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রকাশবাদীরা যখন আর্টকে প্রকাশ বলেন, তখন কথাটা তাঁরা কোন্ দিক থেকে বলেন? এক সঙ্গে দুদিক থেকেই। তাঁদের মতে সৃজনক্রিয়া ও প্রকাশক্রিয়া অভিন্ন, এবং প্রকাশক্রিয়ার মধ্যেই শিল্পবস্তুর শিল্পত্বেরও চাবিকাঠি। অর্থাৎ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া ও ফল তাঁদের কাছে বিশেষ আলাদা নয়।

এইখানেই মুশকিল। ক্রিয়েটিভ প্রসেস্‌টা একটা ঘটনা বা ঘটনা-পরম্পরা। সেই ঘটনার খানিকটা সংঘটিত হচ্ছে শিল্পীর মনোরাজ্যে, খানিকটা সংঘটিত হচ্ছে বহির্জগতে শক্তি-চলাচলের মধ্যে, আর বাকিটা ঘটছে উপকরণ-রাজ্যে। ক্রিয়েটিভ প্রসেস্‌ একটা স্থানকালসাপেক্ষ ব্যাপার, পাত্রসাপেক্ষ ব্যাপার। তা জাগতিক ঘটনা-পরম্পরার সঙ্গে কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত। তা চঞ্চল এবং ক্ষণস্থায়ী। শিল্পবস্তু কিন্তু মোটেই এ রকম নয়, তার শিল্পত্ব সব রকমেই এর বিপরীতধর্মী। মানতেই হবে যে, সৃজনক্রিয়া ও শিল্পবস্তু হুবহু এক নয়, সম্পর্ক তাদের যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন।

এ কথা মানলে এ-ও মানতে হবে যে, শিল্পবস্তুর পরিচয় স্বয়ং শিল্পবস্তুই, শিল্পবিচার শিল্পবস্তুরই বিচার। কবির কাজ যা-ই হোক না কেন, পাঠকের লক্ষ্য কবিতা। পাঠকের আস্বাদ্য বিষয় কবির জীবনলগ্ন কোনো ঘটনা বা ঘটনা-পরম্পরা নয়, কোনো চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী জাগতিক ক্রিয়া নয়, অর্থাৎ সৃজনক্রিয়া নয়, পাঠকের আস্বাদ্য বিষয় কবিতা। সমালোচকের বিচার্য বিষয়ও তাই।

একটা কথা মনে রাখতে হবে— সৃজনক্রিয়া সম্পর্কে যে কথা প্রযোজ্য, শিল্পবস্তু সম্পর্কে সে কথা প্রযোজ্য না-ও হতে পারে। ঠিক যেমন শিল্পবস্তু সম্পর্কে যে কথা খাটে, সৃজনক্রিয়া সম্পর্কে সে কথা সম্পূর্ণ অবান্তরও হতে পারে। শুক্তির ব্যাধি সম্পর্কে যে কথা প্রযোজ্য, মুক্তার মূল্য-নিরূপণের ক্ষেত্রে সে কথা অবান্তর। আবার, মুক্তার রূপগুণের প্রসঙ্গে যে প্রশংসা সম্পূর্ণ সংগত, শুক্তির যন্ত্রণার ক্ষেত্রে সেই-সব প্রশংসা-বাক্যই নির্ভেজাল নিষ্ঠুরতা। অথচ শুক্তির যন্ত্রণাতেই নাকি মুক্তার জন্ম।

সৃজনের ঘটনাটি স্রষ্টার নিজের বোধের কাছে কী রকম ঠেকছে না ঠেকছে সে একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোনো শিল্পীর কাছে যদি সত্যিই এমন প্রতিভাত হয় যে সৃজনক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁর আত্মপ্রকাশও ঘটছে, তাতে কারো কিছু বলবার নেই। এই ব্যক্তিগত উপলব্ধির সাক্ষ্যকে অপর কেউ খণ্ডন বা সমর্থন কিছুই করতে পারেন না। ঠিক তেমনি, এই ব্যক্তিগত ধারণাকে সাধারণ সত্য হিসাবে গ্রহণ করারও কারো বাধ্যবাধকতা নেই।

তবু, তর্কস্থলে যদি তাকে সাধারণ সত্য বলে মেনেও নেওয়া যায়, শিল্পবস্তুর শিল্পত্বকে— তার উৎকর্ষ-অনুৎকর্ষকে— তা স্পর্শ করে না। সৃজনক্রিয়ার সম্পর্কে যা-ই বলা হোক না কেন, ভোক্তাসাধারণের কাছে তা প্রমাণ-অপ্রমাণের বাইরের ব্যাপার। শিল্পবস্তুর শিল্প-সার্থকতার প্রশ্নে সে প্রসঙ্গের উত্থাপন অবৈধ। অর্থাৎ কিনা, যদি মেনেও নিই যে সৃজনক্রিয়া সত্যি সত্যিই স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ, তার দরুণ শিল্পবস্তুকেও যে স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ বলে মানতে হবে, এমন কোনো ব্যধ্যবাধকতা জন্মায় না।

রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো দিক থেকে সৃজনকে স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ-প্রক্রিয়া বলেই বর্ণনা করেছেন। এখানে রোমান্টিক সাহিত্যশাস্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর মিল সহজেই নজরে পড়বে, যদিও সে মিল কতটা গভীর সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। পরে যথাকালে সে প্রশ্নের মীমাংসায় আমাদের প্রবৃত্তও হতে হবে। এ মিল অবশ্য কেবল রোমান্টিকদের সঙ্গেই নয়, কেননা রোমান্টিকতার পরিধির বাইরেও এ রকম উক্তি প্রচুর শুনতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এ তো গেল প্রকাশ-প্রক্রিয়া এবং সৃজন-প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ। রোমান্টিক প্রকাশবাদীরা কিন্তু এইখানে থামেন না। তাঁরা শিল্পবস্তুকেও স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ বলে দাবি করেন। তাঁদের মতে আর্টের স্বরূপ-নির্ণয় সংজ্ঞা-নিরূপণ সবই ওই আত্মপ্রকাশ দিয়ে। তাঁরা বলেন, স্রষ্টার আত্মপ্রকাশের তারতম্যই হল শিল্পবস্তুর

ভালোমন্দ বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। রবীন্দ্রনাথ তা বলেন না। এই পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু আত্মপ্রকাশ দিয়ে শিল্পবস্তুর স্বরূপ-নির্ণয় করেন নি, সংজ্ঞা-নির্ধারণ করেন নি। আত্মপ্রকাশের মাপকাঠি দিয়ে শিল্পবস্তুর মূল্যবিচারের কথা তিনি বলেন নি। স্রষ্টা হিসাবে তাঁর নিজের কাছে আর্টের অন্তরঙ্গ পরিচয় এবং পরম মূল্য দুইই হয়তো আপন আত্মপ্রকাশের সার্থকতায়। কিন্তু এও তিনি জানেন যে, এ দৃষ্টি একান্তভাবেই স্রষ্টার স্বগত দৃষ্টি। শিল্পবস্তুকে যে ভোক্তার দৃষ্টিতেও দেখা যায়—এবং সেই দেখাই যে 'পাবলিক' দেখা, অর্থাৎ তত্ত্বগতভাবে দেখা, এ কথা তিনি কখনো ভোলেন নি। মূল্যায়ন ব্যাপারটা যে আসলে ভোক্তা-ভূমিকারই ব্যাপার, এ কথাও তিনি সব সময় স্মরণ রেখেছেন।

এইখানেই পাশ্চাত্য প্রকাশবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা প্রধান অমিল।

৪

রোমান্টিক প্রকাশবাদীদের মতবাদে প্রকাশ সম্পর্কে, অথবা বলা যেতে পারে স্রষ্টার অনুভূতিপ্রকাশ ও আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে ডবল দাবি। সৃজনক্রিয়াও স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ, শিল্পবস্তুও তাই।—মূর্তি চিত্র কবিতা নাটক, তা রচয়িতারই অনুভূতির প্রকাশ, রচয়িতারই নিগূঢ় নিজত্বের অভিব্যক্তি, এবং সেই হিসাবেই তার মূল্য। পূর্বেই বলেছি, প্রথম দাবিটা খণ্ডন-সমর্থনের বাইরে। প্রশ্ন হল দ্বিতীয় দাবিটাকে নিয়ে। স্রষ্টার অনুভূতিপ্রকাশেই কি শিল্পবস্তুর শিল্পত্বের মাপকাঠি?

এ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে প্রকাশ কথাটিকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। বিশেষত ইংরেজি এক্‌স্‌প্রেশন কথাটিকে, প্রকাশ শব্দটিকে যার অনুবাদ বলে আমরা সাধারণত মনে করে থাকি। পাশ্চাত্য এক্‌স্‌প্রেশনিস্টরা প্রকাশ বা এক্‌স্‌প্রেশন কথাটির দ্বারা ঠিক কী জিনিস বোঝাতে চান?

এক্‌স্‌প্রেশন কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল টিপে বা চেপে বার করা (ex premo, press out)। যেমন করে রস বার করে, টিউব থেকে পেস্ট বার করে। এ থেকে অর্জিত অর্থ হল, আন্তর-ব্যাপারকে বাইরে নিয়ে আসা, আন্তর-সত্যকে বাইরে রূপ দেওয়া। ব্যঞ্জনা থেকে বাড়তি অর্থ পাওয়া গেল—একটা-কিছুকে অপর-কিছু দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া। ক্রমে—চিহ্ন, প্রতিনিধি, প্রতীক ইত্যাদি। দেশি প্রকাশ কথাটার মূল মানে হল বিশেষভাবে দীপ্তি পাওয়া।

কালক্রমে দেশি প্রকাশ এবং ইংরেজি এক্‌স্‌প্রেশন দুয়েতেই অনেক নতুন অর্থের সংযোজনা ঘটেছে এবং দেশি প্রকাশ অনেকখানি পরিমাণে ইংরেজি এক্‌স্‌প্রেশনের প্রতিশব্দ বলে গণ্য হয়েছে। বর্তমানে এদের ব্যবহার বহু-বিচিত্র। সূর্যের আলোতে বস্তুর প্রকাশ, ছিন্নমেঘে সূর্যের প্রকাশ, আবার—সূর্য নিজে নিজেই নিজের প্রকাশ। সাহিত্যের এক-একটা এক্‌স্‌প্রেশন বলিষ্ঠ, এক-একটা এক্‌স্‌প্রেশন দুর্বল; কোনোটা সুন্দর, কোনোটা কুৎসিত। অন্য দিকে, গণিতের বা লজিকের এক্‌স্‌প্রেশন যারা কিনা অত্যন্ত জটিল সম্পর্ককে প্রকাশ করতে পারে, তারা সব সময় অতিশয় নির্বিকার। সর্দি হলে হাঁচির প্রকাশ হয়, আবার বলি—হাঁচিতে সর্দির প্রকাশ। যেমন বলি, বসন্তরোগে দেহে গুটিকার প্রকাশ, আবার, গুটিকাতেই বসন্তের প্রকাশ। মৌনে সম্মতির প্রকাশ, পলায়নে ভীরুতার প্রকাশ, আবার—স্বাক্ষরে সম্মতির প্রকাশ, ভোটে

ইচ্ছার প্রকাশ, বিশেষে সামান্যের প্রকাশ, রূপে অরূপের প্রকাশ, পেয়াদায় রাজশক্তির প্রকাশ,— ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। দেখা যাচ্ছে, সব রকম প্রকাশ এক নয়। কখনো তা চিহ্ন বা লক্ষণ, কখনো অনুমিত সিদ্ধান্ত, কখনো প্রতীক, কখনো বা নিছক রূপ। প্রশ্ন হচ্ছে, শিল্পবস্তু ঠিক কোন্ অর্থে স্রষ্টার অনুভূতিকে বা স্রষ্টার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অনুভূতিপ্রকাশ আর আত্মপ্রকাশ অঙ্গাঙ্গী। ও দুই প্রায় একই কথা, বিশেষত রোমান্টিক থিয়োরিতে। আত্মপ্রকাশের কথাটাকে নেপথ্যে রেখে, কাজের সুবিধার জন্য আপাতত অনুভূতিপ্রকাশকে অবলম্বন করেই আমরা আমাদের আলোচনায় অগ্রসর হব। অর্থাৎ, 'শিল্পবস্তু অনুভূতির প্রকাশ'— এ কথা প্রকাশবাদীরা কী অর্থে বলেন, এখন সেইটেই আমাদের প্রাথমিক আলোচ্য বিষয়।

প্রকাশবাদীরা বার বার বলেছেন, শিল্পবস্তু অনুভূতির চিহ্ন, লক্ষণ বা 'সিম্প্‌টম' নয়। প্রকাশের এ অর্থ এখানে অচল। চিহ্ন থেকে যেভাবে চিহ্নিতকে অনুমান করা হয়, অনুভূতি শিল্পবস্তুতে সে রকম অনুমানের ব্যাপার নয়। অনুভূতি শিল্পবস্তুতে প্রত্যক্ষগোচর।

প্রকাশকে এখানে প্রতীক অর্থে গ্রহণ করা যায় কি? শিল্পবস্তু কি স্রষ্টার অনুভূতির প্রতীক, রাষ্ট্রীয় পতাকা যেমন রাষ্ট্রশক্তির অথবা নাম যেমন নামীর প্রতীক? প্রকাশবাদীদের এতেও আপত্তি। কেননা, এখানেও সেই প্রত্যক্ষগোচরতার প্রশ্ন ওঠে। 'সিম্বল্'এ যদি 'সিম্বলাইজ্‌ড' সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত না থাকে, তা হলে আর্টকে সিম্বল্-ই বা বলা যায় কী ভাবে?

প্রকাশবাদীরা অনুভূতির সাক্ষাৎ-উপস্থিতি চান। দেখতে হবে, এখানে সাক্ষাৎ-উপস্থিতি মানেটা কী। জলের নলে যে জল থাকে, কলের মুখ খুলে দিলে সেই জলেরই প্রকাশ হয়। এই হল সাক্ষাৎ-উপস্থিতি। নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা থেকে যে নির্যাসের প্রকাশ, সে সাক্ষাৎভাবেই উপস্থিত। আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে যে লাভা অদৃশ্য ছিল, হুবহু সেই লাভাই তার আধারকে শূন্য করে বাইরে বেরিয়ে আসে। সেও নিঃসংশয়ে সাক্ষাৎ। কবির হৃদয়-ভাণ্ডারে যে অনুভূতিটি সংগুপ্ত ছিল, হুবহু সেই অনুভূতিটিই কি কবির হৃদয়-ভাণ্ডার থেকে সশরীরে নির্গত হয়ে দৃশ্যমানরূপে বাইরে এসে দাঁড়ায়— উক্ত হৃদয়-ভাণ্ডারকে খালি করে দিয়ে? এবং বাইরে এসেই 'কাব্য' উপাধি অর্জন করে?

এ কথা মানা কঠিন। অনুভূতি জিনিসটা অশরীরী, আর্ট শরীরী। অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী, আর্ট নিত্য। অনুভূতি চঞ্চল, আর্ট স্থির। অনুভূতি ব্যক্তিবদ্ধ, আর্ট সর্বজনবেদ্য। কবির হৃদয়স্থিত অনুভূতি আর বাইরে প্রকাশিত শিল্পবস্তু, এ দুয়ের মধ্যে চরিত্রগত ব্যবধান দুস্তর। তৎসত্ত্বেও কি বলব, ওরা হুবহু এক? কোন্ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বলে এদের একত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারছি?

আর যদি তর্কস্থলে মেনেই নিই যে, এরা হুবহু এক— কবি-হৃদয়ের অনুভূতি আর সর্বজন-আস্বাদ্য শিল্পবস্তু যথার্থই অভিন্ন, তা হলেই কি সব সমস্যা মিটে যায়? তা মেটে না। কেননা, সে ক্ষেত্রে স্রষ্টার ভূমিকা— তাঁর প্রতিভা কল্পনাশক্তি এ-সব একদম অর্থহীন হয়ে পড়ে। স্রষ্টার কাজ রইল কতটুকু? অনুভূতিকে ঢেলে দেওয়া? কাঁচা অনুভূতিকে সরাসরি উদ্‌গিরণ করে দিতে পারলেই তা আর্ট হয়ে গেল?

কোনো কোনো রোমান্টিক লেখক অবশ্য এই রকম ঢেলে দেবার কথাই বলেছেন। সেই-যে বায়রন বলেছিলেন, কবিতা হচ্ছে "the lava of the imagination whose eruption prevents an earthquake", এ হল অনেকটা সেই জাতের কথা। মানতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু সৃষ্টি কথাটা এখানে

একেবারেই মানায় না। তা ছাড়া, এই রকম একটা জৈব-স্তরের ব্যাপারকেই কি তা হলে প্রকাশ বলে মানতে হবে? খাঁটি প্রকাশবাদীরা এই রকম একটা স্থূল মতবাদকে কখনোই সমর্থন করতে পারেন না। এমন কোনো মতই তাঁরা পোষণ করতে পারেন না, যাতে কল্পনাশক্তি ও কবিপ্রতিভার অনুমাত্র মর্যাদাহানি ঘটে।

তবে কি শিল্পবস্তু অনুভূতিকে প্রকাশ করে নিজে অনুভূতির বাহক হয়ে? অর্থাৎ এই কি বলব যে, শিল্পবস্তু অনুভূতি-মণ্ডিত, অনুভূতি-সিক্ত অথবা অনুভূতি-সমন্বিত? কিন্তু কথাটার অর্থ কী দাঁড়াল? শিল্পবস্তু একটা জিনিস, আর অনুভূতি আর-একটা জিনিস? এ দুই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে? শিল্পবস্তু নিজেই সম্পূর্ণ, অনুভূতি একটা বাহ্য সংযোজন মাত্র? তা ছাড়া, অনুভূতির মত মনোলোকের বাসিন্দা, সে কী করে গিয়ে একটা বাহ্য-বস্তুর সঙ্গে অন্বিত হয়? ব্যক্তির মনেই যার অধিষ্ঠান, বস্তুর দেহে সে কী করে অধিষ্ঠিত হয়, তা বোঝা কঠিন। পিরামিড কিংবা তাজমহল সামনে কোনো দর্শক না থাকলেও কি একা একাই অনুভূতিতে টস্‌টস্‌ করতে থাকে? কাব্যগ্রন্থ কি পাঠক-নিরপেক্ষভাবেই অনুভূতিতে সিক্ত হয়ে থাকে?

যার কাছে প্রকাশ হচ্ছে, তাকে ছাড়া প্রকাশ কথাটা অর্থহীন, তা সে প্রকাশ বলতে যা-ই বুঝি না কেন। অনুভূতিপ্রকাশ বললেও এর ব্যতিক্রম হবে না। প্রকাশিতব্য অনুভূতির অধিষ্ঠান হল স্রষ্টার মন। প্রকাশিত বস্তুটি যদি অনুভূতিই হয়, অথবা যদি অনুভূতি-সমন্বিতও হয়, তো সেই অনুভূতিরও একটা অধিষ্ঠান-ভূমি চাই। ভোক্তার মনই সেই অধিষ্ঠান-ভূমি, শিল্পবস্তু নিজে নয়। প্রকাশের প্রশ্নে ভোক্তাকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না।

রোমান্টিক লেখকেরা অনেক সময় আর্টের প্রশ্নে ভোক্তার ভূমিকাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার চেষ্টা করে থাকেন। শিল্পবিচারের থিয়োরিকে তাঁরা পুরোপুরিই স্রষ্টা-কেন্দ্রিক রাখতে চান। স্রষ্টার অনুভূতি কতটা গভীর ব্যাপক ও তীব্র, এবং শিল্পবস্তুতে তা কতটা যথাযথ প্রকাশিত হয়েছে, তারই মানদণ্ডে তাঁরা শিল্পের মূল্যবিচার করতে চান। এ ক্ষেত্রে, শিল্পবস্তুতে স্রষ্টার অনুভূতিকে (বা তার কোনো নিঃসংশয় রূপান্তরকে) সাক্ষাৎভাবে পাওয়া একেবারে অবশ্য-প্রয়োজনীয়। নচেৎ শিল্পবিচারে ভোক্তার অনুভূতিকে কিছুতেই বাদ দিয়ে চলা সম্ভব হয় না।

কিন্তু এর, অর্থাৎ ভোক্তাকে বাদ দেওয়ার, ভীষণ একটা অসুবিধা আছে। সমালোচকের পক্ষে স্রষ্টার অনুভূতিকে সরাসরি জানতে পারার কোনো উপায়ই নেই। স্রষ্টার অনুভূতিকে মাপার উপায়টা কী? সমালোচকের সামনে আছে কাব্য, কবি নয়। কবির অনুভূতিকে জানলে তাই দিয়ে কাব্যে-প্রকাশিত অনুভূতিকে হয়তো যাচাই করা যায়। অন্য দিকে, কাব্যে-প্রকাশিত অনুভূতির সঠিক হদিশ পেলে, তাই থেকে কবির অন্তরের অনুভূতি সম্পর্কে অনুমানও হয়তো একটা করা চলে। কিন্তু দুটো ক্রিয়াকে এক সঙ্গে জড়ানো যায় না। যেমন দুজন দরিদ্র লোক পরস্পরের কাছ থেকে ধার করে ধনী হয়ে উঠতে পারে না। কাব্য থেকে কবির অনুভূতিকে অনুমান করে নিয়ে, তার পর সেই অনুমিত অনুভূতি দিয়েই আবার কাব্যে-প্রকাশিত অনুভূতির যথাযথতা বিচার করব, তা হয় না। শিল্প-বিচারকে একান্তভাবে স্রষ্টা-কেন্দ্রিক করলে প্রকাশবাদী শিল্পতত্ত্ব এই ভ্রান্তিচক্র কিছুতে এড়াতে পারে না।

ভোক্তার কথা বলতেই হয়। কাজে-কাজেই কমিউনিকেশনের কথাও এসে পড়ে। বলতে হয়, প্রকাশ ও কমিউনিকেশন অচ্ছেদ্য। অথবা বলতে হয়, কমিউনিকেশনই প্রকাশ। প্রকাশিতব্য অনুভূতি স্রষ্টার মনে, প্রকাশিত অনুভূতি ভোক্তার মনে। শিল্পবস্তুর কাজ হল, এক মন থেকে অপর মনে অনুভূতিকে পৌঁছে

দেওয়া। অনুভূতির খেয়া-পারাপার করে দেওয়া— অনুভূতির সংবহন বা সংক্রমণ। প্রকাশবাদীরা বেশিরভাগ সেই কথাই বলেন।

এই সংবহন বা কমিউনিকেশন ব্যাপারটাকে একটু বুঝে দেখা দরকার। এখানে সংবাহিত হচ্ছে কী বস্তু? রূপ নয়, ধ্বনি নয়, স্পর্শ নয়, অর্থ নয়— এরা শিল্পবস্তুরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সুতরাং বাহন মাত্র। এদের কাঁধে চড়ে যা সংবাহিত হচ্ছে তা হল অনুভূতি। ডাকগাড়ির কাঁধে চড়ে চিঠি প্রেরকের হাত থেকে প্রাপকের হাতে সংবাহিত হয়, টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়ে এক প্রান্তের ধ্বনি অন্য প্রান্তে সংবাহিত হয়, নলের মাধ্যমে এক চৌবাচ্চার জল অন্য চৌবাচ্চায় সংবাহিত হতে পারে— অনুভূতির সংবহন ঠিক সেই রকম একটা ব্যাপার কি? অনুভূতি তার বাসস্থান পরিত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে কি? এবং সেই বাস্তুত্যাগী অনুভূতির পক্ষে অপর-একটা মনের মধ্যে ঢুকে পড়া এবং পুনর্বাসনলাভ করা সম্ভব কি?

এর অসম্ভাব্যতার কথা অনুভূতির সাক্ষাৎ-উপস্থিতির প্রসঙ্গে পূর্বেই কিছুটা আলোচিত হয়েছে। স্রষ্টার অনুভূতি একটা বিশিষ্ট মনের সুনির্দিষ্ট অনুভূতি, ভোক্তার সংখ্যা অনির্দিষ্ট। স্রষ্টার অনুভূতি সীমাবদ্ধ, শিল্পবস্তুর আবেদন (অনুভূতি উদ্রেক করার ক্ষমতা) দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ নয়। তা ছাড়া, অনুভূতি জিনিসটা এমনই একান্তভাবে ব্যক্তিগত, তা অনুভবকারীর জীবনেতিহাসের এমনই অচ্ছেদ্য অঙ্গ যে তাকে সেখান থেকে উপড়ে নিলে তা আর অনুভূতিই থাকে না। আসলে, অনুভূতি দেওয়াও যায় না, নেওয়াও যায় না। সুতরাং আক্ষরিক অর্থে সংবহন এ ক্ষেত্রে অচল। একই অনুভূতি মন থেকে মনান্তরে যাতায়াত করে বেড়ায় না। অনুভূতির অধিষ্ঠান-ভূমি যখন পৃথক, তখন অনুভূতিও পৃথক।

প্রকাশবাদীরা বলতে পারেন, আক্ষরিক অর্থে অভিন্ন না হয় না-ই হল, সম্পূর্ণ অনুরূপ তো হতে পারে? স্রষ্টার মনের মধ্যে যে-অনুভূতিটা রয়েছে, শিল্পবস্তুর মধ্যস্থতায় ভোক্তার মনেও অবিকল অনুরূপ অনুভূতি তো জাগ্রত হতে পারে? অনুরূপ অনুভূতির উদ্রেকই কমিউনিকেশন, তারই নাম প্রকাশ।

কিন্তু অবিকল অনুরূপ হওয়াই কি সম্ভব? দুটি মন যখন পৃথক, যে সম্পূর্ণ পৃথক জীবনেতিহাস দুটিতে এই অনুভূতি দুটি অচ্ছেদ্যভাবে সংবদ্ধ হয়ে আছে সেই জীবনেতিহাস দুটি যখন পরস্পরের অবিকল অনুরূপ নয়, তখন অনুভূতি দুটির মধ্যে যতই আনুরূপ্য থাক-না কেন, পার্থক্যও থাকতে বাধ্য।

আরো একটা মুশকিল আছে। এই থিয়োরি অনুসারে স্রষ্টা ও ভোক্তা উভয়ের অনুভূতির আনুরূপ্যের উপরেই শিল্পবস্তুর শিল্পত্ব নির্ভর করছে— এইখানেই তার ভালোমন্দের মাপকাঠি। কিন্তু অনুভূতি দুটি যে আদৌ অনুরূপ তা জানব কী করে? দুটো অনুভূতিকে পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে নেবার তো কোনো উপায় নেই। অনুমান? কোন্ তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করব? তা ছাড়া, শিল্পবস্তুর শিল্পত্ব সম্পর্কে বোধ কি আমাদের অমনুমানলব্ধ সিদ্ধান্ত, না, সাক্ষাৎ বোধ? স্রষ্টা এবং ভোক্তা দুজনে পরস্পরের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করেও পরস্পরের অনুভূতির মিল বা অমিল সম্পর্কে কোনো মীমাংসা করে নিতে পারবেন না। কেননা বুদ্ধিগ্রাহ্য বা আটপৌরে বর্ণনা দিয়ে নিজের অনুভূতির যথার্থ স্বরূপটি অপরকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। তা নাকি একমাত্র আর্ট দিয়েই পারা যায়। অর্থাৎ, একটা শিল্পবস্তুর শিল্পত্ব সম্পর্কে স্রষ্টার জবানবন্দী চাইলে, তিনি বড়জোর আর-একটা শিল্পবস্তু আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু, এখানে তো আর্টকে বোঝা নিয়েই প্রশ্ন। একটা আর্টের আর্টত্ব বুঝতে যদি আর-একটা আর্টের প্রয়োজন হয়, তা হলে অন্তহীন আর্ট-পরম্পরা দিয়েও কখনো মীমাংসায় উপনীত হতে পারব না।

রোমান্টিক প্রকাশবাদী অনুভূতিপ্রকাশ কথাটিকে যে অর্থে বা যে যে অর্থে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তার কোনোটিই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। এই-সব বিকল্প ব্যাখ্যার প্রত্যেকটিই সমস্যাসঙ্কুল। লক্ষণীয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ এর কোনো ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করেন নি। কমিউনিকেশন ব্যাপারটাকে তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু অনুভূতির কমিউনিকেশনকেই তিনি প্রকাশ আখ্যা দেন নি, এবং তাই দিয়েই তিনি সাহিত্যের মূল্য-নিরূপণের কথা বলেন নি।

৫

প্রকাশের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন রূপের কথা। রূপই প্রকাশ। যে রূপ সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট, অবিসংবাদিত। যে রূপ সুনিশ্চিত এবং সুপ্রত্যক্ষ। কিন্তু সে রূপ কার? অনুভূতির?

অনুভূতির রূপায়ণ—আর্ট সম্পর্কে একথাটা অনেকেই বলেন বটে। আর্টের ক্ষেত্রে রূপায়ণ কথাটা হয়তো একটুও অসংগত নয়, কিন্তু সে কি শুধু অনুভূতিরই রূপায়ণ? অথবা, সে কি আদৌ অনুভূতির রূপায়ণ?

বিশুদ্ধ অনুভূতি একটি অবচ্ছিন্ন কল্পসত্তা—নিছক অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌শন। তার রূপ নেই, আকার নেই, অবয়ব নেই। ঘটনার আশ্রয় ব্যতিরেকে সে একটি মরীচিকা মাত্র। নিরালম্ব অনুভূতি এতই মিথ্যাময় যে তার রূপায়ণের প্রশ্নই ওঠে না। ঘটনায়-আশ্রিত অনুভূতিই সত্য অনুভূতি, জীবনে-বিধৃত অনুভূতিই রূপ-সমন্বিত অনুভূতি। আসলে, রূপ জীবনেরই। তাই রূপায়ণও জীবনেরই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, জীবনই সাহিত্যের বিষয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকাশ বলতে তিনি 'বিষয়ের প্রকাশ'কেই বুঝেছেন, নিছক অনুভূতিপ্রকাশকে নয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি সাহিত্যে 'ভাবপ্রকাশে'র কথা আদৌ বলেন নি? ভাবপ্রকাশই কি অনুভূতিপ্রকাশ নয়?

ভাবপ্রকাশের কথা রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই বলেছেন। বলেছেন বটে, কিন্তু মোটেই রোমান্টিক অর্থে নয়, মোটেই প্রচলিত অর্থে নয়। 'ভাব' এবং 'অনুভব' দুটো কথাকেই তিনি ব্যবহার করেছেন ব্যুৎপত্তিগত অর্থে। ওয়ার্ডস্বার্থ যখন বলেন, প্রকৃত কবিতা হচ্ছে "the spontaneous overflow of powerful feelings", অথবা মিল্ যখন বলেন যে কবিতা আর কিছুই নয়, সে হল "the expression or utteringforth of feeling", তখন 'ফীলিং' বলতে তাঁরা যা বোঝেন, রবীন্দ্রনাথ ভাব বা অনুভূতি বলতে মোটেই তা বোঝেন না। সাহিত্যতত্ত্ব প্রবন্ধে ('সাহিত্যের পথে') তিনি বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন, "অনুভব মানেই হওয়া"; বলেছেন, "বাহিরের সত্তার অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টিলীলায় উদ্‌বেল হয়।"

এখানে এই 'বাহিরের সত্তা' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ করবার মত। বাইরের সত্তার সঙ্গে নিজের সত্তাকে যুক্ত করে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার নামই অনুভূতি। বাইরের সত্তার অভিঘাতেই 'মন সৃষ্টিলীলায় উদ্‌বেল হয়'। অর্থাৎ সৃষ্টির অপরিহার্য শর্তই হল বাইরের সত্তা, এবং অনুভূতির মধ্যেই সেই বাইরের সত্তা উপস্থিত। রাবীন্দ্রিক অর্থে ভাব বা অনুভূতির প্রকাশ হল—জগৎ-সত্যের মধ্যে দিয়ে আত্ম-সত্যের এবং আত্ম-সত্যের মধ্যে দিয়ে জগৎ-সত্যের রূপায়ণ। নিছক ব্যক্তিগত ফীলিংএর রূপায়ণ নয়।

সংস্কৃত আলংকারিকেরাও ভাবপ্রকাশের কথা বলেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তাঁরা ফীলিংএর

কথাই বুঝি বলতে চান। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, সচরাচর আমরা যাকে ভাব বা অনুভূতি বলি (ইংরেজিতে যাকে ফীলিং বা ইমোশন বলা হয়), সংস্কৃত আলংকারিকেরা ঠিক-ঠিক সেই বস্তুকে প্রকাশ করার কথা মোটেই বলেন নি। ফীলিং সব সময়ই ব্যক্তিগত, কিন্তু অলংকারশাস্ত্রের 'ভাব' ব্যক্তিগত ভাব নয়। অর্থাৎ কাব্যে-প্রকাশিত ভাব মোটেই কবির নিজস্ব ফীলিং নয়। কাব্যের ভাব কবিরও নিজের নয়, পাঠকেরও নিজের নয়। অভিনব গুপ্ত ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, ক্রৌঞ্চের শোকে বাল্মীকির মনে যে-বেদনা পরিপূর্ণকুম্ভোচ্ছলনবৎ উচ্ছলিত হয়ে কাব্যত্বপ্রাপ্ত হল তা লৌকিক শোক থেকে ভিন্ন, তা আস্বাদ্যমানতাপ্রাপ্ত করুণ-রস। মুনির দিক থেকে তা স্বচিত্তবৃত্তির আস্বাদন, পাঠকের দিক থেকেও তাই। 'রামায়ণ' শোকের কাব্য, কিন্তু সে শোক লৌকিক শোক নয়। এবং শোক মোটেই বাল্মীকির নিজের নয় ('ন তু মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম্'— অভিনবগুপ্ত)। 'শকুন্তলা'-নাটকে শৃঙ্গার-রস আছে, কিন্তু রতি-ভাব কালিদাসের নিজের নয়। কাব্যের ভাব— কি কবি কি পাঠক, কারোই নিজের নয়, আবার কারো কাছেই তা সম্পূর্ণভাবে পরেরও নয়। বিশ্বনাথ বলেছেন, 'পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।'

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে 'সাধারণীকরণ'এর উপর অনেকেই খুব জোর দিয়েছেন। পুরোপুরি না হোক, এই তত্ত্বের মূল ভাবটি রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনেও অনুপস্থিত নয়। তিনি বলেছেন, আর্টের কাজই হল ভাবকে সকলের করে দেওয়া। সাহিত্যের ভাব শুধু বিশিষ্টই নয়, তা সর্বজনীনও বটে।

যাকে 'সাধারণীকরণ' বলি, তার একটা ঐতিহাসিক অথবা সামাজিক ভিত্তিভূমির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত করেছেন। সমাজবদ্ধ মানুষ একটি সর্বগত উৎস থেকে প্রতিনিয়ত প্রাণরস মনোরস আহরণ করে চলেছে। সে দিক থেকে, যাকে একান্তই ব্যক্তিগত ভাব বলে মনে করি তারও একটা সামাজিক পরিচয় আছে, সর্বজনীন সত্তা আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, রচনা যদিও লেখকেরই, ভাব কারো নিজস্ব সম্পত্তি নয়। ভাব সমাজের সম্পত্তি, মানুষের ইতিহাসের সম্পত্তি— 'সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন'-এর সম্পত্তি।

"মানুষের সাহিত্যে যে-একটা ভাবের সৃষ্টি চলিতেছে তাহার স্থিতিগতির ক্ষেত্র অতি বৃহৎ"— 'সাহিত্যসৃষ্টি,' সাহিত্য। 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে (সাহিত্য) তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, "ভাব সাধারণ মানুষের।· · সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।" সাহিত্যের ভাব বিশিষ্ট এবং মূর্ত, কিন্তু ব্যক্তিগত নয়। "ভাব· ·মনুষ্যসাধারণের, কিন্তু তাহাকে বিশেষ মূর্তিতে সর্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায়রচনাই লেখকের কীর্তি"।— 'সাহিত্যের সামগ্রী', সাহিত্য।

একটা জিনিস এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রোমান্টিক সাহিত্যশাস্ত্রীদের ঝোঁক ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-প্রকাশের দিকে, অতি-বিশেষীকরণের দিকে।[১] রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্টতার কথা বেশ জোর দিয়েই বলেছেন, কিন্তু অতি-বিশেষীকরণের ঝোঁকটা তার নেই। নেই বলেই, রোমান্টিক শিল্পভাবনার প্রচুর সূত্রকে আত্মসাৎ করেও, রোমান্টিকতার তত্ত্বগত পরিণামকে তিনি অনায়াসে এড়িয়ে যেতে পেরেছেন।

---

১ রোমান্টিকতার অন্যতম পুরোহিত নোভালিসের একটি উক্তি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে: "The more personal, local, peculiar, of its own time, a poem is, the nearer it stands to the centre of poetry."

৬

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিশেষভাবে সৃজনক্রিয়ার প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টার আত্মপ্রকাশের কথাটা উত্থাপন করেছেন। এও বলা হয়েছে যে, কথাটি যেহেতু ক্রিয়েটিভ প্রসেসের ক্ষেত্রের, সেই হেতু শিল্পবিচারকে তা সরাসরি স্পর্শ করে না।

শুধু তাই নয়। সৃজনক্রিয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু আত্মপ্রকাশ ব্যাপারটাতে রোমান্টিক প্রকাশবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

সত্যিই কি রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশক্রিয়া আর সৃজনক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অভিন্ন বলে মনে করেন? আত্ম-প্রকাশমাত্রই কি তাঁর মতে সৃজন? আত্মপ্রকাশ কথাটাকে যদি প্রচলিত অর্থে বা রোমান্টিক অর্থে ধরি, তা হলে এ কথা মোটেই মেনে নেওয়া যায় না।

সমস্ত রকম ক্রিয়াতেই কর্তার কিছু-না-কিছু 'আত্মপ্রকাশ' ঘটে থাকে, ঘটতে বাধ্য। তার প্রত্যেকটিই সৃজন নয়, প্রত্যেকটিই আর্ট নয়। যেখানে কেবল আত্মপ্রকাশের জন্যই আত্মপ্রকাশ, যেখানে আত্মপ্রকাশ ভিন্ন অন্য লক্ষ্য নেই, মাত্র সেইখানেই বলতে পারি—সৃজন। যেখানে আত্ম-প্রকাশ সার্থক, অবারিত। কথাটাকে উল্টো করেও বলা যায়। একমাত্র সৃজনের ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ সার্থক ও অবারিত। রবীন্দ্রনাথের মতে, এই সার্থক আত্মপ্রকাশের সব থেকে বড় বাধাই হল আমাদের অহংবোধ। অহং-এর দেওয়ালগুলি না ভাঙা পর্যন্ত আত্মার প্রকাশ সম্ভব হয় না। সৃজন বলতে রবীন্দ্রনাথ শুধু নির্মাণই বোঝেন না উৎসর্জনও বোঝেন। এ হল অহং-এর উৎসর্জন। তাইতেই আত্মলাভ। সৃজনের ক্ষেত্রেই এই আত্মলাভ সার্থক ও অবারিত।

সৃজনপ্রক্রিয়া এই অর্থেই আত্মপ্রকাশ-প্রক্রিয়া। প্রচলিত আত্মপ্রদর্শন অর্থে নয়, আত্মসিদ্ধি অর্থে। তার মধ্যে দিয়ে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে স্রষ্টা যোগযুক্ত। যেখানে কিনা রোমান্টিক আত্মপ্রকাশবাদের মুখ্যতম কথাই হল নিজত্ব-প্রকাশ—অহং-এর প্রকাশ।

উনবিংশ শতকের রোমান্টিক কবিদের সঙ্গে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মনের সুগভীর মিল অনেকেই লক্ষ করেছেন। এ মিল যে অত্যন্ত স্পষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের কাব্য সম্পর্কে আলোচনার প্রসঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যে-সব মন্তব্য করেছেন তাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আধুনিক কাব্য প্রবন্ধে (সাহিত্যের পথে) তিনি উক্ত কবিদের বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন যে, তাঁদের কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণই হল 'ব্যক্তিগত খুশির দৌড়'। বলেছেন—

> "তাঁরা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখেছিলেন, জগৎটা হয়েছিল তাঁদের ব্যক্তিগত। আপন কল্পনা মত ও রুচি সেই বিশ্বকে যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা নয়, তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত। ওয়ার্ডস্বার্থের জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ডস্বার্থীয়, শেলির ছিল শেলীয়, বাইরনের ছিল বাইরনিক।"

উদ্ধৃতিটিতে ওই যে 'বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে' দেখার কথা এবং 'বিশ্বকে মানবিক ও মানসিক' করার কথা আছে, যা সব কালের সব কবিই করে থাকেন, ওইটুকু রবীন্দ্রনাথের নিজের সাহিত্যতত্ত্বের দ্বারাও সমর্থিত। কিন্তু জগৎটাকে 'মানবিক ও মানসিক' করা এক কথা আর জগৎটাকে ব্যক্তিগত করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। কাব্যের জগৎকে 'বিশেষ কবির মনোগত' করে তোলা, যাকে

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা', এ জিনিসকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ বলে গণ্য করেন নি। ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে, এই রকম একটা 'ব্যক্তিগত খুশির দৌড়' এবং সেই সঙ্গে একটা 'বিষয়ীর আত্মতা'-মূলক মতবাদ যে তৎকালের সাহিত্যে অনিবার্য ছিল—এমন-কি প্রয়োজনীয়ও ছিল, সে কথা তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে এ বস্তু তাঁর সমর্থন পায় নি। রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের রোমান্টিক কবিদের রচনার ইন্দ্রজালশক্তির তারিফ করেছেন, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্রোহকে অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করেছেন, কিন্তু বিদ্রোহের উন্মাদনায় তাঁদের শিল্পভাবনার যে একটা আতিশয্য ও অপরিণতমনস্ক ভাবের সঞ্চার হয়েছে, এ কথাও তিনি বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন।

ব্যক্তিত্বের কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন। কিন্তু রোমান্টিকদের দ্বারা আদৃত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে (অর্থাৎ ব্যক্তিতন্ত্রবাদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে) রবীন্দ্রনাথ-কথিত ব্যক্তিত্বের যোগ কম। বহুধা-বিভক্ত সমাজ শিল্পীর মধ্যে যে একাকিত্ব-বোধের জন্ম দেয়, প্রতিকূল পরিবেশ স্রষ্টার মনে সময়বিশেষে যে আত্মাভিমান জাগিয়ে তোলে, যে ব্যক্তিত্বের মর্মস্থলে অহমিকার সিংহাসন মাথা তুলেছে, রবীন্দ্রনাথ সেই ব্যক্তিত্বের কথা বলেন নি। রবীন্দ্রনাথ 'পার্সোনালিটির' কথা বলেছেন, কিন্তু রোমান্টিকদের মত কোনো স্ফীতকায় অহং-কে নিয়ে—নিজে রোমান্টিক হয়েও কীট্‌স যাকে ঠাট্টা করে বলেছেন "egotistical sublime"—সেই জাতীয় কোনো বিশ্বগ্রাসী আমি'কে নিয়ে তাঁর পার্সোনালিটি-তত্ত্ব গড়ে ওঠে নি।[১]

স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ যে আসলে মানবপ্রকৃতিরই আত্মপ্রকাশ তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি চিঠিতে বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলেছেন—

"লেখকের নিজের অন্তরে একটি মানবপ্রকৃতি আছে এবং বাহিরের সমাজে একটি মানবপ্রকৃতি আছে, অভিজ্ঞতাসূত্রে প্রীতিসূত্রে এবং নিগূঢ় ক্ষমতাবলে এই উভয়ের সম্মিলন হয়, এই সম্মিলনের ফলেই সাহিত্যে নূতন নূতন প্রজা জন্মগ্রহণ করে। সেই সকল প্রজার মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি দুইই সম্বদ্ধ হয়ে আছে, নইলে কখনোই জীবন্ত সৃষ্টি হতে পারে না"।
—'মানবপ্রকাশ,' সাহিত্য।

এখানে যে লেখকের আত্মপ্রকৃতির কথা বলা হয়েছে, তা আসলে বৃহৎ মানবপ্রকৃতিরই অঙ্গীভূত। সেই কথাটা আরো পরিষ্কার করার জন্য ওই চিঠিতেই তিনি যোগ করে দিয়েছেন—

"আমার মনে হচ্ছে, আমার প্রথম চিঠিতে লেখকেরই নিজত্ব-প্রকাশের উপর এতটা ঝোঁক দিয়েছিলুম যে সেইটেই সাহিত্যের মূল লক্ষ্য এই রকম বুঝিয়ে গেছে।··আমার বলা উচিত ছিল, লেখকের নিজত্ব নয়, মনুষ্যত্ব প্রকাশই সাহিত্যের উদ্দেশ্য (আমার মনের মধ্যে নিদেন সেই কথাটাই ছিল)। ··লেখক উপলক্ষ মাত্র, মানুষই উদ্দেশ্য।"

সম্মিলিত মানবমনই নিজেকে প্রকাশ করে। লেখক সেই মানব-মহাসমগ্রতার একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি। সৃজনের নিভৃত লীলাক্ষেত্রে, যেখানে স্রষ্টাকে আমরা একাকী এবং একেশ্বর মনে করি, সেখানেও তিনি একাকী নন, একেশ্বর নন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

১ রোমান্টিসিস্ট সাহিত্যতত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ফ্রে. শ্লেগেলের একটি উক্তি এখানে উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে : "It is precisely individuality that is original and eternal thing in men", এবং সেই কারণে "The cultivation of this individuality, as one's highest vocation, would be a divine egoism"।

"লেখককে আমরা যখন অত্যন্ত নিকটে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখি তখন লেখকের সঙ্গে লেখার সম্বন্ধটুকুই আমাদের কাছে প্রবল হইয়া ওঠে ; তখন মনে করি গঙ্গোত্রীই যেন গঙ্গাকে সৃষ্টি করিতেছে।"

—'সাহিত্যসৃষ্টি', সাহিত্য

অন্যত্র

"যেখানে সাহিত্যরচনায় লেখক উপলক্ষমাত্র না হইয়াছে সেখানে তাহার লেখা নষ্ট হইয়া গেছে।"

—'বিশ্বসাহিত্য', সাহিত্য

পুনশ্চ

"সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, মনের নিগূঢ় এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাকে কেবলই প্রকাশ করিয়া অপরূপ মাসনসৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে।" —'সাহিত্যসৃষ্টি', সাহিত্য

সৃজনক্রিয়ায় স্রষ্টাকে উপলক্ষ করে সমগ্র মানবতারই আত্মপ্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন— মানবপ্রকাশ।

৭

দেখা যাচ্ছে, সৃষ্ট শিল্পবস্তুটি যা-ই প্রকাশ করুক-না কেন, রবীন্দ্রনাথের মতে সৃজনক্রিয়া মানবমনেরই আত্মপ্রকাশক্রিয়া। এ মানুষ কোনো অমূর্ত ভাবপদার্থ নয়। এ মানুষ বাস্তব মানুষ, ইতিহাসের মানুষ, মানবসমাজ ও মানবসংসারের মানুষ— রক্তমাংসের মানুষ।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, ক্ষেত্রবিশেষে রবীন্দ্রনাথ আর-এক রকমের মানুষের কথাও বলেছেন। ব্যাবহারিক জীবনের প্রয়োজনকে ছাপিয়ে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি 'উদ্‌বৃত্ত' সত্তা— একটি লীলাময় সত্তা— বিরাজমান। তার স্থান জীবন-সংগ্রামের ঊর্ধ্বে, অনেকটা যেন ইতিহাসেরও ঊর্ধ্বে। সেই লীলাময় আনন্দময় মানুষটিই মানুষের মধ্যেকার সৃষ্টিকর্তা-মানুষ। সৃজনলীলায় তারই আত্মপ্রকাশ।

এই দুই ধরণের উক্তির মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর পরিমাণে রবীন্দ্র-শিল্পদর্শনসম্মত, রবীন্দ্রনাথ এদের মধ্যে কোনো সমন্বয়সাধন করতে পেরেছেন কি না, অথবা এদের মধ্যে সত্যিকারের কোনো পরস্পর-বিরোধিতা আছে কি না, বর্তমানে সে আলোচনায় আমরা প্রবেশ করব না। আমাদের মূল আলোচ্য সৃষ্টিপ্রক্রিয়া নয়। আমাদের মূল আলোচ্য হল শিল্পবস্তু, তার স্বরূপ, তার মূল্যায়ন।

অর্থাৎ সৃষ্টিক্রিয়াতে যারই প্রকাশ ঘটুক-না কেন, সৃষ্টিতে (বা শিল্পবস্তুতে) কী প্রকাশিত হয়, শিল্পবস্তু কী প্রকাশ করে বা কাকে প্রকাশ করে, বর্তমানে সেইটেই আমাদের প্রধান বিবেচ্য।

দিক যে এখানে দুটো, এবং দিক দুটো যে সম্পূর্ণ আলাদা, তা রবীন্দ্রনাথ নিজেই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। সৃজনক্রিয়ায় সৃষ্টিকর্তার দিকটাই আসল। আর-একটা দিক ভোক্তার। সে দিকটাতে সৃষ্টিই (অর্থাৎ শিল্পবস্তুই) আসল কথা। তিনি বলেছেন (যাত্রী, রচনাবলী ১৯।৪৪৩), "সৃষ্টিকর্তার দিকে বিশেষত্ব প্রতিভায়। সেটা হচ্ছে দৃষ্টির বিশেষত্ব, অনুভূতির বিশেষত্ব, রচনার বিশেষত্ব নিয়ে।" আর সৃষ্টির দিকে ? "সৃষ্টির দিকে বিশেষত্ব এই তো আছে ক্যারেক্‌টার।" আর, দুটো দিককে মিলিয়ে ছবিটাকে যদি পূর্ণাঙ্গ করতে চাই, তা হলে ? "· ·রূপকারের রচনাতেও · · স্রষ্টা ব্যক্তিটি আপন প্রতিভার স্বরূপ দিয়ে আপন সৃষ্টির রূপটিকে দ্রষ্টা ব্যক্তিটির কাছে সুনির্দিষ্ট করে দেয়।" অর্থাৎ, স্রষ্টার স্রষ্টৃত্বের চাবি তাঁর প্রতিভায়, কিন্তু ভোক্তার লক্ষ্য সৃষ্টির রূপ— ক্যারেক্‌টার। সেইখানেই শিল্পবস্তুর শিল্পত্ব।

৮

'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে (সাহিত্য) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় ও মানবচরিত্র।" কথাটাকে ব্যাখ্যা করে তিনি আরো বলেছেন, "বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।"

বহিঃপ্রকৃতি ও মানবচরিত্র নিয়ে যে বৃহৎ বিশ্বজগৎ, মানুষের কাছে তা আপন হৃদয়ে-প্রতিফলিত উপলব্ধিতে-বিধৃত মানবিক বিশ্ব। সাহিত্যে মানুষ ভাষা দিয়ে সেই মানববিশ্বেরই চিত্র রচনা করে। সাহিত্য এই মানববিশ্বেরই রূপকে প্রকাশ করে।

সৃজনক্রিয়ায় যেমন মানবমনের আত্মপ্রকাশ, সৃষ্ট শিল্পবস্তুতেও তেমনি মানবমন ও মানববিশ্বই প্রকাশিত হয়। তাই প্রসেস এবং প্রডাক্ট এই দু'রকম অর্থেই সাহিত্যকে ললিতকলাকে মানবপ্রকাশ বলা চলে। কিন্তু দুটো অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের আলোচ্য শেষেরটা।

বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিতে— জগৎ ও জীবনের মাঝখানেই মানুষ মানুষ। তাই 'নিছক-মানুষ' বলে কোনো নিষ্কাশিত অবচ্ছিন্ন ভাবপদার্থ নয়, জগৎ ও জীবনই সাহিত্যের বিষয়। সাহিত্য তাকেই ব্যক্ত করে, তাকেই রূপ দেয়।

বিষয়ের ব্যক্ততাই যে সাহিত্যের আসল কথা, এটা রবীন্দ্রনাথ খুব জোর দিয়েই বলেছেন। তিনি বলেছেন, সাহিত্যবিষয়কে তার নিজের রূপে ব্যক্ত হতে হবে। এই ব্যক্ত রূপকেই তিনি বলেছেন 'ব্যক্তি'। 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধে (সাহিত্যের পথে) তিনি বলেছেন যে, সাহিত্য-সমালোচনা হল 'মুখ্যত সাহিত্যবিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে'। ব্যাখ্যা করে আরো বলেছেন—

"এখানে ব্যক্তি শব্দটাতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপর জোর দিতে চাই। স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তাই ব্যক্তি।·· ব্যক্তিরূপের এই ব্যক্ততা সকলের সমান নয়, কেউ বা সুস্পষ্ট, কেউ বা অস্পষ্ট।·· সাহিত্যের ব্যক্তি কেবল মানুষ নয়, বিশ্বের যে-কোনো পদার্থই সাহিত্যে সুস্পষ্ট তাই ব্যক্তি, জীবজন্তু গাছপালা নদী পর্বত সমুদ্র ভালো জিনিস মন্দ জিনিস বস্তুর জিনিস ভাবের জিনিস সমস্তই ব্যক্তি।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সৃষ্টির (শিল্পবস্তুর) দিকের আসল কথাই হল ক্যারেক্টার। ব্যক্তিই ক্যারেক্টার। রূপের ব্যক্ততাই আসল কথা। 'সাহিত্য-বিচার' প্রবন্ধে (সাহিত্যের পথে) তিনি বলেছেন যে, সাহিত্য বিষয়ের এই ব্যক্ত রূপের মূল্যবিচারই প্রকৃত সাহিত্য-বিচার। রূপের এই যে ব্যক্ততা, এরই নাম প্রকাশ। এই দিক থেকেই তিনি বলেছেন, "সৃষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ"। ওই প্রবন্ধেই একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টাকে তিনি এইভাবে বুঝিয়েছেন—

"চৈনচিত্র-বিশ্লেষণে প্রমাণ হতে পারে যে, তার কোনো অংশে ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্রব ঘটেছে, কিন্তু সেটা নিছক ইতিহাসের কথা, সারস্বত বিচারের কথা নয়। সে চিত্রের ব্যক্তিত্বটি দেখো, যদি রূপ-ব্যক্ততায় কোনো দোষ না থাকে তা হলে সেইখানেই তার ইতিহাসের কলঙ্কভঞ্জন হয়ে গেল।"

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নিজস্ব রূপ আছে। রবীন্দ্রনাথ বার বার 'বিষয়ের নিজত্ব' বা 'বিষয়ের আত্মতা'-র কথা বলেছেন। বিষয়ের নিজস্ব রূপ—এইটেই যদি শেষ কথা হয়, তা হলে, আর্ট নিজের বাইরে অপর কোনো সত্তার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে, এ কথা বলার কোনো অর্থ হয়

কি ? নিজত্বই যেখানে আসল কথা, সেখানে রূপের সম্পূর্ণতার জন্য সে নিশ্চয়ই অপর কারো মুখাপেক্ষী নয়। তা যদি হয়, রূপ যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ ই হয়, তা হলে আর্টকে সত্য হতে হবে, এই দাবির মূল্য কী ? শিল্পবস্তু জগৎ ও জীবনকে প্রকাশ করে, না, নিজেকেই প্রকাশ করে ?

দেখতে হবে, নিজেকে প্রকাশ করা অর্থ কী ? 'নিছক নিজত্ব' কথাটার অর্থ স্পষ্ট নয়। 'নিজত্ব' প্রত্যেক জিনিসেরই আছে। 'নিছক-নিজত্ব'-কে চরম ধরলে, সুসাহিত্য কুসাহিত্য, অ-সাহিত্য—এদের মধ্যে কোনো তফাত করার উপায় থাকে না। যা ব্যর্থ, যা অপ-সাহিত্য কিংবা যা পুরোপুরি অ-সাহিত্য, কেউই আপন নিজত্বকে লুকিয়ে রাখে না, সকলেই নির্ভুলভাবে আপন নিজত্বকে প্রকাশ করে। নিজত্ব থাকা সত্ত্বেও, নিজত্বকে প্রকাশ করা সত্ত্বেও কোনোটা আর্ট, কোনোটা নয়। নিছক নিজত্ব নয়, আরো একটা-কিছু আছে, যা দিয়ে বুঝতে পারি, কোন্‌টা আর্ট কোন্‌টা আর্ট নয়।

শিল্পবস্তুর সামগ্রিক কোনো নিজত্ব নয়, রহস্যময় কোনো অনির্বচনীয় আত্মতা নয়, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিষয়ের আত্মতার কথা, বিষয়ের ব্যক্ত রূপের কথা—বলেছেন সাহিত্যবিষয়ের ব্যক্তির কথা। এরা 'কেউ বা সুস্পষ্ট, কেউ বা অস্পষ্ট'। এইখানেই ব্যক্ততার মাপকাঠি। রূপটা সুস্পষ্ট সুপ্রত্যক্ষ সুনিশ্চিত হওয়া চাই। যাকে আমরা মেনে নিতে বাধ্য হই। "রূপের স্পষ্টতায় যে সুপ্রত্যক্ষ সেই রূপবান।· · বিষবৃক্ষে হীরা রূপবান। হীরা আমাদের ঘুমোতে দেয় না, সে সুন্দর বলে নয়, গুণবান বলে নয়, রূপবান বলে"—(যাত্রী, রচনাবলী-১৯।৪৪৪-৫)। সাহিত্যের পথে'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইংরেজিতে থাকে বলে real, সাহিত্যে আর্টে সেটা হল তাই, যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য।"

এই বাধ্যতা কিসের ? উপলব্ধির। উপলব্ধিতে এমন কোনো মাপকাঠি, এমন কোনো আদর্শ তা হলে নিশ্চয়ই আছে যার দরুণ আমরা কখনো মানতে বাধ্য হই, কখনো হই না।· · "মন যাকে বলে এই তো নিশ্চিত দেখলুম"—সাহিত্যের পথে'র ভূমিকা।· · এই যে নিশ্চিতি, এর ভিত্তি কী ? মন কখন বলে নিশ্চিত দেখলাম ? এই নিশ্চিতি-বোধ নিশ্চয়ই মনের খেয়ালের সৃষ্টি নয় ?

মনের সত্য-বোধই এই নিশ্চিতির ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন, সাহিত্যের বিষয় মানুষ, সাহিত্যের বিষয় জগৎ ও জীবন। কিন্তু জীবনের নিজেরই তো রূপ আছে—বহু-বিচিত্র রূপ-সম্ভার। "জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলছে" — 'সাহিত্যের মূল্য', সাহিত্যের স্বরূপ। গভীরভাবে অনুধাবন করে দেখলে এই কথাই মনে হয় যে, জীবনের এই রূপই আমাদের সত্য-বোধের ভিত্তি। আমাদের মন তাকেই স্বীকার করে নেয়, তাকেই নিশ্চিতরূপে জানে, যাকে সে সত্য রূপেও জানে।

সাহিত্যে 'রূপ' আর 'সত্যতা' অবিচ্ছেদ্য। রূপের মধ্যেই সত্য ব্যক্তিত্ব অর্জন করে, সত্যকে অবলম্বন করেই রূপ নিশ্চিতি পায়। সাহিত্য যে-রূপকে প্রকাশ করে তা আসলে্‌ জগৎ ও জীবনেরই রূপ। সেইজন্যেই সে-রূপের আর-এক নাম সত্য—truth। জীবনের প্রত্যক্ষতা সঞ্চারিত হয় বলেই সাহিত্যের বিষয় এমন সুপ্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সুপ্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সত্যই যুগপৎ truth এবং beauty।

"জীবনের আপন কল্পনার ছাপ নিয়ে আঁকা হয়েছে যে-সব ছবি তারই রেখায় রেখায় রঙে রঙে সকল দেশে সকল কালে মানুষের সাহিত্য পাতায় পাতায় ছেয়ে গেছে। সাহিত্যে যেখানে সত্যকার রূপ জেগে উঠেছে সেখানে ভয় নেই। চেয়ে দেখলে দেখা যায়, কী প্রকাণ্ড সব মূর্তি, কেউ-বা নীচ শকুনির মতো, মন্থরার মতো, কেউ-বা মহৎ ভীমের মতো, দ্রৌপদীর মতো— আশ্চর্য মানুষের অমর কীর্তি জীবনের চির-স্বাক্ষরিত।"

—'সাহিত্যের চিত্রবিভাগ', সাহিত্যের স্বরূপ

'জীবনের চির-স্বাক্ষরিত'— আশা করি এই কথাটাই যথেষ্ট।

এ-মতবাদকে 'অনুকরণবাদ' নামে চিহ্নিত করলে নিশ্চয়ই ভুল করা হবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন ('সাহিত্যের সামগ্রী', সাহিত্য), "তাহা আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি।" বাস্তবের হুবহু অনুকরণের কথা তিনি কখনোই বলেন নি; সে প্রশ্নই ওঠে না। শুধু এইটুকু মনে রাখলেই আমাদের চলবে যে, অনুকরণবাদের মর্মগত তত্ত্বটি যে সত্যনিষ্ঠার দিকে যে রিয়ালিজ্‌মের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব তার প্রতি খুব বিমুখ নয়।

ইভো আন্দ্রিচ

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৬১ সালের নোবেল পুরস্কার য়ুরোপের এক স্বল্প-পরিচিত গোষ্ঠীর একটি সাহিত্যকে অকস্মাৎ গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যুগোস্লাভ লেখক ইভো আন্দ্রিচ (Ivo Andric)। বলকান অঞ্চলের আর কোনো সাহিত্যের এ সৌভাগ্য এখনো পর্যন্ত হয় নি। আন্দ্রিচের সম্মানে যুগোস্লাভিয়া গৌরবান্বিত হয়েছে,— এটা শুধু কথার কথা নয়। যুগোস্লাভিয়ার ইতিহাস ও মর্মবাণী তাঁর রচনার বিষয়বস্তু। আন্দ্রিচের রচনা থেকে যুগোস্লাভ জীবন বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। সুতরাং আন্দ্রিচের সম্মানের অংশ যুগোস্লাভিয়ারও প্রাপ্য।

সুইডিশ আকাদেমি আন্দ্রিচকে পুরস্কৃত করেছেন "for the epic force with which he has depicted themes of human destinies drawn from the history of his country." সাধারণভাবে সমগ্র রচনাবলীর জন্য পুরস্কার দেওয়া হলেও সুইডিশ আকাদেমি বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা' উপন্যাসটির।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর বোসনিয়ার অন্তর্গত ট্রাভনিকের নিকটবর্তী ছোট গ্রাম ডক্‌-এ আন্দ্রিচ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। তিনি ছিলেন স্বল্প মজুরীর কারিগর। সুতরাং মাত্র দু'বছর বয়সে যখন পিতার মৃত্যু হল তখন তাঁর মা চরম সংকটে পড়লেন। এই সংকট এড়াবার জন্য তাঁকে ভিসেগার্ডে চলে আসতে হল। আন্দ্রিচের ছেলেবেলা এখানেই কেটেছে। পরবর্তী জীবনে আন্দ্রিচ ভিসেগার্ডের ইতিহাস ও পরিবেশকে চিরস্মরণীয় করেছেন 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা' উপন্যাসে।

প্রাদেশিক রাজধানী সারাজেভোর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষার জন্য আন্দ্রিচ জাগ্রেব, ভিয়েনা, ক্রাকাভো, গ্রাৎস প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল দর্শনশাস্ত্র। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আন্দ্রিচ গ্রাৎস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

আন্দ্রিচ শিক্ষাজীবনে বাধা পেয়েছিলেন। যুগোস্লাভিয়ার স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর অস্ট্রিয়ান কর্তৃপক্ষ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর তিনি মুক্তি পান। যুগোস্লাভিয়া স্বাধীনতা লাভ করে ১৯১৮ সালে।

যৌবনে আন্দ্রিচের জীবনে দুটি ধারার প্রভাব দেখা যায়। একটি রাজনীতির, অন্যটি সাহিত্যের। যখন আঠারো বছরের তরুণ তখন থেকেই তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ যুগোস্লাভিয়ার প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। পরাধীনতার বেদনা অনেক যুগোস্লাভ তরুণের মতো আন্দ্রিচের জীবন ও সাহিত্য -সাধনাকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। সক্রিয়ভাবে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেও দ্বিধা করেন নি।

দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষা সমাপ্ত করে আন্দ্রিচ রোম, বুখারেস্ট, মাদ্রিদ, জেনিভা প্রভৃতি স্থানের

যুগোস্লাভ দূতাবাসে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় তিনি ছিলেন জার্মানীতে যুগোস্লাভিয়ার দূত। বেলগ্রেড-এ প্রথম জার্মান বোমা পড়বার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে আন্দ্রিচ বার্লিন থেকে স্বদেশে ফিরে এসেছিলেন।

জেলের জীবন হয়তো এক দিক থেকে আন্দ্রিচের মঙ্গলের কারণ হয়েছিল। কারণ জেলের নিঃসঙ্গ দিনগুলি তিনি সাহিত্য চর্চা করে কাটিয়েছেন। জেলে যতদিন ছিলেন ততদিন কবিতা লিখেছেন— অধিকাংশই গদ্য কবিতা। যুগোস্লাভ সাহিত্যে গদ্য কবিতা প্রবর্তনের কৃতিত্ব আন্দ্রিচের। তাঁর বন্দীজীবনের রচনাগুলি 'এক্স পন্টো' এবং 'আনরেস্ট' নামে যথাক্রমে ১৯১৮ ও ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা হিসাবে এদের মূল্য হয়তো খুব বেশি নয়; কবি আন্দ্রিচকে আজ তাঁর দেশের লোকেই ভুলতে বসেছে। কিন্তু আন্দ্রিচের জীবনদর্শন সম্যকরূপে উপলব্ধি করবার জন্য এই কবিতাগুলির বিশেষ মূল্য আছে। জীবনে এত দুঃখ কেন, এই প্রশ্ন বন্দী তরুণকে ব্যাকুল করেছিল। যৌবনারম্ভের এই প্রশ্নের উত্তর তিনি পেয়েছেন অনেক পরে,— তাঁর উপন্যাসের মধ্যে।

জেল থেকে বেরিয়ে আন্দ্রিচ কাব্যচর্চা ত্যাগ করে গদ্য রচনা আরম্ভ করেন। সরকারী চাকরির নানাবিধ দায়িত্বের মধ্যেও তিনি নিয়মিত গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্ব ১৯৩২ সালে শেষ হয়েছে বলা যেতে পারে। এই পর্বে যুগোস্লাভ সাহিত্যে তাঁর দান তিনটি: গদ্য কবিতার প্রবর্তন, সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ এবং কতকগুলি অনবদ্য ছোট গল্পরচনা। ছোট গল্পের কয়েকটি সংকলন বের হবার পর তিনি লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর আন্দ্রিচ উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। যুদ্ধের অনিশ্চয়তা এবং ভয়াবহ পরিবেশ তাঁর সাহিত্যসাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে নি। রাজধানীর লোক যখন বোমার আতঙ্কে শহর ত্যাগ করে যাবার জন্য ব্যগ্র তখন আন্দ্রিচ একান্ত নির্বিকার চিত্তে উপন্যাস লিখেছেন। এক বন্ধু তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, তুমি শহর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে কেন যাচ্ছ না?

আন্দ্রিচ উত্তর দিয়েছিলেন, আমি জানালা দিয়ে পলায়নপর নর-নারীর মিছিলের দিকে চেয়ে থাকি; বেশ লাগে। ওরা কিছু বাঁচাবার জন্য পালাচ্ছে— স্ত্রী, সন্তান, মূল্যবান সম্পত্তি। নিজের জীবন ছাড়া বাঁচাবার মতো আমার কিছু নেই; শুধু নিজের জীবন রক্ষা করবার জন্য পালানো মনুষ্যত্বের অবমাননা ছাড়া কিছু নয়।

আন্দ্রিচ বিয়ে করেছেন ১৯৫৯ সালে; তাঁর বয়স তখন সাতষট্টি।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে আন্দ্রিচের তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে দু'টি— *Bosnian Story* ও *The Bridge on the Drina*—ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদের মাধ্যমে আন্দ্রিচের নাম গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে বিশেষরূপে পরিচিতি লাভ করেছে।

নোবেল কমিটি যে-সব গুণের উল্লেখ করে ডক্টর আন্দ্রিচকে পুরস্কৃত করেছেন উপরোক্ত উপন্যাস দু'টির মধ্যে তাদের সব ক'টিই বর্তমান। বর্তমানের সংকীর্ণতার মধ্যে আমরা খণ্ডিত। ইতিহাসের বিস্তৃতির মধ্যে মানুষের মুক্তি। তাই আন্দ্রিচ সমকালীন জীবনের সমস্যা ও যন্ত্রণার কথা উপন্যাসের বিষয়বস্তু না করে ইতিহাসের ধারার মধ্যে চিরকালীন মানুষের সন্ধান করেছেন। মানবজীবনের যে অংশটুকু শাশ্বত, ইতিহাসের ভাণ্ডারে সেই অংশটুকু সঞ্চিত থাকে। চিরন্তনকে উপলব্ধি করলে বর্তমান জীবনের জটিলতা

ও যন্ত্রণা থেকে উর্ধ্বে ওঠা সম্ভব হয়। শিল্পী হিসাবে আন্দ্রিচ দু'টি মহাযুদ্ধের নিকট ঋণী। কেননা, যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁর দৃষ্টি বর্তমান থেকে অতীতের দিকে ফিরিয়েছে।

১৮০৭ থেকে ১৮১৪ সালের ট্রাভনিকের জীবন ও ইতিহাস 'বোসনিয়ান স্টোরির' বিষয়বস্তু। ট্রাভনিক বোসনিয়ার রাজধানী। ঐ সময় অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের দূত ছিলেন এই শহরে। সাত বছর যাবৎ দুই দূতের মধ্যে প্রাধান্য লাভের জন্য ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলেছে; এই বিরোধ এবং এঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উপন্যাসের বড় আকর্ষণ। অবশ্য স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনের সুখ-দুঃখ এবং বোসনিয়ার ঐতিহাসিক পটভূমিকার গুরুত্বও কাহিনীতে কম নয়।

'বোসনিয়ান স্টোরি' শুধু আঙ্গিকের দিক থেকে বিচার করলে উপন্যাস হিসাবে হয়তো স্বীকৃতিলাভ করবে। কিন্তু 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনায়' উপন্যাসের অনেক লক্ষণই অনুপস্থিত। আন্দ্রিচ এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি নিজেই একে সাধারণ উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করতে দ্বিধা করেছেন। তাঁর মতে 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা' হল 'ক্রনিক্‌ল্‌' বা ঐতিহাসিক কাহিনী।

গল্পরসে সব চেয়ে বেশি সমৃদ্ধ বোধ হয় আন্দ্রিচের 'মিস এক্স' বা 'অজানিতা'। নায়িকা রাইকা ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। অর্থ ভালোবেসে সে মানুষকে দূরে ঠেলে দিয়েছে; ভুলেছে প্রেম, বন্ধুত্ব এবং সকল সহজ মানবীয় সম্পর্ক। তার কেবল সন্দেহ হৃদয়ের সম্পর্ক স্বীকার করলে সঞ্চিত অর্থের ভাণ্ডারের দিকে লোলুপ হাত প্রসারিত হবে।

কিন্তু 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা' এপিক-গুণে এবং জীবনদর্শনের গভীরতায় আন্দ্রিচের শ্রেষ্ঠ রচনা। ড্রিনা নদী বোসনিয়া ও সার্বিয়ার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। প্রায় চার শ বছর পূর্বে ভিসেগার্ড শহরের নিকটে একটি পাথরের পুল তৈরি করা হল। নদীর দুই তীরের মধ্যে স্থাপিত হল নিবিড় সম্পর্ক। কাহিনীর শুরু হয়েছে ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছর একদল খ্রীস্টান বালককে বোসনিয়া থেকে অটোম্যান সাম্রাজ্যের সুলতানের নিকট উপস্থিত করা হয়েছিল। এই বন্দী বালকদের বোসনিয়া পাঠিয়েছে সুলতানের কর হিসাবে। এই দলের একটি বালক কালক্রমে সুলতানের খুব প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠে। মহম্মদ পাশা সকোলি নামে সে পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত। মহম্মদ পাশা একদিন স্বপ্নে আদেশ পেল যে ড্রিনা নদীর উপর একটি পাথরের পুল তৈরি করে দিলে অনেক বছর যাবৎ বুকের যন্ত্রণায় যে কষ্ট হচ্ছে তা দূর হয়ে যাবে। পুল তৈরি হল মহম্মদ পাশার টাকায়। শহরের নর-নারীর জীবন পুলের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়তে লাগল ধীরে ধীরে। পুলের নীচে দিয়ে বয়ে যায় জলের স্রোত, উপর দিয়ে চলে মানুষের স্রোত। এদেরই মধ্যে কয়েকটি চরিত্রকে আন্দ্রিচ জীবন্ত করে তুলেছেন অল্প কয়েকটি কথায়। মিছিলের মুখের মত এরা কিছুক্ষণের জন্য দেখা দিয়ে হারিয়ে যায়; পূর্ণতর করবার জন্য লেখক এদের ধরে রাখেন নি।

যে পরিবারের উপর মহম্মদ পাশা পুল দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়েছিল তার শেষ বংশধর আলিহোজার এই পুলের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিল না। পারিবারিক ঐতিহ্য থেকেই সে পেয়েছে বিশ্বাসের দৃঢ়তা। কিন্তু প্রথম-মহাযুদ্ধের শুরুতেই কামানের গোলার আঘাতে যখন পুল ভেঙে পড়ল তখন বিশ্বাসভঙ্গের আঘাত সহ্য করা সম্ভব হল না তার পক্ষে। বৃদ্ধ আলিহোজা বাড়ি ফেরার পথে মুখ থুবড়ে পড়ে প্রাণ হারাল।

আত্মসচেতনতা এবং গভীর দুঃখবাদের দ্বারা আন্দ্রিচের প্রথম পর্বের রচনা চিহ্নিত। এর কারণ ছিল। দরিদ্র পরিবারে জন্মাবধি আন্দ্রিচকে নানা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। মাত্র দু বছর বয়সে পিতৃহীন হওয়ায়

যতদিন পর্যন্ত উপার্জনক্ষম হতে পারেন নি ততদিন পর্যন্ত তাঁর দারিদ্র্যের জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার উপায় ছিল না। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল এবং ত্রিশ বছর পর্যন্ত নানা রোগে ভুগেছেন। যৌবনের কতকগুলি অমূল্য বৎসর কারাগারের অন্তরালে কাটাতে হয়েছে বলেও আন্দ্রিচের মন তিক্ত হয়ে উঠেছিল। এই দুঃখবাদ দৃঢ়তর করতে সহায়তা করেছে কির্কেগারের রচনা, জেলে যা ছিল আন্দ্রিচের একমাত্র সঙ্গী। তাই 'এক্স পন্টো'তে আন্দ্রিচ লিখেছেন: "There is no truth but one: pain; no reality but suffering; pain and suffering in every drop of water, every blade of grass, every facet of a crystal, every sound of the living voice, in sleep and in waking, in life, before life, and perhaps also after life."

সমকালীন জীবনে এই সর্বব্যাপী বেদনার জ্বালা তীব্রতর। ইতিহাসে জ্বালা নেই। তাই আন্দ্রিচ বর্তমানকে এড়িয়ে ইতিহাসের বিস্তৃত পরিসরে বিচরণ করতে ভালোবাসেন। ইতিহাস-প্রীতির আরও একটি কারণ কাছে। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মানব-জীবনের শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। জীবন-যন্ত্রণা অনেকটা লঘু হতে পারে যদি ইতিহাসের শিক্ষা থেকে বুঝতে পারি—"evils have always been, and every one in its time seemed the greatest; but life is indestructible, and its ravages, from any wider perspective of time, are as short as a little, unpleasant dream."

'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'য় আন্দ্রিচের গভীর মানবিকতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম জীবনের তিক্ততা আর নেই। আন্দ্রিচ এখানে জীবনধারার নিরাসক্ত দর্শক। এখন তিনি মানুষ সম্বন্ধে আস্থাবান। আলিহোজার জীবনের চরম আঘাত এসেছিল মানুষের পরিবর্তে পুলের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবার ফলে।

ভগবানের শুভেচ্ছা সম্বন্ধেও আন্দ্রিচ আস্থাশীল হয়েছেন। ড্রিনা নদীর পুল ভেঙেছে বলে হতাশ হবার কিছু নেই। কারণ, if they destroy here, then somewhere else someone else is building. If God had abandoned this unlucky town on the Drina, he had surely not abandoned the whole world that was beneath the skies."

নদী এবং পুল 'দি ব্রিজ অন দি ড্রিনা'য় বিশেষরূপে প্রাধান্যলাভ করলেও আন্দ্রিচ তাঁর অনেক রচনায় এই দুটিকে প্রতীক হিসাবে বারবার ব্যবহার করেছেন। নদী ইতিহাসের জটিল ধারার প্রতীক; পুল নিঃসঙ্গ আত্মার অন্যের সঙ্গে যোগস্থাপনের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

আন্দ্রিচ শিল্পী হিসাবে একান্ত সচেতন। প্রত্যেকটি শব্দ অনেক চিন্তার পর তিনি প্রয়োগ করেন। শোনা যায়, 'অভিশপ্ত অঙ্গন' নামে একটি বড় গল্পের চরম রূপ দিতে তাঁর লেগেছে ত্রিশ বছর। আটাত্তর পৃষ্ঠার এই রচনাটির জন্য তিনি দু'শ পৃষ্ঠার নোট ও খসড়া লিখেছেন।

আন্দ্রিচের প্রধান দুটি উপন্যাসের কোনো চরিত্রই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে নায়কের স্থান অধিকার করতে পারে নি। কারণ কাহিনীর প্রকৃত নায়ক ইতিহাস। ইতিহাসের দুর্নিবার স্রোতের মুখে আন্দ্রিচের পাত্র-পাত্রীরা নিরুপায়; নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষমতা তাদের হাতে নেই। ইতিহাসের ক্রীড়নক এই-সব নর-নারীর বেদনাক্ষুব্ধ নিরুপায় জীবনের চিত্র আন্দ্রিচ এঁকেছেন গভীর মমতার সঙ্গে।

ইভো আন্দ্রিচ

স্যাঁ-জন প্যার্স

স্যাঁ-জন প্যার্স

শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ফরাসি কবি স্যাঁ-জন প্যার্স Saint-John Perse, এই নাম তাঁর কবি-পরিচয়ের ছদ্মনাম। কর্মক্ষেত্রে রাজনীতি-সম্পৃক্ত জীবনে তাঁর নাম ছিল Alexis St. Léger Léger বা সংক্ষেপে Alexis Léger। প্যার্স কী গুণের কবি তাঁর কাব্য প্রকৃতির কী বৈশিষ্ট্য তা আলোচনা করবার পূর্বে তাঁর বিচিত্র জীবনকাহিনীর দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যাক।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এক দ্বীপপুঞ্জ গুয়াদ্‌লুপ (Guadeloupe)। এখানে প্যার্স জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে। পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ধরে প্যার্সের পিতা হয়েছিলেন আইনজীবী। তাঁর মা যে-বংশের দুহিতা তাঁরা কয় পুরুষ ধরে প্ল্যাণ্টার্স এবং নৌ-কর্মচারী। এককালে তাঁর সুদূর-আত্মীয়রা ছিলেন খোদ ফরাসিদেশের বুর্‌গোঞ (Bourgogne) এবং নরমাঁদির (Normandie) অধিবাসী। প্যার্সের বাল্যশিক্ষা কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের স্থানীয় বিদ্যালয়ে। ইস্কুল থেকে অবকাশ পেলেই তিনি গিয়ে হাজির হতেন নিজেদের পৈত্রিক চাষবাসের জমিতে— এই রকমের সুযোগে তাঁর হাতেখড়ি নৌ-চালনায় এবং অশ্বারোহণে।

এগারো বছর বয়সের বালক প্যার্স প্রথম ফরাসিদেশে পদার্পণ করলেন ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে। পো'র (Pau) বিদ্যালয়ে প্রথম পাঠ— ব্যাকরণের আদিকাণ্ড— তাঁর আরম্ভ হল। এখানে অবস্থানকালে তাঁর পরিচয় হয় ভালেরী লারবো-র (Valéry Larbaud) সঙ্গে, নিবিড় অন্তরঙ্গতা জন্মে ফ্রান্সিস যা-ম'র (Francis Jammes) সঙ্গে। এই শেষোক্ত অন্তরঙ্গের সাহচর্যে তিনি পরে ফরাসিদেশের বাস্ক অঞ্চল (pays basque) পর্যটন করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টাদশ পদাতিক বাহিনীতে যোগ দেন এবং এক বছর শিক্ষার পর ফরাসি-হিস্পানী সীমান্তে কেল্লা পোর্তালোতে প্রেরিত হন। বৎসরান্তে তিনি আবার ফিরে আসেন বর্দো-য় (Bordeaux)— অসমাপ্ত বিদ্যাচর্চার জের টানতে। আইনের অলিগলি, বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা, সাহিত্যকলার ইন্দ্রজাল— সবেরই দিকে তাঁর সমান প্রবল আকর্ষণ। সমুচ্চ গ্রীক চিন্তা তাঁর প্রিয়, মানসিক বিকার-ব্যাধি-সমস্যা তাঁর প্রিয়, আবার প্রিয় বিষয় তাঁর অসিযুদ্ধ (escrime বা fencing)। অধ্যয়নে যেমন তাঁর উদ্যম, তেমনি ছুটি পেলে সমান উৎসাহে ছুটে যান ভূতত্ত্বের আহ্বানে, পর্বতারোহণের জন্য পিরেনিজের শৈলশিখরে। এর পর এক সময় এল নির্বাচন করবার; পারদর্শিতা অর্জনের জন্য বিষয়-সংকোচের — তিনি মনোনীত করলেন আইন এবং রাজনীতিবিজ্ঞান। ১৯০৮ থেকে ১৯১৩-র মধ্যে আইন অধ্যয়নের ফাঁকে তিনি ঘুরে দেখে এলেন স্পেন এবং জর্মনী। এরকম এক অল্পস্থায়ী ইংলণ্ড-প্রবাসকালে স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক জোসেফ কনরাডের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। স্বদেশে এসে বৈদেশিক দপ্তরে তিনি চাকুরী গ্রহণ করেন। এ পদে তাঁকে অধিষ্ঠিত থাকতে হয় ১৯২১ পর্যন্ত। প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে প্যার্স দর্শন করেন চীন কোরিয়া জাপান মঙ্গোলিয়া এবং মধ্য-এশিয়া। পলিনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জও তাঁর দৃষ্টির বাহিরে থাকে নি। চাকুরির ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র দপ্তরে ক্রমে তিনি সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মতানৈক্যের জন্য তিনি চাকুরি ত্যাগ করেন। জুন মাসে ফ্রান্স ত্যাগ করে ইংলণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হন।

সেখান থেকে ১৪ই জুলাই ওয়াশিংটনে গিয়ে পৌছান। সেই বৎসরই ভিশী সরকার (Vichy Government) তাঁর দেশীয় নাগরিক অধিকার বাতিল করেন। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে তিনি ওয়াশিংটনে স্থায়ী বাসিন্দা হন। এই সময়ে বরাবরের মত তিনি রাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করেন।

১৯৫৯ সালে তাঁর সৌভাগ্য হল দুটি পুরস্কার লাভ করবার— এক, দ্বিবাৎসরিক কবি-সভার অভিনন্দন, আর তার দুই মাস পরে আঁদ্রে মালরো-র হাত থেকে Grand prix national।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশের মাটিতে বাসকালীন প্রকাশ হল, তাঁর *Chronique* বা ইতিবৃত্ত— ফরাসির কবি তখন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়ে বন্দিত হলেন উদার ভুবনে বিশ্বের কবিরূপে।

প্যার্সের গ্রন্থাবলী কালক্রম অনুসারে এই: *Eloges* (প্রশংসা) ১৯১১, *Anabase* (অভিযান) ১৯২৪, *Exil* (নির্বাসন) ১৯৪২, *Vents* (হাওয়া) ১৯৪৬, *Amers* (দলযাত্রীর দিগ্‌দর্শক) ১৯৫৭, *Chronique* (ইতিবৃত্ত) ১৯৬০।

প্যার্সের কাব্যের প্রধান আকর্ষণ ও লক্ষণীয় উপাদান হল বিস্তার। বস্তুত আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির একটি মূল বা মুখ্য ধারাই ব্যাপকতা প্রসার, একটা সার্বভৌম পদবী ও বিশ্বগত সত্য আবিষ্কার করা; সাহিত্যেও ভাবে অনুভবে একটা বিশ্বব্যাপকতাতে পৌছবার প্রয়াস আছে, কাব্যের ভাষায় স্থূলত তা আধুনিক এলিয়টে জ্বলন্তরূপে দেখা দিয়েছে। এলিয়টে বহু ভাষার সংমিশ্রণ এক পৃথিবীতে নানা মহাদেশের মত— পৃথিবী এক হলেও দেশান্তরের সীমারেখাগুলি প্রত্যক্ষগোচর। সেখানে তাদের নানাত্বের হার্মনি উচ্চকিত কনট্রাস্টের মধ্যে বাঁধা। প্যার্স তাঁর কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন বহু বিচিত্র বিষয়ের উপর, সভ্যতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী মালিক শ্বেতকায়দের সঙ্গে তথাকথিত অসভ্য প্রত্যন্তবাসী কৃষ্ণকায়দের উপর, চিন্তারাজ্যে বিবিধ বিষয়ের উপর। তাঁর বাণীশিল্পে এলিয়টী ধরণে বহু দেশের ভাষা হুবহু তুলে বসিয়ে দেওয়া নেই— সেখানে বহু দেশের বহুবিধ চিন্তার স্রোত এসে একত্রে মিশেছে, যদিও উপরে বা বাহিরে রয়েছে ফরাসি আবরণটি। ভালেরী বলেছিলেন, "কঠিন হল দেখা নয়, তা হল যা সব দেখতে পাওয়া তাদের সুসম্বদ্ধ করে ধরা।"[১] প্যার্স এই কঠিনের সাধনায় উত্তীর্ণ—

পামগাছ! আর মধুর তার
বুড়ো শিকড়জাল! · মৌসুমী বায়ুর নিঃশ্বাস,
বুনো পায়রার ঝাঁক আর বনবেড়াল
কাটছে বিস্বাদ পত্রগুচ্ছ যার মধ্যে, প্রলয়গন্ধী
এক সন্ধ্যার বর্বরতায়,
গোলাপী আর সবুজ চাঁদরা ঝুলছে আমের মতো।[২]

---

১ "Le difficile n'est pas de trouver mais de s'ajouter ce qu'on trouve . . ."

২ Palmes! and the sweetness
of an aging of roots! . . . the breath of trade winds,
wild doves and the feral cat
piercing the bitter foliage where, in the rawness of an
evening with an odour of Deluge
moons, rose and green, were hanging like mangoes,

পূর্ব আর পশ্চিমের প্রকৃতি কি মিশে অনবদ্য এক হয়ে যায় নি এর মধ্যে? অতীত সংস্কারের ঘোরে দেখা দিগন্ত কি অকস্মাৎ বিস্তৃততর হয়ে বিলীন হয়ে যায় নি অসীমে? এই প্রসার আসলে কবিচেতনার প্রসারেরই প্রতিফলন, তাঁর আন্তর ব্যাপ্তিরই প্রতিবিম্ব। তাই তো কবি এত সহজে বলতে পারলেন সুন্দরের মর্মোদ্ঘাটন করে তার নিভৃত রহস্যটি—

আমাদের নখের ঢালুতে এক টুকরা আকাশ নীলিম হয়ে উঠছে· ·

আর ফরাসিতে শুনুন সূক্ষ্ম অনুরণনটি সহ—

Un peut de ciel bleuit au versant de nos ongles···

সুইডিশ আকাদেমী নোবেল পুরস্কারের মুখবন্ধ হিসাবে কবিকে যে গুণপত্র দিয়েছেন—"For the soaring flight and the evocative imagery of his poetry"—তারই প্রতিধ্বনি পাই এখানে।

আরো শুনুন গাঢ় হীরকখণ্ডের মত অল্পের মধ্যে কতখানি দীপ্তি বিকিরণ করে—

কতবার জন্ম হল আমাদের, দিনের এই অশেষ বিস্তারে[৩]

এর পর আবার যেখানে কবি নিয়ে চলেছেন ঝুলনঘণ্টাধ্বনির রেশ ধরে—

জ্যোৎস্নায় তরঙ্গভঙ্গ মনে পড়ায় তুমি কাঁদলে ; তুমি কাঁদলে আরো
দূরান্তবাসী কত তটের বেণুসুর মনে করে ; রাত্রির ঘুমন্ত ডানার নীচে
উত্থিত আর মথিত সেই অলোকসংগীত মনে করে
যা পরম্পরাশ্রিত বলয়রেখাগুলির মত শঙ্খের অঙ্গে ঢেউ-
পরম্পরা কিম্বা সমুদ্রগর্ভে কোলাহলের এক স্ফুটতর ভাষা।[৪]

কিম্বা আরও যখন তিনি বলছেন—

পশ্চিমে আকাশ সাজ পরেছে ধনী খলিফার মত, ধরণী তার
আঙুরক্ষেত ধুয়ে দিয়েছে বক্সাইটের লালে, আর মানুষ স্নান করে
উঠেছে রাত্রির মদিরায় : রসকার তার বিপনির সামনে, কামার তার
কামারশালার সম্মুখে, আর ঠেলাগাড়ির বাহক ফোয়ারাদের ঘিরে
চৌবাচ্চার পাথুরে দেয়ালে হেলান দিয়ে।[৫]

কবিত্বের ভাষা সেখানে সুঠাম সুডৌল, লিরিকের মসৃণ ঝংকারে অনুরণিত। মাধুর্যের দিক দিয়ে—প্রায় একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাধুর্যের দিক দিয়ে, অনুভবের কোমল আবেদনের দিক দিয়ে—মানুষের এ এত কাছের কাব্য যে প্রায় আমাদের বৈষ্ণবীয় পদবাচ্য বলতে ইচ্ছা করে। তবে এই আধুনিক বৈষ্ণব মধুরিমার মধ্যে আণবিক বৈজ্ঞানিক চেতনা এসে সব বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়েছে। একটু ব্যাখ্যা করি তা হলে।

---

৩ Car maintes fois sommes-nous nés, dans Pétendue sans fin du jour.

৪ You wept to remember the surf in the moonlight, the whistlings of the more distant shores; the strange music that is born and is muffled under the folded wing of the night, like the linked circles that are the waves of a conch, or the amplifications of the clamours under the sea . . .

৫ Le Ciel en Ouest se vêt comme un Khalife, la terre lave ses vignes au rouge de bauxite, et l'homme se lave au vin de nuit: le tonnelier devant son chai, le forgeron devant sa forge, et le roulier penché sur l'auge de pierre des fontaines.

এ-পর্যন্ত কবি ছিলেন সৌন্দর্যপ্রিয়, রূপের পসারী, রসের ব্যাপারী। কিন্তু দুনিয়াতে রূপ আলো কতখানি দেখি? অন্ধকারই কি বেশি নয়? কবির aesthetic sense-এর কাছে এটা একটা রূঢ় আঘাত, তাই তিনি বিদ্রোহভরে হঠাৎ বলে ওঠেন 'মূক ভগবান' (Dieu se tait), 'অন্ধ ভগবান' (Dieu aveugle)—এমন-কি, দুরন্ত অভিমানভরে এক সময়ে স্বর্গে লঙ্কাকাণ্ড বাধাবার বাসনায় ছুঁড়ে দিতে চান জ্বলন্ত মশাল ওই তাঁর আকাশের খড়ের গাদায়!

> Voici d'un ciel de paille où lancer, ô lancer! à tour
> de bras la torche! ৬

কিন্তু এ হল তাঁর যাত্রারম্ভের গান—অর্থাৎ যতক্ষণ ছিলেন নেহাৎই কবি, নিছকই ভাবরূপের কারবারী—'স্বরূপকৃত্‌'। এর পর জিজ্ঞাসা দ্বন্দ্ব নিয়ে তিনি হলেন জীবনশিল্পী; অর্থাৎ কবি এবং মানুষ, দ্রষ্টা এবং কর্মী। কারণ, তাঁর কাব্যের ব্যাখ্যাই হল—'Poetry is not only a way of knowledge; it is even more a way of life—of life in its totality'। এই পূর্ণজীবনের সাক্ষাৎকার হয় কী রকমে, কী রকমে মানুষের জ্ঞান তার বর্তমানের সীমা ক্রমে অতিক্রম করে চলে? কবি বলছেন, সে তার অন্তরের আলোয়, সম্বোধির উদ্ভাসে ("intuition to come to the rescue of reason"), হৃদ্‌পুরুষের চাপে। চরম পরীক্ষার মুহূর্তে বৈজ্ঞানিকও এই আলোর প্রকাশ কামনা করেছেন। একেই কবি বলেছেন দেহমন্দিরে দেব-সান্নিধ্য, এরই কল্যাণে মর্তাধারে অমৃতের স্পর্শ। কবির সাধনা তাই গুহাহিত অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে ধরে এক আত্মগঠন—intégralité psychique—তাঁর বাণী ধরবে পরমপুরুষেরই ছন্দ। এবার শুনুন কবির কণ্ঠে কি আত্মস্থ সুর, কি স্থিতপ্রজ্ঞ বাক—

> তুমি সমস্তকে এনে দিয়েছ আত্মার উষ্ণতা, ওগো সাগরের সঞ্চল
> সম্পদ, সেই তুমি পৃথিবীর উপর এক সন্ধ্যায় বলবে কি কার হাত
> আমাদের অঙ্গে পরিয়ে দিয়েছে রূপকথার এমন জ্বলন্ত পোশাক,
> এবং আমাদের সৌভাগ্যের জন্য কি আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য কোন্
> পাতাল থেকে উৎসারিত হয়ে এল আরক্ত ঊষা—আমাদের ভিতরে
> এই ভাগবত অংশই ছিল আমাদের অন্ধকারেরই ভাগ হয়ে?.. ৭

কিম্বা এই যেখানে তাঁর অন্তর মথিত করে উঠেছে মর্তমানুষের আকাঙ্ক্ষা—

> আর, আর দেখা দেয় যেন এক পুরোধা জনগোষ্ঠী, পৃথিবীর উপর
> সুউচ্চ তরুরাজি থেকে, একদল মহান আত্মার সহযোগে এক
> উপজাতির মত, যারা তাদের মন্ত্রণাসভায় নেবে আমাদের ডেকে.. ৮

---

৬ Behold, what a sky of straw into which to hurl, O hurl! with all one's might the torch!

৭ O vous qui meniez à tout ce vif de l'âme, fortune errante sur les eaux, nous direz-vous un soir sur terre quelle main nous vêt de cette tunique ardente de la fable, et de quels fonds d'abîmes, nous vint à mal, toute cette montée d'aube rougissante, et cette part en nous divine fut notre part de ténèbres?

৮ Ah! may an élite also arise, of very tall trees on the earth, like a tribe of great souls that shall hold us of their council . . .—*Chronique*.

কিম্বা যেখানে কবির শুরু হয়ে গিয়েছে অন্তর্যাত্রা— spiritual adventure—

ওগো বিভাবরী, শোনো, নিঝুম অঙ্গনে আর নিরালা তোরণের তলায়,
পবিত্র ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আর জীর্ণ উইঢিবিচূর্ণের মাঝে নীড়হারা
আত্মার নিরঙ্কুশ দীঘল পদক্ষেপ,· ·[৯]

এখানে কি পাই না আস্তিক্য প্রতীতির শান্তরসসিক্ত বাণী— রাসীন ও আনাতোল ফ্রাঁসের প্রতিধ্বনি ? কবি এবার ফিরেছেন অন্তরাত্মার সন্ধানে— তাই তো তিনি শুনছেন,

এই এখানে পৃথিবী ঘিরে গুমরে উঠছে এক বিরাট কলরোল,
চতুর্দিক থেকে সবলে ঘিরে উঠল যেন অন্তরাত্মার বিদ্রোহ।· ·[১০]

তাই তিনি দেখেছেন রুদ্রের দক্ষিণ মুখ— প্রলয়নৃত্য মাঝে নটরাজের উত্তোলিত অভয়পাণি।

প্যার্সের কাব্যপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্পেণ্ডার বলেছেন যে এর মধ্যে দুই বিপরীত ধারার সার্থক সমন্বয় ঘটেছে— বাইবেলের উপচিত ঐশ্বর্যের সঙ্গে (বাইবেলের পদ্যরসান্বিত গদ্যধারাও গ্রহণ করেছেন তিনি) গ্রীক ভাস্কর্যের সুষীম অঙ্গরেখা এবং নিটোল উচ্ছ্বসিত তনু। তবে সমস্তের মধ্যে, বহুবিধ ধারার মধ্যে তিনি তাঁর কূটস্থ আশ্রয়স্বরূপ নিজস্বত্বটি ঠিক বজায় রেখেছেন— আপন আত্মস্থতা। এইটিই প্রত্যেক শিল্পীকে দেয় তার আপন মূল্য ও মর্যাদা। পুরাণী প্রজ্ঞা বলেছে, চক্র চারি দিকে ঘুরে চলে, ভার বহন করে অক্ষসমূহও আবর্তিত হয়ে চলে কিন্তু চক্রের কেন্দ্রস্থ নাভি অটল।[১১] মনে হয় প্যার্স এই রহস্যের গূঢ়ার্থ ধরতে পেরেছিলেন তাঁর কাব্যজীবন-সাধনায়।

৯ Listen, O night, in the deserted courtyards and under the solitary arches, amid the holy ruins and the crumbling of old termite hills, hear the great sovereign footfalls of the soul without a lair . . .—*Chronique*.

১০ And here, a great murmur is rising around the like an insurrection of the soul . . .

১১ পঞ্চারে চক্রে পরিবর্তমানে তস্মিন্না তস্থুর্ভবনানি বিশ্বা
তস্য নাক্ষস্তপ্যতে ভুরিভারঃ সনাদেব ন শীর্যতে সনাভিঃ।—ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১৩

আলোচনা

'বাংলা ভাষার স্বর ও ছন্দ'

বিশ্বভারতী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

বিশ্বভারতী পত্রিকায় ষোড়শ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮২ শক, শ্রীযুক্ত পুণ্যশ্লোক রায় 'বাংলা ভাষার স্বর ও ছন্দ' নামে যে প্রবন্ধ লিখেছেন সে সম্পর্কে একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে আমার কিছু বক্তব্য আছে। বাংলা ছন্দ বিচারে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের প্রয়োগ বিশেষ প্রশংসার বিষয় এবং বিশেষ বিতর্কের বিষয়ও বটে। তাই আমরা যারা সাধারণ পাঠক তারা এই প্রবন্ধটি পড়তে গিয়ে প্রথম বাধার সম্মুখীন হই 'স্বর' 'আক্রম' 'যতি' ইত্যাদি পরিভাষার ক্ষেত্রে। কারণ এই শব্দগুলি self explanatory নয়। তা ছাড়া লেখক যখন "অতি আধুনিক ভাষাতত্ত্বের" প্রসঙ্গ তুলেছেন তখন এই শব্দগুলিকে ব্যাখ্যা করা ও তাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করা অবশ্য প্রয়োজন। তিনি কোন শব্দকে কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন তা যদি স্পষ্ট না হয় তা হলে স্বভাবতই তাঁর বক্তব্যও স্পষ্ট হতে পারে না। একটি উদাহরণ দিচ্ছি: তিনি ৩৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "কিন্তু 'বর্ষাকাল একেবারে' বাক্যটাতে" ইত্যাদি— প্রশ্ন হল 'বর্ষাকাল একেবারে'—এটি কি 'বাক্য'? 'বাক্য' বলে মেনে নিতে বাধা নেই—কিন্তু অন্তত কাজ চালানোর মত একটা সংজ্ঞা দেওয়া দরকার। আমি জানি বাক্যের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন—কিন্তু লেখক যখন বাংলা ছন্দ নিয়ে লিখছেন অর্থাৎ লিখিত ভাষা নিয়ে আলোচনা করছেন তখন বাক্য সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা কঠিন ছিল না।

এই প্রবন্ধে লেখক ছেদ দুই ভাগে ভাগ করেছেন—নাম দিয়েছেন p ও q. প্রথম ছেদের পরেও যেন উক্তি শেষ হয় না—কিন্তু দ্বিতীয়টিতে উক্তি সম্পূর্ণ হল মনে হয়। এ ছাড়া অন্য কোন যতি বা ছেদ তিনি স্বীকার করছেন না। আমার প্রশ্ন হল: চোখ গেল [পাখি] আর [উঃ আমার] চোখ গেল; কিংবা ডাক্তার [ডাকো] আর **ডাক-তার** [বিভাগ] কিংবা **নীলমণি** [ভাবছিল] আর [রাজার মুকুটে] **নীলমণি**— ইত্যাদি শব্দসমষ্টির মধ্যে নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দগুলির মধ্যে minimal পার্থক্য কোথায়? আমি মনে করি ছেদে—ভাষাবিজ্ঞানীদের অনুসরণে /+/ এইভাবে চিহ্নিত করতে পারি। এখানে উল্লিখিত শব্দগুচ্ছগুলির পার্থক্য নিশ্চয়ই শুধু "স্বর, বল বা দৈর্ঘ্য" সংক্রান্ত নয়।

লেখকের 'স্বরবিচার' সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতার অভিযোগ করছি। ধরা যাক "আপনি এলেন?" এই উক্তির তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর বিচার মত। কিন্তু "আপনি এলেন?" এই উক্তিটি intonationএর পরিবর্তনের ফলে দুটি ভিন্ন রূপ নিতে পারে—যেমন

— · ·/   /· ·/

আপনি এলেন?   আপনি এলেন?

কাজেই উক্তিটির ছক দুটি হয়—তা হলে তিনি একটি ছক দিতে পারেন না—intonationএর অন্যদিক তাঁকে বিচার করতে হবে। বাংলায় দু-একটিক্ষেত্রে intonation ছাড়া অন্য কোন formal উপায় নেই যাতে করে শব্দের পার্থক্য করা চলে—যেমন

এসোনা [আদেশ] এবং এসোনা [অনুরোধ]— এখানে অর্থগত পার্থক্য বিরাট। এইসবক্ষেত্রে তা হলে তাঁর ছক কীরূপ নেবে। তিনি বাংলা বাক্যকে আদেশ, অনুরোধ, বিস্ময় ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করছেন— এগুলির formal criteria কী তা জানতে ইচ্ছে করে। তাতে অন্তত পাঠকের [যারা আমারই মত আধুনিক ভাষাতত্ত্বের জটিলতা বোঝে না] সুবিধে হয়। আমি জানিনা লেখক Archibald Hillএর *Linguistic Structures of English* নামক গ্রন্থটির দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হয়েছেন কি না— কিন্তু আলোচনাপদ্ধতির যান্ত্রিকতা দেখে মনে হয় যে তিনি বাংলা উক্তিগুলিকে ছাঁচে ফেলবার কঠিন চেষ্টা করছেন। যেমন [ধরতে] পারেনা এবং "এটা কী করল" এই দুটি উক্তিকেই তিনি একই ছাঁচের অন্তর্গত করেছেন। তিনি বিস্ময়, বিরক্তি বা চ্যালেঞ্জ সবগুলিরই একটি ছাঁচ দিয়েছেন। অবশ্য প্রথমেই formally তাঁর দেখানো উচিত "বিস্ময়, বিরক্তি বা চ্যালেঞ্জ" বলতে তিনি কী বলছেন।

৩৪৬ পৃষ্ঠায় বলছেন এরা "সমাস বা ফ্রেজের" মধ্যে পার্থক্য চিনিয়ে দেয়। এখানেও আবার প্রশ্ন সমাস বা ফ্রেজ মানে কি? তিনি সমাস এবং ফ্রেজ সমার্থক মনে করছেন? তিনি কি বলছেন যে এই ধরণের ছেদ দুটি সমাসের মধ্যে পার্থক্য দেখায় অথবা দুটি ফ্রেজের মধ্যে পার্থক্য দেখায়? সমাস চিনবার অন্য ভালো criteria আছে— Compound must be morphologically isolated from a parallel syntactic group [Hans Marchand— *Notes on Nominal Compounds in Present day English*— Word, XI (1955), p 228]

ব্লুমফিল্ড accentuationএরই উপরে জোর দিয়েছেন সমাস চেনার জন্য। (Language, p 228)। 'পুতুল খেলি' ও 'রবীন্দ্রজীবনীর' পার্থক্য চেনা যায় accentuationএ।

এ তো গেল মূলত পরিভাষা ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে মন্তব্য— কিন্তু এই পদ্ধতির প্রয়োগে বাংলা ছন্দের পুনর্বিচার হল কতটুকু। হয়তো পুণ্যশ্লোকবাবু পরে তা করবেন— কিন্তু এখনও পর্যন্ত বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়োগের ফল আশাপ্রদ বলে মনে হল না। পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেছেন দ্রুত উচ্চারণে ভবানীপুর ভনিপুর হয়ে যায় ইত্যাদি— এগুলি কতটা প্রাসঙ্গিক। এইরকম পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আমার প্রশ্ন নয়— আমার প্রশ্ন হল— বাংলা ছন্দের আলোচনায় (তা গদ্যের হোক বা পদ্যের হোক) যেখানে প্রতিটি শব্দই সচেতনভাবে উচ্চারণের ফলেই শব্দসংগীত তথা ছন্দ সৃষ্টি হয় সেখানে ঐ প্রবণতার প্রশ্ন উঠতে পারে কি?

আশা করি আমার এই মন্তব্যগুলি বিচার করে দেখবেন। শ্রীযুক্ত পুণ্যশ্লোক রায়ের প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উপভোগ্য এবং চিন্তাপূর্ণ— এই কথা স্মরণ রেখেই এইসব মন্তব্য করলাম। লেখককে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড অ্যাফ্রিকান স্টাডিজ। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় শিশিরকুমার দাশ

১৫ নবেম্বর ১৯৬১

লেখকের উত্তর

বিশ্বভারতী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দাশ যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন সেগুলি বিবেচনার যোগ্য এবং ধন্যবাদার্হ। উত্তর দিতে চেষ্টা করছি, যদিও স্বীকার করছি যে সম্পূর্ণ উত্তরদান তখনি সম্ভব হবে যখন বাংলা ভাষার সুর ও ছন্দ বিষয়ে একটা আস্ত বই লেখার অবসর ও ক্ষমতা আসবে।

পরিভাষানির্বাচনের দোষ মানতে কিছুদূর যাব। কোনো নতুন ধারণা প্রকাশ করতে চাইলেই পরিভাষা বানাতে হয়। প্রত্যেকটার সংজ্ঞা দিতে গেলে কথা বড্ড বাড়ে। যতদূর সম্ভব পাঠকের অনুভূতির সাহায্য নিতে চাওয়া নীতির দিক থেকে দোষের নয়। অবশ্য এ হতে পারে, যে বিশেষ পরিভাষা কয়েকটা ব্যবহার করেছি, সেগুলি সুষ্ঠু হয় নি। একটা বড় দোষ শিশিরবাবু লক্ষ্য নিশ্চয়ই করেছেন, কিন্তু মন্তব্য করেন নি। আমার ব্যবহৃত চিহ্নগুলি প্রচলিত নয়, স্বকীয়। এ স্বকীয়তার খুব কিছু দরকার ছিল না।

পদ্ধতির দোষ মানতে বেশি দূর যাব না। সমাস বা ফ্রেজ, আদেশ বা বিস্ময়, এ ধরণের পার্থক্য যে ধ্বনিময় রূপাবলীতে প্রকাশিত হবেই তা মোটেই সত্য নয়। ব্যাকরণ ও ধ্বনিতত্ত্ব এক নয়। "তুমি কোথায় গেছলে ?" আর "তুমি যেথায় গেছলে।" স্বরের দিক থেকে পৃথক করা অসম্ভব, যদিও ব্যাকরণের রূপে নিশ্চয় এক নয়। Hillএর কথা তুলে শিশিরবাবু আমাকে সম্মানিত করেছেন। উক্ত প্রবন্ধ রচনা করা গেছিল Hillএর গ্রন্থ পড়তে পাবার আগেই, এমনকি Hillএর গুরু Tragerএর প্রবর্তিত তত্ত্ব ভালোভাবে জানবারও আগে। ক্ষেত্রজ্ঞ জন আমার প্রবন্ধে Palmerএর প্রভাবই বেশি দেখবেন। তবে Tragerএর ধাঁচের বিশ্লেষণ অস্পষ্টভাবে হলেও লক্ষ্য ছিল নিশ্চয়ই।

তবু, রচনার আড়াই বছর পরে আমার প্রবন্ধটি এখন নিজের কাছেই বিশেষভাবে অপূর্ণ ঠেকছে। সব চেয়ে বেশি অপরাধ দেখছি বলবিচারে। সেইখানে দোষ ঘটেছে বলেই অন্য কোনো দিকেই নিখুঁত হতে পারে নি।

কোনো একটা বাংলা বাক্যে (বাক্য কাকে বলে তার অনুভূতিগত জ্ঞানই আপাতত যথেষ্ট) যে দল কয়েকটা আছে তাদের বলাঘাত সমান নয়। এই বিভিন্নমানের বলগুলোকে স্বল্প কয়েকটা বলমাত্রায় বিশ্লিষ্ট বলে ভাবা যেতে পারে। আমার প্রবন্ধে দাবি করেছিলাম এদের সংখ্যা অনির্দিষ্ট এবং উপস্থিতির বিধান স্বরনির্ভর। এটা এখন সমর্থন করতে পারছি না। এখন মনে করছি এদের সংখ্যা তিন এবং এদের বিন্যাস স্বর-অনির্ভর। পাঠককে অনুরোধ করছি নীচের উদাহরণগুলি স্বাভাবিকভাবে বলে এবং বলিয়ে শুনতে, শুনে যাথার্থ্য বিচার করতে।

প্রধান বলকে লেখা যায় ˈ চিহ্ন দিয়ে। মাঝারি শক্তির উপবলকেলেখা যায় ˌ চিহ্ন দিয়ে। সাধারণ বলকে লেখার প্রয়োজন নেই। উদাহরণ—

সেটা কি কোথাও আছে ?	সাজ আনো, রাম।
যাওনি কেন, হরেন ?	আগে হলে আমি আসতাম না।
আমি যাবো ?	দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত।

এ ছাড়া অতি দুর্বল একটা বলমাত্রা শোনা যায় ঘোষণা বা উত্তর জ্ঞাপক বাক্যে অন্তিম যতির অব্যবহিত পূর্বে। কিন্তু ঐ বিশেষ স্থানে অন্য কোনো বলমাত্রা কখনোই আসে না। তাই যতির চিহ্ন এবং এই বলাঘাতহীনতার বিশেষ মাত্রার চিহ্ন আলাদা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

বলবিচার বদলালে রূপনির্ণয়ও বদলাতে হয়। পদ্যের গড়নে পুনরাবৃত্তি থাকে, বৈচিত্র্যও থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা কোথায় ঘটছে। পদকে পদ, পদ্যকে পদ্য বলে চেনাচ্ছে কোন জিনিসটার ফিরে ফিরে আসা ? মিল তো বটেই। কিন্তু মিল ছাড়া আর কী ? নীচের উদাহরণগুলোর প্রথম দুটোতে বলাঘাতে ওতরাইএর একটা নকশা আসছে, তৃতীয় ও চতুর্থ টাতে বলাঘাতে চড়াইএর একটা নকশা আসছে, শেষ দুটোতে বলাঘাতের আবর্তনে কোনো নকশা প্রতিপন্ন হচ্ছে না।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান,
শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিনকন্যে দান।

আমি ছেড়েই দিতে রাজী আছি সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাইনা হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।

হে মোর দুর্ভাগা দেশ যা দের করেছ অপ মান,
অপমা নে হতে হ বে তা দের সক লের স মান।[১]

ঈশ্বরী রে জিজ্ঞাসি ল ঈশ্বরী পাট নী,
একা দে খি কুলব ধূ কে ব ট আ পনি।

খো লো খোলো হে আ কাশ স্তব্ধ, তব নীল যবনি কা,
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্ দের হারানো কণি কা

হে বি রাট্ নদী, অদৃশ্ শ নিঃশব্ দ তব জল,

অবিচ্ছিন্ ন অবি রল, চলে নি র বধি।

---

১ 'অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'

এর পর দুটো অপেক্ষাকৃত লঘু দোষের ক্ষালন। দৈর্ঘ্যবিচারের ক্ষেত্রে দাবি করেছিলাম প্রত্যেক উপগতেই একটা ভাজক থাকে। এটা বোধ হয় সত্য নয়। নীচের উদাহরণগুলোতে ভাজকের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি পাঠক বিচার করে শুনুন

যাওনিকেন—হরেন±

আগেহলে + আমি—আসতামনা±

এবং স্বরের দীর্ঘীকরণকে এখন আমি ভাজক বা উপযতি বা যতির বিন্যাসের অনির্ভর মনে করছি। কোথায় যে কোন্ স্বর দীর্ঘীকৃত হবে তার ব্যাকরণগত নিয়ম নিশ্চয় আছে, ধ্বনিতত্ত্বগত নিয়ম খুঁজে পাওয়া যাবে আর ভরসা রাখতে পারছি না। অবশ্য একদল উপগতে স্বর দীর্ঘীকৃত অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক হবে এটা মানতে আপত্তি নেই। উদাহরণ বিচার করে শুনুন—

২ সেটাকি + কোথাও—আছে±	২ ২ সাজ—আনো—রাম +
যাওনিকেন—হরেন±	২ আগেহলে + আমি—আসতামনা±
২ আমি—যাব±	২ ২ ২ দুর্দান্ত—পাণ্ডিত্য পূরণ + দুঃসাধ্য—সিদ্ধান্ত±

স্বরের হ্রস্বীকরণের ব্যবহারও বাংলাভাষায় এককালে জীবন্ত ছিল। বর্তমানে কয়েকটা ফসিল তেমন অবস্থার সাক্ষ্য দেয়। "কোথাও" আর "কোত্থাও", "এখুনি" আর "এক্ষুনি", "সকলে" আর সক্কলে", "বড়" আর "বড্ড", "যা" আর "যাঃ" ইত্যাদিকে এইভাবে বোঝা যায়।

সুরবিচারেও পুনরীক্ষণের অবকাশ আছে। আমার প্রবন্ধে দাবি করেছিলাম বাংলায় ন্যূনপক্ষে তিনটে ঘাট মানতে হবে। তদনুসারে "এক, দুই, তিন, চার।" বাক্যটার সুর ছকতে হয় 12 + 12 + 12 + 21± কিন্তু মুশকিল হয় যে "এক" এর আরম্ভ এবং "চার" এর শেষ একই ঘাটে বলে ঠেকে না। উপরন্তু "যাওনি কেন হরেন?", "আমি যাব?" এবং "সাজ আনো, রাম।" তিনটে বাক্যের শেষ পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করলে পৃথক পৃথক বলেই ঠেকে। ইত্যাদি যুক্তিতে বাংলা ভাষায় চারটে ঘাট মানা প্রয়োজন দাবি করা যেতে পারে। এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে বলেই চতুরাশ্রয় সুরবিচারের উদাহরণ দিচ্ছি—

॥২ ॥২ ,২ ॥২ এক, দুই, তিন, চার।	23 + 23 + 23 + 31±
। । ক্লাস থেকে ফিরে এল। ।	223 + 22 − 21±
। পুতুল খেলি। ।	23 − 31±
রবীন্দ্রজীবনী। ।	223 − 221±
। ডাক্তার।	31±
। ২ ২ ডাক-তার।	3-1 +

আপনি এলেন ? 22-24±

আপনি এলেন ? 23 – 24±

যাওনি কেন, হরেন ? 3221 – 23±

আমি যা ব ? 22 – 24±

।২ ।২
সাজ আনো রাম ? 32 – 22 – 22±

ফল কি হল ? যদি আস্ত গোটা নিটোল ফল কেউ চান তাঁকে নিরাশ করতে বাধ্য হব। পাওয়া যাচ্ছে কয়েক টুকরো ভাঙাভাঙা ফল। কথা হচ্ছে এ টুকরোগুলো সংস্কৃত বা ইংরেজির গাছ থেকে পাড়া নয় তো, এবং বাসি নয় তো ?

আমার প্রবন্ধে অপটুতার পরিচয় প্রচুর যে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। হয়তো আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করে তবেই কিছু প্রকাশ করার সাহস দেখানো উচিত হত। তবে সম্পূর্ণ নিখুঁত জ্ঞানের অপেক্ষায় বসে থাকা কাজের কথা ছিল না। বিশেষ করে বাংলাদেশের অন্য ভাষাতাত্ত্বিক বিদ্বৎবর্গ প্রস্তাবিত বিষয়ে অনাগ্রহী এরকম ধারণা করা যাচ্ছিল বলেই। শিশিরবাবুকে ধন্যবাদ যে উনি আমার সে ধারণা টলিয়েছেন এবং পুরণো কাজটার দোষগুলো সংশোধনের উপলক্ষ দিয়েছেন।

পুণ্যশ্লোক রায়

ইয়েল ইউনিভার্সিটি। আমেরিকা

১৬ মার্চ ১৯৬২

আত্মপরীক্ষা। শিবনাথ শাস্ত্রী। তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশিত কতিপয় উপদেশ, শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত; সাধন আশ্রম; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ; কলিকাতা; ১৯৫২। মূল্য এক টাকা।

মাঘোৎসবের উপদেশ। শিবনাথ শাস্ত্রী। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ; শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীঅরবিন্দ মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত; সাধারণ ব্রহ্মসমাজ; কলিকাতা; ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ। আড়াই মূল্য টাকা।

মাঘোৎসবের বক্তৃতা। শিবনাথ শাস্ত্রী। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ; শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীঅরবিন্দ মিত্র সম্পাদিত; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ; কলিকাতা; ১৮৭৯ শক। মূল্য দুই টাকা।

ইংলণ্ডের ডায়েরী। শিবনাথ শাস্ত্রী। প্রথম সংস্করণ, বেঙ্গল পাবলিশার্স; কলিকাতা; ১৩৬৪। মূল্য চার টাকা।

তুলসীদাস রামচরিতমানসে তাঁর আরাধ্য দেবতা রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে বলেছেন:

রাম সিন্ধু ঘন সজ্জন ধীরা
চন্দনতরু হরি সন্ত সমীরা।

অর্থাৎ, পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ রামচন্দ্র যেন সাগর ও তাঁর ভক্তবৃন্দ সেই সিন্ধুবারিরাশি হতে উত্থিত মেঘ; ভগবান যেন চন্দনতরু আর সাধুসন্তগণ সেই চন্দনগন্ধবহ মলয়সমীরণ। সংসারে জনতার ভিড়ে ক্বচিৎ এমন দুটি-একটি মানুষ চোখে পড়েন যাঁরা এই উক্তির দৃষ্টান্ত, যাঁদের সমগ্র সত্তা একটি পবিত্র শান্ত ও গভীর আধ্যাত্মিকতার সৌরভে মণ্ডিত। অথচ এই আধ্যাত্মিকতা তাঁদের সংসারবিমুখ করে নি, গৃহধর্মের আদর্শবিচ্যুত করে নি, কল্যাণকর্মে বিরত করে নি। এঁদের ধর্মসাধনায় পারলৌকিক ও ইহলৌকিক জীবন সমান মর্যাদা পেয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় নবজাগরণের ইতিহাসে শিবনাথ শাস্ত্রী এই বিরল-শ্রেণীর একটি আশ্চর্য মানুষ। সাহিত্য সাধনা তাঁর জীবনের একটি রুদ্ধদ্বার স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ মাত্র ছিল না, তা ছিল তাঁর সমগ্র জীবনসাধনারই অন্যতম প্রকাশ। আর যেহেতু তাঁর জীবনাদর্শের ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিকতায়, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিও সেই হেতু উক্ত বিশিষ্ট লক্ষণদ্বারা চিহ্নিত। শিবনাথ শাস্ত্রীর সাহিত্য-কীর্তির বিচার করতে হলে তাই দুটি বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ তাঁর জীবন থেকে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে পৃথক্ করে দেখা চলে না। অবশ্য হয়তো সকল লেখকের পক্ষেই এ কথা অল্পবিস্তর সত্য। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনের বিশেষ পরিবেশ ও তাঁর মানসিকতার বিশেষ গঠনের জন্য তাঁর সম্পর্কে উক্ত মানদণ্ড সমালোচকের প্রধান অবলম্বন হওয়া যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ যে আধ্যাত্মিকতা শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনের তথা সাহিত্যসাধনার মূলমন্ত্র ছিল তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখলেও আমরা লাভবান হব। অল্পকথায় এই আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শের পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয় এ হল ঈশ্বরবিশ্বাসমূলক মানবকল্যাণের আদর্শ। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার লীলাভূমি হলেও অধ্যাত্মসাধনার এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এখানে নূতন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন রায় এই কল্যাণমন্ত্রের প্রথম উদ্‌বোধক। সাদির একটি ফার্সী বয়েৎ তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল যার অর্থ—মানবসেবাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসনা। রামমোহনের ভাবশিষ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তদ্‌রচিত ব্রাহ্মধর্মবীজের মধ্যে এই বাণীরই অপূর্ব সংস্কৃত রূপ দিয়েছেন—

তস্মিন্ প্রীতি তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব— যা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো ধর্মনিরপেক্ষ লোকহিত-ব্রতীকে পর্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। অন্তরের ধর্মবুদ্ধি বা বিবেক অনুযায়ী সমগ্র জীবনকে গড়ে তুলবার উপদেশ দিয়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এই আদর্শকে স্ফুটতর করে তুলেছিলেন। এর ফলে রামমোহন থেকে কেশবচন্দ্র পর্যন্ত ক্রমশঃ জাতীয় সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সর্ববিধ রক্ষণশীলতা কুসংস্কার ও কদাচারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও আপসহীন সংগ্রাম ব্রহ্মসমাজের ধর্মসাধনার অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটলেও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ এই উত্তরাধিকার ত্যাগ করেন নি বরঞ্চ তাঁদের জীবনে ও রচনায় উক্ত আদর্শের উজ্জ্বলতম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্বকৌমুদীর বিগত সংখ্যা থেকে দুটি উদধৃতি দিলে আমাদের বক্তব্যের উদাহরণ পাওয়া যাবে—

> অপিচ ধর্মহীন সমাজসংস্কার বা রাজনৈতিক সংস্কার অতি নিম্নভূমিতে দণ্ডায়মান। লোকের সুবিধাই ইহার ভিত্তি। কিন্তু ধর্মই মানবচরিত্রের চিরকালের অবলম্বন; ইহকালের আশা ও আশ্রয়স্থান; সুতরাং ধর্মানুমোদিত সমাজসংস্কার বা রাজনৈতিক সংস্কারের মূলমন্ত্র যে সর্বতন্ত্রিতা বা উদারতা ব্রাহ্ম-ধর্ম তাহাই ঘোষণা করেন। —তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০২ শক, ১৬ই বৈশাখ, পৃ. ২৭১

> সমাজ ও মনুষ্যজাতিকে বিস্মৃত হইয়া কেবল ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকাকেই ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম বলিয়া মনে করেন না। ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বর, মনুষ্য বা জগতের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিবেন, একটিকে বিস্মৃত হইয়া অন্যটিকে লইয়া অবস্থিতি করিবেন না, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের আকর্ষণ। —তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৩ শক, ১৬ই ফাল্গুন, পৃ. ২০৬

উদ্ধৃত অংশ দুইটি শিবনাথের রচনা কিনা নিশ্চিত জানবার উপায় নেই, কিন্তু এগুলি নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনদর্শনের সংক্ষিপ্তসার, তথা তাঁর চিন্তারাজ্যের খাস দরবারে প্রবেশ করবার আদর্শ চাবিকাঠি।

'আত্মপরীক্ষা' শীর্ষক পুস্তিকাখানি ১৮০০ থেকে ১৮০৫ শকাব্দ (১৮৭৮ থেকে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় প্রকাশিত শিবনাথের রচনা হতে সংকলন। সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজ অতি নিষ্ঠা ও পরিচ্ছন্নতা সহকারে করেছিলেন স্বর্গীয় অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য। সর্বসমেত একশো এগারোটি প্রসঙ্গ এতে সংকলিত হয়েছে। সংগৃহীত উক্তিগুলি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, তাই ভাষণগুলির লক্ষ্য সাধারণভাবে ব্রাহ্মসম্প্রদায়। কিন্তু এগুলির মধ্যে মানুষের প্রতি যে গভীর সহানুভূতি, চিত্তের যে ঔদার্য এবং দৃষ্টিভঙ্গীর যে প্রসার লক্ষ্য করা যায় তার আবেদন নিঃসন্দেহে অসাম্প্রদায়িক ও সার্বজনীন। সাধক ও গোষ্ঠীবিশেষের পরিচালক হিসাবে শাস্ত্রী মহাশয়ের ধর্মজীবনে যে দুটি দিক ছিল, সেই উভয় ক্ষেত্রে লব্ধ গভীর অভিজ্ঞতা থেকে আলোচ্য সুভাষিতাবলীর সৃষ্টি। নিছক সামাজিক বিবেকসম্পন্ন পরহিতব্রতী অপেক্ষা ভাগবতসাধককে তিনি যথাযথ ভাবেই উচ্চ স্থান দিয়েছেন (পৃ. ৯৫-৯৬)। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসীর সামাজিক দায়িত্বের উপর সমুচিত গুরুত্ব আরোপ করতেও ভোলেন নি (পৃ. ৩৮)। আমাদের দেশে প্রচলিত ধর্মচর্চার মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক তরলতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা সাধারণতঃ দেখা যায় তার বিরুদ্ধে উচ্চারিত সাবধানবাণীও এই রচনা-কণিকাগুলির একটি সামান্য লক্ষণ। ধর্মানুভূতিজাত কল্যাণবুদ্ধির প্রভাবে যতক্ষণ না পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের রূপান্তর সাধন করা যাচ্ছে ততক্ষণ যে ধর্মসাধনা সম্পূর্ণ হয় না, এই মত একটি গানের ধুয়ার মতো ঘুরে ফিরে বার বার উক্তিগুলির মধ্যে দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশে "ধর্মভাবে জলের এত মূল্য, যে যদি কোনও প্রকারে একটু ভাবোদয় হয়, তাহা হইলে" ধর্মসাধনার্থিগণ "যেন আর-সকল কর্তব্য ও দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন"— এই কঠোর আত্মসমালোচনা উপদেশগুলিতে

একটি নূতন সুর এনে দিয়েছে যা আমাদের সাম্প্রতিক ধর্মসাহিত্যে বিরল। এই ঝোঁকটি বিশেষভাবে উনবিংশ শতকের সৃষ্টি। বর্তমান সামাজিক ও নৈতিক বিশৃঙ্খলার যুগে এর পুনরুজ্জীবন সর্বথা কল্যাণকর এবং সেই কারণে একান্ত বাঞ্ছনীয়।

'মাঘোৎসবের উপদেশ' ও 'মাঘোৎসবের বক্তৃতা', শাস্ত্রী মহাশয়ের দুখানি সুপরিচিত গ্রন্থের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। সম্পাদনার কাজে শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীঅরবিন্দ মিত্রের যে যত্ন ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল তা বিশেষ প্রশংসনীয়। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাবৎসর থেকে ১৩২৬ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১১ই মাঘের উপাসনায় আচার্যরূপে শিবনাথ যে-সব উপদেশ দিয়েছিলেন প্রথম গ্রন্থে সেগুলি সংগৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয়খানি মাঘোৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতার সংকলন। প্রথম গ্রন্থে উপদেশের ও দ্বিতীয় গ্রন্থে বক্তৃতার সংখ্যা, যথাক্রমে একচল্লিশ ও বারো। 'আত্মপরীক্ষা' গ্রন্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণীর সংকলন হওয়াতে পাঠক সমগ্রভাবে সেখানে যে ধারাবাহিকতার অভাব অনুভব করেন, আলোচ্য সংকলনগুলি তার থেকে মুক্ত। উভয়ক্ষেত্রেই লেখক বা বক্তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও আন্তরিকতার পরিচয় এত স্পষ্ট যে জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর পাঠকের মনকে তিনি অতি সহজে স্পর্শ ও অভিভূত করেন। শিবনাথের 'আত্মচরিত' 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' 'প্রবন্ধাবলী' ইংরেজিতে রচিত 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস' প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রিক ও ঐতিহাসিক রচনায় যে পরিপ্রেক্ষিতচৈতন্য ও বিশ্লেষণী শক্তি আমাদের মুগ্ধ করে, আলোচ্য গ্রন্থ দুখানির প্রতি ছত্রেও আমরা তার প্রকাশ লক্ষ্য করি। গভীর আধ্যাত্মিক বোধের সঙ্গে সহজ বুদ্ধি ও বিশ্লেষণী শক্তির মিলন ঘটলে যে ধর্মোপদেশও কত চিত্তাকর্ষক হতে পারে, শিবনাথের উপদেশ ও বক্তৃতার এই সংকলন দুখানি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাংলা ভাষায় এর সমগোত্রের রচনা বলতে সহজে মনে পড়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' ও রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন'। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উপদেশ বা রামকৃষ্ণ কথামৃতও নিছক সাহিত্যিক মূল্যে গরীয়ান কিন্তু সেগুলির জাত ও স্বাদ আলাদা।

'ইংলণ্ডের ডায়েরী' গ্রন্থখানির জন্য আমরা শিবনাথের পুত্রবধূ শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অবন্তী দেবীর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ ছয়মাসের জন্য ইংলণ্ড গিয়েছিলেন। এই যাতায়াত ও অবস্থানকালের (১৫ই এপ্রিল থেকে ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত) দিনলিপি তিনি নিয়মিত রক্ষা করেন। এতদিন পরে অবন্তী দেবীর সম্পাদনায় তা প্রকাশিত হল। এই 'ডায়েরী' বা দিনলিপির মাধ্যমে আমরা শিবনাথের যে পরিচয় পাই তা এক দিকে যেমন অন্তরঙ্গ, অন্য দিকে তেমনি অভিনব। এক দিকে তিনি আত্মীয়বন্ধুপরিবেষ্টিত, ভগবদ্‌ভক্ত স্নেহশীল, হৃদয়বান্ অথচ নিরাসক্ত একটি মানুষ, অপর দিকে ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষের সেবায় আদর্শবাদী ও শ্রান্তিহীন কর্মী। যে উদ্দেশ্যে শিবনাথ ইংলণ্ড যাত্রা করেছিলেন তা এই ডায়েরীর ২৩-২৫ পৃষ্ঠায় তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। উক্ত সুবিস্তীর্ণ তালিকা থেকে বোঝা যায়, পাঠ সাধনা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা আত্মোন্নতি যেমন তাঁর লক্ষ্য ছিল তেমনি দারিদ্র্য সুরাসক্তি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ইংলণ্ডের জনহিতব্রতী কর্মিগণ যে বিবিধ উপায় অবলম্বন করেছেন তা লক্ষ্য করে শিক্ষালাভও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে বিদেশে ভারতীয় কুলি চালান দেওয়া, আসামে কুলি নির্যাতন, ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে মদ্যব্যবসায়ের ও সুরাপানের প্রসার প্রভৃতি ইংরেজশাসনের অকল্যাণকর কাজগুলির বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের জনমতকে প্রভাবিত করবার

প্রচেষ্টাও তাঁর তৎকালীন কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিলাতপ্রবাস-কালে তিনি যে দাদাভাই নৌরজীর সহযোগিতায় কিছু পার্লিয়ামেণ্ট-সভ্যকে আসামের কুলি নির্যাতনের কাহিনী গোচর করিয়ে পার্লিয়ামেণ্টে প্রশ্ন তুলিয়েছিলেন, তা আমরা এই দৈনন্দিন লিপি থেকে জানতে পারি। মুখ্যতঃ তাঁরই প্রেরণায় উইলিয়ম স্টেড 'পেল মেল গেজেটে' আসামের চা-কুলিদের সম্পর্কে A Plea for Slavery in India শীর্ষক কতগুলি প্রবন্ধ লেখেন। এ বিষয়ে দিনলিপিতে উল্লেখ :"···স্থির হইল তিনি লিখিবেন, আমি 'আর্মার বেয়ারার' এবং 'ওয়েপন সাপ্লায়ার' হইব। আগামী বৃহস্পতিবার গিয়া তাঁহাকে মকদ্দমা বুঝাইয়া দিব।" (পৃ. ১৩৫)। স্বদেশপ্রেমিক শিবনাথের নিকট যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, দেশসেবা ও মানবকল্যাণ-প্রচেষ্টা সমার্থবাচক ছিল, তাঁর দিনলিপি পাঠে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। তা ছাড়া লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির ফলে 'ইংলণ্ডের ডায়েরী' তদানীন্তন ইংরেজ সমাজের যে মনোরম রেখাচিত্রে পরিণত হয়েছে, তা যেমন উপভোগ্য তেমনি মূল্যবান। ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্য, সেখানকার মনীষী ও লোকহিতব্রতীর দল, বিভিন্ন ধর্মমণ্ডলী, দোষে গুণে মেশানো নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, পথে বিচারমানা মানুষ-শিকারী বারাঙ্গনা প্রভৃতি শিবনাথের লেখনীস্পর্শে যেন জীবন্ত হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। একজন সমসাময়িক ভারতীয় মনীষীর দৃষ্টিতে ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের ও ইংরেজ সমাজের এই চিত্রের মূল্য অসীম, কেননা সে ইংলণ্ড এখন আর নেই। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি তথ্যপূর্ণ ভূমিকা ও শাস্ত্রী মহাশয়ের বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর রচনাংশ গ্রন্থে যোজিত হওয়ায় এর মূল্য বেড়েছে।

উপসংহারে শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যবহৃত বাংলা ভাষার বিশেষত্ব সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। এই পারদর্শিতা তাঁর বাংলা রচনারীতিকে প্রভাবিত করেছে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অসামান্য অধিকার থাকায় তাঁর বাংলা ভাষার বনিয়াদ পাকা, শব্দচয়ন নিখুঁত এবং পদবিন্যাস সংযত ও সুসমঞ্জস ; আবার ইংরেজি প্রভাব তাঁকে পণ্ডিতী আতিশয্যের হাত থেকে রক্ষা করেছে, তাঁর ভাষায় সারল্য, ঋজুতা ও গতির স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে। শিবনাথের বাংলা রচনারীতির উপর তাঁর সংস্কৃত চর্চার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বাংলাতে তাঁর অতিসার্থক উপমাপ্রয়োগে। ধর্মসাহিত্যের ভাষা উপলব্ধিমূলক বলেই বোধ হয় এ ক্ষেত্রে উপমাপ্রয়োগের সুযোগ প্রচুর। আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার শিবনাথের ন্যায় তাঁর পূর্বে বা পরে আর কেউ করেছেন বলে জানি না। তাঁর রচনাশৈলীর এই বিশেষত্বটি লক্ষ্য করে শ্রীউমেশচন্দ্র চৌধুরী ১৩২৯ বঙ্গাব্দে তাঁর গ্রন্থাদি থেকে সংগ্রহ ও নির্বাচন করে 'উপমা সংগ্রহ' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন— এ কথা বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বস্তুতঃ শিবনাথের বলিষ্ঠ, ঋজু লাবণ্যদীপ্ত লিখনশৈলীর আকর্ষণ তাঁর পাঠকদের কাছে কম নয়।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

স্বরলিপি

হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান করিয়ো ক্ষমা।
ঝরোঝরো ধারা আজি উতরোল, নদীকূলে-কূলে উঠে কল্লোল,
বনে বনে গাহে মর্মরস্বরে নবীন পাতা।
সজল পবন দিশে দিশে তোলে বাদলগাথা॥

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা।
এল বরষার সঘন দিবস, বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত কানন-'পরে।
নবকদম্ব মদির গন্ধে আকুল করে॥

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা।
তোমার দুখানি কালো আঁখি-'পরে বরষার কালো ছায়াখানি পড়ে,
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে যূথীর মালা।
তোমারি চরণে নববরষার বরণডালা॥

হে নিরুপমা,
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ, করিয়ো ক্ষমা।
হেরো আকাশের দূর কোণে কোণে বিজুলি চমকি ওঠে খনে খনে,
দ্রুত কৌতুকে তব বাতায়নে কী দেখে চেয়ে!
অধীর পবন কিসের লাগিয়া আসিছে ধেয়ে॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II {ঋা২ ঋা২ ঋা২ ঋ২র্সা । র্সা -া -মা -া I মা মা মগা পা । মা -া -া -া I
হে নি রু পং মা ০ ০ ০ হে নি রুং প মা ০ ০ ০

I (সমা মা মা মা । মা -া পমা -গা I মা -দা২ দা২ দ২ণা২ । ণা২ -া -মা -া I
গাং নে য দি লা ০ গে ০ বি হ্ ব লং তা ০ ০ ন্

I মা মা মগা পা । মা -া -া -া)} I মদা২ দা২ দা২ দা২ । না -া র্সা -া I
ক রি য়োং ক্ষ মা ০ ০ ০ ঝ রো ঝ রো ধা ০ রা ০

I [র্স]ঋর্া ঋর্া র্সা র্সনা । র্সা -া -া -া I র্সা [র্স]র্গা র্গঋর্া ঋর্পা । র্গা -ঋর্া ঋর্া -র্সা I
আ জি উ তং রো ০ ০ ল্ ন দী কূং লেং কূ ০ লে ০

I না র্সা র্সঋর্া -র্সা । না -া -মা -া I মা মা মা মা । মা -া [প]মা -গা I
উ ঠে কং ল্ লো ০ ০ ল্ ব নে ব নে গা ০ হে ০

I গা -পা গা গা । [গ]ঋা -া সা -া[ন] I সা সা সমা মা । মা -া -া -া I
ম র্ ম র স্ব ০ রে ০ ন বী নং পা তা ০ ০ ০

I [স]মা মা মা মা । মা মা মা মা I মা -[গ]পা [প]মা -গা । মা -দা২ দা২ -া I
স জ ল প ব ন দি শে দি ০ শে ০ তো ০ লে ০

I দা২ -না র্সা না । [ন]দা২ -মা মা -া I মা মা [ম]গা পা । মা -া -া -া II
বা ০ দ ল গা ০ থা ০ হে নি রু প মা ০ ০ ০

II {গা -মা । -পা দা -পা -দা I পা -র্সা । র্সা -ণা ণপা -ণা I
হে ০ ০ • ০ ০ হে ০ নি ০ রুং ০

I [ণ]দা -া । -া -পা পা -দা I মা -া । পা -া দা -পা I
প ০ ০ ০ মা ০ হে ০ নি ০ রু ০

I মপা -দপা । -মপা -া মগা -া I (গা -া । মা -গা ঋা -া I
পং ০০ ০০ ০ মাং ০ চ ০ প ০ ল ০

I গা -া । মা -া মা -পা I গা -া । মা -গা [গ]ঋা -া I
তা ০ আ ০ জি ০ য ০ দি ০ ঘ ০

I সা -া । -া -া র্সা র্সা I না -া । র্সা -ঋর্া র্সা -ঋর্া I
টে ০ ০ ০ ত বে ক ০ রি ০ য়ো ০

I না -র্সা । -া -না দা -পা)} I {দা -া । দা -া দা -া I
ক্ষ ০ ০ ০ মা ০ এ ০ ল ০ ব ০

I না -া । -া -র্সা র্সা -া I র্সা -ঋর্া । ঋর্া -র্সা র্সা -া I
র ০ ০ ০ ষা র্ স ০ ঘ ০ ন ০

I না -া । -া -র্সা র্সা -া I র্সা -ঋা । ঋা -া ঋা -া I

দি ° ° ° ব স্ ব ° ন ° রা °

I ঋা -া । ঋা -র্সা র্সা -া[ঋা] I না -া । র্সা -ঋা র্সা -ঋা I

জি ° আ ° জি ° ব্যা ° কু ° ল °

I না -র্সা । -া -না দা -পা} I পজ্ঞা -া । জ্ঞা -া জ্ঞা -া I

বি ° ° ° ব শ্ বং ° কু ° ল °

I জ্ঞা -র্রা । জ্ঞা -র্রা জ্ঞা -া I জ্ঞা -র্রা । জ্ঞর্রা -র্মা [র্ম]জ্ঞা -া I

বী ° থি ° কা ° মু ° কুং ° লে °

I [জ্ঞ]ঋা -া । -া -র্সা র্সা -ঋা I ণা[২] -া । র্সা -জ্ঞা জ্ঞা -ঋা I

ম ° ° ত্ ত ° কা ° ন ° ন °

I [জ্ঞ]ঋা -া । -া -সা সা -া I সা -া । সা -মা মা -া I

প ° ° ° রে ° ন ° ব ° ক °

I মা -া । -া -া [প]মা -গা I গা -া । মা -গা গা -া I

দ ° ° ম্ ব ° ম ° দি ° র °

I [গ]ঋা -া । -া -সা সা -া I না -া । র্সা -ঋা র্সা -ঋা I

গ ° ° ন্ ধে ° আ ° কু ° ল °

I না -র্সা । -া -না দা -পা II[১]

ক ° ° ° রে °

II পা [প]র্সা না । র্সা -া । র্সা র্সর্রা I [র্স]ণা র্সা ণা । [প]ধা -পা । পা পা I

চ প ল তা ° আ জিং য দি ঘ টে ° ত বে

I পা পধা [ধ]পা । [প]মা -গা । মা -া I মা মপা [প]মা । মা -জ্ঞা । জ্ঞা -া I

ক রিং য়ো ক্ষ ° মা ° হে নিং রু প ° মা °

১ এই কলি বরাবর দ্বিতীয় অংশ হিসেবে গীত হয়ে এসেছে। ২।৪ মাত্রার অংশ ৩।৩ মাত্রার ছন্দেও গাওয়ার রীতি আছে। শেষ কলিটি কেবলমাত্র ৩।৩ মাত্রাবিন্যাসে গীত হওয়ায় বৈচিত্র্যসাধনের জন্যে এই অংশে ২।৪ মাত্রাবিন্যাস ব্যবহার করা হল।

I রা রমা [ম]জ্ঞা । [স]রাঃ -সঃ । সা -া I {পা পা পা । পা -া । পা ধা I
হে নিং রু প ০ মা ০ তো মা র দু ০ খা নি

I না র্সা র্সা[ন] । [র্]র্সা -না । না [র্]র্সণা I ণা ণা ণধা । [র্স]ণা -[ণ]ধা : পা ধা I
কা লো আঁ খি ০ প রেং ব র ষাং র ০ কা লো

I ণা ণর্রা র্সর্রা । [ণ]র্সণা -ধণা । [প]ধা পা} I {মা মধা ধা । ধা -া । ধা মা I
ছা য়াং খাং নিং ০০ প ড়ে ঘ নং কা লো ০ ত ব

I ধা -ণর্সা র্সর্রা । [র্স]ণর্সণা -ধণা । [প]ধা পা} I পা পধা [ধ]পা । মা -গা । মা -া I
কু ংন্ চিং তং০০ ০০ কে শে যূ থীং র মা ০ লা ০

I মা মপা [প]মা । মজ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা -া I রা রমা মজ্ঞা । [স]রাঃ -সঃ । সা -রজ্ঞা I
তো মাং র চং র ণে ০ ন বং বং র ০ ষা ০র্

I রা রমা মজ্ঞা । [স]রাঃ -সঃ । সা -া I র্সা র্সা র্সর্রা । [ন]র্সা -ণা । ণা -া I
ব রুং ণং ডা ০ লা ০ হে নি রুং প ০ মা ০

I ধা পা [প]ধপা । মগা -[র]গা । মা -া I -া -া -া । -া -া । -া -া II[২]
হে নি রুং পং ০ মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II {রা -মা -রা । -মা -পা -ধণা I ধা ধর্সা ণা । ধা পা -রা I
হে ০ ০ ০ ০ ০০ হে নিং রু প মা ০

I রা [র]পা মা । [র]গা রা -া I (রা রপা [প]মা । গা রা -া I
হে নি রু প মা ০ আঁ খিং য দি আ জ্

I রা রপা [প]মা । গা রসা -া I রা মা রা । মা পা -র্সা I
ক রেং অ প রাং ধ্ ক রি য়ো ক্ষ মা ০

I র্সা র্সনা -র্রা । র্সা র্সা -ণা I ণধা -র্সণা -ধণা । ধা পা) -রা I
আঁ খিং ০ য দি ০ আং ০০ ০জ্ ক রে ০

২ এই কলি বরাবর তৃতীয় অংশ হিসেবে গীত হয়ে এসেছে।

I রা -া -গা । মপা -মপমগা -^{র}গা I রা -া -া । -া -া -া I
অ ০ ০ প০ ০০০০ ০ রা ০ ০ ০ ০ ধ্

I রা রপা মা । ^{ম}গা রসা -া)} I {পনা না না । না না -র্সা I
ক রিং য়ো ক্ষ মাং ০ হেং রো আ কা শে র্

I র্সা -া র্সা । র্সা র্সনা র্সা I না র্সা র্রা । র্রা র্রর্মা র্গর্মা I
দূ র্ কো ণে কোং ণে বি জু লি চ মং কিং

I র্রা র্সা $^{র্স}$ণা । ণধা ধা পা} I মা পা পা । -ণা ধা ণা I
ও ঠে খ নেং খ নে ক্র ত কো উ তু কে

I ধা ণা ধা । ণা ধা ণা I ধা ধর্সা $^{র্স}$ণা । ধা পা -া I
ত ব বা তা য় নে কী দেং খে চে য়ে ০

I সা র্সর্রা $^{র্র}$র্সা । র্সণা ণা ণধা I পা পধা ^{ধ}পা । পমা মা মগা I
অ ধীং র পং ব নং কি সেং র লা গি য়াং

I ^{গ}রা রপা ^{প}মা । ^{ম}গা রসা -া II II
আ সিং ছে ধে য়েং ০

শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি : রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ-গ্রন্থপঞ্জী ॥ সংযোজন

পূর্ববর্তী সংখ্যা (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯) বিশ্বভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি-উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা মুদ্রিত হবার পর এই কয়টি বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়—

অন্নদাশঙ্কর রায়

রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৬২। ৮+২১৩+৪ পৃ। ২২ সে. মি.। ৫·০০

গোপাল হালদার

রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৬১। ৭+২৪৮ পৃ। ২১·৫ সে. মি.। ৫·০০

চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি

রবীন্দ্র-রচনা-কোষ, ১ম খণ্ড, ২য় পর্ব। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৮। ৬+[২৪১-৬২৭] পৃ। ১৮·৫ সে. মি.। ৭·০০

পঁচিশে বৈশাখ। দিল্লী, রবীন্দ্রশতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তী, কেন্দ্রীয় পরিষদ্, ১৯৬১। ৬৮ পৃ। ২৪·৫ সে. মি.। ১·৫০

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রবিতীর্থে। কলিকাতা, বাণী নিকেতন, ১৯৬২। ১০+১৮০+৪ পৃ। ২১·৫ সে.। ৬·০০

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য (Symbolic Plays of Rabindranath Tagore)। কলিকাতা, বুকল্যাণ্ড, তারিখ নেই (১৯৬২ ?)। ৪+৪+৮+৩২৩+৬+৩ পৃ। ২১·৫ সে. মি.। ১০·০০

হরিহর শেঠ, সংকলক

রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর। নারায়ণচন্দ্র দে, ১৯৬১। ৭+২৭৫ পৃ। ২২ সে. মি.। ৩·০০

—

স্বীকৃতি

রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ-ধাঁধা' রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত।

রবীন্দ্রনাথ ও বিধানচন্দ্র রায়ের পত্র রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীনন্দলাল বসু -অঙ্কিত 'নটীর পূজা' চিত্রের ব্লক শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্র দিয়েছেন শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত।

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তি আমাদের পাথেয় হউক

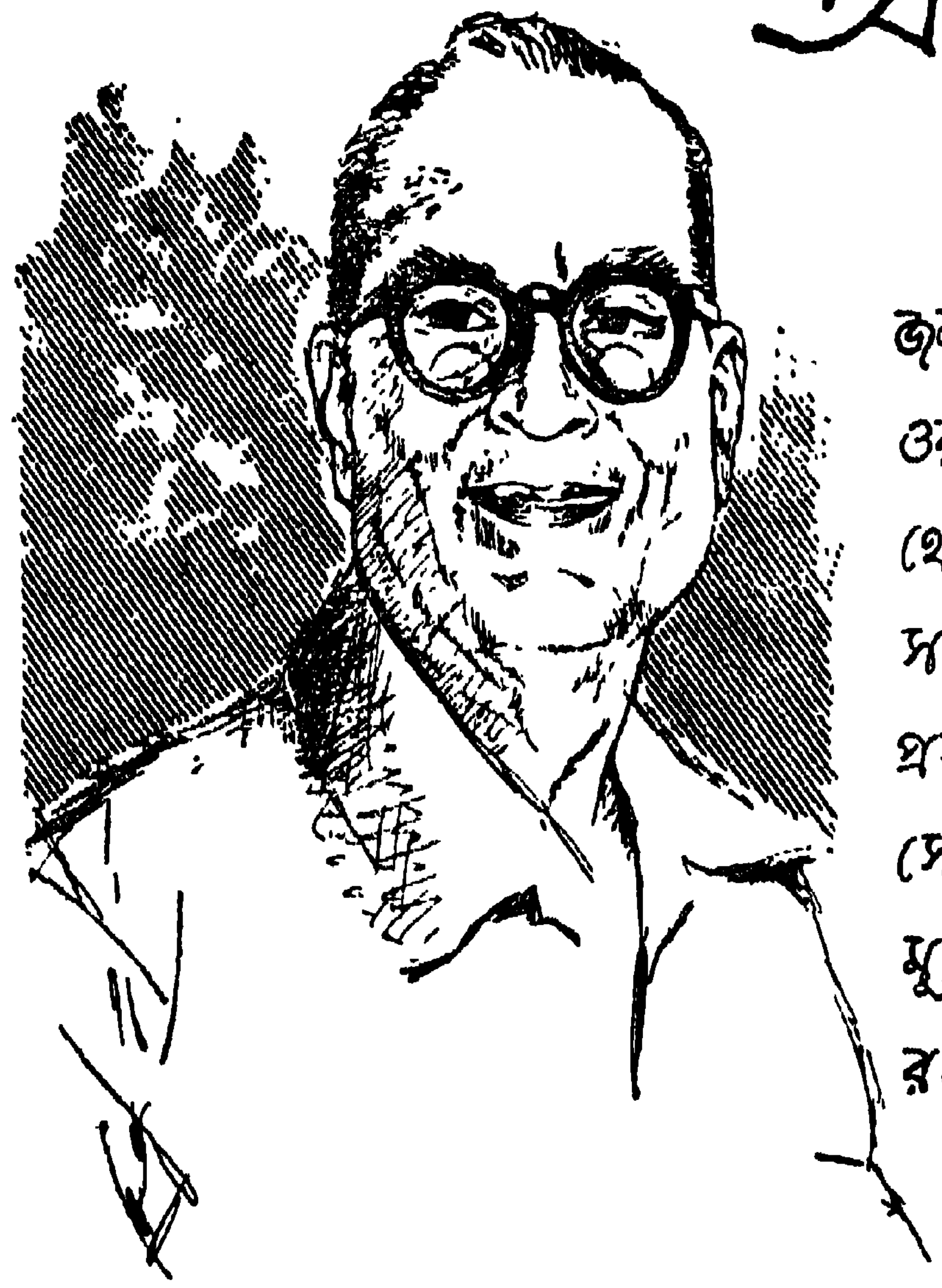

"কঠোর শ্রম ও ধৈর্যের দ্বারা কি লাভ করা যায় তার জন্য যদি কোন উদাহরণের প্রয়োজন হয় আমি সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের নাম উল্লেখ করবো। ছোট অবস্থা থেকে এই প্রতিষ্ঠান আজ অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক বিরাট কারখানায় পরিণত হয়েছে। বিদেশে প্রস্তুত সবচেয়ে সেরা কালির যে গুণগত উৎকর্ষ সুলেখা সেই গুণের অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণে সাহায্য করছে। আজকে তাঁদের এই রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

ডঃ তারকনাথ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ৫৲

[অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেনের ভূমিকা সম্বলিত রবীন্দ্র সাহিত্যে নূতন সংযোজন]

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, ১ম খণ্ড ৫৲

রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ২য় খণ্ড ৫৲

রবীন্দ্র-বিচিত্রা ৫॥০

রেণু মিত্র

রবীন্দ্র-হৃদয় ৫৲

[ভূমিকা : ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত]

ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা ১২৲

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ ৩।০

প্রতিভা গুপ্ত

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ৬৲

সমীরণ চট্টোপাধ্যায়

গুরু-দর্শন ২॥০

শারদোৎসব-দর্শন ২৲

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী

নানা-রকম ৬৲

শ্রেষ্ঠ কবিতা ৬৲

নীরস-গল্পসঞ্চয়ন ৩॥০

নগেন্দ্রকুমার গুহরায়

ডাঃ বিধান রায়ের জীবনচরিত ৮৲

ধীরেন্দ্রলাল ধর

মন্দিরে মন্দিরে ৬৲

প্রতিভা গুপ্ত

সমাজ ও শিশুশিক্ষা ৬৲

সমাজ ও শিশুসমীক্ষা ৮৲

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

হিমালয়পারে কৈলাস ও মানস সরোবর ৮৲

অতীত স্বপন ৬৲

কল্যাণী প্রামাণিক

দুনিয়া-দেখছি ৫৲

শিশুতরু (কাব্য) ২৲

খোকনবাবু (কবিতা) ২৲

॥ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা ১২ ॥

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য…

চারু ও কারুশিল্প, ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলার কী অন্তহীন বৈচিত্র্যই না রয়েছে আমাদের স্বদেশে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে এই বিচিত্র ভারতভূমি গঠিত। রেলপথ প্রতিষ্ঠার আগে যে সব অঞ্চল ছিল বিচ্ছিন্ন ও দূরধিগম্য তাদেরই একসূত্রে গ্রথিত ক'রে এক বিচিত্রবর্ণ পুষ্পহারের সৃষ্টি করেছে আমাদের রেলপথ—ভৌগলিক সান্নিধ্যে তাদের অন্তরঙ্গ করেছে। ভৌগলিক অখণ্ডতাকেও অতিক্রম ক'রে যে আত্মিক ঐক্যে আজ সারা ভারতবর্ষ প্রাণময়—তা' আন্তঃআঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সংযোগের জন্যই সম্ভবপর হয়েছে।

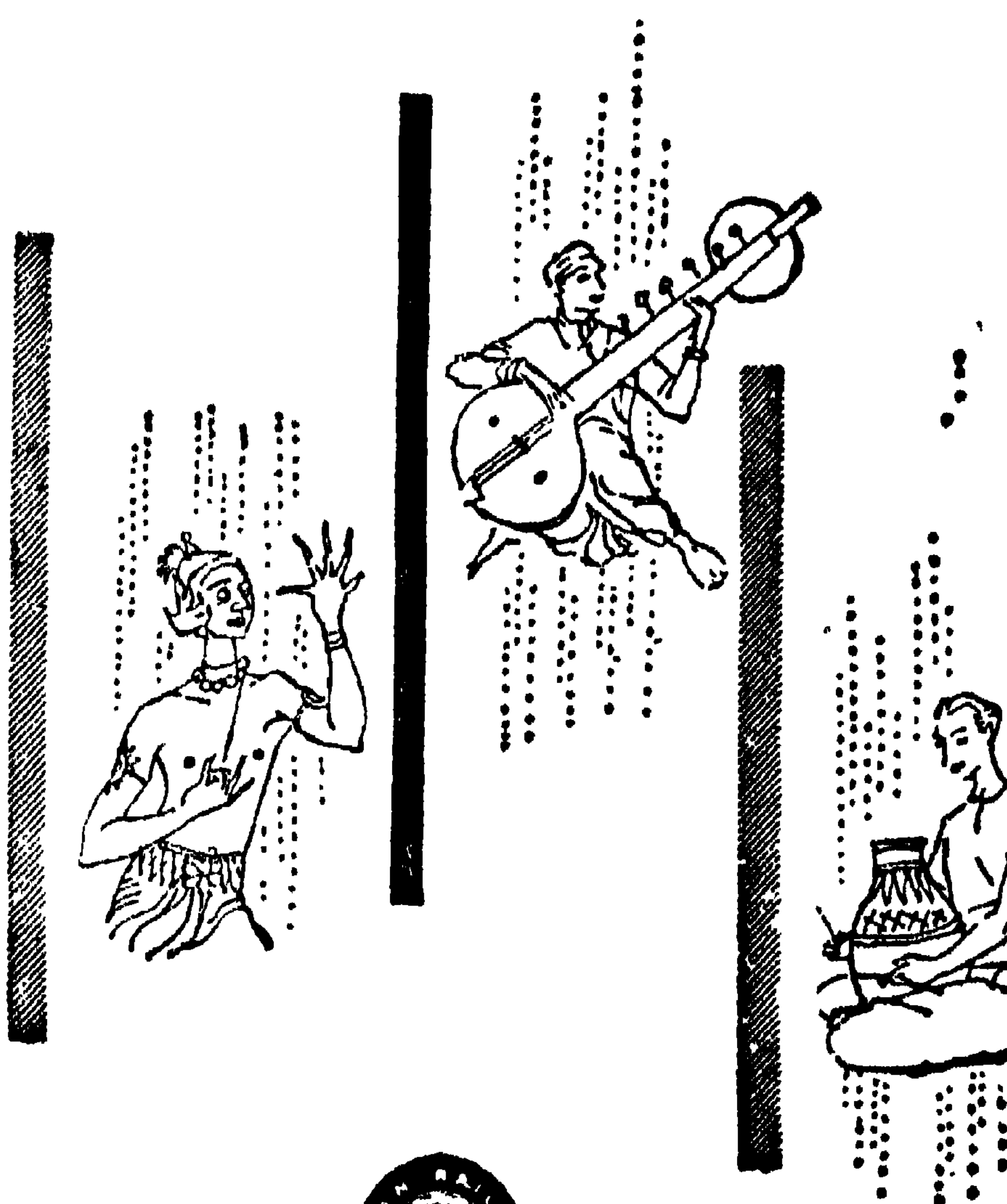

পূর্ব রেলওয়ে

ER/PA/G

রবীন্দ্র-গীতির নবতম অর্ঘ্য…………

ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন তোমরা আমায় ডাকো
কবে তুমি আসবে বলে
GE 25104

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই
ওরে আগুন আমার ভাই
N 82979

লং-প্লেয়িং রেকর্ডে চির নতুন গীতি-নাট্য

চণ্ডালিকা

ECLP 2273

পরিচালনা : সন্তোষ সেনগুপ্ত তত্ত্বাবধান : শান্তিদেব ঘোষ

—ভূমিকায়—

সুচিত্রা মিত্র, সুপ্রীতি ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়,
দ্বিজেন চৌধুরী, সন্তোষ সেনগুপ্ত ও অন্যান্য শিল্পী।

সাধারণ অটো-কাপলিং সেটেও পাওয়া যায়।

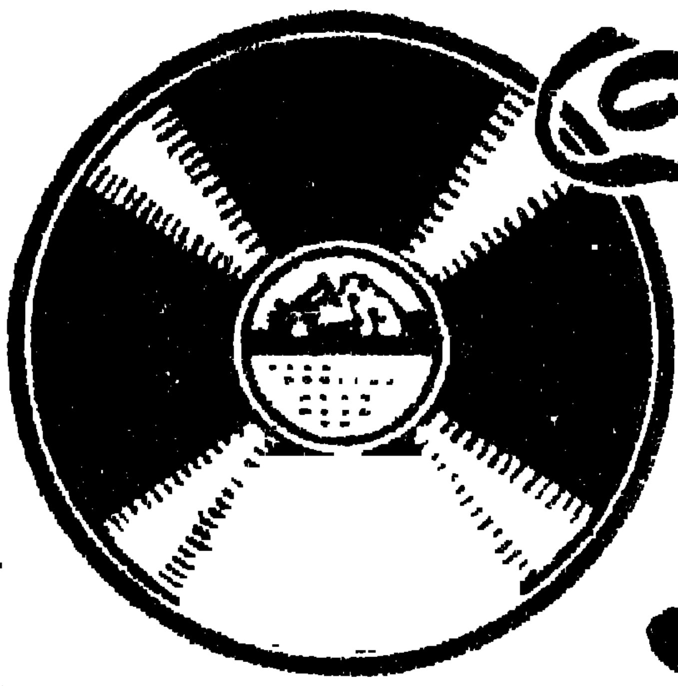

এবার পূজায়

"HIS MASTER'S VOICE"

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস • কলম্বিয়া

রেকর্ড নির্বাচন প্রতিযোগিতায়

১০৩ টি পুরস্কার

এবার পূজায় ২৩ খানি "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" ও কলম্বিয়া রেকর্ড বেরিয়েছে, বিস্তারিত তালিকা ডীলারদের দোকানে পাবেন। সেই রেকর্ডগুলি হতে আপনার পছন্দ অনুসারে ছয়খানি রেকর্ড বেছে দিয়ে আপনিও একটি মূল্যবান পুরস্কার পেতে পারেন। প্রতিযোগিতার প্রবেশপত্র বিনামূল্যে ডীলারদের দোকানে বা সরাসরি গ্রামোফোন কোম্পানী হতে পেতে পারেন। প্রবেশপত্র পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১শে অক্টোবর '৬২।

দ্বিতীয় পুরস্কার
এইচ. এম. ভি. এভারেস্ট-৪
ট্রানসিসটর ৪-স্পীড রেডিওগ্রাম

প্রথম পুরস্কার
এইচ. এম. ভি রেডিও
মডেল ৫২৬৯
এ.সি/ডি. সি

তৃতীয় পুরস্কার
এইচ. এম. ভি. শার্পা
৪-স্পীড রেকর্ড-প্লেয়ার
এটাচমেন্ট এ. সি. অথবা
ড্রাইব্যাটারি
চালিত।

আরও একশতটি বিশেষ পুরস্কার
বিস্তারিত নিয়মাবলী ও প্রবেশপত্র অনুমোদিত এইচ. এম. ভি - কলম্বিয়া ডীলারের দোকানে পাবেন।

দি গ্রামোফোন কোং লিঃ : কলিকাতা : বোম্বাই : মাদ্রাজ : দিল্লী

প্রকাশক শ্রীশরদিন্দু বসু
বিশ্বভারতী
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন • কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন • কলিকাতা ৯

চিত্র ও মলাট মুদ্রক
বেঙ্গল অটোটাইপ কোম্পানি
২১৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট • কলিকাতা ৬

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৩ মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯

THIS IS YOUR GUARANTEE FOR QUALITY CABLES

IS : 434

GLOSTER CABLES

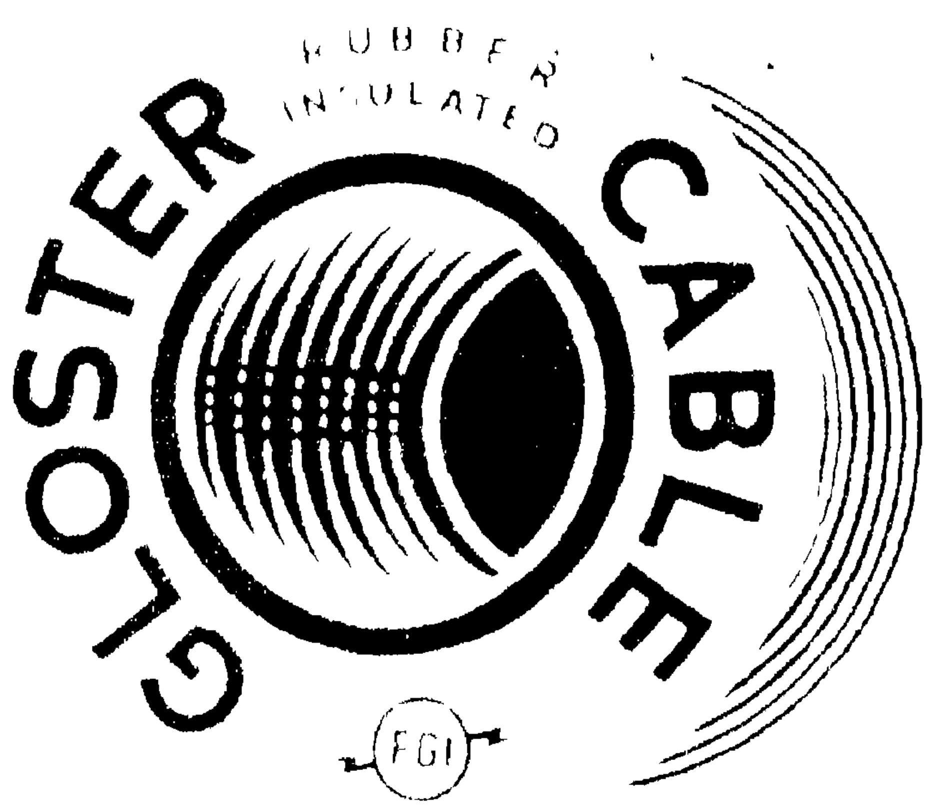

Gloster Cables are manufactured strictly according to British Standard Specification No. 7 and Indian Standard Specification No. 434.

Gloster Cables are manufactured by the most up-to-date process in technical collaboration with BRITISH INSULATED CALLENDER'S CABLES LIMITED, London, one of the foremost Cable manufacturers in the world. Their long experience has been built into Gloster Cables.

Gloster Cables are on D. G. S. & D. Rate Contract and are approved by all important State Electricity Boards, P. W. Ds and other Government Departments.

Each and every reel of Gloster Cables is individually tested and certified by the Director of Inspection (Met), Government of India and sealed with I. S. I. Certification Mark, No. IS : 434

FORT GLOSTER INDUSTRIES, LTD

CABLE DIVISION,
14, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-1.
Managing Agents: KETTLEWELL BULLEN & CO., LTD.

Aiyars. F. G. I. 30

প্রতি মাসের
৭ তারিখে আমাদের নূতন বই
প্রকাশিত হয়

স্মরণীয় বই
অ্যাসোসিয়েটেড-এর
গ্রন্থতিথি

সম্প্রতি প্রকাশিত

'প্রবাসী' ও 'Modern Review'-এর সম্পাদক
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ ৫·৭৫

১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন রেজা শাহ্ পহ্লবী ও রাজা ফৈজলের নিমন্ত্রণে ইরাণ ও ইরাক ভ্রমণে যান তখন লেখক রবীন্দ্রনাথের এই ভ্রমণের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সঙ্গী ছিলেন। এই দুটি দেশের সর্বত্র কবি যে সাদর অভ্যর্থনা ও বিপুল সম্মান লাভ করেছিলেন তার পূর্ণ বিবরণ ও চিত্র-পরিচয় লেখক পরিবেশন করেছেন এই গ্রন্থে। ইরাণ ও ইরাকের প্রাচীন ও আধুনিক কালের ইতিবৃত্ত, সভ্যতা ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের পরিচয়বহ প্রায় একশতখানি দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য চিত্র গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য। এই গ্রন্থখানি পাঠ করলে এই দুটি প্রাচীন দেশের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস, রাজনীতি, সভ্যতা ও সমাজ মানসলোকে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

ডীন অফ দি ফ্যাকাল্টি অফ ড্রামা, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা; মেম্বার, বোর্ড অফ স্টাডিজ ইন থিয়েটার আর্টস্, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের গিরিশ লেকচারার
পদ্মশ্রী নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর

নিজেরে হারায়ে খুঁজি ২০·০০

সেকালের নট ও নাট্যমঞ্চের বহু চিত্রে ও তথ্যে সমৃদ্ধ সুবৃহৎ গ্রন্থ ॥

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের

স্মৃতিচারণ ১ম খণ্ড ১২·০০ ॥ **স্মৃতিচারণ** ২য় খণ্ড ৬·৫০

প্রথম খণ্ডে আছে: দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, লোকেন পালিত, সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাচরণ মিত্র, কবি বিজয়চন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রোমাঁ রোলাঁ, বার্টরাণ্ড রাসেল, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, গোপীনাথ কবিরাজ প্রভৃতি···এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আছে: রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্দ্র ঘোষ, কাশী নরেশ, এস. ডোরাস্বামী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণের বৃত্তান্ত।

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বিবিধ গ্রন্থ

সুধীরচন্দ্র সরকারের
বিবিধার্থ অভিধান ৬·৫০

ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ'র
আকাশ ও পৃথিবী (গল্পাকারে বিজ্ঞান) ১০·০০

ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্যের
বাংলা কাব্যে শিব ১০·০০

নিরঞ্জন চক্রবর্তীর
উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য ৮·০০

অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর
অলঙ্কার-চন্দ্রিকা ৭·০০

ডঃ উমা দেবীর
গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব ৬·০০

কানাই সামন্তের
রবীন্দ্র-প্রতিভা ১০·০০

কাজী আবদুল ওদুদের
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১২·০০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
গ্রাম: কালচার ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৪-২৬৪১

বাংলা সাহিত্যের কয়েকখানি বরণীয় গ্রন্থ

॥ সাহিত্য-বিষয়ক ॥

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রবন্ধ সংগ্রহ ৭.৫০ ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত

বিমানবিহারী মজুমদার: **ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য** ১৫.০০ ; **পাঁচ শত বৎসরের পদাবলী** ৭.৫০ ॥ অজিত দত্ত: **বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস** ১২.০০ ॥ মদনমোহন গোস্বামী: **ভারতচন্দ্র** ৩.০০ ॥ ভবতোষ দত্ত: **চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র** ৬.০০ ॥ রথীন্দ্রনাথ রায়: **সাহিত্য-বিচিত্রা** ৮.৫০ ॥ নারায়ণ চৌধুরী: **আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন** ৩.৫০ ॥ অরুণ মুখোপাধ্যায়: **উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য** ৮.০০ ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ: **আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য** ৮.০০ ॥ সত্যব্রত দে: **চর্যাগীতি-পরিচয়** ৫.০০ ॥ অরুণ ভট্টাচার্য: **কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল** ৪.০০ ॥ প্রশান্ত রায়: **সাহিত্য দৃষ্টি** ৪.০০ ॥ সাধনকুমার ভট্টাচার্য: **রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা** ৬.০০ ; **নাটক ও নাটকীয়ত্ব** ২.৫০ ; **নাটক লেখার মূলসূত্র** ৫.০০ ॥ আজ্‌হারউদ্দীন খান্: **বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল** ৫.০০ ॥

॥ জীবনী সাহিত্য ॥

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য: **বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-কাহিনী** ১.৫০ ॥ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত: **বঙ্গের প্রাচীন কবি** ১.০০ ॥ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী: **ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ** ৫.০০ ; **শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে** ৫.০০ ॥ বলাই দেবশর্মা: **ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়** ৫.০০ ॥ প্রভাত গুপ্ত: **রবিচ্ছবি** ৬.০০ ॥ খাজা আহ্‌মদ আব্বাস: **ফেরে নাই শুধু একজন** ৪.০০ ॥ মণি বাগচি: **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ** ৪.৫০ ; **মাইকেল** ৪.০০ ; **কেশবচন্দ্র** ৪.৫০ ; **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র** ৪.৫০ ; **রামমোহন** ৪.০০ ॥ **রমেশচন্দ্র** ৫.০০ ॥

॥ বিবিধ গ্রন্থাবলী ॥

প্রবোধচন্দ্র সেন: **রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি** ৩.০০ ॥ অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়: **সমসাময়িক মনোবিজ্ঞান** ৪.০০ ॥ রাধাকৃষ্ণণ: **হিন্দু সাধনা** ৩.০০ ॥ তারাপ্রসন্ন দেবশর্মা: **রামায়ণতত্ত্ব** ৪.৫০ ॥ দীনেশচন্দ্র সেন: **রামায়ণী কথা** ৪.০০ ॥ ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী: **রামায়ণের কথা** ১.২৫ ; **ভারতজিজ্ঞাসা** ৩.০০ ; **মনোবিদ্যা ও দৈনন্দিন জীবন** ২.৫০ ॥ শিশিরকুমার নিয়োগী: **সহজ কৃত্তিবাসী রামায়ণ** ৩.৫০ ॥ বিশ্বেশ্বর মিত্র: **পৃথিবীর ইতিহাস প্রসঙ্গ** ৩.৫০ ॥ কল্যাণী কার্লেকর: **ভারতের শিক্ষা** ১ম খণ্ড ২.৫০ ; ২য় খণ্ড ৫.৩০ ॥ প্রফুল্লকুমার দাস: **রবীন্দ্র-সংগীত প্রসঙ্গ** ১ম খণ্ড ৩.৫০ ॥ সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়: **আফ্রিকার চিত্র** ১.৫০ ॥ সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়: **লাইবেরিয়ার উপকথা** ১.৫০ ॥ সুনীলকুমার গুহ: **স্বাধীনতার আবোল তাবোল** ৫.০০ ॥ সত্যকিঙ্কর সাহানা: **হিন্দুধর্ম** ১.৫০ ; **বিবিধ প্রবন্ধ** ২.৫০ ; **বিচিত্র প্রবন্ধ** ২.৫০ ॥ মণীন্দ্র সমাদ্দার: **প্রবাসী বাঙালীর কথা** ১.৫০ ॥ মানবেন্দ্রনাথ রায়: **মার্কসবাদ** ১.৫০ ; **দর্শন ও বিপ্লব** ১.৫০ ॥ শ্রীজ্ঞানান্বেষী: **দেশবিদেশের শিক্ষা** ৪.০০ ॥

॥ গল্প ও উপন্যাস ॥

বুদ্ধদেব বসু: **আমার বন্ধু** ২.০০ ; **চারদৃশ্য** ২.৫০ ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়: **লক্ষ্মী** ২.০০ ; **হাসি** ২.০০ ॥ বাণী রায়: **শূন্যের অঙ্ক** ২.৫০ ॥ সুবোধ মজুমদার: **অন্তর ও বাহির** ২.০০ ; **পলাতক** ৩.০০ ॥ বিদ্যুৎবাহন চৌধুরী: **অনুস্মৃতি** ২.৫০ ॥ কল্যাণী কার্লেকর: **কন্যা ও কুমার** ১.৭৫ ॥ সুধীররঞ্জন গুহ: **ময়নানদী** ৩.০০ ॥ সুবোধ বসু: **মানবের শত্রু নারী** ২.০০ ; **স্বর্গ** ২.০০ ; **পুনর্ভব** ২.৫০ ; **উর্ধ্বগামী** ৩.০০ ; **চিমনি** ৩.০০ ; **ইঙ্গিত** ২.৫০ ; **পদ্মা প্রমত্তা নদী** ৩.৭৫ ; **গল্পলতা** ৪.০০ ; **পদ্মানদীর ডাক** ১.৭৫ ॥ সুকুমার রায়: **কয়েকটি গল্প** ১.০০ ॥

জিজ্ঞাসা ॥ ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ : ১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

৪৯ বছর কাজ করছেন···গায়ে একটি আঁচড়ও লাগেনি

ভারতের কলকারখানায় দুর্ঘটনার হার ১৯৩৮ সালে প্রতি হাজার কর্মীপিছু ২৪ জন থেকে বেড়ে ১৯৫৯ সালে হাজারে প্রায় ৪৪ জন দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর দুর্ঘটনায় গড়ে ৯৩০০০ কর্মী জখম হন এবং তার মধ্যে প্রায় ২৫০ জন মারা যান। দুর্ঘটনার দরুণ বছরে প্রায় দশ লক্ষ ঘণ্টার কাজ নষ্ট হয়। এই নষ্ট সময় কাজে লাগালে ভারতীয় রেলওয়ের জন্যে ১৭০টি ব্রডগেজের ইঞ্জিন বা ৭০০টি রেলের কামরা তৈরী করা যায়।

টাটা স্টীল নিরাপত্তার দিকে সদাসর্বদা তীক্ষ্ণ নজর রাখে, কারণ তা নাহ'লে কোনো কর্মীই পুরোপুরি শক্তি দিয়ে কাজ করতে পারেন না। বছরে নিয়মিত 'নো অ্যাক্সিডেণ্ট মাস', নিরাপত্তা প্রদর্শনী, নিরাপত্তা সম্বন্ধে শিক্ষাদান, নিরাপত্তা পুরস্কার, নিরাপদে কাজ করবার সুযোগ-সুবিধে, নিরাপত্তাকে অভ্যাসে দাঁড় করানোর জন্যে যুক্ত পরিষদের পরিচালনায় টানা অভিযান চালানো···জামশেদপুর কারখানায় দুর্ঘটনা দূর করার জন্যে এইসব উপায় অবলম্বন করা হয়।

কাজে নিরাপত্তা কিন্তু কর্মীর নিজের ওপরই বিশেষভাবে নির্ভর করে, কারণ দেখা যায়, প্রায় ৭৫ ভাগ দুর্ঘটনা মানুষের অসাবধানতার জন্যে ঘটে। কিন্তু এরই আর একটি দিক হল টাটা স্টীলের আজকের সবচেয়ে পুরোনো কর্মী যমুনা দুবে। ৪৯ বছর ধরে দুবে টাটা স্টীলের কারখানায় কাজ করছেন অথচ আজ পর্যন্ত তাঁর কোনো আঘাত লাগেনি, এমন কি একটা আঁচড় পর্যন্ত না।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ইস্পাত নগরী জামশেদপুরে এসে দুবে যে জিনিষগুলি প্রথমেই শেখেন তার মধ্যে প্রধান হ'ল হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা···জামশেদপুরে শিল্প শুধু জীবিকা অর্জনের উপায় নয়, জীবনেরই অঙ্গ।

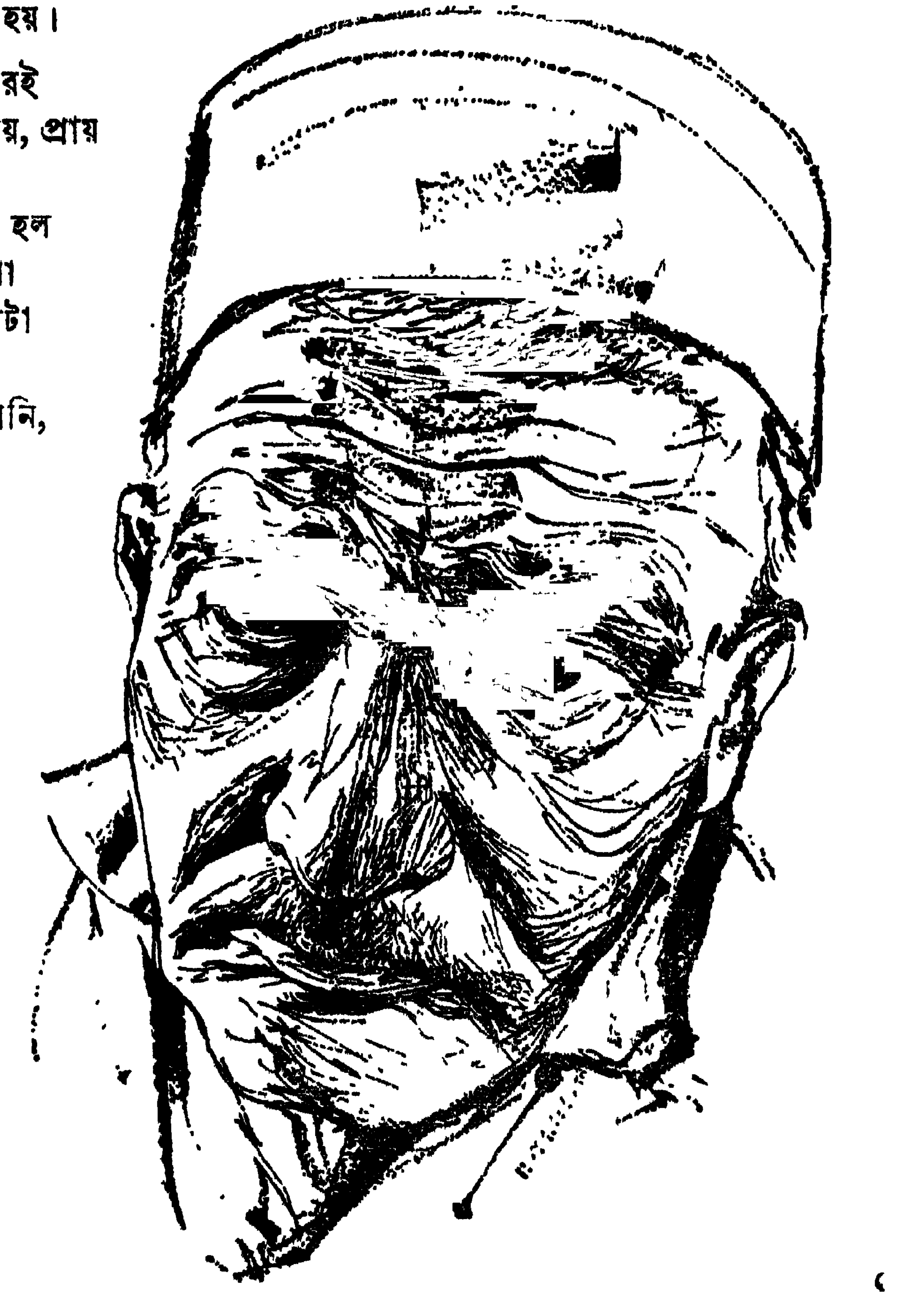

জামশেদপুর
ইস্পাত নগরী

The Tata Iron and Steel Company Limited

JWTTN 6093

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

পাল্‌কি চলে
কোথাও যাযাবর বেদুইন দস্যুদল দিগন্তে বিলীন বিশাল মরু-প্রান্তরের বুকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে···শ্যামল অরণ্যে শিকারের অন্বেষণে বিচরণ করছে হিংস্র শ্বাপদ··· কাজল-কালো অথৈ জলে ভেসে চলেছে 'ময়ূরপঙ্খি নাও' —আবার কোথাও রয়েছে ঊর্মিমুখর বিস্তীর্ণ নীলাম্বু··· সুদূরের হাতছানি যখন কিশোর রবীন্দ্রনাথকে ব্যাকুল করে তুল্‌ত তখন তিনি ঠাকুমা'র আমলের একটা পুরনো পাল্‌কির ভিতরে চুপি চুপি ঢুকে পর্দা টেনে দিয়ে বসে পড়তেন। তারপর চোখ দু'টি বুজে কল্পনা করতেন পাল্‌কিটা যেন যাদুমন্ত্রে ভরা একটা উড়ন্ত গালিচা, তাঁকে নিয়ে শূন্যপথে ভেসে চলেছে মায়ায় ঘেরা অচেনা অজানা কোন রাজ্যে। দেশ-দেশান্তরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতেন তিনি। উত্তরকালে কবিগুরু সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন। 'জগতের আনন্দ-যজ্ঞে' নানা বৈচিত্র্য ও অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি দু'টি নয়ন মেলে অপরূপকে দেখেছেন—কৈশোরে একটা পাল্‌কির মধ্যে বসে দেখা স্বপ্ন 'সত্য' হয়ে উঠেছে।
ডানলপ
কর্তৃক প্রচারিত
'পথিক কবি' পর্যায়ের অন্যতম
DC-558 BEN

সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহ দান

বিগত দশ বছরে তাঁতিগণের সমবায় সমিতি গঠনে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। প্রথম দিকেই অখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত বোর্ড বুঝতে পারেন যে এই শিল্পের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে সমবায় পদ্ধতিই হ'ল সবচাইতে ভালো উপায় এবং তাঁতিগণের সমবায় ও প্রধান সমিতি গড়ে তোলার জন্য সেস্ তহবিল থেকে রাজ্য সরকারগুলিকে সাহায্য করা হয়। কার্য্যকরী তহবিলের জন্য সেস্ তহবিল থেকে এ পর্য্যন্ত ৮.২৮ কোটি টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে।

কাঁচা মাল কেনা এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদি বণ্টন করা সম্পর্কেও সমবায় সমিতিগুলিকে সুযোগ সুবিধে দেওয়া হয়।

১৯৫২ সালে সমবায় সমিতি-গুলির অধীনে ৭,০০,০০০ তাঁত ছিলো, বর্ত্তমানে এই তাঁতের সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজারেরও বেশী।

অখিল ভারত

হস্তচালিত তাঁত বোর্ড

ভারতের সর্ব্ববৃহৎ কুটির শিল্পের অন্যতম সহায়ক

DA 62/373

কিউ করে দাঁড়ানোই ভাল
অন্যথায় দেরী হবার সম্ভাবনা
HABIT
যার যার নিজের পালা না আসা পর্য্যন্ত
অপেক্ষা করাই হল সভ্য সমাজের প্রথা। যত তাড়াই
থাকুক না কেন, সারিতে দাঁড়াবার অভ্যাস করে
নিজের এবং রেলওয়ের পক্ষেও রেলযাত্রা
সুবিধাজনক করে তুলুন। মনে রাখবেন, শৃঙ্খলার
অনেক গুণ আর হুড়োহুড়ি মানেই কাজের গণ্ডগোল
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

IISCO

দি
ইণ্ডিয়ান আয়রন
অ্যাণ্ড স্টীল
কোং লিঃ

কারখানা : বার্নপুর ও কুলটি (পশ্চিমবঙ্গ)

উৎপন্ন দ্রব্য :

রোল করা ইস্পাতের জিনিস :— ব্লুম, বিলেট, স্ল্যাব, রেল, স্ট্রাকচারাল সেকশন, রাউণ্ড, স্কোয়ার, ফ্ল্যাট, ব্ল্যাক শীট, গ্যালভানাইজ করা প্লেন শীট, করোগেট করা শীট • স্পান আয়রন পাইপ, ভার্টিকেলি কাস্ট আয়রন পাইপ, হ্যাণ্ড স্টেম্পিং পাইপ, আয়রন কাস্টিং, স্টীল কাস্টিং, নন্-ফেরাস কাস্টিং • হার্ড কোক, অ্যামোনিয়াম সালফেট, সালফিউরিক অ্যাসিড, বেঞ্জল থেকে তৈরী জিনিসপত্র।

ম্যানেজিং এজেন্ট :
মার্টিন বার্ন লিঃ
মার্টিন বার্ন হাউস, ১২ মিশন রো, কলিকাতা ১
শাখা : নয়া দিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা
দক্ষিণ ভারতে এজেন্ট : দি সাউথ ইণ্ডিয়ান এক্সপোর্ট কোং লিঃ, মাদ্রাজ ১

MC-89A BEN

পায়ে হেঁটে পরমায়ু

রোদের খরতা যখন কম, ঘর ছেড়ে আসুন বাইরে—খোলা হাওয়ায়। চলুন পায়েহাটা পথ ধরে যেখানে দুচোখ চায়, বাধা নেই সেই প্রান্তরে। খোলা আকাশ, খোলা বাতাস, এই পথ প্রকৃতির। তাই নীরোগ আনন্দ এই পথে, এই পথে পরমায়ু। এই হাঁটাপথে চলতে পথিকের পরম বন্ধু বাটা।

টাফিস ১১.৯৫—১৫.৫০

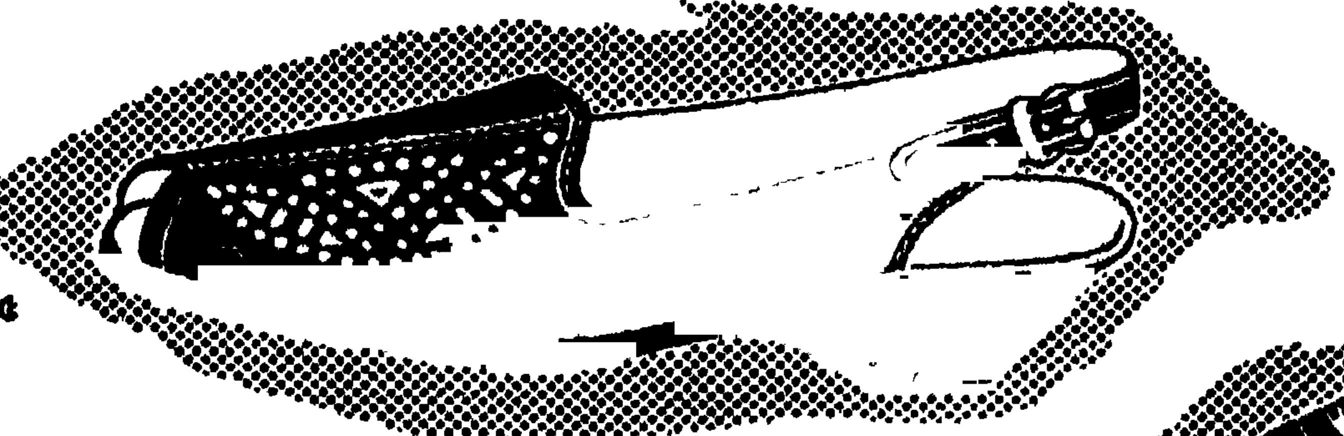

আজা ১২.৯৫

লংলাইফ অক্সফোর্ড ১৬.৫০

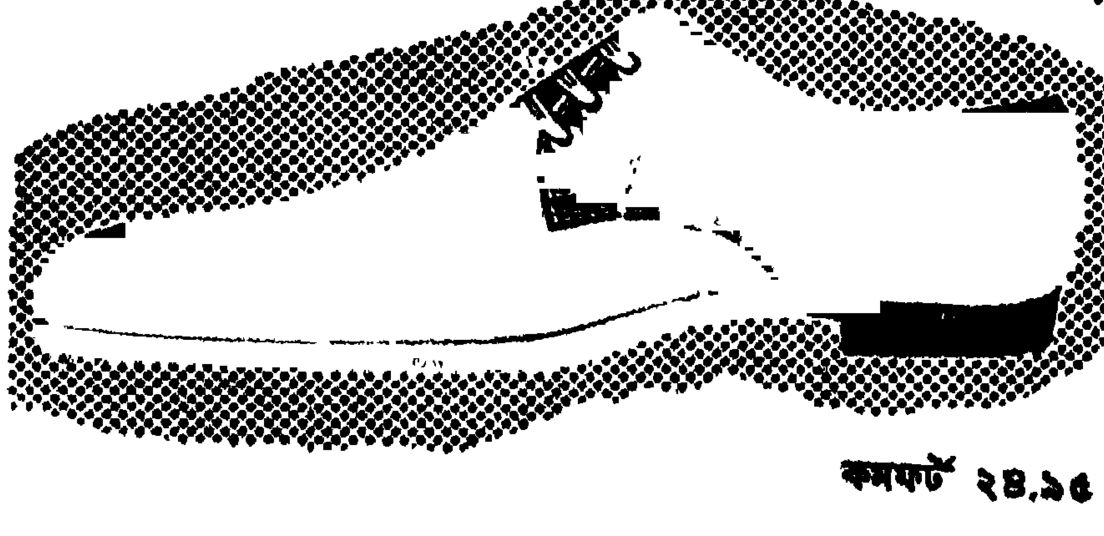

Bata

কমফর্ট ২৪.৯৫

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

গ্রন্থটি রচনার জন্য ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫৲]

রামায়ণ : কৃত্তিবাস বিরচিত

পূর্ণাঙ্গ রামায়ণটির বহুবর্ণ চিত্র সমন্বিত যুগরুচিসম্মত অনিন্দ্য প্রকাশন !
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। [৯৲]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলন, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের আধুনিকতম আকরগ্রন্থ। [২৫৲]

রবীন্দ্র-দর্শন

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্রজীবনবেদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা [২৷০]

জীবনের ঝরাপাতা

রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবীচৌধুরানীর আত্মচরিত। ঠাকুরবাড়ির আলেখ্য। [৪৲]

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান

পরিবর্ধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। [৮৷০]

Samsad Anglo-Bengali Dictionary

বহু প্রশংসিত উচ্চমানবিশিষ্ট ইংরাজী-বাঙ্গালা আধুনিক শব্দকোষ। [১২৷০]

বঙ্কিম-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪ খানি একত্রে) তৃতীয় মুদ্রণ বাহির হইল।
[১২৲]

দ্বিতীয় খণ্ড সমগ্র সাহিত্য-অংশ একত্রে
[১৫৲]

রমেশ-রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস একত্রে
[৯৲]

উভয় রচনাবলীই শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও লেখকদিগের সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। উপহারে ও গ্রন্থাগারে অপরিহার্য।

পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন :

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ॥

বা ক্‌-সা হি ত্যে র ব ই

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
সাংস্কৃতিকী ৫·৫০

বিনয় ঘোষের
সুতানুটি সমাচার ১২·০০
বিদ্রোহী ডিরোজিও ৫·০০

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের
সাহিত্য-সংস্কৃতি-সময় ৪·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নিশিপদ্ম (৩য় সং) ৪·০০

শংকর-এর
চৌরঙ্গী (৫ম সং) ১০·০০
এক দুই তিন (৬ষ্ঠ সং) ৪·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর
শ্রেষ্ঠগল্প (২য় সং) ৪·০০
ভবঘুরে ও অন্যান্য ৬·৫০

শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত
রবীন্দ্রায়ণ দুই খণ্ড প্রতি খণ্ড ১০·০০

ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহের
চীনের ড্রাগন ৩·৫০

জন হাওয়ার্ড গ্রিফিনের
আলো থেকে অন্ধকারে ২·৫০
অনুবাদ—নিখিল সরকার

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
অযাত্রায় জয়যাত্রা ৪·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
হসন্তী ৪·৫০

জরাসন্ধ-এর
মসিরেখা ৯·০০
পাড়ি (৬ষ্ঠ সং) ৩·৫০ **আশ্রয়** (৩য় সং) ৩·৫০

সুবোধ ঘোষের
চিত্তচকোর (২য় সং) ৩·০০

বাক্‌-সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

নববর্ষের নূতন গ্রন্থসম্ভার

স্বামী দিব্যাত্মানন্দের
সমগ্র ভারততীর্থ পরিক্রমার কাহিনী
পুণ্যতীর্থ ভারত ১০৲

ডঃ বিজিতকুমার দত্তের
বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ৮॥০

জরাসন্ধের নূতন উপন্যাস
ছায়াতীর ৫৲

অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজে'র পরবর্তী কাহিনী
হিংলাজের পরে ৫৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
যাত্রাপথ ৪॥০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
মেঘ ও মৃত্তিকা ৫৲

বিমল করের
পান্থশালা ৩॥০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
সন্ধ্যার কুয়াশা ৫৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অপরাজিত ৯৲ **পথের পাঁচালী** ৫॥০

নলিনীকান্ত সরকারের
দাদাঠাকুর ৫৲

বিমল মিত্রের ক্লাসিক উপন্যাস
কড়ি দিয়ে কিনলাম ১ম-১৬৲ ২য়-১৪৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
কাল, তুমি আলেয়া ১২॥০

=ছোটদের সোনার বই=
বিমল ঘোষ (মৌমাছি)র
রূপকথার ঝুলি ৩॥০

প্রমথনাথ বিশীর
রবীন্দ্র-সরণী ১০৲

যামিনীকান্ত সোমের
শ্রীনেহেরু ১৸০

প্রমথনাথ বিশী ও ডঃ বিজিতকুমার দত্তের
বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক ১২॥০

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

গীত-ভানু

('দক্ষিণী' পরিচালিত শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র)
১৩২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯।

নূতন-শিক্ষাবর্ষ

জানুয়ারী মাস থেকে 'গীত-ভানু'র নূতন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা আরম্ভ হয়েছে। কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত ও সেতার শিক্ষাদান করা হয়। শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত চর্চার অনুকূল পরিবেশে আদ্য মধ্য ও অন্ত্য শ্রেণীতে বিভক্ত ছয় বছরের শিক্ষাক্রম, যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ৩৬টি রাগরাগিণী ও ১২টি তালের সঙ্গে পরিচয় হবে। শিক্ষা-পরিষদ : শচীনদাস মতিলাল (প্রধান অধ্যাপক), মণিলাল নাগ, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র নায়ক ও দীপক মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা গ্রহণ ও ভর্তির সময় : শনিবার ৪—৭ ও রবিবার সকাল ৮—১১।

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি অর্ঘ্য

রবীন্দ্রবীক্ষা ১২·০০

সম্পাদনা : **ডক্টর নীলরতন সেন**

"শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ ও সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, 'রবীন্দ্রবীক্ষা' তন্মধ্যে অন্যতম।" —দেশ

"আলোচ্য গ্রন্থটি একটি উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। নানাদিক থেকে এই সংকলন গ্রন্থটি মামুলি সংকলনের চলতি পথের যাত্রী নয়। এই গ্রন্থের সম্পাদনার পশ্চাতে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত ছিল যার ফলে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, তাঁর জীবনের ভিত্তিভূমি, আদর্শ, ব্যপ্তি ও গভীরতাকে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকের কাছে বইটি বিশেষ ভাবে সমাদৃত হবে।" —যুগান্তর

পঁচিশ জন সাম্প্রতিক কবি ৪·০০

সম্পাদনা ॥ **দিনেশ দাস**

পঁচিশ জন কবির কবিতা সংকলন

শরৎচন্দ্র : দেশ ও সমাজ ২·০০

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি তরু দত্ত ২·৫০

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য ও জীবনী আলোচনা

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ১·০০

রাখাল ভট্টাচার্য

উইলিয়াম ফকনার ১·০০

কৃষ্ণগোপাল চট্টোপাধ্যায়

রবার্ট ফ্রস্ট ১·০০

বাণী রায়

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট : কলিকাতা-বারো

ডায়াল : ৩৪-২৩৮৬

রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে

বিস্ময়কর প্রকাশ

রবীন্দ্র-সাগর সংগমে

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

এযাবৎ রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ইহা তাহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একখানি প্রাচীন দলিল-বিশেষ।

প্রাচীন, দুর্লভ, বিস্মৃত পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদি হইতে সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের ত্রিশখানি কাব্য, উপন্যাস ও নাটকের সমালোচনা, বিভিন্ন পুরাতন পত্র-পত্রিকা হইতে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক টীকাটিপ্পনী, লোকান্তরিত একষট্টিজন সাহিত্যরথীর অনুকূল ও প্রতিকূল রচনা, বঙ্গদেশের বিশিষ্ট মনীষীবর্গের খণ্ড মন্তব্য, লেখক-পরিচিতি ও রবীন্দ্রনাথের চিত্রসহ অপরাপর লেখকগণের চল্লিশখানি চিত্রের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ এই বৃহৎ সংকলন।

॥ যাঁদের রচনায় সমৃদ্ধ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, বিপিনচন্দ্র পাল, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, প্রিয়নাথ সেন, নিত্যকৃষ্ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমণীমোহন ঘোষ, প্রমথ চৌধুরী, বিপিনবিহারী গুপ্ত, ললিতকুমার বন্দ্যোপা ধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বিহারীলাল গোস্বামী, চিত্তরঞ্জন দাশ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সরলা দেবী, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, বিনয়কুমার সরকার, শশাঙ্কমোহন সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, দীনেশচন্দ্র সেন, রাজশেখর বসু, সরসীলাল সরকার, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, অমরেন্দ্রনাথ রায়, মোহিতচন্দ্র সেন, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, সতীশচন্দ্র রায়, অতুল গুপ্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মোহিতলাল মজুমদার, সুখরঞ্জন রায়, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস (অরসিক রায়), অকিঞ্চন দাস প্রভৃতি।

সাইজ : ডিমাই • পৃষ্ঠা : ৫৭৭ • মূল্য : দশ টাকা

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : : কলিকাতা-১২

কয়েকটি দরকারী বই

শ্রীতারিণীশংকর চক্রবর্তীর

বাংলার উৎসব

বাংলার বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্রত-পার্বণের
ইতিহাস, কাহিনী ও কিংবদন্তী সংবলিত সরস পরিচয়

—পাতায় পাতায় ছবি—

দাম : এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা

হাতের কাজ

কম মূলধনে ও সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়ে
যে-সব জিনিস হাতে তৈরি করা যায়
তার সচিত্র বিবরণ

তিনখণ্ডে প্রকাশিত : প্রতি খণ্ডের দাম '৫০

আমাদের পতাকা

জাতীয় পতাকার ক্রম-পরিবর্তনের
ইতিহাস ও পতাকা-ব্যবহারের
সঠিক নির্দেশ

দাম : '৫০

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

প্রকাশন বিক্রয়-কেন্দ্র
নিউ সেক্রেটারিয়েট
১ হেস্টিংস্ স্ট্রীট, কলিকাতা-১

প্রকাশন-শাখা
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ
৩৮ গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭

ড. রবীন্দ্রনাথ মাইতি

চৈতন্য-পরিকর ১৬·০০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী ৫·০০

ড. শান্তিকুমার দাসগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য ১০·০০

ড. ক্ষুদিরাম দাস

রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় ১০·০০

ড. বিমানবিহারী মজুমদার

রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান ৬·০০

সোমেন্দ্রনাথ বসু

রবীন্দ্র অভিধান

প্রথম খণ্ড ৬·০০

দ্বিতীয় খণ্ড ৬·০০

সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ ৪·০০

বিদেশী ভারত সাধক ৩·৫০

শিশির চট্টোপাধ্যায়

উপন্যাস-পাঠের ভূমিকা ৫·০০

ড. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

লিপিবিবেক ৬·০০

মোহিতলাল মজুমদার

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র ১০·০০

ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান ৬·০০

অমিতাভা মৈত্র

আধুনিক শারীরশিক্ষা ২·৫০

(মেয়েদের জন্য)

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন

বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ ৬·৫০

ধীরানন্দ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা ১২·০০

রাবীন্দ্রিকী ৪·৫০

বাংলা উচ্চারণকোষ ৩·০০

জগদানন্দের পদাবলী ৩·০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২·৫০

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য ১০·০০

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাস ৮·০০

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প ৩·০০

শিশির দাস

মধুসূদনের কবিমানস ২·৫০

গোপালদাস চৌধুরী ও
প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত

প্রবাদ-বচন ৬·০০

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

অনুন্নত দেশের অর্থনীতি ৪·০০

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালিদাসের কাব্যে ফুল ৪·০০

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড : ১ শংকর ঘোষ লেন। কলিকাতা-৬

শাখা : এলাহাবাদ, পাটনা। গ্রাম : বাণীবিহার। ফোন : ৩৪-৪০৫৮

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

শ্রাবণী ৯.০০

যুগান্তকারী উপন্যাস : যা আজকের দিনের বুদ্ধিজীবী জীবনের সংহিতা। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের চিন্তা ও অস্তিত্ব সমস্যায় সজীব—প্রেম আর প্রয়োজনের দুর্নিবার দ্বন্দ্ব।

মহালগ্ন ৩.০০ এ্যালবার্ট হল (যন্ত্রস্থ) প্রিয়তমের চিঠি ৩.০০

সজনীকান্ত দাসের

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস

সম্পর্কে ডঃ সুশীলকুমার দে মন্তব্য করেছেন

…গ্রন্থটিকে বিশেষজ্ঞের সঙ্কলন মাত্র অথবা গবেষকের প্রমাণপঞ্জী বলিয়া ধরিলে ভুল করা হইবে। সজনীকান্তের লেখনী-পুণ্য শুধু তথ্য মাত্র সন্ধানী নয়। নীরস বস্তুকে অপরূপ সরসতায় অভিষিক্ত করিবার ক্ষমতাও রাখে।……

বাংলা গদ্যের আদিযুগের ভাষা ও সাহিত্যিক রূপ থেকে রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাল পর্যন্ত বিবর্তন-বিশ্লিষ্ট আলোচনা। দুষ্প্রাপ্য ভাষার প্রতিচিত্রগুলি গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। ১৪.০০

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের—দিকবিদিক ৩.৫০

মিত্রালয় :: ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বাসবদত্তার
গৃহস্থবধূর ডায়েরী ৭.০০
যুগোপযোগী উপন্যাস

মোহিতলাল মজুমদারের
কাব্য-মঞ্জুষা (সম্পূর্ণ ও টীকা সম্বলিত) ১০.০০

ডঃ মনোরঞ্জন জানার
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ৮.০০
(সাহিত্য ও সমাজ)
রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক) ১২.৫০

নারায়ণচন্দ্র চন্দের
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ৭.০০

ঋষি দাসের
রত্নদীপ ২.৮০

সুনীল দত্তের
বর্ণ-পরিচয় ২.৫০
(বিদ্যাসাগরের জীবনী অবলম্বনে নাটক)

মৃণালকান্তি দাশগুপ্তের
পরমারাধ্যা শ্রীমা (৪র্থ সং) ২.৫০
রূপ হতে অরূপে ২.৫০
মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ৬.০০
মুক্তিপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা ৬.০০

সন্তোষকুমার কুণ্ডুর
বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ৪.০০

সুখময় মুখোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র-সাহিত্যের নবরাগ ৫.০০
বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর :
স্বাধীন সুলতানদের আমল ১৩.৫০

ভূতনাথ ভৌমিকের
স্বামী বিবেকানন্দ ৩.০০

অধ্যাপক রমণীমোহন চক্রবর্তী
বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কাল ৫.০০

ভারতী বুক স্টল ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ Dial 34-5178

॥ 'বেঙ্গল'এর বই বলতেই বোঝায় সেরা লেখকের সার্থক সৃষ্টি ॥

পুনর্মুদ্রণ

দেবেশ দাশের

ইয়োরোপা ৮ম মুঃ ৩·০০

রাজসী (৩য় মুদ্রণ) ৩·০০

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

জর্জ বার্নার্ড শ ২য় মুঃ ১০·০০

শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও চিন্তানায়কের বিচিত্র জীবনের আশ্চর্য রূপায়ণ দুটি খণ্ড একত্রে।

বিনয় ঘোষ-কৃত

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১ম খণ্ড ১২·৫০

অতি দুষ্প্রাপ্য, জীর্ণ ও ব্যবহারের অযোগ্য কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা ঘেঁটে বাংলার সমাজ, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা, ও সংস্কৃতি বিষয়ে যাবতীয় উপকরণ এই সংকলনে বিষয়ভেদে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিস্তারিত সম্পাদকীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য ও টীকা সংযোজিত। ১৮৪০ সন থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত বিষয় সংকলিত। এই ধরনের আরো ক'টি খণ্ড প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থ-প্রকাশনে ভারত ও বাংলা সরকারের অর্থানুকূল্যের জন্য রয়েল অক্টাভো সাইজের ৬০০ পৃষ্ঠার বই, আর্ট প্লেট ও বোর্ড বাঁধাই সমেত মূল্য নামমাত্র করা হয়েছে।

বাঙালীর নব জাগরণ-ইতিহাসের প্রাথমিক আকর-গ্রন্থ

এই লেখকের আরো একটি বই :

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১ম খণ্ড : ৩·০০ ॥ ২য় খণ্ড : ৭·০০ ॥ ৩য় খণ্ড : ১২·০০

প্রবোধকুমার সান্যাল

রাশিয়ার ডায়েরী

কমিউনিস্ট জগৎ ও জীবনের ওপর হার্দ্য নির্মম ও অন্তরঙ্গ দৃষ্টিপাত। ১ম খণ্ড : ১৪·০০। ২য় খণ্ড : ১২·০০। দুটি খণ্ড একত্রে ২৫·০০।

দেবতাত্মা হিমালয় ১ম খণ্ড (১০ম মুঃ) ৯·০০। ২য় খণ্ড (৬ষ্ঠ মুঃ) ১০·০০

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
বৈদেশিকী সচিত্র সংস্করণ ৫·৫০

শিবনাথ শাস্ত্রীর
ইংলণ্ডের ডায়েরী ৪·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর
চতুরঙ্গ ৩য় মুঃ ৪·৫০

নিখিলরঞ্জন রায়ের
সীমান্তের সপ্তলোক ৩·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আমার কালের কথা ২য় মুঃ ৪·০০

যোগেশচন্দ্র বাগলের
বিদ্রোহ ও বৈরিতা ৩·০০

হুমায়ুন কবিরের
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ২য় মুঃ ৩·৫০

নারায়ণ চৌধুরীর
বাংলার সংস্কৃতি ৩·০০

অশোক মিত্রের
ভারতের শিল্পকলা ১৫·০০

বিনায়ক সান্যালের
রবি-তীর্থ ৪·০০

সরলাবালা সরকারের
হারানো দিন ৩·০০

শশিভূষণ দাশগুপ্তের
ব্যান ও বন্যা ৩·০০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
চরণিক ৩·০০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
বিগত দিন ৩·০০

বুদ্ধদেব বসুর
হঠাৎ আলোর ঝলকানি ২য় মুঃ ২·৫০

বিক্রমাদিত্যের
যুদ্ধের ইয়োরোপ ৮·০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

এন. আর. বোস অ্যাণ্ড কোম্পানী

কলিকাতা-৬

[কাগজ সরবরাহক]

ফোন—৫৫-৪৪০০

পোস্ট বক্স—১১৪৪৬

গ্রাম—পেপার গুডস্।

জগদী[illegible]বা[illegible]র গী[illegible]া

মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা অন্তর্-রহস্য ভূমিকাসহ অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ৬·০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম — শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা ৫·০০

ভারত-আত্মার বাণী — ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতির কথা ৩·০০

শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১·৫০

কর্মব[illegible]ণী ১·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	বাংলার ঋষি	৩·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	বাংলা[illegible] মনীষী	১·২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	বাং[illegible]র বিদুষী	২·০০
আচার্য জগদীশ	২·০০	রাজর্ষি [illegible]মমোহন	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০	[illegible]নন্দ	১·৫০
জীবন গড়া	·৭৫	রবীন্দ্রনাথ	১·২৫

ব্যবহা[illegible] শব্দকোষ

প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান বহুল পরিবর্তিত ও বহু পরিশিষ্ট-সংবলিত ৯·৫০

STUDENTS' OWN DICTIONARY OF WORDS, PHRASES & IDIOMS

প্রয়োগমূলক নূতনধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান। এই দুই যুগান্তকারী সুসঙ্কলিত সর্বদা-ব্যবহার্য অভিধান প্রত্যেকের অপরিহার্য। ৭·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী। ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

গীত-বিতান
কলিকাতা

একুশ বছর পূর্বে ১৯৪১ সালে কবিগুরুর পবিত্র নাম নিয়ে রবীন্দ্র-স্মারক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে গীতবিতান নবদিগন্তের সূচনা করে। সুদীর্ঘ একুশ বছর ধরে গীতবিতান রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্য, অভিনয় ও সাহিত্য প্রচারে ও প্রসারে নিরলস চেষ্টা করে এসেছে। সেই দীর্ঘ সাধনা নিয়ে আজও গীতবিতান এগিয়ে চলেছে।

গীতবিতান

২৫-বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৫

ফোন ॥ ৪৮-৩২০০

গীতবিতান দুইটি সংগীতবিদ্যালয় পরিচালনা করছে। তার মাধ্যমে সংগীতশিক্ষাদানের সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন সংগীত -বিষয়ে অন্ত্যপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের গীতভারতী, সংগীতভারতী, সুরভারতী, নৃত্যভারতী ও সংগীতশ্রী উপাধি দেওয়া হয়।

গীতবিতান শিক্ষায়তন

রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্যকলা ও যন্ত্রসংগীত শিক্ষা দেওয়া হয়।

সংগীতভারতী

উচ্চাঙ্গ সংগীত, রাগপ্রধান, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

॥ শাখা বিদ্যালয় ॥

উত্তর-কলিকাতায় ও বালিগঞ্জে **গীতবিতান শিক্ষায়তনের** দুটি শাখায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। ঠিকানা যথাক্রমে—

১৭।১।এ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ॥ ফোন ৫৫-৪৪৩৩

৪১।ডি একডালিয়া রোড, কলিকাতা ১৯

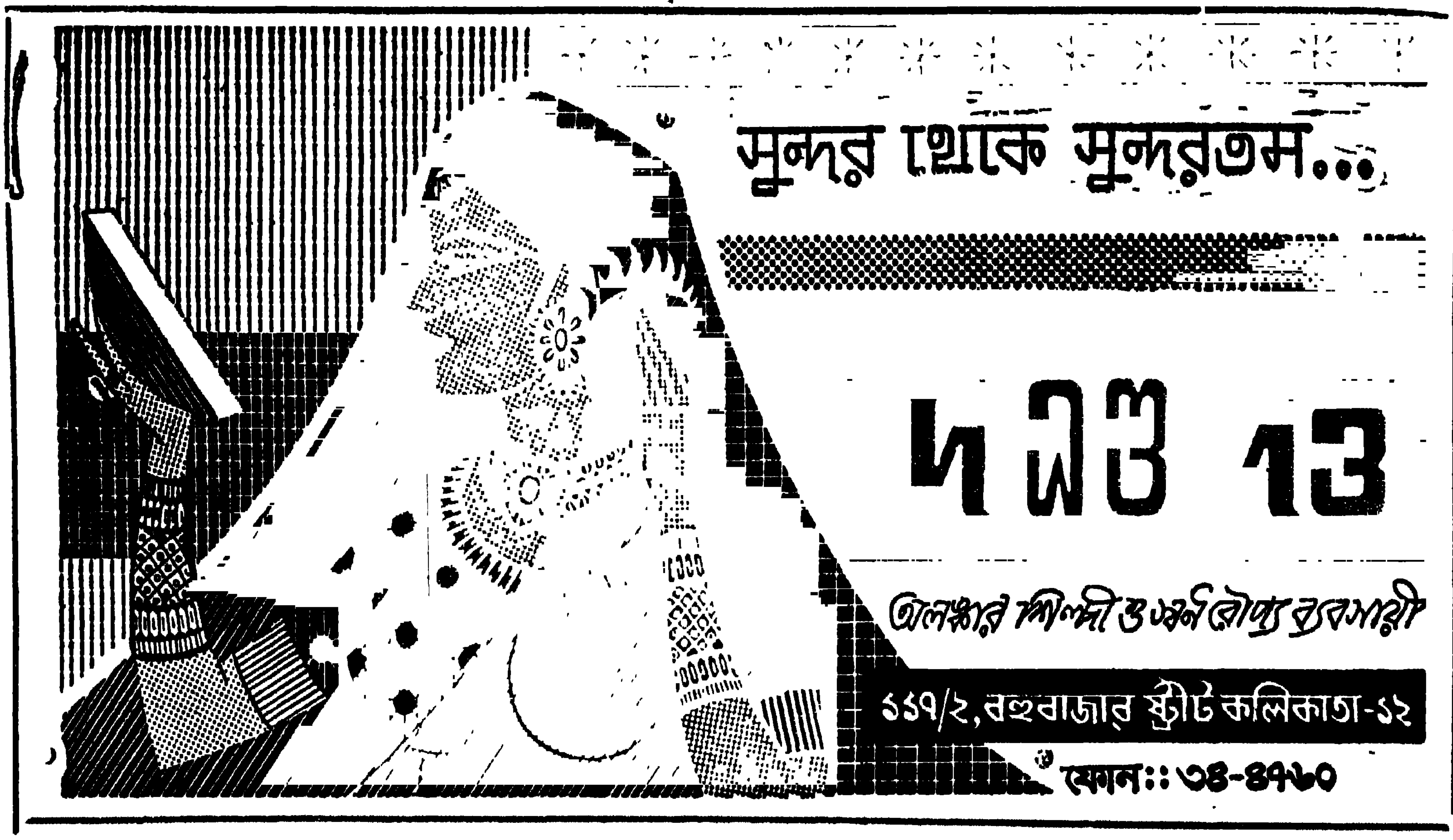
সুন্দর থেকে সুন্দরতম...
অলঙ্কার শিল্পী ও স্বর্ণরৌপ্য ব্যবসায়ী
১১৭/২, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২
ফোন:: ৩৪-৪৭৮০

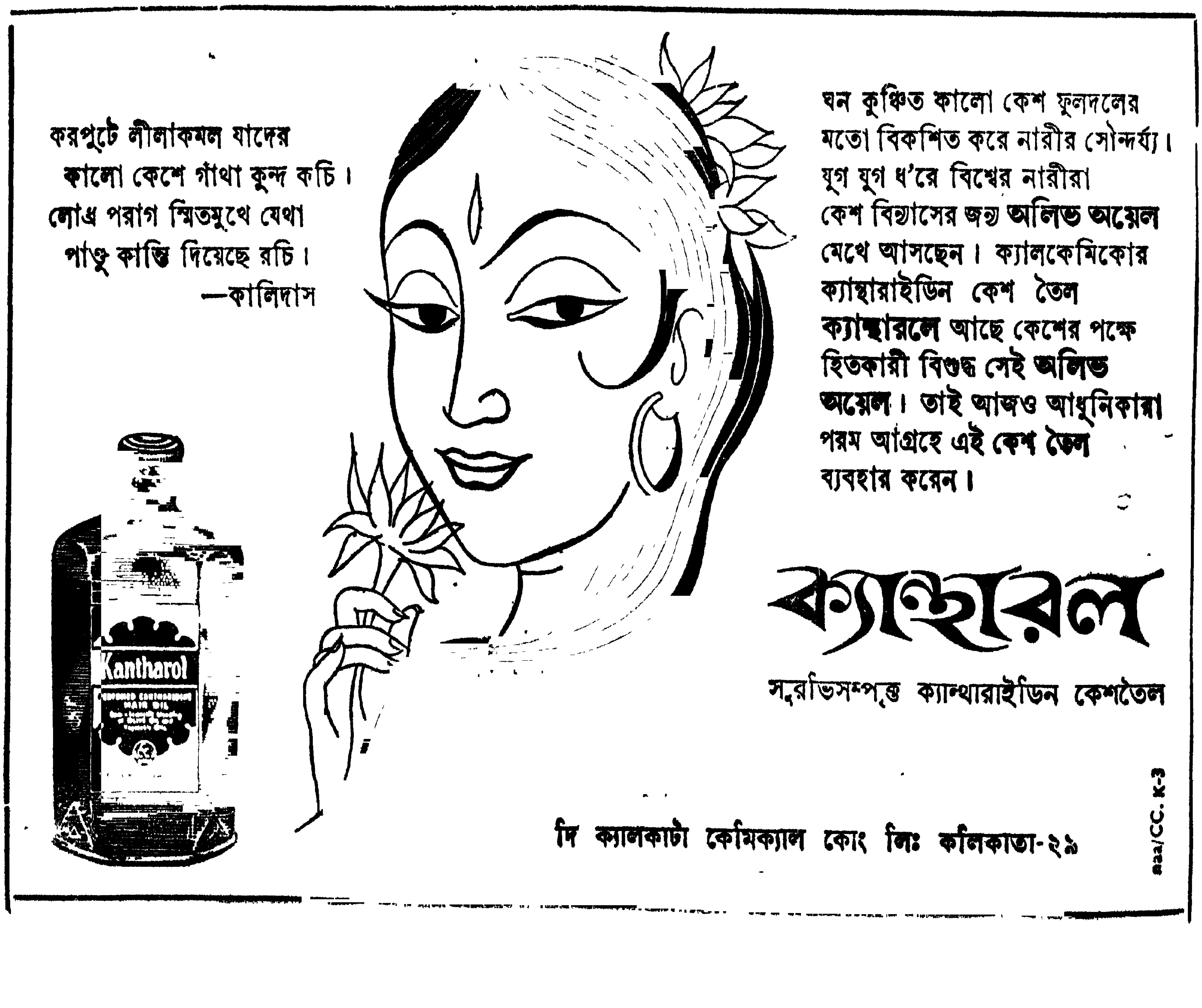
করপুটে লীলাকমল যাদের
কালো কেশে গাঁথা কুন্দ কচি।
লোধ্র পরাগ স্মিতমুখে যেথা
পাণ্ডু কান্তি দিয়েছে রচি।
—কালিদাস
ঘন কুঞ্চিত কালো কেশ ফুলদলের মতো বিকশিত করে নারীর সৌন্দর্য্য। যুগ যুগ ধ'রে বিশ্বের নারীরা কেশ বিন্যাসের জন্য অলিভ অয়েল মেখে আসছেন। ক্যালকেমিকোর ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল ক্যান্থারলে আছে কেশের পক্ষে হিতকারী বিশুদ্ধ সেই অলিভ অয়েল। তাই আজও আধুনিকারা পরম আগ্রহে এই কেশ তৈল ব্যবহার করেন।
Kantharol
ক্যান্থারল
সুরভিসম্পন্ন ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

ভালো কাগজের
দরকার থাকলে

এই ঠিকানায়
অনুসন্ধান করুন

দেশী বিদেশী বহু বিচিত্র
কাগজের ভাণ্ডার

এইচ. কে. ঘোষ
অ্যাণ্ড কোম্পানী

২৫এ সোয়ালো লেন। কলিকাতা
টেলিফোন ॥ ২২-৫২০৯

JUST PUBLISHED

HIRENDRANATH MUKERJEE'S

INDIA'S STRUGGLE FOR FREEDOM

(3rd revised edition)

The long awaited third edition of the much appreciated book 'India Struggles For Freedom' is now out with the title slightly changed. This is the inspiring story of our freedom struggle, its rise, development and fulfilment. It offers a penetrating analysis of the last 150 years of India's long history. Dealing with every aspect of the fight for Freedom, it is the most fascinating story of our national movement. As the present edition is published after a lapse of about 15 years, it has been enriched with as much upto date materials as possible. Towards the end a concise resume of post-independence happenings has been added in order to place the entire story of freedom struggle in the perspective of today.

Price : 8·00

NATIONAL BOOK AGENCY PRIVATE LTD.

12 Bankim Chatterjee St., Cal.-12
172 Dharamtola Street, Calcutta-13
Nachan Road, Benachity, Durgapur-4

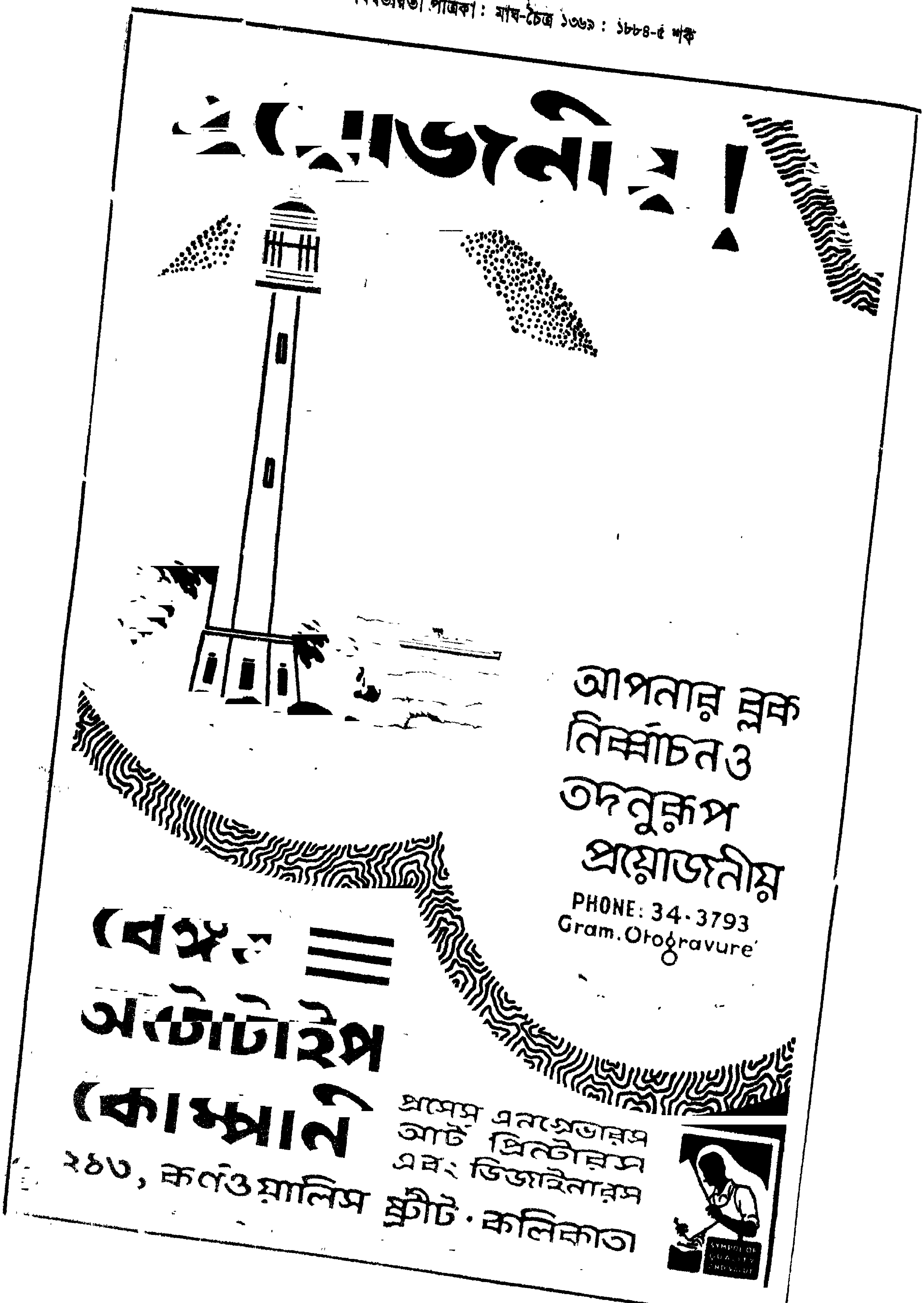
আপনার ব্লক
নির্ব্বাচন ও
তদনুরূপ
প্রয়োজনীয়
PHONE: 34-3793
Gram. Otogravure
বেঙ্গল
অটোটাইপ
কোম্পানি
প্রসেস এনগ্রেভারস
আর্ট প্রিন্টারস
এবং ডিজাইনারস
২১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট · কলিকাতা

মোটরগাড়ীর যন্ত্রপাতি
ও
সরঞ্জামের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী
প্রাইভেট লিমিটেড
১৬ রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ১
শাখা: দিল্লী বম্বে পাটনা ধানবাদ কটক গৌহাটী ও শিলিগুড়ি

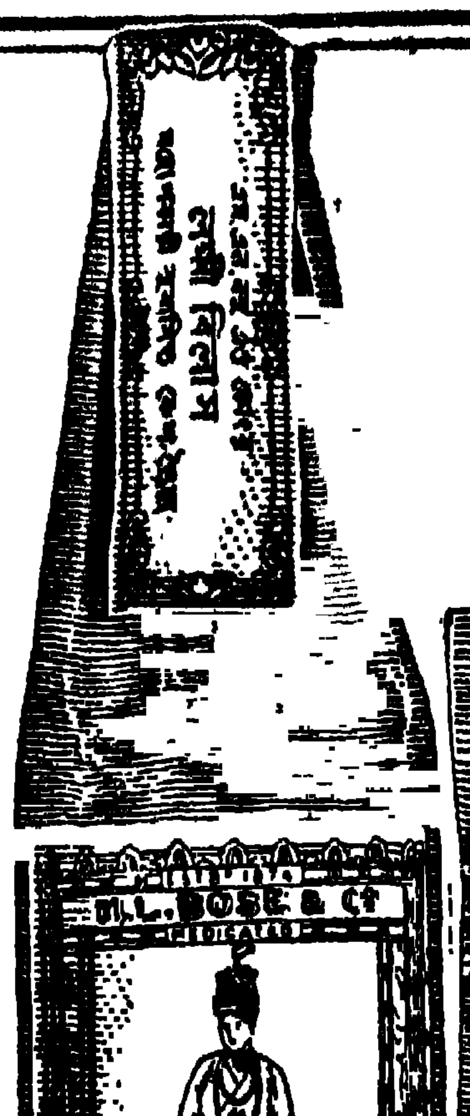

শতাব্দীর ঐতিহ্যমণ্ডিত গুণসম্পন্ন তৈল
*
এম, এল, বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা

একমাত্র পরিবেশক আর, ডি, এম, এণ্ড কোং ২১৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ · ১৮৮৪-৫ শক

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বিষয়সূচী

ছন্দ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৩৭
রসাদ্বৈতবাদ	শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য	২৪৫
সনেট · রবীন্দ্রনাথকে লিখিত	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	২৫৯
শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি		
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা	শ্রীঅজিত দত্ত	২৬০
নাটকের নাটকীয়তা · দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রসঙ্গে	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৬৮
দ্বিজেন্দ্রলাল · জীবনভাষ্য	শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়	২৭২
দ্বিজেন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি	শ্রীদিলীপকুমার রায়	২৮১
রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ		
সরকারী দলিলে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা	শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮৩
ভারতবর্ষীয় সভা	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	২৯১
গ্রন্থপরিচয় · দ্বিজেন্দ্রপ্রসঙ্গ	শ্রীবিজিতকুমার দত্ত	৩০৭
গ্রন্থপরিচয়	শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য	৩১৩
স্বরলিপি · রবীন্দ্রসংগীত	শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার	৩১৭
সম্পাদকের নিবেদন		৩১৯

চিত্রসূচী

শীতের পদ্মা	শ্রীনন্দলাল বসু	২৩৭
দ্বিজেন্দ্রলালের 'সনেট' পাণ্ডুলিপিচিত্র		২৫৯
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় · আলোকচিত্র		২৬৮

মূল্য এক টাকা

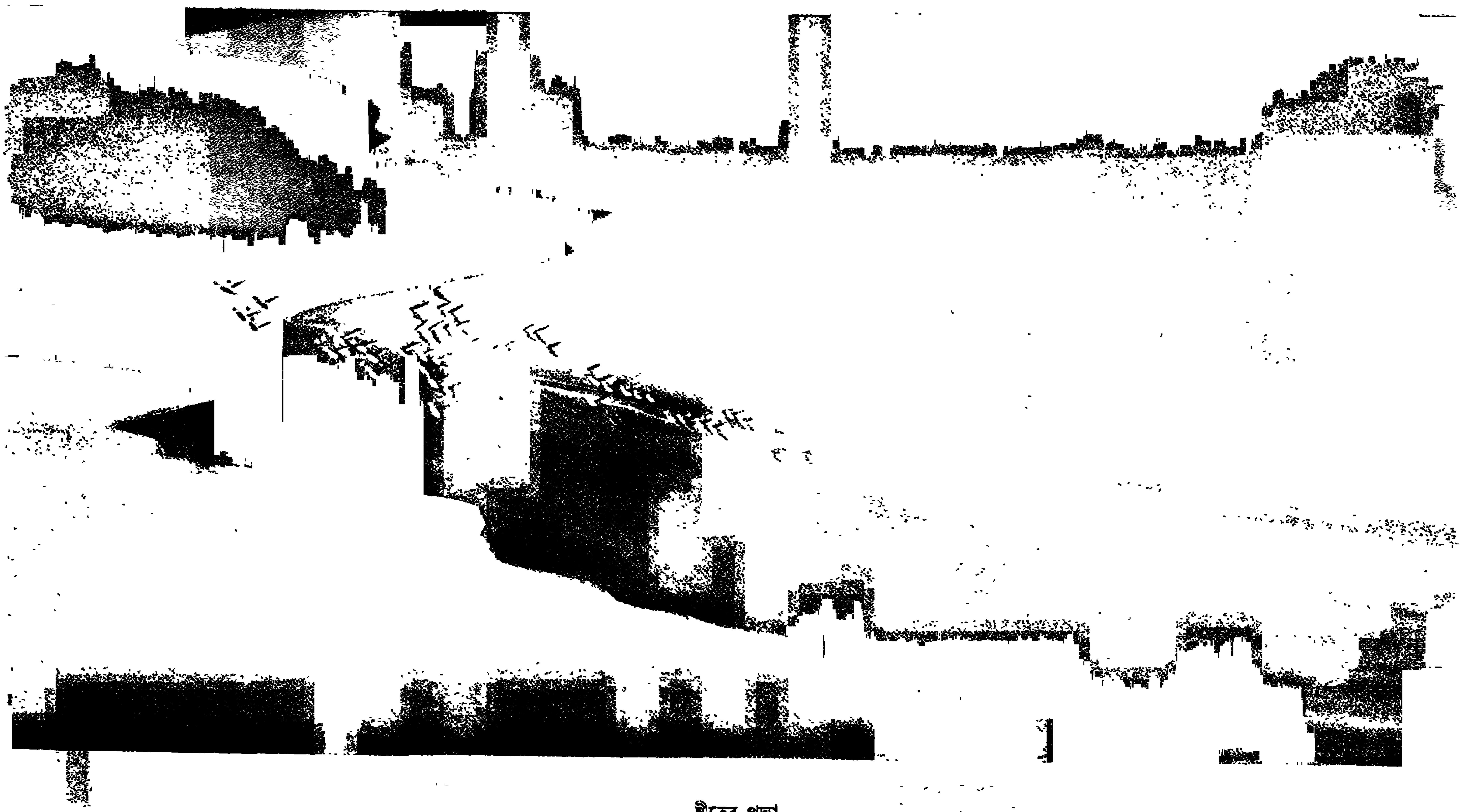

শীতের পদ্মা

শ্রীনন্দলাল বসু । ফেব্রুয়ারী ১৯১৫

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ · ১৮৮৪-৫ শক

ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২] ভিন্নপ্রদেশী আমার এক বন্ধু বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বল্‌তে অনুরোধ করেচেন। একদিন এ কাজ করেচি— তখন ভেবেছিলুম ব্যাপারটা খুবই সহজ। সেকালে নাড়ী টিপেই ছন্দের ধাত বিচার করা যেত, এখন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ডায়োগনোসিস্ চলচে; যাকে সহজ মনে করে নিশ্চিন্ত ছিলুম সেগুলো দুর্ব্বোধ হয়ে দেখা দিয়েছে, অথচ ডাক্তারে ডাক্তারে মতের মিল হচ্চে না। যারা জিজ্ঞাসু, পূর্ব্বের চেয়েও তাদের অবস্থা শোচনীয়। তাই, আমি আনাড়ি, এ কথা কবুল করেই বৈজ্ঞানিক দুর্গম পথটা এড়িয়ে আপন মেঠো রাস্তায় চল্‌ব।

সকলেই জানেন ভাষায় প্রকাশের রীতি আছে দুই জাতের। গদ্য আর পদ্য। গদ্য মুখ্যত বলে, পদ্য মুখ্যত চলে। গদ্যে কমা সেমিকোলন দাঁড়ির ভাগ আছে, সেটা বলার ভাগ; আর পদ্যে পদবিচ্ছেদে যে-ভাগ দেখা যায় সেটা চলার ভাগ।

মানুষের চলন দুই পায়ের চলন। মাত্রায় মাত্রায় পদক্ষেপের দ্বারা এই চলন বিভক্ত। মানুষকে পা তুলে ও ফেলে চল্‌তে হয় ব'লে এই চলায় ছন্দ লেগেই আছে। যেমন ছন্দ আছে হৃৎপিণ্ডের ওঠায় পড়ায়। চল্‌তে চল্‌তে যখন হাত দোলে তখন সেই চলার ছন্দের ঝোঁক তাতেও ধরা পড়ে।

যে হেতু মানুষের পা ফেলার মধ্যে একটা সহজ ভাগ আছে এইজন্যে সাধনার দ্বারা সেই ভাগটাকে মানুষ বিচিত্র করে তুলেচে। যার শক্তি আছে সে এই চলার ছন্দকে নানা বিচিত্র ছন্দে শাখান্বিত করে নৃত্যরূপে দেখাতে পারে।

এই নৃত্যের একটা স্বতন্ত্র মাধুর্য্য আছে। সে কেবল গতির আন্দোলনেই মনকে আন্দোলিত [৪] করতে পারে। কিন্তু নাচ এইখানেই থামেনি। তার সঙ্গে ভাবের মিলন ঘটেচে। আমাদের হৃদয়াবেগের মধ্যে একটা আন্তরিক আন্দোলন আছে। আমাদের রক্তস্রোতকে সে দোলা দেয়, আমাদের নিঃশ্বাসকে সে ক্ষুব্ধ করে। এই ক্ষোভকে নৃত্য যখন আপন সুনিয়মিত চাঞ্চল্য দিয়ে প্রকাশ করে তখন আমাদের সেই ভাবের আবেগ আপন প্রতিদিনের তুচ্ছতাকে ছাড়িয়ে ওঠে, একটা বিশিষ্ট নিত্যরূপ ধারণ করে, সে রূপ আর ব্যক্তিগত থাকে না, সে হয়ে ওঠে বিশ্বগত, যেমন সাজাহানের তাজমহল।

আমাদের পদ্যের পদচালনাকে এই দিক থেকে বিচার করা যাক্। পদ্য মানুষেরই মতো পদস্থ জীব— সাপের মতো অপদস্থ নয়। সাপ সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অগ্রসর হয়, তার গতি নিতান্তই প্রয়োজনের গতি; প্রাণ

ধারণের আবশ্যকে তাকে চলাফেরা করতে হয়। কিন্তু পাখী পেয়েচে দুই পা, সে নাচতে পারে। সারসের যুগলনৃত্য দেখেছি, তাদের নাচ ভাবপ্রকাশের ভাষা, সে লিরিক কাব্য। সাপের মনে আবেগ যতই থাক সে ইচ্ছে করে নাচে না।

কিন্তু সাপুড়ে তাকে বাঁশি বাজিয়ে নাচায়। তখন সাপ আপন দেহের একটা অংশকে চলার প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে। সেই অংশ কেবল অকারণ আন্দোলনের স্বাধীনতা পেয়েচে, তাই সে বাঁশির ছন্দের আনন্দ আপন ফণার দোলায় প্রকাশ করতে পারে।

মানুষের দুই পা এমনভাবে তৈরি, যাতে সে প্রয়োজনের চলাও চলে, অপ্রয়োজনের নাচও নাচে। দুটো পা নিয়ে চলে বলেই প্রত্যেক পদক্ষেপেই পালায় পালায় এক পায়ের উপরে মানুষকে আপন শরীরের ওজন সামলিয়ে এগোতে হয়। চলবার সময়ে তার হাতের দোলন এই ওজনরক্ষারই অঙ্গ। এই ওজনরক্ষার দরকার কুকুরের নেই, তার চারটে পা-ই চলার প্রয়োজনে নিযুক্ত। তার দেহের অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় অংশ ল্যাজটা। এই কারণে ভাবের উচ্ছ্বাসে ঐ ল্যাজের দোলাতেই কুকুরীয় ছন্দে তার নাচের কাজ নির্ব্বাহ হয়।

[৬] প্রতিদিনের সাধারণ আলাপে আমাদের ভাষার সবটাই দরকারী হয়ে ওঠে, তার প্রত্যেক কথার কাছ থেকে খাঁটি অর্থের হিসেবটুকু আদায় করি। "একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল" এই বাক্যটা খবরের বেশি আর কিছুই দেয় না। কিন্তু শুধু রিপোর্ট্ না দিয়ে ব্যাপারটাকে যদি রূপ দিতে হয় তাহলে ভাষাকে নাচিয়ে দেখাতে হবে—

বিদ্যুৎলাঙ্গুল করি ঘন তর্জ্জন
বজ্রদিগ্ধ মেঘ করে বারি বর্জ্জন,—
সেই মতো বেদনায় অস্থির শার্দ্দূল
অস্থি-বিদ্ধ গলে করে ঘোর গর্জ্জন।

গদ্যের ভাষা সর্ব্বাঙ্গ দিয়েই চলে ব'লে তাকে কেবল শব্দের অর্থ বহন করতে হয়, কিন্তু শব্দের ওজন সাম্‌লাতে হয় না। পদ্যে তাকে পদভাগের উপরে দাঁড় করাতেই ভারসাম্যের অপ্রতিষ্ঠতা অর্থাৎ unstable equilibrium-এর হোলো সৃষ্টি। তখন তার উপরে ওজন-সামলানোর কঠিন দায়িত্ব পড়ল। শব্দব্যূহের বিশেষত্ব অনুসারে এই ওজনের সংস্থান নানারকম হতে পারে; সেই বৈচিত্র্যেই ছন্দের বৈচিত্র্য।

সংক্ষেপে বলি :— পদ্যের পদ আছে গদ্যের পদ নেই। গদ্য প্রধানত বলে, পদ্য প্রধানতঃ চলে। বলার বিশুদ্ধিতায়, সুস্পষ্টতায়, তার যাথার্থ্যে গদ্যের গৌরব, আর চলার ভঙ্গিমায়, বৈচিত্র্যে, ভাবাবেগের ব্যঞ্জনায় পদ্যের গৌরব।

বিশেষ পদবিভাগ ও শব্দের বিশেষ ওজন এই দুই নিয়ে ছন্দ। প্রত্যেক পাফেলার সঙ্গে কতটা ভার আছে তাই নিয়ে ছন্দের বিশেষত্ব। শুধু দেহের ভঙ্গীটা নাচের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সেই ভঙ্গীর সঙ্গে দেহের ভার যতটা বিক্ষেপ করা যায় সেই অনুসারে নাচের নানা মূর্ত্তি। নাচে দেহের ভারটাকে কেবলি এদিকে ওদিকে নাড়ানাড়ি করতে হয়। দেহেরই মধ্যে একসঙ্গে ভারও আছে গতিও আছে,

তারই ব্যবস্থা করতে করতে নাচের রূপ জাগে। ছন্দেও তেমনি। ভাষায় [৮] শব্দের গতিও আছে আর তাতে ধ্বনির ভারও আছে। তারই বৈচিত্র্যসাধনে ছন্দ। গতিভাগের একএকটি একককে বলা যাক্ পদ, তার সেই পদবর্ত্তী ধ্বনির একককে বলা যাক মাত্রা।

[৭] বস্তুজগতের সত্তার মূলেও এই নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক আদিভূতের সঙ্গে একটা বোঝা আছে, আর সেই সঙ্গে আছে চলা; বিশেষসংখ্যক প্রোটোন্ ইলেক্‌ট্রোন্, আর সেই প্রোটোন্ ইলেক্‌ট্রোনের আবর্তনগতি। গতিবেগ যেমনি হোক্, ইলেক্‌ট্রোন প্রোটোনের সংখ্যার কমিবেশি নিয়েই শিষের সঙ্গে সোনার প্রভেদ। আমাদের প্রতীতির মধ্যে সে প্রভেদ তো কম নয়। তেমনি অধিকাংশ ছন্দেরই গতি-ভাগ হয়তো চার, কিন্তু কোনোটাতে তার ধ্বনিমাত্রার এক রকমের পরিমাণ, কোনোটাতে অন্য রকমের পরিমাণ। তাতেই আমাদের চেতনাতে সে দোলা দেয় ভিন্ন ভিন্ন ধারায়।

[৮] সব চেয়ে সাদা ছন্দ হচ্চে দুই ধ্বনিমাত্রা নিয়ে দুই পদপাতন। আমার ছাত্র অবস্থার আরম্ভেই এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল— সেদিন "কর" "খল" বানান করে পড়তে পড়তে হঠাৎ এসে পড়ল, জল পড়ে পাতা নড়ে। ঐ একটুখানি ছন্দে মন উঠেছিল নেচে। মনে হোলো সামনে একটা সজীব বাণী। যেন হাল্‌কা দেহটুকু নিয়ে শালিখ পাখী লাফ দিয়ে দিয়ে চল্‌চে। এর গতির ভাগ এক দুই, এক দুই, একপা দুপা, একপা দুপা। এই প্রত্যেক পা পড়চে দুটি মাত্রার বোঝা নিয়ে। জ-ল, প-ড়ে ইত্যাদি।

তার পরে ভেবে দেখলে দেখা যাবে, প্রথম শ্রেণীর ছন্দের পত্তন দুইমাত্রার গুণকের উপর। অর্থাৎ প্রত্যেক পদের বোঝার পরিমাণ দুই, চার বা আট মাত্রা। এই শ্রেণীর ছন্দ পয়ার, প্রথম থেকেই বাংলা ভাষায় সব চেয়ে প্রচলিত। এই ছন্দে প্রত্যেক লাইনে দুটি করে পদ এবং প্রত্যেক পদে আটটি করে মাত্রা। অর্থাৎ প্রত্যেক আটমাত্রায় একটা করে ঝোঁক পড়চে। যথা :—

ı ı
এক্‌জামিনেশন্ বসে | সেনেটের হলে ·· |
ı ı
পটোলডাঙায় ছাত্র | চলে দলে দলে ·· |

এই আটমাত্রাকে যদি আরো ছোটো খণ্ডে ভাগ করা যায়, যথা দুই দুই দুই দুই, অথবা চার চার, এবং প্রত্যেক দুই কিম্বা চার মাত্রার উপর ঝোঁক দেওয়া হয়, তাহলে পয়ারের যথার্থ চাল খাটো হয়ে পড়ে। যথা

ı ı ı ı ı ı ı
কেন | তার | মুখ | ভার | বুক | ধুক | ধুক |
ı ı ı ı ı ı ı
চোখ | লাল | লাজে গাল | রাঙা | টুক | টুক ॥

অথবা

। । । ।
সুনিবিড় | শ্যামলতা | উঠিয়াছে | জেগে ∘∘ |
। । । ।
ধরণীর | বনতলে | গগনের | মেঘে ∘∘ |

[১০] বলা বাহুল্য পয়ার ও ত্রিপদীর একই গোত্র— অর্থাৎ প্রত্যেক আটমাত্রায় তার পা পড়ে— যেমন

।
আঁধখানি চাঁদ ওঠে।
।
দিক্‌-ললনার ঠোঁটে
।
সরমে যেনরে ফোটে
।
স্মিত হাসিখানি ॥

এই শ্রেণীর সব চেয়ে প্রশস্ত ছন্দ দীর্ঘ পয়ার। এই ছন্দ বড়দাদা[১] সবপ্রথমে তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে ব্যবহার করেছিলেন। এই ছন্দে প্রত্যেক লাইনে দুই পদক্ষেপ। প্রথম পদে আটমাত্রা নিয়ে ঝোঁক, দ্বিতীয় পদে দশমাত্রা নিয়ে। তাঁর কাব্য থেকে এই ছন্দের দুটি লাইন উদ্ধৃত করি :—

। ।
গম্ভীর পাতাল, যথা | কালরাত্রি করালবদনা
। ।
বিস্তারে একাধিপত্য, | শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা।

পয়ারজাতীয় ছন্দের দুইটি মহদ্‌গুণ, এক তার ভারবহনশক্তি, আর তার গাম্ভীর্য্য। এইজন্যে বাংলাভাষায় এর প্রভাব এত বেশি।

[১১] পয়ারে বা দীর্ঘপয়ারে এই যে এক ঝোঁকে আটদশমাত্রা গড়িয়ে চলা এটা সংস্কৃতে চলে না, ইংরেজিতেও না। কারণ সংস্কৃতে প্রত্যেক শব্দের মধ্যে দীর্ঘহ্রস্বের অসমানতা। এই অসমানতার খেলা নিয়েই তার ছন্দ।— অস্ত্যুত্তরস্যাম্‌ দিশি দেবতাত্মা, হিমালয়ো নাম নগাধিরাজ :— এই ধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘতায় ছন্দ তরঙ্গিত। ইংরেজি ছন্দের অসমানতা তার প্রত্যেক এক্‌সেণ্টবিদ্ধ শব্দে। বাংলায় এক্‌সেণ্ট্‌ নেই, স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নেই। আমরা বাক্যের আরম্ভশব্দে একটা ঝোঁক দিই, সেই ঝোঁকে আমাদের মসৃণ সমতল ভাষার উপর দিয়ে অনেকগুলো শব্দ গড়িয়ে চলে যায়। "আমি গেল শনিবারের দিন কলকাতায় গিয়েছিলুম"— এক নিঃশ্বাসে সমস্ত বাক্যটা দাঁড়িতে এসে পৌছয়। আমাদের ভাষার এই অবন্ধুরতায় বাক্যের অর্থ জোরের সঙ্গে মনে ঘা দেয় না। এই অভাব লাঘব করবার জন্যে পাঁচালিতে কবির গানে অনুপ্রাসের প্রাচুর্ভাব। সেই অনুপ্রাস অনেক স্থলেই অর্থহীন, কিন্তু উপস্থিতমত তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, শ্রোতাদের চমক লাগে, অন্যমনস্ক হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে।

১ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওরে রে লক্ষ্মণ, একি অলক্ষণ,
বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।
অতি অগণ্য কাজে ছি ছি জঘন্য সাজে,
ঘোর অরণ্যমাঝে কত কাঁদিলাম—
আহা অপার জলধি কেন বাঁধিলাম।

মাইকেল তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি ঘন ঘন ব্যবহারদ্বারা পয়ারের একটানা একঘেয়ে চালের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু তাঁরও অনবধানতা মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভে প্রকাশ পেয়েছে। যথা

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে
পাঠাইলা রণে পুন রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি।

এই এতগুলো লাইনের মধ্যে আরম্ভে "সম্মুখ" এবং শেষে "রক্ষঃকুল" শব্দে সংযুক্তবর্ণের বাধা আছে। এর সঙ্গে প্যারাডাইস্ লস্টের সূচনা অংশ তুলনা করে দেখ্‌লে উভয়ের প্রভেদ স্পষ্ট হবে।

আমি একদা ছন্দের এই ক্ষীণতার প্রতিকারের উপায় ভেবেছিলুম। সংস্কৃতের অনুবর্ত্তন করে স্বরবর্ণের হ্রস্বদীর্ঘতা প্রচলন করতে গেলে সে কৃত্রিমতা বেশিক্ষণ চলে না। তার অসঙ্গতি হাস্যরসাত্মক কাব্যের প্রয়োজন সাধন করতে পারে। যেমন—

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্যগৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজনবশে কিচ্ছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতিপিরহনে মান রয় না।

মানসী লেখবার সময় একটা সংকল্প মনে এসেছিল, যুক্তবর্ণের ধ্বনিকে দুইমাত্রিক বলে গণ্য করে যথাস্থানে তার প্রয়োগ এবং অযথাস্থান থেকে তার বর্জ্জন। বাংলা ছন্দে যুক্তবর্ণ তখন সর্ব্বত্রই একমাত্রিক শ্রেণীতেই গণ্য ছিল। সেইজন্যে "বদনমণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া" এমনতরো লাইনের সৃষ্টিতেও কবির সঙ্কোচ হয় নি। এখানে যুক্তবর্ণ ছন্দকে পীড়িত করেছে এ কথা এখনকার দিনে বলা বাহুল্য।

[১৩] পূর্ব্বেই আভাস দিয়েছি ছন্দে যেখানে প্রত্যেক পদে তিন চার পাঁচ প্রভৃতি অল্পমাত্রার সমাবেশ, কিম্বা যেখানে দুই + তিন, তিন + চার, প্রভৃতি যুগ্ম অযুগ্ম মাত্রাকে জুড়ে ছন্দ রচনা হয়েচে সেখানে পূর্ব্বপ্রচলিত রীতি অনুসারে যুক্তবর্ণের ধ্বনিতে একমাত্রা গণনা করলে ছন্দ পীড়িত হয়।

[১০] এই ভারবহনের শক্তি উপলক্ষ্যে একটা কথা এইখানে বলে নিই। যাকে আমরা ধ্বনিমাত্রা বলচি তার সরুমোটা আছে। "চন্দন-চর্চ্চিত" কথাটাকে অক্ষর হিসাবে গ'ণে দেখলে দেখি ছয়মাত্রা; তাকে

ধ্বনির ওজনে তৌল করে দেখলে দেখি আটমাত্রা। সংস্কৃত ছন্দে যুক্ত অক্ষরের ধ্বনিতে দুইমাত্রাই গণনা করে। যুক্তবর্ণের ওজন অযুক্তবর্ণের চেয়ে যে ওজনে বেশি তা দুর্বল বাহনের পিঠে চড়ালেই বোঝা যায়। দৃষ্টান্ত দেখাই :

আঁখির পাতার নিবিড় কাজল
আঁখিজলে পড়ে গলিয়া।

[১২] অক্ষরসংখ্যা সমান রেখে যদি এই ছড়ায় যুক্তবর্ণ চড়ানো যায় তাহলে সেটা কেমন হবে যেমন এক এক সময়ে দেখতে পাই জোয়ান স্বামী স্ত্রীর ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে পথে চলে নির্মমভাবে। প্রমাণ দিই :—

চক্ষুর পল্লবে নিবিড় কজ্জল
অশ্রুজলে পড়ে গলিয়া।

কিন্তু এই বোঝা পয়ারজাতীয়ের স্কন্ধে চাপানো যাক্ তাতে অপঘাতের সম্ভাবনা থাকবে না। প্রথমে বিনা বোঝার চালটা দেখাই

শ্রাবণের কালো ছায়া ছেয়ে দেয় তমালের বনে,
যেন দিক্‌ললনার গলিত কাজল বরিষণে।—

এইটেকেই গুরুভার করে দিই—

বর্ষার তমিস্রছায়া পরিব্যাপ্ত অরণ্যের তলে,
যেন অশ্রুসিক্ত আঁখি দিগ্বধূর গলিত কজ্জলে।

এ হোলো আটমাত্রা দশমাত্রার ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ।

আমি বাংলার সমস্ত ছন্দকে তার প্রত্যেক পদের মাত্রার পরিমাণ অনুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছি। এক হচ্চে দুইমাত্রা যার মূলে; দ্বিতীয় তিনমাত্রা; তৃতীয় দুইতিন বা তিনচার বা চারপাঁচ মাত্রা। এ ছাড়া অন্য শ্রেণীর ছন্দ সংস্কৃত ভাষায় আছে কিন্তু বাংলায় আছে বলে আমি জানিনে।

তিনমাত্রার ছন্দ : যথা

শ্রাবণধারার নিঠুর আঘাতে
মালতী পড়িছে ঝরিয়া,
গন্ধে তাহার বাদল বাতাস
উঠে করুণায় ভরিয়া॥

নববর্ষার বারিসংঘাতে
পড়ে মল্লিকা ঝরিয়া
সৌরভে তার সিক্ত পবন
কারুণ্যে উঠে ভরিয়া।

[১৪] এই ছন্দটিকে দুরকম করে ভাগ করা যায়, প্রতিপদে তিনমাত্রায় কিম্বা ছয়মাত্রায়। পড়তে গেলে দেখা যাবে বড়ো ভাগের আয়তন যে ছোটো ভাগের দ্বিগুণ তা নয়, তার চেয়ে বেশি।

শ্রাবণ | ধারার | নিঠুর | আঘাতে—

এর প্রত্যেক ঝোঁক যেন সমান সমান ঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গবর্ষণ করচে— প্রত্যেকটির পরিমাণ খুব আঁট। কিন্তু ছয়-মাত্রার ঝোঁকে একটা করে বাড়্‌তি টান থাকে—

শ্রাবণধারা—র | নিঠুর আঘাতে— |
মালতী পড়িছে— | ঝরিয়া— ॥

লম্বা মাত্রার পদভাগে আমাদের আবৃত্তি স্বভাবত একটু যেন ঢিল দিতে চায়, একেবারে খট্‌খট্‌ করে চলে না। এর থেকেই বুঝতে পারি হ্রস্ব বা দীর্ঘ পয়ারের আট, অথবা আটদশ মাত্রার লম্বা চালের আবৃত্তিতে ভিতরে ভিতরে ফাঁক থেকে যায়, তাই মোটা মোটা যুক্তবর্ণও এই ছন্দে অভদ্র রকমের ঠেলাঠেলি করে না। তারা যথেষ্ট আরাম পায়। এইজন্যে এই ছন্দটাকে সাধুভাষার ছন্দ বলা যেতে পারে ॥

তিনের ছন্দকে নয়মাত্রায় প্রশস্ত করা চলে। যেমন—

আঁধার রজনী পোহালো,
জগৎ পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাতকিরণে
মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে ॥

কিন্তু তিনমাত্রার ছন্দকে যতই চওড়া করি না কেন দুইমাত্রার ছন্দের মতো এ'কে উদার করা যায় না, এর দৌড় চাল, সেইজন্যে এ অতিরিক্ত বোঝা নিতে রাজি নয়, "আঁধার শর্ব্বরী পোহালো" এর সইবে না।

বাংলায় আর এক ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে যার মাত্রাগুলি যুগ্মঅযুগ্ম সংখ্যায় জোড়া। যথা

[১৬] আঁধার রাতি | জ্বেলেছে বাতি |
অযুতকোটি তারা,
আপন কারাগারে সে পাছে
আপনি হয় হারা ॥

তিনচারের মাত্রা—

নয়ন-অতিথিরে
শিমূল দিল ডালি ;—
নাসিকা প্রতিবেশী
তা নিয়ে দেয় গালি।
সে জানে গুণ শুধু
প্রমাণ হয় ঘ্রাণে,—
রং যে লাগে রূপে
সে কথা নাহি জানে ॥

[১৮] সমস্ত প্রবন্ধে যত দৃষ্টান্ত দিয়েছি সবই লৈখিক ভাষার। লৈখিক[২] ভাষাতেও ছন্দের মূলতত্ত্ব একই। তার একটি প্রমাণ দিয়ে উপসংহার করি।—

২ ভ্রমক্রমে লেখা হয়েছে 'লৈখিক'। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত শব্দটি বোধ হয় 'মৌখিক'।—দ্র রবীন্দ্রনাথের "ছন্দ" গ্রন্থ (কার্তিক ১৩৬৯), পৃ ৪৪৫ পাদটীকা।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান—
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান ॥

এও পয়ার। হসন্তের জালে বাঁধা এর শব্দপুঞ্জের চেহারাটাকে বড়ো দেখাচ্চে। এ'কেই সাধুভাষার কাঠামোয় ভরলে ছন্দটার শ্রেণীনির্ণয় সহজ হবে—

যথা বৃষ্টি ঝরে ঝরো ঝরো ডেকে এলো বান,
শিবুঠাকুরের বিয়ে তিন কন্যে দান ॥

[১৬] ছন্দ সম্বন্ধে আমার যা বলবার আছে তা শেষ হোলো। মূলকথাগুলো বেশি নয়, তার সন্ধান জান্‌লে শাখা প্রশাখা চিনে নেওয়া সহজ হয়। আমি যখন ছোটো ছেলেদের পড়াতুম তখন কাব্য পড়াবার বেলায় সবপ্রথমে কাব্যের ছন্দোরূপ নিয়ে আলোচনা করতুম। জিজ্ঞাসা করতুম বিশেষ কাব্যের লাইনে ক'টা ভাগ, আর প্রত্যেক ভাগে ক'টা মাত্রা। এই যথেষ্ট। ভালো করে বুঝিয়ে দিলে ছোটো ছেলেদের পক্ষেও এ প্রশ্ন কঠিন নয়। কিছুদিন এটা চর্চ্চা করলে ছন্দপতন হয় কী দোষে তা তারা বুঝতে পারবে এবং ছন্দ নিয়ে কারবার করি বলে বিশেষ জাতের একটা অস্বাভাবিক অভ্যাস বলে মনে করবে না। অবশ্য এ কথাটা তাদের যত শীঘ্র পারা যায় বুঝিয়ে দেওয়া ভালো যে ছন্দরচনা করা এবং কাব্যরচনা করা একই কথা নয়। নইলে কবিকে তাদের প্রতিযোগী মনে করে একদা তাকে খর্ব্ব করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগবে ॥

রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত। ১৯৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, পৃ ১-১৮।
বন্ধনীর অন্তর্গত সংখ্যাগুলি উক্ত পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক।
এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের "ছন্দ" গ্রন্থের (কার্তিক ১৩৬৯) 'পাণ্ডুলিপি-পরিচয়', পৃ ৪৪৩-৪৪৫।

রসাদ্বৈতবাদ

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাহনন্দী ভবতি"

—তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

"তদেবং মূলং বীজস্থানীয়ঃ কবিগতো রসঃ।...ততো বৃক্ষস্থানীয়ং কাব্যম্। তত্র পুষ্পাদিস্থানীয়োঽভিনয়াদিনটব্যাপারঃ। তত্র ফলস্থানীয়ঃ সামাজিকরসাস্বাদঃ। তেন রসময়মেব বিশ্বম্"— অভিনবগুপ্ত

১

ভারতীয় মনীষার দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টিতে ধরা না পড়িয়া পারে না। একদিকে ইহা যেমন প্রত্যেক প্রতিপাদ্য তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম ভেদনিরূপণের সাহায্যে শ্রেণীকরণ বিষয়ে আপন প্রবণতা প্রকট করিতে সর্বদা ব্যগ্র, অপর দিকে তেমনই প্রতিলোম দৃষ্টিতে সেই স্বপরিকল্পিত অগণিত শ্রেণী ও অবান্তরভেদ সমূহকে ক্রমশঃ ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর তত্ত্বের মধ্যে উন্নীত ও সমীকৃত করিবার অলোকসামান্য শক্তিও তাহার এক অসাধারণ লক্ষণ। ভারতীয় মনীষার এই উভয়বিধ লক্ষণই প্রাচীন সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে আপন আপন সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে সাহিত্যবিচার শাস্ত্রের মুখ্য প্রমেয় রসতত্ত্ব সম্পর্কিত বিচারেও ভারতীয় মনীষার উপরি-নির্দিষ্ট দুইটি লক্ষণ কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা আমাদের লক্ষ্য।

আমরা জানি ভরতমুনি রসকেই কাব্যনির্মাণের একমাত্র উৎসরূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন—'নহি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে'। রস হইতেছে মানব-মনের একজাতীয় আস্বাদনাত্মক অনুভব, যাহা কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থায়িভাবের উপযুক্ত বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সাহায্যে অভিব্যক্তির পরিণামাবস্থা। সুতরাং ভরতমুনি কাব্যে রসীভবনযোগ্য কয়েকটি স্থায়িভাবের পরিগণনা করিয়াছেন তাঁহার নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত কারিকাদ্বয়ে—

"শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ॥
রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥"[১]

অবশ্য কোনও কোনও মতে ভরতমুনি 'শান্ত' নামে নবম রস এবং তদুপযোগী নির্বেদাখ্য নবম স্থায়িভাবও স্বীকার করিয়াছেন। পরবর্তী কাব্যমীমাংসকগণ রসের সংখ্যা বিষয়ে ভরতমুনির সিদ্ধান্তই প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। তবে স্থায়িভাবের এবং রসের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে আগ্রহও যে কোনও কোনও আচার্যের

---

১ নাট্যশাস্ত্র, ৬, ১৫, ১৬। পণ্ডিত এস্. রামকৃষ্ণ কবি সম্পাদিত 'গাইকবাড় প্রাচ্য গ্রন্থমালা'-য় প্রকাশিত 'নাট্যশাস্ত্র' ১ম খণ্ডের ২য় সংস্করণ দ্রষ্টব্য (১৯৫৬)।

মধ্যে দেখা না যায়, তাহাও সত্য নহে। কেহ কেহ দশ একাদশ দ্বাদশ এমনকি তদপেক্ষাও অধিক রস ও তদুপযোগী স্থায়িভাবের অস্তিত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন।[২] মূলরসের শ্রেণীকরণ বিষয়েই কাব্য-বিচারকগণ যে আপন আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহাই নহে; এক-একটি রসের অবান্তর প্রভেদ উদ্ভাবন বিষয়েও তাঁহাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তির সাক্ষ্য সুপরিস্ফুট। যেমন, একমাত্র শৃঙ্গার রস বিষয়েই তাঁহাদের সমীক্ষার বিকাশ সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্তিকর। এক শৃঙ্গার রসেরই কত অবান্তরভেদ না পূর্বাচার্যগণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেইরূপ বীররসেরও দান দয়া যুদ্ধ ধর্ম প্রভৃতি উপাধিভেদে অবান্তরভেদকল্পনা সুপরিজ্ঞাত। এইভাবে পরবর্তী আচার্যবৃন্দের মধ্যে অনেকেই যদিও ভরতকল্পিত নব-রসের অতিরিক্ত রসকল্পনা ও মূলরসের অবান্তরভেদকল্পনা বিষয়ে আপন আপন মনীষার স্বাতন্ত্র্য খ্যাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি রসের সংখ্যা বিষয়ে ভরতমুনির সিদ্ধান্তই সর্বজনগ্রাহ্যরূপে স্বীকৃত। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের 'রস-গঙ্গাধর' নামক আলঙ্কারিক নিবন্ধের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"অথ কথমেত এব রসাঃ? ভগবদালম্বনস্য রোমাঞ্চাশ্রুপাতাদিভিরনুভাবিতস্য হর্ষাদিভিঃ পরিপোষিতস্য ভাগবতাদিপুরাণশ্রবণসময়ে ভগবদ্‌ভক্তৈরনুভূয়মানস্য ভক্তিরসস্য দুরপহ্নবত্বাৎ। ভগবদনুরাগরূপা ভক্তিশ্চাত্র স্থায়িভাবঃ। ন চাসৌ শান্তরসেঽন্তর্ভাবমর্হতি অনুরাগস্য বৈরাগ্যবিরুদ্ধত্বাৎ। উচ্যতে—ভক্তের্দেবাদিবিষয়-রতিত্বেন ভাবান্তর্গততয়া রসত্বানুপপত্তেঃ।···

"ন চ তর্হি কামিনীবিষয়ায়া অপি রতের্ভাবত্বমস্তু, রতিত্বাবিশেষাৎ। অস্তু বা ভগবদ্‌ভক্তেরেব স্থায়িত্বম্, কামিন্যাদিরতীনাং চ ভাবত্বম্, বিনিগমকাভাবাৎ— ইতি বাচ্যম্। ভরতাদিমুনিবচনানামেবাত্র রসভাবত্বাদি-ব্যবস্থাপকত্বেন স্বাতন্ত্র্যাযোগাৎ। অন্যথা পুত্রাদিবিষয়ায়া অপি রতেঃ স্থায়িভাবত্বং কুতো ন স্যাৎ? ন স্যাদ্বা কুতঃ শুদ্ধভাবত্বং জুগুপ্সা-শোকাদীনাম্— ইত্যখিলদর্শনব্যাকুলী স্যাৎ। রসানাং নবত্বগণনা চ মুনিবচননিয়ন্ত্রিতা ভজ্যেত— ইতি যথাশাস্ত্রমেব জ্যায়ঃ।"[৩]

উদ্ধৃত সন্দর্ভে স্বাধীনচেতাঃ পণ্ডিতরাজও যুক্তি অপেক্ষা শাস্ত্রবচনের প্রতিই আপন আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠাধ্যায়স্থ 'অভিনব-ভারতী' নামক অপূর্ব ব্যাখ্যানগ্রন্থে গুপ্তপাদ ভরতমুনিপরিগণিত রসের নবত্বগণনার এক সুনিপুণ যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমরা জানি, প্রাচীন ভারতীয় আচার্যগণ যদিও আনন্দকেই সর্ববিধ কবিকর্মের পার্যন্তিক মুখ্য ফলরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তথাপি চতুর্বর্গব্যুৎপত্তিও যে তাহার সহিত ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হইয়া থাকে, সে কথা তাঁহারা একবারের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। সুতরাং রসপ্রধান নাট্যও তাঁহাদের মতে অবশ্যই পুমর্থোপযোগী হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে নাট্যবেদ সম্পর্কে ভরতমুনির নিম্নোদ্ধৃত বচনগুলি মনে পড়িবে—

---

২ 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' নামক সুপ্রসিদ্ধ নিবন্ধে ভোজরাজ যদিও দ্বাদশপ্রকার রসের উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার মতে রসের সংখ্যা যে তাহাতেই সীমাবদ্ধ নহে, ইহাও অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের অজ্ঞাত নহে। তু° "What exactly must be noted as the Rasas added by Bhoja are Udātta and Uddhata; for we can say in a way that Bhoja gave in the middle of his argument an indicative list of twelve Rasas, his final view however being either one or numerous Rasas."—Dr. V. Raghavan: *Bhoja's Śṛṅgāra Prakāśa,* Vol. I, Pt. II, p. 431.

৩ রসগঙ্গাধর: ১ম আনন, পৃ. ৫৫-৫৬ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ। ১৯৩৯)।

"ক্বচিদ্ধর্মঃ ক্বচিৎ ক্রীড়া ক্বচিদর্থঃ ক্বচিচ্ছমঃ।
ক্বচিদ্ধাস্যং ক্বচিদ্‌যুদ্ধং ক্বচিৎ কামঃ ক্বচিদ্‌বধঃ॥
ধর্মো ধর্মপ্রবৃত্তানাং কামঃ কামোপসেবিনাম্।
নিগ্রহো দুর্বিনীতানাং বিনীতানাং দমক্রিয়া॥
ক্লীবানাং ধার্ষ্ট্যজননমুৎসাহঃ শূরমানিনাম্।
অবুধানাং বিবোধশ্চ বৈদুষ্যং বিদুষামপি॥
ঈশ্বরাণাং বিলাসশ্চ স্থৈর্যং দুঃখার্দিতস্য চ।
অর্থোপজীবিনামর্থো ধৃতিরুদ্বিগ্নচেতসাম্॥
নানাভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্।
লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্॥"[৪]

অতএব ভরতমুনির মতে ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ— এই চতুর্বিধ পুরুষার্থ-সাধনই নাট্যের লক্ষ্য। এবং নাট্য যখন রসস্বরূপ,[৫] তখন নাটকে এমন সকল রসেরই অভিব্যক্তিসাধন কর্তব্য যাহার দ্বারা প্রেক্ষক সামাজিক-গণের চতুর্বর্গের অন্যতম পুরুষার্থলাভ সম্ভব হইতে পারে। ভরতমুনিপরিকল্পিত রসসংখ্যানিয়ন্ত্রণ এই মৌলিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত—আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার ভাষ্যে ইহা সুস্পষ্টভাবেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"এবং তে নবৈব রসাঃ। পুমর্থোপযোগিত্বেন রঞ্জনাধিক্যেন বা ইয়তামেবাপদেশ্যত্বাৎ। তেন রসান্তর-সম্ভবেঽপি পার্ষদপ্রসিদ্ধ্যা সংখ্যানিয়ম ইতি যদন্যৈরুক্তম্, তৎপ্রত্যুক্তম্। ভাবাধ্যায়েঽপি চৈতদ্‌বক্ষ্যতে।[৬] আর্দ্রতাস্থায়িকঃ স্নেহো রস ইতি ত্বসৎ। স্নেহো হ্যভিষঙ্গঃ। স চ সর্বো রত্যুৎসাহাদাবেব পর্যবস্যতি। তথাহি— বালস্য মাতাপিত্রাদৌ স্নেহো ভয়ে বিশ্রান্তঃ। যূনোর্মিত্রজনে রতৌ। লক্ষ্মণাদৌ ভ্রাতরি স্নেহো ধর্মময় এব। এবং বৃদ্ধস্য পুত্রাদাবিতি দ্রষ্টব্যম্। এষৈব গর্ধস্থায়িকস্য লৌল্যরসস্য প্রত্যাখ্যানে সরণির্মন্তব্যা। হাসে বা রতৌ বাঽন্যত্র পর্যবসানাৎ। এবং ভক্তাবপি বাচ্যমিতি।"[৭]

এমনকি অভিনবগুপ্তপাদ ভরতমুনি যে ক্রমে উপরিবর্ণিত আটটি বা নয়টি রস নির্দেশ করিয়াছেন, সেই ক্রমনির্দেশের মধ্যেও পুরুষার্থভিত্তিক একটি যুক্তি আবিষ্কারে প্রয়াসী হইয়াছেন। শৃঙ্গারের পর হাস্য, হাস্যের পর করুণ, তাহার অব্যবহিত পরে রৌদ্র— এইভাবে রসের ক্রমিক নির্দেশের হেতু সম্পর্কে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—

"তত্র কামস্য সকলজাতিসুলভতয়াঽত্যন্তপরিচিতত্বেন সর্বান্ প্রতি হৃদ্যতেতি পূর্বং শৃঙ্গারঃ। তদনুগামী

---

৪ নাট্যশাস্ত্র: ১ম অধ্যায়, শ্লোক ১০৮-১১২।

৫ দ্র° 'তেন রস এব নাট্যম্। যস্য ব্যুৎপত্তিঃ ফলমিত্যুচ্যতে।'— অভিনবভারতী ১ম ভাগ, পৃ. ২৬৭। অপিচ—"নাট্যাৎ সমুদায়-রূপাদ্রসাঃ। যদি বা নাট্যমেব রসাঃ। রসসমুদায়ো হি নাট্যম্। (ন) নাট্য এব চ রসাঃ। কাব্যেঽপি নাট্যায়মান এব রসঃ।..'—ঐ. পৃ. ২৯০।

৬ দ্র° "এতাবন্ত এব চ রসা ইত্যুক্তং পূর্বম্। তেনানন্ত্যেঽপি পার্ষদপ্রসিদ্ধ্যৈতাবতাং প্রযোজ্যত্বম্ ইতি যদ্ ভট্টলোল্লটেন নিরূপিতং তদবলেপেনাপরামৃশ্যেত্যলম্।"—ঐ. পৃ. ২৯৮।

৭ অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪১।

চ হাস্যঃ নিরপেক্ষভাবত্বাৎ। তদ্বিপরীতস্ততঃ করুণঃ। ততস্তন্নিমিত্তং রৌদ্রঃ। স চার্থপ্রধানঃ। ততঃ কামার্থয়োর্ধর্মমূলত্বাদ্ বীরঃ। স হি ধর্মপ্রধানঃ। তস্য চ ভীতাভয়প্রদানসারত্বাৎ। তদনন্তরং ভয়ানকঃ। তদ্বিভাবসাধারণ্যসম্ভাবনাৎ। ততো বীভৎস ইতি যদ্‌বীরেণাক্ষিপ্তম্। বীরস্য পর্যন্তেঽদ্ভুতঃ ফলম্ ইত্যনন্তরং তদুপাদানম্। তথা চ বক্ষ্যতে—"পর্যন্তে কর্তব্যো নিত্যং হি রসোঽদ্ভুতঃ" (না°শা° ১৮.৪৩) ইতি। ততস্ত্রি-বর্গাত্মকপ্রবৃত্তিবিপরীতনিবৃত্তিধর্মাত্মকো মোক্ষফলঃ শান্তঃ। তত্র স্বাত্মাবেশেন রসচর্বণেত্যুক্তম্ ॥"৮

সুতরাং ধর্ম অর্থ এবং কাম প্রবৃত্তিপ্রধান; অপরপক্ষে মোক্ষ নিবৃত্তিপ্রধান। অতএব এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নাট্যও যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যুপযোগী হইবে, তাহা তো নির্বিবাদসিদ্ধ। আর প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি যখন ঈশ্বরের সৃষ্টিলীলারই দুইটি ছন্দ মাত্র, তখন নাট্যও সৃষ্টিরই প্রতিরূপক মাত্র হইবে—ইহাই প্রাচীন ভারতীয় আচার্যগণের সিদ্ধান্ত। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর এই বিশেষত্ব সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্ত্য মনীষীর মন্তব্য অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ—

> Another attempt to make the Universe intelligible regards it as an eternal rhythm playing and pulsing outwards from spirit to matter (*pravṛtti*) and then backwards and inwards from matter to spirit (*nivṛtti*). This idea seems implied by Śankara's view that creation is similar to the sportive impulses of exuberant youth and the Bhagavad-gîtâ is familiar with *pravṛtti* and *nivṛtti*, but the double character of the rhythm is emphasized most clearly in Śâkta treatises. Ordinary Hinduism concentrates its attention on the process of liberation and return to Brahman, but the Tantras recognize and concentrate both movements, the outward throbbing stream of energy and enjoyment (*bhukti*) and the calm returning flow of liberation and peace. Both are happiness, but the wise understand that the active outward movement is right and happy only up to a certain point and under certain restrictions. ৯

২

এইভাবে যদিও ভরতমুনি ও তাঁহার অনুগামী কাব্যলক্ষণবিধায়কগণ প্রধানতঃ রসের নববিধত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি এই নানা প্রভেদ-প্রভিন্ন আস্বাদনাত্মক চিত্তাবস্থার একটি সামান্য প্রকৃতি ও একটি সাধারণ কারণ অন্বেষণ বিষয়েও তাঁহারা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। জিজ্ঞাসুহৃদয়ে প্রথমেই একটি প্রশ্ন উদিত

---

৮ অভিনবভারতী. ১ম ভাগ. পৃ. ২৬৭। অপি চ তুলনীয় :—"তত্র পুরুষার্থনিষ্ঠাঃ কাশ্চিৎ সংবিদ এব প্রধানম্। তদ্ যথা—রতিঃ কামঃ তদনুষঙ্গিধর্মার্থনিষ্ঠা। ক্রোধস্তৎপ্রধানেষ্বর্থনিষ্ঠঃ। কামধর্মপর্যবসিতোঽপ্যুৎসাহঃ সমস্তধর্মাদিপর্যবসিতঃ। তত্ত্বজ্ঞানজনিত-নির্বেদপ্রায়ো বিভাবো মোক্ষোপায় ইতি তাবদেষাং প্রাধান্যম্। যদ্যপি চৈষামপান্যোন্যং গুণভাবোঽস্তি তথাপি তৎতৎপ্রধানে রূপকে তৎতৎপ্রধানং ভবতীতি রূপকভেদপর্যায়েণ সর্বেষাং প্রাধান্যমেষাং লক্ষ্যতে। অদূরভাগাভিনিবিষ্টদৃশস্ত্বেকস্মিন্নপি রূপকে পৃথক্ প্রাধান্যম্ ॥"—ঐ. পৃ. ২৮২।

৯ Sir Charles Eliot: *Hinduism and Buddhism*, Vol. I, p. lxxxi. (Routledge & Kegan Paul Ltd., London. Third Impression, 1957).

হওয়া স্বাভাবিক। তাহা হইতেছে এই : ভরতমুনি যে আটটি কি নয়টি রস ও তদুপযোগী অনুরূপসংখ্যক স্থায়িভাব স্বীকার করিয়াছেন, ইহার তাত্ত্বিক ভিত্তি কি? যদি বলা যায় ঐ কয়টি স্থায়িভাবই কেবল আস্বাদনাত্মক রসাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, তবে তো কার্যতঃ স্বীকার করিয়াই লওয়া হইল যে, সেই অভিন্ন কূটস্থ 'স্বাদ'-ই ইহাদের একমাত্র মূলপ্রকৃতি, পরস্পর প্রভেদ শুধু আপাতপ্রতীয়মান বিকৃতি মাত্র।[১০] যুক্তিটি যে বেশ বলিষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অভিনবগুপ্ত স্বয়ং তাঁহার নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় ভরতের একটি অতি প্রসিদ্ধ উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটির অবতারণা করিয়াছেন। ভরতাচার্য বলিয়াছেন—'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্ততে'। এই পংক্তিটিতে 'রসাৎ' এই পদে একবচন প্রয়োগের হেতু নির্দেশ করিতে গিয়া অভিনবগুপ্ত বলিতেছেন—

"পূর্বত্র[১১] বহুবচনমত্র চৈকবচনং প্রযুঞ্জানস্যায়মাশয়ঃ—এক এব তাবৎ পরমার্থতো রসঃ সূত্রস্থানীয়ত্বেন রূপকে প্রতিভাতি। তস্যৈব পুনর্ভাগদৃশা বিভাগঃ।"[১২]

স্থলান্তরেও ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"তেন রস এব নাট্যম্। যস্য ব্যুৎপত্তিঃ ফলমিত্যুচ্যতে। তথা চ 'রসাদৃতে'-ইত্যেকবচনোপপত্তিঃ। ততশ্চ মুখ্যভূতাৎ মহারসাৎ স্ফোটদৃশীবাসত্যানি বা অন্বিতাভিধানদৃশীবোপায়াত্মকানি সত্যানি বা অভিহিতান্বয়দৃশীব তৎসমুদায়রূপাণি বা রসান্তরাণি ভাগাভিনিবেশদৃষ্টানি রূপ্যন্তে। ..."[১৩]

সুতরাং আপাততঃ রসের অনেক ভেদ স্বীকৃত হইলেও পরমার্থতঃ রসস্বরূপ যে অভিন্ন ও নির্বিকার এবং সকল প্রভেদের মধ্যেই যে সেই অদ্বৈত রসস্বরূপের স্ফূর্তি অনুস্যূত হইয়া আছে, ইহা রসতত্ত্বের মুখ্য প্রবক্তা ভরতমুনিরও অপরিজ্ঞাত ছিল না, ইহাই আচার্য অভিনবগুপ্তের সুস্পষ্ট অভিমত। সেই সর্বপ্রভেদের মধ্যে অনুগত, সূত্রস্থানীয় 'মহারস', যাহা হইতে আর সকল রসের 'বিবর্ত্ত', স্বরূপজ্যোতিঃ স্ফোটতত্ত্ব হইতে যেমন বহুধা বাগ্‌বিবর্ত্ত— তাহার স্বরূপ বিষয়ে অবশ্য আচার্যগণের মধ্যে সম্মতি নাই। বৈদিক দেবতাতত্ত্বের আলোচনায় যেমন বিভিন্ন দেবগণ কখনও পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতেছেন, আবার কখনও সমস্ত দেবতার মধ্যে একই পরমা দৈবী শক্তির স্ফুরণ কীর্তিত হইতেছে, সর্বশেষ স্তরে যেমন পরমার্থতঃ একই পরমাত্মা ঋষিগণ কর্তৃক স্তুত হইয়াছেন, দেবতাভেদ শুধু কল্পনা মাত্র, সেই একই দেবতার বিলাসমাত্র, এবং সেই পরমাত্মতত্ত্বই যেমন জড় ও চৈতন্যের মিলনকেন্দ্ররূপে বিঘোষিত হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়, এইভাবে আর্যগণের দেবতাবোধের ক্রমবিকাশের যেমন তিনটি প্রধান স্তর পরিলক্ষণীয়—পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ যাহাদের নাম দিয়াছেন যথাক্রমে henotheism, pantheism এবং monotheism; অনুরূপভাবে রসতত্ত্বের আলোচনাও তিনটি পৃথক্ স্তর অতিক্রম করিয়া চরম অদ্বৈতবাদের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।[১৪] একেবারে

১০ অভিনবভারতী ১ম ভাগ।

১১ তু° 'তত্র রসানেব তাবদভিব্যাখ্যাস্যামঃ'—নাট্যশাস্ত্র ১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২৭২।

১২ অভিনবভারতী ১ম ভাগ, পৃ. ২৭২।

১৩ ঐ. পৃ. ২৬৭।

১৪ দার্শনিক তত্ত্বের বিচারেও আরম্ভবাদ, সংঘাতবাদ, পরিণামবাদ এবং বিবর্তবাদের মধ্য দিয়া বেদান্তবাদের অদ্বৈতবাদে উত্তরণ এই প্রসঙ্গে সহজেই মনে পড়িবে। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য ৺মহামহোপাধ্যায়, পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ প্রণীত 'ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়' (Adharchandra Mookerjee Lectures, 1952: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) নামক গ্রন্থের 'বেদান্তদর্শনের আলোচনা' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য: পৃ. ৮০-৮৯।

প্রাথমিক স্তরে সকল রস এবং তদুপযোগী স্থায়িভাবকেই স্বতন্ত্র ও স্বলক্ষণ রূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে—ইহা বৈদিক দেবতত্ত্বে polytheism-এর অনুরূপ। পরবর্তী স্তরে কোনও একটি রসকে পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠ রস রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে—কখনও শৃঙ্গারকে, কখনও বা করুণকে ইত্যাদি। তৃতীয় স্তরে, সমস্ত রসের মধ্যেই একটি অনুগত তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রতি আচার্যগণের প্রবণতা লক্ষিত হয়, কেহ আত্মরতিকে, কেহ শমভাবকে, আবার কোনও আচার্য চমৎকার বা অভিমানকে এই অনুগত তত্ত্বরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। সর্বশেষে রসতত্ত্ব বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের স্তরে উন্নীত হইয়া ঔপনিষদ আত্মতত্ত্বের সহিত একাত্মীভূত হইয়া অধ্যাত্মশাস্ত্রগোচররূপে পরিণত হইয়াছে। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী রসতত্ত্বের আলোচনায় ভারতীয় আচার্যগণের এই অদ্বৈতপক্ষপাত সম্পর্কে একস্থলে বলিয়াছেন—

In the course of the development of the philosophy of *Rasa,* several attempts were made in the direction of synthesising the various *Rasas.* The more important results of such attempts were summed up in four kinds of synthesis. Firstly, there is *Karuna-synthesis* which originated from Vālmīki and found its culmination in Bhavabhūti's "एको रसः करुण एव" on the practical side, and in Ānandavardhana's "शोकः श्लोकत्वमागतः" on the theoretical side. Secondly, there is *Śānta-synthesis,* which started perhaps from the *Mahābhārata,* found its fulfilment in works like Aśvaghoṣa's *Śāriputra-parkarṇa,* Śrī Harṣa's *Nāgānanda* and Kṛṣṇa-Miśra's *Prabodha-candrodaya,* and received able advocacy on the theoretical side at the hands of the two greatest Ālaṃkārikas—Ānandavardhana and Abhinavagupta. Thirdly, there is the *Śṛṅgāra-synthesis,* which firmly rooted in human nature itself since the beginning of creation, reached its acme of spiritual refinement, on the practical side, in the self-effacing ideal of love delineated in an inimitable manner by the creative genius of great poets like Kālidāsa and Bāṇa, and, on the theoretical side, in the well-known dictum of the royal polymath, Bhoja : "रसोऽभिमानोऽहङ्कारः शृङ्गार इति गीयते". And fourthly, there is the *Adbhuta-synthesis* which, on the theoretical side, became crystallised in the views of Nārāyaṇa and Dharmadatta referred to by Viśvanātha in his *Sāhitya-darpaṇa* and in the views of Bhānudatta as expressed in his *Rasataraṅgiṇī ;* and which on the practical side, led to the production of the wonder-dominated dramatic type represented by the older *Āścarya-cūḍāmaṇi* and the later *Adbhuta-darpaṇa* of Mahādeva at the end of the seventeenth century.[১৫]

---

১৫ S. Kuppuswami Sastri : *Introduction* to *Āścarya-cūḍāmaṇi* : A drama by Śaktibhadra : Pp. 13-14 (Madras, 1926)। বিভিন্ন রসগুলির মধ্যে সমন্বয়স্থাপনের বিচিত্র প্রয়াস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য ড. ভি. রাঘবন্ প্রণীত *The Number of Rasas* গ্রন্থের Rasa-Synthesis শীর্ষক দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কিন্তু ইহা রসতত্ত্বের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদকে প্রতিপাদন করে নাই। উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে ভারতীয় রসমীমাংসকগণের যে অদ্বৈতাভিমুখে যাত্রার ইঙ্গিত আছে, তাহা বৈদিক দেবতত্ত্বে অনেকটা henotheism, কি বড় জোর hantheism-এর অনুরূপ মাত্র। যাহা হউক, উপরি-উল্লিখিত কয়েকটি মতবাদ এই প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া আমরা বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ বা pure monism -এর স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

৩

ভারতীয় আচার্যগণ শৃঙ্গার-রসকে 'আদিরস' এই আখ্যার দ্বারা ভূষিত করিয়া থাকেন। হাস্য, করুণ প্রভৃতি রসান্তরেরও মূল যে রতিরূপ স্থায়িভাব, ইহা 'নাশৃঙ্গারী হসতি···' প্রভৃতি উক্তির দ্বারা আচার্য অভিনবগুপ্ত বহুস্থলে প্রতিপাদন করিয়াছেন। আচার্য আনন্দবর্ধনও তাঁহার 'ধ্বন্যালোক' নিবন্ধে স্পষ্টতই বলিয়াছেন—

"শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।
স এব বীতরাগশ্চেন্নীরসং সর্বমেব তৎ॥"[১৬]

'শৃঙ্গার-প্রকাশ' কর্তা ভোজরাজের হস্তে শৃঙ্গার-রস সর্বশ্রেষ্ঠ রস, এমনকি একমাত্র 'রসনীয়' চিত্তাবস্থা এবং সর্বরসের আকররূপে নিরূপিত হইয়াছে—

"শৃঙ্গার-বীর-করুণাদ্ভুত-রৌদ্র-হাস্য-
বীভৎস-বৎসল-ভয়ানক-শান্তনাম্নঃ।
আম্নাসিষুর্দশ রসান্ সুধিয়ো বয়ং তু
শৃঙ্গারমেব রসনাদ্রসমামনামঃ॥· ·
··· ··· ···
অপ্রাতিকূলিকতয়া মনসো মুদাদেঃ
যঃ সংবিদোঽনুভবহেতুরিহাভিমানঃ।
জ্ঞেয়ো রসঃ স রসনীয়তয়াত্মশক্তেঃ
রত্যাদিভূমনি পুনর্বিতথা রসোক্তিঃ॥"[১৭]

বর্তমান প্রবন্ধের পরিমিত পরিসরের মধ্যে ভোজরাজ-পরিকল্পিত শৃঙ্গারাদ্বৈতবাদের যথার্থ স্বরূপ বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। তথাপি এই মতবাদ যে গভীর মননশীলতাপ্রসূত, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

শৃঙ্গারাদ্বৈতবাদের বিপরীত কোটিতে অবস্থিত শান্তাদ্বৈতবাদও অতিগম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। শান্তরসের রসত্ব বিষয়ে ভরতমুনির কাল হইতেই আচার্যগণের মধ্যে পরস্পর বিসংবাদ

---

১৬ দ্র° ধ্বন্যালোক: ৩য় উদ্দ্যোত্ত, বৃত্তি. পৃ. ৪৯৮ (কাশী সংস্করণ)। তু°—"শৃঙ্গারীতি। শৃঙ্গারোক্তবিভাবানুভাব-ব্যভিচারি-চর্বণারূপপ্রতীতিময়ো ন তু স্ত্রীব্যসনীতি মন্তব্যম্। অতএব ভরতমুনিঃ—'কবেরন্তর্গতং ভাবম্', 'কাব্যার্থান্ ভাবয়তি' ইত্যাদিষু কবিশব্দমেব মূর্ধাভিষিক্ততয়া প্রযুঙ্‌ক্তে। নিরূপিতং চৈতদ্রসস্বরূপনির্ণয়াবসরে।"—ঐ. লোচন-টীকা।

অপি চ— "শৃঙ্গাররসো হি সংসারিণাং নিয়মেনানুভববিষয়ত্বাৎ
সর্বরসেভ্যঃ কমনীয়তয়া প্রধানভূতঃ।"—ধ্বন্যালোক-বৃত্তি, কারিকা ৩.২৯।

১৭ শৃঙ্গারপ্রকাশ: প্রথম অধ্যায়।

প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রেরই কোনও কোনও গ্রন্থে শান্তরসকে শৃঙ্গার প্রভৃতি অষ্টবিধ রসের সহিত একত্র উল্লেখ করা হয় নাই, তদুপযোগী স্থায়িভাব নির্বেদকেও অনুরূপভাবে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের সহিত পরিগণনা করা হয় নাই। অথচ নির্বেদকে ভরতমুনি সঞ্চারিভাব বা ব্যভিচারিভাবের তালিকায় প্রথম স্থান দিয়াছেন। 'নির্বেদ' সম্পর্কে ভরতমুনির এই বিলক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গীর হেতু নির্দেশপ্রসঙ্গে আচার্য অভিনবগুপ্তপাদ বলিতেছেন—

"ইহ তাবদ্ ধর্মাদিত্রিতয়মিব মোক্ষোঽপি পুরুষার্থঃ শাস্ত্রেষু স্মৃতীতিহাসাদিষু চ প্রাধান্যেনোপায়-তো ব্যুৎপাদ্যত ইতি সুপ্রসিদ্ধম্। যথা চ কামাদিষু সমুচিতাশ্চিত্তবৃত্তয়ো রত্যাদিশব্দবাচ্যাঃ কবি-নট-ব্যাপারেণাস্বাদযোগ্যতাপ্রাপণদ্বারেণ তথাবিধহৃদয়সংবাদবতঃ সামাজিকান্ প্রতি রসত্বং শৃঙ্গারাদিতয়া নীয়ন্তে, তথা মোক্ষাভিধানপরমপুরুষার্থোচিতা চিত্তবৃত্তিঃ কিমিতি রসত্বং নানীয়তে ইতি বক্তব্যম্। যা চাসৌ তথাভূতা চিত্তবৃত্তিঃ সৈবাত্র স্থায়িভাবঃ। এতত্তু চিন্ত্যম্। কিং নামাসৌ? তত্ত্বজ্ঞানোত্থিতো নির্বেদ ইতি কেচিৎ। তথাহি—দারিদ্র্যাদিপ্রভবো যো নির্বেদঃ স ততোঽন্য এব। হেতোস্তত্ত্বজ্ঞানস্য বৈলক্ষণ্যাৎ। স্থায়িসঞ্চারিমধ্যে চৈতদর্থমেবায়ং পঠিতঃ। অন্যথা মাঙ্গলিকো মুনিস্তথা ন পঠেৎ। জুগুপ্সাং চ ব্যভিচারিত্বেন শৃঙ্গারে নিষেধন্ মুনির্ভাবানাং সর্বেষামেব স্থায়িত্ব-সঞ্চারিত্ব-চিন্তনাৎ তাবত্ত্বানুভাবত্বানি যোগ্যতোপনিপাতিতানি শব্দার্থবলাকৃষ্টান্যনুজানাতি।"[১৮]

অভিনবগুপ্ত তাঁহার সুবিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থের নানাস্থলে সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে শান্তরসের রসত্বই যে শুধু স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই নহে; তিনি এতদূর পর্যন্তও বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে শান্তরসই সকল রসের প্রকৃতি, সর্ববিধ রসানুভূতির মধ্যে শান্তরসের উপযোগী চিত্তাবস্থা ও আস্বাদন অনুস্যূত হইয়া থাকে—

"তস্মাদস্তি শান্তো রসঃ। তথা চ চিরন্তনপুস্তকেষু 'স্থায়িভাবান্ রসত্বমুপনেষ্যামঃ'-ইত্যনন্তরং 'শান্তো নাম শমস্থায়িভাবাত্মকঃ'—ইত্যাদি শান্তলক্ষণং পঠ্যতে। তত্র সর্বরসানাং শান্তপ্রায় এবাস্বাদো ন বিষয়েভ্যো বিপরিবৃত্ত্যা। তন্মুখ্যতালাভাৎ কেবলং বাসনান্তরোপহিত ইত্যস্য সর্বপ্রকৃতিত্বাভিধানায় পূর্বমভিধানম্।..."[১৯]

শান্তরসে যেমন সর্ববিধ তৃষ্ণার উপশম ঘটিয়া থাকে, এবং তাহাই যেমন সর্বমানবের চরম পুরুষার্থ এবং ব্রহ্মানন্দস্বভাব, সেইরূপ সর্বরসের ক্ষেত্রেই যতক্ষণ পর্যন্ত না তৃষ্ণাক্ষয় সংঘটিত হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রসাস্বাদ অপরিপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অতএব তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখই সকল রসের সাধারণ প্রকৃতি, এবং তাহাই শান্তরস। শান্ত হইতেই অনুকূল বিভাবাদি নিমিত্ত সমবায়ে শৃঙ্গারাদি রসের জন্ম, আবার নিমিত্তাপগমে শান্তরসেই বিলয়। আস্বাদভেদ শুধু ঔপাধিক। রসাস্বাদের চরম অবস্থায় তৃষ্ণাক্ষয়, এবং এই তৃষ্ণাক্ষয়ের সহিত তুলনায় লৌকিক সকল সুখই অকিঞ্চিৎকর। কেননা—

---

১৮ অভিনবভারতী: ১ম ভাগ, পৃ. ৩৩১।

১৯ ঐ. পৃ. ৩৩৯। ধ্বন্যালোকের লোচন-টীকার একস্থলে অভিনবগুপ্ত শান্তরস সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"মোক্ষফলত্বেন চায়ং পরম-পুরুষার্থনিষ্ঠত্বাৎ সর্বরসেভ্যঃ প্রধানতমঃ। স চায়মস্মদুপাধ্যায়ভট্টতৌতেন কাব্যকৌতুকে, অস্মাভিশ্চ তদ্বিবরণে বহুতরকৃতনির্ণয়পূর্বপক্ষ-সিদ্ধান্তঃ-ইত্যলং বহুনা।"—লোচন, পৃ ৩৯৪ (কাশী সংস্করণ)।

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ কিঞ্চিন্মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥"[২০]

এইভাবে আচার্য অভিনবগুপ্ত শান্তরসকে সকল রসের প্রকৃতিরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং ভরতমুনিরও যে এই মত অসম্মত নহে তাহা তাঁহার বচন উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

৪

কিন্তু ভারতীয় কাব্যমীমাংসকগণ এইভাবে সর্বরসের মধ্যে একটি বাহ্য সমন্বয়সূত্র আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা রসানুভূতির ক্ষেত্রে যে বিজ্ঞান ও আনন্দঘন আস্বাদ সর্ববাদিসম্মত, তাহার এক তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত ঔপনিষদ অধ্যাত্মবাদের সহিত রসতত্ত্বের ঐকান্তিক অভিন্নত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের একটি মন্ত্রবর্ণ তাঁহাদের এই জিজ্ঞাসাকে প্রধানতঃ উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেখানে আত্মাকে বলা হইয়াছে— রস-স্বরূপ:

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাহনন্দী ভবতি।"

কাব্য নাট্য সঙ্গীত চিত্রকলা প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের ক্ষেত্রেও সহৃদয়ের চিত্তে যে রসানুভূতি সম্ভব হয়, তাহাও সচ্চিদানন্দস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্যের অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গের ফলস্বরূপ, অতিরিক্ত কিছুই নহে। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি সাধনার দ্বারা যোগিগণ যেভাবে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন, এবং সেই সাক্ষাৎকারক্ষণে যেমন আত্মব্যতিরিক্ত আর সকল প্রপঞ্চেরই বিলয় ঘটে এবং সেই আনন্দঘন রসস্বরূপ আত্মচৈতন্যের আহ্লাদ যেমন তাঁহাদের সমস্ত চিত্তভূমিকে প্লাবিত করে, কাব্য-গীতাদি চারুশিল্পও যথার্থ সহৃদয়ের চিত্তে অনুরূপ নির্বিকার, একতান এবং আহ্লাদঘন সাক্ষাৎকারকল্প এক বিলক্ষণ প্রত্যয়ের জনক। এবং আনন্দ বা আহ্লাদ, যাহা কোনও বিঘ্ন বা মালিন্যের দ্বারা অস্পৃষ্ট, যখন বেদান্তমতে আত্মব্যতিরিক্ত আর কাহারও ধর্মই হইতে পারে না, পরন্তু আত্মস্বরূপমাত্র, তখন শিল্পকর্মসঞ্জাত সহৃদয়ের এই আনন্দাস্বাদ আত্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, ইহাই ভারতীয় আচার্যগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিয়া পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলিয়াছেন—

"বস্তুতস্তু বক্ষ্যমাণশ্রুতিস্বারস্যেন রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ। সর্বথৈব চাস্যা বিশিষ্টাত্মনো বিশেষণং বিশেষ্যং বা চিদংশমাদায় নিত্যত্বং স্বপ্রকাশত্বং চ সিদ্ধম্। রত্যাদ্যংশমাদায় ত্বনিত্যত্বমিতরভাস্যত্বং চ।"[২১]

ভট্টনায়ক তাঁহার লুপ্ত নিবন্ধ 'হৃদয়দর্পণে' অভিনবগুপ্তেরও পূর্বে বলিয়াছিলেন—

"পাঠ্যাদথ ধ্রুবাগানাৎ ততঃ সম্পূরিতে রসে।
তদাস্বাদভরৈকাগ্রো হৃষ্যত্যন্তর্মুখঃ ক্ষণম্॥

---

২০ দ্র° ধ্বন্যালোক: ৩য় উদ্দ্যোত, বৃত্তি (পৃ. ৩৯০)। এই বৃত্তি-গ্রন্থের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন: "অন্যে তু—
স্বং স্বং নিমিত্তমাসাদ্য শান্তাদ্ভাবঃ প্রবর্ততে।
পুনর্নিমিত্তাপায়ে তু শান্ত এব প্রলীয়তে ॥—ইতি ভরতবাক্যং দৃষ্টবন্তঃ সর্বরসসামান্যস্বভাবং শান্তমাচক্ষাণা অনুপজাতবিশেষান্তরচিত্তবৃত্তিরূপং শান্তস্য স্থায়িভাবং মন্যন্তে। এতচ্চ নাতীবাস্মৎপক্ষাদ্ দূরম্।..."—লোচন, পৃ. ৩৯১।

২১ দ্র° রসগঙ্গাধর: ১ম আনন, পৃ. ২৭।

ততো নির্বিষয়স্যাস্য স্বরূপাবস্থিতৌ নিজঃ।
ব্যজ্যতে হ্লাদনিষ্যন্দো যেন তৃপ্যন্তি যোগিনঃ॥"[২২]

রসানুভূতিজনিত এই 'হ্লাদনিষ্যন্দ' যে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' তাহাও 'হৃদয়দর্পণ'কারই ঘোষণা করিয়াছিলেন। আচার্য অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়কের এই সিদ্ধান্তই আপন অপূর্ব মনীষার সাহায্যে সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিস্থাপিত করিয়াছেন মাত্র। তবে যদিও রসচর্বণাকে পরব্রহ্মাস্বাদের সহোদর বলা হইয়াছে বটে, তথাপি এই উভয় বিজ্ঞানধারার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ বৈলক্ষণ্যও যে আছে, তাহাও ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত কাহারও দৃষ্টি এড়ায় নাই। কেননা, পরব্রহ্মাস্বাদ নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মসাক্ষাৎকার। অপরপক্ষে রসচর্বণায় স্বপ্রকাশ চৈতন্যের আনন্দাংশের আস্বাদসমকালেই বিভাবাদির সাক্ষাৎকারও অনুভবসিদ্ধ। সেইজন্যই পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলিয়াছেন—

"ইয়ং চ পরব্রহ্মাস্বাদাৎ সমাধের্বিলক্ষণা। বিভাবাদিবিষয়সংবলিত-
চিদানন্দালম্বনত্বাৎ। ভাব্যা চ কাব্যব্যাপারমাত্রাৎ।"[২৩]

এইভাবে যদিও ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত পরব্রহ্মাস্বাদ এবং রসাস্বাদের মধ্যে প্রকারগত তারতম্য কিঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি কবিকে যোগী হইতে সমুচ্চ আসন দান করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। এই প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত তাঁহার লোচনটীকায় 'হৃদয়দর্পণ' হইতে ভট্টনায়কের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যোগিগণ যে ব্রহ্মানন্দরূপ রস পান করেন তাহা শমদমাদিসাধনোপার্জিত; পরন্তু কবিগণ বাগ্‌দেবীর অর্চনার দ্বারা যে দিব্য আনন্দরস আস্বাদনে সমর্থ হন, তাহা অযত্নলভ্য। ধেনুর নিকট হইতে বৎস সন্তানস্নেহে স্বত-উৎসারিত যে ক্ষীরধারা পান করে, তাহার সহিত গোপকর্তৃক ক্লেশোপার্জিত দুগ্ধধারার আস্বাদের যেমন তুলনা হয় না, বাগ্‌দেবীর সন্তানরূপ কবিগণকর্তৃক অক্লেশাস্বাদিত দিব্য আনন্দরসের সহিতও সেইরূপ যোগিগণকর্তৃক আস্বাদিত পরব্রহ্মাস্বাদের তুলনা হয় না।[২৪] বস্তুতঃ,

২২ মহিমভট্টকৃত 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থের ১ম বিমর্শে উদ্ধৃত। দ্র° 'ব্যক্তিবিবেক', পৃ. ৯৪ (কাশী সংস্করণ)। যদিও এইস্থলে ভট্টনায়কের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না, তথাপি এই দুইটি শ্লোক ভট্টনায়কের লুপ্ত নিবন্ধ হইতেই উদ্ধৃত বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। অপি চ তুলনীয়: "This monistic idea is seen in the system of the Kashmerian writers as developed and followed by most Ālaṃkārikas. The idea of aesthetic Rasa being equal to Brahmāsvāda is spoken of by all writers, Bhaṭṭa Nāyaka, Abhinavagupta and all the followers of the latter."—V. Raghavan: *Bhoja's Śṛṅgāra Prakāśa*, Vol. I, Part II, p. 507 (Karnatak Publishing House, Bombay).

২৩ দ্র° রসগঙ্গাধর: ১ম আনন, পৃ. ২৭।

২৪ 'সরস্বতী স্বাদু তদর্থবস্তু—' (ধ্বন্যালোক ১.৬)—এই ধ্বনিকারিকার ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—'সরস্বতীতি। বাগ্‌রূপা ভগবতীত্যর্থঃ।···নিঃষ্যন্দমানেতি। দিব্যমানন্দরসং স্বয়মেব প্রস্নুবানেত্যর্থঃ। যদাহ ভট্টনায়কঃ—

বাগ্‌ধেনুর্দুগ্ধ এতং হি রসং যদ্ বালতৃষ্ণয়া।
তেন নাস্য সমঃ স স্যাদ্ দুহ্যতে যোগিভির্হি যঃ॥

তদাবেশেন বিনাপ্যাক্রান্ত্যা হি যো যোগিভির্দুহ্যতে।··"—লোচন, পৃ. ৯১-৯২।

তু° "Poets are Nature's favourite children. She yields her secrets to them more readily than to others. The best part of her gifts is given to them, even as the cow, as it is said, yields the best part of the milk to the calf."—M. Hiriyanna: *The Indian Conception of Values.*

আনন্দমাত্রই ব্রহ্মানন্দস্বভাব, সে-আনন্দ যোগজ সমাধির দ্বারা অভিব্যক্ত হউক, কাব্য-বর্ণিত বিভাবাদির দ্বারা অভিব্যক্তই হউক, অথবা লৌকিক অনুকূলবেদনীয় সুখাদি-সমুত্থই হউক— ইহাই বেদান্তদর্শনের চরম সিদ্ধান্ত। তবে যে এই সকল আনন্দব্যক্তির আস্বাদনের মধ্যে প্রকারগত অথবা প্রকর্ষগত তারতম্য অনুব্যবসায়সিদ্ধ, তাহা শুধু অভিব্যঞ্জক সামগ্রীর ভেদনিবন্ধন। অভিব্যঙ্গ্য সচ্চিদানন্দস্বভাব রসস্বরূপ পরমাত্মার তাহার দ্বারা কোনও প্রভেদ সিদ্ধ হয় না। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের পুত্র কুমারস্বামী বিদ্যানাথপ্রণীত 'প্রতাপরুদ্রীয়যশোভূষণ' নামক অলংকারনিবন্ধের ব্যাখ্যায় ভট্ট নরহরির যে মত উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

"...অত এবায়ং ব্রহ্মানন্দ এব। ইয়াংস্তু বিশেষঃ। ব্রহ্মানন্দো যোগগম্যঃ। অয়ং তু বিভাবাদ্যনুসন্ধানগম্য ইতি। ইদমপি তেনৈবোক্তম্—'সর্বত্রৈকৈবানন্দব্যক্তির্লৌকিকং সুখমিতি ব্যবহ্রিয়তে। অলৌকিকবিভাবাদ্যভিব্যক্তা কবিসময়প্রসিদ্ধ্যনুসারাদলৌকিকো রস ইতি কথ্যতে। নানাবিধবিমলকর্মনির্মলান্তঃকরণেষু শমদমাদিসাধনসম্পন্নেষু শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-পরেষু পরমযোগিষু নির্বিকল্পকসমাধ্যভিব্যক্তা ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ঈশ্বর ইতি শব্দ্যতে—ইতি। উক্তং চ 'স্বাত্মযোগপ্রদীপে'—

যা স্থায়িভাবরতিরেব নিমিত্তভেদা-
চ্ছৃঙ্গারমুখ্যনবনাট্যরসীভবন্তী।
সামাজিকান্ সহৃদয়ান্ নটনায়কাদীন্
আনন্দয়েৎ সহজপূর্ণরসোঽস্মি সোঽহম্॥"[২৫]

'ধ্বন্যালোকে'র তৃতীয়োদ্দ্যোতের বৃত্তিগ্রন্থে আচার্য আনন্দবর্ধন—

"যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা দৃষ্টিঃ"

এই শ্লোকে পরমেশ্বরভক্তির যে অনুপম আনন্দরূপতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে দার্শনিকপ্রবর গুপ্তপাদের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি এইপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য—

"এবং প্রথমমেব পরমেশ্বরভক্তিভাজঃ কুতূহলমাত্রাবলম্বিত-কবি-প্রামাণিকোভয়বৃত্তেঃ পুনরপি পরমেশ্বরভক্তিবিশ্রান্তিরেব যুক্তেতি মন্বানস্যেয়মুক্তিঃ। সকল-প্রমাণ-পরিনিশ্চিত-দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়বিশেষজং যৎ সুখং, যদপি বা লোকোত্তরং রসচর্বণাত্মকং, তত উভয়তোঽপি পরমেশ্বরবিশ্রান্ত্যানন্দঃ প্রকৃষ্যতে; তদানন্দবিপ্রুণ্‌মাত্রাবভাসো হি রসাস্বাদ ইত্যুক্তং প্রাগস্মাভিঃ॥"[২৬]

অতএব অভিনবগুপ্ত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে লোকোত্তর রসচর্বণাত্মক সুখই হউক, অথবা প্রামাণিকগণের তত্ত্বদর্শনজনিত সুখই হউক, বা লৌকিক যে কোনও সুখই হউক না কেন, সকল সুখই পরমেশ্বরবিশ্রান্তি বা ব্রহ্মসমাধিসঞ্জাত আনন্দেরই 'বিপ্রুট্' বা কণিকামাত্র, অতিরিক্ত কিছু নহে। ইহাই তো উপনিষদের সারমর্ম।[২৭]

---

২৫ দ্র° *Pratāparudrīya-yaśobhūṣaṇa*: Ed. by K. P. Trivedi (Bombay Sanskrit & Prakrit Series), p. 295.

২৬ দ্র° লোচন-টীকা, পৃ. ৫১০।

২৭ তুলনায়: "........it is really the infinite whom we seek in our pleasures. Our desire for being wealthy is not a desire for a particular sum of money but it is indefinite, and the most fleeting of our enjoyments are but the momentary touches of the eternal."—Rabindranath: *Sādhanā* ('Realisation of the Infinite' শীর্ষক ভাষণ দ্রষ্টব্য)।

৫

রসতত্ত্বের এই অধ্যাত্মশাস্ত্রসম্মত অদ্বৈতপর ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়া লইয়াও আমরা একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হই। কবি যদি যোগীরই সমগোত্রীয় হন, কাব্যানুশীলনাভ্যাসরত সহৃদয় যদি পরব্রহ্মসাক্ষাৎকারনিরত মুমুক্ষু সাধকেরই সজাতীয় হন, তবে কি কাব্যনির্মাণ বা কাব্যানুশীলনও তুল্যভাবে মুক্তির সোপান ?

বিশুদ্ধ যুক্তি যে তাহাই নির্দেশ করে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।[২৮] কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাহা কি সম্ভব ? এই জিজ্ঞাসার সমাধান কি ? এই প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হিরিয়ানার সমীক্ষা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি Mac Gregor প্রণীত *Aesthetic Experience in Religion* নামক গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলিয়াছেন—

The relation between art experience and religion is considered by Indian thinkers also, and we may close this review by making a brief reference to their conclusion. To those who are familiar with Indian thought, it is clear from the account given above of the approach to mystic experience, that there is a striking resemblance between it and the three ascending steps of spiritual discipline prescribed in Indian works—*śravaṇa, manana* and *dhyāna,* which respectively stand for knowledge of God, by faith, reflection upon it and meditation with a view to transform it into direct experience. Since *rasa* or aesthetic experience also, like this final one of *jīvan-mukti,* is characterised by complete detachment and is accompanied by a unique form of delight, the two are described as similar. But there is one vital difference between them. It is the lack in the former of the knowledge of ultimate reality, which is essential to the latter (a deficiency which is made good here by assuming grades of aesthetic intuition that progressively reveal reality). To this, they trace the lapse from art experience which takes place sooner or later when, to speak generally, all the tensions of ordinary life return. There is a reversion to common life from the experience of *jīvanmukti* also ; but it can by no means, be regarded as a 'lapse', since the philosophic condition endures then, with all its expected influence upon life's conduct. In other words, there is according to the Indian view, no direct connection between aesthetic and absolute experience, as seems to be supposed here. The discipline of the fine arts, particularly of music,[২৯] is not, however, excluded from religion ;

২৮ তু° *"Kāvya-yoga* is also a path-way to Reality, even as *Karma-yoga,* for example."—N. Shivarama Sastry : *Aesthetic Experience* (Proceedings of the Indian Philosophical Congress, 1940).

২৯ 'সঙ্গীতদর্পণ'-কার মার্গ-সঙ্গীতকে স্পষ্টতই 'বিমুক্তি-দ' রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত মনীষী আনন্দ কুমারস্বামীর *The Nature of "Folklore" and "Popular Art"* -শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য। চিত্রশিল্পও যে কাব্যের ন্যায়ই সহৃদয়-দর্শকচিত্তে বিভিন্ন রসের উদ্রেকে সমর্থ, এবং তাহাই যে চিত্রকরের লক্ষ্য, তাহা ভোজরাজ প্রণীত 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধার' নামক নিবন্ধে সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। দ্র° *Samarāṅgaṇa-sūtradhāa,* Vol. II, Ch. 82. (Gaekwad Oriental Series).

but it is explained as only a useful aid to success in meditation upon the Highest (cf. *Yājñavalkya-smṛti,* iii. 115).[৩০]

সুতরাং দেখা যাইতেছে কাব্যজন্য অলৌকিক রসাস্বাদ ও সমাধিজন্য পরব্রহ্মাস্বাদ এই দুইটিই তত্ত্বদৃষ্টিতে সগোত্রীয় হইলেও জীবনচর্যার উপর উভয়ের প্রভাবের গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব সমান নহে এবং সেইজন্যই অধ্যাপক হিরিয়ানা এই দুইটিকে বিলক্ষণ স্তরের অনুভূতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে সমাহিত যোগচিত্তেরও 'ব্যুত্থান' আছে, তখন তাঁহাকে এই বাস্তবজীবনের অসম্পূর্ণতার মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করিতে হয়, যেমন রসাস্বাদক্ষণ হইতে ভ্রষ্ট সহৃদয়কে পুনরায় লৌকিক জীবনের বন্ধন স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সেই পরিপূর্ণ আনন্দময় রসানুভূতির কোনও রেশই কি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার মধ্যে ধ্বনিত হয় না? যদি না হয়, তবে অবশ্য রসানুভূতি ক্ষণকালের নিছক ভাববিলাস ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু যথার্থ কাব্য বা শিল্পের আস্বাদ তো এতদূর ক্ষণস্থায়ী নয়। অন্ততঃ আমাদিগের চিত্তে ক্ষণকালের জন্যও যে ব্রহ্মাস্বাদ জন্মাইয়া দিতে পারে, তাহাতেই কাব্য বা শিল্পের সার্থকতা; কেননা, সেই আস্বাদ পুনর্বার লাভ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা আমাদের চিত্তে জাগরূক হয়, এবং এইভাবেই বিশুদ্ধ আনন্দপদপ্রার্থী হইয়া আমরা ক্রমশঃ আমাদের ধূলিমলিন এই জীবনকে উন্নত হইতে উন্নততর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে সমর্থ হই। এ বিষয়ে অধ্যাপক হিরিয়ানাই তাঁহার অন্য একটি প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য—

"The limitations of the experience of art, to which we have alluded, do not affect the conclusion that it is of the same order, as that of the ideal state; and we may well deduce from the fact of the one the feasibility of the other. Further, art experience is well adapted to arouse our interest in the ideal state by giving us a foretaste of it, and thus to serve as a powerful incentive to the pursuit of that state. By provisionally fulfilling the need felt by man for restful joy, art experience may impel him to do his utmost to secure such joy finally[৩১]

তাহা ছাড়া এ কথাও আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে অধ্যাত্মশাস্ত্রে যেমন অধিকারিভেদচিন্তা অবর্জনীয়, রসশাস্ত্রেও সেইরূপ অধিকারিভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কবির কাব্যের তাৎপর্য, তাহার রসপরিণাম, সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে, যথার্থ সহৃদয়তা অপেক্ষিত। কেননা, আচার্য আনন্দবর্ধনের ভাষায়—

বৈকটিকা এব হি রত্নতত্ত্ববিদঃ, সহৃদয়া এব হি কাব্যানাং রসজ্ঞা ইতি কস্যাত্র বিপ্রতিপত্তিঃ?"[৩২]

কিন্তু সকল পাঠক বা প্রেক্ষকই তো তুল্যভাবে 'কাষ্ঠাপ্রাপ্তসহৃদয়ভাব' নন। সুতরাং তাঁহাদের সহৃদয়তার তারতম্য অনুসারে সেই রসতত্ত্বের উপলব্ধিরও যে তারতম্য ঘটিবে, ইহা তো স্বাভাবিক। উত্তম মধ্যম

---

৩০ দ্র° M. Hiriyanna : *Experience : First and Final.*

৩১ M. Hiriyanna : *Art Experience* শীর্ষক প্রবন্ধ-সংকলনের অন্তর্গত 'Art Experience—I' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য : পৃ. ২৮ (Mysore 1954)।

৩২ ধ্বন্যালোক ৩.৪৭ (বৃত্তি), পৃ. ৫১৭।

অধম— সর্ববিধ অধিকারীই যাহাতে সেই 'কাব্যামৃতরসাস্বাদ', তাহা যতই ক্ষণস্থায়ী হউক না কেন, লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যেই কবি কাব্য নির্মাণ করিবেন, ইহা তো আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণই সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। কেননা—"সর্বানুগ্রাহকং হি শাস্ত্রম্"। নতুবা কয়জন কবি আছেন যিনি রবীন্দ্রনাথের মত বলিতে পারেন—

"আমার মুক্তি গানের সুরে
এই আকাশে
আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায়
ঘাসে ঘাসে।
দেহ মনের সুদূর পারে
হারিয়ে ফেলি আপনারে
দিগ্ বিদিকে ছড়ায় আমায়
কোন্ বাতাসে।"

কয়জন সহৃদয়ই বা সেই কবিবাণীকে আপন জীবনচর্যার মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া কবির ন্যায়ই মুক্তির সাধনা করিতে পারেন?

বস্তুতঃ কালক্রমে যেমন কবিত্বের অবক্ষয় হইয়াছে, সেইরূপ সহৃদয়তারও হ্রাস ঘটিয়াছে। তাই বর্তমান বিশ্বের সাহিত্যসৃষ্টিতে যেমন ভারতীয় কাব্যমীমাংসকগণের আদর্শসম্মত কবিহৃদয়ের রসবীজ অঙ্কুরিত হইতেছে না, সেইরূপ যে-কয়টি স্বল্পসংখ্যক উৎকৃষ্ট কবিকর্ম জন্মলাভ করিতেছে, তাহাদের অন্তর্নিহিত শাশ্বত বাণী গ্রহণ ও ধারণ করিবার মত সহৃদয় সামাজিককুলও আজ লুপ্তপ্রায়। এই নিদারুণ অমান্ধকারের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যবিচারকগণের নির্দেশ আমাদের পক্ষে দীপবর্তিকাস্বরূপ। কেননা, তাঁহারাই অবিচল কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে কবি ও সহৃদয়— তাঁহারা যে স্তরেরই হউন না কেন— সমানভাবেই 'অমৃত'পথযাত্রী। কেননা, তাঁহাদের চিত্তেই, তাহা যতই কলুষ ও মালিন্যগ্রস্ত হউক না কেন, সেই সারস্বততত্ত্বের নিঃসংশয় স্ফুরণ ঘটে, যাহা ব্রহ্মতত্ত্বেরই সবিধবর্তী।[৩৪] এই ঘোষণা হয়তো অনেকের নিকট দম্ভ ও আত্মাভিমানের প্রকাশ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা ক্ষমার্হ এবং শ্রদ্ধেয়। যেহেতু —"The evil wrought by this mystical pride, great as it often is, is like a straw to the evil wrought by a materialistic self-abandonment."[৩৫]

৩৩ তু° "যত্তু দশরূপকং তস্য যোঽর্থস্তদেব নাট্যম্।...তস্য হৃদয়সংবাদতারতম্যাপেক্ষয়া শ্রোতৃ-প্রতিপত্তৃ-স্ফুরণং স্ফুটাস্ফুটত্বেনাতিবিচিত্রম্।..."— অভিনবভারতী. ১ম ভাগ, পৃ. ২৯১।

৩৪ তু° "সরস্বত্যাস্তত্ত্বং কবিসহৃদয়াখ্যং বিজয়তে"— অভিনবগুপ্ত: লোচন-ব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণ শ্লোক।

৩৫ G. K. Chesterton: *Robert Browning,* p. 202 (Macmillan's Pocket Library Edn. 1957).

(সনেট)

রবিবারের; সাড়ে সাতটায়;
'[illegible]'; [illegible];
'উদার': — তোমার সঙ্গে [illegible] প্রায়;
ইহা [illegible] কর মাত্র [illegible] মনে।
সকলেরই এ জীবন! তাও অনিশ্চিত।—
ঠিক নেই চলে যায় কোথায় কে কবে!
আমোদটা এ এক ঘোর অস্পষ্ট ভবে
সত্য করে নিতে পারে তত তার ঠিক।
কেহ পায় সে আমোদ কোন [illegible];
কেহ নৃত্যগীতবাদ্যে; কেহ [illegible]-
[illegible] 'উদার'-এর মধুর কলরবে।
আমরা পেয়েছি।— তবে করে অনুগ্রহ
আমাদের এই অতি সাধু মণ্ডলে
রবিবাবু — আপনার যোগ দিতে হবে।

ভবদীয়
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

XIII

দ্বিজেন্দ্রলালেব 'সনেট'   ববীন্দ্রনাথকে লিখিত

সনেট রবীন্দ্রনাথকে লিখিত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কল্য রবিবার রাত্রে ; সাড়ে সাতটায় ;
১ 'ব্যাঙ্কশল ষ্ট্রীটে' ; ভারতীয় 'ক্লবে' ;
'ডিনার' ;— ব্যাপার সবই পূর্ব্ববৎ প্রায় ;
ইচ্ছা গোলযোগ করা মাত্র মিলে সবে।
কদ্দিনেরই বা জীবন ! তাও অনিশ্চিত।—
ঠিক্ নেই চলে' যায় কোথায় কে কবে !
আমোদটা যে এ ঘোর অর্থশূন্য ভবে
যত করে' নিতে পারে তত তার জিত।
কেহ পায় সে আমোদ দোলদুর্গোৎসবে ;
কেহ নৃত্যগীতবাদ্যে ; কেহ বন্ধুসহ
নম্র 'ডিনারে'র মৃদুতর কলরবে।
আমরা শেষোক্ত।— তবে করে' অনুগ্রহ
আমাদের এই অতি সাধু মতলবে
রবিবাবু— আপনার যোগ দিতে হবে।

ভবদীয়
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা

অজিত দত্ত

কয়েক মাসের মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হবে। ১২৭০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ, ১৮৬৩ সালের ১৯ জুলাই দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে কিঞ্চিদধিক দু বৎসরের ছোটো ছিলেন। বয়ঃকনিষ্ঠ যে দুজন মাত্র সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব বিশেষ লক্ষ করা যায় না, তাঁরা দ্বিজেন্দ্রলাল এবং প্রমথ চৌধুরী। জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ অন্য কোনো সমসাময়িক সাহিত্যিকের, বিশেষত কবির, নাম মনে পড়ে না যাঁর রচনা প্রায় সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত। প্রমথ চৌধুরী একাধিক কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা হলেও তিনি কবি-উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; কারণ এই তীক্ষ্ণধী সাহিত্যিক জানতেন যে তাঁর ছন্দোবদ্ধ রচনাগুলি কবিত্ব-সমৃদ্ধ নয়, এবং পাঠকমাত্রই জানেন যে সেগুলির উপভোগ কবিত্ব-নিরপেক্ষ। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। সে হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালই তৎকালীন একমাত্র কবি যিনি রবীন্দ্রনাথের নিকটে থেকেও এবং রবীন্দ্রপ্রতিভার অনুরাগী হয়েও স্বকীয় কাব্যরচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব আত্মসাৎ করেন নি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রবিরোধী বলে সুপরিচিত হলেও তিনি যে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন এবং রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যে নাটকের আসর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বহু বৎসর সজীব থেকে রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার প্রাথমিক প্রেরণা জুগিয়েছিল, কিছুকাল দ্বিজেন্দ্রলাল সে আসরে নিয়মিত যোগদান করতেন। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্য সম্পর্ক ছিল। 'বিরহ' নামে প্রহসনটি দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং সেটি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে অভিনীতও হয়েছিল। দেবকুমার রায়চৌধুরী তাঁর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির উক্তি উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন যে, এককালে দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ—উভয়েই পরস্পরের একান্ত গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এই অবস্থায় খুবই প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল। প্রকাশ্যভাবে রবীন্দ্রকাব্য আক্রমণ করার পরেও দ্বিজেন্দ্রলাল যে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাকে শ্রদ্ধা করতেন, তার প্রমাণ দ্বিজেন্দ্রলালের বিবিধ উক্তিতে ও চিঠিপত্রে পাওয়া যায়। তবু যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার সম্বন্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন, তার কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। বস্তুতঃ মেজাজ ও মনোভঙ্গিতে বা poetic temperament-এ এই দুই সমসাময়িক কবি যেন কাব্যলোকের দুই সীমান্তবাসী রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কবিরূপে দ্বিজেন্দ্রলালের যথার্থ পরিচয় পেতে হলে তাঁর বিশিষ্ট মনোভঙ্গি ও তাঁর কবিত্বের প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে কবিত্বের অনুভূতি, এমনকি অনুভূতির প্রবলতা ছিল। যা বাংলা কাব্যসাহিত্যে সুলভ নয়। ভাবপ্রবণ অনেক কবির ক্ষেত্রে যা ঘটে, অনুভূতির তীব্র বেগে কাব্যের বাঁধুনি বা শিল্প ক্ষুণ্ণ হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে সেরূপ ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না। কেননা, প্রথমত তিনি ভাবপ্রবণ ছিলেন

না, দ্বিতীয়ত কাব্যশিল্পের সকল কলাকৌশল তাঁর সহজায়ত্ত ছিল। 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগের কিছু সংখ্যক অপরিণত রচনা ভিন্ন দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় সকল কবিতায় শব্দ ধ্বনি ছন্দ ও মিল এরূপ সুশৃঙ্খল সমন্বয়ে বক্তব্যকে পরিস্ফুট করে যে, কবিতাগুলি অতিশয় অবলীলাক্রমে লিখিত বলে ধারণা জন্মে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার এই সহজ সাবলীলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরূপ একজন কবি, যাঁর আবেগ সত্য ও আন্তরিক, প্রকাশ সহজ ও সবল, শিল্পকৌশল করায়ত্ত, তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যে মহত্তর স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন না কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে জাগে। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে। প্রথমত রবীন্দ্রকাব্যপ্রতিভার অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি অন্যান্য সমসাময়িক কবির মতো দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রতিভাকেও কিছুটা প্রচ্ছন্ন করেছে। দ্বিতীয় কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং। নাট্যকাররূপে তিনি যে বিপুল খ্যাতি ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তা তাঁর কবিখ্যাতির অন্তরায় হয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু, তৃতীয় এবং সর্বাধিক প্রবল কারণ বোধ হয় এই যে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার স্পষ্টতাই তাঁকে পাঠক মনের গভীর স্তরে প্রবেশ করে স্থায়ী হতে দেয় নি, নদীস্রোতে ভাসমান ফুলের মতো তা ক্ষণিক প্রীতি বা চমৎকারিত্ব উৎপাদন করে বিস্মৃতির দিগন্তে হারিয়ে গেছে।

২

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যগ্রন্থগুলির রচনাক্রম এইরূপ—

আর্যগাথা। প্রথম ভাগ। ১৮৮২
The Lyrics of Ind। ১৮৮৬
আর্যগাথা। দ্বিতীয় ভাগ। ১৮৯৪
আষাঢ়ে। ১৮৯৯
হাসির গান। ১৯০০
মন্দ্র। ১৯০২
আলেখ্য। ১৯০৭
ত্রিবেণী। ১৯১২

এই আটখানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে *The Lyrics of Ind* আমাদের বর্তমান আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। অপর সাতখানির মধ্যে 'আর্যগাথা' দুই ভাগ ও 'হাসির গান' -এর রচনাগুলিতে কবি সুরসংযোগ করেছিলেন। 'আষাঢ়ে' বইটি ছন্দোবন্ধে রচিত হলেও গ্রন্থকার এটিকে 'গুটিকয়েক হাসির গল্প' বলে বর্ণনা করেছেন। 'মন্দ্র' 'আলেখ্য' ও 'ত্রিবেণী'ই শুধু কবিতাপুস্তক বলে বর্ণিত হয়েছে। প্রকারভেদ সত্ত্বেও ছন্দোবন্ধে রচিত দ্বিজেন্দ্রলালের সাতখানি বইই তাঁর কাব্যপ্রতিভার পরিচয় বহন করে।

'আর্যগাথা' প্রথম ভাগ কবির উনিশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় কবি এ রচনাগুলিকে গীত বলে বর্ণনা করেছেন ; কিন্তু এগুলির রসোপভোগ সুরের উপর নির্ভরশীল নয়, কারণ, "গীতগুলি শ্রুত অপেক্ষা অধিক পঠিত হইবে" এই অনুমানে কবি এগুলির পাঠযোগ্যতার প্রতিই বেশি লক্ষ রেখেছিলেন। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের গানের প্রধান পার্থক্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ সুরকে ব্যবহার করেছিলেন ভাষাকে

অতিক্রম করে "এক অনির্বচনীয় আকুলতার আন্দোলন সঞ্চার" করে দেবার জন্য। ছন্দ সম্বন্ধেও যে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন, এ কথা তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় স্পষ্টতই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, শব্দ তার অর্থমাত্র দ্বারা যে কথা প্রকাশ করতে পারে না, ছন্দ এবং ততোধিক পরিমাণে সুর— তা অভিব্যক্ত করে। "আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে" কথা-ক'টির গূঢ়ার্থ তাই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ছন্দকে সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন নি। তাঁর গানের সুর গানের শব্দার্থকে ব্যঞ্জিত করে না। সে শুধু শব্দার্থকে কর্ণমনোহররূপে উপস্থিত করে। তার কারণ, দ্বিজেন্দ্রলাল সুর-দ্বারা বাচ্যাতিরিক্ত আবেগকে প্রকাশ করবার প্রয়াস করেন নি। তাঁর গানের বক্তব্য শব্দার্থেই পরিপূর্ণরূপে এবং স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। তা সম্পূর্ণরূপে পাঠক বা শ্রোতার মনে প্রকাশিত হবার জন্য ছন্দ বা সুরের অপেক্ষা রাখে না। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুর ও কবিতার ছন্দ যতই সুন্দর হোক, তা তাঁর কাব্যভাষার সহচর মাত্র, সে ভাষার সঙ্গে একাত্ম নয়। এই কারণে, তাঁর গানগুলির উপভোগ সুর-নিরপেক্ষ। 'আর্যগাথা'র সমালোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিই অন্যভাবে উল্লেখ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি পাঠেই সম্পূর্ণ উপভোগ্য। তাই কবিতা হিসাবেই সেগুলির আলোচনা করা যেতে পারে।

'আর্যগাথা' প্রথম ভাগের কবিতাগুলি অপরিণত বয়সের রচনা হলেও তার মধ্য থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের কবিমানসের প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি "প্রকৃতিবিষয়িণী গীতি"সমষ্টি। প্রকৃতিসৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য দেখে, কবির মনে যেসকল ভাব উদিত হয়েছিল, 'আর্যগাথা'য় সেগুলি ছন্দোবদ্ধে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতির বিবিধ রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই রূপগুলিকে কবি উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন। বর্ণনাগুলি সুলিখিত ও সুন্দর, কিন্তু তা যথাযথ। কবির চোখ দিয়ে এইসব প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করে পাঠকমন জিজ্ঞাসু হতে পারে যে এ কবিতা পড়ে— "চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা?" এ জিজ্ঞাসার উত্তর বোধ হয় এই যে, কবি তাঁর ভাবটুকু সম্পূর্ণরূপে ভাষায় প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন ; তা ভাষার চেয়ে গভীর নয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার ভাবগুলি সুন্দর, কিন্তু সে ভাবে আকুলতা নেই ; তাঁর শব্দবিন্যাস ও ছন্দঝংকার অপূর্ব, কিন্তু তা বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে না ; তাঁর সৌন্দর্য-উপভোগ ইন্দ্রিয়ে সীমাবদ্ধ— অতীন্দ্রিয়লোকে বিহার করে না বলে তা পাঠকের চক্ষুকর্ণকে তৃপ্ত করেই থেমে যায়, পাঠকমনে তার অনুরণন রেখে যায় না। অথচ, 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগের অপরিণত রচনাগুলিতেও সৌন্দর্যের অভাব নেই। এবং সে সৌন্দর্য কবির অভিজ্ঞতা-গোচর ছিল। কেননা ভূমিকায় কবি নিজেই বলেছেন যে, "প্রকৃতি-সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া" তিনি এইসব গীতি রচনা করেছিলেন। কবির অনুভূতিপ্রসূত আন্তরিক এই ভাবগুলি পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়ে তাকে আলোড়িত করতে না পারার কারণ এই যে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিদৃষ্টি প্রকৃতির শোভা যথাযথ ভাবেই নিরীক্ষণ করেছে, কিন্তু সেই শোভা অন্তরে যে ভাব উৎসারিত করেছে তা গভীরভাবে অনুধাবন করে নি। সেই হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিদৃষ্টি কিছু পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সংঘাতে হৃদয়ে যে প্রতিক্রিয়া জাগে, দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে তারও প্রকাশ আছে সত্য, কিন্তু সে অনুভূতি এরূপ গভীর স্তরের নয় যা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয় না। অপর দিকে ভাষা ও ছন্দের উপরে দ্বিজেন্দ্রলালের এরূপ প্রভুত্ব ছিল যে, মনের অগভীর স্তরে ভাসমান এই অনুভূতিগুলিকে তিনি অনায়াসে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাষান্তরিত করতে পারতেন। এ কারণে তাঁর কবিতায় কোনোরূপ অস্পষ্টতা দেখা দিত না। ঐ একই কারণে, অপরের কবিতায় যেখানে ভাব স্পষ্টরূপে ভাষায় ধরা পড়ে নি বলে

তাঁর মনে হত, তাকে তিনি দুর্বল কবিত্ব বলে মনে করতেন। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের কবিতার অর্থহীনতা বা অস্পষ্টতা সম্বন্ধে তাঁর অভিযোগ।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বিহারীলালের কাব্যে প্রায়ই মনের আবেগ প্রকাশে কবির অসামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিহারীলালের কাব্যধর্ম ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর ভাবাকুলতা ছিল পার্বত্য নদীর মতো বেগবান, অপর পক্ষে তাঁর ভাষা বা বাক্‌নৈপুণ্য সে অনুপাতে দুর্বল ছিল। ঠিক বিপরীত-ধর্মী কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাব ছিল শান্ত, সংযত, অপ্রগল্‌ভ; এবং ভাষা ছিল তদনুপাতে অধিক শক্তিশালী। সে কারণে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা সর্বদাই তাঁর বক্তব্যকে নিপুণভাবে সুপরিস্ফুট করেছে, কোথাও ব্যঞ্জনার অস্পষ্টতার অবকাশ রাখে নি। আর, যে কাব্য ব্যঞ্জনা-বর্জিত, সে কাব্য মনোহররূপে উপস্থিত হলেও যে তা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না, এ কথা ভারতীয় আলংকারিকেরা অনেকদিন আগেই বলে গেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের ভাবসকল লক্ষ করলে মনে হয় যে, তাঁর মন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অপেক্ষা সামাজিক বা সম্প্রদায়গত অভিজ্ঞতায় বেশি আন্দোলিত হত। অর্থাৎ প্রেমের গভীরতায় নিমগ্ন হওয়ার চেয়ে স্বাদেশিকতার প্রবলতায় বা সামাজিক হীনতার গ্লানিতে বেশি আলোড়িত হবার প্রবণতা তাঁর মধ্যে লক্ষ করা যায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, অন্তর্মুখীনতা অপেক্ষা বহির্মুখীনতা, ভাবালুতা অপেক্ষা বাস্তববোধ দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে বেশি প্রকট। এ জাতীয় কবিদৃষ্টি নাট্যরচনা ও আখ্যায়িকা কাব্য রচনার পক্ষেই অধিক উপযোগী, এ কথা বলা বাহুল্য। এই কারণেই, মনে হয়, 'আর্যগাথা'র প্রথম ভাগ বাদ দিলে তাঁর অধিকাংশ কবিতা কিছু পরিমাণে গল্প বা কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। 'আষাঢ়ে' 'মন্দ্র' 'হাসির গান' ও 'আলেখ্য' বইগুলির অধিকাংশ কবিতায় কিছু কিছু গল্প আছে। 'আষাঢ়ে' বইটিকে তো দ্বিজেন্দ্রলাল সরাসরি 'গুটিকয়েক হাসির গল্প' বলেই বর্ণনা করেছিলেন। ঐ একই কারণে তিনি নাট্যরচনায় যে সাফল্য লাভ করেছেন, গীতিকাব্যে সে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তাঁর ভাবগুলি সত্য ও আন্তরিক হয়েও যে তা অগভীর বলে মনে হয়, এবং তিনি যে গভীর রসের চেয়ে সহজে লঘুরসগুলিকে বেশি সার্থক করে তুলতে পারতেন, তারও কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের এই মনোবৈশিষ্ট্যেই নিহিত বলে মনে করি। হাস্যরসের কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ তুলনাহীন। সুকুমার রায়ও হাস্যরস-সৃষ্টিতে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছেন সত্য, কিন্তু সে হাস্যরস সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। তুলনামূলক আলোচনা এ প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু এই কথাটুকু উল্লেখ করা যায় যে, সুকুমার রায়ের রচনার প্রধান অবলম্বন কল্পনা, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কল্পনাশক্তি সীমাবদ্ধ ছিল ও বাস্তবদৃষ্টি প্রখর ছিল বলে তাঁর সৃষ্ট কৌতুক বাস্তব ঘটনা ও পরিবেশ অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার স্পষ্টতারও অন্যতম কারণ এই বহির্মুখী কবিদৃষ্টি এবং সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতি প্রখর সচেতন লক্ষ। সেজন্য, তৎকালে জনমানসে প্রবলরূপে অনুভূত স্বদেশপ্রেম দ্বিজেন্দ্রকাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে আছে। এবং সমসাময়িক বাঙালিজীবনের সকল সমস্যা ও গ্লানি তাঁর কাব্যে বলিষ্ঠরূপে প্রকাশ পেয়েছে। কি বাঙালির চাকুরিজীবন, কি ধর্ম ও সমাজ, কি পরিবার ও

পারিবারিক সমস্যা, সবই দ্বিজেন্দ্রকাব্যে প্রেরণা জুগিয়েছে। সেজন্য দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক কবিতাই সাময়িক বা তারিখযুক্ত বলে গণনা করা যায়। এদিক থেকে মনোভঙ্গিতে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কিছুটা সাধর্ম্য ছিল, যদিও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার শক্তি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে অনুপস্থিত।

অন্তর্মুখী দৃষ্টি অপেক্ষা বহির্মুখী দৃষ্টির আধিক্যহেতুই, মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃতি বা প্রেমবিষয়ক কবিতাগুলি মনের গভীরতল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। বস্তুত, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার স্পষ্টতার দুটি প্রধান কারণ, কবির অন্তর্মুখী দৃষ্টি বা ভাবতন্ময়তার অভাব এবং তাঁর ভাষা-নিপুণতা। কাব্যভাষায় দ্বিজেন্দ্রলাল যে শক্তি ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলা কাব্যসাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে তুলনাহীন। পুনরুক্তি করে বলছি যে, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাব অগভীর ও সে তুলনায় ভাষা অতি সহজায়ত্ত ছিল বলে তাঁর ভাব কখনো ভাষাকে অতিক্রম করে যেতে পারে নি, বরং ভাষাই উপভোগের প্রধান উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভাষা ব্যবহারে দ্বিজেন্দ্রলাল যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, বাংলা পদ্যসাহিত্যে তা অদ্বিতীয়। এ শক্তির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় 'আষাঢ়ে' বইটিতে। এর আগে 'আর্যগাথা'য় দ্বিজেন্দ্রলাল কবিত্বময় রচনার প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু সে প্রয়াস খুব সার্থকতা লাভ করেছিল বলা যায় না। তার কারণ, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃত শক্তি নিহিত ছিল গদ্যধর্মী ভাষার ব্যবহারে। কবিতার ভাষা যে সর্বদাই কবিত্বময় হবে এমন কোনো কথা নেই। কাব্যভাষা যেমন বর্ণাঢ্য সুরেলা অলংকৃত বা অন্তরঙ্গ হতে পারে, তেমনি গদ্যধর্মী হতেও বাধা নেই; গদ্যের ভাষাতেও অনুরূপ বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব। দ্বিজেন্দ্রলাল পদ্যরচনায় যে ভাষারীতি ব্যবহার করেছিলেন তা এরূপ প্রবলরূপে গদ্যধর্মী যে কবি স্বয়ং তাঁর 'আষাঢ়ে'র কবিতাগুলিকে সমিল গদ্য নামে অভিহিত করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পদ্যরচনার প্রধান শক্তিই ছিল তাঁর অভিনব ভাষারীতিতে। এ ভাষা যথার্থরূপে গদ্যভাষা নয়; তার প্রমাণ, দ্বিজেন্দ্রলাল গদ্যরচনারীতিতে বিশেষ কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। বস্তুত, দ্বিজেন্দ্রলাল গদ্যলেখক ছিলেন না। কিন্তু গদ্যাত্মক এক পদ্যরীতি তিনি বাংলায় সফলরূপে প্রবর্তন করেছিলেন যার বিচিত্র সম্ভাবনা এখনো পর্যন্ত সন্ধান করা হয় নি। সাম্প্রতিক কালে কাব্যভাষাকে মুখের ভাষার অনুরূপ করে গড়ে তোলার যে প্রবণতা আমরা বাংলা কবিতায় দেখতে পাই, সে ভাষার রীতিকে কিন্তু যথার্থরূপে গদ্যধর্মী বলা চলে না। তা বহুল পরিমাণে সুর বর্ণ ও অলংকারে সমৃদ্ধ। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার ভাষা ঠিক সে অর্থে গদ্যধর্মী নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের বাক্‌বিন্যাসে ও শব্দনির্বাচনেই এ রীতির চমৎকারিত্ব। এবং মনে হয় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের একটি শ্রেষ্ঠ দান এক অভিনব বাক্‌রীতি। এ রীতি সফলভাবে অন্য কোনো পদ্যরচয়িতা ব্যবহার করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। প্রমথ চৌধুরীর পদ্যের ভাষাকে গদ্যধর্মী বলা হয় বটে, কিন্তু তার একমাত্র কারণ তাতে কবিত্বের অভাব। কিন্তু গদ্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য শব্দের ব্যবহারে এবং বিন্যাসে (syntax) প্রকাশিত হয়। প্রমথ চৌধুরীর পদ্যে কবিত্ব বিশেষ ছিল না সত্য, কিন্তু তার ভাষা গদ্যবৎ নয়। অপর পক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় কবিত্ব ছিল, কিন্তু তাঁর ভাষা ছিল গদ্যের ন্যায় যথেচ্ছগামী। ভাষা ছন্দ ও মিলের উপর যুগপৎ কি অসাধারণ দখল থাকলে গদ্যাত্মক পদ্যরীতিকে সফলভাবে ছন্দোবদ্ধে

ব্যবহার করা যায়, এমনকি ছন্দ ও মিলের দ্বারা চমৎকারিত্ব উৎপাদন করা যায়, তা ভেবে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। দু একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে।

তার যাওয়ার দু হপ্তা না হতে হতে ভাই,
বাবার ভাঙল হাত, মোদের চুরি গেল গাই ;
মায়ের হল ব্যামো, আর হেম গ্যাছে দূরে,
এমন সময় নবীন এল—

—আর্যগাথা

সে দিনটা তো গেল, পরের দিনটা এল,
তখন খুড়ীর গতর যেন একটু জোরও পেল ;
বাহির কামরা থেকে শ্রীহরিকে ডেকে,
ক্ষীণস্বরে ওষ্ঠ্যবর্ণে বল্লেন শেষে খুড়ী ;
শ্রীহরিরে পাগলামী রাখ্,—দিয়ে মন
আমার পরামর্শ টা—আর আমার কথা শোন্ ;

—আষাঢ়ে

আমরা সব "রাজভক্ত রাজভক্ত" ব'লে চেঁচাই উচ্চরবে
কারণ সেটার যতই অভাব ততই সেটা বলতে হবে।

—হাসির গান

'বিশ্বাবসু' কিংবা 'এটনার' মত যদি জাগো, যদি জ্বালোই
জাগরণে প্রলয়াগ্নি, তবে যত না জাগো ততই ভালোই।

—মন্দ্র

কল্য ব'হে গেছে ঝঞ্ঝা এ শাল্মলীর উপর দিয়া,
উন্মূলিত সে শাল্মলী ভূমিতলে চুমি ;
কল্য যাহা শত হর্ম্য-বিমণ্ডিত নগর ছিল ;
বিরাট ভূমিকম্পে আজি তাহা মরুভূমি ;

—আলেখ্য

এ ভাষারীতি গদ্য ভাষারীতির অতি নিকট, এ কথা সহজেই বোঝা যায়। অথচ এ রীতি নিখুঁত পদ্যরচনায় সার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

পদ্যভাষা ও গদ্যভাষার আরও একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, পদ্যভাষার ধর্ম লালিত্য মাধুর্য ও ব্যঞ্জনা। গদ্যের ধর্ম ঋজুতা ও বলিষ্ঠতা। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য পাঠকমাত্রই লক্ষ করে থাকবেন যে তাঁর পদ্যরচনায় প্রথমোক্ত গুণগুলির চেয়ে শেষোক্ত গুণগুলিই প্রধান হয়ে উঠেছে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় যে পৌরুষ লক্ষ্য করেছিলেন, তা এই গদ্যভঙ্গির ঋজুতার পৌরুষ। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার মধ্যে ঢাকাঢাকি চাপাচাপি ইশারা ইঙ্গিতের অবকাশ নেই, তা তির্যক, সরল ও জোরালো। কারণ,

তাঁর চিন্তা কবিত্বে নিবদ্ধ হলেও, তার প্রকাশ ঘটত গদ্যরীতিতে। এই অভিনব পদ্যরচনারীতিকে কবি যে অপূর্ব কৌশলে ব্যবহার করেছেন, তা অন্য কারুর দ্বারা অদ্যাবধি সম্ভব হয় নি।

বাংলা সাহিত্যের রীতিপ্রবর্তক ও রীতিশিল্পীদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী। বোধ হয় গদ্যের পরিবর্তে পদ্যের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নূতন বাক্‌রীতি প্রবর্তন করার ফলেই এ বিষয়ে তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব যথার্থরূপে অভিনন্দিত হয় নি। বাংলা সাহিত্যের গদ্য ও পদ্যের প্রধান প্রধান ভাষাশিল্পীদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালকে গণনা করা এই কারণেই সংগত যে, দ্বিজেন্দ্রলাল যে পদ্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন তা শক্তিতে চমৎকারিত্বে ও অভিনবত্বে পূর্ব বা পর -বর্তী সকল পদ্যরীতি থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'আত্মকথা'য় বলেছেন যে, তিনি বাক্‌চাতুর্য শিখেছেন কৃষ্ণনগর থেকে, এবং কৃষ্ণনগর যে বাক্‌পটুতায় প্রধান ব্যক্তিদের জন্ম দিয়েছে, এ উক্তির উদাহরণরূপে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের নাম করেছিলেন। ভেবে দেখতে গেলে বাক্‌-নিপুণতায় দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমথ চৌধুরী অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। বরং প্রমথ চৌধুরীর অপেক্ষা দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষারীতিতে বৈচিত্র্য বেশি। যদিও প্রধানত পদ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে, তবু এ ভাষারীতি কখনো একঘেয়ে হয়ে পড়ে নি, এবং তা কেবলমাত্র তীক্ষ্ণ যুক্তি ও উইট্‌-প্রসূত হাস্যরসেই পরিসমাপ্ত হয় নি। সে হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল সার্থক কৃষ্ণনাগরিক ছিলেন সন্দেহ নেই।

হাস্যরসকে আমরা লঘুরস বলে থাকি। কারণ, নবরসের অন্যতম হলেও করুণ ও মধুর রসের মতো এ রস অন্তরের গভীরতলে প্রবেশ করে না। কিন্তু সেজন্য উচ্চস্তরের কৌতুকহাস্য সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত সহজ বলে মনে করা চলে না। জগৎ ও জীবনের অসংগতিগুলি সকল লেখকের চোখে পড়ে না, সেগুলিকে অনুধাবন করবার জন্য এক বিশেষ ধরণের সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রয়োজন হয়। এ জন্য খুব বড়ো লেখকও অনেক সময় হাস্যরসসৃষ্টিতে খুব বেশি কৃতিত্ব দেখাতে পারেন না।

হাস্যরসকে সাহিত্যে সার্থক করে তোলার জন্য প্রয়োজন প্রবল সমাজচেতনা, সূক্ষ্ম বাস্তবদৃষ্টি এবং নিপুণ ভাষাবিন্যাস। এইসকল গুণই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাই বাংলা হাস্যরসাত্মক সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল অদ্বিতীয় হয়ে আছেন। বাংলা কাব্যসাহিত্যে অন্যান্য যেসকল হাস্যরসিক লেখক আছেন তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথের রচনা বিদ্রূপাত্মক, সুকুমার রায়ের রচনা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী— এ কথা আগে উল্লেখ করেছি। প্রমথ চৌধুরীর রচনা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উইট্‌-আশ্রিত। রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি, বোধ হয় লঘুতার স্তরে মনকে সীমাবদ্ধ রাখা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু সমাজ পরিবার ও ব্যক্তি -জীবনের সকল অসংগতি দ্বিজেন্দ্রলালের চোখে সহজেই ধরা পড়ত, এবং অসাধারণ বাক্‌বৈদগ্ধ্যের ফলে তিনি তা নিখুঁত ভাবে তুলে ধরতে পারতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসাত্মক রচনার আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কি বিদ্রূপে, কি বুদ্ধিগ্রাহ্য বাক্‌-চাতুর্যজনিত হাসি বা উইট্‌ -সৃষ্টিতে, কি নিছক কৌতুকে তিনি সমান অবলীলায় বিচরণ করতেন।

'আষাঢ়ে'র কবিতাগুলির বিষয় প্রধানত সামাজিক ও পারিবারিক। জাতীয়-জীবনের বেদনা ও গ্লানি এগুলির প্রেরণা জুগিয়েছে। সে কারণে এ রচনাগুলি তীব্র বিদ্রূপাত্মক। এগুলি Ingoldsby Legends

-এর অনুকরণে গল্পচ্ছলে লিখিত, এবং এখানে হাস্যরসের সঙ্গে সামাজিক গ্লানিবোধ প্রায় সমপরিমাণে পরিবেশিত হয়েছে বলে, কোথাও কোথাও কিছুটা তিক্ততা উৎপন্ন না হয়েছে এমন নয়। কাজেই হাস্যরসাত্মক কাব্য হিসাবে এটিকে পুরোপুরি সার্থক বলা চলে না। কিন্তু তথাপি এই বইখানিতেই হাস্যরসিক কবিরূপে দ্বিজেন্দ্রলালের অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম বাস্তবদৃষ্টি ও প্রবল সমাজচেতনার সঙ্গে এখানে ভাষা ছন্দ ও মিলের উপর দ্বিজেন্দ্রলালের অনন্যসাধারণ প্রভুত্বের পরিচয়ও এ বইটিতেই পাওয়া যায়। 'আষাঢ়ে'র সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আলোচ্য ছন্দের প্রধান বাধা· ·তাহার সর্বত্র এক নিয়ম বজায় থাকে নাই, এইজন্য পড়িতে পড়িতে আবশ্যক মতো কোথাও টানিয়া কোথাও ঠাসিয়া কমিবেশি করিয়া চলিতে হয়।" মনে রাখতে হবে এই যে ছন্দের নিয়মভঙ্গ, এটা কবির দুর্বলতার ফলে ঘটে নি, এটি কবির ইচ্ছাকৃত। গদ্যাত্মক পদ্যরচনারীতির যে পরীক্ষা কবি এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় করেছিলেন, ছন্দ ও ভাষার উপর পরিপূর্ণ প্রভুত্ব এবং প্রবল আত্মপ্রত্যয় না থাকলে কোনো কবির পক্ষে সকল নিয়মের বন্ধন ছিন্ন করে সে পরীক্ষায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ছিল।

'হাসির গান'-এর কথা বাদ দিলেও দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে হাস্যরসের অভাব নেই। 'মন্দ্র' বইটির সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, কবি এখানে নবরসকে অকুতোভয়ে এক মহলেই স্থান দিয়েছেন। 'আলেখ্য' বইটি সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য করা চলে। কিন্তু সর্বত্রই দেখা যায় হাস্যরসকে কবি যত সহজ নিপুণতায় সার্থক করে তুলতে পেরেছেন, অন্য রসের ক্ষেত্রে তিনি ঠিক সে পরিমাণ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তার কারণ, দীনবন্ধু মিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলা যায় যে "যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে [দ্বিজেন্দ্রলালের] তেমন অধিকার ছিল না।· · কিন্তু যাহা স্থুল, অসংগত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রেরও অধীন।" হাস্যরসে দ্বিজেন্দ্রলালের অতুলনীয় কৃতিত্বের পরিচয়, বলা বাহুল্য, তাঁর 'হাসির গান'এ। 'হাসির গান'এর কিছুসংখ্যক কবিতা অবশ্য তীব্র বিদ্রূপাত্মক। তাই যথেষ্ট হাসি থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে শ্রেষ্ঠ কৌতুক-রচনা বলে গণ্য করা যায় না। কিন্তু কতকগুলি গান বা কবিতায় আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন গতানুগতিক জীবনের মধ্য থেকেও কবি এমন প্রবল হাসির উপকরণ খুঁজে বার করেছেন, এবং তার থেকে এমন তুমুল কৌতুক উৎপন্ন করেছেন যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে কুত্রাপি খুঁজে পাওয়া যায় না। "প্রথম যখন বিয়ে হল ভাবলাম বাহা বাহা রে।" কিংবা "বুড়োবুড়ী দু'জনাতে মনের মিলে সুখে থাকত।" অথবা "তার রং বড্ডই ফর্সা, তারে পাব হয় না ভরসা, তার জন্য যে কচ্ছে রে মোর প্রাণ আনচান্।" এগুলি সংসারের অতি সাধারণ ঘটনা ও গতানুগতিক মনোভাব। কবি এর মধ্য থেকে অদ্ভুত কৌশলে শুধু মজাটুকু তুলে ধরেছেন। এইরূপ সূক্ষ্ম কৌতুকবোধের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে মিলিত হয়েছিল ভাষা ছন্দ ও মিলের উপর অতুলনীয় প্রভুত্ব। এই উভয়ের সংমিশ্রণে উচ্ছ্বসিত হাস্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এককালে দ্বিজু রায়ের হাসির গান লোকের মুখে মুখে থাকত। অধুনা কেন যে এগুলির জনপ্রিয়তা কমে গেছে তার কোনো সংগত কারণ পাওয়া যায় না। কেননা, এর চেয়ে ভালো হাসির গান যে অদ্যাবধি রচিত হয় নি, এ কথা নিঃসংশয়েই বলা যায়।

নাটকের নাটকীয়তা : দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রসঙ্গে

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

কাব্যসৃষ্টির প্রথম যুগে কাব্য গান করে শোনানো হত, অর্থাৎ কাব্যসুধা শ্রোতার কর্ণে বর্ষিত হত। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে কাব্য যখন কেবলমাত্র শ্রবণের জিনিস না হয়ে পঠনের জিনিস হল তখন খুব স্বাভাবিক কারণেই কাব্যের স্বভাব গেল বদলে। নাটকের বেলায়ও তাই ঘটেছে। নাটকের আদি যুগে তাকে সর্বাগ্রে লোকসমক্ষে হাজির করতে হত। লোকে তাকে চোখে দেখত, কানে শুনত। কাব্যের মতো নাটকও পরবর্তী কালে কেবলমাত্র শ্রবণ এবং দর্শনের বস্তু না হয়ে পঠনের সামগ্রী হয়েছে। ফলে তারও স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে। এটি হতে বাধ্য, কারণ শিল্পবস্তু যে ভাবে মানুষের গোচরীভূত হবে তার উপরে তার প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করবে। শিল্প ছেড়ে দিয়ে প্রথমে খুব সহজ একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আগে চিকিৎসকরা স্টেথেস্‌কোপের সাহায্যে কানে শুনে রোগনির্ণয় করতেন, এখন এক্স-রে প্লেটের সাহায্যে চোখে দেখে রোগনির্ণয় করেন। ফলে চিকিৎসাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। শিল্পবস্তুর রসগ্রহণে যখন যে ইন্দ্রিয়—দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদি—প্রাধান্য লাভ করছে সেই অনুযায়ী শিল্পের ফর্ম এবং টেকনিকের পরিবর্তন হচ্ছে। ইদানিং বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি প্রখরতর হয়েছে। মানুষ দূরের জিনিসকে নিকটতর করে দেখছে, পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের শব্দ ঘরে বসে শুনছে। নাটক যা এককালে একমাত্র রঙ্গমঞ্চের জন্যই রচিত হত—এখন অনেকে তা আদৌ চোখে দেখছে না, রেডিয়োতে শুনছে কিম্বা গ্রামোফোন রেকর্ডে। এসমস্তের প্রভাব পরোক্ষভাবে শিল্পসাহিত্যের উপরে এসে পড়বেই। অনেকেই লক্ষ করে থাকবেন যে সাম্প্রতিক কালের বেশির ভাগ নাটক অভিনয়-নিরপেক্ষ ভাবে লেখা। ধরেই নেওয়া হয়েছে যে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত না করে ঘরে বসে পড়েও এর রসগ্রহণ করা যাবে। নিশ্চয় যাবে; কিন্তু যার যেখানে স্থান সেখানে সে এক, অন্যত্র আর। গ্রীনরুমের জিনিসকে ড্রয়িংরুমে আনার ফলে ওর স্বভাবের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। দর্শক নেই বলে সাজসজ্জার জৌলস নেই, চেহারা হয়েছে আটপৌরে। শ্রোতা নেই বলে এখন আর চেঁচিয়ে কথা বলে না। বসনে এবং ভাষণে অত্যন্ত সংযত। এককথায় আধুনিক নাটক নিরাভরণ এবং মৃদুভাষী। অর্থাৎ কিনা আধুনিক নাটক যথেষ্ট পরিমাণে নাটকীয় নয়।

এসব কথা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গে এইজন্য বলছি যে তিনি তাঁর নাটক মুখ্যতঃ রঙ্গমঞ্চের জন্যেই লিখেছিলেন। দর্শক এবং শ্রোতার জন্যে লিখেছেন, পাঠকের জন্যে নয়। এ কথা যে সত্য তার অন্যতম প্রমাণ—তাঁর যে দু-একটি নাটক তাঁর জীবদ্দশায় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নি, দেখা যাচ্ছে, সে নাটক তাঁর জীবিতকালে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় নি। একান্তভাবে রঙ্গমঞ্চের জন্য অভিপ্রেত বলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে নাটকীয় ভঙ্গি অতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকট। এই কারণে কোনো কোনো সমালোচক তাঁর নাটক সম্পর্কে অতি-নাটকীয়তার অভিযোগ এনেছেন। নাট্যমঞ্চের সঙ্গে যে নাটকের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সে কথা ভুলে গেলে নাটক এবং নাট্যকার উভয়ের প্রতি অবিচার হবার আশঙ্কা থাকে। এলিজাবেথীয়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৮৬৩ - ১৯১৩

যুগের সব নাট্যকার সম্পর্কেই আতিশয্যের অভিযোগ আনা সহজ, কিন্তু ভুললে চলবে না যে সে যুগে নাটক দেখারই রীতি ছিল, পড়ার রীতি ছিল না।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে নাটককে সর্বাগ্রে নাটকীয় হতে হবে। এর কারণ অতি সুস্পষ্ট— যেখানে চোখে দেখে এবং কানে শুনে কোনো জিনিসকে হৃদয়ঙ্গম করতে হয় সেখানে খানিকটা অঙ্গভঙ্গি দৃষ্টিগোচর এবং বাক্যভঙ্গি কর্ণগোচর হওয়া প্রয়োজন। নাটকের ভাষাকে সে অনুযায়ী খানিকটা অভিনয়-অনুসারী হতে হয়। এই ভাষা এবং ভঙ্গিকেই আজকাল আমরা নাটকীয় বা theatrical বলে অপবাদ দিচ্ছি।

'নাটকীয়' কথাটিকে আজকাল এমন ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যেন যা-কিছু অসম্ভব অস্বাভাবিক এবং অসংগত তাই নাটকীয়। নাটককে সর্বদা স্বভাব-সংগতি রক্ষা করে চলতে হবে এমন মাথার দিব্যি কেউ তাকে দেয় নি। প্রথমেই ধরুন, নাটকের জন্মকাল থেকে বেশ কয়েক শতাব্দী একাদিক্রমে কাব্য ছিল নাটকের বাহন। অথচ এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, মানুষ কথাবার্তা কোনো কালেই কবিতায় বলে নি, আজও বলে না। অথচ নাটকে ছন্দোবদ্ধ কথাবার্তা কখনোই অস্বাভাবিক বলে মনে হয় নি। শেক্সপীয়ার-নাটকের কাব্যগুণ তাঁর নাট্যগুণের প্রধান সহায়ক। এটা খুব যদি একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হত তা হলে এই বিংশ শতাব্দীতে verse-drama পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা হত না। আমার বক্তব্য হল, নাটকের পাঠক— বিশেষ করে দর্শক— যদি তাঁর সম্ভাব্যতার ধারণাটিকে একটু ঢিলে না করে নেন তা হলে নাটকের রস পুরোপুরি গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। কোলরিজ তাঁর কাব্যবিচারে যে suspension of disbelief এর কথা বলেছেন নাট্যসাহিত্য সম্পর্কেও সেটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। গ্রীক বীর সেলুকস, মোগল সম্রাট শাজাহান কিম্বা কোনো রাজপুত রমণী যখন বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় কথা বলতে থাকেন তখনই বলতে হবে যে নাট্যকার সম্ভাব্যতার সীমাকে লঙ্ঘন করে গিয়েছেন। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি হয়েছে? শেক্সপীয়রের রোম্যান হিরোরা সকলেই এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজি ভাষায় কথা বলেছেন। তাতে সে নাটকের রসসম্ভোগে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হয়েছে বলে কেউ বলবে না। ভাষার কথা ছেড়ে দিয়ে— প্লট বা কাহিনীবন্ধনের ব্যাপারেও কখনো কখনো সম্ভাব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া খুব বিচিত্র নয়। বাস্তবে এবং সম্ভাব্যে খানিকটা ব্যবধান অবশ্যম্ভাবী। এই ব্যবধানকেই অতি-নাটকীয়তা আখ্যা দিয়ে আমরা জাতে ঠেলবার উপক্রম করেছি।

সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে সাময়িক ভ্রান্তি উৎপাদনই নাট্যকারের লক্ষ্য। দক্ষ অভিনেতাও নাট্যকারের এই উদ্দেশ্যটিকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেন। ভাষাবিজ্ঞানীরা জানেন, ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি hypocrite গ্রীক ভাষায় তাকে বলে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা অর্থাৎ hypocrisy হল অভিনেতার (অংশতঃ নাট্যকারেরও) প্রধান গুণ। আধুনিক নাট্যসমালোচনায় ঐ hypocrisy কথাটিকেই একটু মোলায়েম করে বলা হয়েছে illusionএর সৃষ্টি। অবশ্য এই illusion সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। একদল মনে করেন অভিনয়-দর্শনকালে দর্শকরা সাময়িকভাবে বেমালুম ভুলে যাবেন যে সমস্ত ব্যাপারটাই কাল্পনিক। অলীককে তাঁরা বাস্তবের সত্য বলে গ্রহণ করবেন। অপর পক্ষে ডক্টর জন্‌সন্ তাঁর শেক্সপীয়ার-ভাষ্যের মুখবন্ধে বলেছেন, দর্শকরা নিছক আনন্দ উপভোগের জন্যেই থিয়েটারে আসেন, তাঁরা মুহূর্তের জন্যেও ভোলেন না যে সমস্ত ব্যাপারটাই কল্পনার সৃষ্টি, বাস্তবের সঙ্গে এর সম্পর্ক শিথিল। নাটকের গুণাগুণ

বিবেচিত হবে 'according to its adherence to logical probability and general human nature'। কোলরিজ এই দুই বিরুদ্ধ মতের মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁর মতে দর্শক পুরোপুরি মোহগ্রস্ত নয় আবার পুরোপুরি মোহমুক্তও নয় (neither deceived nor wholly undeceived)। তিনি দর্শকের এই মনের অবস্থাকেই dramatic illusion আখ্যা দিয়েছেন। পূর্বোল্লিখিত suspension of disbelief এবং অভিনেতার দক্ষতা— এই দুইয়ে মিলে dramatic illusion-এর সৃষ্টি হয়। এই ভ্রান্তি উৎপাদনের জন্যে নাট্যকার এবং অভিনেতাকে যেসব চাতুর্যের (hypocrisyও বলতে পারা যায়) সাহায্য নিতে হবে তারই উপরে নির্ভর করবে নাটকের নাটকীয়তা।

অন্যান্য সব শিল্পের ন্যায় নাটকও বাস্তব বা রিয়ালিটির অনুকরণ কিন্তু মনে রাখতে হবে যে অনুকৃতি (imitation) এবং প্রতিকৃতি (copy) এক জিনিস নয়। অনুকরণ কথাটির মধ্যেই এই ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে যে বাস্তব এবং তার অনুকৃতির মধ্যে খানিকটা ব্যবধান থাকতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, এই ব্যবধানটুকুই এর বৈশিষ্ট্য এবং রসসৃষ্টির প্রধান সহায়ক। বলতে গেলে এটি শিল্পের অঙ্গ। খ্যাতনামা ইংরেজ সমালোচকের মতে— 'A certain quantum of difference is essential to imitation, and an indispensable condition and cause of the pleasure we derive from it'। শিল্প মাত্রই বাস্তবকে অনুসরণ করে, কিন্তু অনুসরণ করতে গিয়ে তাকে অতিক্রমও করে। বাস্তবকে ছাড়িয়ে যেটুকু, তার মধ্যেই রস। নাটকের মধ্যে ঐ অত্যাবশ্যক ব্যবধানটুকুর নামই নাটকীয়তা। অবশ্য আমাদের অতি-বাস্তব প্রাত্যহিক জীবন নাটকীয়তা-বর্জিত এমন কথা কখনোই বলব না। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম দ্বন্দ্ব সন্তানবাৎসল্য, পিতা পুত্রের কলহ, ভ্রাতৃবিরোধ, আত্মীয় পরিজনের স্নেহ প্রেম ঈর্ষা বিদ্বেষ— এ সমস্তই নাটকীয় কিন্তু অতি-পরিচয়ে ম্লান। রঙ্গমঞ্চে এর পুনরাবৃত্তি দেখে আমারা তৃপ্তি পাই না যদি না এর মধ্যে আকস্মিকের বা অপ্রত্যাশিতের রোমাঞ্চ খানিকটা মিশ্রিত থাকে। যেটুকু আমাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার এবং সদাপরিচিত অভিজ্ঞতার বাইরে সেটুকুই যথার্থ নাটকীয়।

হাল আমলের নাটক (বিশেষ করে পশ্চিম দেশীয়) অতিমাত্রায় স্বাভাবিক হতে গিয়ে নিজের স্বভাবকেই বিসর্জন দিয়েছে। এসব নাটক চতুষ্পার্শ্বস্থ জীবনের এমন হুবহু প্রতিচ্ছবি যে তাকে নাটক বলে চেনাই দুষ্কর। নাট্যকাররা গর্ব করে বলে থাকেন যে এর প্রত্যেকটি একটি slice of real life, অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের একটি জলজ্যান্ত টুকরো যেন নাট্যমঞ্চে ধরে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি বলব পরিপূর্ণ রসাস্বাদনের জন্য কেবলমাত্র slice of life-ই যথেষ্ট নয়, এর সঙ্গে একটু spice of life -এর মিশ্রণ প্রয়োজন। একটু মশলা না মেশালে আস্বাদটা ঠিক আসে না। ঐ মশলাটুকুই হল আসল শিল্পরস, নাটকের বেলায় একেই বলব নাটকত্ব। আগেই বলেছি, নাটকীয়তাই নাটকের সর্বপ্রধান গুণ। নাটক যদি যথেষ্ট পরিমাণে নাটকীয় না হয় তবে সেই নাটক স্বধর্মচ্যুত। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি আছে; বাক্যবিন্যাসে, ঘটনাবিন্যাসে, চরিত্রচিত্রণে নানা স্থানে দুর্বলতা আছে, কিন্তু নাটকীয়তার অভাব নেই। সমস্তটা মিলিয়ে নাটকের যে প্রাণীন পদার্থ রোমাঞ্চ, সেটি অধিকাংশ নাটকেই তিনি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। নাটকের মূল ধর্ম তিনি বজায় রেখেছেন। তবে এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। যিনি যথার্থ ধার্মিক তাঁর যেমন বাহ্যিক ভড়ং-এর প্রয়োজন হয় না, ফোঁটা তিলক না হলেও চলে, খাঁটি নাট্যকারের স্বধর্মও ঠিক সে ভাবেই পালন করতে হবে অর্থাৎ নাটকের নাটকীয়তা

প্লটের গতি এবং পরিণতির মধ্য দিয়েই প্রকাশ করতে হবে। ভাষার কারসাজি দিয়ে প্রকাশ করলে চলবে না। ঘটনার অমোঘ বিধানে যে অবস্থার উদ্ভব হবে ভাষা তার সঙ্গে তাল রেখে চলবে। দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষণে ক্ষণে ওজস্বিনী ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন যদিচ ঘটনার সংস্থানে তার প্রশ্রয় নেই। একটা ঝঞ্ঝা, একটা জলোচ্ছ্বাস, একটা ভূমিকম্প!— ইত্যাকার গুরুগম্ভীর শব্দপ্রয়োগে বক্তব্যের গাম্ভীর্য নষ্ট হয়। নাটকীয়তা এবং নাটুকেপনা এক জিনিস নয়। বাক্‌চাতুর্য ভালো, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সেটা হয় ছ্যাবলামো। নাটকীয়তা খুবই স্বাভাবিক জিনিস, নাটুকেপনা তার ছ্যাবলা সংস্করণ।

স্থানে স্থানে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় আতিশয্য আছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। তবে এরও সপক্ষে একটি কথা বলবার আছে। ঘরে বসে পড়তে গেলে এ ভাষা যতখানি বিসদৃশ মনে হয়, রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার মুখে ততখানি মনে হবে না। আতিশয্য-দোষ শেক্সপীয়ারের নাটকেও লক্ষণীয়। কাব্যামৃত স্থানে-অস্থানে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। বেন্ জনসন্ এই ত্রুটির কথা সে যুগেই উল্লেখ করেছিলেন। নিজে এ বিষয়ে উন্নততর টেকনিকের পরিচয় দিয়েছেন! কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে—তথা সাহিত্যিকের পক্ষে— টেকনিক একমাত্র রক্ষাকবচ নয়। পুডিংএর ভালো-মন্দ খেয়ে তবে বিচার। আমরা শেক্সপীয়ার পড়ে যতখানি আরাম পাই বেন্ জনসন্ পড়ে কি ততখানি পাচ্ছি? রঙ্গমঞ্চে বেন্ জনসনের নাটক আজ বিরলদর্শন। শেক্সপীয়ার যে পাঠক এবং দর্শক উভয়ের কাছে আজ পর্যন্ত সমাদৃত সে তাঁর কবিত্বের ঐশ্বর্যে, বলা যেতে পারে তাঁর আতিশয্যের ঐশ্বর্যে। একজন আধুনিক নাট্য-সমালোচকের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি—'What is it we notice if we pick up a modern play after reading Shakespeare or the Greeks? Nine times out of ten it is the *dryness* —I do not mean the *dullness*, but the modesty of the language, the sheer lack of winged words, even of eloquence'।

সব জিনিসকে কেটেছেঁটে বাদ ছাদ দিয়ে ন্যাড়া করবার একটা চেষ্টা আধুনিক টেকনিক বলে সমাদৃত হচ্ছে। কবিতা থেকে কবিত্ব বর্জন করতে হবে, নাটক থেকে নাটকীয়তা! If the salt have lost his savour wherewith shall it be salted? নুনের যদি নুনত্ব না থাকে তবে নুনের স্বাদ কোথায় পাব? কবিত্বহীন কবিতা, নাটকীয়তা হীন নাটক আমাদের কোন্ কাজে লাগবে?

দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনভাষ্য

রথীন্দ্রনাথ রায়

রবীন্দ্রজীবনের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রসমকালীন কবিদের মধ্যে যিনি কাব্যপ্রত্যয়ে ও কাব্যরীতির অভিনব কর্ষণায় বিশিষ্ট মনন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট চিহ্ন রেখেছেন তিনি কবি দ্বিজেন্দ্রলাল। রবীন্দ্র-প্রভাবিত কাব্য-ভূমিতে সেদিন আপন কবিব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সহজসাধ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিনব কবিশক্তিকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। উত্তরকালে তিনি যখন প্রধানত নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তখনও তাঁর মানসবৈশিষ্ট্য ও শিল্পস্বাতন্ত্র্য নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র পঞ্চাশ বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যে তাঁর রচনার বিস্ময়কর বৈচিত্র্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রেম ও সৌন্দর্যস্বপ্নের রোমান্টিক গীতিকাব্য, হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যসংগীত, অভিনব ছন্দ ও কাব্যরীতি, বিচিত্রধর্মী নাটক ও প্রহসন, দেশাত্মবোধক সংগীত প্রভৃতি বিচিত্রকীর্তি তাঁর শিল্পজীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পজীবন আলোচনা করতে হলে তাঁর দেশ-কাল ও ব্যক্তিজীবনকে উপেক্ষা করা যায় না। বরং এই পটভূমিকায় তাঁর সাহিত্যসাধনাকে আরও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা যায়। বিশেষত, দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে এর স্বতন্ত্র তাৎপর্য আছে। তাঁর কাব্যজীবন ও ব্যক্তিজীবন একই বিধাতার রচনা, একটিকে বাদ দিয়ে আর-একটির পূর্ণ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। দান্তের কাব্যপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন: "কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে ও জীবনের কর্মে, উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন— কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে, তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে।"[১]

২

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ জুলাই (১২৭০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ) কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান। কার্তিকেয়চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনের উপর তাঁর পিতার প্রভাব কম নয়। সুকণ্ঠ গায়ক, সুরসিক তেজস্বী ও উন্নতচরিত্র কার্তিকেয়চন্দ্র তৎকালের কৃষ্ণনাগরিক সমাজে নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। কার্তিকেয়চন্দ্র সংস্কৃত 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত'-এর আদর্শে 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত' নাম দিয়ে কৃষ্ণনগর-রাজবংশের একটি প্রামাণিক ইতিহাস লিখেছিলেন। তাঁর 'আত্মজীবনচরিত' বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি 'গীতমঞ্জরী' নামে একখানি স্বরচিত গীতিসংগ্রহও প্রকাশ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কার্তিকেয়চন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন, "আত্মীয়স্বজন পোষণ, গুণিজনের উৎসাহদান, সাধুতার সমাদর, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, এসকল যেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। এইসকল গুণেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি দেশহিতৈষী, স্বজাতিপ্রেমিক মহাজনগণের বিশেষ সম্মানিত হইয়া-

---

১, কবিজীবনী: সাহিত্য।

ছিলেন।"[২] চরিত্রের আভিজাত্য, তেজস্বিতা, সংগীতানুরাগ প্রভৃতি গুণ দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিলেন। এই চরিত্রের আদর্শেই তিনি দুর্গাদাস চরিত্রটি এঁকেছিলেন। দুর্গাদাস নাটকের উৎসর্গ-পত্রে তিনি লিখেছেন, "যাঁহার দেবচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি এই দুর্গাদাস চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, সেই চিরআরাধ্য পিতৃদেব ৺কার্তিকেয়চন্দ্র রায় দেবশর্মার চরণকমলে এই ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম।"

সেকালের কৃষ্ণনগরে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। কার্তিকেয়চন্দ্রের বাসভবনটি ছিল কৃষ্ণনাগরিক সংস্কৃতির ও সংগীতচর্চার প্রধান কেন্দ্র। বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মধুসূদন প্রমুখ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের কীর্তিমানদের সঙ্গে কার্তিকেয়চন্দ্রের বন্ধুত্ব ছিল। এঁদের অনেককেই বালক দ্বিজেন্দ্রলাল মধুসূদন হেমচন্দ্র প্রমুখ কবির কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন।[৩] অল্পবয়সে তিনি সংগীতচর্চাও শুরু করেন। সেকালের কৃষ্ণনগরের সাংগীতিক পরিবেশের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, "··দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কার্তিক দেওয়ানের অনেক গান শুনেছি। তিনি ছিলেন সুকণ্ঠ ও সংগীতবিদ্যায় সুশিক্ষিত। তিনি বোধ হয় বাঙ্গালা হিন্দী দু-ভাষায়ই গান গাইতেন, কিন্তু কি যে গাইতেন আমার মনে নেই। দ্বিজেন্দ্রলালও গাইয়ে বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সভাসমিতিতে গান গাইতেন ছোকরা বয়সেই। বোধহয় কণ্ঠসংগীত তাঁর পিতার কাছ থেকেই শিক্ষা করেছিলেন।"[৪]

দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রাতারাও সকলে কৃতবিদ্য ছিলেন। 'সেজদা' জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, 'রাঙাদা' হরেন্দ্রলাল রায় ও 'রাঙাবৌদি' মোহিনীদেবীর উৎসাহবাক্য দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। বড়দা রাজেন্দ্রলাল রায় ও সেজদা জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় তাঁকে ইংরেজি সাহিত্যে দীক্ষা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন, "বড়দাদা এবং সেজদাদা আমাকে ইংরাজী সাহিত্যের অভিজ্ঞতা-অর্জনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন।"[৫] জ্ঞানেন্দ্রলাল সুলেখক ছিলেন। তিনি তৎকাল-প্রচলিত সুরভি, পতাকা, Telegraph, Bengalee প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতেন। হরেন্দ্রলাল রায় নবপ্রভা নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মোহিনীদেবী সুলেখিকা ও প্রতিভাশালিনী গায়িকা ছিলেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভগ্নী। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বিলিতি গানের ভক্ত হয়ে ওঠেন, তখন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারই নাকি তাঁকে ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মাত্র বারো বছর বয়সেই তিনি কবিতা ও গান রচনা শুরু করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, "১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আমি কবিতা ও গান রচনা করিতাম। ১২ হইতে ১৭ বৎসর পর্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে 'আর্যগাথা' নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু তখন কোনো কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল দেওঘরে সন্ধ্যা নামক মৎপ্রণীত একটি কবিতা নব্যভারতে প্রকাশিত হয়।"[৬]

২. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (ভাদ্র ১৩৬২), পৃ ৩০।

৩. "মহারাজ সতীশচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার পিতার বন্ধুগণ কৌতূহলী হইয়া দ্বিজেন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া তাঁহাকে কবিতা পাঠে উৎসাহিত করিতেন।"—দ্বিজেন্দ্রলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃ ১০।

৪. আত্মকথা, পৃ ৩০।

৫. দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায় চৌধুরী, পৃ ৭১।

৬. আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ : নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩১৭।

এম্. এ. পাস করার পরে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্টেট্ স্কলারশিপ নিয়ে তিনি বিলাতযাত্রা করেন (এপ্রিল ১৮৮৪)। তিনি তাঁর প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতাকে 'বিলাতপ্রবাসী' নাম দিয়ে পতাকা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন।[৭] নিপুণ পর্যবেক্ষণশক্তি, হাস্যপরিহাস-প্রবণতা, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, স্বদেশ ও স্বজাতি -প্রীতি, চারিত্রিক তেজস্বিতা প্রভৃতি ব্যক্তি ও সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য এই পত্রগুচ্ছের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। বিলাতপ্রবাসকালে দ্বিজেন্দ্রলাল 'দি লিরিক্‌স অব্ ইণ্ড' নামে একখানি ইংরেজি কাব্য প্রকাশ করেন। এই কাব্যেও তাঁর প্রতিভার গীতিধর্মিতা ও সুগভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় আছে।

বিলাতপ্রবাসকালে বিলিতি গান শিক্ষা ও ইংরেজি কাব্য রচনা করা দ্বিজেন্দ্রজীবনের দুটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। নাট্যরচনার আকাঙ্ক্ষাও সেই সময়েই অঙ্কুরিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, "বিলাত যাইবার পূর্বে আমি 'হেমলতা' নাটক ও 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক শৌখীন অভিনেতৃদল কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'গ্রন্থকার' নামক একটি প্রহসনের অভিনয় দেখি, আর Addisonএর Cato এবং Shakespeareএর Julius Caesarএর আংশিক অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চেও বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমে অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয় হইয়া উঠে।"[৮]

তিন বছর পরে তিনি বিলাত থেকে ফিরে এসে সরকারি কার্যভার গ্রহণ করেন। বিলাত যাওয়া তখনকার রক্ষণশীল সমাজে ঘোরতর অশাস্ত্রীয় ও অসামাজিক ব্যাপারের মধ্যে গণ্য ছিল। কেউ কেউ তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করার পরামর্শও দিয়েছিলেন। সামাজিক উৎপীড়ন দ্বিজেন্দ্রলালের তরুণ মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এই প্রতিক্রিয়ার বহ্নিজ্বালাময়রূপ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'একঘরে' নকৃশায়। নকৃশাটির সাহিত্যিক মূল্য কিছু নেই— লেখক নিজেই সংযমের শাসন হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু একদিক থেকে এর তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না। নকৃশাটিতে দ্বিজেন্দ্রমানসের সুপ্ত স্যাটায়ারিস্টকেই যেন আকস্মিক আঘাতে জাগিয়ে তুলেছে। সামাজিক অসংগতি ও ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে তিনি পরবর্তীকালে বহু হাসির গান ও প্রহসন রচনা করেন। 'একঘরে' নকৃশায় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর মানসপ্রকৃতির একটি অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডকে প্রথম আবিষ্কার করেছেন।

৩

১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৮৭) দ্বিজন্দ্রলালের সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ হোমিয়োপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা দেবীর বিবাহ হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবনের উপর সুরবালা দেবীর প্রভাব অসামান্য। সুরবালা দেবী প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। বিলাত-প্রত্যাগত হওয়ার পর দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে যে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, বিবাহ-ব্যাপারে তাই চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করল। জ্ঞানেন্দ্রলাল লিখেছেন, "কৃষ্ণনগরের

৭. জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ও হরেন্দ্রলাল রায় সাপ্তাহিক পতাকা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় ১২৯১ ও ১২৯২ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিলাতপ্রবাসী' প্রকাশিত হয়।

৮. আমার নাট্য জীবনের আরম্ভ: নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩১৭।

কয়েকটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু দ্বিজেন্দ্রের বিবাহে আমাদের সহিত বরযাত্রী গিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পূর্বে কোনো প্রবল পক্ষ, যাঁহারা এই বিবাহে যোগ দিবেন তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিবেন, এই সংবাদ পাইয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। দ্বিজেন্দ্রের এই বিবাহে আমরা যোগ দেওয়া সত্ত্বেও কেহ আমাদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন না। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে দ্বিজেন্দ্রের সহিত তখন কেহ চলিতে স্বীকৃত হইলেন না।"[১]

পরস্পরবিরোধী দুটি ভাববৃত্তি দ্বিজেন্দ্রমানসলোকে যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিল, এইখানেই তার প্রারম্ভ লগ্ন। 'একঘরে' নক্শা ও পরবর্তীকালের বিদ্রূপাত্মক কবিতায় যেমন তাঁর বহির্মুখী সামাজিক মন হাস্যে-পরিহাসে-ব্যাটায়ারে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তেমনি অন্যদিকে নবপরিণীতা পত্নীকে ঘিরে তাঁর হৃদয়োচ্ছ্বাস 'গীতিকবিতার স্ফটিক পাত্রে স্বর্ণমদিরার মতো বিহ্বল ও উজ্জ্বল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে'। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মনোলোকে দুটি ধারা প্রবহমান: আত্মমুগ্ধ প্রেম-বিহ্বল স্বপ্নাতুর কবি ও অসংগতি-ক্ষুব্ধ সামাজিক মানুষ। এই দুটি ধারা কখনো স্বতন্ত্র ধারায় সমান্তরেখায় প্রবাহিত হয়েছে, আবার কখনো বা এই দুই বিরুদ্ধ ধারা এক হয়ে ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে বিচিত্রমুখী জটিলতার সৃষ্টি করেছে। প্রেম ও সামাজিক নির্যাতন— দুয়েরই কেন্দ্রে পত্নী সুরবালা দেবী।

দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ আর্যগাথা (দ্বিতীয় ভাগ) ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাব্যখানির উৎসর্গ পত্রেই কবির প্রিয়াবন্দনার সুর নিঃসংশয়িত হয়ে উঠেছে—

নয় কল্পিত সৌন্দর্যে ;— নয়
কবির নয়নে দেখা— পরিস্বপ্ন সম ;—
এসেছ প্রত্যক্ষ স্বীয় দেবীরূপ ধরি।

'আর্যগাথা'র (দ্বিতীয় ভাগ) প্রথমাংশের কবিতাগুলি প্রেম ও যৌবনস্বপ্নের, কবিজায়াই তার অবলম্বন। দ্বিতীয়াংশে পাশ্চাত্য কবিদের গানের অনুবাদগুলি সংকলিত হয়েছে। ষোলো বছরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় দাম্পত্যজীবন দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। প্রহসন, ব্যঙ্গ কবিতা, হাসির গান, নাট্যকাব্য, রোমান্টিক গীতিকবিতা প্রভৃতি বিচিত্র সৃষ্টির প্রাচুর্যে কবিজীবন তখন পূর্ণোচ্ছ্বসিত। সৃষ্টি-সাফল্যের এই চরম মুহূর্তেই এল নিদারুণ আঘাত— সুরবালা দেবীর মৃত্যু হল (২৯ নভেম্বর ১৯০৩)।

স্ত্রীবিয়োগ-বেদনা তাঁর শিল্পজীবনের পক্ষেও একটি তাৎপর্যময় ঘটনা। স্ত্রীবিয়োগের পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানত কবি ও প্রহসন রচয়িতা। একদিকে ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ গীতিকবিতা, অন্যদিকে বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও প্রহসন—এই দুয়ের টানাপোড়েনে তাঁর সাহিত্যিক জীবন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। 'আর্যগাথা' (১ম, ২য়) ও 'মন্দ্র' কাব্য ; 'হাসির গান' ও 'আষাঢ়ে' ব্যঙ্গ কাব্য ; 'কল্কি অবতার' 'বিরহ' 'ত্র্যহস্পর্শ' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসন চতুষ্টয় এই কালের মধ্যেই রচিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকগুলি স্ত্রীবিয়োগের পরবর্তীকালেই রচিত হয়। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে স্বদেশভক্তির উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি তাকেই বাণীরূপ দিয়েছিল। স্ত্রীবিয়োগ-বেদনাবিধুর দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর শূন্য হৃদয়ের হাহাকারকে যেন এই বহিরাশ্রয়ী উন্মাদনা ও উত্তেজনা দিয়ে অনেকটা পূরণ

১. নব্যভারত, শ্রাবণ ১৩২০।

করার চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মানস-পরিবর্তনের উপরে চমৎকার আলোকপাত করেছেন সমালোচক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—

"তারাবাই ব্যতীত তাঁহার যাবতীয় জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকের সৃষ্টি স্ত্রীবিয়োগের পরে। নাটক পাঠে, নাটকের অভিনয় দেখায়, নাটক-রচনায় তাঁহার ঝোঁক গোড়া হইতেই ছিল। কিন্তু এই সময়কার নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি রঙ্গমঞ্চের চাহিদা অনুসারে লিখিত। এমন হইবার অনেক কারণ থাকা সম্ভব। প্রথম, অভিনয়যোগ্য নাটকের চাহিদা। দ্বিতীয়, বঙ্গ-ভঙ্গ-জনিত জাতীয়তাবোধের প্রসার। আরও একটি কারণ থাকাও অসম্ভব নয়। স্ত্রীবিয়োগের পরে সংসারের ও মনের হঠাৎ-শূন্যতা পূরণ করিবার জন্য বাহিরের উত্তেজনার কিছু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল তাঁহার পক্ষে। রঙ্গালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সেই শূন্যতা পূরণ করিতে পারে আশায় তিনি মঞ্চোপযোগী নাটক রচনায় উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছিলেন এমনই খুবই সম্ভব।"[১০]

দ্বিজেন্দ্রলালের চাকুরী-জীবন সুখের হয় নি। চাকুরী-জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাও তাঁর কোনো কোনো রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি ছিলেন সদালাপী ও মজলিশী প্রকৃতির মানুষ। অনেক গুণমুগ্ধ জ্ঞানী গুণী, সংগীত ও সাহিত্য-রসিক তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্যে ও নানা আলোচনায় দুঃসহ ব্যথা ভুলে থাকতে চাইতেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'পূর্ণিমা-মিলন' নামে এক সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সম্পর্কে তিনি একখানি চিঠিতে জানিয়েছেন—

"এক নূতন খেয়াল মাথায় আসিয়াছে।··আমি (অর্থাৎ আমরা) ইচ্ছা করিয়াছি, প্রতি পূর্ণিমায় দেশশুদ্ধ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগীদের একত্র করিয়া এক-একবার প্রতি পূর্ণিমা উপলক্ষে 'মিলন' করা যাইবে। নাম হইবে 'পূর্ণিমা-মিলন'। ইহাতে কলিকাতাস্থ সমুদয় সাহিত্যিকদের মধ্যে অবারিতভাবে মেলামেশা ভাববিনিময় প্রীতিবর্ধন ও পরিচয়াদি হইবে ; আর তাহার সঙ্গে সেখানে (যেখানে যখন হইবে) গৃহস্বামীর প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যানুসারে, অল্প কিছু জলযোগ— এই ধর যেমন চা, সরবত প্রভৃতি ও চুরুট তামাকের (সিগারেটেরও !!) ব্যবস্থা থাকিবে।"[১১]

'পূর্ণিমা-মিলন' প্রায় দুবছর ধরে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল খুলনায় বদলি হওয়ার পর ক্রমশ অনিয়মিত হয়ে পড়ল, শেষে একেবারে বন্ধই হয়ে গেল। 'পূর্ণিমা-মিলন' স্বল্পায়ু হলেও তৎকালীন শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান বাঙালির একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। পূর্ণিমা-মিলনকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। ললিতচন্দ্র মিত্রের বাড়িতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। ডাক্তার কৈলাস বসুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রলাল ঐ মিলনোৎসবের জন্যই 'এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ' গানটি রচনা করেন। উক্ত অধিবেশনে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে সীতা ও সরমার কথোপকথন অংশটি

---

১০. বাংলার কবি

১১. দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে লিখিত পত্র ; দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ ৪১০-১১

আবৃত্তি করে শোনান। জাস্টিস সারদাচরণ মিত্রের বাড়িতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ অধিবেশনে কান্ত কবি রজনীকান্ত স্বরচিত গান গেয়ে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। ঐ অধিবেশনেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাধে কি বাবা বলি' গানখানি গেয়েছিলেন। পূর্ণিমা-মিলনের দোললীলা উপলক্ষে একবার আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের "শুভ্রকেশ লালে লাল" হয়ে উঠেছিল।

৪

স্ত্রীবিয়োগের পর যে দশ বছর দ্বিজেন্দ্রলাল জীবিত ছিলেন (১৯০৩-১৯১৩) তাকে প্রধানত নাটক-রচনার যুগ বলা যায়। 'আলেখ্য' (১৯০৭) ও 'ত্রিবেণী' (১৯১২) ছাড়া এ যুগের অধিকাংশ রচনাই নাটক ও প্রহসন। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিই মঞ্চসাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের আবেগ-দীপ্ত মুহূর্ত তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে জাতীয় ভাব বিকাশের অনুকূল উপাদান ছিল। তা ছাড়া, অতীতাশ্রয়ী ঐতিহাসিক রোমান্সকে চিত্রময় ভাষায় ও আবেগদীপ্ত ভঙ্গিতে রূপায়িত করা হয়েছে।

স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। এই সময় বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ভট্টাচার্য 'কলিকাতা ইভনিং ক্লাব' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। এই ক্লাব কালক্রমে 'সুরধামে' স্থাপিত হল, দ্বিজেন্দ্রলাল হলেন এর সভাপতি। তাঁর মৃত্যুর পর 'ইভনিং ক্লাব' উঠে যায়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন। ব্যাধির জন্য এক বছর ছুটি নিলেন। কিন্তু দেহও ক্রমশ অপটু হয়ে আসছিল। ১৯১৩র ২২শে মার্চ তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করার পর তিনি একখানি মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স পত্রিকাটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। প্রথম সংখ্যার (আষাঢ় ১৩২০) জন্য তিনি 'সূচনা' অংশ লিখেছিলেন, ঐ সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য রচনাগুলিও নির্বাচন করেছিল। বিখ্যাত 'ভারতবর্ষ' সংগীতটিও এই পত্রিকার জন্যই রচিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পত্রিকা প্রকাশের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয় (১৭ মে ১৯১৩)।

দ্বিজেন্দ্র-জীবনের শেষ অধ্যায়ে সবচেয়ে তাৎপর্যমূলক ঘটনা হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ। এই দীর্ঘ বিস্তৃত সাহিত্যিক বিরোধের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়োজন আছে। সেদিনের উত্তাপ উত্তেজনা ও ব্যক্তিগত আক্রমণ আজ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এ কালের সমালোচক ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকের কাছে এ ঘটনা সাহিত্যের ইতিহাসেরই অঙ্গীভূত হয়েছে। এই ঘটনা থেকে দুটি সত্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রবীন্দ্রবরণ ও রবীন্দ্রবিরোধের ইতিহাস ; দ্বিতীয়ত, দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যাদর্শ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র দু বছরের ছোট হলেও সাহিত্যিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন অনেক পরে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভার মৌলিকতা ও বিস্ময়কর স্বকীয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম আলোচনা করেন। 'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ), 'আষাঢ়ে' ও 'মন্দ্র' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দিগ্‌দর্শন।[১২] রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের 'অবলীলাকৃত ক্ষমতা' 'প্রবল আত্মবিশ্বাস' ও 'অবাধ সাহস'

১২ 'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ): সাধনা, অগ্রহায়ণ ১৩০১। 'আষাঢ়ে': ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫। 'মন্দ্র': বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩০৯। প্রবন্ধ তিনটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

-এর কথা সশ্রদ্ধ ভাবে উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁর 'বিরহ' প্রহসনটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। প্রহসনটি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও অভিনীত হয়েছিল।[১৩] কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় নাটকগুলির সপক্ষে বা বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ কোনো মন্তব্য করেন নি। সম্ভবত, রবীন্দ্রনাথের এই নীরবতা দ্বিজেন্দ্রলালের মনঃপূত হয় নি। বরিশালের প্রাদেশিক সম্মিলনীতে (১৯০৬) যে সাহিত্য-সম্মেলন আহ্বান করা হয়, তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা রবীন্দ্রনাথকে এই উপলক্ষে নির্মমভাবে আক্রমণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কাঁদি থেকে এই সম্মিলনের অন্যতম ব্যাবস্থাপক দেবকুমার রায়চৌধুরীকে চিঠি লেখেন, "রবিবাবুকে সাহিত্যিক সম্মিলনের সভাপতি করায় 'বঙ্গবাসী' তোমার উপরে নারাজ হইয়া এত চটিলেন কেন জানি না। আমি যদিও রবিবাবুর ঐ সব লালসামূলক রচনাবলীর নিতান্ত বিরোধী তবু এ কথা আমি মুক্ত কণ্ঠেই মানি যে, বর্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি সর্বাপেক্ষা যোগ্যব্যক্তি এবং তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার সঙ্গে এখন আর কাহারও তুলনাই হইতে পারে না।"[১৪]

বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯০৪) গ্রন্থটির অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী নিয়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকাশ্য বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়টি দ্বিজেন্দ্রলালকে উত্তেজিত করেছিল। ১৩১১ সালে এই দুই কবির সাহিত্যিক বিরোধ যে কতদূর গড়াইয়াছিল তা রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি থেকে জানা যায়।[১৫] দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গয়ায় বদলি হন, তখন তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন জেলা জজ লোকেন্দ্রনাথ পালিত। রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে দুই বন্ধুর তুমুল তর্ক হত। দ্বিজেন্দ্রলাল পালিত সাহেবকে স্বমতে দীক্ষিত করতে অসমর্থ হয়ে প্রকাশ্যভাবে রবীন্দ্রনাথের 'অস্পষ্ট রীতি'র বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। এই মনোভাবটি দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে লিখিত একখানি চিঠিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[১৬] এর পরেই দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে কবিতাটিকে হাস্যাস্পদ করে তোলেন।[১৭]

অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'কাব্যের প্রকাশ'[১৮] প্রবন্ধটিকে উপলক্ষ করে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর ধূমায়িত বিক্ষোভকে রূপ দেন। 'কাব্যের অভিব্যক্তি'[১৯] প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রকাব্যের অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এর প্রায় এক বছর পরে 'কাব্যের উপভোগ'[২০] নামক একটি প্রবন্ধেও তিনি তীব্রভাবে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন। রবীন্দ্রনাথের জবাবটিও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ঐ সংখ্যাতেই ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "দ্বিজেন্দ্রবাবু কেন অযথা কল্পনা করিতেছেন যে, আমি এক দল চেলা আমার চারপাশে তৈরি করিয়া তুলিয়াছি।· ·আমার যে কবিতা দ্বিজেন্দ্রবাবুর কোনো মতেও ভাল লাগে নাই তাহা যে আর কাহারও ভাল লাগিতে পারে, আমার এ অপরাধ তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না।"

---

১৩ "বিরহ প্রহসনটি থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল, এমন কি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও উহার অভিনয় হয়।"—রবীন্দ্রজীবনী (২য় খণ্ড, ১৩৫৫) : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ ২৮০।

১৪ ১৩ই মে, ১৯০৬ কাঁদি থেকে লিখিত চিঠি : দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ ৪৪৯।

১৫. দ্বিজেন্দ্রলালকে লিখিত একখানি চিঠি (২৩ বৈশাখ, ১৩১২), রবীন্দ্রজীবনী (২য় খণ্ড, ১৩৫৫), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ; পৃ ২৮৩-৫

১৬. দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ ৪৯৮-৪৯৯।

১৭. একটি পুরাতন মাঝির গান (আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা), সাহিত্য, আশ্বিন ১৩১৩।

১৮. বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১৩।

১৯. প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৩।

২০. বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৪।

কাব্যে অস্পষ্টতা অভিযোগের প্রায় বৎসরাধিক কাল পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন।[২১] প্রবন্ধটির মূল আক্রমণস্থল ছিল রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'। প্রিয়নাথ সেন এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেছিলেন।[২২] কাব্যে নীতির প্রসঙ্গ নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। 'আনন্দবিদায়' প্যারডি রচনা করে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে সর্বসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। স্টার রঙ্গমঞ্চে 'আনন্দবিদায়'-এর দক্ষযজ্ঞ পরিণতি নিয়ে প্রমথ চৌধুরী 'সাহিত্য চাবুক '(সাহিত্য, মাঘ ১৩১৯) প্রবন্ধ লেখেন। মৃত্যুর পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার জন্য যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে তিনি বলেছেন, "আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।"

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ এনেছিলেন: কাব্যে অস্পষ্টতা ও দুর্নীতি। দ্বিতীয় অভিযোগটির মূলে কোনো যুক্তিই ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বহু রচনায় সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিদীপ্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। 'পাষাণী' রচয়িতার পক্ষে 'চিত্রাঙ্গদা'র দুর্নীতি আলোচনা নিতান্ত অসংগত বলেই মনে হয়। তবে প্রথম অভিযোগটির মধ্যে তৎকালীন রবীন্দ্রবিরোধী মতবাদের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগের অনেকেই রবীন্দ্রকাব্যের সূক্ষ্মতর ভাব-লাবণ্য গ্রহণ করতে পারেন নি। তার কারণ তখনো রবীন্দ্রকাব্যকে আস্বাদন করার মতো কাব্যসংস্কার ও রসরুচি তৈরি হয় নি। হেম-নবীনের কাব্যসংস্কারই তখন রসাস্বাদনের মাপকাঠি। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্পষ্ট ও জোরালো কাব্যের পক্ষপাতী। প্রত্যক্ষের বাইরে যে অস্পষ্ট, অদেখা আর-একটি সূক্ষ্মতর ছায়াশরীরী জগৎ আছে, তাকে কাব্যে স্থান দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরোধ তাই অনেকখানি কাব্যপ্রত্যয়গত বিরোধ। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল সম্পর্কে লিখেছিলেন, "বিহারীলাল তখনকার ইংরাজি ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না— তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।"[২৩] হেম-নবীনের যুগে যে কারণে বিহারীলালের আদর হয় নি, রবীন্দ্রনাথেরও কতকটা সেই কারণেই বাংলাদেশে যথার্থ স্বীকৃতি পেতে বিলম্ব ঘটেছিল।

৫

দ্বিজেন্দ্রমানস যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি বলিষ্ঠ। তবু তাঁর সাহিত্যের যথাযোগ্য সমাদর ঘটে নি। সমসাময়িক কালে, বিশেষত তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরে, নাট্যকার হিসাবেই তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানও সেকালে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাঁর নাট্যকার খ্যাতিই কবিখ্যাতির অন্তরায় হয়েছিল। নাটকগুলির জনপ্রিয়তা ও মঞ্চসাফল্যও হয়তো তাঁকে তাঁর স্বক্ষেত্র থেকে অনেকখানি সরিয়ে এনেছিল। শেষকাব্য 'ত্রিবেণী'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: "সম্ভবতঃ আমার খণ্ডকবিতার এই খানেই সমাপ্তি!"—এই উক্তিটি যেন তাঁর কাব্যনিয়তিরই নির্মম পরিহাস! স্বক্ষেত্র থেকে সরে এসে তিনি লাভবান হতে পারেন নি। সম্ভাবনা-দীপ্ত কাব্যজীবনকে অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে নাট্যসরস্বতীর আহ্বানে সাড়া দিতে হয়েছে।

২১. কাব্যে নীতি: সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।
২২. চিত্রাঙ্গদা: সাহিত্য, কার্তিক ১৩১৬।
২৩. বিহারীলাল: আধুনিক সাহিত্য।

তাঁর নাট্যকার খ্যাতি যেমন কবিখ্যাতির অন্তরায় হয়েছে, তেমনি আর-একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের কাল একই সঙ্গে রবীন্দ্রবরণ ও রবীন্দ্রবিরোধের কাল। কেউ কেউ আবার এই দুই ভাবধারার বিপরীত আকর্ষণে আন্দোলিত হয়েছিলেন। তৎকালে দ্বিজেন্দ্রলালের নেতৃত্বে একটি রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ আরও আটাশ বছর জীবিত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি অংশ এই অসাধারণ রূপস্রষ্টার দক্ষিণপাণির আশীর্বাদে ধন্য হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের রূপ ও রীতিই বাংলা কাব্যের পথ নির্দেশ করেছে। যা রবীন্দ্রকাব্যের অনুকূল নয়, তা সহজেই পরিত্যক্ত হল। দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রবর্তিত কাব্যরীতি ও কলাবিধির সম্যক্‌ অনুশীলনের অভাবে বাংলা সাহিত্যের এই প্রতিভাবান কবির কবিকীর্তি আজ এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একটি শক্তির উৎস দীর্ঘকাল অনাবিষ্কৃতই পড়ে রইল।

দ্বিজেন্দ্রলালের মনে লিরিসিজম্‌ ও স্যাটায়ার একটি যুগ্মবেণী রচনা করেছিল। লিরিক ও স্যাটায়ারের বিপরীত আকর্ষণে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-পরিণামকে কোন্‌ পথে নিয়ন্ত্রিত করেছে, দ্বিজেন্দ্রকাব্য-জিজ্ঞাসার এইটিই সবচেয়ে বড় কথা। মনোধর্মের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল 'বিশুদ্ধ রোমান্টিক কবি' নন। 'আষাঢ়ে' কাব্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে এই সত্যটিকে বহু পূর্বেই নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর বায়রনের কথা মনে হয়েছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা শেলীর মত বায়রনের কবিতার কোনো সুগভীর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা ছিল না। আবেগতপ্ত অবলীলাকৃত প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে এক বিদ্রূপাত্মক মনোভাব তাঁর কাব্যে প্রাধান্যলাভ করেছিল। 'মহতের সঙ্গে তুচ্ছ, গভীরের সঙ্গে অগভীর, করুণের সঙ্গে হাস্য— প্রভৃতি আপাতবিরোধী ভাববৃত্তিগুলি তাঁর কাব্যে ওঠা-নামা করেছে।' বায়রনের মত দ্বিজেন্দ্রলালেরও অন্তর্মুখী গতিপ্রবণতার সঙ্গে বহির্মুখী সামাজিক মনের একটি মিলন ঘটেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যরীতি ও ছন্দের ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব এনেছিলেন। বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, গদ্যাত্মকভঙ্গি দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই তিনি syllabic রূপ দিতে চেয়েছিলেন। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন, "তাঁর এই অভিনব ছন্দে স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনি সমাবেশ ঘটেছে।"[২৪]

দ্বিজেন্দ্রলাল মূলত কবি হলেও নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর দান কম নয়। তখন বাংলা নাটকের একচ্ছত্র সম্রাট গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্রের সেই প্রবল প্রভাবের যুগেও দ্বিজেন্দ্রলাল সেই জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেন নি। তাঁর স্বাতন্ত্র্য-সমুজ্জ্বল প্রতিভা রূপ-রীতি আঙ্গিক-প্রকরণ চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে নূতনত্ব এনেছিল। কিন্তু নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল অপূর্ণতা ও আতিশয্য-দোষ থেকে মুক্ত নন। আধুনিক নাটকের সূক্ষ্মতর শিল্পরীতি, স্বল্পায়ত রূপবিন্যাস, আধুনিক মঞ্চানুগ কলাবিধি দ্বিজেন্দ্র-নাটকে অনুসন্ধান করা সঙ্গত নয়। ব্যয়সাধ্য দীর্ঘ ঐতিহাসিক নাটকের প্রবণতাও আজ অনুপস্থিত। যে নাট্যকার খ্যাতি তাঁকে সে যুগে জনপ্রিয় করেছিল, তার ভিত্তি আজ দুর্বল। কবিতা গান ও কাব্যরীতির মধ্যেই তাঁর স্বক্ষেত্র নির্ণয় করতে হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে এই প্রতিভাবান কবি সুরকার ও নাট্যকারকে যোগ্য সমাদর দেওয়ার সুযোগ এসেছে।

---

২৪. দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরবৃত্ত ছন্দ: উদয়ন, আশ্বিন ১৩৪০।

স্বরলিপি

জীবনটা তো দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল,
এখন যদি সাহস থাকে মরণটাকে দেখবি চল।
পড়ে আছে অসীম পাথার
সবাই তাতে দিচ্ছে সাঁতার
অঙ্গ এলে অবশ হয়ে সবাই যাবি রসাতল।
উপরে তো গর্জে ঢেউ সে
দণ্ডমাত্র নয়কো স্থির
নীচে পড়ে আছে অগাধ
স্তব্ধ শান্ত সিন্ধু নীর।
এত দিন তো ঢেউয়ে ভেসে
দিলি সাঁতার উপর-দেশে
ডুব দিয়ে আজ দেখব নীচে কতখানি গভীর জল।

কথা ও সুর : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় — স্বরলিপি : শ্রীদিলীপকুমার রায়

মা । মা গরা গা II II মা মা -া । পা পা -া I মগা মা -া । পা ধা -া I পধা -র্সা ণা । ধা -া -া I
জী বন্ টা ০ ত দে খা ০ গে ল ০ শু ০ ধু ই কে ব ল্ কো ০ ০ লা হ ০ ল্

-া -া না । না না না I র্সা র্সা -া । র্সনা র্সা -া I র্রা র্রা -র্জ্জা । র্রা র্সা -া I
০ ০ এ খন্ য দি সা হ স্ থা ০ কে ০ ম র ণ্ টা কে ০

নর্সা -র্রর্সা ণা । -ধা ধা ধা I ণা ণা -া । ধা পা -া I মপা -ধপা মা । -গা গা মা I
দে ০ খ্ বি ০ ওরে ম র ণ্ টা কে ০ দে ০ খ্ বি ০ ও রে

ধা ধা -া । ধা ধা -ণা I পা -া ধা । পধা -র্সণা -া I -া -া ধা । পা মা গা I
ম র ণ্ টা কে ০ দে খ্ বি চ ০ ০ ল্ ০ ০ জী বন্ টা ত

মা মা -া । পা পা -া I গা মা -া । পা ধা -া I পধা -র্সা ণা । ধা -া -া II
দে খা ০ গে ল ০ শু ধু ই কে ব ল্ কো ০ ০ লা হ ০ ল্

II -া -া না । না না না I র্সা র্সা -া । র্সনা র্র্সা -া I র্রা র্রা -র্জ্জা । র্রা র্সা -া I
০ ০ প ড়ে আ ছে অ সী ম্ পা০ থা র্ স বা ই তা তে ০

নর্সা -র্র্সা র্সা । ণা ধা -া I ণা -া ধা । -পা মগা মা I পা পা -া । পক্ষা ধপা -া I
দি০ ০ চ্ছে সাঁ তা র্ অ ০ ঙ্গ ০ এ০ লে অ ব শ্ হ০ য়ে ০

ধা ধা -র্সা । ধা পমা -গা I মা ধা -া । পধা র্সণা -া I -া -া ধা । পা মা গা I
স বা ই যা বে০ ০ র সা ০ ত০ ০ ল্ ০ ০ জী বন্ টা ত

মা মা -া । পা পা -া I গা মা -া । পা ধা -া I পধা র্সা ণা । ধা -া -া II
দে খা ০ গে ল ০ শু ধু ই কে ব ল্ কো০ ০ লা হ ০ ল্

II সা -া সা । গা গা -া I মা -া মা । পা -া পা I গা -া মা । পা -া ধা I
উ ০ প রে তো ০ গ ০ র্জে ঢে উ সে দ ০ ও মা ০ ত্র

পধা -র্সা ণা । ধা -া -া I র্সা র্সা -না । র্সা র্সা -র্রা I র্সধর্সা ণা -া । ধা পা -া I
ন০ য়্ ক স্থি ০ র্ নী চে ০ প ড়ে ০ আ০ ছে ০ অ গা ধ্

মা -া গা । মা -া পা I মরা -মা জ্ঞরা । সা -া -া I না না -া । না -া না I
স্ত ০ ব্ধ শা ০ ন্ত সি ০ ন্ধু০ নী ০ র্ এ ত ০ দি ন্ ত

র্সা র্সা র্সা । র্সনা র্র্সা -া I র্রা র্রা -র্জ্জা । র্রা র্সা -া I নর্সা নর্সা -া । ণা ধা -া I
ঢে উ য়ে ভে০ সে০ দি লি ০ সাঁ তা র্ উ০ প০ র্ দে শে ০

ণা -া ণা । ধা পমগা -মা I পা -া পা । -া মা পা I ধা ধা -র্সা । ধা পমা -গা I
ডু ব্ দি য়ে আ০০ জ্ দে খ্ ব ০ নী চে ক ত ০ খা নি০ ০

মা ধা -া । পধা -র্সণা -া I -া -া ধা । পা মা গা I মা মা -া । পা পা -া I
গ ভী র্ জ০ ০ ল্ ০ ০ জী বন্ টা ত দে খা ০ গে ল ০

গা মা -া । পা ধা -া I পধা -র্সা ণা । ধা -া -া II II
শু ধু ই কে ব ল্ কো০ ০ লা হ ০ ল্

সরকারী দলিলে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর সপ্ততিতম জয়ন্তী উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সেদিনকার অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে আমি ছিলেম বয়সে সবচেয়ে ছোটো, শিক্ষায় সবচেয়ে কাঁচা। আমার ছন্দগুলি লাগাম-ছেঁড়া, লেখবার বিষয় ছিল অস্ফুট উক্তিতে ঝাপসা, ভাষার ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে। তখনকার সাহিত্যিকেরা মুখের কথায় বা লেখায় প্রায়ই আমাকে প্রশ্রয় দেন নি— আধো আধো বাধো বাধো কথা নিয়ে বেশ একটু হেসেছিলেন। সে হাসি বিদূষকের নয়, সেটা বিদূষণ-ব্যবসায়ের অঙ্গ ছিল না। তাঁদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজন্য ছিল না লেশমাত্র। বিমুখতা যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সেখানেও বিদ্বেষ দেখা দেয় নি। তাই প্রশ্রয়ের অভাব সত্ত্বেও বিরুদ্ধ রীতির মধ্য দিয়েও আপন লেখা আপন মতে গড়ে তুলেছিলেম।"

নিজের প্রথম পর্বের রচনার সমকালীন স্বীকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা যথার্থ বলে মেনে নেওয়া যায় না। বরং পরিণত বয়সে কবি যে-সব রচনা অস্বীকার করেছেন, অচলিত সংগ্রহের দূরত্বে যারা আত্মরক্ষা করছে, সমকালীন সমালোচকরা যে তাদেরও স্বাগত জানিয়েছিলেন এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। ভাব, ব্যঞ্জনা ও শব্দ-প্রয়োগের নবত্ব সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অবশ্য অনেকে এই নবত্বকে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করেছেন, বিরূপতাও দেখিয়েছেন। কিন্তু অভিনন্দনের যে অভাব ছিল না সে কথা মনে রাখতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং কবিকে অভিনন্দিত করেছেন। প্রথম পর্বের রচনার উপর নির্ভর করেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে সাহিত্যের আসরে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

ভারত সরকারের রিপোর্টেও রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের রচনা সম্বন্ধে অনেক প্রশংসাসূচক মন্তব্য পাওয়া যায়। সরকারী দলিলের মন্তব্য হিসাবে এদের বিশেষ মূল্য আছে। যদিও এ কথা স্বীকার করতে হবে যে আজ সরকারী দলিলের অনেক মতামতই বিচারসহ মনে হবে না। কোথাও কোথাও সমকালীন লেখকদের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার যে ভাবে তুলনা করা হয়েছে তা কৌতূহলোদ্দীপক।

ভারত সরকার ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক সরকারদের প্রকাশিত বইপত্রের উপরে বার্ষিক রিপোর্ট[১] পেশ করবার নির্দেশ দেন। এই রিপোর্টে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি এবং উল্লেখযোগ্য বই সম্পর্কে মন্তব্য করা হত। প্রথম রিপোর্ট সংকলিত হয় ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত পুস্তকের উপর ভিত্তি করে। ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত রিপোর্ট দেখেছি। এর পরেও দু-এক বছর রিপোর্ট বেরিয়েছিল বলে মনে হয়। তবে ১৯০০ সালের পরে বোধ হয় এই রিপোর্ট আর বের হয় নি।

চন্দ্রনাথ বসু বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানের পদ গ্রহণ করেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর।[২] তিনি কাজে যোগ দেবার পর থেকে বাংলা বইয়ের উপর বিস্তৃত রিপোর্ট সঙ্কলিত হতে আরম্ভ হয়। ১৮৮০

১ এই রিপোর্টগুলি পুস্তকাকারে ছাপা হচ্ছে।

২ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার তারিখটি ঠিক নয়।

খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী বৎসরে প্রাপ্ত পুস্তকের রিপোর্ট লেখেন। এটি তাঁর প্রথম রিপোর্ট। শেষ রিপোর্ট তিনি লিখেছেন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বইয়ের উপরে। এই কয় বছরের সরকারী রিপোর্ট থেকে দেখা যায় চন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-রচনার গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় পূর্ব হতেই ছিল। ১৮৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি কিশোর রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের বার্ষিক সভায় কবিতা আবৃত্তি করবার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন।[৩]

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের কোনো বই বের হয় নি। পরবর্তী বৎসরে প্রকাশিত 'বনফুল' চন্দ্রনাথ বসুর রিপোর্টে স্থান পায় নি। ঐ বছর বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল', হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছায়াময়ী', রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাঞ্চীকাবেরী' এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'ফুলবালা' প্রকাশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে কিশোর কবির প্রথম রচিত কাব্যগ্রন্থ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পাওয়া গেল চারটি বই— 'ভগ্নহৃদয়' 'রুদ্রচণ্ড' 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'। এই বছরের রিপোর্টে প্রত্যেকটি বই সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে। 'রুদ্রচণ্ড'কে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠ নাটকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পৃথ্বীরাজের সংগ্রাম বাঙালী কবি ও ঔপন্যাসিকের প্রিয় বিষয়। 'রুদ্রচণ্ডে' স্বাদেশিকতার ভাবোচ্ছ্বাস নেই ; ঘৃণা ও প্রতিহিংসায় অন্ধ একটি মনের কুটিল গতি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে উন্মোচিত করা হয়েছে। "The best work coming under this head [drama] was a small tragedy by Baboo Rabindra Nath Tagore, entitled 'Rudrachanda'. . . . But the work under notice is not written in a spirit of sentimental patriotism. One of its principal objects is to describe the workings of a mind completely possessed by feelings of hatred and vindictiveness on account of personal wrongs ; and this object has been accomplished with remarkable success."

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অস্পষ্টতার অভিযোগ অনেক উঠেছে। সরকারী রিপোর্টে কিন্তু সমকালীন কবিদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের রচনা স্পষ্টতর ও অধিকতর জীবনঘনিষ্ঠ বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

'ভগ্নহৃদয়' সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসু রিপোর্টে বলেছেন— "Vagueness is one of the principal characteristics of modern Bengali poetry. The Bengali poet's pictures of men and things are hazy and inaccurate. His men and women do not seem to be made of flesh and blood and bone ; they have no clear outline or definite movement ; they move as a mist in which it is hard to discern a true or living form. To certain poems which appeared last year this criticism, however, does not apply ; the chief among them being 'Bhagnahridaya' by Baboo Rabindra Nath Tagore. It is a love poem, like all those belonging to the school of Bengali poetry, of which Baboo Rabindra Nath is a leading representative. But the characters introduced in it look like real living beings, with mental and bodily features that may be clearly

৩ রবীন্দ্রজীবনী ১ম (১৩৫৩) পৃ ৫৪

distinguished. The poetry of this school deals with realities, though of sentimental kind ; and treats them in a fitting spirit and style."

'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র'কে রিপোর্ট-লেখক বৎসরের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী বলতে পারেন নি। চন্দ্রনাথ বসুর মতে রামকুমার ভট্টাচার্যের 'আসাম-ভ্রমণ' ঐ বছরের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী। রবীন্দ্রনাথ বল-নাচ, থিয়েটার, গানের মজলিস, পার্টি ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন ; ভ্রমণকাহিনীতে যে-সব মূল্যবান তথ্য জানবার আশা পাঠকরা করেন 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে' তা নেই। সুতরাং এটি "not so valuable a work as Baboo Ramkumar's book…". তথাপি 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে'র কিছু গুণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে : "But, although very far from possessing the best features of a book of travels, Baboo Rabindra Nath's work gives ample evidence of descriptive power and capacity for observation, combined with a talent for humorous and caustic writing which is rare among Bengali authors."

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম সংস্করণে লেখকের নাম ছাপা হয় নি। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডের সম্পাদকীয় টীকায় বলা হয়েছে: "ইহা ১৮০২ শকের ফাল্গুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়, সম্ভবতঃ বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষে অভিনীত গীতিনাট্যটির প্রোগ্রাম-হিসাবে।…আন্দাজ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম অভিনয় হয়। পুস্তকটিও এই দিনে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।" শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন: "বিদ্বজ্জনসমাগম সভা উপলক্ষে উহার প্রথম প্রকাশ ও অভিনয় হয়।"[৪]

ড. সুকুমার সেন দেখিয়েছেন, শনিবার ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম অভিনয় হয়েছিল।[৫] কিন্তু বইটির প্রথম প্রকাশের তারিখ ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১।[৬] সুতরাং 'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয়ের আগেই বেরিয়েছে এবং শুধু যে অনুষ্ঠানপত্র হিসাবে নয়, পৃথক বই হিসাবেই এর অস্তিত্ব ছিল এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি কারণে। সরকারী দলিলে প্রথম সংস্করণের লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই। সেখানে লেখক ও বইয়ের স্বত্বাধিকারী হিসাবে নাম আছে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। এটা সরকারী দপ্তরের ভুল নয়। আইন অনুসারে প্রকাশককে বই সম্বন্ধে সকল তথ্য লিখে পেশ করতে হয়। প্রকাশক ছিলেন প্রসন্নকুমার বিশ্বাস। বিদ্বজ্জন সমাগম সভার প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম লেখকরূপে দেওয়া অসম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের নাম ছাপা না হওয়ায় এই ভুল করা আরও সহজ ছিল। কিন্তু চন্দ্রনাথ বসুর মতো প্রতিষ্ঠাপন্ন তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে পরিচিত থাকা সত্ত্বেও 'বাল্মীকি-প্রতিভা' প্রকাশ ও অভিনয়ের বছরখানেক পরেও প্রকৃত লেখকের সন্ধান পান নি। তিনি রিপোর্টে বলেছেন: "Valmiki Prativa by Baboo Dwijendra Nath Tagore was an exceedingly good opera published during the year under review [1881]."

৪ রবীন্দ্রজীবনী ১ম (১৩৫৩) পৃ ৮৮

৫ রবীন্দ্রজীবনী ১ম, ১নং পাদটীকা।

৬ বাংলা ১২৮৭ ফাল্গুন ২ শনিবার।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'বউঠাকুরানীর হাট' 'কালমৃগয়া' ও 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'—এই তিনটি বই বের হয়। কিন্তু এ বছরের রিপোর্টে একমাত্র 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের'ই দীর্ঘ সমালোচনা করা হয়। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতকে' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। চন্দ্রনাথ বসু রিপোর্টে লিখছেন: "But by far the best poetical work of the year—indeed one of the best poems yet written in Bengali—was Babu Rabindra Nath Tagore's Sandhya Sangit, a volume of love poems. The source of those poems lies deep within the author's heart. The sentiments to which he gives expression do not, therefore, seem to be empty or affected, but appear thoroughly genuine. They possess a strength, a fire as of a living and burning thing, and a vitality, which cannot possibly belong to a thing that is counterfeit. These bold, earnest and glowing expressions of a deeply felt sentiment are adorned with a wealth of imagery and cast in a mould of many coloured fancy which mark the author as a true poet, and one who, though very young, ought to be placed in the front rank of living Bengali poets."

এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পরে চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অস্পষ্টতার মৃদু অভিযোগ এনেছেন: "It should be observed, however, with reference to Babu Rabindra Nath's poetry, that it is of that abstract and impersonal type which cannot be always easily penetrated, and which, as in the case of Shelley's poetry, is often considered to be rather mystical. The subject of such poetry is not love in a concrete form, or love as existing between individual lovers in a story, such as is described by the older poets both here and in England, but mere forms or modes of the sentiment of love dissociated as much as possible from all individualising circumstances of time, place and personality. . . . Babu Rabindra Nath's poetry, however good and pure in itself, may be therefore expected to give rise to an objectionable school of imitators and interpreters in this country."

'কালমৃগয়া'র মধ্যে চন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছেন "much artistic power and skill". 'বউঠাকুরানীর হাট'কে খুব সার্থক উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। রিপোর্টে এই উপন্যাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"Though not very successful, was much better than most Bengali novels are."

'বিবিধ প্রসঙ্গ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধপুস্তক। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য রিপোর্ট-লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি। রিপোর্টে এ বই সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে—"Written with great cleverness and in a distinctly original vein. Babu Rabindra Nath is not always sound, but his shrewdness, his ingenuity, his wit, his thoughts cast in a mould of playful fancy, his occasional flashes of genius, make him out as a unique and independent figure in Bengali literature. His style is also as unique as his

matter and manner. It is a poetical and figurative style, with an element of quaint humour in it which seems traceable to a strong and somewhat queer individuality."

'প্রভাতসঙ্গীতে' রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান। এর বেশি কিছু রিপোর্টে এ বই সম্বন্ধে বলা হয় নি। আগের বছরের রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথের অনুকারী কবিদের হয়ত শিগগিরই দেখা যাবে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। সফল করেছিল সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের 'ঝঙ্কার'। এটি বোধ হয় রবীন্দ্রকাব্যের অনুকারী প্রথম বই।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে অন্তঃসারশূন্য সমকালীন বাংলা কবিতার সঙ্গে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের তুলনা করা হয়েছে: "Verbose and bombastic in expression, that poetry is utterly hollow and unsubstantial, and the only idea it conveys is that they who write this poetry are mere literary mountebanks who want only to draw attention to themselves, or idle blusterer who make a noise, for the sake of noise, and not from depth or truth of thought, feeling, or character. And in this respect ordinary educated Bengali of the present time, a noisy young man who affects to know everything and to be possessed of the highest character, but who in reality knows nothing and possesses no character."

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা নতুন স্বর এনেছে। তাঁর কাব্যে আছে প্রাণের স্পর্শ। "There is, however, in Bengali literature poetry of a far higher kind than this, genuine poetry proceeding from genuine thought and feeling. There was enough of such higher poetry in Babu Rabindra Nath Thakur's Chhabi O Gan . . . in which sentiments of the deepest and most delicate kind is expressed in a more concrete or realistic form than it is in any of the author's previous poems."

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র আলোচনা প্রসঙ্গে রিপোর্ট-লেখক মন্তব্য করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিদের রচনার তুলনামূলক বিচার করে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা কঠিন। "The sentiment of love is expressed in these sonnets in forms which are at once so deep, delicate, fine, fervid, and in verses so full of the luxuriance of music and melody that it is difficult to decide who is the better sonneteer, the imitator Bhanusinha Thakur, or his model the great Baisnaba poet."

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সমালোচনা করা হয়েছে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটিকার। বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করবার পর প্রশ্ন করা হয়েছে যে সন্ন্যাসীর মানসিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে নাটক গড়ে উঠতে পারে কি না। "It may be questioned whether a purely mental struggle can be a fit subject for dramatic composition. But there can be no doubt that it may be made the subject of the best and highest poetry. The description of the mental struggle in this book is in the highest degree poetical, and the manner in which its different stages are proportioned to each other is really dramatic. The mind of the ascetic

in all its phases is one of the noblest creations of poetry in Bengali literature, and there are . . . passages of remarkable power, beauty, and grandeur."

'নলিনী' সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে : "a creation of inexpressible tenderness."

'আলোচনা' রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গদ্য গ্রন্থ। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ এ বই অস্বীকার করলেও রিপোর্ট-লেখক হিসাবে চন্দ্রনাথের উৎসাহ কম ছিল না। 'আলোচনা' সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : " . . . written in a style half poetic, half discursive, was one of the best Bengali books received in the year. The topics dwelt upon are of the meditative order, and they are handled in the singularly witty and original style of the author."

চন্দ্রনাথ বসুর লেখা এটিই শেষ রিপোর্ট। এর পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। তাঁর প্রথম রিপোর্ট ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের বইয়ের উপরে। ঐ বছর রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হয়। 'কড়ি ও কোমল'কে হরপ্রসাদ ঐ বছরের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলতে পারেন নি। তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন রাম শর্মা। হরপ্রসাদ 'কড়ি ও কোমল' সম্বন্ধে বলেছেন : "It is not possible to leave the subject of poetry for the year 1886 without saying something about that excellent collection of sonnets and humorous pieces entiled 'Kari O Komal'. . . . Though not one of his best works, it has still all the impress of his genius. The melody of his verses, and the Shelley-like idealism of his sentiments often remind the reader of his Prabhat Sangit. In 'Kari O Komal' Babu Rabindra Nath Tagore has perhaps for the first time descended occasionally from the lofty ethereal region of idealism to handle subjects of a realistic and more terrestrial nature, and his epistle to Damu and Chamu shows that he has an excellent vein for satire."

পর বৎসরের রিপোর্টে হরপ্রসাদ 'রাজর্ষি' সম্বন্ধে বলেন : "Though the closing portion of the work appears to have been rather hastily written, contains touches of genuine poetical feeling. The death of Dhruba's sister is described with much pathos."

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' এবং অন্যান্য অনেক নাট্যকারের বাস্তবানুগ নাটকের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের নাটক কল্পলোকের কাহিনী— এই মন্তব্য করা হয়েছে 'মায়ার খেলা' সম্পর্কে। তবে এই গীতিনাট্যের একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তা হল এই : "The fairy beings, named Maya Kumaris, introduced for the first time into the Bengali drama in imitation of similar beings in Shakespeare, appear on the stage in every scene, and direct that action of the play like the witches in Macbeth."

কিন্তু 'রাজা ও রানী' অন্য শ্রেণীর নাটক। এ নাটকে বাস্তবতার স্পর্শ পাওয়া যায়। তাই 'রাজা ও রানী' সম্বন্ধে বলা হয়েছে : "Raja O Rani has more flesh and blood, more circumstance and detail, than the previous works of Babu Ravindra Nath, and the interest is

sustained throughout. With the increase of age and experience, Ravindra Babu's works are becoming replete with human interest. His dramas when performed before a select audience by the members of his own family produce a powerful effect, but they are generally meant for the cultured few."

হরপ্রসাদের ধারণা ছিল যে সকলে রবীন্দ্রনাথের নাটক বুঝতে পারবে না— এই আশঙ্কায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটকের অভিনয় হয় না।

'বিসর্জন' নাটকের মধ্যে হরপ্রসাদ একটি উদ্দেশ্য দেখতে পেয়েছেন। পৌত্তলিকতা অপেক্ষা ব্রাহ্ম মতবাদ যে অধিকতর সত্য তা দেখাবার জন্য এই নাটক লেখা হয়েছে। "Bisarjan is written with consummate art. In this work the Babu [Rabindranath] has dramatized the first few, that is, the best chapters of his well-known novel, the Rajarshi ; but the plot of the drama is a great improvement upon that of the novel. . . . The book is designed to prove the truth of Brahmoism as opposed to idolatry, and the writer has attempted to show this with great cleverness."

'মানসী' ও কামিনী (সেন) রায়ের 'নির্মাল্য'কে হরপ্রসাদ পৃথক করে দেখতে পারেন নি। দুটি কাব্যগ্রন্থের মূল্যই তাঁর কাছে সমান ছিল। হরপ্রসাদ তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন: "Nirmalya by Miss Kamini Sen and Manasi by Babu Ravindranath Tagore, are two collections of occasional pieces by two distinguished poets of Bengal. They are on a par as regards melody of versification, sweetness of language and purity and depth of sentiment."

পরের বছরের রিপোর্টে দেখা যায় হরপ্রসাদ 'চিত্রাঙ্গদা' অপেক্ষা 'গোড়ায় গলদ' কৌতুক-নাটকটির অনেক বেশি প্রশংসা করেছেন। "The oddities and eccentricities of educated Bengalis is the theme of the work (Goday Galad). . . .This produces infinite amusement, and the author, with a cleverness and dexterity which is his own, takes advantage of every opportunity of entertaining his audience."

'চিত্রাঙ্গদা' হল "a love story of great merit"। এই কাব্য-নাটকে লেখক দেখিয়েছেন জীবনে মাত্র একবার প্রেমের আবির্ভাব ঘটে এবং তখনই সে রূপের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

'য়ুরোপযাত্রীর পত্রে'র একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের কথা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে; সেটি হল এর রচনাশৈলী—"Charmingly melodious prose".

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র পরলোক গমন করেন। কথাসাহিত্যিক হিসাবে বঙ্কিমের পরেই নাম করতে হয় রমেশচন্দ্র দত্ত ও রবীন্দ্রনাথের। হরপ্রসাদ রমেশচন্দ্রের নতুন উপন্যাস 'সমাজে' রিফর্ম-মুভমেন্টের সমর্থন দেখেছেন। ঐ বছরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'ছোটগল্প'ও নব-আন্দোলনের সমর্থক। "Chhotagalpa is a collection of small but very touching stories. . . . It is also written in support of the same movement (Reform). Some of these stories will be enjoyed by the orthodox and the non-orthodox community alike."

'সোনার তরী'কেও হরপ্রসাদ সমকালীন বাংলা কাব্যের উর্ধ্বে স্থান দিতে পারেন নি। "The Sonar Tari by Babu Ravindra Nath Tagore, the Pradipa by Babu Akshay Kumar Baral, the Pratidhwani by Shrimati Mrinalini are miscellanies of more than average merit."

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত হরপ্রসাদ বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্ট লিখেছেন রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী। রবীন্দ্রনাথের 'কথাচতুষ্টয়' ও প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা-কাহিনী 'দারোগার দপ্তর'কে একই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে ঐ বছরের রিপোর্টে। অর্থাৎ, এই দুটি বই-ই বাস্তব জীবনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। মনোহারিত্বের কারণ রয়েছে গল্প বলবার ভঙ্গীর মধ্যে। "Ravindra Nath has formed his style on an English model, and there is a freedom and a raciness about it which are quite charming. No other Bengali author can boast of a style so happy, so flowing and so characteristic as his."

পর বৎসরের রিপোর্টে 'চিত্রা' সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "...remarkable for freshness of imagery and richness of fancy. Descriptive pieces generally, and those describing village life in Bengal specially, are exquisitely beautiful."

'কাব্যগ্রন্থাবলী' প্রকাশের পরে সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার উপর মন্তব্য করবার সুযোগ পাওয়া গেল। রিপোর্ট-লেখক বলছেন, রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় সমকালীন বাঙালী কবিদের অগ্রণী। তাঁর অনেক কবিতায় "dreamy vagueness" থাকলেও তিনি স্বদেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন "a rich harvest of enjoyable and melodious verse."

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে শুধু 'পঞ্চভূতের' আলোচনা আছে। এ বই লেখা হয়েছে "in the author's well-known playful style, and is full of observations which bespeak a thoughtful mind, cultured taste, and a varied experience of men and things."

এর পরের রিপোর্টে রবীন্দ্রনাথের কোনো বইয়ের আলোচনা নেই। উপরে আমরা যে কয় বছরের রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের সব বইয়ের আলোচনা করা হয় নি। সমকালীন সমালোচনা হিসাবে রিপোর্টের মন্তব্যগুলির কিছু মূল্য আছে। এই-সব মন্তব্য সরকারী রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত বলে এদের কমবেশি গুরুত্বও আছে। চন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের রচনা সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য করেছেন তা থেকে তাঁর গভীর রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় সভা জাতীয় স্বার্থ ও সংহতি -রক্ষায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

প্রতিষ্ঠা অবধি ভারতবর্ষীয় সভা তুইটি মৌলিক বিষয়ের দিকে অবহিত হন। শাসনে ভারতবাসীর অধিকার লাভ করিতে হইলে আইন বা ব্যবস্থাপক সভাকে প্রতিনিধিমূলক করিতে হইবে। ইহার প্রাথমিক ধাপ স্বরূপ প্রথমে মনোনয়ন এবং পরে নির্বাচন -দ্বারা ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। দ্বিতীয় মৌলিক বিষয়টি হইল শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনে ভারতবাসীর অংশ গ্রহণ। ইহা তখনই সম্ভব যখন সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় ভারত সন্তানেরা ইংরেজদের মত যোগ দিতে সমর্থ হইবেন। ইহারও প্রথম ধাপ স্বরূপ সভা প্রস্তাব করিলেন যে, লণ্ডনে যেরূপ সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গৃহীত হয় ভারতবর্ষেও তেমনি তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরে অর্থাৎ কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ইহা গ্রহণ করা হোক। সভার তুইটি প্রস্তাবই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কার্যে পরিণত করিতে ঐ সময় অস্বীকৃত হন। ইহার ফল কিরূপ বিষময় হয় একটু পরেই আমরা দেখিতে পাইব। সভা কিন্তু এ তুইটি বিষয়ে আন্দোলন পরিচালনা করিতে কখন বিরত হন নাই।

পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে যেমন দায়িত্বশীল সরকার-বিরোধী দল থাকেন ভারতবর্ষীয় সভা নূতন সনন্দ অনুযায়ী আইন বা ব্যবস্থা পরিষদ স্থাপিত হইলে বাহির হইতে বে-সরকারী ভাবে অনুরূপ দায়িত্বশীল বিরোধী দলের মত কার্য করিতে থাকেন। আইন পরিষদে যে সব বিল বা আইনের খসড়া উপস্থাপিত হইত সে সম্বন্ধে তাঁহারা নিজ মতামত ব্যক্ত করিতেন। প্রস্তাবিত আইনগুলির কল্যাণমূলক অংশ যেমন তাঁহারা সমর্থন করিতেন তেমনি জাতীয় স্বার্থ ও সংহতির হানিকর বিষয়গুলির তীব্র সমালোচনা করিতেও ছাড়িতেন না। মধ্যে মধ্যে জাতির হিতকর কোন কোন প্রস্তাব করিয়াও তাঁহারা আইন পরিষদে পাঠাইতেন। আইন পরিষদ সে সমুদয় একেবারে অগ্রাহ্য করিতেন না। কোন কোনটি গ্রহণ করিয়া সভার মতামতের উপর গুরুত্বই আরোপ করিতেন। ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলীর মধ্যে ইহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। পৌরসভা, সংস্কৃত শিক্ষা, পাশ্চাত্য শিক্ষা, শিল্প-ব্যবসায় ও যৌথ কারবার সংক্রান্ত আইন, সমাজকল্যাণমূলক অথচ আর্থিক লাভ ক্ষতি মুক্ত উদ্যোগ, বিচার আদালত সংস্কার, দেওয়ানী ও ফৌজদারী-বিধি প্রণয়ন, সুপ্রিম কোর্ট ও নিজামত আদালতগুলি মিলাইয়া হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু বিষয়ে ভারতবর্ষীয় সভা গঠনমূলক অভিমত প্রকাশ করেন।

আইন পরিষদ ১৮৫৭ সনের প্রথমেই এমন একটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন যাহার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় সভার সম্পূর্ণ সায় ছিল। বহুকাল পোষিত গুরুতর বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অপসারণকল্পে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং আইনসভার সদস্য সার বার্নেস্ পীকক ব্যবস্থাপক সভায় একটি আইনের খসড়া উপস্থাপিত করেন। ইহার মর্ম এই ছিল যে, মফস্বলের ফৌজদারি বিচারালয়ে ভারতবাসীদের ন্যায় ইংরেজদেরও সমভাবে বিচার হইতে পারিবে। এ সম্বন্ধে এখানে একটু বিশেষ করিয়া বলা দরকার। পূর্বে স্থানীয় ইংরেজদের দেওয়ানী ও ফৌজদারি সবরকম বিষয়েরই বিচার হইত একমাত্র কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্টকে তখন 'কিংস্ কোর্ট' বলা হইত। মফস্বলের বিচার আদালতগুলিকে বলা হইত 'কোম্পানিস্ কোর্ট'। শেষোক্ত আদালতগুলির পক্ষে ইংরেজদের কোন রকম বিচার করিবার অধিকার ছিল না। টমাস্ বেবিংটন

মেকলে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য একটি আইনের খসড়া প্রচার করেন। ইহাতে তখন ইউরোপীয় মহলে খুবই আলোড়ন উপস্থিত হয়। তাহারা ঐ সময়েই ইহাকে 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' নামে অভিহিত করে। মেকলে আইনটি সম্পূর্ণ বর্জন না করিয়া মফস্বলের দেওয়ানী আদালতগুলিকে ইউরোপীয়দের বিচারের ক্ষমতা দিয়া যায়। ১৮৪৯-৫০ সালে তৎকালীন আইন সচিব বেথুন সাহেব কোম্পানির মফস্বলস্থ ফৌজদারি আদালতগুলিকে ইউরোপীয়দের বিচারের ক্ষমতা অর্পণের নিমিত্ত কতকগুলি আইনের খসড়া প্রণয়ন করিয়া প্রচার করেন। তখন পুনরায় আন্দোলন উপস্থিত হইল। ইউরোপীয়েরা এই সময় খুবই প্রভাবশালী হইয়া ওঠে। তাহাদের আন্দোলন এরূপ প্রবল আকার ধারণ করে যে বেথুন এগুলি অবিলম্বে প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। এই সময়ও ইউরোপীয়েরা এই আইনগুলিকে 'ব্ল্যাক অ্যাক্টস্' নামে আখ্যাত করে। বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়াই চলিল। তাহারা মফস্বলে নীল ও অন্যান্য শিল্পের জন্য বিস্তর ভূসম্পত্তি ক্রয় করে। তাহাদের বিচারের ক্ষমতা ফৌজদারি আদালতগুলির না থাকায় ইউরোপীয়দের অত্যাচার উৎপীড়ন চরমে উঠিল। খুনখারাপী করিয়াও দেশের মধ্যে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করিতে তাহাদের পক্ষে কোনোরূপ বাধা হইল না। প্রজাসকল তখন ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িতে থাকে। এই সকল অনাচারের কাহিনী ভারতীয় নেতারা কেহ কেহ, যেমন রামগোপাল ঘোষ, পূর্বেই পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া শিক্ষিত সমাজের গোচরে আনিয়াছিলেন। দেশীয়—বাঙলা ও ইংরাজী সংবাদপত্রগুলিতে ইউরোপীয়দের উপদ্রবের কাহিনী প্রায়ই বাহির হইতে থাকে। এই প্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি। ভারতবর্ষীয় আইনসভায় ইহার মূলীভূত কারণগুলি দূর করিবার জন্যই বিচারপতি পীকক ঐরূপ একটি খসড়া আইন পেশ করিয়াছিলেন। উহার মূল কথা ছিল মফস্বলের দেওয়ানি আদালতগুলির মত ফৌজদারি বিচারালয়গুলিকেও ইংরেজদের (British-born European subjects) অপরাধের বিচার করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দান।

খসড়াটি আইন পরিষদে উপস্থাপিত হইবার পর ইউরোপীয় মহলে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এবারে তাহারা যেরূপ জোট বাঁধে এমনটি পূর্বে কখন দেখা যায় নাই। ইংরেজ নীলকরদের সভা কলিকাতায় অবস্থিত। অপরাপর ইউরোপীয় শিল্প-ব্যবসায় সংক্রান্ত সংঘও এখানে বিদ্যমান। ইউরোপীয়দের মুখপত্র ইংরেজ সম্পাদিত দৈনিক সংবাদপত্রগুলি প্রবল প্রতাপান্বিত। এরূপ অবস্থায় খসড়া আইনটির বিরুদ্ধে তাহাদের আন্দোলন যে নিরতিশয় তীব্র হইয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি। 'নেটিভ'—কালা আদমীদের বিরুদ্ধে যেন সাজ সাজ রব। ১৮৫৭, ১৪ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতাস্থ টাউন-হলে ইউরোপীয়দের বিরাট সভা হইল প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে। বক্তারা বাঙালিদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিল। মফস্বলের বিচার আদালতগুলি যে নানা দোষে দুষ্ট এবং ত্রুটিপূর্ণ তাহা বলিতে গিয়া বাঙালিদের চরিত্রের উপরও অযথা তীব্র কটাক্ষ করা হইল। প্রস্তাবিত আইনের অপেক্ষা নব্য শিক্ষিত বাঙালি তথা ভারতবাসীরাই ইউরোপীয়দের অধিকতর লক্ষীভূত, সুতরাং তাহাদের উপরই ইহারা অযথা গালিগালাজ বর্ষণ করে। ইহার একটি কারণও ঐ সময় অনুমিত হইয়াছিল। বাঙালিরা নব্যশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পাশ্চাত্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় এবং শাসন ও বিচারে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ দেশী বিদেশী নির্বিশেষে সমান অধিকার দাবী করিতে থাকেন, ইহা ইউরোপীয়দের একেবারে অসহ্য হইয়া উঠে। উপরন্তু শাসকজাতির অঙ্গীভূত বলিয়া ইংরেজগণ নিজেদের বহুকাল পোষিত অন্যায় অধিকারগুলির বিন্দুমাত্র অপহ্নব

ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিলে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিত। তাহাদের জাতিগত ঔদ্ধত্য সম্পর্কে নব্যশিক্ষিত বাঙালিরা সংবাদপত্রে বিশেষ সমালোচনা করিতে থাকায় ইংরেজদের আক্রোশ আরও বাড়িয়া যায়। এবারে যখন শাসক ইংরেজ এবং শাসিত ভারতবাসীর মধ্যে বিচার সাম্যের কথা উঠিল তখন তাহারা কিরূপে নিরস্ত থাকিবে? আইনটি উপলক্ষ মাত্র, শিক্ষিত বাঙালিরাই হইল তাহাদের লক্ষ্য।

ভারতবর্ষীয় সভা নব্যশিক্ষিত বাঙালি তথা ভারতবাসীর একমাত্র জাতীয় সভা, নবজাগ্রত জাতীয়তার প্রতীক। সভার কর্তৃপক্ষ, পূর্বেই বলিয়াছি, কল্যাণমূলক সরকারী প্রস্তাবসমূহকে আন্তরিকভাবে বরাবর সমর্থন করিতেন। এবারেও বহুদিন প্রচলিত অন্যায়ের প্রতিকার এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে আইনপরিষদে যে খসড়াটি উপস্থাপিত হয় তাহাতে তাঁহারা উৎফুল্ল না হইয়া পারেন নাই। ইউরোপীয়দের অন্যায় প্রতিবাদের বিরুদ্ধে এবং প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে তাঁহারাও টাউন হলে ৬ই এপ্রিল, ১৮৫৭ তারিখে একটি জনসভার আয়োজন করিলেন। মফস্বলের ফৌজদারি আদালতগুলি ইংরেজ অপরাধীদের বিচারে অসমর্থ থাকায় তাহাদের অপরাধপ্রবণতা কিরূপ বাড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশাও কত চরমে ওঠে তাহা শিক্ষিত বাঙালিদের অজানা ছিল না। উক্ত সভায় উত্থাপিত বিবিধ প্রস্তাবের মধ্যে তাহার উল্লেখ করা হয় এবং বিভিন্ন বক্তা বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা প্রমাণ করিয়া দেন। রাজা রাধাকান্ত দেব ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতি। আয়োজিত জনসভায় অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারিয়া তিনি যে পত্রখানি দেন তাহাতে মফস্বলের ফৌজদারি আদালতগুলির বিচারে অক্ষমতা হেতু ইউরোপীয়দের অনাচার কতখানি বাড়িয়া যায় তাহা বিবৃত করেন এবং এই আইনটিকে ইউরোপীয়দের কথিত 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' বা 'কালো আইনের' পরিবর্তে 'হোয়াইট এ্যাক্ট' বা 'শুভ্র আইন' বলিয়া অভিনন্দন জানান। এই পত্রখানি নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল—

My dear brother,

In reply to your kind letter of yesterday, requesting me to take the chair at the meeting to be held this afternoon, I regret to inform you that my ill-health will not permit me to accept the honor. I embrace this opportunity however, to make the following remarks on the momentous question to be discussed on the occasion. Should you deem it worthwhile to read them before the meeting, you are at liberty to do so.

The object of our meeting is to consider the propriety of supporting that portion of the draft of a law now before the Legislative Council of India, which refers to the extension of the Criminal Jurisdiction of the mofussil Courts to all classes of Her Majesty's subjects without respect of religion, race or place of birth.

The Penal Code of India with reference to the jurisdiction of the Company's Criminal Courts, as it now exists, is of a most objectionable character. It would not, I believe, be irrelevant to state here its principal features.

1st. Natives and all Europeans not British subjects are amenable to the authority of the Magistrates and Sessions Courts within whose jurisdiction they are apprehended and broght to trial. But European British subjects, for all acts of a criminal nature, are amenable only to Her Majesty's Courts and exempted from the jurisdiction of the Local Authorities in the administration of the Penal enactments of the Government of India 53 Geo. III Cap. Sec. 2 Cl. 1—ceded Prov. Reg. VI 1803, Sec. 19, Cl. 1 and Court No. 1296.

2nd. In the event of any charges being preferred against European British subjects which may render them liable to a criminal prosecution in Her Majesty's Courts, the process is so circuitous dilatory expensive, and productive of such infinite inconvenience and trouble to the prosecutors and witnesses, specially if they belong to the class of poor riots and cultivators that they (the European British subjects) are virtually allowed to commit crimes of the most heinous nature with impunity.

3rd. There are some petty offences for which indeed a European British subject can be tried by a mofussil Magistrate, but convictions in such cases are removable by Writ of certiorari into the Supreme Court 53 Geo. III. Cap. 155, Sec. 205.

4th. So great is the privilege of a European British subject that if a native happily happen to be a brother fellon with him, the Magistrate will not be able to try him (the native) without a reference to the Nizamat C.O. No. 29. Vol. I.

5th. The Magisterial authorities have not even the power to interrogate a European British subject brought before them for any alleged offence upon matters charged against them, C.O. No. 99 of Vol. 3rd.

Such are some of the odious features of a law unworthy of the enlightened principles of the liberal Government of one of the most civilized nations in the world, which the proposed humane enactment intends to obliterate from the Penal Code.

It is indeed strange that the British Legislature should have delayed so long to pass a law founded upon the broadest principles of justice and humanity but stranger still that many of the British inhabitants of India should protest against the enactment and stigmatize it by christening it "The Black Act."

The law proposed would strike at the foundation of this inhuman principle.

Far from deserving the epithet of "the Black Act"—I would call it "the White Act," it should be compared to the sun in his meridian splendour, shedding the refulgent beams of justice on all classes of people equally, and dim indeed are their eyes with prejudice who cannot behold its genuine nature. A celebrated Persian Poet has aptly said:—

"If his eyes cannot see in the day
What fault is there in the rays on the sun."

"Desirst thou the Truth? It is better that a thousand eyes were thus blind, than the sun dark.'

There needs no argument to prove the necessity of a law dictating that justice should be administered without distinction of creed, colour or caste. Our most cordial and grateful thanks are due to the Hon'ble Mr. Peacock, for his having wisely and with a feeling of noble disinterestedness framed an act which proposes to render the administration of justice uniform to the British subjects of India at large. But as there are always two sides of a question, we should examine the sum total of the objections raised against the passing of the Act by oppositionists, it is no other than the standing imperfections of the Mofussil Courts.

I admit there are many serious defects in the constitution of these Courts, and I have all along both privately and publicly expressed this my opinion, but these should not in any wise interfere with the question at issue, which is simply this. Whether there should be one Penal Code for the Whites, another for the Blacks? One for the Christians and another for the Heathens? What unbiassed individual would not answer in the negative? What man of common sense would not see the injustice of a Saheb maltreating a poor native in the mofussil, under the most aggravating circumstances, and going unpunished owing to the difficulties of a prosecution in the Supreme Court? Who would not—if a stranger . . . . ১ of justice that, whilst a native is amenable to the local court both in Civil and Criminal cases a European British Subject . . . . ১ tried there only, in matters of civil controversy and would be penalty liable to the jurisdiction of Her Majesty's Courts?

The defects of the mofussil courts should certainly be enquired into, and corrected . . . ১ the Legislature but because not . . . ১ reformed, it is no reason that justice should . . . ১ to assume a mild form for the conquering and a harsh one for the conquered race.

It is indeed a mistaken notion of those, who suppose the amalgamation of the

Supreme and Sudder Courts would degrade the former and aggrandize the latter. The consolidated tribunal would inevitably be endowed with double the Power that each separately possesses: Local knowledge of the interior, a practical acquaintance with the manners and customs of the people and a due comprehension of zemindary affair and records would be combined with profound legal love and judicial acumen mutual error would be corrected and uniform justice would be dealt out. Union is power holds good in this as in other cases, it will be exemplified in this as it has lately been done on the shores of the Euxine.

Under these circumstances we would pray for the immediate promulgation of this salutary luminous and "White Act", and only suggest that the new Tribunal should be made none independent of the Government that it is intended to be made.

I beg our fellow British subject will not regard our proceedings with a hostile feeling ; it is not our wish that they should in any respect suffer ; all that we look for, is that justice should be dispensed with an even hand to all classes of Her Majesty's subjects. I shall not trouble you further, but conclude with wishing you every success in your laudable exertions, and subscribe myself.

Calcutta, Your obedient servant,
April 6, 1857. RADHAKANT [২]

পত্রখানিতে রাধাকান্তের প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম সুপরিস্ফুট, অথচ ইহাতে জাতিবিদ্বেষ বা জাতিবৈরিতার লেশমাত্র নাই। ইংরেজেরা এ দেশেরই প্রজা, তাহাদের অপরাধের বিচার-ক্ষমতা মফস্বলের আদালতগুলির থাকিবে না— বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহার ত্রুটি লক্ষ না করিয়া পারেন না। রাধাকান্ত দফাওয়ারী ভাবে মফস্বল আদালতগুলির পক্ষে ইংরেজদের কার্যকর বিচারক্ষমতা যে প্রকৃত প্রস্তাবে নাই তাহাই পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। ইংরেজগণ প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে নানারকম আপত্তি তুলিয়াছেন, রাধাকান্ত ইহার অযৌক্তিকতা খণ্ডন করিতে সভাকে এই পত্রে অনুরোধ জানান। মফস্বলের আদালতগুলির সংশোধন ও সংস্কার যে আবশ্যক তাহা কেহই অস্বীকার করেন না; তার জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ইংরেজ-ভারতবাসী সকল প্রজারই যে একই রূপ বিচার হওয়া আবশ্যক সে সম্বন্ধেও দ্বিমত থাকা উচিত নয়। কথা উঠিয়াছে সুপ্রিম কোর্ট ও সদর আদালতগুলি মিলিত হইলে প্রথমটির অপকর্ষ এবং অপরগুলির ক্ষমতাধিক্য ঘটিবে— ইহা কেমন করিয়া বলা যায়? উভয় প্রকার উচ্চ আদালত সম্মিলিত হইয়া শহর মফস্বল সকল শ্রেণীর প্রজার অবস্থা দৃষ্টে সুবিচার হওয়া সম্ভব হইবে। রাধাকান্তলিখিত মূল বিষয়টি যে যুক্তিসিদ্ধ তাহা বিখ্যাত পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফের নিম্নোধৃত পত্রখানি হইতেও সপ্রমাণ হয়। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ইউরোপীয় পাদ্রীগণ জনসাধারণের হিতকর কার্যে ও উন্নতিপ্রচেষ্টায় সবিশেষ তৎপর ছিলেন। ডাফের পত্রখানি এই—

My dear Sir,

You have asked my opinion of the proposal to render British born subjects amenable to the mofussil courts. I have no hesitation in replying that I have always approved of such a measure, wisely and properly executed,—as equitable in itself and accordant with the broadest views of enlightened general policy. If objections have not been unfairly raised against the present constitution of the mofussil courts, the modes of procedure, the Codes of Civil and Criminal Law administered, and the qualification of the Judges—then clearly the true, statesmanlike and philanthropic remedy should consist not in retaining the machinery of justices now so loudly complained of, but in improving and elevating that imperfect machinery into an effective instrument of impartial justice alike to natives and Europeans, who are now equally subjects of the British Crown. In order, however, to bring about and insure the fruits of a reform so glorious the intellectual and above all the moral education of the people ought to be pressed with tenfold earnestness not only by the Government, but by the landholders and wealthier classes of every grade.

Men are beginning to talk of patriotism but in the present state of India, the truest patriot is he who denies himself most and disinterestedly labors most for the intellectual and moral illumination of an ignorant, superstitious, and down trodden population.

I remain,
Very sincerely yours,
(Signed) ALEXANDER DUFF.

মফস্বলের ফৌজদারি বিচার আদালতে ইংরেজ এবং ভারতবাসীর একই আইন-বলে সমভাবে বিচার হওয়া আবশ্যক সে বিষয়ে ডাফের অনুকূল অভিমত এই পত্রখানিতে বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। এই-সকল বিচার আদালতের সংস্কার এবং উন্নতির আবশ্যকতার কথাও তিনি বলিতে ভুলেন নাই। পত্রে শেষোক্ত কথা কয়টি আজিও প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রণিধানযোগ্য। স্বদেশপ্রেমিক মাত্রেই ত্যাগধর্মে দীক্ষিত হইবেন এই কথাগুলি ডাফ পত্রের শেষে বড়ো সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন। ঐ সময়ে ধর্ম বিষয়ে উগ্র মতাবলম্বী হইলেও ইউরোপীয় পাদ্রীগণ স্কুল কলেজ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং সমাজকল্যাণকর অন্য বহুবিধ প্রচেষ্টার সঙ্গে শহরে ও মফস্বলে নিজেদের সংযুক্ত করিয়াছিলেন। বাঙলা সাহিত্যের চর্চায়ও যে তাঁহারা কেহ কেহ অবহিত হন তাহা আজ সুবিদিত। প্রজাকুলের প্রতি পাদ্রীদের দরদ ও মমতা নীল আন্দোলনের সময় নানাভাবে প্রকাশ পায়।

জাতীয় স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় সভা যে বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছিলেন, টাউন হলে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় উত্থাপিত প্রস্তাব সমূহ এবং তাহার উপর প্রদত্ত সভ্যদের বক্তৃতায় বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম

হয়। এই সময়ে ভারতহিতৈষী জর্জ টমসন পুনরায় ভারতে আসেন। সভায় তিনিও একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। উত্থাপিত প্রস্তাব তিনটির মূল কথা এই যে—১. মফস্বলের ফৌজদারি আদালতকে ইংরেজ ও ভারতবাসীর বিচারের সমান অধিকার অর্পণ সম্পর্কে আইন সভার প্রস্তাব সমর্থন। ২. ভারতীয় সরকারী কর্মচারীরা দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যোগ্যতার সহিত নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিয়া চলিয়াছেন। এ জন্য তাহারা সকলেরই আস্থাভাজন যদিও পদমর্যাদায় তাঁহারা ইংরেজ সিবিলিয়ানদের সমান নন। তাঁহাদের নিয়োগে বিচার আদালতগুলির যথেষ্ট সংস্কার সাধন সম্ভব হইয়াছে। ৩. তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হয় যে এ সত্ত্বেও বিচার আদালতগুলির উন্নতির যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। ফৌজদারি বিচার-বিধিতে ব্যবহার-সাম্য প্রবর্তন, ব্যবহারশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বিচারক নিয়োগ ও স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা— এই উদ্দেশ্যে দেশী বিদেশী সকলেরই একযোগে কার্য করা আবশ্যক।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে কিশোরীচাঁদ মিত্র, জর্জ টমশন এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তাঁহারা নিজ নিজ বক্তৃতায় তথ্য প্রমাণ -সহযোগে প্রস্তাবগুলির সমর্থনে বিশদভাবে আলোচনা করেন। কিশোরীচাঁদ দীর্ঘকাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে বঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে বিচার আদালতগুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে সমর্থ হন। তিনি বিচারে বৈষম্য হেতু দেশীয়দের লাঞ্ছনার বহু দৃষ্টান্তের বিশদ বিবরণ বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। নব্য শিক্ষিত ভারতবাসীরা বিচার বিভাগে প্রবেশ করিয়া ইহাকে বিশেষভাবে কলুষমুক্ত করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের সুবিচারের সপ্রশংস উল্লেখ ইতিপূর্বে বহু পদস্থ ইংরেজ করিয়া গিয়াছেন। জর্জ টমসন দ্বিতীয় প্রস্তাবের সমর্থনে এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া দেশীয় সুযোগ্য বিচারকদের অভিনন্দিত করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৃতীয় প্রস্তাবে বর্ণিত বিবিধ বিষয়ের সমর্থনে আলোচনা করিয়া বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার মধ্যে একস্থানে তিনি এই মর্মে বলেন যে, এ দেশে যে-সব ইংরেজ আসে তাহার অধিকাংশই বিলাতি সমাজে নিম্নস্তরের, এমনকি অপাঙক্তেয়। তাহার এই উক্তির ফলে ইউরোপীয়েরা বিশেষ বিরক্ত হন এবং ইণ্ডিয়ান ফটোগ্রাফিক সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ পদ হইতে ভোটাধিক্যে তাঁহাকে অপসারিত করে। সাত বৎসর পূর্বে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দেও এইরূপ একটি ব্যাপার ঘটিয়াছিল। মফস্বলে সাধারণ লোকের উপর ইউরোপীয়দের অনাচার-উৎপীড়নের বহু দৃষ্টান্তসহ একখানি পুস্তিকা লেখেন রামগোপাল ঘোষ। ইহাতে কলিকাতাস্থ ইউরোপীয়গণের এতই উষ্মা বাড়িয়া যায় যে, রামগোপালকে অনুরূপ ভোটাধিক্যের জোরে ১৮৫০ খ্রীঃ কৃষি সমাজ (Agricultural and Horticultural Society) হইতে বহিষ্কার করিয়া দেন। রামগোপাল তখন এই সমাজে সহকারী সভাপতি ছিলেন। এই ক বৎসরে ইউরোপীয় ও উচ্চ শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে জাতি-বৈরিতা কিরূপ বাড়িয়া যায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তাবিত আইনের আলাপ-আলোচনাকালে তাহা বিশেষ প্রতিপন্ন হইল। বহুকালপোষিত বিচার-বৈষম্য বিদূরণের যে আশা উক্ত প্রস্তাবের মধ্যে পাওয়া গেল তাহাও কিন্তু অব্যবহিত পরবর্তী একটি বিষম ব্যাপারের ফলে লুপ্ত হইয়া যায়। ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে এতাদৃশ বিচার-বৈষম্য হেতু পরবর্তীকালে আমাদের জাতীয় আন্দোলন বিশেষভাবে জোরালো হইয়া উঠে। ভারতবর্ষীয় সভা নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে সুপথে পরিচালনার নিমিত্তই এইরূপ একটি সমাজহিতকর প্রস্তাবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছিলেন।

এই মাত্র যে আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা বলিলাম তাহা হইল সিপাহী যুদ্ধ বা বিদ্রোহ। ১৮৫৭, ১০ই মে সৈন্য

বিভাগের সিপাহীরা বিদ্রোহ আরম্ভ করে এবং দেখিতে দেখিতে উত্তর ভারতে দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে তড়িৎ গতিতে ইহা ছড়াইয়া পড়ে। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে অতীতে যেমন বর্তমানেও তেমনি নানা দিক হইতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হইয়াছে। সিপাহী যুদ্ধের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ করিয়া স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন স্থলে সুধীবৃন্দ ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনায় রত হন। কাহার কাহার মতে ইহা ব্রিটিশ ভারতে প্রথম স্বাধীনতা সমর। এ দেশ হইতে ব্রিটিশ বিতাড়নকেই যদি স্বাধীনতা সমর আখ্যা দেওয়া যায় তাহা হইলে হয়তো এই উক্তির মধ্যে খানিকটা সত্য পাওয়া যাইবে। কিন্তু স্বাধীনতা এবং জাতীয়তা দুইটিকে একই অর্থে বা পরস্পরের পরিপূরক রূপে প্রয়োগ করিলে কোনোমতেই এই যুদ্ধকে ঐ রূপ আখ্যা দেওয়া যাইবে না। উত্তর ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলের শ্রেণী ও সম্প্রদায় বিশেষ ব্রিটিশের প্রশাসনিক নীতির দ্বারা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত এবং উদ্‌ব্যস্ত হইয়া উঠে; তাহারা নামেমাত্র সম্রাট বাহাদুর শাহকে পুরোভাগে রাখিয়া সরকারে কর্মরত সিপাহীদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষ যে এক রাষ্ট্র, এক জাতি (Nation) এই বোধ ইহাদের মধ্যে জাগ্রত ছিল বলিয়া একান্তই প্রমাণাভাব। পূর্ব শতকের দুঃখ দুর্দশা সাধারণ মানুষ তখনও ভুলিতে পারে নাই। আহমদ্ শা আব্‌দালী ও নাদির শাহের ভারত আক্রমণ, দিল্লীর বাদশাহের অন্তঃসারশূন্যতা ও নিরতিশয় অকর্মণ্যতা, বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান শাসকদের অত্যাচার, বিশেষ করিয়া বাঙলার বর্গীর হাঙ্গামা এবং নবাবী অনাচার এ দেশবাসীর মনে কাঁটার মতো বিঁধিয়া ছিল। ব্রিটিশ শাসনে সমগ্র ভারত একীভূত হইবার পথে, অরাজকতা বিদূরিত করিয়া শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় শাসক জাতি তখন তৎপর। ধর্ম এবং সমাজ-বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কর্ম করিবার পক্ষে এ দেশবাসীরা ক্রমে যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিতে থাকেন। পশ্চিমের জাতীয়তাবোধের আদর্শ ও তাহাদের সম্মুখে। ভারতবর্ষীয় সভা নব্যশিক্ষিত ভারতবাসীদেরই সভা। তাঁহারা বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে প্রথম হইতে তৎপর হইয়াছিলেন। জাতীয় সংহতির ভিত্তি জাতীয় ঐক্যবোধ। তাঁহারা দেখিলেন আরব্ধ সিপাহী যুদ্ধ এই নবজাগ্রত জাতীয়তার তরু-মূলে ভীষণ আঘাত হানিতেছে। তাই তাঁহারা তীব্র ভাষায় ইহার নিন্দাবাদ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

সম্প্রতি জনৈক ভদ্রলোক সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত সিপাহী যুদ্ধ সম্বন্ধে তীব্র নিন্দাবাদ ও কটূক্তি উল্লেখ করিয়া সে কালের শিক্ষিত বাঙালিদের উপর বিশেষ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাঁহার উক্তির নির্গলিতার্থ এই যে, বাঙালিরা তখনও 'স্বাধীনতা সমরে'র গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অথচ সংবাদপ্রভাকর্ সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই, আমার যতদূর মনে হয়, স্বদেশপ্রেমের প্রথম বাঙালি কবি। তাঁহারই কথা স্বদেশের কুকুর পূজি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি অন্য প্রসঙ্গে স্বাধীনতার জয়গান করিয়াছেন একটি বিখ্যাত কবিতায় যাহার আরম্ভ—স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে··· ইত্যাদি।

পূর্ব প্রবন্ধে ভারতবর্ষীয় সভার একটি উদ্ধৃতি হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতবাসীরা তখনই ব্রিটিশের স্বাধীনতার সঙ্গে তুলনা করিয়া নিজেদের দাসত্বের সম্বন্ধে সচেতন হইতেছেন এবং তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতাস্পৃহাও বাড়িয়া যাইতেছে। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র মাধ্যমে সভারই মুখপত্র স্বরূপ জাতীয়তার ভিত্তিতে এই স্বাধীনতাস্পৃহার কথা প্রতিনিয়ত ব্যক্ত করিতেছিলেন।

এ সত্ত্বেও ভারতবর্ষীয় সভা ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ কখন চাহেন নাই। শাসক জাতির সহায়ে

ভারতবাসীরা একতাবদ্ধ হইয়া দ্রুত নিজেদের উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে এই বিশ্বাসের বলেই তাঁহারা সর্বপ্রকার কার্য করিয়া যাইতেছিলেন। এ সময়ে এইরূপ একটি বিদ্রোহের দ্বারা দেশের সমূহ ক্ষতি হইবে বলিয়া তাঁহারা বিদ্রোহীদের গর্হিত কার্যের নিন্দাবাদে একটি ব্যাপক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবে এই মর্মে বলা হয় যে, এই বিদ্রোহ শুধু সিপাহীদের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। উত্তর ভারতের যে-সব অঞ্চলে ইহা দেখা দিয়াছে সেখানকার জনসাধারণের সহানুভূতি তাহারা পায় নাই বলিয়া সভার বিশ্বাস। কুচক্রীদের প্ররোচনায় সিপাহীরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের সমুচিত দণ্ড বিধান একান্ত আবশ্যক। ভারতবাসীরা ব্রিটিশের সদিচ্ছা এবং শাসননীতির প্রতি আস্থাশীল এ কথাও ঐ প্রস্তাবে বলা হয়। বাঙালিরা কেন যে, শ্রেণীসংগ্রামকে স্বাধীনতা তথা জাতীয় সংগ্রাম বলিয়া তখন গ্রহণ করিতে পারেন নাই তাহা এই সময়কার ভারতবর্ষীয় সভার কার্যকলাপ হইতে সবিশেষ বুঝা যায়। ২৩শে মে (১৮৫৭) তারিখের সাধারণ মাসিক অধিবেশনে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় সভা নিম্নরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করেন :

'The Committee of the British Indian Association have heard of the disastrous events which have lately occurred at Meerut and Delhi with deep concern and sorrow.

'The Committee view with disgust and horror the disgraceful and mutinous conduct of the native soldiers at those stations, and the excesses committed by them, and confidently trust to find that they have met with no sympathy, countenance or support from the bulk of the civil population of that part of the country, or from any reputable or influential classes among them.

'The Committee of the Association record without hesitation their conviction of the utter groundlessness of the reports that have led a hitherto faithful body of soldiers of the state to the commission of the gravest crimes of which military men or civil subjects can be guilty, and the Committee deem it incumbent on them on the present occasion to express their deep abhorrence of the practices and purposes of those who have spread those false and mischievous reports.

'The Committee earnestly hope for the restoration of peace and good order, which they doubt not will soon be re-established by the vigorous measures which the Government have adopted in this exigency.

'The Committee trust and believe that the loyalty of their fellow subjects in India to the Government under which they live, and their confidence in its power and good intentions unimpaired by the lamentable events which have occurred, or the detestable efforts which have been made to alienate the minds of the Sepoys and the people of the country from their duty and allegiance to the beneficient rule under which they are placed.—*The Englishman,* Tuesday, 9 June, 1857.

ভারতবর্ষীয় সভা বিদ্রোহ দমনে সরকারী নীতিকে সমর্থন করিলেন বটে কিন্তু বেসরকারী ইউরোপীয়েরা এই সুযোগে বাঙালিদের উপর প্রতিহিংসা লইতে অতিমাত্র সচেষ্ট হইয়া উঠিল। এই সভা নিখিল ভারতীয় সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য স্থাপিত হইলেও ইহার কর্ণধারগণ তো নব্য শিক্ষিত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালি। এই শ্রেণীর বাঙালিরা যে প্রজাকুলের উপর ইউরোপীয়দের অনাচার-উৎপীড়ন সম্পর্কে সচেতন তাহা পূর্বেই তাহারা বুঝিয়া লইয়াছে। বিদ্রোহকালের জরুরী অবস্থায় বড়লাট ক্যানিং সাময়িকভাবে মুদ্রাযন্ত্র আইন এবং অস্ত্র আইন জারি করেন। বিদ্রোহের শুরুতেই ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি জাতীয়তাবাদী বাঙালিদের নিগৃহীত করিবার জন্য অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল। মুদ্রাযন্ত্র আইন বিধিবদ্ধ হইলে আশ্চর্যের বিষয় 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রথমেই ইহার কবলে পড়ে। আর এই ভারতবন্ধুর ভারতীয় বিদ্বেষ প্রচারই তাহার কারণ। ইউরোপীয়েরা জিদ ধরিল কলিকাতার এবং উপকণ্ঠস্থিত এ দেশবাসীদের অস্ত্র আইন বলে নিরস্ত্র করিতে হইবে। এই হেতু তাহারা সরকারে আবেদনপত্র প্রেরণের নিমিত্ত ইউরোপীয় সাধারণের নিকট ইহা স্বাক্ষর করাইয়া লইতে আরম্ভ করিল। ভারতবর্ষীয় সভা ইউরোপীয়দের মতিগতি সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। সভা-কর্তৃপক্ষ তাহাদের মতলব জানিয়া ২৫শে জুলাই (১৮৫৭) তারিখে সাধারণ অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন:

That this Society has been informed that a petition is in circulaion among the Christian community of this metropolis praying Government to disarm the native population, but as no acts of that population within the last hundred years could in any wise be construed as disloyal towards its British rulers, and on the contrary, the Government have always had reason to be satisfied with their truth and good faith as subjects, the invidious measure of disarming one class in preference to another, could not but be viewed by the native community as an underserved and ungenerous manifestation of distrust on the part of Government towards them, and the Committee be therefore requested to address Government on this head with the least possible delay.—*The Englishman,* Saturday, 8 August. 1857.

ইউরোপীয়দের মতলব অনুযায়ী কার্য আর হয় নাই। তাহাদের আর একটি প্রস্তাব ছিল সমগ্র ভারতে ও দেশীয়দের উপর সামরিক আইন জারি। উপদ্রুত অঞ্চলে সামরিক আইন প্রবর্তিত হইল বটে কিন্তু অন্য কোথায়ও ইহা চালু হইল না। ক্যানিংয়ের কার্যে ইউরোপীয় সমাজ খুবই অসন্তুষ্ট হয় এবং তাহার উপর 'ক্লেমেন্সি ক্যানিং'— এই ব্যঙ্গাত্মক উপাধি বর্ষণ করে। জনশ্রুতি এই যে, হরিশ্চন্দ্রের হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রতি সপ্তাহে বাহির হইবামাত্রই বড়লাট ক্যানিং ভারতবাসীদের মতামত বুঝিয়া লইবার নিমিত্ত ইহা পাঠ করিতেন এবং অনেকের বিশ্বাস তাঁহার ঐ সময়কার শাসননীতি ইহার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। এ দেশে বড়লাট ক্যানিংয়ের উপর ইউরোপীয় সমাজ যেমন অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে বিলাতেও তাঁহার বিরুদ্ধে সত্য-মিথ্যা নানারূপ প্রচারকার্য চলিতে থাকে। বোর্ড অব কনট্রোলের সভাপতি ভারতবর্ষের প্রাক্তন বড়লাট লর্ড এলেনবরা একটি বক্তৃতায় বলেন যে, খ্রীষ্টান মিশনরীদের বিবিধ উদ্যোগে বড়লাট

ক্যানিং অর্থ সাহায্য দান করার দরুণই প্রজাদের অসন্তোষ দেখা দেয়, এবং উহাই এই বিদ্রোহের একটি প্রধান কারণ। ভারতবর্ষীয় সভা বরাবর ক্যানিংয়ের উদার শাসন পদ্ধতি সমর্থন করিতেছিলেন। এইরূপ একটি অর্থহীন উক্তি সম্পর্কে তাঁহারা নীরব থাকিতে পারিলেন না। ২৫শে জুলাইয়ের (১৮৫৭) উক্ত সাধারণ সভায় লর্ড এলেনবরার ভ্রমাত্মক উক্তির প্রতিবাদে এবং বড়লাট ক্যানিংয়ের উদার শাসননীতির সমর্থনে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় একটি প্রস্তাব[৩] উত্থাপন করেন। এই সময় তিনি একটি আবেগময় সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। ইহাতে তিনি লর্ড এলেনবরা যে ভারতহিতৈষী তাহা স্বীকার করিয়াও এই মর্মে বলেন যে, উক্ত কারণে বিদ্রোহ ঘটে নাই। ইহার মূল অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। একশ্রেণীর লোকে সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষ করিয়া সমগ্র ভারতীয় জাতিকেই দোষারোপ করিতেছেন। ভারতবর্ষের অধিবাসীরা একটি বহু পুরাতন সভ্যতার উত্তরাধিকারী ; তাঁহারা নির্বিচারে আপাতলাভের নিমিত্ত কোনো গর্হিত কার্যে লিপ্ত হইতে পারেন না। ভারতবর্ষীয়দের জাতীয়তাবোধ এই সুপ্রাচীন সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত, বহুশতাব্দীর পরাধীনতা সত্ত্বেও তাঁহাদের বিচারবুদ্ধি এখনও সক্রিয় রহিয়াছে। কোনো ভারতীয় বিষয়ের আলোচনাকালে ইহা মনে রাখিতে হইবে। দক্ষিণারঞ্জন বলেন—

When discussing an Indian subject, it should always be remembered that this country is not inhabited by savages and barbarians, but by those whose language and literature are the oldest in the world, and whose progenitors were engaged in the contemplation of the sublimest doctrines of religion and philosophy, at a time when their Anglo Saxon and Gallic contemporaries were deeply immersed in darkness and ignorance ; and if owing to 900 years of Mahomedan tyranny and misrule this great nation has sunk in sloth and lethargy, it has, thank God, not lost its reason, and is able to make a difference between the followers of a religion which inculcates the doctrine that should be propagated at the point of the sword, and that which offers compulsion to none, but simply invites enquiry.

দক্ষিণারঞ্জন এই উক্তির মধ্যে ইসলাম এবং খ্রীষ্টধর্মের তুলনা করিয়া দ্বিতীয়টিকে বর্তমানযুগের উন্নতির মূলীভূত কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ জগৎ একদা খ্রীষ্টরাজ্যে পরিণত হইবে পাদ্রীদের এই বিশ্বাস তাঁহারা আদৌ সমর্থন করেন না বটে, কিন্তু এ দেশের জনসাধারণের শিক্ষা স্বাস্থ্য সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধিকল্পে পাদ্রীরা যে যত্ন লইতেছেন তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। লর্ড এলেনবরা-ঘোষিত ধর্ম বিষয়ে সরকারের নিরপেক্ষ নীতির এ দেশীয়রা পূর্ণ সমর্থন করেন বটে তবে এ কথা কোনো মতেই ঠিক নয় যে, বিশেষ বিশেষ মিশনরী প্রতিষ্ঠানকে বড়লাট কর্তৃক অর্থসাহায্য হেতুই এইরূপ একটি সাংঘাতিক বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। যুদ্ধবিদ্যা ব্যতিরেকে সিপাহীদের সাধারণ শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা করিতে দক্ষিণারঞ্জন এই বক্তৃতায় সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। তিনি এই মর্মে বলেন যে, মাতৃভাষায় নির্দিষ্টমান পর্যন্ত শিক্ষালাভের পর সিপাহীদের সৈন্য বিভাগে ভর্তি করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে তাহাদের মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সৈন্যদের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ইহার একটি উৎকৃষ্ট উপায়। যাহারা জ্ঞানলাভে উৎকর্ষ দেখাইবে তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিতে হইবে। যুদ্ধের

সময় ব্যাতিরেকে অন্য সময় বৃথা আলস্যে ও গালগল্পে না কাটাইয়া তাহাদের মধ্যে মানবিকতাবোধ উন্মেষ এইরূপে সম্ভব হইবে। অপরের প্ররোচনায় কর্ণপাত না করিয়া নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনেও উদ্বুদ্ধ হইবে। ভারতবর্ষীয় সভার অন্যতর সহকারী সভাপতি রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের মূল খুঁজিতে হইবে আরও গভীরে। অপদস্থ ও রাজ্যচ্যুত ব্যক্তিদের পক্ষে কতকগুলি লোক সিপাহীদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাইবার সুযোগ পাওয়ায় বিদ্রোহ এইরূপ ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস. তবে ইহা একটি শ্রেণীর মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, ভূস্বামী—জনসাধারণ এই বিদ্রোহ হইতে দূরে রহিয়াছে। এক শ্রেণীর লোকের অপরাধের জন্য সমগ্র ভারতবাসীকে সায়েস্তা করিবার প্রবৃত্তি আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে।

বিদ্রোহের মধ্যেই ১৮৫৭, ১লা আগষ্ট বঙ্গের ছোট লাট নিজ দায়িত্বে জরুরী অবস্থায় মফস্বলের নীলকর ইউরোপীয়দের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিয়োগ করা শুরু করেন। ইহাতে ভারতবর্ষীয় সভা বিশেষ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মফস্বলের নীলকরদের অনাচার অত্যাচার এবং অন্যায় জোট সুবিদিত। তাহাদের উপর শাসন ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে প্রজাকুলের দুঃখদুর্দশার অবধি থাকিবে না। ভারতবর্ষীয় সভা উহার প্রতিবাদে যে স্মারকলিপি সরকারে পাঠাইলেন তাহাতে আইনগত একটি বিষয়ের উপরই তাহারা বিশেষ জোর দেন। লাভজনক ব্যবসায়ে লিপ্ত কোনো ব্যক্তিকেই সরকারী বিচারক পদে নিয়োগ করা হইবে না—এবম্বিধ সরকারী নিয়ম এবং চিরাচরিত রীতি কর্তৃপক্ষ এই ভাবে ভঙ্গ করিয়াছেন, এই কথাই স্মারকলিপিতে বিশেষ করিয়া বলা হইল। ইহার ফলে দেশে অনাচার উৎপীড়ন যে বাড়িয়াই চলিবে ইহারও আভাস দিলেন এই স্মারকলিপিতে। সরকার কিন্তু জরুরী অবস্থার অজুহাতে সভার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, ইহা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র বলিয়াই নিরস্ত হন। বৎসরখানেকের মধ্যেই অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটগণের অত্যাচার-নিপীড়নে প্রজাকুল অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সভা নীলকর ম্যাজিষ্ট্রেট লারমুর এবং ডিরেটের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সরকারে লেখেন যে তাহারা নিজ নিজ এলাকায় পেয়াদা হইতে উপরিতন কর্মচারীগণকে নির্লজ্জভাবে নীল চাষীদের উৎপীড়নে নিযুক্ত করিয়াছে। বিদ্রোহান্তে স্থানীয় সরকার এই ব্যবস্থার কতকটা সংস্কার করিলেও নীলকর এবং নীলচাষীদের মধ্যে তিক্ততা অতিদ্রুত বাড়িয়া যায়। ফলে প্রজাদের মধ্যে একটি ব্যাপক নীলকর বিরোধী আন্দোলনের উদ্ভব হয়।

বিদ্রোহকালে সিপাহীদের নৃশংসতা এবং তাহাদের দমনের জন্য সরকারী সেনাবাহিনীর শতগুণ বর্বরতায় দেশের মধ্যে অস্বস্তি এবং অশান্তির ঘনছায়া দেখা দিল। এ দেশে এবং বিলাতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইউরোপীয় সম্প্রদায় বিদ্রোহের অছিলায় আপামর ভারতীয় জনসাধারণকে সায়েস্তা করিবার জন্য তীব্র আন্দোলন করিতে থাকে। বিলাতে বোর্ড অব কনট্রোলের সভাপতি লর্ড এলেনবরা হাউস অব লর্ডস-এ এবং ইণ্ডিয়ান রিফর্ম সোসাইটির সভাপতি উদারনৈতিক জন ব্রাইট হাউস অব কমনস্-এ এতাদৃশ ভারতবিরোধী আন্দোলনের রাশ আগলাইয়া রাখিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হন। ভারতবাসীদের শাসনব্যবস্থা কোম্পানির নিকট হইতে ব্রিটিশ সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে তাহারা ১৮৫৮ সনের মাঝামাঝি একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া উভয় পার্লামেণ্ট হইতে পাশ করাইয়া লন। হাউস অব লর্ডস্-এ লর্ড এলেনবরা এবং হাউস অব কমনস্-এ জন ব্রাইট এই আইনের ধারাগুলিকে ভারতবাসীর পক্ষে অনুকূল করিয়া তুলিতে বিশেষভাবে যত্ন লন। ধর্ম বিষয়ে সরকারী নিরপেক্ষতা এবং প্রশাসনিক কার্যে ধর্ম বর্ণ জাতি নির্বিশেষে

সকলেরই সমান অধিকার স্বীকার—এই আইনের দুইটি প্রধান বিষয়। কোম্পানির শাসন বিলুপ্ত হইয়া ব্রিটিশ রাজের হস্তে যাবতীয় ক্ষমতা অর্পিত হইল এই আইন দ্বারা। ভারতবর্ষীয় সভা পূর্ব হইতেই এরূপ ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থার পক্ষপাতি ছিলেন। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় তাহারা বিশেষ আনন্দিত হন। ইহার দুইজন প্রধান সমর্থক লর্ড এলেনবরা এবং জন ব্রাইটকে অভিনন্দিত করিয়া ১৮৫৮ সনের ২রা অক্টোবর তারিখের সাধারণ সভায় এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবটি এই :

That the session of Parliament having come to a close, the Members of the British Indian Association feel it their duty to record their deep sense of obligations under which people of India have been laid by Right Hon'ble the Earl of Ellenborough by his labours in the House of Peers, and by John Bright, Esq., by his labours in the House of Commons during the past session,—labours unsurpassed in their arduousness, performed in a spirit of earnest patriotism and philanthropy, and directed by the most statesmanlike wisdom and foresight.

ভারতবর্ষীয় সভা এই দুই বৎসরে ভীষণ দুর্যোগ ও সংকটের মধ্যেও বিবিধ গঠনমূলক প্রস্তাবের আলোচনা পর্যালোচনা করিতেও বিরত হন নাই। বিচার আদালতগুলির সংস্কারকল্পে তাঁহারা এই মর্মে একটি প্রস্তাব করেন যে, সিবিল সার্বিসের কর্মী বাদে স্বাধীন ব্যবহারজীবী ইংরেজ আইরিশ ব্যারিস্টার ও স্কচ এ্যাডভোকেটগণকে বিচারকপদে নিয়োগ করা আবশ্যক। তখনও দেশবাসী বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন নাই, নহিলে তাহাদের কথাও সভা অবশ্যই বলিতেন। সুপ্রীম কোর্ট এবং সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত দুইটি একীভূত করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্ট— উচ্চতম ধর্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠায় তাহারা পার্লামেণ্টে আবেদন প্রেরণ করেন। বিলাতে ভারতবর্ষীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে যে আইন রচনা কার্য চলিতেছিল ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়ান রিফর্ম সোসাইটি ইহাকে ভারতীয় সমাজব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শিল্প ব্যবসায়ের প্রসার ও উন্নতিকল্পেও ভারতবর্ষীয় আইন সভায় যৌথ কারবার সম্পর্কীয় একটি আইনের খসড়া এই সময় উপস্থাপিত করা হয়। ইহার উপরেও সভা একটি বিশেষ উপযোগী সংশোধন প্রস্তাব সম্বলিত লিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। লিপিতে তাঁহারা বলিলেন যে, ব্যাঙ্ক এবং জীবনবীমাগুলিকেও এই আইনের আওতার মধ্যে আনা উচিত। মহাজনের নিকট হইতে চড়া সুদে অর্থ লইয়া ছোটো ছোটো কারবারীরা ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারে না। দেশের মধ্যে মজুত মূলধন—অইনানুগ ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতেই লোকে গচ্ছিত রাখিতে উৎসুক হইবে। এইরূপে মূলধন সহজলভ্য হইলে ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতি এবং প্রসার ত্বরান্বিত হইবে। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাও ইহার ফলে ফিরিয়া যাইবে। এই সময়ে আর একটি প্রস্তাব হয় যাহা সমাজের হিতকল্পে বিশেষ প্রয়োজন। লাভবিহীন সমাজকল্যাণকর উদ্যোগগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত একটি আইনের প্রস্তাবও করা হয় ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে। সভার অন্যতম প্রধান সদস্য প্যারীচাঁদ মিত্র কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তাঁহারই নির্দেশে সরকারকে এইরূপ একটি আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাব পূর্বেই করিয়াছিলেন।

ভারত সরকার খ্রীষ্টীয় যাজক বিভাগ পোষণ করিয়া থাকেন। এ দেশবাসীরা বহুপূর্ব হইতেই ইহার

অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আন্দোলন করেন। এই সময়ে বিলাতে প্রতিপত্তিশালী ধর্মযাজকগণ এই বিভাগটিকে সম্প্রসারিত করিবার জন্য সচেষ্ট হন। ভারতবর্ষীয় সভা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলে এ বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আর অধিক দূর অগ্রসর হন নাই।

শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে ভারতবর্ষীয় সভা বরাবর অবহিত। ইংরেজী শিক্ষা সংকোচনের নিমিত্ত বিলাতে এই সময় একটি আন্দোলন উপস্থিত হইল। আন্দোলনকারীদের মতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার হেতুই ভারতবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সভা কাল বিলম্ব না করিয়া ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। বিলাতে লর্ড এলেনবরা, লর্ড স্ট্যান্‌লি প্রমুখ কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আন্দোলনের সপক্ষতা না করিয়া ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের আয়োজন করিতে উদ্যোগী হন। এই সময় সরকারের অর্থকৃচ্ছ্রতা হেতু কলিকাতার সংস্কৃত কলেজটিকেও তুলিয়া দিবার কথা উঠিল উচ্চ সরকারী মহলে। সভা এই প্রস্তাবের আঁচ পাইয়া নানা যুক্তি সহকারে ইহার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট লিপি পাঠান। সংস্কৃত কলেজ শুধু সংস্কৃত শিক্ষারই আয়োজন করে না, এখানে সংস্কৃত শিক্ষা পাইবার দরুন যুবক-পণ্ডিতেরা মাতৃভাষার যথাযোগ্য অনুশীলন দ্বারা ইহার উন্নতি করিতেও সক্ষম হন। সংস্কৃত শিক্ষার বিলুপ্তি ঘটিলে দেশ-ভাষা সমূহের উন্নতি সাধন একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সরকার অতঃপর এ প্রচেষ্টা হইতে বিরত হন। কলিকাতা পৌরসভার কার্যাদি সম্পর্কেও সভা যে বরাবর সচেতন তাহার প্রমাণ আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। কলিকাতাস্থ দেশীয় অধিবাসী অধ্যুসিত অঞ্চলের উন্নতি সম্পর্কে পৌরসভার ঔদাসীন্য সুবিদিত। এখানকার পথ, ঘাট, নর্দমা প্রভৃতির সংস্কার ও প্রসার -কল্পে শুধু ইউরোপীয়দের লইয়া একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠনের প্রস্তাব হয়।

ভারতবর্ষীয় সভা এরূপ একটি ব্যাপারে ভারতবাসীদের লওয়া যে অত্যাবশ্যক তাহা প্রতিপাদন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পরে এ প্রস্তাবানুসারে কার্যও হইয়াছিল, ভারতবর্ষীয় সভার সার্থক কার্যকলাপে বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের শিক্ষিত সাধারণ ইহার দিকে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। বিভিন্ন স্থলে তাঁহারা সভার আনুকূল্যে শাখাসমিতি গঠন করেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মূল সভা অথবা শাখাসমিতির সদস্য হইলেন। সভার কার্য সাধারণের মধ্যে প্রচারের নিমিত্ত সরকার হইতে প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি এবং সরকারের নিকট প্রেরিত আবেদনপত্রাদি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাইয়া প্রচারের ব্যবস্থা করেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব স্মারকলিপি এবং আবেদনপত্রগুলি তাঁহারা খণ্ডে খণ্ডে পুস্তক আকারেও প্রকাশ করিতে থাকেন। সভার অন্যতম প্রধান সদস্য হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ইহার মুখপত্র স্বরূপ এই সময়ে যে কার্য করিয়া আসিতেছিল তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ১৮৫৮ সনের প্রথম হইতেই স্বনামধন্য কৃষ্ণদাস পাল ভারতবর্ষীয় সভার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইনি তখন মাত্র বিংশতিবর্ষীয় যুবক। তাঁহার কর্মকুশলতায় সভা পরবর্তী দশকে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে এবং একটি বিশেষ শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকরূপে তিনি পত্রিকাখানিকে ভারতবর্ষীয় সভার পুরাপুরি মুখপত্র করিয়া তোলেন। ইহা অবশ্য কিছু পরের কথা। যাহা হোক, ভারতবর্ষের সঙ্কটকালে, ১৮৫৭—১৮৫৮ এই দুই বৎসরে বিবিধ কার্যের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষীয় সভা আত্মসচেতন, সুসংহত একটি ভারতীয় মহাজাতির ভিত্তি রচনায় সবিশেষ তৎপর হইলেন।

১ কীটদষ্ট অংশ

২ 'The Hindu Intelligencer'—April 13, 1857.

৩ প্রস্তাবটি এই —

That though this Society perfectly coincides with the ex-Governor General, Lord Ellenborough, as to the propriety of Government exercising no interference with the religion of the country, yet in justice to the present Governor General, deems it necessary to record that it has not failed to pay due attention to the acts of Lord Canning's administration, but there has been none of that nature which could be properly reckoned as an interference with our religion, or could give rise to rebellion; and the society cannot but record its humble approbation of the present Governor General's measures for the preservation of the peace of this realm under the peculiar circumstances in which it has been placed by the recent unforeseen and unfortunate mutinies.—*The English man*, 8, August 1857.

দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার। শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়। সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৬। মূল্য সাড়ে তের টাকা।

দ্বিজেন্দ্রকাব্য-সঞ্চয়ন। শ্রীদিলীপকুমার রায়-সংকলিত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি., কলিকাতা ৭। মূল্য আট টাকা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জীবিতকালে খ্যাতি পেয়েছিলেন। তাঁর আর্যগাথা আষাঢ়ে মন্দ্র কাব্যত্রয়ী রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল। নাট্যমঞ্চে তাঁর নাটকগুলির আদর অব্যাহত ছিল। 'হাসির গানে' তিনি অভিনবত্ব এনেছিলেন। স্বদেশপ্রেমে তাঁর অক্লান্ত নিষ্ঠা স্মরণযোগ্য। এসব সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল অধুনা প্রায় বিস্মৃত। কিছু পরিমাণে উপেক্ষিত। এমন হবার কারণ যে কি তা ভেবে দেখবার যোগ্য। কেউ কেউ দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তাহ্রাসের কারণ তাঁর রবীন্দ্রবিরোধী মনোভাবের মধ্যে খোঁজেন। এইটি অমূলক নয়। কিন্তু রবীন্দ্রবিরোধিতা দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যজীবনে একটি অপরিহার্য অধ্যায় হলেও কবি-নাট্যকার সম্বন্ধে বাঙালি পাঠকের উৎসাহের অভাবের কারণ আরও কিছু আছে বলে মনে হয়। তিনি যে নাটকগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি আজ আর বিশেষ মঞ্চস্থ হয় না। শৌখিন নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক মাঝে মাঝে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ডাক পড়ে। বলা বাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রলাল যে ধরণের নাটক রচনা করেছিলেন, আজকের দর্শক সেরকম নাটক চায় না। নাটকের আকৃতি ও প্রকৃতি এখন পরিবর্তিত। রোমান্টিক এবং ঐতিহাসিক নাটক বাংলাদেশে আর জনপ্রিয় নয়। একালের মানুষ রোমান্টিক ধর্মকে বিসর্জন দিয়েছে এমন বলি না, কিন্তু একালের রোমান্টিক মানসের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শবাদের কোথায় যেন একটা ব্যবধান রচিত হয়েছে। উঁচু সুরে বাঁধা জীবনের প্রতি মানুষের আর তেমন শ্রদ্ধা নেই। রাজপুত অথবা মোগল সম্রাটরা বর্তমানে আমাদের আর তেমন করে উৎসাহিত করে না। দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তাহ্রাসের এও একটা কারণ। দ্বিজেন্দ্রলাল যে-সমস্ত হাসির গান রচনা করেছিলেন সেগুলির মধ্যেও সমসাময়িকতার ছাপ আছে। সমসাময়িক কালের উজান বেয়ে সেগুলি একালের তীরে বাসা বাঁধতে পারে নি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'হসন্তিকা'য় যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের আশ্রয় নিয়েছিলেন সেগুলিও আজ চলতি নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল গীতিকবিতার ক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তা অভিনন্দনযোগ্য সন্দেহ নেই। তথাপি গীতিকবিতার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমত্ব দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাকে আড়াল করে ফেলেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি বাঙালি পাঠকের কিঞ্চিৎ উপেক্ষার কারণস্বরূপ যে ইঙ্গিতগুলি করা হল সেগুলি সবই ঠিক কি না, এবং এই উপেক্ষা প্রদর্শন সংগত কি না তার আলোচনা করেছেন শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায় 'দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থে। বস্তুত, রথীন্দ্রনাথের গ্রন্থটি গবেষণাপুস্তক হিসাবেই কেবল নয় সময়োপযোগী বলেও অভিনন্দিত হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে যে সংশয় ও দ্বিধার সৃষ্টি হয়েছিল তিনি তা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে সে-সমস্ত দ্বিধাসংশয়ের নিরসন করেছেন।

বেশ কিছুদিন আগে দেবকুমার রায়চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী রচনা করেছিলেন। তার পর নবকৃষ্ণ ঘোষ দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন। দ্বিজেন্দ্রলাল-পুত্র শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই গ্রন্থগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য প্রায় সবই আছে। তা ছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও কবিজীবনী ও কিছু সাহিত্য-আলোচনা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে। এর পরেও রথীন্দ্রনাথের গ্রন্থখানির প্রয়োজন ছিল। রথীনবাবু পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন কিন্তু নিজেও সেই পথের সীমাকে বিস্তৃত করেছেন। উপপথ শাখাপথ চিনিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ব্যাপক। তাঁর কথায় 'বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যকীর্তির মূল্য নির্ণয় করতে গেলে এই যুগের বাংলা সাহিত্যের স্বরূপধর্ম ও অন্তঃপ্রকৃতির বিচার করা ছাড়া তা সম্ভবপর নয়। তাই দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের একটি কাল, বাংলাসাহিত্যের একটি যুগ ও বাঙালির রসরুচির একটি অধ্যায়কেই আলোচনা করতে হয়েছে।' এই দেশকালের প্রেক্ষাপটটি রথীনবাবু সুন্দর করে বিশ্লেষণ করেছেন বিভিন্ন অধ্যায়ে।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রসঙ্গ এই কয়টি: কবিজীবনী, দেশ-কাল, দ্বিজেন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, কাব্যকীর্তি ও কলাবিধি, প্রহসন ও হাস্যরস, নাট্যপ্রবাহ ও নাটকবিচার, দ্বিজেন্দ্রনাট্যের নানা প্রসঙ্গ, দ্বিজেন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যরচনা, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব, দ্বিজেন্দ্রমানস: বৈচিত্র্য ও ঐক্য।

এই বইতে কবিজীবনী অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। এইটি অত্যন্ত সংগত হয়েছে। আজকাল একজাতীয় গবেষণাগ্রন্থে তথ্যনিষ্ঠার বাহুল্য যেমন লক্ষ করা যায় তেমনি দেখা যায় পূর্বে আলোচিত বিষয়ের পুনরায় উত্থাপন। রথীনবাবু সে ক্ষেত্রে পাদটীকায় আকরগ্রন্থের উল্লেখ করে নিজের বক্তব্যকে যথাযথ সংক্ষিপ্ত করেছেন। পূর্ববর্তী জীবনীকারেরা জীবনীই রচনা করেছেন, রথীনবাবু সে ক্ষেত্রে জীবনী-গ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করে দ্বিজেন্দ্রমানসের সারস্বত দিকটিকে প্রকাশ করেছেন। রথীনবাবু প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের 'কবিজীবনী' প্রবন্ধ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে এই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ দেশ-কালের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটটি আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক কালে এক দিকে স্বদেশচর্চার তীব্র উত্তেজনা ও প্রচণ্ড উৎসাহ লক্ষ করা গিয়েছিল, অপর দিকে কিছুসংখ্যক চিন্তানায়কদের চিত্তে ধর্মের গোঁড়ামি বাসা বেঁধেছিল। এক দিকে পাশ্চাত্যশিক্ষাকে অঙ্গীকার অপর দিকে প্রাচ্যবিদ্যার সনাতন কল্যাণবোধকে স্বীকৃতি এই দুইই শিক্ষিত বাঙালি মেনে নিয়েছিল। এই আলোড়ন-বিলোড়ন দ্বিজেন্দ্রলাল লক্ষ করেছিলেন। এমনকি তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও ধর্মের শাসনের নিষ্ঠুর রূপটি দেখেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাকর্মে সমাজমানসের এই আলোড়ন-বিলোড়ন প্রভাব ফেলেছিল। দ্বিজেন্দ্রসংগীত এবং ঐতিহাসিক নাটকগুলির পটভূমিকা রচনা করেছে এই দেশ-কাল।

তৃতীয় প্রসঙ্গে রথীনবাবু আর্যগাথা, হাসির গান, আষাঢ়ে, মন্দ্র, আলেখ্য, ত্রিবেণী এই কাব্যগ্রন্থগুলির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতার এমন সুচারু বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে হয় নি। গীতিকবিতার আদর্শ, হাসির গানের শ্রেণীবিভাগ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, বাংলা কবিতায় দাম্পত্যপ্রেম ও বাৎসল্যরসের কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব লেখকের আলোচ্য বিষয়। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার সমধর্মী না হলেও এইগুলির স্বাতন্ত্র্য কোথায় লেখক বিশ্লেষণের সাহায্যে

তা দেখিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে লেখকের ঐতিহাসিক বিবেকের সচেতনতা লক্ষ করবার মত। কেবল একটা জায়গায় পাঠকের একটু খেদ থেকে যায়। হাসির গানের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যের ব্যঙ্গবিদ্রূপ কবিতাগুলির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার তুলনামূলক আলোচনা থাকলে প্রসঙ্গটি আরও গভীর হতে পারত। কাব্যরীতি ও কলাবিধি অধ্যায়ে লেখক দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দনির্মাণ পদ্ধতির অভিনবত্বের দিকটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রকাব্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ওজোগুণ, অনুষ্টুপ ও পজ্‌ঝটিকা ছন্দের নিপুণ প্রয়োগ, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লঘু ও হাল্‌কাচালের কবিতানির্মাণ, স্তবকসজ্জায় অভিনবত্ব ইত্যাদি রথীনবাবু আলোচনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের আলোচনায় তাঁর ছন্দসৃষ্টির প্রসঙ্গ প্রাধান্য পাওয়া স্বাভাবিক। নূতন ছন্দের নির্মাতা হিসাবে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হওয়া উচিত। মধুসূদন আবিষ্কার করেছিলেন বাংলা অক্ষরবৃত্তের অপরিমেয় সম্ভাবনা, রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন এবং পূর্ণতা দিয়েছিলেন মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে, আর দ্বিজেন্দ্রলাল দেখিয়ে গেলেন স্বরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্নিহিত শক্তি। তাঁর এই আশ্চর্য নৈপুণ্য রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু প্রথাগত সমালোচকদের মত বিশ্লেষণ করে যান নি। দীর্ঘকাল দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দনৈপুণ্য অবহেলিতই ছিল। অনেকেই একে ব্যর্থতা বলেই মনে করেছেন। প্রথমে ছান্দসিক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন (উদয়ন ১৩৪০ আশ্বিন) ও পরে শ্রীদিলীপকুমার রায় (ছান্দসিকী, ১৩৪৭) এবং মোহিতলাল (বাংলা কবিতার ছন্দ, ১৩৫২) দ্বিজেন্দ্রলালের এই ছন্দের অভিনবত্ব দেখিয়ে দেন। মনে হল, আলোচ্য গ্রন্থকার এঁদের আলোচনাতেই পুরোপুরি নির্ভর করেছেন। প্রসঙ্গত রথীনবাবু দ্বিজেন্দ্রলালের ক্লাসিক্যাল বাক্‌রীতির বৈশিষ্ট্যটি দেখিয়ে দিয়েছেন।

প্রহসন ও হাস্যরস পর্বে রথীনবাবু পূর্ববর্তী কবিসাহিত্যিকদের তুলনায় দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের মৌলিকতা কোথায় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

পরের নিবন্ধটিতে লেখক দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকর্মের বিস্তৃত রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র এইটুকুই বলা যায় যে, লেখকের আলোচনাপদ্ধতি বিশ্লেষণাত্মক এবং সূক্ষ্মদর্শী। তিনি নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে নাটকগুলির বিচার করেছেন, ঐতিহাসিক নাটকগুলির বিচারে ইতিহাসবিচ্যুতি এবং ইতিহাসনিষ্ঠার সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রথীনবাবু নাটকবিচারে দ্বিজেন্দ্রলালের ধারাবাহিক বিবর্তনটিকেও ইঙ্গিতে আভাসে ধরবার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী নিবন্ধটি পূর্ব নিবন্ধটিরই দ্বিতীয় অংশ। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে দীনবন্ধুর এবং রবীন্দ্রনাথের নাট্যধর্মের পার্থক্য কোথায়, মিলই বা কতটুকু তা লেখক তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। নাটক আলোচনার উপসংহারে তিনি বলেছেন, 'অন্তর্দ্বন্দ্ববহুল চরিত্রসৃষ্টি, উজ্জ্বল-বলিষ্ঠ সংলাপ রচনা, নাটকীয় সংস্থান ও চমৎকারিত্বের সৃষ্টি, নাটকীয় টেকনিকের অভিনব প্রয়োগ, শেক্সপীয়রীয় নাট্যকলার অনুসরণ, নাটকে আধুনিক চিন্তা-চেতনার প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বাংলা রঙ্গমঞ্চের মধ্যে এক উন্নত রসের ধারা প্রবাহিত করেছিল—'নাট্যশালাগুলি 'বেল্লিকবাজার' থেকে 'আনন্দবাজারে' পরিণত হয়েছিল।'

দ্বিজেন্দ্রসংগীতের বিশিষ্টতা সকলেই লক্ষ করেছেন। এই গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রসংগীতের বিস্তৃত আলোচনা সকলকে মুগ্ধ করবে। লেখক উনবিংশ শতাব্দীর সংগীতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রসঙ্গত

পাশ্চাত্য সংগীতধারা বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে কি রকম প্রভাবশীল ছিল তার কথা বলেছেন। দ্বিজেন্দ্র-সংগীতে পাশ্চাত্য সংগীতরীতি কি রকম সুফল ফলিয়েছিল সে কথাও গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সংগীতের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্যকাল থেকেই টান ছিল। এবং তিনি নিষ্ঠা নিয়ে সংগীতচর্চাও করেছেন। বাংলার সুরকারদের মধ্যে তাঁর বিশিষ্টতাও স্মরণীয়। সুরকার দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গানে কি রকম সিদ্ধি পেয়েছিলেন রথীনবাবু সে কথা সবিস্তারে বলেছেন। এমনকি স্বদেশসংগীতেও দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্টতা সমালোচকদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়ায় নি। দ্বিজেন্দ্রনাটকে সংগীতের নিজস্ব মূল্য এবং নাটকীয় মূল্য নির্ধারণে রথীনবাবু আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, আমরা নাটকে গান শুনতে অভ্যস্ত। অনেক সময়েই নাটকে এই সংগীতের বাহুল্যকে বাঙালির বিশিষ্ট মানসিকতার উপর বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। রথীনবাবু তাঁর গ্রন্থে সে রকম প্রচলিত মতকে আমল না দিয়ে সংগীতগুলির নাটকীয় তাৎপর্যের উপরই জোর দিয়েছেন বেশি।

দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যরচনা বেশি নয়। বলা বাহুল্য, গদ্যরীতিতে দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন কৃতিত্ব নেই। তাঁর পত্রসাহিত্য, কালিদাস ও ভবভূতি সম্বন্ধে নিবন্ধ, 'চিন্তা ও কল্পনা'র প্রবন্ধাবলী রথীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণের বস্তু।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাকর্ম সমসাময়িককালে এবং পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে কিরকম প্রভাব ফেলেছিল তা পাঠকের কৌতূহলের বিষয়। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রজনীকান্ত সেন, প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম ইত্যাদি কবিবৃন্দ কোনো-না-কোনো প্রকারে দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট ঋণী। কেউ শব্দচয়নে, কেউ ক্লাসিক্যাল রীতির অনুসরণে, কেউ স্তবকনির্মাণপদ্ধতিতে, আবার কেউ ছন্দোনির্মাণে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কবিতায় যেমন, নাটকের ক্ষেত্রেও তেমনি, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাকর্মের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত। গ্রন্থকার এই প্রভাব-অনুসরণ-পর্বটি সংক্ষিপ্তভাবে উত্থাপন করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের বৈচিত্র্য ও ঐক্য নিবন্ধটিতে রথীনবাবু দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাকর্মের সার্থকতা কোথায় তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। লিরিসিজ্‌ম্ ও স্যাটায়ারের সর্বোত্তম সমন্বয় ঘটেছে মন্দ্র কাব্যগ্রন্থে। নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের সিদ্ধি দেশপ্রেম পরহিতব্রত আদর্শবাদ প্রভৃতি বৃত্তিগুলির উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রণের মধ্যে দিয়ে। এ ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় ত্রুটিবিচ্যুতির দিকটিও লেখক আলোচনা করতে দ্বিধা করেন নি। শেষজীবনে যে দ্বিজেন্দ্রলাল 'জনচিত্তরঞ্জন সুলভ উত্তেজনার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন' সে সম্বন্ধে লেখকের সন্দেহ নেই। ফলে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় ভাবাতিরেক-প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্রবিরোধিতা সে যুগে একটি বৃহৎ ঘটনা। একালের পাঠকও দ্বিজেন্দ্রলালের বিরোধিতার স্বরূপটি সম্বন্ধে সচেতন। 'আনন্দবিদায়' নাটকের অভিনয়-ঘটনাটি সাহিত্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, বোধ করি তা আজও অনেকের মন থেকে যায় নি। এই গ্রন্থে রথীনবাবু সে প্রসঙ্গটির আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর আলোচ্য বিষয় দ্বিজেন্দ্রলাল। সাধারণ লেখকের রচনায় এই বিষয়টি এমনভাবে উত্থাপিত হতে পারত যার ফল হত মারাত্মক। কিন্তু গ্রন্থকার প্রসঙ্গটিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের অযথা দোষক্ষালন করবার চেষ্টা করেন নি। তবে তিনি এ কথা বলেছেন, এ বিরোধ ব্যক্তিগত নয়— সাহিত্যগত। দুটি মতবাদের

বিরোধ। এ বিরোধ সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্গত। দ্বিজেন্দ্রলালের যখন কোনো খ্যাতি ছিল না তখন রবীন্দ্রনাথই তাঁকে সাহিত্যজগতে পরিচয় করে দেন। এতৎসত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন এমন আশা করা যায় না। রথীনবাবু বিরোধের সূত্রপাত থেকে বিরোধের শেষ পর্যায়টি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এ বিরোধে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ উৎসাহ থাকলেও বিরোধের পরিণাম যে কেমন আকার লাভ করবে সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না। লেখক দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মধুর সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র সপ্রশংস সমালোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে আমার যে পরিচয় স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য তাহা এই যে, আমি অন্তরের সহিত তাঁহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার লেখায় বা আচরণে কখনও তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই।' পরিশেষে রথীনবাবুর সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য 'রবীন্দ্রনাথের ললিত-মধুর কবিকীর্তির মোহ তাঁর [দ্বিজেন্দ্রলালের] ভাব-স্বাতন্ত্র্যকে আবিষ্ট করতে পারে নি— বস্তুসত্যের প্রতি বিশ্বাস বুদ্ধি বিচারের অতন্দ্র শাসন তাঁকে কাব্যমূল্যের আর-একটি প্রত্যয়ে অচল-প্রতিষ্ঠ করেছিল। কোনো সময় বিভ্রান্তি ঘটলেও তিনি মনের অনন্যতা হারান নি। রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল তাই অপঠিত ও অনাদৃত।'

আলোচ্য গ্রন্থের যে সংক্ষিপ্তসার সংকলন করা হল তা থেকে সহজেই বোঝা যাবে লেখকের আলোচনার পরিধি ব্যাপক। দ্বিজেন্দ্রলাল বিস্মৃতপ্রায় লেখক। বাঙালি পাঠক দ্বিজেন্দ্রলালকে বিস্মৃত হয়ে লাভবান হয় নি। এই গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলাল-সমীক্ষা একালের পাঠকের সামনে নূতন ইঙ্গিত দেবে। পূর্বসূরীদের আলোচনায় বর্তমান কালের সাহিত্যধারার বিচার সহজ ও সরল হয়ে ওঠে। এই গ্রন্থটি সে কাজে সহায়তা করবে।

রথীনবাবুর দৃষ্টি স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের অযথা স্তুতি করেন নি। দ্বিজেন্দ্রমানসের উৎস নিরূপণ করে তিনি তাঁকে যথাযথ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এককালে আমরা আমাদের নাট্য-আন্দোলন সম্পর্কে অতিরিক্ত উৎসাহী ছিলাম। সে সময় নাটকগুলির গঠনপারিপাট্য সম্বন্ধে দর্শক অবহিত থাকত না। রথীনবাবু একালে সেযুগের নাট্য-আন্দোলনের ঢেউগুলি লক্ষ করেছেন। সকল ঢেউই যে মনোহর, এ কথা তিনি বলেন নি। তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতির কথা তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন। আবার এই-সমস্ত নাট্যকর্ম একালেও যে আমাদের রসবোধকে তৃপ্ত করতে পারে সে কথা জানিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য প্রহসন গদ্যরচনা সম্বন্ধেও রথীনবাবু উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার মণিমুক্তা আহরণ করেছেন ও আমাদের উপহার দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রসংগীতের পারিভাষিক আলোচনা তিনি করেন নি, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রসংগীতের মৌলিকতা কোন্ কোন্ বস্তুর উপর নির্ভরশীল তা তিনি দেখিয়েছেন। লক্ষণীয় এই যে, এই গ্রন্থ পড়ার পরে ব্যক্তি-দ্বিজেন্দ্রলালের একটি পরিচ্ছন্ন চরিত্র পাঠকের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তাঁর প্রত্যেকটি রচনার পশ্চাতে যে ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা ছিল, যে ধ্রুব আদর্শের দ্বারা তিনি চালিত হয়েছিলেন লেখক তার বিবরণ দিয়েছেন। রথীনবাবুর পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। কেবল পরিশ্রমই নয় তাঁর অনুসন্ধিৎসা এবং রসবোধ একত্র হওয়াতে গ্রন্থটি সুখপাঠ্য হয়েছে। আশা করি গ্রন্থটি সর্বত্র আদৃত হবে।

বেশ কিছুকাল আগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে দ্বিজেন্দ্রগ্রন্থাবলী বার হয়েছিল। সে গ্রন্থটির সম্পাদনাও সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়েছিল। কিন্তু যতদূর জানি গ্রন্থাবলীখানি নিঃশেষিত হবার পরও পুনর্মুদ্রণের সৌভাগ্য লাভ করে নি। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কিন্তু আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে মিটিয়েছেন কবিপুত্র শ্রীদিলীপকুমার রায় 'দ্বিজেন্দ্রকাব্য-সঞ্চয়ন' গ্রন্থখানি বার করে। এই বইখানির জন্য সংকলক এবং প্রকাশক উভয়েই বাংলাদেশের কৃতজ্ঞতা পাবেন।

'সঞ্চয়ন' গ্রন্থখানিতে দ্বিজেন্দ্রলালের সব কাব্যগুলির কবিতা কিছু কিছু স্থান পেয়েছে। সবগুলিই ভালো কবিতা। নিঃসন্দেহে এ সংকলন দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভার সার্থক রূপ প্রকাশ করতে সমর্থ হবে। দিলীপবাবু নাট্যকাব্যের অংশবিশেষ এ সংকলন গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে যে কাব্যধর্মের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল এগুলি থেকে তা বোঝা যাবে। পরিশেষে *Lyrics of Ind* গ্রন্থ থেকে দুটি কবিতা চয়ন করে শ্রীদিলীপকুমার আমাদের জানিয়েছেন ভবিষ্যতে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের একটি গদ্য-সংকলন গ্রন্থও প্রকাশ করবেন। আশা করি অচিরকালের মধ্যে সেই সংকলনটি প্রকাশিত হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলিকে মোট পাঁচটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে— পূজা, দেশ, প্রেম, প্রকৃতি ও বিবিধ। গানগুলির বিষয়ের দিক থেকে এই বিভাগ রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতানে'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিবিধ পর্যায়ে সংকলক বৈরাগ্য, সিন্ধু, অনামী, আবেশ, নাস্তিক্য ও অপেরা সংগীত জাতীয় গান ন্যস্ত করেছেন।

সংকলনে যে কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলির পুনরালোচনা এ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। রথীন্দ্রবাবু তাঁর গ্রন্থে সে সব কবিতার আলোচনা করেছেন। দিলীপকুমার স্বয়ং কবি। সুতরাং তাঁর বিচারের উপর আস্থা স্থাপন করতে কুণ্ঠা নেই। 'হাসির গান' পর্যায়ে তানসান-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ, নন্দলাল ইত্যাদি কবিতা যে এখনও চমক সৃষ্টি করতে পারে, আমাদের সুপ্তিকে নাড়িয়ে দিতে পারে এ কথা বলাই বাহুল্য। আষাঢ়ের 'কর্ণবিমর্দন-কাহিনী'র কথা কার না পড়ে। মন্দ্র কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রকাব্যপ্রতিভার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যটি সহজে উপলব্ধ হয়ে আসে। আলেখ্য কাব্যগ্রন্থে ছন্দের যে বিচিত্র রূপনির্মাণ-কলা কবিকে আকৃষ্ট করেছিল সংকলক সেরকম কবিতা গ্রন্থে স্থান দিয়ে পাঠকদের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

গ্রন্থটির একটি অভিনবত্বের দিক হল সংকলক বাংলার কয়েকজন লেখক-সুরকার-কবিকে আহ্বান করেছেন দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে। শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টি দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য কাব্য ও সংগীতের আলোচনা করেছেন। 'প্রাক্‌কথন' প্রবন্ধটিতে কালিদাসবাবু দ্বিজেন্দ্রকাব্য ও সংগীত নিয়ে আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের সঙ্গে তিনি যে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। নিজে কবি বলে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার রীতিবৈচিত্র্য নিয়েও কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধক সংগীতগুলিতে মাঝে মাঝে কয়েকটি ছত্র কিংবা কিছু শব্দ হঠাৎ বেমানান বলে মনে হতে পারে। কালিদাসবাবু সেসব শব্দ কিংবা ছত্র যে সঙ্গতভাবেই প্রয়োগ করা হয়েছে সেকথা নিপুণভাবে বলেছেন।

রথীন্দ্রবাবু দ্বিজেন্দ্রনাট্য-আলোচনায় উৎসাহবোধ করেও শেষ পর্যন্ত বলেছেন দ্বিজেন্দ্রলালের সিদ্ধি কাব্যে ও গানে। সংকলক দিলীপকুমার রায়ও একই কথা বলেছেন। আমরা অনেকেই সুরকার রূপে

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে পরিচিত নই। এ সংকলনে জ্ঞানপ্রকাশবাবু ও রাজ্যেশ্বর বাবু সে দায়িত্ব অঙ্গীকার করে তাঁর বিভিন্ন গানের রাগরাগিণীর উল্লেখ সহ আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত পাশ্চাত্য সংগীতের কোনো বিশেষ দিকটি দ্বিজেন্দ্রলালে এসে মিশেছে সে কথাও পাচ্ছি। দিলীপবাবু দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দপ্রতিভা সম্বন্ধে মোটামুটি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথের তুলনা নেই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালও যে বাংলা ছন্দে অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে অভিনবত্ব এনেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম দ্বিজেন্দ্রলালকে কোনো দুটি ইংরেজি গ্রন্থ বিশেষভাবে মুগ্ধ এবং প্রভাবিত করেছিল। রিচার্ড হ্যারিস বারহাম-এর 'ইনগোল্‌ড্‌স্‌বি লেজেণ্ড' এবং টমাস ক্রফটন ক্রকারের 'পপুলার সংস্‌ অফ আয়র্লণ্ড'। দ্বিজেন্দ্রলাল যে গ্রন্থে উদ্ধৃত কবিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন বিশেষ করে মিলবিন্যাসের ক্ষেত্রে সে কথা আমাদের জানা ছিল না। কালিদাসবাবু এবং দিলীপবাবু উভয়েই দ্বিজেন্দ্রলালের মিলবিন্যাসের চমৎকারিত্বের দিকটি প্রচুর পরিশ্রম করে তুলে ধরেছেন। যেমন, ভাংলো/বাংলো; মণিমঞ্চবান/হবে পঞ্চবান, গুনগুনিয়া/হত দুনিয়া, মজার জিনিস/চিরদিন! ইশ!, বারবেলায়/তার ঠেলায়, সুখে থাকত/ভারি শাক্ত, প্রাণান্ত/জানত। এই প্রসঙ্গে মিলবিন্যাসে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে আরও দুজন কবির কথা স্বতই মনে আসে— একজন প্রমথ চৌধুরী, দ্বিতীয়জন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। দিলীপকুমার বলতে চেয়েছেন আর্যগাথার উৎসর্গ কবিতাটির ছন্দে বলাকার ছন্দের পূর্বাভাষ সূচিত হয়েছিল। দ্বিমাত্রিক সংস্কৃত গুরু স্বরের প্রয়োগে দ্বিজেন্দ্রলালের সাংগীতিক মনই আকৃষ্ট হয়েছিল বেশি। ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ আছে আর্যগাথার একটি গানে— গুরু স্বরকে দীর্ঘায়িত করে প্রয়োগ করার মধ্যে যে দুঃসাহস আছে। যদি কোনো কবির লেখায় তার সার্থক প্রয়োগ পাই তবে উল্লসিত হই। দ্বিজেন্দ্রলালের দুঃসাহসিকতা আমাদের মুগ্ধ করে। দ্বিজেন্দ্রলালের ত্রিস্বর স্বরবৃত্তের নমুনা হিসাবে দিলীপবাবু 'স্ত্রীর উমেদার' কবিতাটির কিছু অংশ ছন্দোলিপি করে দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রয়োগ মৌলিক। রথীনবাবু এবং দিলীপবাবু উভয়েই দ্বিজেন্দ্রলালের অক্ষরবৃত্ত ছন্দে বৈচিত্র্য দেখেছেন। এই বৈচিত্র্য এসেছে অক্ষরবৃত্তের স্বরবৃত্তের প্রতিরূপে। পরিশেষে দিলীপকুমার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে দ্বিজেন্দ্রলালের গানে ছন্দের সাহায্যে কিভাবে ছবি ও গানের অপরূপ সমাবেশ হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এ সংবাদটির জন্য সংকলকের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। দিলীপবাবু প্রসঙ্গটি উত্থাপন না করলে গানটির মাধুর্য অনেকের কাছেই অপরিজ্ঞাত থেকে যেত।

শ্রীবিজিতকুমার দত্ত

বৈদিকী। শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। বাণীতীর্থ, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

ঋগ্বেদসংহিতা ভারতীয় আর্যগণের প্রাচীনতম সাহিত্যসৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, এবং সর্বাধিক সম্মানিত ধর্মগ্রন্থরূপে পরিগণিত। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ বৈদিক মন্ত্রসমূহকে হয় অপৌরুষেয় অথবা ঈশ্বরপ্রণীত এবং নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। মনুপ্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারগণ বেদকে 'সর্বজ্ঞানময়' এবং সর্ববিধ ধর্মের আকর রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। 'বেদাদ্ ধর্মো হি নির্বভৌ' 'সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ'— ইত্যাদি মনুবচন তাহার সাক্ষ্য। বেদের প্রতি এই শ্রদ্ধা ভারতীয় বেদপন্থী আর্যগণের চিত্তে জন্মগত সংস্কাররূপে দৃঢ়মূলভাবে

রোপিত। ইহার এক সুফল হইয়াছে এই যে বৈদিক সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে রক্ষা করিবার জন্য ভারতীয়গণ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন; এবং সেই সশ্রদ্ধ প্রযত্নের ফলস্বরূপ আমরা মহেঞ্জোদারোর সিন্ধুসভ্যতারও পূর্ববর্তী (?) বৈদিক সাহিত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অমূল্য নিদর্শনরাজি এখনও পর্যন্ত অবিকৃতভাবে অনুশীলন করিবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

বৈদিক যুগে 'ঋষি' ও 'কবি' এই দুইটি শব্দই ছিল সমানার্থক। 'ঋষি' শব্দের অর্থ 'দ্রষ্টা'। যাঁহারা অলৌকিক শক্তিবলে অতীন্দ্রিয় ও শাশ্বত, অতীত অনাগত ও বর্তমান, সন্নিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট সর্বজাতীয় অর্থ প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিতে সমর্থ, তাঁহারাই 'ঋষি', তাঁহারাই 'কবি'। 'অপশ্যমস্য মহতো মহিত্বম্ / অমর্ত্যস্য মর্ত্যাসু বিক্ষু'। এই অলৌকিক দর্শনশক্তি বৈদিক ঋষিকবিগণ লাভ করিতেন অগ্নি, ইন্দ্র, সোম প্রভৃতি দেবতাগণের প্রসাদে। সোমদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া এক মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'ঋষিমনা য ঋষিকৃৎ স্বর্ষাঃ / সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাম্', ; আবার, 'ঋষির্বিপ্রো বিচক্ষণস্ত্বং কবিরভবো দেববীতমঃ'—ইত্যাদি। সুতরাং বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ দেবতার প্রসাদে সেই অলৌকিক দৈবী শক্তির অধিকারী হইতেন। অতএব, মন্ত্ররচনা সম্বন্ধে তাঁহাদের সচেতন কর্তৃত্ববোধ না থাকিবারই কথা। কিন্তু ঋগ্বেদীয় মন্ত্রসমূহ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ঋষিগণ তাঁহাদের অলৌকিক দর্শনক্ষমতা সম্পর্কে যেমন সচেতন ছিলেন, অনুরূপভাবে সচেতন ছিলেন মন্ত্রের সৌষ্ঠব সম্পাদন বিষয়ে; ছন্দোনির্বাচন, শব্দচয়ন, অলংকার-প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদের সাবধানতা কিছুমাত্র ন্যূন ছিল বলিয়া তো মনে হয় না। বহু ঋক্‌মন্ত্রে মন্ত্রকৃৎ ঋষি তক্ষার সহিত উপমিত হইয়াছেন। সুনিপুণ রথকার যেমন যথাযথভাবে তক্ষণকরতঃ রথটিকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত করিবার চেষ্টা করে, সেইরূপ মন্ত্রকৃৎ ঋষি আপন মনীষার সাহায্যে মন্ত্রবর্ণটিকে আরাধ্য দেবতার হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিবার জন্য সতত যত্নশীল—'এতং তে স্তোমং তুবিজাত বিপ্রো / রথং ন ধীরাঃ স্বপা অতক্ষম্ /', 'ইন্দ্র ব্রহ্ম ক্রিয়মাণং জুষস্ব / যা তে শবিষ্ঠ নব্যা অকর্ম / বস্ত্রেব ভদ্রা সুকৃতা বসূয়ুঃ / রথং ন ধীরাঃ স্বপা অতক্ষম্'—ইত্যাদি। অতএব বৈদিক ঋষিকবিগণ শুধু অলৌকিক দৈবী শক্তিসম্পন্নই ছিলেন না, তাঁহারা আত্মসচেতন সুনিপুণ ভাষাশিল্পীও ছিলেন। এই দিক্ দিয়া প্রাচীন ঋষিকবিগণের সহিত পরবর্তী লৌকিক কবিগণের এক ঘনিষ্ঠ সাজাত্য বর্তমান। অতএব বৈদিক মন্ত্রগুলিকে যেমন অতীন্দ্রিয় শাশ্বত ধর্মের আকরস্বরূপে আলোচনা করিতে পারা যায়, সেইরূপ সুনিপুণ শিল্পকর্মরূপেও ঐগুলির অনুশীলন করা অসম্ভব বা অযথার্থ নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যদিও পাশ্চাত্য দেশে বৈদিক সূক্তসমূহের কাব্যসৌন্দর্য নানাদিক্ দিয়া উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করিবার বহুবিধ চেষ্টা হইয়াছে বটে, তথাপি বেদের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষে ঋগ্বেদকে স্বতন্ত্র শিল্পসৌন্দর্য-মণ্ডিত কবিকর্মরূপে আলোচনা করার কোনো সার্থক উদ্যম এযাবৎ অতি স্বল্পই আমাদের গোচরে আসিয়াছে। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সায়ণভাষ্য অবলম্বন করতঃ উইল্‌সন প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি ভাষান্তরের সহিত মিলাইয়া সমগ্র ঋগ্বেদের একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু বৈদিক গবেষণার ধারা বর্তমান যুগে তদানীন্তন অনুসৃত পদ্ধতি হইতে বহুলাংশে অগ্রসর হইয়াছে। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য দেশসমূহে—বিশেষতঃ ফ্রান্স ও জার্মানিতে, নবীন পদ্ধতি অবলম্বনে এবং আধুনিক গবেষণার উপর ভিত্তি করিয়া একাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে দুঃখের বিষয় সমগ্র ঋগ্বেদের দ্বিতীয় কোনো বঙ্গানুবাদ আর আমরা দেখিলাম না।

কেবলমাত্র বঙ্গানুবাদের সাহায্যে ঋগ্বেদীয় সূক্তসমূহের কাব্যসৌন্দর্য ও শিল্পসুষমা, ঋষিকবিগণের গভীর ভাবাবেগ—ইহাদের কোনোটিরই যথাযথ উপলব্ধি সম্ভবপর নহে। ঋষিগণের কবিত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে বৈদিক সূক্তসমূহের কাব্যানুবাদের মধ্য দিয়াই তাহা সম্ভব। কিন্তু সেই কাব্যানুবাদ এক দিকে যেমন মূলানুগ এবং নির্ভরযোগ্য হওয়া প্রয়োজন, সেইরূপ অনুবাদকের কবিত্বের সহিত সৌষ্ঠববোধের সমন্বয় তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হওয়া চাই। এই প্রসঙ্গে একজন সুবিখ্যাত ফরাসী মনীষীর উক্তি মনে পড়িবে—'Les traductions sont comme les femmes; lorsqu'elles sont belles elles ne sont pas fidèles et lorsqu'elles sont fidèles elles ne sont pas belles.' ঋগ্বেদের অধিকাংশ সূক্তই দেবস্তুতি; তথাপি লৌকিক জীবনের দৈনন্দিন তুচ্ছ আচার-অনুষ্ঠান, সমসাময়িক রাজন্যবৃন্দের স্তুতি, নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনা, যুদ্ধবিগ্রহাদির বিবরণও ঋষিগণের প্রজ্ঞার বহির্ভূত ছিল না। নিরুক্তকার আচার্য যাস্ক বলিয়াছেন—"উচ্চাবচৈরভিপ্রায়ৈর্ঋষীণাং মন্ত্রদৃষ্টয়ো ভবন্তি।" সুতরাং ঋগ্বেদের এক দিকে যেমন ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তুতি ও হিরণ্যগর্ভসূক্ত, দেবীসূক্ত, সৃষ্টিসূক্ত প্রভৃতি ভাবগম্ভীর মন্ত্রবর্ণগুলি রহিয়াছে, অনুরূপভাবে আর-এক দিকে আছে অক্ষসূক্ত, ঝঞ্ঝাসূক্ত, অরণ্যানীসূক্ত, রাজা সুদাসের যুদ্ধ, নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ, পুরূরবা ও উর্বশীর সংবাদসূক্ত ইত্যাদি। অবশ্য বেদকে যাঁহারা নিত্য ও অপৌরুষেয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই শেষোক্ত শ্রেণীর মন্ত্রবর্ণকে লৌকিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। আচার্য যাস্ক তাঁহার নিরুক্তভাষ্যে সেইজন্য বেদব্যাখ্যার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন—অধিযজ্ঞ, অধিদৈব, অধ্যাত্ম, নৈরুক্ত ইত্যাদি। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যান-পদ্ধতিরও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। বেদের এই 'ঐতিহাসিক ব্যাখ্যান'-ই,—ইংরেজিতে যাহাকে বলা হয় 'historical interpretation of the Vedas'—আধুনিক পণ্ডিতগণের অভিমত। ইহার দ্বারা বেদকে আমরা ভারতীয় আর্যগোষ্ঠীর সভ্যতার বিবর্তনের একটি বিশিষ্ট এবং প্রাচীনতম স্তরের বাঙ্ময় সাক্ষ্যরূপে দেখিতে শিখিয়াছি। বেদকে শুদ্ধমাত্র ধর্মগ্রন্থরূপে দেখিতে অভ্যস্ত বলিয়া, আমরা ইহার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের বহু উৎকৃষ্ট কাব্য-নাটকাদির বীজ নিহিত। ঋগ্বেদের অন্তর্গত পুরূরবা ও উর্বশীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটক ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এমনকি স্বয়ং ব্যাসদেব 'মহাভারত' সম্বন্ধে এমন কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই যে—"দশভ্য ঋক্‌সহস্রেভ্যো নির্মথ্যামৃতমুদ্ধৃতম্"। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কয়েকজন পূর্বসূরি ঋগ্বেদীয় মন্ত্ররাজির কিছু কিছু বঙ্গানুবাদ কাব্যাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নিতান্তই স্বল্প। তাহার দ্বারা ঋগ্বেদের অনন্ত বৈচিত্র্যের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। কবি শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'বৈদিকী' নামক কাব্যগ্রন্থে ঋগ্বেদের অন্তর্গত অল্পাধিক ত্রিশটি নাতিদীর্ঘ সূক্ত বা সূক্তাংশের একটি শোভন অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বাংলাসাহিত্যের একটি শাখাকে সমৃদ্ধ করিলেন। সূক্তগুলির নির্বাচন বেশ সুনিপুণ হইয়াছে; ইহার দ্বারা বৈদিক মন্ত্রকৃৎ কবিগণের কল্পনার বিচিত্র লীলার কিছুটা আভাস আমরা পাই। অনুবাদ যে বেশ সাবলীল হইয়াছে তাহা অকুণ্ঠচিত্তেই বলিতে পারা যায়। মন্ত্রের গাম্ভীর্যও যাহাতে সংরক্ষিত হয় সেজন্যও অনুবাদক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। অনুবাদকের

আর-একটি বিশেষ কৃতিত্ব এইযে, প্রতিটি অনুবাদই আধুনিক পাঠকের সাহিত্যরুচির অনুগামী হইয়াছে, কোথাও অনুবাদভঙ্গী আধুনিক বাংলাকবিতার পাঠকসমাজের রুচির পরিপন্থী হয় নাই। ইহাতেই অনুবাদের সার্থকতা। বিশেষতঃ 'বরুণ-সূক্ত' 'অরণ্যানী-সূক্ত' প্রভৃতি কয়েকটি সূক্তের অনুবাদে ওজোগুণসম্পন্ন গম্ভীর গদ্যচ্ছন্দের সুনিপুণ প্রয়োগ অনুবাদকের সূক্ষ্ম শিল্পবোধের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। গ্রন্থের অন্তে সন্নিবিষ্ট 'বৈদিকী' নামক স্বতন্ত্র কবিতাটিতে বৈদিক মন্ত্রকৃৎ ঋষিগণের উদ্দেশে অনুবাদকের গভীর মমতাপূর্ণ কাব্যোচ্ছ্বাসের ভিতরে সমগ্র অনুবাদের অন্তর্নিহিত যোগসূত্রটি বিধৃত রহিয়াছে। উক্ত কবিতার অন্তিম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করিয়া আমরা আমাদের বর্তমান সমালোচনার উপসংহার করিতে চাই—

আজও প্রতিদিন তেমনি প্রভাতে নবীন সূর্য্য উঠে,
তেমনি হাসিয়া তরুণী উষার আঁচল ধরিতে ছুটে।
আজিও অরণি-মন্থনে বনে অনল উঠিছে জ্বলি,
আজিও মরুৎ বজ্র হানিয়া চলিছে আকাশ দলি,
আজিও নবীন-নীরদ-পুঞ্জে ছেয়ে যায় নীলাকাশ,
আজিও দেবতা বর্ষণ ঢালি মিটায় ধরার আশ।
কত সুন্দর, কত মনোহর! তবু যেন মনে হয়
প্রাণের পাত্র ভরে না'ক সব— খানিক শূন্যময়!
সেদিন প্রভাতে সূর্য চাহিয়া গেয়েছিল যেই প্রাণ
তাহার খানিক হারায়ে ফেলেছি, নাহি আর সন্ধান!
আজিকার এই উদয়-আকাশ-পানে চাহি মনে হয়
হে ঋষি কুৎস! তোমার সূর্য সে যেন আমার নয়!

পরিশেষে আমরা শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই, এবং আশা করি তিনি ঋগ্বেদের অন্যান্য সূক্তরাজির অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙালি পাঠকসমাজকে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

সংশোধন

বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯, পৃ ১৪৫, শেষ ছত্র। ওয়ার্ডসওয়ার্থ স্থলে পোপ হবে।
পোপের উক্তিটি হচ্ছে—

Know then thyself, presume not God to scan"
The proper study of mankind is Man.

—*Essay on Man,* Epistle ii,

স্বরলিপি

পিণাকেতে লাগে টঙ্কার—
বসুন্ধরার পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শঙ্কার ॥
আকাশেতে ঘোরে ঘূর্ণি   সৃষ্টির বাঁধ চূর্ণি,
বজ্রভীষণ গর্জনরব প্রলয়ের জয়ডঙ্কার ॥
স্বর্গ উঠিছে ক্রন্দি,   সুরপরিষদ বন্দি—
তিমিরগহন দুঃসহ রাতে উঠে শৃঙ্খলঝঙ্কার।
দানবদম্ভ তর্জি   রুদ্র উঠিল গর্জি—
লণ্ডভণ্ড লুটিল ধুলায় অভ্রভেদী অহঙ্কার ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

ঈষৎ মধ্য লয়ে গেয়

II (জ্ঞ)মা (জ্ঞ)মা রা । রা সা সা I রা -পা মা । -জ্ঞা -া -া I
পি ণা কে তে লা গে ট ঙ্ কা ০ ০ র্

I (জ্ঞ)মা মা -া । রা সা -া I রা -া জ্ঞা । রা (স)ন্া -া I
ব সু ন্ ধ রা র্ প ন্ জ র ত ০

I সা -া -া । -া -া -া I র্সর্জ্ঞা -া র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I
লে ০ ০ ০ ০ ০ কং ম্ প ন জা গে

I র্জ্ঞর্মা -া র্রা । -র্সা -া -া I -মা -পা -র্সা । -না -র্সা -র্রা I
শং ঙ্ কা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -না -র্সা -া । -মা -জ্ঞা -া II
০ ০ • ০ ০ র্

II মা পা ণপা । ণপা না না I না -া র্সা । -া -া -া I
আ কা শেং তেং ঘো রে ঘ্ র্ ণি ০ ০ ০

I মা -া পা । পা ণপা না I না -া র্সা । -া -া -া I
সৃ ষ্ টি র বাঁং ধ চূ র্ ণি ০ ০ ০

I মা -পা পা । পা পা পমা I পা -ণা ণধা । ণধা ধণা পা I
ব জ্ জ্র ভী ষ ণং গ র্ জং নং রং ব

I ^পর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্রর্জ্ঞা -র্মা র্রা । -া -র্সা -া I

প্র ল য়ে র জ য় ড° ঙ্ কা ° ° °

I -মা -পা -র্সা । -না -র্সা -র্রা I -না -র্সা -া । -মা -জ্ঞা -া II

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° র্

II মা -া পা । পা পা পা I পা -মা মা । -ণা -া -া I

স্ব র্ গ উ ঠি ছে ক্র ন্ দি ° ° °

I ধা ণা ধা । ণা ধা পা I পধা -মা পা । -া -া -া I

সু র প রি ষ দ ব° ন্ দী ° ° °

I মা পা পমা । মণা ণা ণা I ধা -া ণা । ধা পা -মা I

তি মি র° গ° হ ন দুঃ ° স হ রা °

I পা -া -মা । -জ্ঞা -া -া I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞমা । -া রা সা I

তে ° ° ° ° ° উ ঠে শৃ° ঙ্ খ ল

I রা -া সা । -া -া -া I মা পা পা । পণা -পা না I

ঝ ঙ্ কা ° ° র্ দা ন ব দ° ম্ ভ

I না -া র্সা । -া -া -া I মা -া পা । পা ণপা না I

ত র্ জি ° ° ° রু ° দ্র উ ঠি° ল

I না -া র্সা । -া -া -া I র্সণা -া ণা । ণা -া ণা I

গ র্ জি ° ° ° ল° ণ্ ড ভ ণ্ ড

I ধা ণা ণা । ণা ধা -পা I পর্জ্ঞা -া র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I

লু টি ল ধু লা য়্ অ° ভ্ র ভে দী অ

I ^র্জ্ঞর্মা -া র্রা । -া -র্সা -া I -মা -পা -র্সা । -না -র্সা -র্রা I

হু ঙ্ কা ° ° ° ° ° ° ° ° °

I -না -র্সা -া । -মা -জ্ঞা -া II II

° ° ° ° ° র্

সম্পাদকের নিবেদন

আমরা অনেক সময়ে আক্ষেপ করে থাকি যে, আমরা আমাদের দেশের অনেক কৃতী সন্তানের কথা ভুলে গিয়েছি; একদা যাঁদের আমরা নিত্য স্মরণ করেছি তাঁদের কথা আমরা নাকি মনে রাখি নি। নিজেদের বিরুদ্ধেই আমাদের এ অভিযোগ; তবুও মনে হয় আমরা বুঝি অকারণেই নিজেদের উপর এই দোষ আরোপ করছি।

প্রত্যহ নামোচ্চারণ না করলেই সম্ভবত বিস্মৃত হওয়া হয় না। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ভবভূতি কালিদাস ইত্যাদি নাম আমরা রোজ উচ্চারণ করি নে; শেলী কীট্‌স মিল্টন ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিয়ে রোজ সময় কাটাই নে; সুতরাং তাঁদের আমরা মনে রাখি নি, এমন বুঝি নয়।

আমাদের জীবনে মাঝে মাঝে আসে উৎসব এবং উপলক্ষ। সেই সুযোগে, নতুন ক'রে পাব ব'লে নূতন ভাবে আমরা কারও কারও সম্বন্ধে নূতন করে আলোচনা হয়তো করি। এর থেকে এমন কথা যেন মনে না হয় যে, এতদিন যার কথা আমরা ভুলে ছিলাম আজ তার কথা হঠাৎ মনে পড়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। এ বছরে তাঁর জন্মশতবার্ষিক-উৎসব পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে আমরা তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি রচনা এই সংখ্যায় প্রকাশ করে তাঁর উদ্দেশে শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম।

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বছর-দুইয়ের ছোট ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। একই যুগে একই কালে দুই জনে পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা করেছেন। পাশাপাশি থাকলে কখনো কখনো সংঘর্ষ ঘটে— কখনো মনের, কখনো-বা মতের। সাহিত্যের আদর্শ নিয়ে এঁদের দুজনের মধ্যে মতান্তর যে ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেটা একটা ঘটনা অবশ্যই; এবং দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনার ভাষা সময় সময় হয়তো সৌজন্যের সীমা ছাড়িয়েও গেছে। কিন্তু সেটাকে বড় করে দেখার আবশ্যকতা নেই। মৃত্যুতে সেসব ধুয়ে মুছে গেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল 'চিত্রাঙ্গদা' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ কথা বলেছেন বটে, কিন্তু প্রায় সেই সময়েই (বাণী।১৩১৭ আশ্বিন-কার্তিক) রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, বলেছেন, "এ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের গৌরব।" তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য ছিল মতের ও পথের; কিন্তু তার কথা আজকের দিনে ভাবব না। উভয়ের মধ্যে যেটুকু অন্তরঙ্গতা ছিল, আজকের দিনে— বিশেষ করে বর্তমানে, শতবার্ষিক-উৎসব উদ্‌যাপনের সময়ে— আমরা সে কথাই স্মরণ করব। অন্তরঙ্গতার নিদর্শন রূপে এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রলালের একটি সনেট— একটি নিমন্ত্রণলিপি— দ্বিজেন্দ্রহস্তাক্ষরে মুদ্রিত হল।

স্বীকৃতি

রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' প্রবন্ধ রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রলালের 'সনেট'-পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীনন্দলাল বসুর 'শীতের পদ্ম' চিত্রের ব্লক শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চিত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-চিত্রশালা থেকে পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থটির পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হল। প্রথম সংস্করণে (১৩৪৩) ছন্দ-বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের যেসব রচনা গ্রন্থভুক্ত হয় নি, বর্তমান সংস্করণে সেসব রচনা সংকলিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন।

এ ছাড়া ছন্দ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ও ভাষণ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থশেষে সংজ্ঞাপরিচয় পাঠপরিচয় পাণ্ডুলিপি-পরিচয় ও দৃষ্টান্তপরিচয় সংযোজিত। মূল্য ৮·০০ টাকা

লক্ষ্মীর পরীক্ষা

ছোটদের অভিনয়োপযোগী এই নাট্যকবিতাটি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। মূল্য ১·০০ টাকা

স্বদেশী সমাজ

'যে দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সেই দেশকে সম্পূর্ণ আপন করে তুলতে হবে' এ বিষয়ে জীবনের বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথ বারবার যে আলোচনা করেছেন তারই কেন্দ্রবর্তী হয়ে আছে 'স্বদেশী সমাজ' (১৩১১) প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধ ও তারই আনুসঙ্গিক অন্যান্য রচনা ও তথ্যের সংকলন 'স্বদেশী সমাজ' গ্রন্থ। মূল্য ৩·০০ টাকা

গল্পগুচ্ছ ৪র্থ খণ্ড ৫·০০

গল্পগুচ্ছের এই খণ্ড প্রকাশের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গল্প গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

ARROWROOT
স্বাদে ও গন্ধে
অতুলনীয়
লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

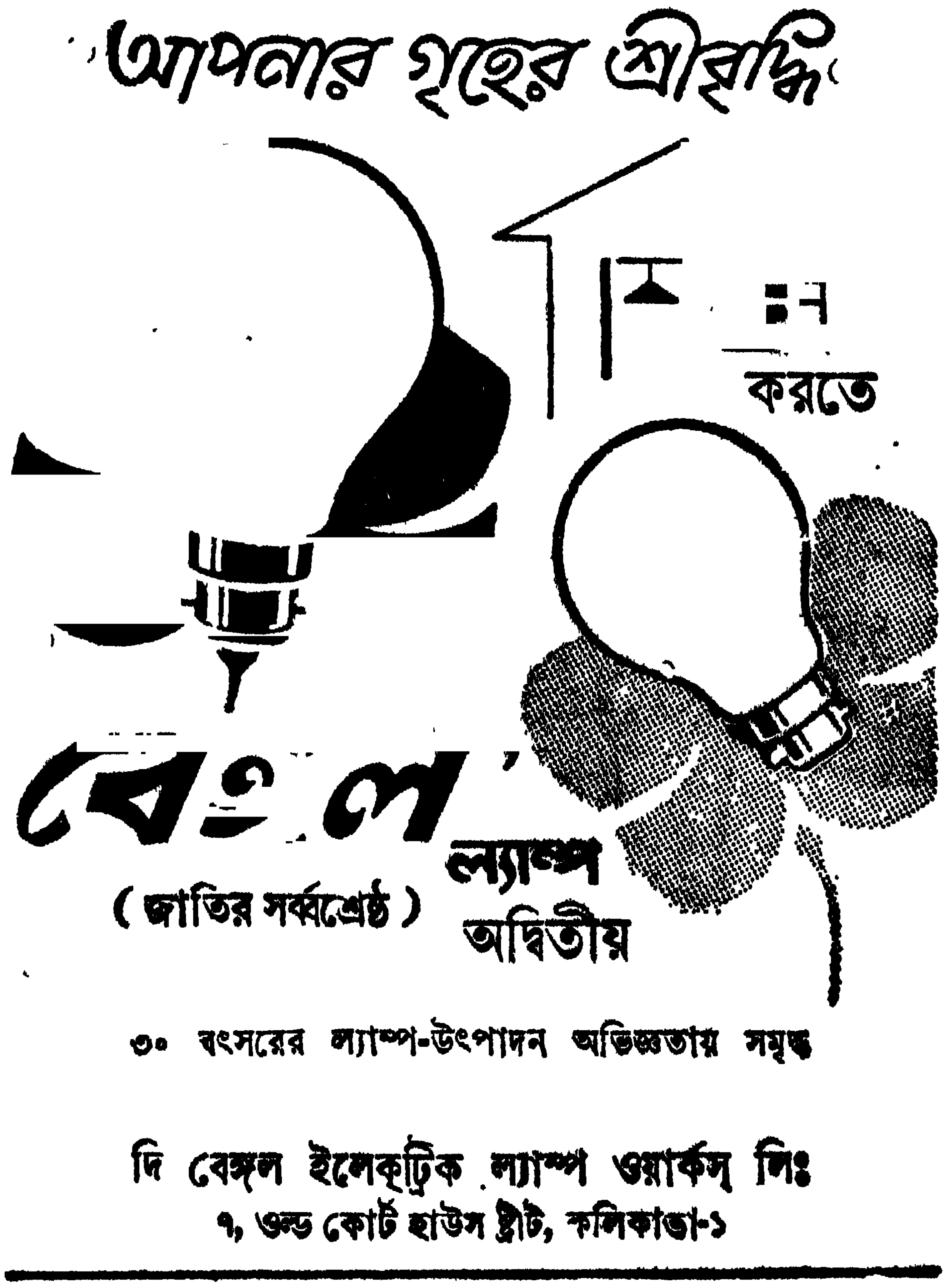
আপনার গৃহের শ্রীবৃদ্ধি
করতে
বেঙ্গল
ল্যাম্প
(জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ)
অদ্বিতীয়
৩০ বৎসরের ল্যাম্প-উৎপাদন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ
দি বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস্ লিঃ
৭, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা-১

an immensely enjoyable
Drink
VITO
Here is a soft drink which you will enjoy in all weathers and in all circumstances. It is manufatured with pure sugar and compound fruit flavours.
SPENCER AERATED WATER FACTORY PRIVATE LTD.
CALCUTTA-14.

রাত্রির কুহকে,শঙ্কার মত্ততার একটি রহস্যময় কাহিনী
অগ্রগামী প্রোডাকসন্সের
নিবেদন
রবীন্দ্রনাথের
নিশীথে
রূপায়ণে
উত্তম·সুপ্রিয়া
নন্দিতা·গঙ্গাপদ
রাধামোহন
ছায়া দেবী
পরিচালনা
অগ্রগামী
সুরশিল্পী
সুধীন দাশগুপ্ত
চণ্ডীমাতা ফিল্মস
পরিবেশিত
মিনার • বিজলী • ছবিঘরে আসছে

মেয়েদের মন আর মতি স্বয়ং দেবা ন জানন্তি। অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনায় সত্যঘটনামূলক বিভিন্ন ও বিচিত্র নারী-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ রূপায়ণ।

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল, এম, এস-সি প্রণীত

আমার দেখা মেয়েরা

রহস্য-রোমাঞ্চের স্বর্ণখনি। মূল্য চার টাকা

আসন্ন প্রকাশ

রায় গুণাকর

ভারত চন্দ্রের গ্রন্থাবলী

মুকুন্দ রাম চক্রবর্ত্তীর

কবি কঙ্কণ চণ্ডী

সোনার বাঙলার সোনার কাব্য

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

অসংখ্য বহুবর্ণ চিত্র

মূল্য আট টাকা

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত

ভক্তগণের কণ্ঠহার, তুলসীমালা সদৃশ

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

মূল্য চারি টাকা

আর্যকীর্তির অক্ষয় ভাণ্ডার

কাশীদাসী মহাভারত

সুরঞ্জিত চিত্রের সমাবেশে পূর্ণ

কাশীরাম দাসের জীবনী সহ

১ম ৬৲ ২য় ৬৲

ভক্তির মন্দাকিনী—প্রেমের অলকানন্দা

স্বর্ণপত্রে সুসজ্জিত দেবেন্দ্র বসু বিরচিত

শ্রীকৃষ্ণ

মূল্য পনেরো টাকা

শ্রীজয়দেব গোস্বামী বিরচিত

শ্রীগীতগোবিন্দম্

ভক্তজন মনোলোভী সুধাধারা

মূল্য দুই টাকা

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা

শ্রীরূপ গোস্বামীর

বিদগ্ধমাধব (টীকা সহ)

মূল্য তিন টাকা

মহাকবি কালীদাসের গ্রন্থাবলী

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত বঙ্গানুবাদ ও মূল সহ রঘুবংশ : মালবিকাগ্নিমিত্র : ঋতুসংহার : শৃঙ্গার-তিলক : পুষ্পবাণবিলাস : শৃঙ্গার রসাষ্টক : কুমার-সম্ভব : নলোদয় মেঘদূত : শকুন্তলা : বিক্রমোর্বশী : শ্রুতবোধ : দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা : কালিদাস-প্রশস্তি। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ।

প্রতি খণ্ড তিন টাকা

মহাকবি সেক্সপীয়ারের গ্রন্থাবলী

ম্যাকবেথ : মনের মতন : এণ্টনি ক্লিওপেট্রা : রোমিও জুলিয়েট : ভেরোনার ভদ্রযুগল : জুলিয়াশ সিজার : ওথেলো : মার্চেণ্ট অব ভেনিস : মেজার ফর মেজার : সিম্বেলিন : কিং লিয়র : টুয়েলফথ নাইট।

দুই খণ্ডে। প্রতি খণ্ড আড়াই টাকা

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষায় অনূদিত

মহাভারত ১ম, ২য়, ৩য় : প্রতি খণ্ড ৮৲

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও দিগ্বিজয়ী অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

নন্দরাণীর সংসার : রাবণ : পরিণীতা : সীতা : বিষ্ণুপ্রিয়া : মহামায়ার চর ও পূর্ণিমা মিলন। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খণ্ড দুই টাকা মাত্র।

সাহিত্যসম্রাট, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

বঙ্কিম গ্রন্থাবলী

সমগ্র সাহিত্য :: সমগ্র উপন্যাস

তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ :: তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ

প্রতি খণ্ড মূল্য দুই টাকা

বঙ্কিম উপন্যাসের নাট্যরূপ

চন্দ্রশেখর ২৲ রাজসিংহ ১৲ দেবী চৌধুরাণী ১৲ সীতারাম ১৲ কপালকুণ্ডলা ১৲ ইন্দিরা ও কমলাকান্ত ১৲ কৃষ্ণকান্তের উইল ১৲

প্রত্যেকটি অভিনয় উপযোগী।

পাঠাগার ও লাইব্রেরীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। পুস্তক বিক্রেতাগণের জন্য শতকরা কুড়ি টাকা কমিশন।

পুস্তক তালিকার জন্য পত্র লিখুন। ভি পি অর্ডারের সঙ্গে অর্ধেক মূল্য অগ্রিম প্রেরণীয়।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির ॥ কলিকাতা-১২

প্রকাশিত হইয়াছে

আত্মজীবনী

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী একখানি অপূর্ব গ্রন্থ। অতুল ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাসের দ্বারা বেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও কিরূপে তাঁহার মন বৈরাগ্যের অনলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, ঈশ্বরের জন্য একটি প্রবল পিপাসা কিরূপে তাঁহাকে অধিকার করিয়া ক্রমে তাঁহার সুখশান্তি হরণ করিল এবং কিরূপে পরে সেই পিপাসা তৃপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনে একটি পরম সার্থকতার অনুভূতি আনিয়া দিল— এই গ্রন্থে তিনি স্বীয় অতুলনীয় ভাষায় তাহা বিবৃত করিয়াছেন।"

আত্মজীবনীর এই সংস্করণে পরিশিষ্ট অংশে মহর্ষির জীবনের আরও অনেক তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে, এবং মহর্ষির যুগ-সম্পর্কিত কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সংযোজিত হইয়াছে।

বিষয়সূচী ও বংশলতিকা সন্নিবিষ্ট
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্র

মূল্য ১২·০০ টাকা

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের
দ্বি-ভাষিক ত্রৈমাসিক মুখপত্র

প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে
জানুয়ারীর শেষে

মূল্য এক টাকা

সম্পাদক : শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ

এ সংখ্যার লেখকসূচী :

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য
শ্রীমন্মথ রায়
শ্রীভবরঞ্জন দে
শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন
শ্রীসমর ভৌমিক
শ্রীদীপক বড়ুয়া
শ্রীঅমর ঘোষ
শ্রীঅনিল রায়চৌধুরী
শ্রীরঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়
শ্রীআরতি মৈত্র
শ্রীসুভাষ বসু
শ্রীপিনাকীরঞ্জন চক্রবর্তী
শ্রীহীরা দেবরায়

For a clear and comprehensive discussion of all aspects of rural industrialisation

KHADI GRAMODYOG

A monthly journal on rural economics, sociology and development
Editor : **S. C. Sarkar.**

Some Opinions :

"The volume is full of contributions from writers who should know their subject well, the topics are interesting and the number is very well produced."
—Dr. C. D. Deshmukh, President, India International Centre.

"I have read the Annual Number of the "Khadi Gramodyog" with great interest. There were quite a number of articles which showed evidence of clear and progressive thinking on khadi and village industries".
—Dr. B. N. Ganguli, Pro Vice-Chancellor, University of Delhi.

"I have no hesitation in saying that it is a great improvement on the previous annual numbers and contains very useful reading material pertaining to the development of Khadi and Village Industries."
—A. C. Joshi, Vice-Chancellor, Punjab University.

"It is an interesting publication and will be found useful by all those interested in the economy of Khadi."
—V. R. Sen, Vice-Chancellor, University of Jabalpur.

"It was a pleasure to have a copy of the Annual Number, From a little of the material that I have gone through, I feel that there has been an excellent collection of articles, for which I congratulate you.
—Dr. Ram Das, Director, Planning, Research and Action Institute, Lucknow.

Annual Subscription Rs. 2·50
Published in English and Hindi by
KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION
"Gramodaya", Vile Parle (West), BOMBAY-56.

বিশ্বভারতী পত্রিকা

পুরাতন সংখ্যা

বিশ্বভারতী পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা কিছু আছে। যাঁরা সেট সম্পূর্ণ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁদের অবগতির জন্য বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হল—

¶ প্রথম বর্ষের মাসিক বিশ্বভারতী পত্রিকার চার সংখ্যা পাওয়া যায়। একত্র ১'০০।

¶ তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১'০০।

¶ পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১'০০।

¶ অষ্টম বর্ষের প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১'০০।

¶ নবম বর্ষের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১'০০।

¶ ষষ্ঠ, সপ্তম, দশম, একাদশ ও চতুর্দশ বর্ষের সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যায়। প্রতি সেট ৪'০০, ডাকে ৬'০০।

¶ দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ বর্ষ নিঃশেষিত।

¶ পঞ্চদশ বর্ষের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১'০০।

¶ ষোড়শবর্ষের প্রথম সংখ্যা নিঃশেষিত; দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্ত-সংখ্যা, মূল্য ৩'০০, ডাকে ৪'০০।

¶ সপ্তদশ বর্ষের চারিটি সংখ্যা একত্রে একটি খণ্ডে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা-রূপে প্রকাশিত হয়। এখনও কয়েকটি খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে; মূল্য ৪'০০।

¶ অষ্টাদশ বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১'০০।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কলকাতার গ্রাহকবর্গ

স্থানীয় গ্রাহকদের সুবিধার জন্য কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত ক্রেতারূপে নাম রেজিস্ট্রি করবার এবং বার্ষিক চার সংখ্যার মূল্য চার টাকা অগ্রিম জমা নেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এইসকল কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা উল্লিখিত হল—

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
৩৩ কলেজ রো

ভবানীপুর বুক ব্যুরো
২বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড

যাঁরা এইরূপ গ্রাহক হবেন, পত্রিকার কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হলেই তাঁদের সংবাদ দেওয়া হবে এবং সেই অনুযায়ী গ্রাহকগণ তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। এই ব্যবস্থায় ডাকব্যয় বহন করবার প্রয়োজন হবে না এবং পত্রিকা হারাবার সম্ভাবনা থাকে না।

মফস্বলের গ্রাহকবর্গ

যাঁরা ডাকে কাগজ নিতে চান তাঁরা বার্ষিক মূল্য ৫'৫০ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলিকাতা ৭ ঠিকানায় পাঠাবেন যদিও কাগজ সার্টিফিকেট অব পোস্টিং রেখে পাঠানো হয়, তবুও কাগজ রেজিস্ট্রি ডাকে নেওয়াই অধিকতর নিরাপদ। রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানোর জন্য অতিরিক্ত ২০ লাগে।

রঞ্জন পাবলিশিং-এর বই

কুমারসম্ভব ৫·০০

প্রবোধেন্দু ঠাকুর অনূদিত

সংসারে বীর পুত্রের জন্মতত্ত্ব—'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যের কবির এই সুন্দর রহস্তকল্পনা রূপায়িত হয়ে উঠেছে। আচার্য নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্র ও একটি বহুবর্ণ চিত্র গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

আলেখ্যদর্শন ২·৫০

সুশীল রায়

কালিদাসের 'মেঘদূত' খণ্ডকাব্যের মর্মকথা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে নিপুণ কথাশিল্পীর অপরূপ গদ্যসুষমায়। মেঘদূতের সম্পূর্ণ নূতন ছায়ারূপ। বঙ্গসাহিত্যে নতুন আশ্বাস ও আস্বাদ এনেছে।

বিদ্যাসাগর পরিচয় ২·৫০

যোগেশচন্দ্র বাগল

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যশস্বী লেখকের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ। স্বল্প পরিসরে নির্ভরযোগ্য আলোচনা।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ২·৫০

মনোরঞ্জন গুপ্ত

প্রফুল্লচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ জীবনকথা। সুধীজনপ্রশংসিত সর্বজনপাঠ্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

তুহিন মেরু অন্তরালে ৩·০০

বসুধারা গুপ্ত

সরস ভঙ্গীতে লেখা কেদার-বদরী ভ্রমণের মনোজ্ঞ কাহিনী। ভ্রমণ-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংকলন।

বহুরূপে— ৬·৫০

মণীন্দ্রনারায়ণ রায়

সুন্দর সরস একটি কাহিনী। বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন বলে পরিগণিত হবে।

পান্থপাদপ ৩·০০

সজনীকান্ত দাস

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি কবিতার এবং তৎসহ কয়েকটি কাহিনী-কাব্যের একত্র সংকলন।

ছন্দগীতি ২·৫০

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

বিভিন্ন বিষয় ও বিচিত্র ভাব অবলম্বনে রচিত কবিতা ও গানের মনোরম সংকলন। সুন্দর প্রচ্ছদপট।

উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ

কফিহাউস ৩·০০

পবিত্রকুমার ঘোষ

একালের বুদ্ধিজীবীদের কাছে চিন্তার নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করবে এ বইখানি।

উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ-কাহিনী

রম্যাণি বীক্ষ্য ৭·০০

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

ভ্রমণের সরসতার সঙ্গে ইতিহাসের তথ্যকথার অপূর্ব সমাবেশ। দক্ষিণ-ভারতের সচিত্র মনোরম ভ্রমণ-কাহিনী।

নূতন প্রকাশিত

উলঙ্গ রাজা ২·৫০

দেবী খান

জীবনের জটিলতম সমস্যা সমাধানে চিন্তাশীল লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত রচনা।

চন্দ্র-সূর্য-তারা ৪·০০

অমলেন্দু চৌধুরী

বুদ্ধি ও আবেগের সমন্বয়ে রচিত মননশীল নবাগত লেখকের প্রাণধর্মী শক্তিশালী উপন্যাস।

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস : ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭

বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

ক্ষিতিমোহন সেন

প্রাচীন ভারতে নারী ২·০০

প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থা ও অধিকার সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণযোগে বিস্তৃত আলোচনা।

শ্রীসুখময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ

তন্ত্রপরিচয় ২·০০

হিন্দুধর্মে তন্ত্রের প্রভাব, আগমাদি সংজ্ঞার অর্থ, তন্ত্রের কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা।

মীমাংসাদর্শন ১·০০

মীমাংসা-শাস্ত্রে প্রবেশেচ্ছু পাঠকগণেব উপ-যোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রচিত।

জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরঃ ৫·৫০

পরীক্ষার্থীদের সুবিধাব জন্য টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ সংযোজন করিয়া এই গ্রন্থেব প্রথম অধ্যায় সম্পাদন করা হইয়াছে।

মহাভারতের সমাজ। ২য় সংস্করণ ১২·০০

মহাভারতের সামাজিক ও দার্শনিক সর্ববিধ আলোচনাই এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি

রবীন্দ্র-রচনা-কোষ ১ম খণ্ড : ২য় পর্ব ৭·০০

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার ২·৫০

আচার্য শান্তিদেবের অপূর্ব গ্রন্থ বোধিচর্যাবতারের সরল অনুবাদ।

মৈত্রীসাধনা ০·৫০

প্রাচীন ভারতে বৈদিক ও বৌদ্ধ সাধকগণের মৈত্রী-সাধনার যে পরিচয় আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে পাই, এই গ্রন্থ তাহার উদ্ধৃতি সহযোগে আলোচনা।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী -সম্পাদিত

সাহিত্যপ্রকাশিকা প্রথম খণ্ড ১০·০০

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল -সম্পাদিত কবি দৌলত কাজির 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী', এবং শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'বাংলার নাথসাহিত্য' এই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল -সম্পাদিত

সাহিত্যপ্রকাশিকা দ্বিতীয় খণ্ড ৬·০০

শ্রীরূপগোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বিশিষ্ট সংস্কৃত প্রমাণগ্রন্থ। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই গ্রন্থের যে ভাবানুবাদ হয় তাহার বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি-অবলম্বনে বিস্তৃত ভূমিকার সহিত শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।

সাহিত্যপ্রকাশিকা তৃতীয় খণ্ড ৮·০০

বাঙ্গালার নাথ-পন্থের মত ধর্ম-পন্থেও ভারতীয় সনাতন চিন্তাধারার বহুধা বিকাশের আলোচনা সংবলিত। নবাবিষ্কৃত যাদুনাথের ধর্মপুরাণ ও রামাই পণ্ডিতের অনাদ্যের পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে।

সাহিত্যপ্রকাশিকা চতুর্থ খণ্ড ১৫·০০

এই খণ্ডে দ্বিজ হরিদেবের রচনাবলী মুদ্রিত হইয়াছে।

চিঠিপত্রে সমাজচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড ১৫·০০

বিশ্বভারতী-সংগ্রহ হইতে ৪৫০ ও বিভিন্ন সংগ্রহের ১৮২ : মোট ৬৩২খানি পুরাতন (খ্রী ১৬৫২-১৮৯২) চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের সংকলনগ্রন্থ।

পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড ১০·০০

দ্বিতীয় খণ্ড ১৫·০০

বিশ্বভারতী-সংগ্রহের সর্বসমেত ৬০০০ পুঁথির মধ্যে প্রতি ৫০০ পুঁথির বিবরণ-সম্বলিত এক একখানি খণ্ড প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা অনুসারে মুদ্রিত।

বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রজীবনী

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্রজীবনী

এখন তিনটি খণ্ড পাওয়া যায়

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনের যাবতীয় ঘটনা ও রচনার তথ্যসমৃদ্ধ বিস্তারিত বিবরণ চারটি পর্বে বিভক্ত হয়ে এই চারটি খণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রথম খণ্ড

১২৬৮-১৩০৮। ১৮৬১-১৯০১ ॥ মূল্য ১৫৲

দ্বিতীয় খণ্ড

১৩০৮-১৩২৫। ১৯০১-১৯১৮ ॥ মূল্য ১৫৲

তৃতীয় খণ্ড

১৩২৫-১৩৪১। ১৯১৮-১৯৩৪ ॥ মূল্য ১৫৲

চতুর্থ খণ্ড

১৩৪১-১৩৪৮। ১৯৩৪-১৯৪১ ॥ নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ

প্রথম তিনটি খণ্ড সংশোধিত সংযোজিত পরিবর্ধিত পুনর্মুদ্রণ।

রবীন্দ্রজিজ্ঞাসুদের পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্থ

•

সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে

রবীন্দ্র জীবন কথা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত এই বইটি চার খণ্ডে মুদ্রিত বিরাট রবীন্দ্রজীবনীর সংক্ষেপকৃত সংস্করণ নয়—এটা একটা নূতন বই। প্রথমত, চলতি ভাষায় লেখা, এবং দ্বিতীয়ত, সন-তারিখ-পাদটীকায় ভারাক্রান্ত নয়।

মূল্য ৬৲ টাকা, বোর্ড বাঁধাই ৮৲ টাকা।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

॥ ওরিয়েণ্টের সাহিত্য সম্ভার

• রবীন্দ্র সাহিত্য •

ডঃ তারকনাথ ঘোষ
রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ৫·০০

প্রমথনাথ বিশী
রবীন্দ্র-বিচিত্রা ৫·৫০
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১ম ৫·০০
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ২য় ৫·০০

প্রতিভা গুপ্ত
শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ৬·০০

সমীরণ চট্টোপাধ্যায়
শারোদৎসব-দর্শন ২·০০
গুরু-দর্শন ২·৫০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ ৩·২৫

ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা ১২·০০
রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ১২·০০

রেণু মিত্র
রবীন্দ্র-হৃদয় ৫·০০

• জীবনচরিত •

নগেন্দ্রকুমার গুহরায়
ডাঃ বিধান রায়ের জীবনচরিত ৮্

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
আত্ম-চরিত ১২·০০

প্রকাশচন্দ্র রায়
অঘোর-প্রকাশ ৫·০০
[বিধানচন্দ্রের পিতা-মাতার আত্ম-চরিত]

স্বামী অমিতানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের যারা এসেছিল সাথে ৪·০০

স্মরণীয়

সুশীল রায়

বাংলাদেশের মনীষীদের জীবনালেখ্য। বাংলাদেশের ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে প্রত্যেকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে তাঁদের জীবন-পরিক্রমার কাহিনী শুনে নিয়ে সুশীল রায় রচনা করেছেন এই মহাগ্রন্থ।

এতে যাঁদের জীবনকথা আছে—

যোগেশচন্দ্র রায়, চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বসন্তরঞ্জন রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, সুনয়নী দেবী, সরলাবালা সরকার, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন, রাজশেখর বসু, বিধানচন্দ্র রায়, অনুরূপা দেবী, শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু, শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, যোগেন্দ্রনাথ বাগচী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

প্রত্যেকের স্বাক্ষর ও চিত্র -সম্বলিত

মূল্য আট টাকা

• ভ্রমণ-কাহিনী •

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর ৮্

কল্যাণী প্রামাণিক
দুনিয়া দেখছি [২য় মুদ্রণ] ৫·০০

জ্যোতিষচন্দ্র রায়
কেদার-বদরী ৪·৫০

রামনাথ বিশ্বাস
ভারত-ভ্রমণ ৫·০০

বার্তাবহ
মহাচীনে শ্রীনেহেরু ৩·৫০

• কাব্য ও কবিতা •

প্রমথনাথ বিশী
শ্রেষ্ঠ-কবিতা ৬·০০

কল্যাণী প্রামাণিক
শিশু-তরু ২·০০
খোকনবাবু ২·০০

প্রবন্ধ ও সমালোচনা

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী
ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ৬·০০

যোগেশচন্দ্র রায়
কি লিখি ? ৩·৫০

অনন্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থ
বৈভাষিক দর্শন ২·০০

হুমায়ুন কবির
নয়া ভারতের শিক্ষা ৮·০০

॥ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা ১২ ॥

ঐক্য ও সমন্বয়ের সাধনায় ...

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের—বহুর মধ্যে সমন্বয়-সাধনের সফল সাধনাই আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের মর্মবাণী। এই মর্মবাণীই নিহিত রয়েছে তার ব্যাপক, বিচিত্র, কখনও বা ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি ও শিল্পকলার মধ্যে।

হিমালয়ের যে পার্বত্য পৌরুষ বল্লম নৃত্যে উদ্দীপিত, সমতলবাসিনী রসকলি-লাঞ্ছিত তরুণীদের রাসনৃত্যে ও মৃদঙ্গের বোলে বা বাউল ও কীর্তনে তা স্তিমিত ও ভাবনত। উড়িষ্যার ছউ বা মধ্য ভারতের লাম্বাডি নৃত্যে, গুজরাটের গরবা বা দক্ষিণ ভারতের ভারতনাট্যম্ ও কথাকলি নৃত্যে এই বিচিত্র ভিন্নধর্মী সংস্কৃতিরই আত্মপ্রকাশ।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই বিচিত্র, ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির ঐক্য ও সমন্বয় সাধনের প্রয়াসই রূপায়িত।

পূর্ব রেলওয়ে

৪৫ আর-পি-এম্ এক্সটেন্‌ডেড প্লে রেকর্ড

ভারতের জাতীয় সংগীত ও বন্দেমাতরম্

NATIONAL ANTHEM OF INDIA & VANDEMATARAM

(অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে)

প্রথম দিক জন-গণ-মন (মিলিটারী ব্যাণ্ড)
বন্দেমাতরম্—অর্কেস্ট্রা (আকাশবাণী বাদ্যবৃন্দ)
জন-গণ-মন সমবেত কণ্ঠ-গীতি (আকাশবাণী কোরাল গ্রুপ)

দ্বিতীয় দিক জন-গণ-মন—অর্কেস্ট্রা (আকাশবাণী বাদ্যবৃন্দ)
বন্দেমাতরম্—সমবেত কণ্ঠ-গীতি (আকাশবাণী কোরাল গ্রুপ)
জন-গণ-মন (ইণ্ডিয়ান ন্যাভাল ব্যাণ্ড)

7EPE 1006

রবীন্দ্র-সংগীতের নবতম অর্ঘ্য

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
আমার হৃদয় তোমার
তুই ফেলে এসেছিস কারে
GE 25190

সুচিত্রা মিত্র
কত যে তুমি মনোহর
এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে
N 82995

পূরবী মুখোপাধ্যায়
আমি আছি তোমার সভায়
দিন-পরে যায় দিন
GE 25191

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়
না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো
ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে
N 82996

৩৩১/৩ আর-পি-এম্ লং প্লেয়িং রেকর্ড

অতুলপ্রসাদের গান

SONGS OF ATULPROSAD

প্রথম দিক ওগো নিঠুর দরদী, মোরা নাচি ফুলে ফুলে,
পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ্ —কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রাবণ-ঝুলাতে বাদল-রাতে, ওরে বন, তোর বিজনে,
যদি তোর হৃদ্-যমুনা —কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় দিক কত গান তো হল গাওয়া, সবারে বাস্ রে ভালো ;
যাব না, যাব না —মঞ্জু গুপ্ত

একা মোর গানের তরী, কে তুমি বসি নদীকূলে ;
কে আবার বাজায় বাঁশি —সুচিত্রা মিত্র

সম্পূর্ণ রেকর্ড তালিকা ডীলারের কাছে দেখুন।

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস" ও "কলম্বিয়া"

কলিকাতা - বোম্বাই - মাদ্রাজ - দিল্লী

প্রকাশক শ্রীসুশীল রায় • বিশ্বভারতী • ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন • কলিকাতা ৭
মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় • শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড • ৫ চিন্তামণি দাস লেন • কলিকাতা ৯
চিত্র ও মলাট মুদ্রক • বেঙ্গল অটোটাইপ কোম্পানি • ২১৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট • কলিকাতা ৬

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস   বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৪   বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য
এই দেশে
আনন্দ-বেদনার প্রকাশ
বৈচিত্র্যের অন্ত নেই।
আমাদের গভীরতম
বেদনা, সুকুমার অনুভূতি,
আর আনন্দঘন
সংবেদন আমাদের চিত্রে
ও সাহিত্যে, নৃত্যে ও
গীতে রসরূপ প্রাপ্ত হয়।
বিভিন্ন প্রদেশের সৃজনী
প্রতিভার অপরূপ ভাব ও
ব্যঞ্জনা আজ রসৈক্য
লাভ ক'রে সমন্বিত ভারতীয়
সংস্কৃতির রূপ নিয়েছে।
দূরকে নিকট
ক'রে, আন্তঃপ্রাদেশিক
সাংস্কৃতিক সংযোগ সম্ভব
ক'রে, জাতির ভাব
সমন্বয়ের মহৎ আয়োজনে
ভারতীয় রেলপথের
ভূমিকা সামান্য নয়।
পূর্ব
রেলওয়ে
medium

সবিনয় নিবেদন,

আমি বিশ্বভারতী পত্রিকার বিংশ বর্ষের (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০ থেকে বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭১) গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করি। চাঁদা মনিঅর্ডারে পাঠাইলাম। মনিঅর্ডার রসিদ নম্বর..........................তারিখ...........................।

১ **বার্ষিক চাঁদা ৪·০০ টাকা, পত্রিকা হাতে লইব।**

২ **সডাক বার্ষিক চাঁদা ৫·৫০ টাকা, সার্টিফিকেট অব পোস্টিং রাখিয়া পত্রিকা পাঠাইবেন।**

৩ **রেজিস্ট্রি ডাকব্যয় সহ ৭·৫০ টাকা, পত্রিকা রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠাইবেন।**

নাম..

ঠিকানা..

তারিখ...

বিশেষ দ্রষ্টব্য : পুরাতন গ্রাহকেরা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন।
পুরাতন গ্রাহকগণও ২০শ বর্ষের জন্য গ্রাহক করিয়া লইবার নির্দেশ দিলে ভাল হয়।
১ ২ ও ৩ এর মধ্যে একটি রাখিয়া অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিবেন।
পত্রিকা রেজিস্ট্রী ডাকে লইলে হারাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

POST CARD

Stamp

PUBLISHER

VISVA-BHARATI PATRIKA

5 Dwarkanath Tagore Lane

Calcutta 7

প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের নূতন বই প্রকাশিত হয়

স্মরণীয় ৭ই অ্যাসোসিয়েটেড-এর প্রস্থতিথি

সুধীরচন্দ্র সরকার প্রণীত

বিবিধার্থ অভিধান ৬·৫০

[বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন প্রকার অভিধান। প্রায় পনেরো হাজার শব্দের সমন্বয়ে গ্রথিত : ইহাতে আছে—বিশিষ্টার্থক শব্দ (Idioms) এবং বাক্যাংশ (Phrases) : প্রবাদ্ ও প্রবচন : দেবদেবী, নাম, স্থান ইত্যাদি : বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দ : বিভিন্ন প্রাদেশিক শব্দ : বৃহৎবাচক ও ক্ষুদ্রবাচক শব্দ : সমষ্টিগত জিনিষের নাম : সহচর শব্দ, প্রতিচর শব্দ, উপচর বা বিকার শব্দ, আওয়াজ ও ডাক : বাংলা শব্দের বিকৃত ও গ্রাম্যরূপ : পরিভাষা ইত্যাদি]

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদের বিরাট গবেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১২·০০

["রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনায় তথ্য বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে বইখানি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য সংকলন। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি গ্রন্থের গভীরে প্রবেশ করে যে অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে যেরূপ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তা বাস্তবিকই উচ্চ-প্রশংসার দাবী রাখে। কবিতাগুলির উপর কতকগুলি সাধারণ মন্তব্য করে সহজেই কর্তব্য সম্পাদন না করে যে রকম পংক্তি ধরে ধরে নিখুঁত ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করেছেন, তা বাংলার সমালোচকদের সামনে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আর আপনার সমালোচনাগুলির যা ভাষা তা আপনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।"…]

ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ'র

আকাশ ও পৃথিবী ১০·০০

প্রাচীন মানুষ যা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়েছিল তা হলো আকাশ ও পৃথিবী। তারই রহস্যময় পরিচয় সরল গল্পের ভঙ্গিতে লেখা। এই গ্রন্থের চিত্র-সম্পদ বিস্ময়কর। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, নীহারিকাপুঞ্জ প্রভৃতির কয়েকশত আলোকচিত্র আছে।

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থ

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের
ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা ২·৫০

সুবোধ ঘোষের
অমৃতপথযাত্রী ৩·৭৫

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের
বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি ১২·০০

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর
পুরাতনী ৫·০০

রাসসুন্দরী দাসীর
আমার জীবন ২·৫০

দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের
আত্মজীবন-চরিত ৩·০০

নলিনীকান্ত সরকারের
শ্রদ্ধাস্পদেষু ২·৫০

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের
অবনীন্দ্র চরিতম্ ৫·০০

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের
ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর ৫·৫০

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ২·৫০

শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের
শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন ২·৫০

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র-কথা ২·০০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রাম : কালচার ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১

কেশ সজ্জা ও
কবরী রচনা ...

যুগ যুগ ধরে নারীর মনে জেগে রয়েছে
একটী আকাংখা—নিজেকে
আরও রমণীয় ক'রে তোলা।

অর্ধ শতাব্দীর বেশী বেঙ্গল
কেমিক্যালের ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল অভিজাত
মহিলাগণের কেশ সৌন্দর্য
বর্ধনে ও কেশ স্বাস্থ্য সংরক্ষণের
জন্য সমাদৃত হয়ে আসছে।

বেঙ্গল
কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

প্রকাশিত হল

সুশীল রায়ের **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ** চিত্র সম্বলিত ১০'০০

সুশীল রায় বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী রূপে অভিহিত। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর পারদর্শিতার জন্যে সাহিত্যসমালোচকেরা তাঁকে এই আখ্যায় ভূষিত করেছেন। গল্প উপন্যাস জীবনী প্রবন্ধ রম্যরচনা কবিতা সর্বত্রই তিনি সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সকলের প্রীতিভাজন হয়েছেন। গল্প-উপন্যাস ছাড়া তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের বিষয়ে এখানে উল্লেখ করা যায়। সুশীল রায়ের মন ক্লাসিক মন, এই জন্যে চিরায়ত সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ অধিক। তিনি মহাভারতের আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচনা করেছেন কাহিনীকাব্য 'প্রণয়ী পঞ্চক'—বর্তমান যুগে এ বিষয়ের তিনি প্রবর্তক ও পথিকৃৎ; এবং রচনা করেছেন কালিদাসের মেঘদূত খণ্ডকাব্যের মর্মকথা 'আলেখ্যদর্শন'—এই গ্রন্থে মেঘদূতের নতুন ব্যাখ্যা পাঠ করে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন "কালিদাসের কালের দেড় হাজার বছর পরে নূতন মল্লিনাথের আবির্ভাব" ব'লে সুশীল রায়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সুশীল রায়ের সাহিত্যকর্মের মধ্যে আর-একটি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলাদেশের মনীষীদের জীবনীগ্রন্থ 'স্মরণীয়'। সুশীলবাবু বিশ্বভারতীর কর্মী, বিশ্বভারতী পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য তাঁর এই গ্রন্থটি—'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'। সাহিত্যের বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত থেকেও দীর্ঘকালীন গবেষণার ফলে রচিত তাঁর এই গ্রন্থের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছেন।

॥ জীবনী সাহিত্য ॥

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : **ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ** ৫'০০ ; **শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে** ৫'০০ ॥ বলাই দেবশর্মা : **ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়** ৫'০০ ॥ মণি বাগচি : **শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার** ১০'০০ ॥ প্রভাত গুপ্ত : **রবিচ্ছবি** ৬'০০ ॥ খাজা আহম্মদ আব্বাস : **ফেরে নাই শুধু একজন** ৪'০০ (ডঃ কোট্‌নীসের অমর কাহিনী) ॥ মণি বাগচি : **রামমোহন** ৪'০০ ; **মাইকেল** ৪'০০ ; **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ** ৪'৫০ ; **কেশবচন্দ্র** ৪'৫০ ; **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র** ৪'৫০ ; **রমেশচন্দ্র** ৫'০০ ; **সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ** ৫'০০ ॥ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য : **বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-কাহিনী** ১'৫০ ॥ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : **বঙ্গের প্রাচীন কবি** ১'০০ ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : **রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী** ৪'০০ ॥

॥ সাহিত্য-বিষয়ক ॥

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রবন্ধ সংগ্রহ ৭'৫০ (ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত) ॥ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার : **ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য** ১৫'০০ ; **পাঁচশত বৎসরের পদাবলী** ৭'৫০ ॥ অজিত দত্ত : **বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস** ১২'০০ ॥ ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত : মিলনের **অ্যারিওপ্যাগিটিকা** ৩'০০ ॥ ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য : **মনসামঙ্গল** ৩'০০ ॥ ডঃ মদনমোহন গোস্বামী : **ভারতচন্দ্র** ৩'০০ ॥ ভবতোষ দত্ত : **চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র** ৬'০০ ॥ রথীন্দ্রনাথ রায় : **সাহিত্য-বিচিত্রা** ৮'৫০ ॥ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : **উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য** ৮'০০ ॥ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য : **রবীন্দ্র নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা** ৬'০০ ; **নাটক লেখার মূলসূত্র** ৫'০০ ॥ **নাটক ও নাটকীয়ত্ব** ২'৫০ ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ : **আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য** ৮'০০ ॥ নারায়ণ চৌধুরী : **আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন** ৩'৫০ ॥ সত্যব্রত দে : **চর্যাগীতি পরিচয়** ৫'০০ ॥ অরুণ ভট্টাচার্য : **কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল** ৪'০০ ॥ আজ্‌হারউদ্দীন খান্‌ : **বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল** ৫'০০ ॥ ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় : **বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী** ৭'০০ ॥ ডঃ সুকুমার সেন : **বিচিত্র সাহিত্য** ১ম খণ্ড ৬'০০ ; ২য় খণ্ড ৬'০০ ॥ বিষ্ণু দে : **এলো-মেলো জীবন ও শিল্প-সাহিত্য** ৪'০০ ॥ ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র : **সাহিত্যের নানা কথা** ৬'০০ ॥

জিজ্ঞাসা প্রকাশন বিভাগ ॥ ১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

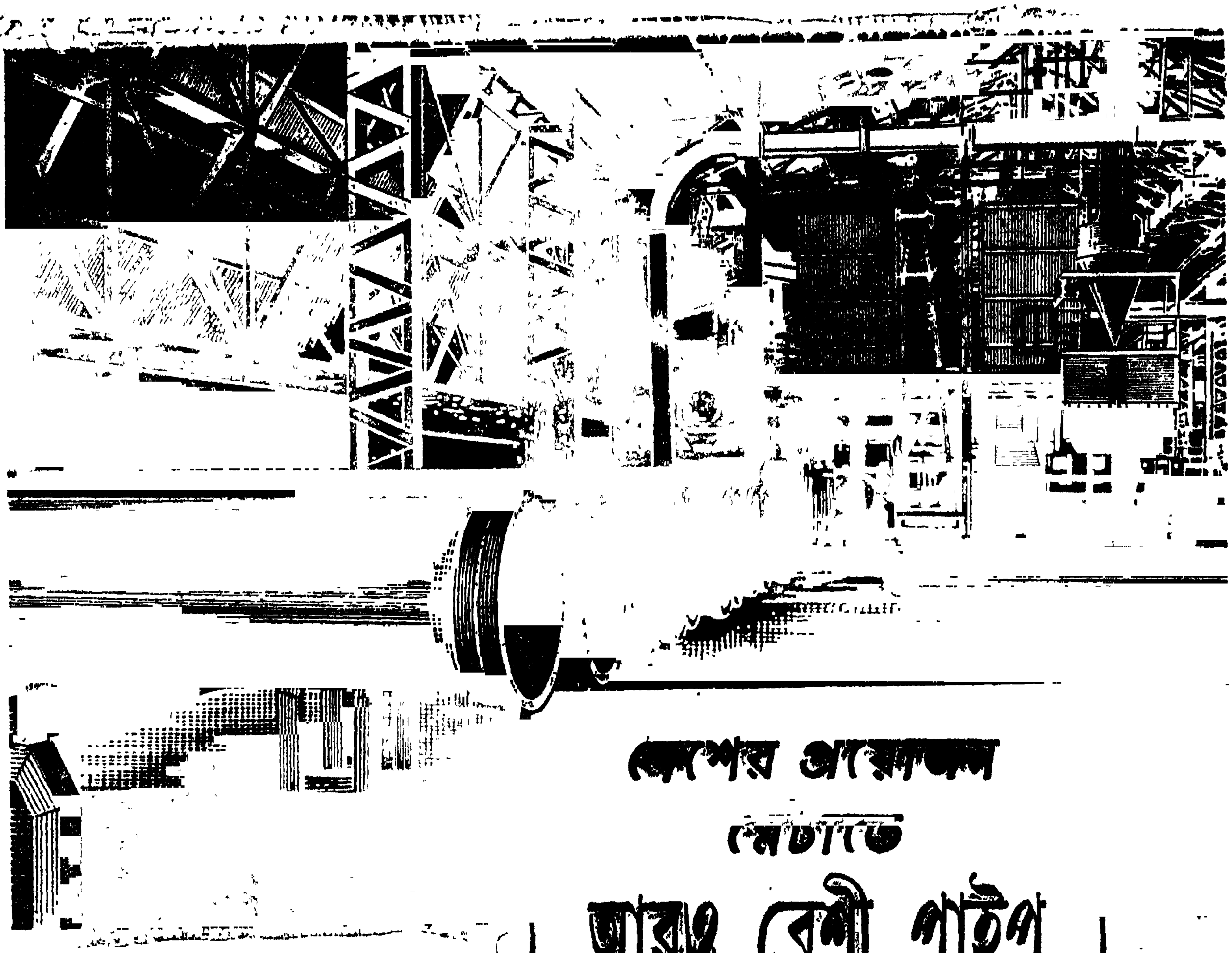

দেশের প্রয়োজন মেটাতে

আরও বেশী পাইপ

ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেডের কুলটি কারখানায় দ্বিতীয় একটি প্লান্ট স্থাপনার ফলে স্পান আয়রন পাইপের উৎপাদন বছরে ৬০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ টনে উঠেছে। বড় ব্যাসযুক্ত মেইন পাইপের জন্য ভারতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটান ছাড়াও উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ার ফলে প্রতি বছর ভারতের বহু কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা বাঁচবে। আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ও কারিগরি কৌশল নিয়োগ করে 'ইস্কোর' কুলটি কারখানা ৩″ থেকে ৩০″ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত স্পান আয়রন পাইপ এদেশে প্রথম তৈরি করে।

IISCO

দি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিঃ

কারখানা : বার্নপুর ও কুলটি

বিক্রয় বিভাগ : ১২ মিশন রো, কলিকাতা ১

ম্যানেজিং এজেন্ট :

মার্টিন বার্ন লিমিটেড

মার্টিন বার্ন হাউস, ১২ মিশন রো, কলিকাতা ১

শাখা : নয়াদিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

দক্ষিণ ভারতে এজেন্ট : দি সাউথ ইণ্ডিয়ান এক্সপোর্ট কোং লিঃ, মাদ্রাজ ১

IIC 81C BEN

প্রিন্স ১৪.৯৫

এয়ারি ১১.৫০

পাঞ্জাবি ১৩.৯৫

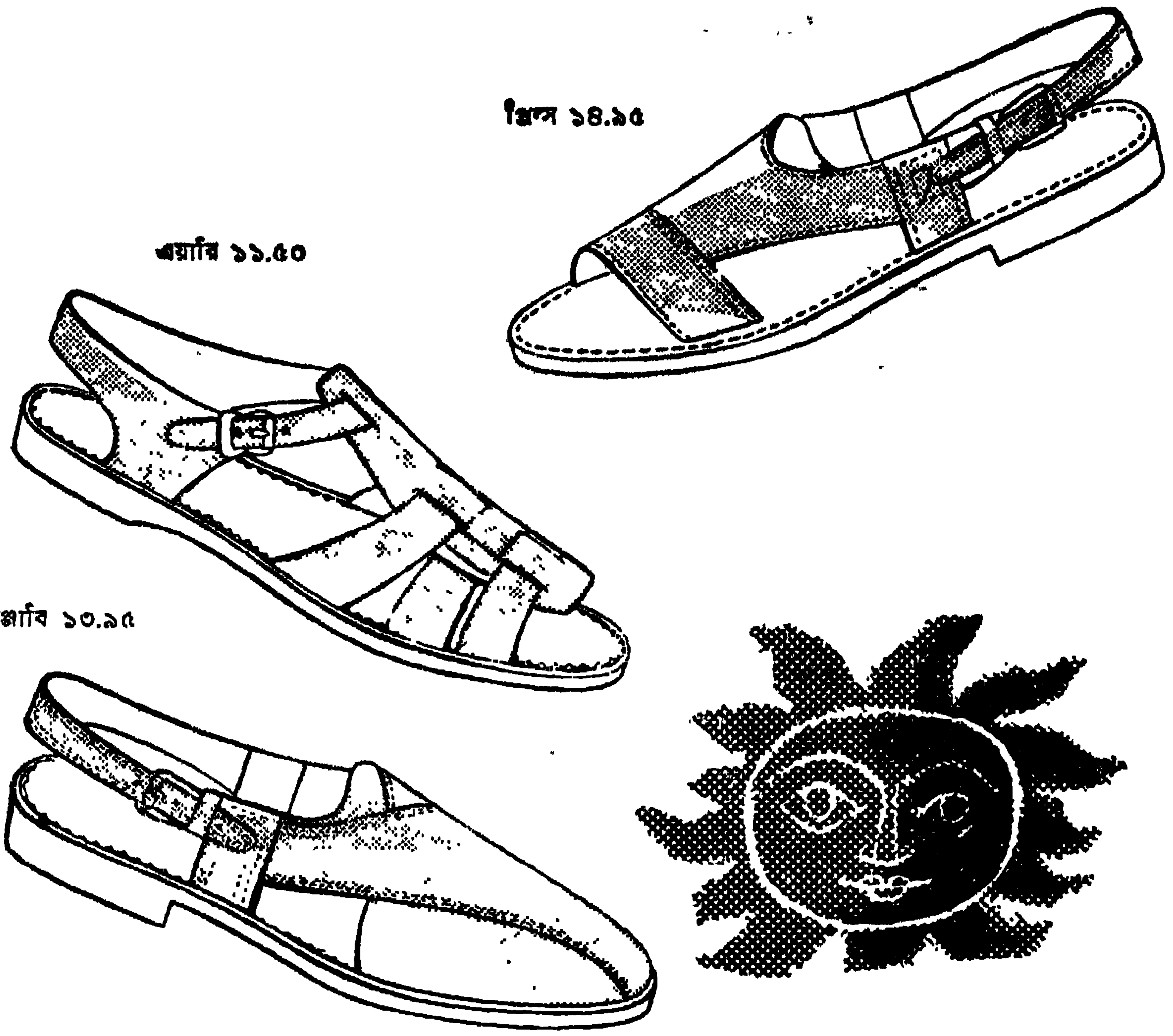

গরমে ছিমছাম বাটার স্যাণ্ডাল

গরমের পথে ঘোরাফেরা সবচেয়ে ভালো স্যাণ্ডালে। স্যাণ্ডাল কেমন না-জুতো, না-চটি। পা-ঢাকা নয়, আবার পা-খোলাও নয়। গরমের তেজ থেকে বাঁচাবে, আবার হাওয়াও খেলাবে। পথিকের প্রিয় তাই বাটার স্যাণ্ডাল। হাজার রোদেও তাজা, ফিটফাট গঠন, উৎকৃষ্ট উপাদানে বাটার স্যাণ্ডাল।

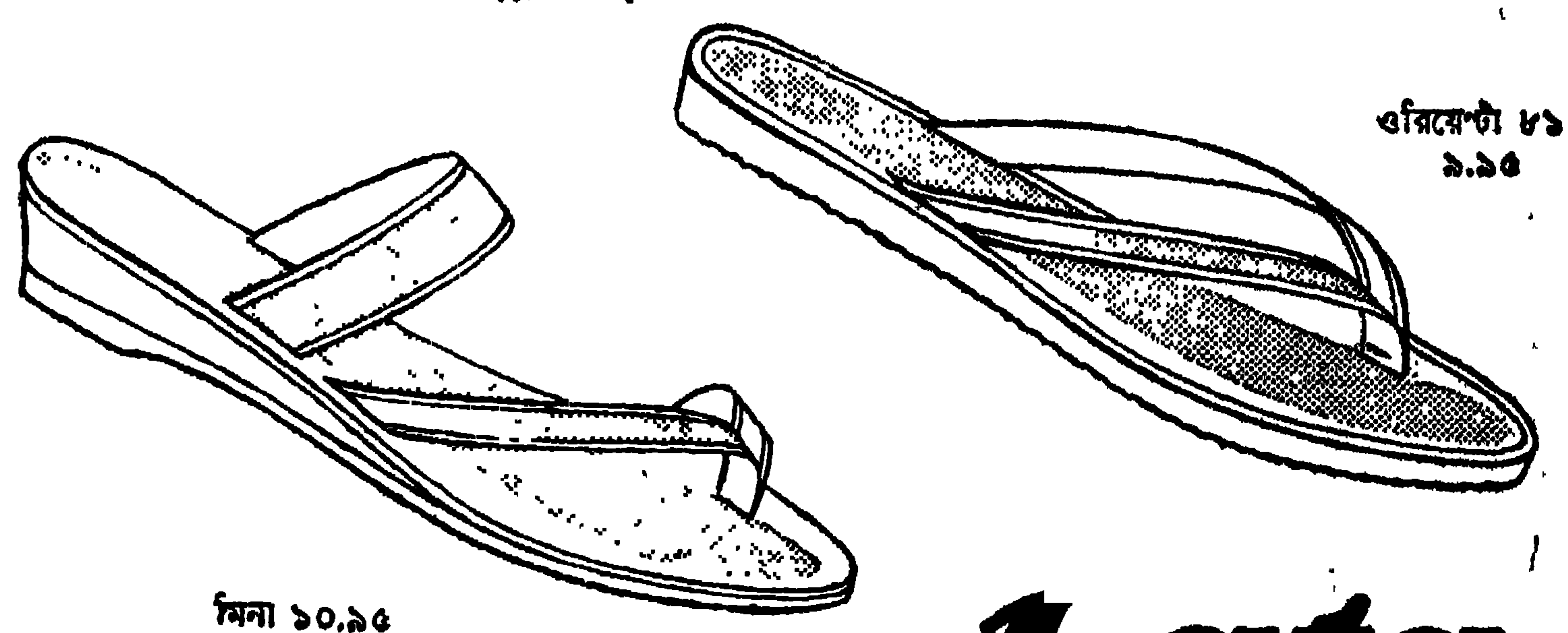

ওরিয়েন্টা ৮১
৯.৯৫

মিনা ১০.৯৫

Bata

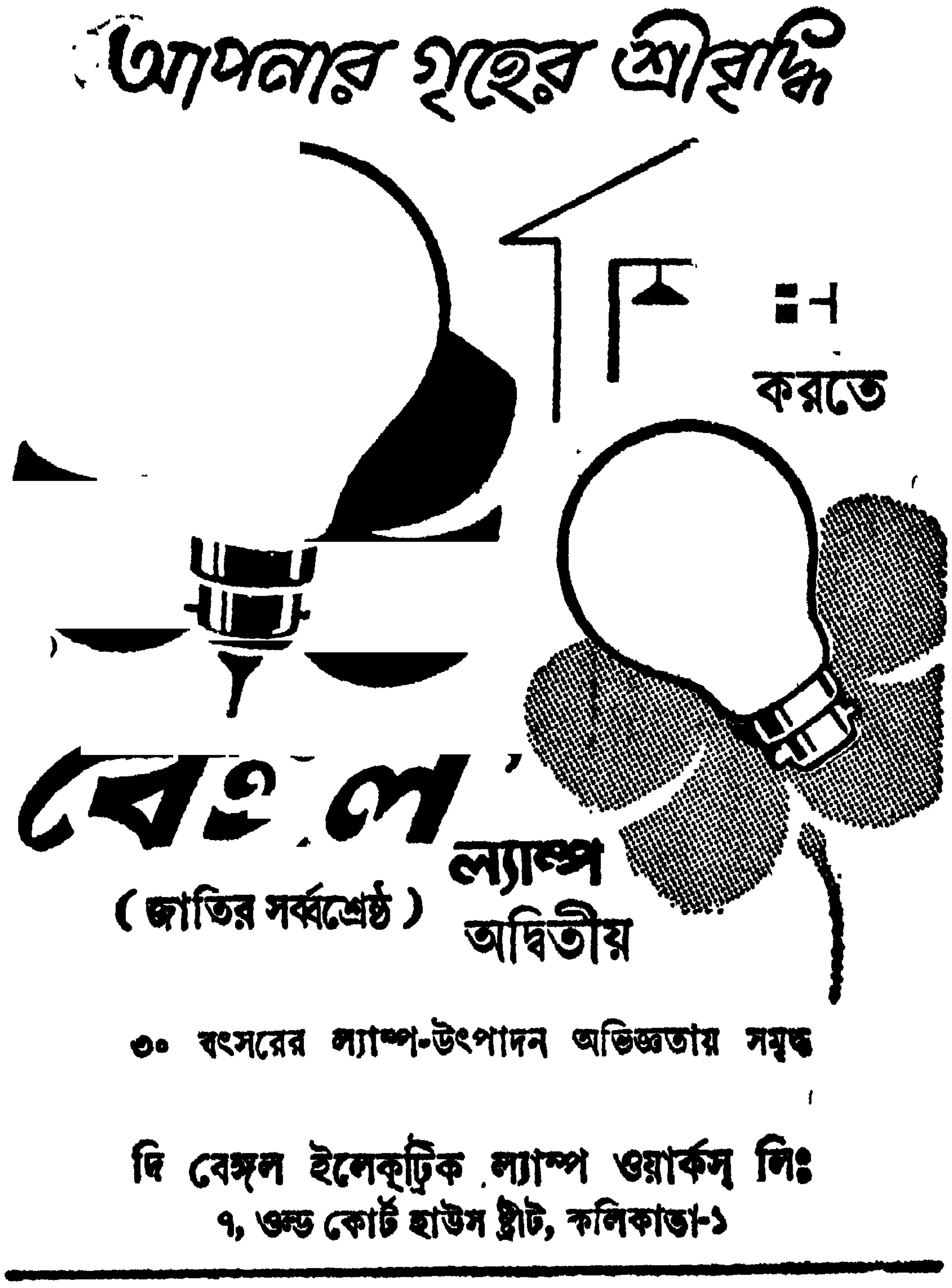
আপনার গৃহের শ্রীবৃদ্ধি
করতে
বেঙ্গল
ল্যাম্প
(জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ)
অদ্বিতীয়
৩০ বৎসরের ল্যাম্প-উৎপাদন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ
দি বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস্ লিঃ
৭, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

an immensely enjoyable
Drink
VITO
Here is a soft drink which you will enjoy in all weathers and in all circumstances. It is manufatured with pure sugar and compound fruit flavours.
SPENCER AERATED WATER FACTORY PRIVATE LTD.
CALCUTTA-14.

* বাংলা সাহিত্যে 'ইণ্ডলাইটের' কয়েকটি মূল্যবান সংযোজন *

রবীন্দ্রজীবনিকার

রবীন্দ্রনাথের চেনা-শোনা মানুষ | প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত

(১৯৫৯ সনে প্রদত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা বক্তৃতামালা)

রবীন্দ্রনাথের চেনা-শোনা মানুষের সংখ্যা অগণিত ; সকলের কথা বলা সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নেই, কেবল যাঁরা (স্বদেশী বা বিদেশী) তাঁর জীবনে রেখাপাত করেছেন বা যাঁদের উপর তাঁর প্রত্যক্ষ রেখাস্পর্শ পড়েছে তাঁদেরই কথা আছে এই গ্রন্থে। মনোটাইপে সুন্দর ছাপা, ডবল ডিমাই সাইজ, অপূর্ব প্রচ্ছদ, অসংখ্য মূল্যবান ও অপ্রকাশিত ছবি, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপের সম্পূর্ণ নাম তালিকা সহ নূতন ধরণের এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। দাম ৬'০০

রবীন্দ্রনাথ | অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

"বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সংকলন। লেখকদের দিকে তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এঁরাই যথার্থ আলোচনা এতদিন করে এসেছেন, না হলে রবীন্দ্রনাথ এতদিনে সাহিত্যিকদের স্মৃতির পাতায় স্থান লাভ করতেন মাত্র। এতগুলি অধ্যাপককে সম্মিলিত করা সৎসাহসের পরিচয় বটে—" দেশ। দাম ১০'০০

মনোটাইপে ঝক্ ঝকে ছাপা, ডবল ডিমাই সাইজ, রেক্সিনে বাঁধাই, সুন্দর প্রচ্ছদ। শতবার্ষিকীতে সঙ্কলন গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলে বিদগ্ধজন কর্তৃক স্বীকৃত।

ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী | সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্কলন গ্রন্থ

বাংলা গদ্যের আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ৫৩ জন শ্রেষ্ঠ রস-সাহিত্যিকের রস-রচনার অপূর্ব সঙ্কলন গ্রন্থ। মনোটাইপে ঝক্‌ঝকে ছাপা, পরিমল গোস্বামীর ১৬ পৃষ্ঠা ভূমিকা সম্বলিত ৫৪৬ পৃষ্ঠা ডবল ডিমাই সাইজ, পাঁচরঙা মনোরম প্রচ্ছদ, সিল্ক কাপড়ে বাঁধাই। (২য় সংস্করণ) দাম মাত্র ৭'৫০

পথ যে আমায় ডাকে | বেদুইন

(উত্তর খণ্ড)

ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ, বিচিত্র তার পরিবেশ, বিচিত্র তার মানুষ, আমরা যারা টুরিষ্ট ছুটে বেড়াই সেই ভারতবর্ষকে দেখতে বা জানতে অনেক সময়েই ভুলে যাই ভারতবর্ষকে দেখবার আগে বাংলাদেশকে দেখা দরকার, বাংলাদেশকে জানা দরকার। তাই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল, পরিভ্রমণের উপযোগী 'গাইড গ্রন্থের' মত করে তিনটি খণ্ডে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করা হল। তারই প্রথম অংশ 'উত্তর খণ্ড' প্রকাশিত হল। দ্বিতীয় অংশে থাকবে পশ্চিম বঙ্গের অবশিষ্ট অংশ, তৃতীয় অংশে থাকবে ভবিষ্যত বংশধরদের নিষিদ্ধ দেশ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ। মূলত ভ্রমণকাহিনী হলেও উপন্যাসের অনুকরণে লেখা। বঙ্গ-সংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা গর্ব বোধ করেন, বঙ্গদেশের লোকশিল্প ও লোক-সাহিত্যের সাথে যাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিচিত হতে চান তাঁদের এই বইটি সংগ্রহ করা অপরিহার্য। দাম ৫'০০ (সচিত্র পশ্চিম খণ্ড প্রকাশ অপেক্ষায়)

অন্তরালের শিশিরকুমার | তারাকুমার মুখোপাধ্যায়

শিশিরকুমার ভাদুড়ী বলতেন : "আমি চঞ্চলবীর্য লোক, স্রোতের মধ্যে থাকার মানুষ। পাদপ্রদীপ পাই অমনি জ্বলে উঠি।" শিশির ভাদুড়ীর অন্তরঙ্গ জীবনের প্রতিটি স্তরে অসামান্য এক প্রতিভাধরের এমন বিচিত্র বিকাশ উপন্যাসেও সুদুর্লভ। মনোটাইপে ঝক্ ঝকে ছাপা। দাম ৪'০০

ইণ্ডলাইট বুক হাউস। ২০, স্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ ডায়াল : ২২-৬৩৮৯

For a clear and comprehensive discussion of all aspects of rural industrialisation

KHADI GRAMODYOG

A monthly journal on rural economics, sociology and development

Editor : **S. C. Sarkar.**

Some Opinions :

"The volume is full of contributions from writers who should know their subject well, the topics are interesting and the number is very well produced."

—Dr. C. D. Deshmukh, President, India International Centre.

"It is an interesting publication and will be found useful by all those interested in the economy of Khadi."

—V. R. Sen, Vice-Chancellor, University of Jabalpur.

"It was a pleasure to have a copy of the Annual Number. From a little of the material that I have gone through, I feel that there has been an excellent collection of articles, for which I congratulate you.

—Dr. Ram Das, Director, Planning, Research and Action Institute, Lucknow.

Annual Subscription Rs. 2·50

Published in English and Hindi by

KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION BOMBAY-56.

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের
দ্বি-ভাষিক ত্রৈমাসিক মুখপত্র

প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে
দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হবে
মে মাসের প্রথম সপ্তাহে
প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা

সম্পাদক : শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ

দ্বিতীয়-সংখ্যার লেখক-সূচী :

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
শ্রীকুলপ্রসাদ সেন
শ্রীআবদুল হাকিম
শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য
শ্রীদীপককুমার বড়ুয়া
শ্রীঅনিল রায়চৌধুরী
শ্রীসবিতা মুখোপাধ্যায়
শ্রীরঞ্জিত মুখোপাধ্যায়
শ্রীআরতি মৈত্র
শ্রীপ্রণবকুমার ঘোষ
শ্রীচিত্তপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়
শ্রীব্রজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রিকা সংক্রান্ত যাবতীয় খবরের জন্য যোগাযোগ করুন :

'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা' কার্যালয়

৬/৪, দ্বারকনাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা—৭

ফোন : ৩৪-২৭৪৯

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আমার কালের কথা ১ম খণ্ড ২য় মুঃ ৪.০০
আমার সাহিত্য জীবন ২য় মুঃ ৪.০০
নলিনী দাশগুপ্তের
বৈদিক ও বৌদ্ধশিক্ষা ৩.০০
নিখিলরঞ্জন রায়ের
সীমান্তের সপ্তলোক ৩.০০

মনোজ বসুর
সোভিয়েতের দেশে দেশে ৩য় মুঃ ৬.০০
নতুন ইয়োরোপ নতুন মানুষ ২য় মুঃ ৫.০০
বীরেন্দ্রমোহন আচার্যের
আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ২য় মুঃ ৭.৫০
কুমারেশ ঘোষের
সাগর-নগর ৩.৫০

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
বৈদেশিকী সচিত্র সংস্করণ ৫.৫০
AFRICANISM 16/-
শশিভূষণ দাশগুপ্তের
ব্যান ও বন্যা ৩.০০
দক্ষিণারঞ্জন বসুর
বিদেশ-বিভুঁই ৬.০০

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
জর্জ বার্নার্ড শ
শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও নাট্যকারের বিচিত্র জীবনী।
দুটি খণ্ড একত্রে ২য় মুঃ ১০.০০

বিনায়ক সান্যালের
রবিতীর্থে
॥ চার টাকা ॥
'রবিতীর্থের' প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই আপনার রূপরসান্বিত ভাষার মাধুরী আস্বাদন করেছি। রবিতীর্থে একটি মূল্যবান সংগ্রহ।' —অন্নদাশঙ্কর রায়।

আনন্দকিশোর মুন্সীর
ভেলকি থেকে ভেষজ ২য় মুঃ ৬.৫০
দিলীপ মালাকারের
নেপোলিয়নের দেশে ২.০০

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের
মার্কসবাদ ২.০০
প্রমথনাথ বিশীর
বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ৪র্থ মুঃ ৪.৫০

দেবজ্যোতি বর্মনের
আধুনিক ইউরোপ ৩.২৫
বিক্রমাদিত্যের
যুদ্ধের ইয়োরোপ ৪.০০

প্রবোধকুমার সান্যালের
রাশিয়ার ডায়েরী
১ম খণ্ড ১৪.০০ ২য় খণ্ড ১২.০০ দুই খণ্ড একত্রে ২৫.০০
দেবতাত্মা হিমালয়
১ম খণ্ড (১০ম মুঃ) ৯.০০ ২য় খণ্ড (৬ষ্ঠ মুঃ) ১০.০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
দুয়ার হতে অদূরে ৪র্থ মুঃ ৩.৫০
দেবেশ দাশের
পশ্চিমের জানলা ২য় মুঃ ৫.৫০
রাজসী ৩য় মুঃ ৩.০০
মৌলানা কাফি খানের
যন্দৃষ্টং ২.৫০
হুমায়ুন কবিরের
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ২য় মুঃ ৩.৫০
শ্রীনিবাস ভট্টাচার্যের
প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ৪.০০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
চরণিক ৩.০০
বুদ্ধদেব বসুর
স্বদেশ ও সংস্কৃতি ২য় মুঃ ৪.০০
হঠাৎ আলোর ঝলকানি ৩য় মুঃ ২.৫০
শিবনাথ শাস্ত্রীর
ইংলণ্ডের ডায়েরী ৪.০০
সরলাবালা সরকারের
স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (সচিত্র) ৪.৫০

রূপদর্শীর
কথায় কথায় ২য় মুঃ ৩.০০
কালকূটের
অমৃতকুম্ভের সন্ধানে ৯ম মুঃ ৫.০০
সৈয়দ মুজতবা আলীর
চতুরঙ্গ ৩য় মুঃ ৪.৫০
জলে ডাঙ্গায় ১০ম মুঃ ৩.৫০
মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের
জাহাজ ৫.০০
রঞ্জনের
বইয়ের বদলে ২য় মুঃ ২.৫০

বিনয় ঘোষ সম্পাদিত
সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র
১ম খণ্ড ১২.৫০
[বাংলা ও বাঙালীর নবজাগরণ ইতিহাসের পবিত্র ও প্রামাণ্য দলিল]
বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১ম খণ্ড ৩.০০ ২য় খণ্ড ৭.০০ ৩য় খণ্ড ১২.০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ঃ ১২

বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা

ক্ষিতিমোহন সেন

প্রাচীন ভারতে নারী ২·০০

প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থা ও অধিকার সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণযোগে বিস্তৃত আলোচনা।

শ্রীসুখময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ

তন্ত্রপরিচয় ২·০০

হিন্দুধর্মে তন্ত্রের প্রভাব, আগমাদি সংজ্ঞার অর্থ, তন্ত্রের কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা।

মীমাংসাদর্শন ১·০০

মীমাংসা-শাস্ত্রে প্রবেশেচ্ছু পাঠকগণের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রচিত।

জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরঃ ৫·৫০

টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদ সংযোজন করিয়া এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় সম্পাদন করা হইয়াছে।

মহাভারতের সমাজ। ২য় সংস্করণ ১২·০০

মহাভারতের সামাজিক ও দার্শনিক সর্ববিধ আলোচনাই এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি

রবীন্দ্র-রচনা-কোষ

১ম খণ্ড : ১ম পর্ব ৬·৫০, ২য় পর্ব ৭·০০

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার ২·৫০

বোধিচর্যাবতারের সরল অনুবাদ।

মৈত্রীসাধনা ০·৫০

প্রাচীন ভারতে বৈদিক ও বৌদ্ধ সাধকগণের মৈত্রী-সাধনার যে পরিচয় আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে পাই, এই গ্রন্থ তাহার উদ্ধৃতি সহযোগে আলোচনা।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী -সম্পাদিত

সাহিত্যপ্রকাশিকা প্রথম খণ্ড ১০·০০

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল -সম্পাদিত কবি দৌলত কাজির 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী', এবং শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'বাংলার নাথসাহিত্য' এই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল -সম্পাদিত

সাহিত্যপ্রকাশিকা দ্বিতীয় খণ্ড ৬·০০

শ্রীরূপগোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বিশিষ্ট সংস্কৃত প্রমাণগ্রন্থ। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই গ্রন্থের যে ভাবানুবাদ হয় তাহার বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি-অবলম্বনে বিস্তৃত ভূমিকার সহিত শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।

সাহিত্যপ্রকাশিকা তৃতীয় খণ্ড ৮·০০

বাঙ্গালার নাথ-পন্থের মত ধর্ম-পন্থেও ভারতীয় সনাতন চিন্তাধারার বহুধা বিকাশের আলোচনা সংবলিত। নবাবিষ্কৃত যাদুনাথের ধর্মপুরাণ ও রামাই পণ্ডিতের অনাদ্যের পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে।

সাহিত্যপ্রকাশিকা চতুর্থ খণ্ড ১৫·০০

এই খণ্ডে দ্বিজ হরিদেবের রচনাবলী মুদ্রিত হইয়াছে।

চিঠিপত্রে সমাজচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড ১৫·০০

বিশ্বভারতী-সংগ্রহ হইতে ৪৫০ ও বিভিন্ন সংগ্রহের ১৮২ : মোট ৬৩২খানি পুরাতন (খ্রী ১৬৫২-১৮৯২) চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের সংকলনগ্রন্থ।

পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড ১০·০০

দ্বিতীয় খণ্ড ১৫·০০

বিশ্বভারতী-সংগ্রহের সর্বসমেত ৬০০০ পুঁথির মধ্যে প্রতি ৫০০ পুঁথির বিবরণ-সম্বলিত এক একখানি খণ্ড প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা অনুসারে মুদ্রিত।

বিশ্বভারতী

রবীন্দ্র কাব্যনাটকসমূহের বিস্তৃত ও সরস আলোচনা গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেক ছাত্র, গবেষক, নট ও নাট্যকারের অবশ্য পাঠ্য বই

রবীন্দ্র নাট্যপ্রসঙ্গ-কাব্যনাটক ৪·০০

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত

বিপুল রবীন্দ্ররচনাবলীর এক পূর্ণাঙ্গ সহজ নির্দেশ

রবীন্দ্র নির্দেশিকা ১০·০০

নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী

মনসাদেবীর পূজা প্রচলনকে কেন্দ্র করে চাঁদ সওদাগর ও মনসাদেবীর বিরোধের কাহিনী সুললিত ছন্দে বাইশ কবি বিরচিত

মনসাপুঁথি ৬·০০

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

গ্রন্থটি রচনার জন্য ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য অকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫৲]

রামায়ণ : কৃত্তিবাস বিরচিত

পূর্ণাঙ্গ রামায়ণটির বহুবর্ণ চিত্র সমন্বিত যুগরুচিসম্মত অনিন্দ্য প্রকাশন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। [৯৲]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলন, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের আধুনিকতম আকরগ্রন্থ। [২৫৲]

রবীন্দ্র-দর্শন

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্রজীবনবেদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা [২৸৹]

জীবনের ঝরাপাতা

রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবীচৌধুরানীর আত্মচরিত। ঠাকুরবাড়ির আলেখ্য। [৪৲]

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান

পরিবর্ধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। [৮৸৹]

Samsad Anglo-Bengali Dictionary

বহু প্রশংসিত উচ্চমানবিশিষ্ট ইংরাজী-বাঙ্গালা আধুনিক শব্দকোষ। [১২৸৹]

বঙ্কিম-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪ খানি একত্রে) তৃতীয় মুদ্রণ বাহির হইল। [১২৲]

দ্বিতীয় খণ্ড সমগ্র সাহিত্য-অংশ একত্রে [১৫৲]

রমেশ-রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস একত্রে [৯৲]

উভয় রচনাবলীই শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও লেখকদিগের সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। উপহারে ও গ্রন্থাগারে অপরিহার্য।

পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন :

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৯

॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ॥

রঞ্জন পাবলিশিং-এর বই

কুমারসম্ভব ৫.০০
প্রবোধেন্দু ঠাকুর অনূদিত
সংসারে বীর পুত্রের জন্মতত্ত্ব—'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যের কবির এই সুন্দর রহস্যকল্পনা রূপায়িত হয়ে উঠেছে। আচার্য নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্র ও একটি বহুবর্ণ চিত্র গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

আলেখ্যদর্শন ২.৫০
সুশীল রায়
কালিদাসের 'মেঘদূত' খণ্ডকাব্যের মর্মকথা উদ্ঘাটিত হয়েছে নিপুণ কথাশিল্পীর অপরূপ গদ্যসুষমায়। মেঘদূতের সম্পূর্ণ নূতন ভাষ্যরূপ। বঙ্গসাহিত্যে নতুন আশ্বাস ও আস্বাদ এনেছে।

বিদ্যাসাগর পরিচয় ২.৫০
যোগেশচন্দ্র বাগল
বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যশস্বী লেখকের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ। স্বল্প পরিসরে নির্ভরযোগ্য আলোচনা।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ২.৫০
মনোরঞ্জন গুপ্ত
প্রফুল্লচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ জীবনকথা। সুধীজনপ্রশংসিত সর্বজনপাঠ্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

তুহিন মেরু অন্তরালে ৩.০০
বসুধারা গুপ্ত
সরস ভঙ্গীতে লেখা কেদার-বদরী ভ্রমণের মনোজ্ঞ কাহিনী। ভ্রমণ-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংকলন।

বহুরূপে— ৬.৫০
মণীন্দ্রনারায়ণ রায়
সুন্দর সরস একটি কাহিনী। বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন বলে পরিগণিত হবে।

পান্থপাদপ ৩.০০
সজনীকান্ত দাস
গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি কবিতার এবং তৎসহ কয়েকটি কাহিনী-কাব্যের একত্র সংকলন।

ছন্দগীতি ২.৫০
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
বিভিন্ন বিষয় ও বিচিত্র ভাব অবলম্বনে রচিত কবিতা ও গানের মনোরম সংকলন। সুন্দর প্রচ্ছদপট।

উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ

কফিহাউস ৩.০০
পবিত্রকুমার ঘোষ
একালের বুদ্ধিজীবীদের কাছে চিন্তার নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করবে এ বইখানি।

উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ-কাহিনী

রম্যাণি বীক্ষ্য ৭.০০
সুবোধকুমার চক্রবর্তী
ভ্রমণের সরসতার সঙ্গে ইতিহাসের তথ্যকথার অপূর্ব সমাবেশ। দক্ষিণ-ভারতের সচিত্র মনোরম ভ্রমণ-কাহিনী।

নূতন প্রকাশিত

উলঙ্গ রাজা ২.৫০
দেবী খান
জীবনের জটিলতম সমস্যা সমাধানে চিন্তাশীল লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত রচনা।

চন্দ্র-সূর্য-তারা ৪.০০
অমলেন্দু চৌধুরী
বুদ্ধি ও আবেগের সমন্বয়ে রচিত মননশীল নবাগত লেখকের প্রাণধর্মী শক্তিশালী উপন্যাস।

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস : ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭

সদ্য প্রকাশিত

রুশ গল্প সঞ্চয়ন

রুশ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সুনির্বাচিত গল্প সংকলন। এর মধ্যে আছে পুশকিন, গোগোল, লেরমন্তভ, তুর্গেনিভ, দস্তয়েভস্কি, শেড্রিন, লেস্কভ, উসপেনস্কি, সিবিরিয়াক, আর্টজিভাশেভ, পোতাপেঙ্কো, সোলোন্তব, রেমিদভ, চেখভ, গোর্কী ও তলস্তয়ের গল্প। অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ ৬.০০

সনৎ রায়ের **ভারতের অর্থনীতি কোন পথে?** ৪০ নঃ পঃ

* * * *

বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

ইলিয়া এরেনবুর্গ
পারীর পতন
পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। দাম : ৮.০০
নবম তরঙ্গ
১ম খণ্ড ৪.৫০ ২য় খণ্ড ৬.০০ তৃতীয় খণ্ড ৭.৫০

সদরুদ্দিন আইনী
সেকালের বুখারায় ৪.০০

মিখাইল শলোখভ
ধীর প্রবাহিনী ডন
দাম : ৯.০০
সাগরে মিলায় ডন
১ম খণ্ড ৫.০০
২য় খণ্ড শীঘ্র বের হবে।

আলেকজাণ্ডার কুপরিন
রত্নবলয় ৫.৫০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২ ॥ ১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

বা ক্-সা হি ত্যে র ব ই

শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত
রবীন্দ্রায়ণ দুই খণ্ড প্রতি খণ্ড ১০.০০

শ্রীনিরপেক্ষর
নেপথ্যদর্শন ৭.৫০
যুগান্তরের 'শ্রীনিরপেক্ষ' ছদ্মনামধারী শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীর তথ্যাশ্রয়ী বলিষ্ঠ রচনাগুলির সংকলন। এই রচনাগুলির জন্য শ্রীচৌধুরী দশ হাজার ডলার ম্যাগ্‌সেসে পুরস্কার লাভ করেছেন।

বিনয় ঘোষের
সুতানুটি সমাচার ১২.০০
বিদ্রোহী ডিরোজিও ৫.০০

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের
সাহিত্য-সংস্কৃতি-সময় ৪.০০

অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকরীপ্রসাদ বসু ও শংকর-এর সম্পাদনায়
বিশ্ববিবেক
স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংকলন শীঘ্রই বেরুবে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
সাংস্কৃতিকী
বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা। দাম ৫.৫০

জরাসন্ধের তিন খানি অপূর্ব উপন্যাস
পাড়ি (৬ষ্ঠ সং) ৩.৫০ **আশ্রয়** (৪র্থ সং) ৩.৫০
মসিরেখা (২য় সং) ৯.০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নিশিপদ্ম (৪র্থ সং) ৪.০০

বনফুলের
দূরবীন (২য় সং) ৪.০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
অযাত্রায় জয়যাত্রা ৪.০০

শংকর-এর
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ৪.৫০
এক দুই তিন (৬ষ্ঠ সং) ৪.০০
চৌরঙ্গী (৬ষ্ঠ সং) ১০.০০

বাক্-সাহিত্য। ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা-৯

বিশ্বভারতী পত্রিকা

পুরাতন সংখ্যা

বিশ্বভারতী পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা কিছু আছে। যাঁরা সেট সম্পূর্ণ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁদের অবগতির জন্য বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হল—

¶ প্রথম বর্ষের মাসিক বিশ্বভারতী পত্রিকার চার সংখ্যা পাওয়া যায়। একত্র ১.০০।

¶ তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১.০০।

¶ পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১.০০।

¶ অষ্টম বর্ষের প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১.০০।

¶ নবম বর্ষের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১.০০।

¶ ষষ্ঠ, সপ্তম, দশম, একাদশ ও চতুর্দশ বর্ষের সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যায়। প্রতি সেট ৪.০০, ডাকে ৬.০০।

¶ দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ বর্ষ নিঃশেষিত।

¶ পঞ্চদশ বর্ষের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১.০০।

¶ ষোড়শবর্ষের প্রথম এবং চতুর্থ সংখ্যা নিঃশেষিত; দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্ত-সংখ্যা, মূল্য ৩.০০, ডাকে ৪.০০।

¶ সপ্তদশ বর্ষের চারিটি সংখ্যা একত্রে একটি খণ্ডে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা-রূপে প্রকাশিত হয়। এখনও কয়েকটি খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে; মূল্য ৪.০০।

¶ অষ্টাদশ বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যা ১.০০।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কলকাতার গ্রাহকবর্গ

স্থানীয় গ্রাহকদের সুবিধার জন্য কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত ক্রেতারূপে নাম রেজিস্ট্রি করবার এবং বার্ষিক চার সংখ্যার মূল্য চার টাকা অগ্রিম জমা নেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এইসকল কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা উল্লিখিত হল—

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
৩৩ কলেজ রো

ভবানীপুর বুক ব্যুরো
২বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড

যাঁরা এইরূপ গ্রাহক হবেন, পত্রিকার কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হলেই তাঁদের সংবাদ দেওয়া হবে এবং সেই অনুযায়ী গ্রাহকগণ তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। এই ব্যবস্থায় ডাকব্যয় বহন করবার প্রয়োজন হবে না এবং পত্রিকা হারাবার সম্ভাবনা থাকে না।

মফস্বলের গ্রাহকবর্গ

যাঁরা ডাকে কাগজ নিতে চান তাঁরা বার্ষিক মূল্য ৫.৫০ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলিকাতা ৭ ঠিকানায় পাঠাবেন যদিও কাগজ সার্টিফিকেট অব পোস্টিং রেখে পাঠানো হয়, তবুও কাগজ রেজিস্ট্রি ডাকে নেওয়াই অধিকতর নিরাপদ। রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানোর জন্য অতিরিক্ত ২৲ লাগে।

সন্দেশ

ছোটদের সচিত্র মাসিক
নববর্ষের বিশেষ সংখ্যা

'সন্দেশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর
শততম জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁর

গল্প * কবিতা * গান * ছবি * চিঠি

ও অন্যান্য বিচিত্র রচনার সংকলন

উপেন্দ্রকিশোরের জীবনী ও স্মৃতিচিত্র

*

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদারের
ধারাবাহিক উপন্যাস

'হট্টমালার দেশে'

এই সংখ্যা থেকে শুরু হবে

*

সত্যজিৎ রায়
গৌরী চৌধুরী আর নলিনী দাশের গল্প

কবিতা

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পরিমল গোস্বামীর সরস প্রবন্ধ

'এক যে ছিল কাল—'

ম্যাজিক। প্রতিযোগিতা। ধাঁধা

এই বিশেষ সংখ্যা এক টাকা। বার্ষিক চাঁদা ন টাকা

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট। কলকাতা ১৩

যে মহাকাব্য দুটি পাঠ না করিলে—কোন ভারতীয়
ছাত্র বা নর-নারীরই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না

কাশীরাম দাস বিরচিত অষ্টাদশপর্ব্ব

মহাভারত

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

কাশীরাম দাসের মূল মহাভারত অনুসরণে
প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি বিবর্জ্জিত ১০৬৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিল্পীদের আঁকা ৫০টি বহুবর্ণ চিত্রশোভিত।
ভালো কাগজে—ভাল ছাপা—চমৎকার বাঁধাই।
মহাভারতের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এমন সংস্করণ আর নাই।
মূল্য কুড়ি টাকা। ডাক ব্যয় তিন টাকা।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

যাবতীয় প্রক্ষিপ্ত অংশ বিবর্জ্জিত মূল গ্রন্থ অনুসরণে। ৫৮৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ!
অবনীন্দ্রনাথ, রাজা রবি বর্ম্মা, নন্দলাল, উপেন্দ্রকিশোর, সারদাচরণ উকিল, অসিতকুমার, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত শিল্পীদের আঁকা—বহু একবর্ণ এবং বহুবর্ণ চিত্র পরিশোভিত।
পৃথিবীখ্যাত কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণের এমন মনোহর
বাঙ্গলা সংস্করণ বিরল, নাই বলিলেও চলে।
মূল্য দশ টাকা পঞ্চাশ ন. প.। ডাক ব্যয় ও প্যাকিং অতিরিক্ত দুই টাকা দশ ন. প.।

প্রবাসী প্রেস প্রাঃ লিমিটেড

১২০।২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

চৈতন্য-পরিকর	ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি		১৬.০০
বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ	শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন		৬.৫০
শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়		৫.০০
রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান	ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার		৬.০০
রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়	ডঃ ক্ষুদিরাম দাস		১০.০০
রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য	ডঃ শান্তিকুমার দাসগুপ্ত		১০.০০
রবীন্দ্র অভিধান ১ম ও ২য় খণ্ড	সোমেন্দ্রনাথ বসু	প্রতি খণ্ড	৬.০০
সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ	সোমেন্দ্রনাথ বসু		৪.০০
বিদেশী ভারত সাধক	সোমেন্দ্রনাথ বসু		৩.৫০
রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা	ধীরানন্দ ঠাকুর		১২.০০
রাবীন্দ্রিকী	ধীরানন্দ ঠাকুর		৪.৫০
জগদানন্দের পদাবলী	ধীরানন্দ ঠাকুর		৩.০০
বাংলা উচ্চারণকোষ	ধীরানন্দ ঠাকুর		৩.০০
বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ১ম ও ২য় খণ্ড	ভূদেব চৌধুরী	প্রতি খণ্ড	১২.০০
বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	ভূদেব চৌধুরী		৭.০০
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য	ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়		১০.০০
চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি	শঙ্করীপ্রসাদ বসু		১২.৫০
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র	মোহিতলাল মজুমদার		১০.০০
লিপিবিবেক	ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য		৬.০০
বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র	অহীন্দ্র চৌধুরী		৫.০০
বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী		৩.০০
কালিদাসের কাব্যে ফুল	সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর		৪.০০
ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান	ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		৫.০০
মধুসূদনের কবি-মানস	শিশির দাস		২.৫০
অনুন্নত দেশের অর্থনীতি	প্রিয়তোষ মৈত্রেয়		৪.০০
প্রবাদ-বচন	গোপালদাস চৌধুরী ও		
উপন্যাস-পাঠের ভূমিকা	প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত		৬.০০
ইডেনে শীতের দুপুর	শিশির চট্টোপাধ্যায়		৫.০০
আধুনিক শারীরশিক্ষা	শঙ্করীপ্রসাদ বসু		৩.৭৫
(মেয়েদের জন্য)	অমিতাভা মৈত্র		২.৫০

গ্রাম : বাণীবিহার ফোন : ৩৪-৪০৫৮

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড

১ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

শাখা :—এলাহাবাদ, পাটনা

॥ স্মরণীয় গ্রন্থের কয়েকখানি ॥

রবীন্দ্র বীক্ষা ১২.০০
সম্পাদনা : ডক্টর নীলরতন সেন

সাত রং সাত আকাশ ৩.০০
পনেরোটি বিদেশী ভাষার কবিতা সংকলন

ভ্রান্তি বিলাস ২.৫০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

WEST TO DAY 7.00

আজকের পশ্চিম ৪.৫০
ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

শরৎচন্দ্র : দেশ ও সমাজ ২.০০
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পঁচিশ জন সাম্প্রতিক কবি ৪.০০
পঁচিশ জন কবির কবিতা-সংকলন
সম্পাদনা : দিনেশ দাস

•

সাহিত্য ও জীবনী আলোচনা

কবি তরু দত্ত ২.৫০
উইলিয়াম ফক্‌নার ১.০০
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ১.০০
রবার্ট ফ্রস্ট ১.০০

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট : কলিকাতা-বারো
ডায়াল : ৩৪-২৩৮৬

বাসবদত্তার
গৃহস্থবধূর ডায়েরী ৭.০০
মোহিতলাল মজুমদারের
কাব্য-মঞ্জুষা (সম্পূর্ণ ও টীকা সম্বলিত) ১০.০০
অধ্যাপক ডঃ মনোরঞ্জন জানার
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ৮.০০
(সাহিত্য ও সমাজ)
রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক) ১২.৫০
Prof. W. T. Webb's
EVERYBODY'S LETTER-WRITER
(28th Ed.) Rs. 5.00
(Contains about 500 letters)
নারায়ণচন্দ্র চন্দের
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ৭.০০
ঋষি দাসের
রত্নদীপ (Treasure Island) ২.৮০
মৃণালকান্তি দাশগুপ্তের
পরমারাধ্যা শ্রীমা ২.৭৫
রূপ হতে অরূপে ২.৫০
মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ৬.০০
মুক্তিপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা ৬.০০
অধ্যক্ষ সন্তোষকুমার কুণ্ডুর
বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ৪.০০
অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র-সাহিত্যের নবরাগ ৫.০০
বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর :
স্বাধীন সুলতানদের আমল ১৩.৫০
ভূতনাথ ভৌমিকের
স্বামী বিবেকানন্দ ৩.০০
সুনীল দত্তের
বর্ণ-পরিচয় ২.৫০
(বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী অবলম্বনে নাটক)
অধ্যাপক রমণীমোহন চক্রবর্তী
বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কাল ৫.০০

ভারতী বুক স্টল ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯ : : Dial 34-5178

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে ! শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে !

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গল্প-পঞ্চাশৎ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় কৃত
বিরাট ভূমিকাসহ গ্রন্থটি বিদগ্ধসমাজে অবশ্যই আদরণীয় হইবে।

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
প্রতিহারিণী ৪·০০

ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের
দেওয়ালের দাগ ৭·০০

চিরঞ্জীব সেনের
রহস্যের অন্ধকারে ৪·৫০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
ময়নাতদন্ত ৩·০০

গোলাম কুদ্দুসের
সুরের আগুন ৪·৭৫

প্রফুল্ল রায়চৌধুরীর
প্রাণতরঙ্গ ৬·৫০

মুকুন্দ পাবলিশার্স : ৮৮ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট : কলিকাতা ৪
(রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মস্থান)

মিত্রালয়ের বই !!

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত
র বী ন্দ্র স ঙ্গী তে র না না দি ক
চার টাকা

…উভয়েই তাঁরা গুরুদেবের সঙ্গীত বিষয়ে কিছু বলার অধিকারী। নিজেদের বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুদেবের গানকে তাঁরা যেভাবে দেখেছেন বা বুঝেছেন, তা পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন এই বইয়ে। —শান্তিদেব ঘোষ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী রচিত
অ হিং স স মা জ বা দে র প থে
পাঁচ টাকা

অহিংসার প্রতি শিক্ষিত মনের যতই উন্নাসিকতা থাক একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, চরম বিনাশের পথ থেকে একমাত্র অহিংসাই মানুষকে বাঁচার নিশ্চয়তা দিতে পারে।

বিশ্ববিখ্যাত মহাপণ্ডিত ৺**রাহুল সাংকৃত্যায়নের**
ভো ল গা থে কে গ ঙ্গা
যাঁরা পড়েছেন তাঁরা রাহুলের অমিত সৃষ্টি ও দৃষ্টিশক্তির খবর রাখেন।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের নূতন গ্রন্থ
কি ন্ন র দে শে
সবেমাত্র প্রকাশিত হ'ল ॥ সাড়ে ছয় টাকা

মিত্রালয় : ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

বুদ্ধদেব বসুর নতুন বই

সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ

সতেরোটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সর্বাধুনিক সংগ্রহ ॥ দাম ৫'০০

বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রবীন্দ্র-সাগর সঙ্গমে

প্রাচীন, দুর্লভ, বিস্মৃত পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদি থেকে সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের ত্রিশখানি কাব্য, উপন্যাস ও নাটকের সমালোচনা এবং কৌতূহলোদ্দীপক টীকা-টিপ্পনি। সুবৃহৎ সংকলন গ্রন্থ। ১০'০০

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

প্রাচীন প্যালেষ্টাইন

হিব্রু জাতির প্রাচীন জীবন ও তার জীবনের চেয়েও প্রিয় বিগতকালের মহিমাসমুজ্জ্বল ঐতিহ্যের ইতিবৃত্ত। ৬'০০

অবনীনাথ মিত্র প্রণীত

আচার্য জগদীশচন্দ্র ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দির ১'৫০

আশাপূর্ণা দেবীর নতুন উপন্যাস

দিনান্তের রঙ

বিষয়ের ধারালো অভিনবত্বে, চরিত্র-চিত্রণের সূক্ষ্ম শিল্পসৌকর্যে ও বর্ণনা ভঙ্গীর কুশলতায় 'দিনান্তের রঙ' বাংলা উপন্যাসের অম্লান গৌরব। ৬'৫০

ডক্টর সত্যনারায়ণ সিংহ রচিত

হিমালয়ের অন্তরালে

এই বইয়ের লেখক হিমালয় ও ভারতের সাম্প্রতিক দুর্যোগের রোমহর্ষক পট-ভূমিতে প্রত্যক্ষভাবে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। হানাদার চীনা-বাহিনীর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তিব্বতীদের ও ভারতীয় সৈন্যের মরণজয়ী মুক্তি-সংগ্রামের বীরত্ব-কাহিনী এই গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। দাম—৪'০০

নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল

বুদ্ধদেব বসু-অনূদিত

কালিদাসের মেঘদূত

৩য় সংস্করণ ॥ দাম—৬'৫০

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

কাব্য-সঞ্চয়ন

১০ম সংস্করণ ॥ দাম—৬'০০

রাজশেখর বসু-অনূদিত

কালিদাসের

মেঘদূত

মহাকবির অবিনশ্বর রচনার প্রাঞ্জল গদ্য-অনুবাদ। ৩য় সংস্করণ ॥ দাম—২'৫০

অমূল্যনাথ চক্রবর্তীর

ভারতে শক্তি-সাধনা ৭'০০

তারকচন্দ্র রায়ের

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য ৪'০০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ; ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ; কলিকাতা-১২

॥ রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আলোচনা গ্রন্থ ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-অধ্যাপক
প্রমথনাথ বিশীর

রবীন্দ্রসরণী ১০৲

রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ ১ম ৫৲ ২য় ৫৲

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ৫৲

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের

রবি-দীপিতা ৫॥০

রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের

টলষ্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ৫৲

বিশ্বপতি চৌধুরীর

কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৲

কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ৩॥০

ডঃ শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার ৬॥০

মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত দুটি মূল্যবান গ্রন্থ—শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর

পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ ৩৲

সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ ৩৲

প্রমথনাথ বিশী ও ডঃ বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত

বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক

বাংলার আদিযুগ হইতে শুরু করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত ১৪০জন লেখকের ২০২টি রচনার সংকলন। বাংলা গদ্যের স্টাইলের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশীর ২২০ পৃষ্ঠার মূল্যবান ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে। ১২॥০

ডঃ বিজিতকুমার দত্তের মূল্যবান প্রবন্ধ গ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ৮॥০

কালিদাস রায়ের

সাহিত্যপ্রসঙ্গ ৫৲

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের

কাব্যসাহিত্যের ধারা ৪॥০

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

দক্ষিণী

'দক্ষিণী-ভবন'

১ দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েষ্ট, কলিকাতা ২৬

ফোন— ৪৬-২২২২

নূতন-শিক্ষাবর্ষ

'মে' মাস থেকে দক্ষিণী'র নূতন শিক্ষাবর্ষ স্থরু হয়। নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা শিক্ষাদান করা হয়। বয়স্কদের রবীন্দ্র-সঙ্গীতে পাঁচ বছরের ও নৃত্যকলায় চার বছরের শিক্ষাক্রম। শিশুদের উভয় বিষয়েই তিন বছরের শিক্ষাক্রম। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে ঔপপত্তিক, স্বরসাধনা ও স্বরলিপি-পাঠ অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে নির্দিষ্ট। সতেরোটি পর্যায়কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যে শিক্ষাক্রম নির্ধারিত তার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনার সহিত পরিচয় ঘটবে। ভারতনাট্যম, কথাকলি ও মণিপুরী পদ্ধতির সমন্বয়ে নৃত্যকলার শিক্ষাক্রম পরিকল্পিত। শিক্ষা-পরিষদ : শুভ গুহঠাকুরতা, স্থনীলকুমার রায়, বীরেশ্বর বস্থ, অমল নাগ, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থশীল চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা বস্থ, হেনা সেন, মঞ্জরী লাল, দেবী চাকলাদার, লীলা দত্তগুপ্ত, আদিত্যসেনা রাজকুমার, নন্দিতা রায় ও স্থিতি গুহঠাকুরতা। শিক্ষাগ্রহণ ও ভর্তির সময় : মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার বিকাল ৪—৮॥০ এবং রবিবার সকাল ৮—১২ ও বিকাল ৪—৬।

চালক না হয়েও···

আপনার মোটরগাড়ীর গতিবিধি আপনি সম্পূর্ণরূপে জানতে পারেন। কোন সময়ে গাড়ী চালু হয় * কখন ফিরে এসেছে * কতটা পথ ঘুরেছে * কত জোরে গাড়ী চালান হয়েছে * কখন, কোথায় এবং কতক্ষণ গাড়ী থেমেছে— এ সমস্ত প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দেবে—

VDO TACHOGRAPH

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসাম প্রদেশের পরিবেশক—

হাওড়া মোটর কোম্পানী

প্রাইভেট লিমিটেড

১৬ রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ১

যুগপরম্পরায় চলেছে রূপের সাধনা কেশের পরিচর্য্যা—বিশেষ করে নারী জাতির। বর্ত্তমান যুগেও চলেছে সেই নারীর রূপের আরাধনা। এ আরাধনায় নারী তার আলুলায়িত কেশকে সুরভিত ও শ্রীমণ্ডিত করে তুলবে—।

কিং কোর 'আর্ণিকা হেয়ার অয়েল' ব্যবহার করে এ যুগের নারী। রূপের সাধনায় আরও অপরূপ হয়ে উঠবে।

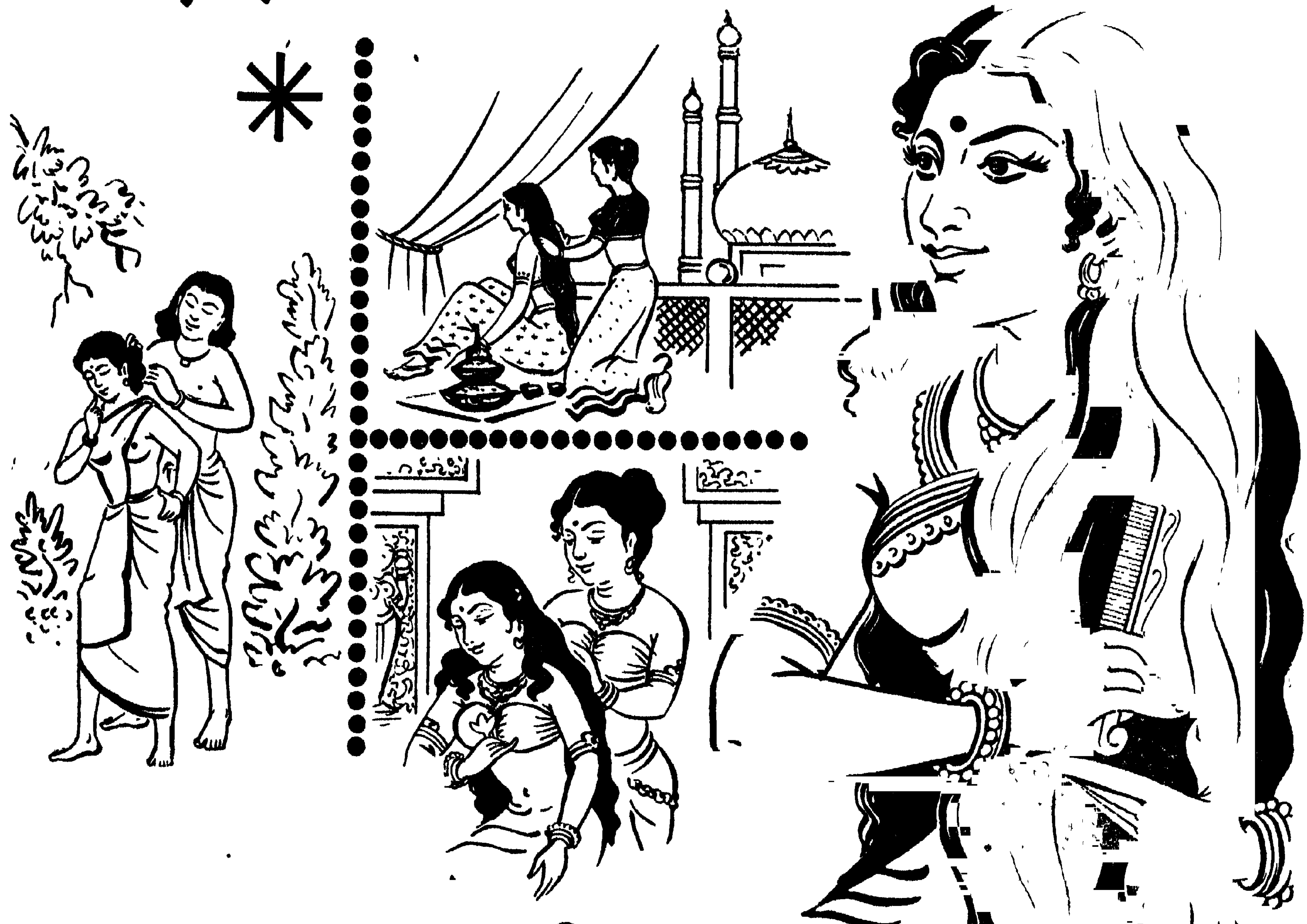

কিং কো'র

হেয়ার অয়েল

একমাত্র পরিবেশক

আর, ডি, এম, এণ্ড কোং

২১৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

প্রস্তুত কারক- কিং এণ্ড কোং কলিকাতা-৭

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৪ • বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০ • ১৮৮৫ শক
সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বিষয়সূচী

চিঠিপত্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩২১
বাংলা কাব্যে দুই রীতি	শ্রীভবতোষ দত্ত	৩২৩
জন স্টাইনবেক	শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়	৩৩৮
ভারতবর্ষীয় সভা • নবযুগের সূচনায়	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	৩৪২
রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ		
সমালোচনাতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়	৩৪৯
শতবার্ষিক রবীন্দ্রচর্চা	শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৭০
পত্রাবলী • সি. এফ. এণ্ডরুজকে লিখিত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪০৭
গ্রন্থপরিচয়	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪১৪
	শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য	৪২৩
স্বরলিপি : 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে· ·'	শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার	৪২৮
সম্পাদকের নিবেদন		৪৩১

চিত্রসূচী

একাকী	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩২১
জন স্টাইনবেক		৩৩৮
সি. এফ. এণ্ডরুজ		৪০৭

মূল্য এক টাকা

একাকী

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০ · ১৮৮৫ শক

চিঠিপত্র রমা করকে লিখিত

P. & O. S. N. Co.
S. S.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

নুটু, বিদেশে আসবার মুখে নারীবিভাগ সম্বন্ধে মনের মধ্যে অনেকখানি দুশ্চিন্তা বহন করে এনেছিলেম। এটা আভাসে বোঝা গিয়েছিল যে নারীভবন সমস্ত আশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি ও নিষ্ঠা বহন করে— তার সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত হতে পারে নি। তোদের অনেকে আমাকেই দোষ দিয়েছিলি, বলেছিলি আমিই মেয়েদের প্রশ্রয় দিয়ে তাদের সমস্ত বিধিবিধানের অতীত করে দিয়েছি— তারা আত্মত্যাগে অসমর্থ হয়ে পড়েছে, নিজেদের ছোটখাটো সুযোগ সুবিধার দিকেই তাদের সমস্ত চেষ্টা সংহত হয়েচে। এ কথার মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকে তবে সেজন্য আমি অন্তরের সঙ্গে অনুতপ্ত। ভবিষ্যতে সাবধান হব। জানিনে কি কারণে মেয়েদের সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা আছে— আমি বরাবর বিশ্বাস করে এসেচি তারা স্বভাবতই আপনার জীবন দিয়ে আমাদের আশ্রমকে গড়ে তোলবার কাজে লাগ্‌বে। এই তাদের ধর্ম্ম। দীর্ঘকাল চলে গেছে— ক্রমেই তাদের ঔদাসীন্য আমাকে পীড়িত করেচে। কিন্তু দোষ কি কেবলি আমার?

অমিয়কে যে লম্বা চিঠি লিখেছিলেম, সেটা নিশ্চয় পড়েছিস্। অনেক চিন্তা করে আমি ঠিক করেচি যে মেয়েরা যদি একটা স্বতন্ত্র আশ্রম সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা করে তবে তারই যোগে তারা নিজেদের চালনা করতে, ওখানকার আদর্শকে নিজেদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। এ সম্বন্ধে চেষ্টা করিস্। এই কাজের মধ্যে বৌমা[1] তাঁর স্বাভাবিক আসন গ্রহণ করবেন এই আমার ইচ্ছা— মীরা[2]ও যদি রাজি হয় তাহলে খুসী হব। মেয়েদের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব স্বভাবতই তাঁদের। আমার সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধজনিত দাবী যেমন আমি করতে পারি তেমনি মেয়েরাও করতে পারে। এই কারণেই তাঁরাই ঠিক মধ্যবর্ত্তিনী। মনে একান্ত ইচ্ছা আছে মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে আমেরিকায় অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করব। যতটুকু আশা পাওয়া যাচ্চে তাতে মনে হয় চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। কিন্তু যন্ত্র ও টাকায় মিলে সৃষ্টিকার্য্য হয় না। তোরা অনেকেই সকল দিক থেকেই আশ্রমে মানুষ হয়েছিস, তোরা যদি এই কাজে তোদের শ্রদ্ধা ও সেবা অন্তরের সঙ্গে উৎসর্গ করতে না পারিস তাহলে বুঝব একা আমিই দিলুম আমার জীবনটাকে একটা শূন্যতার মধ্যে। আমি কোনোদিন তোদের কাছে ভক্তি চাইনি কিন্তু আমার কাজের প্রতি

১ শ্রীপ্রতিমা দেবী

২ কবিকন্যা শ্রীমীরা দেবী

তোদের নিষ্ঠা আমি চিরদিন মনে মনে চেয়েছি। অন্য দেশে বড়ো কাজে এই নিষ্ঠা অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়— আমাদের হতভাগ্য দেশে অর্থও জোটে না শ্রদ্ধাও জোটে না। তবু আমার দিকে শেষ পর্য্যন্ত কোনো ত্রুটি না হয় এ চেষ্টা চিরদিন করতেই হবে। কেউ কেউ তোরা মাঝে মাঝে উদ্বেগ প্রকাশ করিস দুর্ব্বল শরীরে আমার দুঃখকর অধ্যবসায় দেখে। শুনে আমি মনে মনে হাসি। কেউ কোথাও একটুও দুঃখ করবে না অথচ কাজ চলবে ব্যাপারটা এত সহজ নয়। বলতে পারিস কাজ না হয় নাই চল্‌ল। কিন্তু দু দশ দিন আয়ু হ্রাসের চেয়ে সেটা আমার পক্ষে কি কম দুঃখের? মৃত্যুই কি সবচেয়ে বড় অমঙ্গল। জীবন ক্ষয়ের চেয়ে জীবনের বিফলতা কি অনেক বেশি শাস্তি নয়? ইতি ৭ই মার্চ ১৯২৯।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কানাডার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলকাতা থেকে যাত্রা করে বোম্বাইতে গিয়ে জাহাজ গ্রহণ করেন। এই পত্র সেই জাহাজে বসে লেখা। রমা কর (নুটু) শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের স্ত্রী। ১৯৩৫ সালের ১৯ জানুয়ারি তারিখে রমা করের অকালমৃত্যু হয়।

বাংলা কাব্যে দুই রীতি

ভবতোষ দত্ত

একটি কাব্যসমালোচনা উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, কাব্যসৃষ্টির দুটি উদ্দেশ্য থাকে। কোনো কাব্যের লক্ষ থাকে বিশ্বজগতে যা আছে তাকেই যথাযথ বর্ণনা করে যাওয়া; আর, কোনো কাব্যের উদ্দেশ্য হয় বিশ্বজগতের রূপকে শোধন করা। কাব্য মাত্রেরই অবশ্য মূল উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি। কিন্তু এক শ্রেণীর কবি যেমন জগতের সৌন্দর্যকে অবিকৃতভাবে প্রকাশ করেন আর-এক শ্রেণীর কবি তেমনি প্রকৃতিকে সংশোধন করে প্রকাশ করেন। বঙ্কিমের নিজের ভাষায়[১]—

'সুন্দরেও যে সৌন্দর্য নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ, কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, "যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই" সেই আত্মচিত্তপ্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া, সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন— সৌন্দর্যের অতি প্রকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতি প্রকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। তাঁহাদের সৃষ্টিতে অযথার্থ, অভাবনীয়, সত্যের বিপরীত, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক তাহার আদর্শ কোথাও দেখিবে না। ইহাকেই আমরা· ·শোধন বলিয়াছি। যে কাব্যে এই শোধনের অভাব,· ·তাহাকেই আমরা বর্ণনা বলিয়াছি।'

বিশুদ্ধ কাব্য সম্পর্কে আমাদের যা ধারণা, মনে হয়, বঙ্কিমের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সঙ্গে তার বিশেষ অমিল নেই। অবশ্য আমাদের মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র যদি এখানে 'কল্পনা' কথাটির প্রয়োগ করতেন তা হলে তাঁর আলোচ্য বিষয়টি সহজেই পরিষ্কার হয়ে যেত। বাস্তবে যা নেই তাকেই প্রকাশ করে বলা অথবা বাস্তবকে সংশোধন করে কল্পনা করা রোমান্টিক কাব্যের লক্ষণ। কিন্তু বঙ্কিমের মন্তব্যে একটি কথা আছে যেটা সংশয়ের সৃষ্টি করে। কবির সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু নেই— কথাটা এক অর্থে সত্য নিশ্চয়ই। কারণ কবির কল্পনা জগতের নিগূঢ় সত্যের বিরোধী নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু 'প্রাকৃতিক নিয়ম' বলতে এমনি ভাবের সত্যকে বোঝায় না, বস্তুর সত্যকেই বোঝায়। সুতরাং বঙ্কিম যে কাব্যের কথা বলছেন, 'আত্মচিত্তপ্রসূত' বলে তার আত্মনিষ্ঠ কল্পনার ইঙ্গিত করলেও সে কাব্য ভাবধর্মী কাব্য নয়। সে কাব্য আমাদের সহজ যুক্তিবোধের বিরোধী নয়, অর্থাৎ তা ঋজু স্পষ্ট এবং বুদ্ধিগম্য। বঙ্কিমচন্দ্র যে এই রীতির কাব্যের কথাই বলছেন তা তাঁর দৃষ্টান্ত থেকেও বোঝা যায়। তিনি হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারে'র দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। সহজেই অনুমান করা যায় যে শোধন-কাব্য বলতে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন এক ধরণের নৈতিক আদর্শসম্পন্ন কাব্য। এই আদর্শ জীবনে হয়তো নেই, কিন্তু সেই আদর্শকেই আকাঙ্ক্ষিতরূপে কাব্যে ফুটিয়ে তোলাই উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার লক্ষণ।

বঙ্কিমচন্দ্র যে কাব্যাদর্শের কথা বলেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যের সেটাই ছিল প্রচলিত সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ। সে কালে কাব্যের এই রীতির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সে কথাও বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী ও কবিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—

১ বঙ্গদর্শন ১২৮২ বৈশাখ। গঙ্গাচরণ সরকারের 'ঋতুবর্ণন' কাব্যের সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত। দ্রষ্টব্য বঙ্কিমরচনাবলী, পরিষৎ সংস্করণ, বিবিধ।

'যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য নাই? আছে বৈকি। ঈশ্বর গুপ্ত সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্যের কবি। যাহা আছে ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি।'

এই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আর-একটি মন্তব্য মিলিয়ে নিলেই বক্তব্য স্পষ্ট হয়—

'প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্তন করিয়া যায়। ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেকটা ছিল বটে— অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র, কিন্তু আর-একটা ধরণ ছিল যা কখনও বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্যনৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়।'

ঈশ্বর গুপ্তের এই কাব্যরীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র-নির্দিষ্ট প্রথমশ্রেণীর কাব্যের মধ্যে ফেলা চলে। কবি তাঁর চার পাশে যা দেখেছিলেন তাকেই তিনি তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু করে তুলেছিলেন। এই কবিতা রচনায় কবির অবশ্য নিজস্ব এক ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি ছিল। কবিতে কবিতে কাব্যরচনাভঙ্গির পার্থক্য থাকবেই। হেমচন্দ্রও ঈশ্বর গুপ্তের রীতিতে পারিপার্শ্বিক সমাজ অবলম্বনে কাব্য লিখেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি তিনি সর্বদা অনুসরণ করেন নি। ঈশ্বর গুপ্ত এবং হেমচন্দ্রের কাব্যসাফল্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও ঈশ্বর গুপ্ত -প্রবর্তিত আদর্শকেই যে পরবর্তী প্রতিনিধিস্থানীয় কবি অনুসরণ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যাকে শোধনকাব্য বলেছিলেন, ঈশ্বর গুপ্তে যদি তার দৃষ্টান্ত পাওয়া না-ও যায়, হেমচন্দ্রে তার লক্ষণ যথেষ্টই সুলভ। দেশাত্মবোধক বা ত্যাগমূলক আদর্শ, জাতীয় উন্নয়ন অথবা নবভাবের বিজয় হেমচন্দ্র যা স্থাপন করে গিয়েছিলেন, রঙ্গলালে তার ক্ষীণ সূচনা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র শোধনকাব্য বলতে এসব আদর্শের কবিতাকেও বুঝেছিলেন। কারণ জীবনে ও সমাজে যা আমাদের স্পষ্ট ও ইন্দ্রিয়গোচর হয়ে আছে, তার মধ্যে অনায়ত্ত আদর্শের কল্পনাই এই কাব্যের লক্ষণ। যা আছে তাকেই পুনর্গঠন করলে তা হবে 'অতি প্রকৃত কিন্তু অপ্রাকৃত নহে'। এতে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু হবে না।

কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়মের অবতারণা করে বঙ্কিমচন্দ্র অভিনবত্বের সূচনা করেছেন। 'প্রাকৃতিক নিয়ম' উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার একটি মূল গ্রন্থি। প্রাকৃতিক নিয়মের উপর ভিত্তি করেই ধর্ম নীতি শিক্ষা প্রভৃতি অন্য সব-কিছুর মত সাহিত্যের তত্ত্বও রচিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পরিপার্শ্বের প্রভাবের উপর খুবই জোর দিয়েছিলেন।[২] এই সূত্র তাঁরা পেয়েছিলেন টেনের সাহিত্যসমালোচনার পদ্ধতি থেকে। টেনের ইংরেজি সাহিত্য-ইতিহাস রচনার পদ্ধতি সেকালের সাধারণ ভাবনারীতিরই ফল। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই য়ুরোপে মানুষ যে নিয়মের সন্ধানে যাত্রা করেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই নিয়মসন্ধান সব বিষয়েই একটি সাধারণ প্রবণতা হয়ে দাঁড়াল। সাহিত্যসৃষ্টির কারণ রূপেও যেমন একটা নিয়মকে আবিষ্কার করে নেবার চেষ্টা হয়েছে, তেমনি সাহিত্যসৃষ্টির লক্ষ্যেও একটি নিয়ম স্থির করে নেবার চেষ্টা হয়েছে। কি রকম জলবায়ুতে কি রকম জনসমাজে সাহিত্যের বিশেষ রীতিপ্রকৃতি গড়ে ওঠে, সে বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্টতা এসে গেল। এই মতবাদে কবিপ্রতিভার কোনো রকম অলৌকিকতাকেই আর স্বীকার করা হল না। সাহিত্যের লক্ষও হল প্রভূততম ব্যক্তির প্রভূততম কল্যাণ-

২ 'মানসবিকাশ' সমালোচনা দ্রষ্টব্য, বঙ্কিমরচনাবলী, সাহিত্য-পরিষৎ, বিবিধ

সাধন মাত্র। সকলের পক্ষে যা সাধারণ, সাহিত্যের বিষয়ও হল তাই; কোনো রকম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ভাবনা এই আদর্শে গৌণ হয়ে গেল। রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের ভূমিকায় 'আশু চিত্তাকর্ষণ' করার জন্যেই উপযুক্ত বিষয় সন্ধান করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

অতএব কবিতাকে সর্বজনগ্রাহ্য করবার জন্যেই বিশুদ্ধ-ভাবমূলক বিষয় পরিহার করাই আদর্শ রীতি বলে গণ্য হল। ব্যক্তিগত ও আত্মকেন্দ্রিক বিষয়ের স্থলে বস্তুমূলক কাহিনী বা আদর্শ ই হয়েছে কবিতার প্রধানতম বিষয়। এই জন্যেই আখ্যানকাব্যের প্রচলন হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে মহাকাব্য রচনার কারণ যাই থাক্, কাহিনীর আবশ্যকতা এদিক দিয়ে সত্যই খুব বেশিই ছিল। কারণ কাহিনীর মধ্যে সর্বজনবোধ্য আদর্শ ও ভাবকে পরিবেশন করা সহজ। এমন ভাবের মূল্য নেই যে ভাব নির্জন অস্ফুট এবং ব্যক্তিগত। বঙ্কিমচন্দ্র শোধনকাব্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে বৃত্রসংহারের উল্লেখ করেছেন। ঘটনা- কাহিনী- এবং চরিত্র- সমন্বিত এই মহাকাব্যই ছিল প্রকৃষ্ট বাহন যার মধ্যে একটি আদর্শকে পরিপূর্ণ করে দেখানো সম্ভব। দধীচির আত্মত্যাগ, জয়ন্তর বীরত্ব, দেবতাদের মাতৃভূমি উদ্ধারের সংকল্প কিংবা নবীনচন্দ্রের কাব্যে সংহতিবদ্ধ মহাভারত-রচনার স্বপ্ন—এসব সেকালের শিক্ষিত কাব্যপাঠকদের চিত্ত সহজেই স্পর্শ করত। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে প্রত্যক্ষত কোনো নৈতিক উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া না গেলেও কাহিনীর স্পষ্টতার জন্যই আকাঙ্ক্ষিত রস আকর্ষণে কোনো বাধাই হয় নি। প্রমীলার যুদ্ধযাত্রায় জাগ্রত নারী-সমাজের আত্মঘোষণা, রাবণের পরাজয়ে শক্তিমান্ পুরুষকারব্রতী যোদ্ধার করুণ উদ্যম এবং সীতার বন্দীদশায় ভারতজননীর শৃঙ্খলিত রূপ যেন ভাষা পেয়েছে। লক্ষ করবার বিষয় এই যে কাব্যপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতির মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। জীবনে মানুষ যে যুক্তি বুদ্ধি এবং নীতি দিয়ে সব কিছু বিচার করেছে, কাব্যেও প্রয়োগ করেছে সেই যুক্তি ও নীতি। সত্য সত্যই সেকালটা নিভৃত কাব্যগুঞ্জনের সময় ছিল না।

মহাকাব্যের কল্পনা আখ্যানধর্মী অতএব বস্তুনিষ্ঠ, কিন্তু গীতিকাব্য তো ভাবধর্মী। সুতরাং মনে হতে পারে কেবল মহাকাব্য দিয়েই সমগ্র সাহিত্য-প্রকৃতির বিচার সংগত নয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্যই হোক আর গীতিকাব্যই হোক, দুয়েরই মধ্যে একটা প্রকৃতিগত ঐক্য আছে। ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকেই বক্তব্যের সুস্পষ্টতার দিকেই কবিদের লক্ষ নিবদ্ধ হয়েছে। মহাকাব্যে থাকে পূর্ণাঙ্গ কাহিনী, বিস্তৃত বিষয়। গীতিকাব্যে ছিল খণ্ডিত বিষয় অথবা কাহিনীর আভাস। সেকালের গীতিকাব্যে নিছক ভাবেরই বিষয় থাকত না। আজকাল সহজেই মনে হয়, যে কারণেই হোক কবিরা বিষয়কে ভাবময় করে তুলতে পারেন নি। ঈশ্বর গুপ্তের 'আত্মবিলাপ' কবিতাটির সঙ্গে মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' কবিতাটির তুলনা করলে বেশ বুঝতে পারা যায় পূর্বসূরীর চেয়ে উত্তরসূরীর কবিতা অধিকতর ব্যক্তিগত হলেও দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য হচ্ছে বক্তব্যের পরিমিততায় এবং স্পষ্টতায়। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা একটা সাধারণ তত্ত্বচিন্তার দৃষ্টান্ত, মধুসূদনের কবিতা নিজের জীবনের ব্যর্থ বাসনার হাহাকার।

হেমচন্দ্রের যুগের গীতিকাব্যের প্রকৃতিকে আরও সহজে বোঝানো যেতে পারে গীতিকাব্যের চিরকালীন বিষয়, প্রেম ও প্রকৃতি দিয়ে। হেমচন্দ্রের প্রেমবিষয়ক একটি কবিতা 'হতাশের আক্ষেপ' সেকালের একটি

---

৩ 'অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা-প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয় এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বনপূর্বক মৎকর্তৃক রচিত হইল।'

সুপরিচিত এবং সর্বজনপ্রশংসিত কবিতা। এই কবিতার বিষয় অচরিতার্থ বাল্যপ্রণয় এবং প্রণয়িণীর বৈধব্য। বাল্যপ্রণয়ের নিষ্ফলতার কারণ—

কৌমার যখন তার বলিত সে বারবার
সে আমার আমি তার অন্য কারো হব না।
ওরে দুষ্ট দেশাচার কি করিলি অবলার
কার ধন কারে দিলি আমার সে হল না।

হেমচন্দ্রের এই কবিতার মূলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকা অসম্ভব নয়, তৎসত্ত্বেও এই কবিতায় নিছক ব্যক্তিগত সুর নেই।[৪] এতে একটি কাহিনীর আভাস তো আছেই, দেশাচারের ভাবনা নিবিড়তা সৃষ্টির পক্ষে বাধা দিয়েছে। একটা স্পষ্ট বিস্তৃত সুপরিমিত বক্তব্য ছাড়া কবিতা লেখা সেকালে যেন সম্ভবই ছিল না। সেকালের প্রকৃতি বিষয়ের কবিতাতেও লক্ষ করি, প্রকৃতির রূপ রং রেখার চেয়ে প্রাধান্য পায় কবির মনের তত্ত্বচিন্তা অথবা স্বদেশ ও সমাজের ভাবনা। হেমচন্দ্রের 'যমুনাতটে' অথবা 'অশোকতরু' কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হেমচন্দ্রকেই আমরা এই কাব্যরীতির প্রতিনিধিস্থানীয় বলে ধরে থাকি।

এই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীতে রূপককবিতার বাহুল্যই লক্ষ করি। রূপকের ঐতিহ্য আমাদের পুরনো। তবু সেকালের কল্পনাপ্রবণতার সঙ্গে এর একটা নিকট-সম্বন্ধও ছিল বলে মনে হয়। রূপক হচ্ছে চিন্তার একটা সুস্পষ্ট রূপ। যাকে ইংরেজিতে 'অ্যালিগরি' বলে, সেটা ভাবনার একটা অলংকার, সে অলংকার ব্যঞ্জনা সৃষ্টির চেয়ে বক্তব্যকে আয়ত ও পরিমিত করে দেয় মাত্র। এ দিক থেকে রূপকরীতির সঙ্গে সেকালের কল্পনা-রীতির মিল ছিল। রবীন্দ্রনাথও 'সোনার তরী'র যুগে রূপকের প্রচুর ব্যবহার করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্র-কাব্যে রূপক সূক্ষ্ম ও ব্যঞ্জনাধর্মী হয়েছে এবং রবীন্দ্রমানসের সেটা একটা মূলগত বৈশিষ্ট্যেই পরিণত হয়েছে, তথাপি তাঁর প্রথম দিকের রূপক-কবিতাগুলির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পূর্বতন রূপক-কবিতার মিলও দুর্লক্ষ্য নয়। সেকালের রবীন্দ্রকাব্যের রূপক-ও ব্যঞ্জনার চেয়েও চিন্তার পরিমিততাকেই ফুটিয়ে তোলে। রূপকের এই রীতির সূত্রপাতও আধুনিককালে ঈশ্বর গুপ্তেই হয়।

নবীনচন্দ্র সেন বলেছেন বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম গীতিকবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র যখন যশোহরে তখন 'নিরাশ প্রণয়' 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী' এবং 'মুমূর্ষু শয্যায় বাঙালী যুবক' লেখা হয়েছিল। অবকাশরঞ্জিনীর প্রথম ভাগের সমস্ত কবিতাই কবির আঠারো থেকে তেইশ বৎসরে অর্থাৎ ১৮৬৪ থেকে ১৮৭০ -এর মধ্যে রচিত। প্যারীচরণ সরকার -সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত নবীনচন্দ্রের 'কোনো এক বিধবা কামিনীর প্রতি' (১৮৬৪) কবিতাটি তাঁকে সুপরিচিত করে। নবীনচন্দ্র লিখেছেন[৫]—

'অবকাশরঞ্জিনী সম্বন্ধে দুটি কথা বোধ হয় আমি বলিতে পারি। প্রথমত আমি এডুকেশন গেজেটে লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ে খণ্ডকবিতা বঙ্গভাষায় ছিল না মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' ও

৪ মন্মথনাথ ঘোষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা অস্বীকার করেছেন, দ্রষ্টব্য 'হেমচন্দ্র' ১ম খণ্ড (১৩৩৫) পৃ ২০৫। কিন্তু হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের আত্মভাব-মূলক কবিতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য দেবীপদ ভট্টাচার্য 'রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা খণ্ডকবিতা-প্রসঙ্গ', অনুক্ত, ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ৩৮০-৩৮৩।

৫ আমার জীবন, ২য় ভাগ (১৩:৬), পৃ ১৭৯

'ব্রজাঙ্গনা'য় খণ্ডকবিতা থাকিলেও তাহারা এক বিষয়ে। চতুর্দশপদী কবিতাবলী স্মরণ হয় আমার এডুকেশনে লিখিতে আরম্ভ করিবার পরে প্রকাশিত হয়। তাহাও সমস্ত এক ছন্দে। এ সম্বন্ধে একমাত্র পথপ্রদর্শক 'প্রভাকর'। তবে 'প্রভাকর'ও কাব্যাকারে প্রকাশিত হয় নাই। হেমবাবু, স্মরণ হয়, তখনও খণ্ডকবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। আমি প্রভাকরের অনুকরণে শৈশব হইতে এরূপ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, 'অবকাশরঞ্জিনী' বোধ হয় বঙ্গভাষায় এরূপ ভাবের প্রথম খণ্ডকাব্য। দ্বিতীয়ত আমি এডুকেশন গেজেটে লিখিবার পূর্বে স্মরণ হয় স্বদেশপ্রেমের নামগন্ধ বাংলার কাব্যে কি কবিতায় ছিল না।'

নবীনচন্দ্রের কবিতা অসংযত ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ এবং এই উচ্ছ্বাসের ফলে বক্তব্য অনেক সময়েই আড়ালে পড়ে যায়। এতে এক ধরণের গীতিধর্মিতা আসে সত্য, এদিক দিয়ে নবীনচন্দ্রের বিশিষ্টতাও স্বীকার্য। কিন্তু তাঁর গীতিকাব্য সাধারণত এক-একটি নাটকীয় পরিস্থিতির সংঘাতকে নিয়েই উচ্ছ্বসিত। সেই জন্যে এতে রসসৃষ্টির চেয়ে বরং সৃষ্টি হয় কাঁচা উত্তেজনার। আপাতদৃষ্টিতে নবীনচন্দ্রে ও হেমচন্দ্রে বৈপরীত্য যথেষ্ট বলেই মনে হয়। কিন্তু উভয়ের মূল কাব্যরীতিতে একটা মিল আছে। শশাঙ্কমোহন সেন নবোদ্ভূত আধুনিক বাংলার সাহিত্যাদর্শকে তিনভাগে ভাগ করেছিলেন—বস্তুগত, তত্ত্বগত এবং ভাবগত।[৬] হেমচন্দ্রের কবিতায় প্রথম দুটির দৃষ্টান্ত আছে, তৃতীয়টির দৃষ্টান্ত নবীনচন্দ্রে। ভাব বলতে বোঝায় সুখ দুঃখ বেদনা হতাশা উল্লাস প্রভৃতি কতকগুলি 'হৃদয়াবেগের প্রবলতা'। এই ভাবচিত্র আঁকবার নাটকীয় মুহূর্ত কল্পিত হয়ে থাকে। নবীনচন্দ্রের কবিতার নামকরণেই তার নিদর্শন আছে। তাঁর কবিতায় ভাষা ও ভাবের উচ্ছ্বাস এবং নাটকীয়তার আভাস আছে কিন্তু মগ্নতা অস্ফুট ব্যাকুলতা অথবা অনির্দেশ্য সৌন্দর্যানুভূতি নেই। নবীনচন্দ্রের কবিতায় রোমান্টিক বিষাদ আছে, সে বিষাদ জীবনের এবং সমাজের আশাভঙ্গ ও ব্যর্থতাজনিত। গভীর এবং সীমাহীন উৎকণ্ঠা থেকে তার জন্ম নয়। নবীনচন্দ্রের প্রথম দিকের অনেকগুলি কবিতাই প্রণয়ের ব্যর্থতা থেকে লেখা। বিশেষ করে 'নিরাশ প্রণয়' 'বিষণ্ণ কমল' 'কেন ভালবাসি' 'যাই' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে ব্যক্তিগত বেদনার তীব্র উত্তেজনা আছে। এ কথা সত্য, ঠিক এ জিনিস ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ছিল না যদিও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা থেকেই তিনি কবিতা লেখার আদর্শ পেয়েছিলেন[৭]। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় সাময়িক উপলক্ষ যে ভাবে সোজাসুজি কাব্যে এসে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বা উত্তেজনার কারণ হয়েছে, নবীনচন্দ্রের কবিতায় ব্যক্তিগত ভাবাবেগ তেমনি করেই সোজাসুজি কাব্যে স্থান করে নিয়েছে। কবির হৃদয়ে এর কোনো রূপান্তরই ঘটে নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে পাঠকের সহানুভূতি বা মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে নাটকীয় উচ্ছ্বাসে তীব্র করে তোলা হয়েছে মাত্র। এ দিক দিয়ে খানিকটা নতুনত্ব নবীনচন্দ্রের থাকলেও সেকালের কাব্যপ্রকৃতির সঙ্গেই তার মিল। বিশেষত হেমচন্দ্রের চিন্তাতরঙ্গিণীর (১৮৬১) বিষাদপ্রবণ হৃদয়াবেগের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনীর খণ্ড কবিতার ভাবগত যোগ দুর্লক্ষ্য হয় না।

এই রীতির আত্মভাবমূলক গীতিকাব্য সেকালের সমাজ বা দেশবিষয়ক অজস্র কবিতার পাশে দুর্লভ একেবারেই ছিল না বরং এই শ্রেণীর কাব্যকল্পনা উনিশ শতকীয় বলেই পরিচিত হয়েছে। এই কল্পনাকে কাব্যে রূপ দেবার যেমন বিশেষ নাটকীয় ভঙ্গি আছে, তেমনি আছে কল্পিত ব্যর্থতাবোধের অতিনাটকীয়

৬ বঙ্গবাণী ১ম খণ্ড (১৯১৫), পৃ ১২৮-২৯

৭ আমার জীবন, ১ম ভাগ (১৩১৪), পৃ ১৩০

রোমান্টিক উচ্ছ্বাস। এই নৈরাশ্যের উৎস কোথায়? রোমান্টিক কল্পনার সঙ্গে নৈরাশ্য অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু সে নৈরাশ্যবোধ আসে কল্পনাবৃত্তির অতিবিকাশের ফলে। কল্পনায় যখন সৌন্দর্যের জগৎ গড়ে ওঠে তখন এই পারিপার্শ্বিক বাস্তব সেই পরিমাণেই হয় সৌন্দর্যহীন। তাই একটা নিঃসঙ্গতাবোধ এবং বিরহবোধ কবিতাত্মাকে ব্যাকুল করে তোলে। আমাদের সাহিত্যে নবীনচন্দ্র এবং হেমচন্দ্রের কাব্যে একদিকে যেমন জাতীয় জীবন সম্পর্কে আশাবাদিতার সুর আছে, তেমনি এই শ্রেণীর আত্মভাবমূলক কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে নৈরাশ্যের সুর। কিন্তু এই নৈরাশ্যবোধ কি রোমান্টিকদের মত কল্পনাপ্রবণতার ফল? বলা বাহুল্য বিষাদপ্রবণতার উৎস সেখানে নয়। রবীন্দ্রনাথ এই যুগের কাব্যোচ্ছ্বাস সম্পর্কে যা বলেছেন তা স্মরণযোগ্য[৮]—

'তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়র মিলটন বায়রন। ইঁহাদের লেখার ভিতরকার যে জিনিসটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা। এই হৃদয়াবেগের প্রবলতাটা ইংরেজের লোকব্যবহারে চাপা থাকে কিন্তু তাহার সাহিত্যে ইহার আধিপত্য যেন সেই পরিমাণেই বেশি। হৃদয়াবেগকে একান্ত আতিশয্যে লইয়া গিয়া তাহাকে একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করা, এই সাহিত্যের একটা বিশেষ স্বভাব। অন্তত সেই দুর্দাম উদ্দীপনাকেই আমরা ইংরেজি সাহিত্যের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের বাল্যবয়সের সাহিত্যদীক্ষাদাতা অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় যখন বিভোর হইয়া ইংরেজি কাব্য আওড়াইতেন তখন সেই আবৃত্তির মধ্যে একটা তীব্র নেশার ভাব ছিল। রোমিও জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষানলের প্রলয়দাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে একটা প্রবল অতিশয়তা আছে তাহাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত।'

শুধু নাটক বা উপন্যাস নয় রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় নবীনচন্দ্র হেমচন্দ্র এবং তাঁদের অনুবর্তীদের কবিতা। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'অতিশয়তা' বলেছেন এই কবিতার তাই ছিল প্রধান লক্ষণ। শেক্‌স্‌পীয়রের সাহিত্য থেকে যে সব নাটকীয় পরিস্থিতির দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন, ঠিক সেই ধরণের পরিস্থিতিই অধিকতর অসংযমের সঙ্গে নবীনচন্দ্র প্রভৃতির কাব্যে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, সেকালের এইসব গীতিকবিতার উৎস এবং প্রকৃতি কি ছিল এবং কেনই বা এই বিষাদের বিলাস।

২

উনবিংশ শতাব্দীর এই সুপ্রচলিত কাব্যাদর্শের পাশেই গড়ে উঠেছিল আর একটি কাব্যরীতি। সেই কাব্যরীতির সঙ্গে পূর্বালোচিত কাব্যাদর্শের কোনো মিলই ছিল না। এ কাব্যে বক্তব্য একান্ত ব্যক্তিগত। বক্তব্যই এই কাব্যের সার্থকতার মান নয়। এই রীতির সাফল্য বিশুদ্ধ রসের সৃষ্টিতে, নিভৃত স্বগত ভাষণে, বাস্তবাতীত সৌন্দর্যের অনুভূতিতে। ঈশ্বর গুপ্তকে যদি আধুনিক কালে পূর্বোক্ত কাব্যধারার প্রবর্তক বলা যায় তবে বিহারীলাল চক্রবর্তীকে এই কাব্যধারার প্রবর্তক বললে অনৈতিহাসিক হবে না। বিহারীলালের কাব্যে এই নবীন রীতির প্রায় সর্ববিধ লক্ষণ প্রকাশ পেল। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল

৮ জীবনস্মৃতি : 'ভগ্নহৃদয়'

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। এই কাব্যের অষ্টম সর্গ ছাড়া অন্যান্য সর্গ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং পরে 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র যখন এডুকেশন গেজেটে 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী' প্রভৃতি কবিতা লিখছিলেন সেই সময় বিহারীলাল লিখছেন—

আমি ভ্রমি কমলকাননে
যথা বসি কমল আসনে
সরস্বতী বীণা করে
স্বর্গীয় অমিয় স্বরে
গান গান সহাস আননে।
করি সে সংগীত সুধা পান
পাগল হইয়ে গেছে প্রাণ
দৃষ্টি নাই আশে পাশে
সমুখেতে স্বর্গ হাসে
ভুলে আছে তাতেই নয়ান।

বিহারীলালের এই স্বগত-ভাষণ সেকালের প্রচলিত রীতির পাশে কতখানি অভিনবত্ব এনেছিল, আজ তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন[১]—

'বিহারীলাল তখনকার ইংরেজিভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না— তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এইজন্য তাহার সুর অন্তরঙ্গ রূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।'

বিহারীলালের কবিতার বিষয়বস্তু বা কবিতার রীতি কোনোটার সঙ্গেই প্রচলিত কবিতার মিল ছিল না। এ কথা সত্য, আমাদের আধুনিক যুগের সাহিত্যে নারীচরিত্রের সম্বন্ধে যে বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার নিদর্শন ফুটে উঠেছিল, 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যেও সেই বিস্ময়ই নতুন ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে মাত্র। তবু এ কথা বলব বিহারীলালের কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল স্বতন্ত্র। প্রথমত 'আশু চিত্তাকর্ষণ' করার জন্য সর্বজনের কৌতূহল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সামাজিক বিষয় তিনি গ্রহণ করেন নি; দ্বিতীয়ত তাঁর আত্মভাব নাটকীয় ভঙ্গিতে উচ্ছল ও অতিশয়তা দিয়ে প্রবল করে তোলা হয় নি। প্রকৃতি নিয়েই তিনি প্রধানত কবিতা লিখেছিলেন, আর তার সঙ্গে ছিল ব্যক্তিগত হৃদয়লীলার কিছু কাহিনী যেমন 'প্রেমপ্রবাহিনী' অথবা 'বন্ধুবিয়োগ'।

বিহারীলাল সম্বন্ধে এ কথা অনেকেই বলেছেন যে তিনি নিভৃত প্রাণের আত্মমগ্ন কবি ছিলেন। সর্বজনগত বিষয় তিনি গ্রহণ করেন নি, সামাজিক মানুষের মুখ চেয়েও তিনি কবিতা লেখেন নি। যখন

১ সাধনা ১৩০১ আষাঢ়: 'বিহারীলাল'। 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত।

তাঁর চার পাশের নগরজীবনে নানা জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনার আলোড়ন হচ্ছিল সেই সময় তিনি নগরজীবন থেকে পল্লীপ্রকৃতির স্বপ্ন দেখছেন অথবা বলছেন—

থাক হৃদে জেগে থাক
রূপে মন ভরে রাখ
তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর কোলাহলে।

আধুনিক ভাষায় একে পলায়নই বলা যাক আর রোমান্টিসিজ্‌মই বলা যাক, বিহারীলাল উনবিংশ শতাব্দীর আলোড়নমুখর মহানগরীর মাঝখানে বাস করেও নিজের চারি দিকে একটি শুদ্ধতার পরিবেশ রচনা করেছিলেন।

কাব্যের এই আদর্শ বিহারীলালের স্বরচিত হলেও এর কোনো পূর্বসূত্র কোথাও পাওয়া যায় কি না, এ কথা সমালোচকেরা ভেবেছেন। তাঁর কাব্যের সঙ্গে ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যের কল্পনারীতির সাদৃশ্য আছে তবু ইংরেজি কাব্যরস আত্মসাৎ করে মৌলিক ভাবেই নতুন সৃষ্টি করার মত পাশ্চাত্য সাহিত্যে অধিকার বিহারীলালের ছিল কি না সন্দেহ। তিনি পণ্ডিতবংশের সন্তান ছিলেন। সংস্কৃত তাঁর ভালোই পড়া ছিল, কিন্তু সংস্কৃত কবিতার কল্পনারীতির কোনো প্রভাব তাঁর মধ্যে খুঁজে পাওয়া শক্ত। তবে সংস্কৃত কাব্যরূপের একটি ক্ষীণ প্রভাব তাঁর 'সারদামঙ্গল' বা 'সাধের আসন' কাব্যেথাকতে পারে। এই কাব্য দুখানি শ্লোকপরম্পরায় গ্রথিত। শ্লোকগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিক থেকে সংস্কৃত কাব্যের শ্লোকরচনার সঙ্গে মিল থাকতে পারে। অবশ্য পংক্তি ও মিলের রীতি সংস্কৃত কাব্যের নয়। বিহারীলালের ভাষা বা শিল্পরীতি আলংকারিক নয়। খাঁটি সংস্কৃতানুগ আলংকারিক স্টাইলের নিদর্শন পাওয়া যাবে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'নির্বাসিতের বিলাপ' (১৮৬৮) অথবা বলদেব পালিতের 'কাব্যমঞ্জরী'তে (১৮৬৮) 'কাব্যমালা'য় (১৮৭০)। বিহারীলালের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক কাব্যরুচির সঙ্গে এদের পার্থক্য স্পষ্ট। কিন্তু তাঁর প্রথম কবিতার বই 'সঙ্গীতশতক' (১৮৬২) এর[১০] গানগুলি পড়লে একথা মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে এদের মগ্নতা ও রূপরীতির সঙ্গে নিধুবাবু শ্রীধর কথক কালী মির্জা প্রভৃতির প্রাচীন বাংলা গানের মিল আছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারও লিখেছেন[১১]—

'বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গলার বিশুদ্ধ গীতিকবিতার যে ধারাটি নিধুবাবু শ্রীধর কথক রাম বসু প্রভৃতির প্রণয়সংগীতে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহা বিহারীলাল নূতন খাতে বহাইয়া দিলেন সঙ্গীতশতকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পুরনো গীতিকবিতার সহিত শেষভাগের নূতন গীতিকবিতার অখণ্ড সংযোগের সাক্ষ্য দিতেছে বিহারীলালের এই প্রথম গানকবিতার বইটি। সুরতালের নির্দেশ থাকিলেও সবগুলি ঠিক গানের ঠাটে বাঁধা নয়। যেগুলি গানের ঠাটে বাঁধা সেগুলির ভাবে-ভঙ্গিতে প্রায়ই শ্রীধর প্রভৃতির রচনার প্রতিবিম্বন আছে। আর যেগুলি দীর্ঘতর রচনা এবং গানের ঠাটে বাঁধা নয় সেগুলিতে বিহারীলালের পরবর্তী গীতিকবিতার পূর্বাভাস রহিয়াছে।'

১০ "১৫ হইতে ২৫ বৎসর পর্যন্ত আমার মনে যে যে ভাবোদ্‌গম হইয়াছিল, এবং জীবনে যে যে ঘটনা হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ 'সঙ্গীতশতকে' বর্ণিত আছে।"— সাহিত্যসাধকচরিত 'বিহারীলাল', পৃ ১৬

১১ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড : 'নবীন কবিতার সূত্রপাত'

প্রাচীন বাংলা গানের বিষয় ছিল প্রণয়। বাউলের এবং রামপ্রসাদের গানে ছিল আধ্যাত্মিকতা। বিহারীলালের সঙ্গীতশতকে মুখ্যস্থান প্রকৃতির। তবু মোটের উপর বিষয়বৈচিত্র্য বিহারীলালের স্বাতন্ত্র্যের বড়ো লক্ষণ। কবিহৃদয়ের সহজাত প্রসন্নতা ছিল তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য। এক বৎসর মাত্র পূর্বে প্রকাশিত হেমচন্দ্রের চিন্তাতরঙ্গিণী অথবা তৎপূর্বপ্রকাশিত ঈশ্বর গুপ্ত রঙ্গলাল প্রভৃতি কবিদের কাব্যের সঙ্গে সঙ্গীতশতকের পার্থক্য একেবারে প্রকৃতিগত। পুরনো বাংলা গানের প্রতি বিহারীলালের আকর্ষণ ছিল বাল্যাবধি। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়ের কথা জানা যায় না।

পুরনো বাংলা গানের ঐতিহ্যের সঙ্গে বিহারীলালের যোগ যাই থাক আধুনিক গীতিকবিতার প্রবর্তক তাঁকেই বলতে হবে। শুধু যে প্রকৃতিকেই অপরিসীম প্রীতিস্নিগ্ধতায় তিনি অভিষিক্ত করে দিলেন তাই নয়, কাব্যে তিনি দুটি প্রধান সম্পদ এনে দিলেন। কাব্যে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব আসলে কিছুই নয়, আসল গুরুত্ব হচ্ছে কবিমানসের— বিহারীলালের কাব্য পড়েই তা প্রথম জানা গেল। এই কবিমানসটি আশ্চর্যভাবে নতুন। যে অখণ্ড জীবনসত্যের উপলব্ধি রবীন্দ্রকবিমানসের একটি অতিপ্রধান বৈশিষ্ট্য, বিহারীলালের চেতনাতেই তার প্রথম উদয়। দেহাতিক্রমী অমৃতের ঔপনিষদিক তত্ত্ব রবীন্দ্রকবিমানসের মর্মমূলে নিহিত এবং যে-আনন্দবাদ জীবন ও মৃত্যুকে একই বৃন্তে ধরে রেখেছে বিহারীলালের কাব্যে তার প্রথম ছায়াপাত ঘটেছে। 'সাধের আসন' কাব্যে তার তত্ত্বের দিকটি এবং 'সারদামঙ্গল' কাব্যে (রচনাকাল ১২৭৭-১২৮৬) তার সার্থকতর কাব্য-রূপ পাই। এই উপলব্ধি দিয়েই তিনি জীবনমৃত্যু সুখদুঃখ, সুন্দরকুৎসিত সব বিরোধকেই এক সূত্রে গেঁথে নিয়েছিলেন। একটু নিবিষ্টভাবে বিচার করে দেখলেই বোঝা যায়, যে-তত্ত্ব রবীন্দ্রমানসে এক এবং বহুর লীলায় লীলায়িত, বিহারীলালের কাব্যেই তার প্রথম সূচনা।

দ্বিতীয়ত যে নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা একালের সাহিত্যেরই একটা প্রধান লক্ষণ বিহারীলাল সেই নারীরূপকেই নতুন সৌন্দর্যবাদের প্রতীক করে তুললেন। কবির এই নারী অবশ্য মানবী নয়। এ একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রতিমা মাত্র। আবার এই কল্পিত সৌন্দর্যদেবীর সঙ্গে বিরহমিলনের মানবীয় লীলাতেই বিহারীলালের কাব্য পূর্ণ। মনের সৃষ্টি বলে এই সৌন্দর্যদেবীর অন্য নাম মানসী। বিহারীলালের প্রভাবেই অক্ষয়কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য কবিদের কাব্যে এই মানসী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

যখন নবীনচন্দ্র গীতিকবিতা লিখতে আরম্ভ করেছেন এবং মনে করেছেন তিনিই প্রথম এর সূচনা করলেন, সেই সময়ে বিহারীলাল অবোধবন্ধু পত্রিকায় লিখছিলেন 'নিসর্গসন্দর্শন', 'বঙ্গসুন্দরী', 'প্রেমপ্রবাহিনী'। প্রেমপ্রবাহিনী কাহিনীকাব্যের ধারাকে কিছু অনুসরণ করেছে। সারদামঙ্গল কাব্যের নামকরণেও তিনি মধ্যযুগীয় আদর্শকে অনুসরণ করেছেন। কাহিনীর একটা ক্ষীণ সূত্র এতে লক্ষ্য করলে চোখে পড়ে। অবশ্য এগুলি যুগরুচির অনিবার্য প্রভাব। এরকম প্রভাব বিহারীলালের কাব্যের আরও কোনো কোনো জায়গায় পাওয়া যেতে পারে। তথাপি বিহারীলালের ভঙ্গি এতই স্বতন্ত্র যে হেমচন্দ্রীয় আদর্শের প্রভাব নেহাতই গৌণ ধরলেও ক্ষতি নেই। হেমচন্দ্র বিহারীলালের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন কি না সন্দেহ। বরং সমসাময়িক ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিতে বিহারীলাল দ্বারা হেমচন্দ্রের প্রভাবিত হওয়াই আশ্চর্যের বিষয়। বিহারীলাল-সম্পাদিত 'অবোধবন্ধু' পত্রিকাতে (১২৭৬ শ্রাবণ) হেমচন্দ্রের 'ইন্দ্রের সুধাপান' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। হেমচন্দ্রের সঙ্গে বিহারীলালের পরিচয় ছিল, কিন্তু সে পরিচয় সামান্যই। বিহারীলালের

কবিতা তাঁর ভালো লাগত, সংক্ষেপে এই কথাটি ছাড়া আর কিছু বলেন নি।[১২] নবীনচন্দ্রের সঙ্গে বিহারীলালের কোনো যোগাযোগের বিবরণ জানা যায় না। বিহারীলাল তাঁদের সমসাময়িক হলেও তাঁর কাব্য সেকালে কতকটা অপরিচিত ছিল, এ কথা সকলেই জানে। অর্থাৎ বিহারীলালের কাব্যের রসিক তখন মুষ্টিমেয়।

তথাপি বিহারীলালের আদর্শ চলে এসেছে যতদিন পর্যন্ত না রবীন্দ্রনাথ একে তুলে নিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে হেমচন্দ্রের রীতিতে কবিতা লিখতেন।[১৩] কিন্তু তিনি বিহারীলালের কবিতার আবাল্য গুণগ্রাহী ছিলেন। জীবনস্মৃতিতে তার উল্লেখ সকলেই দেখেছেন। অবোধবন্ধু পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিহারীলালের কবিতা পড়েন; কিন্তু অবোধবন্ধুর কবিতা পড়েই তিনি বিহারীলালকে চেনেন এ কথা সম্ভবত ঠিক নয়। সঙ্গীতশতক (১৮৬২) পড়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিহারীলালের অনুরাগী পূর্বেই হয়েছিলেন। বিহারীলাল তাঁদের সঙ্গে পরে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতী পত্রিকা প্রতিষ্ঠার সময় বিহারীলাল ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বলেছেন,[১৪] "আমাদের পরিবারের বন্ধু কবি বিহারীলালকে ছোটবেলা থেকে জানতুম এবং তাঁর কবিতার প্রতি অনুরাগ আমার ছিল অভ্যস্ত।"

যে সময় বিহারীলালের গুণগ্রাহীর সংখ্যা অল্প ছিল, সেই সময় ঠাকুর-পরিবারে তাঁর কাব্য ছিল সমাদৃত।

কেবল কাব্যপাঠে নয়, বিহারীলালের আদর্শ এঁদের মধ্যে কাব্যতত্ত্ব হিসাবেও গৃহীত হয়েছিল। বিহারীলালের কাব্যরীতিই তাঁদের মতে কাব্যের যথার্থ আদর্শ। হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রকে তাঁরা কতখানি স্বীকার করতে পেরেছিলেন সন্দেহের বিষয়। ভারতী পত্রিকাই এই কাব্যের আদর্শ ও তত্ত্ব সর্বতোভাবে গ্রহণ করে নেয়। এই পত্রিকায় 'বাঙ্গালী কবি নয় কেন' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[১৫] এই প্রবন্ধে অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় নবীনচন্দ্রের কাব্যরীতিকে আক্রমণ করে বিহারীলালের কবিতা উদ্ধৃত করে তাঁর প্রশস্তি করা হয়েছিল। তাতে লেখক বলছেন[১৬]—

'আমাদের খুব খানিকটা রক্তমাংস চাই, যাহা আমরা ধরিতে পারি, যাহা দুইহাতে লইয়া আমরা নাড়াচাড়া করিতে পারি। আমাদের গণ্ডারচর্ম মন অতি মৃদু সূক্ষ্ম স্পর্শে অনুভব করিতে পারে না। এইজন্য আমরা বাইরণের ভক্ত।'

অতঃপর নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনীর ২য় ভাগ থেকে 'চিত্র' নামক কবিতার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে লেখক মন্তব্য করেছেন[১৭]—

---

১২ মন্মথনাথ ঘোষ, 'হেমচন্দ্র' ১ম খণ্ড (১৩৩৫), পৃ ১৮৬-৮৭

১৩ প্রবোধচন্দ্র সেন, 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা' বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাখ এবং 'ভোরের পাখি' বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৮ কার্তিক-পৌষ

১৪ রবীন্দ্ররচনাবলী (বিশ্বভারতী) ২য় খণ্ড, 'কড়ি ও কোমল'এর ভূমিকা

১৫ ভারতী ১২৮৭ আশ্বিন

১৬ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৭২

১৭ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৭৩

'এমনতর একটা স্থূল নশ্বর মাংসপিণ্ড নহিলে বাঙ্গালী হৃদয়ের অসাড় অপূর্ণ স্নায়ুবিশিষ্ট কর্কশ ত্বকে তাহার স্পর্শ ই অনুভব হয় না।'

এর পর লেখক অবকাশরঞ্জিনী থেকেই 'কেন ভালবাসি' কবিতার চার লাইন উদ্ধৃত করে তুলনা করেছেন বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরী কাব্যের 'একদিন দেব তরুণ তপন' কবিতাটির সঙ্গে। অতঃপর লেখকের মন্তব্য[১৮]—

'ইহাতে নিবিড় কেশভার, ঘনকৃষ্ণ আঁখিতারা, সুগোল মৃণালভুজ নাই তাই বোধ করি ইহার কবি বঙ্গীয় পাঠকসমাজে অপরিচিত, তাঁহার কাব্য অপঠিত। আন বিষ, মার ছুরী, ঢাল মদ— এমনতর একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড না হইলে বাঙ্গালীদের হৃদয়ে তাহার একটা ফলই হয় না। একপ্রকার প্রশান্ত বিষাদ, প্রশান্ত ভাবনা আছে, যাহার অত ফেনা নাই, অত কোলাহল নাই অথচ উহা অপেক্ষা ঢের গভীর তাহা বাঙ্গালা কবিতায় প্রকাশ হয় না।'

এই রচনাটি রবীন্দ্রনাথের কিনা জানি না[১৯] তবে জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ মার্জিত ও সংযত ভাষায় কবিতার এই আদর্শের কথাই বলে গিয়েছেন এটা লক্ষণীয়। ভারতীতে 'বাঙ্গালী কবি কেন' এই নামে একটি রচনা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। সেই রচনাটি 'নীরব কবি এবং অশিক্ষিত কবি' নামে 'সমালোচনা' গ্রন্থের (১২৮৮) অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ আরও কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে গীতিকাব্যের লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। 'সমালোচনা'র অন্তর্ভুক্ত দুটি প্রবন্ধ 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' (বৈশাখ ১২৮৮) এবং 'সঙ্গীত ও কবিতা' (মাঘ ১২৮৮) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এতে তিনি কবিতা সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা হেম-নবীনের কাব্যের আদর্শের অনুকূল নয় বরং বিহারীলালেরই অনুকূল। 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা'য় তিনি বলছেন[২০]—

'যেখানে সীমা আরম্ভ সেইখানেই আমাদের কাজকর্ম যুঝাযুঝি ও অসীমের দিকে আমাদের বিশ্রামের স্থল আছে— সেই দিকেই কি আমরা মাঝে মাঝে নেত্র ফিরাইব না? সে অসীমের দিকে চাহিলে যে অবিমিশ্রিত সুখ হয় তাহা নহে, কোমল বিষাদ মনে আসে। কারণ, সেদিকে চাহিলে আমাদের ক্ষুদ্রতা আমাদের অসম্পূর্ণতা চোখে পড়ে, সংশয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন প্রকাণ্ড রহস্যের মধ্যে নিজেকে রহস্য বলিয়া বোধ হয়— সে রহস্য ভেদ করিতে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসি।'

এর সঙ্গে তুলনীয় বিহারীলাল—

রহস্য বিশ্বের প্রাণ
রহস্যই স্ফূর্তিমান্
রহস্যে বিরাজমান ভব।

১৮ পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২৭৪

১৯ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন রচনাটি রবীন্দ্রনাথের। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, সংশোধিত সংস্করণ ১৩৬৭ পৌষ, পৃ ১৩২। কিন্তু এই প্রবন্ধটি 'সমালোচনা' গ্রন্থে অথবা অচলিত সংগ্রহে সংকলিত হয় নি, সম্ভবত আলোচনার ভাষা ও রীতিতে পরে রবীন্দ্রনাথের কাছে সংকলনযোগ্য মনে হয় নি।

২০ অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬২) পৃ ৯৪

ভাই বন্ধু কেবা কার
রহস্যেই আপনার।
প্রেম স্নেহ সুত দারা
বায়ু বহ্নি সূর্য তারা
সকলি রহস্যময়।
এ ব্রহ্মাণ্ডে রহস্যই সব।[২১]

রবীন্দ্রনাথ কবিদের যে অস্ফুট ব্যাকুলতার কথা, অসীমের জন্য অনির্বচনীয় বিরহের কথা বলেছেন, বিহারীলালের কাব্যে সেই ব্যাকুলতা এবং বিরহবোধই প্রধান রস। এই অনুভূতি ব্যক্তিগত ও আত্মমগ্ন। এই অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করবার উপায় সুর এবং ছন্দ। 'সঙ্গীত ও কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ বলছেন[২২]—

'আমাদের ভাব প্রকাশের দুটি উপকরণ আছে—কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমন কি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ভাবপ্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় -ভাষায় মিলিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে।'

কয়েক বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ 'ভাষা ও ছন্দ' নামে যে বিখ্যাত কবিতা লিখেছিলেন তাতে এই কথাগুলি আরও সুন্দর করে বলেছিলেন। কাব্যের কাজ তথ্য-বর্ণনা করা নয়, কিংবা যুক্তি দেওয়া নয়। কাব্য গভীর ও অনির্বচনীয় অনুভূতিকে ভাষা দেয়। সেজন্য ব্যঞ্জনা চাই, ইঙ্গিত ও সংকেত চাই। সুর আমাদের অর্থবদ্ধ কথায় ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। কাব্য বুঝিয়ে দেয় না, অনুভব করিয়ে দেয়। এখানেই গদ্য ও কাব্যের পার্থক্য। বিহারীলাল তার নিবিড় অনুভূতিকে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। তিনি যদি সেটা না পেরে থাকেন, তবে সেটা তাঁর শিল্পের ত্রুটি, অনুভূতির ফাঁকি নয়। রবীন্দ্রনাথের অভিমত ভারতীগোষ্ঠীর কাব্যের আদর্শ প্রতিফলিত করেছিল। এই প্রবন্ধগুলিতে বিহারীলালের কবিতার উল্লেখ নেই বটে, কিন্তু অভিমতগুলি যে তাঁর কবিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য, পাঠকমাত্রেই সে কথা বুঝতে পারবেন। বিহারীলালই সর্বপ্রথম উদ্দেশ্যবিরহিত কাব্য লেখেন। সে যুগে লোকে বিশ্বাস করত, সাহিত্যসৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন— কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নয়, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কবিরা চিত্তরঞ্জন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। কিন্তু ভারতী পত্রিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের মতের প্রতিবাদ করে প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল[২৩]—'কাব্যের প্রাণ আমোদ দেওয়া। যদি আমোদ জন্য কাব্যে স্থান বিশেষে নীতিকথার বিশেষ আবশ্যক করে, তবেই তাহাকে কবি আদর করেন।'

বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা বস্তুগত কাব্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় যেমন সহায়তা করেছে, ঠাকুর-পরিবারের 'ভারতী' পত্রিকা তেমনি সহায়তা করেছে বিহারীলাল-প্রবর্তিত ভাবমূলক কবিতার প্রতিষ্ঠায়। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবির কবিতা প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গদর্শনে, তাঁদের কাব্যের আদর্শ প্রচারে বঙ্গদর্শন

২১ 'সাধের আসন', প্রথম সর্গ 'মাধুরী'

২২ অচলিত সংগ্রহ ২য় খণ্ড (১৯৬২) পৃ ৮৯

২৩ ভারতী, কার্তিক ১২৮৭ : 'কাব্যের উদ্দেশ্য', পৃ ৩২৪

প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। এতে বিহারীলালের কবিতা কখনও প্রকাশিত হয় নি; ভারতীতেও হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কবিতা বেরিয়েছিল বলে জানা নেই। বিহারীলালের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় পর্যন্ত ছিল না। এ বিষয়ে সুরেশ সমাজপতি লিখেছেন[২৪]—

'বেহারীবাবু বঙ্কিমবাবুর প্রতি বড় প্রসন্ন ছিলেন না। আমি মনে করিয়াছিলাম বেহারীবাবুর কাছে যেমন বঙ্কিমবাবুর কথা শুনি বঙ্কিমবাবুর মুখেও হয়ত তত উচ্চগ্রামে না হউক কিছু শুনিব, কিন্তু বঙ্কিমবাবু বিহারীবাবুর দুই একটী গল্প শুনিয়া বলিলেন "জীবনেও Poet! ইহাকেই বলে কবি। খুব সদানন্দ লোক ত।"'

বঙ্কিমচন্দ্র বিহারীলালের কাব্য কতখানি পড়েছিলেন বলা কঠিন। বঙ্গদর্শনে নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনীর সমালোচনা উপলক্ষে গীতিকাব্য নামে যে প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন তাতে বলেছেন[২৫]—

'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষার উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।'

এদের মধ্যে বিহারীলালের কাব্যের নাম নাই। অথচ এই প্রবন্ধ লেখার পূর্বে বিহারীলালের সারদামঙ্গল পর্যন্ত কাব্য রচিত হয়েছে। শুধু আখ্যানকাব্য ও গীতিকাব্য বলে নয় স্পষ্টতই গীতিকাব্যেও দুটি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকেই। এই দুই সম্প্রদায় দুই বিখ্যাত পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। এই দুই আদর্শ সাময়িক আদর্শ মাত্র নয়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত দুই আদর্শের কাব্যসৃষ্টি পাশাপাশি চলে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ কবি বিহারীলালের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিলেও অন্য আদর্শটি লুপ্ত হয় নি। কিন্তু বিহারীলালের অনুকরণ যদিও তেমন ব্যাপকভাবে হয় নি, তথাপি কয়েক বৎসরের মধ্যেই বাঙালি পাঠক বিহারীলালের স্বতন্ত্র আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে ওঠেন। বিহারীলালের অনুসরণ করেছিলেন অক্ষয়কুমার বড়াল এবং প্রিয়নাথ সেন। এঁরা দুজনেই বিহারীলালের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন।[২৬] রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিপ্রতিভা (১৮৮১) এবং সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২) থেকেই বিহারীলালের প্রভাবকে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নেন। রচনাবলী সংস্করণে 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন[২৭]—

'তখন হেম বাঁড়ুজ্জে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোনো দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না যাঁরা নূতন কবিদের কোনো একটা কাব্যরীতির বাঁধা পথে চালনা করতে পারতেন। কিন্তু আমি তাঁদের সম্পূর্ণ ই ভুলে ছিলুম। আমাদের পরিবারের বন্ধু কবি বিহারীলালকে ছেলেবেলা থেকে জানতুম এবং তাঁর কবিতার প্রতি অনুরাগ আমার ছিল অভ্যস্ত। তাঁর প্রবর্তিত কবিতার রীতি ইতিপূর্বেই আমার রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে গিয়েছিল।'

---

২৪ বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, পৃ ৩২৫

২৫ বঙ্গদর্শন ১২৮০ বৈশাখ

২৬ বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, পৃ ৩২৫

২৭ রবীন্দ্ররচনাবলী (বিশ্বভারতী) ২য় খণ্ড, 'কবির মন্তব্য'

অবশ্য সূক্ষ্মভাবে তুলনামূলক আলোচনা করে দেখলে সমালোচকেরা বিহারীলালের প্রভাব রবীন্দ্রকবি-মানসে পরেও পাবেন, যদিও হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কোনো চিহ্ন পাবেন কিনা সন্দেহ। যতদূর মনে হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকেই বিহারীলালের কাব্যরীতি বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে। অক্ষয়কুমারের কাব্যগ্রন্থ এই সময় থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাব্যগুলির প্রকাশকাল এই সময় থেকেই। এই সময়কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিরূপে রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ। রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহসভায় বঙ্কিমচন্দ্র নতুন কবিকে মালা পরিয়ে বরণ করে নেন 'নবোদিত অরুণের মতো'। সেকালের অনেক কবি যাঁদের মধ্যে সত্যকার কবিত্বশক্তি ছিল, প্রথম দিকে হেমচন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন কিন্তু পরে তাঁরাই আকৃষ্ট হয়েছেন ভাবমূলক আত্মনিষ্ঠ কবিতার আদর্শে। এই দ্বিধার যুগ ছিল মোটামুটি ১৮৮০ থেকে ১৮৯০-র মধ্যে। উনিশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রপন্থার শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃপ্রমাণিত হয়ে যাওয়ায় হেমচন্দ্রীয় রীতি ম্লান হয়ে এল। অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাতদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী উল্লেখযোগ্য যিনি প্রথমে হেমচন্দ্রকে অনুসরণ করে পরে রবীন্দ্রপন্থা বরণ করেছিলেন[২৮]। এই পরিবর্তন যুগের একজন উল্লেখযোগ্য কবি কামিনী রায়। কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে ভূমিকা লিখেছিলেন হেমচন্দ্র। ভূমিকায় হেমচন্দ্র বলেছেন—

'কবিতাগুলি আজকালের ছাঁচে ঢালা। যাঁহারা এ ছাঁচের পক্ষপাতী নহেন তাঁহাদের নিকট এ পুস্তক কতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে তাহা বলিতে পারি না; তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিলে তাঁহারাও লেখকের অসাধারণ প্রতিভা ও প্রকৃত কবিত্বশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিবেন।'

'আজকালের ছাঁচ' বলতে হেমচন্দ্র নবানুকৃত গীতিকাব্যের আদর্শকেই বুঝিয়েছেন। কামিনী রায় তাঁর কবিতায় সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার যে সুর ধ্বনিত করেছিলেন তা হেমচন্দ্রেরই অনুরূপ। সেইসঙ্গে তাঁর প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ নতুন আত্মনিষ্ঠ কল্পনার পথ নির্মাণ করেছে। তাঁর কাব্যে একটা নিঃসঙ্গতার সুর আছে যা বিহারীলালের অনুরূপ, যদিও বিহারীলালের প্রীতিপ্রসন্নতার সঙ্গে তাঁর কোনো মিল নেই। যাই হোক, হেমচন্দ্রের উক্তিতে প্রমাণিত হচ্ছে যে সাহিত্যে একটি নূতন রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। এই রীতি যে আসলে নূতন নয়, তা আমরা দেখেছি। কিন্তু এই সময়ে এই রীতি বেশ পরিচিত এবং অনুসৃত হতে আরম্ভ করেছে। সরোজকুমারী দেবী-রচিত এবং স্বর্ণকুমারী দেবী-সম্পাদিত 'হাসি ও অশ্রু' কাব্যের সমালোচনায় জনৈক সমালোচক লিখেছিলেন[২৯]—

'হাসি ও অশ্রু যে ধরণের কবিতা পুস্তক এ ধরণের কবিতার প্রবর্তক ও নেতা "সারদামঙ্গলে"র কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। চক্রবর্তী মহাশয়ের গুণভাগ ছাঁকিয়া লইয়াছেন তাঁহার মেধাবী শিষ্য প্রতিভাবান্

২৮ 'অশ্রুকণা'র (১৮৮৭) পূর্ব পর্যন্ত গিরীন্দ্রমোহিনী হেমচন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন। অশ্রুকণার কবিতাগুলি নির্বাচন করেছিলেন অক্ষয়কুমার বড়াল। এই সম্পাদন-উপলক্ষে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনীর মনোমালিন্য হয়। এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য 'সাহিত্যে তস্করতা', নববিভাকর সাধারণী, ২৯ কার্তিক ১২৯৪, পৃ ৩৪১। অতঃপর অক্ষয় বড়ালের সঙ্গে বাদপ্রতিবাদ, ঐ পত্রিকা ৬ অগ্রহায়ণ ১২৯৪ পৃ ৩৫৩, ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৪ পৃ ৩৬৬, ১০ মাঘ ১২৯৪।

২৯ জন্মভূমি, ১৩০২ আষাঢ় পৃ ৪৪৬

বঙ্গের কৃতী কবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ। সেই রবিকবির পাঠশালে এখন অনেকে "হাতেখড়ি" দিতেছেন; দুই একজন "লায়েকও" হইয়াছেন।'

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই নবরীতির গীতিকাব্যের প্রবর্তক বলে বিহারীলাল স্মরণীয় হয়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথের অধিনায়কতায় তাঁর যে একটি শিষ্যসম্প্রদায় গড়ে উঠেছে এটাও স্বীকৃত হয়েছে। এই রীতি যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠছে এবং সমালোচকের কথার ভঙ্গিতে বোঝা যায় এই রীতিকে অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করে নিতে এখনও তাঁর দ্বিধা আছে। তাঁর ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিই এর প্রমাণ। এই দ্বিধার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হেমচন্দ্রই রেখে গিয়েছেন। গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করেন।[৩০] হেমচন্দ্র বলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েন 'কিন্তু দেখ, ভাল বুঝতে পারিনে বাপু।' বলা বাহুল্য ভাল বুঝতে না পারার কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিতার ব্যক্তিগত এবং আত্মনিষ্ঠ অনুভূতি এবং তদনুগত ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা। নবীনচন্দ্র সেনও বলেছেন[৩১]—

'কবিতা-দেবী এখন কায়া ত্যাগ করিয়া ছায়া হইয়াছেন। কায়া সাকার, কাযে কাযে পৌত্তলিক ও অশ্লীল। ছায়া নিরাকার। কিন্তু আমরা মুর্খ পৌত্তলিকেরা নিরাকার ব্রহ্মকে যেমন বুঝিতে পারি না এই নিরাকার কবিতাও কিছু বুঝি না।'

স্পষ্টকাব্য এবং অস্পষ্টকাব্য নিয়ে যে দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেখা দিয়েছিল, তার পূর্বতন ইতিহাস আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা থেকেই আরম্ভ হয়েছে। প্রায় ১৮৬০ থেকেই দুই রীতির সমান্তরাল ধারা চলে এসেছে এবং ১৮৮০র পর থেকেই অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত রীতিটি প্রাধান্য পেতে থাকে। তখন থেকেই বাংলা কবিতার পাঠক এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন, এবং এর নানা দিক ভাবতে আরম্ভ করেছেন। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ সাহিত্যিকগণ যে অভিযোগ সুস্পষ্টভাষায় উত্থাপন করেছিলেন, তারই পূর্বসূত্র আছে 'নবজীবনে'র একটি রচনায়[৩২]—

'বাঙ্গালা সাহিত্য সূতিকাগার হইতেই সুস্পষ্ট। বৈষ্ণব কবিগণের নন্দ যশোদা,— শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী, বৃন্দা, চন্দ্রা, শ্রীদাম, সুবল— মান মাথুর রাস প্রভাস সকলই বর্ণনার গুণে আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ।· ·

'কেবল বৈষ্ণব কবিগণ বলিয়াই নহে, বাঙ্গালার পূর্বতন সকল কবিই সুস্পষ্ট চিত্রণে সমীচীন। গীতিকাব্যের তো কথাই নাই; উহা জগতে অতুল্য।···কবিকঙ্কণের দারিদ্র্যদুঃখ বর্ণনা— যে কখন দুঃখের মুখ দেখে নাই তাহাকে দীন হীনের কষ্টের কথা বুঝাইয়া দেয়।···

'কেবল সে-যেন, কি-যেন, কেন-যেন, কোথা-যেন, যেন-যেন করিলে কবিতা হয় না। এমন করিয়া কেবলই যেন-যেন করিলে ছায়া ছায়া আঁকিলে আর হতাশ হুতাশ উদাস আকাশ— বলিলেই কেবল কবিতা হয় আর কিছুতে হয় না, এমন নহে। কবিতার অস্থি আছে, মজ্জা আছে, রক্ত আছে, মাংস আছে; কবিতা কেবলই ছায়াময়ী কায়ার বাষ্পময় দীর্ঘশ্বাস নহে।'

তখনও রবীন্দ্রনাথের যুগ আরম্ভ হয় নি। কিন্তু নবজীবনের সমালোচনায় রবীন্দ্ররীতির সমালোচনাই শোনা গেল। এর যোগ হেমচন্দ্রীয় কাব্যাদর্শের সঙ্গে আশা করি এটা এতক্ষণে সুস্পষ্ট হয়েছে।

---

৩০ মন্মথনাথ ঘোষ, 'হেমচন্দ্র' তৃতীয় খণ্ড (১৩৩০) পৃ ৪১১-১২

৩১ আমার জীবন ১ম খণ্ড, (১৩১৪) পৃ ১৩০

৩২ নবজীবন, অগ্রহায়ণ ১২৯৩, 'কাব্যি সমালোচনা', পৃ ৩১৮-৩২০

জন স্টাইনবেক

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

আধুনিক মার্কিন কথাশিল্পীদের স্বীকৃতি দিতে নোবেল পুরস্কার সমিতি কার্পণ্য করেন নি। সিনক্লেয়ার লুইস্ (১৯৩০), পার্ল বাক্ (১৯৩৮), উইলিয়ম ফক্নার (১৯৪৯), আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (১৯৫৪) তার উদাহরণ। এবার ১৯৬২র নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন জন্ স্টাইনবেক। অন্য কোনো দেশের এতজন সমসাময়িক কথাসাহিত্যিকের নাম এ পুরস্কারের খতিয়ানে দেখা যায় না।

এর কারণ আছে। মার্কিন সভ্যতা তরুণ, তার প্রাণশক্তি প্রবল। জীবনের পরীক্ষানিরীক্ষার পালা তার এখনও শেষ হয় নি। ধমনীতে তার নতুন রক্তের সঞ্চার প্রতিক্ষণে। তাই তার সাহিত্যেও নূতনত্বের স্বাদ বারে বারেই মেলে। এবং নোবেল পুরস্কার তাঁদেরই দেওয়া হয়, যাঁরা চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন পথ নির্ণয় করেন।

অবশ্য তাঁর নূতনত্ব নিয়েও স্টাইনবেক পুরানো মার্কিন ঐতিহ্যেরই উত্তরসাধক, হার্ম্যান মেলভীল আর ওঅল্ট হুইট্‌ম্যানেরই বংশধর। আর এমার্সন যে অরিগন্ আর টেক্সাসের কাঠগড়ানো মাছশিকারী নিগ্রো-এবং-রেডইণ্ডিয়ান-বৎসল সাহিত্যিকের স্বপ্ন দেখেছিলেন তারও অনেকখানিই সত্য হয়েছে স্টাইনবেকের মধ্যে।

স্টাইনবেকের জন্ম আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে, ক্যালিফোর্নিয়ার সেলীনাস শহরে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের সাতাশে ফেব্রুয়ারি। তাঁর মা আইরিশ, বাবার পূর্বপুরুষ জার্মান। ফলে দুই সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তাঁর জীবনে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা, কিন্তু ডিগ্রীগ্রহণ হয় নি। তার বদলে কখনো মজুর সেজে, কখনো খামারে কখনো ল্যাবরেটরিতে কাজ ক'রে তিনি আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে এসে হাজির হলেন মহানগর নিউ ইয়র্কে। কিন্তু নিউ ইয়র্ক তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। তাই আবার তিনি ঘরে ফিরে এলেন এবং সাহিত্যচর্চা করতে লাগলেন। প্রথম উপন্যাস 'দি কাপ অভ গোল্ড' প্রকাশিত হল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে।

বহু অভিজ্ঞতাপ্রসূত তাঁর জীবন। কিন্তু তাদের নিয়েই তিনি লিখতে ভালোবাসলেন যারা সহজ, যারা মাটির কাছাকাছি। বিশেষ ক'রে ক্যালিফোর্নিয়ার উপরে তাঁর রক্তের টান, ওখানেই তাঁর সব উপন্যাসের পটভূমি। 'দি পাস্চার্স্ অব হেভ্নে্' এবং 'টু এ গড্ আন্নোন্' প্রকাশিত হল ১৯৩৩এ, ক্যালিফোর্নিয়ারই গল্প। কিন্তু আমেরিকা তখন অর্থনৈতিক সংকটের কবলে, ফলে তাঁর এ তিনখানি বই তিন হাজার কপির বেশি বিক্রি হয় নি। পরবর্তী উপন্যাস 'টর্টিলা ফ্ল্যাট্' (১৯৩৫) কিন্তু খুবই জনপ্রিয় হল। যাদের নিয়ে তিনি এ বই লেখেন, তারা মণ্টেরি প্রদেশের পাইসানো সম্প্রদায়, রক্তে তাদের মেক্সিকোর আদিম সুর— 'হাসি আর মমতামাখানো ভালোমানুষের জাত'। তারা এক দিকে যেমন আইনের ধার ধারে না, অন্যদিকে তেমনি খাঁটি মানুষ। আবার 'অব মাইস অ্যাণ্ড মেন' (১৯৩৭)-গ্রন্থের নায়ক লেনি-ও জড়বুদ্ধি, কিন্তু শিশুর মতো তার ভালোবাসা। দূরসম্পর্কের ভাই জর্জ-কে সে যেমন ভালোবাসে, তেমনি ভয় করে। একমাত্র জর্জ'ই তাকে চালাতে পারে, আর কেউ তার ভালোবাসার উপদ্রব সইতে পারে না, কুকুর খরগোস আর ইঁদুরের

জন স্টাইনবেক

ছানারা তো প্রায়ই প্রাণ হারায়। অবশেষে যেদিন তাদের মনিব কার্লি'র বৌ তার অবোধ আদরে মারা পড়ল, সেদিন আর জর্জ লেনিকে বাঁচাতে পারল না। নৃশংস অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে অবশেষে জর্জ'ই বন্দুক তুলে নিল। লেনি যখন পরমবিশ্বাসে তার সঙ্গে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে, তখন জর্জ তাকে হঠাৎ গুলি করতে বাধ্য হল। বিস্ময়েরও সময় পেল না লেনি। শিকারীরা এসে দেখল লেনির মৃতদেহের পাশে হতভম্ব জর্জ ব'সে আছে। যেমন নিদারুণ, তেমনি নাটকীয় এ গল্পের সংহতি।

এর পর 'সানফ্রানসিস্কো নিউজ' থেকে স্টাইনবেককে বলা হ'ল ক্যালিফোর্নিয়ার বাস্তুহারা কৃষাণদের সম্পর্কে লিখতে, যারা ট্র্যাক্টরের সাহায্যে নতুন কৃষিব্যবস্থার তাড়নায় মধ্য-আমেরিকার ওক্লাহোমা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় এসে আশ্রয় খুঁজছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিল তাঁর দুটি উপন্যাস : 'ইন্ ডিউবিয়াস্ ব্যাট্‌ল্' এবং তাঁর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর উপন্যাস 'দি গ্রেপ্‌স্ অব রথ' (১৯৩৯)। আমেরিকান কংগ্রেসে এই বই নিয়ে আলোচনা হল, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এ প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন, এবং ক্যালিফোর্নিয়া রাষ্ট্র এ সমস্যা সম্বন্ধে সতর্ক হলেন। সে বছর এবং পরের বছরেরও জনপ্রিয়তম বইয়ের তালিকায় 'দি গ্রেপ্‌স্ অব রথ'-এর নাম রইল। স্টাইনবেকের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলিও প্রায় এই সময়েই প্রকাশিত হয়, 'দি লং ভ্যালি' (১৯৩৮) গ্রন্থে সেগুলি সংকলিত আছে। বিশেষ ক'রে 'দি রেড পোনি' বা লাল টাট্টু গল্পটি স্মরণীয়।

তার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পালা। এ সময় স্টাইনবেক প্রথমে মার্কিন বিমানবাহিনীর তরফে লেখার কাজে নিযুক্ত হন, এবং পরে 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' এবং ইংলণ্ডের 'ডেলি এক্সপ্রেস' পত্রিকার সাংবাদিক রূপে য়ুরোপে কাটান। সেই সময়ে নাৎসি আক্রমণের কুরূপ ফুটে ওঠে তাঁর 'দি মুন্ ইজ্ ডাউন' উপন্যাসে। যুদ্ধশেষে তিনি আবার ফিরে আসেন স্বদেশে। তার পর তাঁর 'দি পার্ল' 'বার্নিং ব্রাইট' প্রভৃতি ছোট বড় গল্প বেরিয়েছে। তবে তাঁর ইদানীংকালের বৃহত্তম রচনা 'ইস্ট অব ইডেন' (১৯৫২)। এই বই সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "আমার প্রায় সব কিছুই ওতে আছে।"

স্টাইনবেক অনেক লিখেছেন। প্রথম উপন্যাসের পর এই তেত্রিশ বছরের মধ্যে তাঁর আরও ছাব্বিশখানি বই প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে গল্প-উপন্যাস ছাড়া অন্য ধরণের রচনাও আছে। যেমন রাজনৈতিক ব্যঙ্গরচনা তাঁর 'দি শর্ট্ রেন্ অব পিপিন্ দি ফোর্থ্'; বাস্তুসংস্থান নিয়ে তাঁর 'লগ ফ্রম দি সী অব কর্টেজ'।

স্টাইনবেক নিশ্চয় আরও লিখবেন। 'দি গ্রেপ্‌স্ অব রথ' বা 'ইস্ট অব ইডেন্'-এর মতো বৃহৎ উপন্যাস আর লিখবেন কিনা বলা যায় না। তবু জীবন সম্পর্কে এখনও তাঁর অগাধ নিষ্ঠা, তাঁর প্রতিটি রচনা প্রাণের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। বোধ হয় এই প্রাণশক্তিতে দোসর বলেই স্বর্গত এচ্. জি. ওয়েল্‌স্ তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন : "That tremendous genius"—সেই প্রচণ্ড প্রতিভার অধিকারী।

স্টাইনবেকের ভিতরে দুটি মন আছে। একটি কবিমন, যা চিরন্তনের সন্ধানী, যা তৃপ্তি পায় মাটির অঞ্চলে আর মানুষের হৃদয়ে, প্রেরণা যার বেদ ও বাইব্‌লে। আর, অন্যটি সামাজিক মন, সমাজ ও রাজনীতির বড় বড় দোলার সঙ্গে যার তাল মেলানোর ঝোঁক, মানুষের সংগঠনে অন্যায় অবিচার দেখলে যা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাঁর লেখায় এ দুইয়ের সমন্বয় ঘটেছে। যদিচ তাঁর উপাখ্যান আধুনিক সমাজের পরিবর্তনশীল রূপ নিয়ে, কালকের কৃষাণ এবং আজকের মজুরদের নিয়ে, তবু তাঁর লেখায় যেন চিরকালের মানুষের রূপটিও

আমরা অনেকখানি পাই। তাই তাঁর 'টু এ গড্ আন্‌নোন্'এর ভূমিকায় ঋগ্বেদের 'য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে· ·কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' মন্ত্র আমাদের আশ্চর্য করে না। আর 'দি গ্রেপ্‌স্ অব রথ'এর দেশান্তরী কৃষাণদের পশ্চিমমুখো যাত্রার সঙ্গে বাইব্‌লের সেই প্রতিশ্রুত দেশের দিকে যাত্রার সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। এবং 'দি গ্রেপ্‌স্ অব রথ' যদি হয় নিষ্ক্রমণ বা 'এক্সোডাস' অধ্যায়ের নবরূপ, 'ইস্ট অব ইডেন্' তবে জাতক বা 'জেনীসিস্' অধ্যায়ের। মনে রাখা দরকার যে এ উপন্যাসের নায়কের নামও অ্যাডাম্— অ্যাডাম্ ট্র্যাস্ক্। তারও দুই ছেলে, এবং তারা জেনীসিস্‌এর কাহিনীকে জানে "The symbol story of the human soul"—মানবাত্মার রূপককথা— ব'লে।

কিন্তু তাঁর কাহিনীগুলির একটি অব্যবহিত দিকও আছে। কখনো তা বিশ দশকের অর্থনৈতিক সংকট, কখনো ত্রিশ দশকের শ্রমিকবিক্ষোভ, কখনো চল্লিশ দশকের মহাসমর। এবং তার সমাজনৈতিক বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে স্টাইনবেক কখনোই অচেতন নন। তাঁর জীবনবোধ বা আদর্শস্পৃহা কোনোকালেই বাস্তব তথ্যের প্রতি উদাসীন থাকে নি। 'দি গ্রেপ্‌স্ অব রথ'এ তিনি ওক্‌লাহোমা থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত যে যাত্রাপথের ছবি এঁকেছেন, তার প্রতিটি ধূলিকণার ভিতরে ঐতিহাসিক সত্য প্রচ্ছন্ন আছে। সে পথ একদিকে যেমন "mother road, the road of flight"— মায়ের মতো পথ, উধাও হবার পথ— অন্যদিকে তেমনি এর ভৌগোলিক পরিচয় "হাইওয়ে ৬৬, কত গ্রামের বুক জুড়ে দীর্ঘ কংক্রিটের রাস্তা, মানচিত্রের ঢেউয়ের মতন— মিসিসিপি থেকে বেকার্স্‌ফীল্ড্"।

এই দুটি মানসের সমন্বয় যে তাঁর সব উপন্যাসে সমান সফল হয়েছে তা বলা যায় না। একই উপন্যাসের সব জায়গাও হয়তো সমান সফল হয় নি। এইজন্যে তাঁর পাঠকসমালোচকেরা সময় সময় তাঁকে নিয়ে কিঞ্চিৎ বিব্রত। তিনি প্রচারব্রতী না ভাববিলাসী এই নিয়ে তাঁদের সমস্যা। কারও কারও মতে 'দি গ্রেপ্‌স্ অব রথ'এর তুলনা চলে শুধু হ্যারিয়েট স্টো-র 'আঙ্ক্‌ল্ টম্‌স্ ক্যাবিন'এর সঙ্গে, এবং স্টাইনবেকের চেতনা একান্তভাবেই সমাজসংস্কারকের চেতনা। অন্যদের মতে আবার স্টাইনবেক ভাবালু আদর্শবাদী, যিনি সমকালীন ঘটনাবলীকে তাঁর ভাববিলাসের নিমিত্তমাত্র ক'রে তুলেছেন।

এ দুটি মতই বোধ হয় চরম। সমসাময়িক সত্যকে স্টাইনবেক তুলে ধরেছেন ঠিকই, কিন্তু তা শিল্পীর নিষ্ঠা নিয়েই, নিছক প্রচারবাদের উৎসাহ নিয়ে নয়। এবং সে শিল্পীর নিষ্ঠা সমন্বয়েরই নিষ্ঠা। তাকে সার্থক করতে তিনি যে পথে এগিয়েছেন, সে অতি দুরূহ সাধনার পথ। তাতে হয়তো তিনি মধ্যে মধ্যে বাধা পেয়েছেন, হয়তো সবগুলি উপাদানকে মেলাতে গিয়ে তাঁকে কিছু কিছু বিসর্জন দিতে হয়েছে, কিন্তু তাই ব'লে নিছক ভাবালুতা বা সেন্টিমেণ্টালিটির মধ্য দিয়ে তিনি সহজ সমাধান খোঁজেন নি।

এবং এক এক জায়গায় তিনি আশ্চর্যভাবে সফল হয়েছেন। সে সমস্ত জায়গায় তাঁর লেখা হঠাৎ যেন জ্ব'লে উঠেছে, সে রকম দীপ্তি তাঁর সমসাময়িক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে এক উইলিয়ম ফক্‌নার ছাড়া আর কারও লেখায় পাওয়া যায় না। এ রকমই একটি সম্পূর্ণ সৃষ্টি 'অব মাইস অ্যাণ্ড মেন'। সেখানে স্টাইনবেকের কবিকল্পনা এবং মানবদরদী মনের বাঁধন কখনোই শিথিল হয় নি।

অন্য উপন্যাসগুলিতে অজস্র শক্তির পরিচয় থাকা সত্ত্বেও যদি স্টাইনবেক সম্পূর্ণ সার্থক না হ'য়ে থাকেন, তার একটি কারণ বোধ হয় এই যে, বিশেষ বিশেষ চরিত্রকে আলাদা ক'রে দেখতে বা বুঝতে তাঁর আগ্রহ কম। মানুষকে মিলিত ক'রে দেখতেই তাঁর উৎসাহ বেশি। সেই উৎসাহের ভরেই তিনি বলেন "This

is the beginning—from 'I' to 'we'—"এইখানেই সূচনা—'আমি' থেকে 'আমরা'র দিকে (দি গ্রেপ্‌স্ অব রথ্)। আর যখন তাঁর প্রথমদিকের উপন্যাস 'টু এ গড্ আন্‌নোন্'এ পড়ি নায়কের প্রতি তার ভ্রাতৃবধূর সেই কথা: "তুমি কোনো বিশেষ লোককে জানো না জোসেফ, জানো শুধু লোকেদের। তুমি বিশেষ ক'রে কিছু দেখতে পারো না জোসেফ, তুমি সমগ্রকেই দেখো"—তখন মনে হয় এ কথা স্টাইনবেক যেন নিজেকেই বলছেন। একমাত্র 'ইস্ট অব ইডেন'এ এসে দেখি তাঁর চরিত্রগুলি যেন যথেষ্ট স্পষ্টতা পেয়েছে। এ কথা বোধ হয় তিনি বুঝেছেন, তাই ও বই সম্বন্ধে তাঁর এত আশা: "আমার যা কিছু আছে তার প্রায় সবই ওতে আমি দিয়েছি।" আর তাই ঐ উপন্যাসেরই এক জায়গায় শোনা যায়—এও যেন তাঁর নিজেরই কথা: "আমি বিশ্বাস করি যে পৃথিবীতে সবচেয়ে দামী জিনিস হল ব্যক্তিমানসের মুক্ত সন্ধানী মন। আমি যার জন্যে লড়াই করতে পারি সে হল নিজের খুশিমত দিক্‌নির্ণয় করবার স্বাধীনতা। যে কোনো তত্ত্ব, যে কোনো ধর্ম, যে কোনো শাসনবিধি ব্যক্তিপুরুষকে নষ্ট করতে বা খর্ব করতে চায় তারই বিরুদ্ধে আমার লড়াই।"

ভারতবর্ষীয় সভা নবযুগের সূচনায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভারতবাসীর পক্ষে সিপাহী যুদ্ধ সাপে বর হইল। ভারতবর্ষীয় সভা কোম্পানীর ঘুন-ধরা অসার শাসনের অবসান চাহিয়াছিলেন। ব্রিটিশরাজ তথা পার্লামেণ্ট ইহার অবসান ঘটাইয়া ভারতবর্ষের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করায় নব-যুগের সূচনা হইল। তবে ইহাই তো যথেষ্ট নয়। ভারতবাসীর কল্যাণ তখনই সম্ভব যখন ভারতশাসনে তাহার অধিকার স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতবর্ষীয় সভা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠাবধিই কর্মতৎপর ছিলেন। নূতন পরিবেশে ইহার পক্ষে যে সুযোগ উপস্থিত হইল তাহাও তাঁহারা পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইলেন।

পরবর্তী যুগে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সরকারের নিকট 'আবেদন-নিবেদন' পেশ করা কেমন যেন একটা উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এ সময়ে এরূপ করা ছাড়া উপায়ন্তর ছিল না। ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যবোধ-উন্মেষ এবং সংহতি-স্থাপনের পথে সিপাহী যুদ্ধের দরুন যে বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হয় তাহা তখন তিরোহিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সভা পূর্বের মতই শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে পার্লামেণ্টে আবেদনপত্র প্রেরণে মনোযোগী হইলেন। ১৮৫৯ সনেই কালবিলম্ব না করিয়া বিবিধ বিষয় -সম্বলিত একখানি ব্যাপক আবেদনপত্র পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়। ইহাতে পাঁচটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়, যথা : ব্যবস্থা-পরিষদ, বিচার-আদালত, সিবিল সার্বিস, শিক্ষা এবং ভূমিস্বত্ব। শাসনে অধিকার স্থাপনের পক্ষে ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতীয় গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। সভা প্রস্তাব করিলেন যে, দেশমধ্যে বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলি হইতে পরিষদের সদস্য গ্রহণ করিতে হইবে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণের স্থান ইহাতে হওয়া একেবারেই সমীচীন নয়। কারণ এরূপ হওয়ায় তাঁহাদের মূল কার্যে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। তখনই এই আবেদনপত্রে কোনো কার্য হয় নাই। সভা পুনরায় ১৮৬০ সনে এইসকল বিষয়ের উপরে জোর দিয়া পার্লামেণ্টে আর-একখানি আবেদনপত্র পাঠাইলেন। এবারে, নূতন একটি বিষয়ও আবেদনপত্রে যুক্ত করা হইল। বিলাতে প্রভাবশালী একদল লোক এই বলিয়া আন্দোলন উপস্থিত করেন যে, ভারতশাসনে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করা মোটেই উচিত নয়। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইংরেজ এই দেশের শাসক, কাজেই খ্রীষ্টান ধর্ম বিষয়ে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সরকারকে মানিয়া লইতে হইবে। ভারতবর্ষীয় সভা পূর্ব হইতেই এইরূপ অসংগত দাবির আপত্তি করিতেছিলেন। এবারকার আবেদনে এধরণের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধে তাহারা ঘোরতর আপত্তি জানাইলেন।

সিপাহী যুদ্ধ পরিচালনা করিতে গিয়া ভারতের সরকারী রাজকোষে ভয়ানক টান পড়ে। শাসন-ব্যয় নির্বাহার্থ কর্তৃপক্ষ নূতন নূতন উপায় অবলম্বনে বাধ্য হইলেন। এইজন্য ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট স্থানীয় সরকারকে অর্থাগম সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য জেমস উইলসন নামক একজন অর্থনীতি বিশারদকে প্রেরণ করেন। কি কি উপায়ে অর্থাগম সম্ভব সে বিষয়ে বিবেচনা করিয়া ১৮৬০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে উইলসন একটি 'নূতন কর-পরিকল্পনা' বা Taxation Scheme আইন পরিষদে উপস্থাপিত করিলেন। ইহাতে দুই প্রকারের নূতন কর স্থাপনের কথা হয় : ১. লাইসেন্স কর, ২. আয়কর। সকল শ্রেণীর শিল্পী ব্যবসায়ী ও বৃত্তিধারীদের

উপর প্রথমোক্ত কর নির্দিষ্ট হারে ধার্য হয়। কতদিনের জন্য, ইহাতে তাহা বলা হইল না। দ্বিতীয়, অর্থাৎ আয়কর ধার্য হইল এইরূপ : দুই শত টাকা হইতে পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়ের উপর ধার্য হইল শতকরা দুই টাকা ; এবং বার্ষিক আয় পাচ শত টাকার উপরে হইল শতকরা তিন টাকা। ইহা মাত্র পাঁচ বৎসরের জন্য ধার্য হয়। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর আয়ের উপর স্থায়ীভাবে শতকরা এক টাকা হারেও আয়কর নির্ধারিত হইল।

উইলসন-প্রস্তাবিত এই মারাত্মক কর-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় সভা অবিলম্বে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা প্রথমে হেতুবাদ সহ এই পরিকল্পনার বাংলা অনুবাদ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার করিয়া ইহার কুফলের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং সরকারের নিকটও ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিপি পাঠাইলেন।

সভা প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। দরিদ্র নিপীড়িত ও বিভ্রান্ত স্বদেশবাসীদের উপর এতাদৃশ করভার না চাপাইয়া অন্যান্য কি কি উপায়ে সরকারের অর্থাগম হইতে পারে সে বিষয়ে একটি পাণ্টা পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিলেন। তাঁহাদের মতে শুল্ক নীতির রদবদল, আবগারী কর বৃদ্ধি, লবণ কর, স্ট্যাম্প ডিউটি বা কর, নূতন করিয়া আফিঙের মূল্য নির্ধারণ, খাসমহল ও পতিত জমি বিক্রয়, মাদ্রাজ প্রদেশের 'এনাম'সত্ব সংস্কার, সরকারি পেপার কারেন্সি এবং নদীর জলকর—এই সকল উপায়ে সরকারে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে। কর্তৃপক্ষ এই সময়েই সভার প্রস্তাব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ নাই। তবে নেতৃবর্গ তখনই যে যুগপৎ প্রশাসনিক ব্যবস্থার উৎকর্ষ এবং জনসাধারণের কল্যাণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন ইহা হইতে সে বিষয়ে সম্যক হৃদয়ংগম হয়। সভার পক্ষে রমানাথ ঠাকুর এবং দিগম্বর মিত্র সরকারি প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার দ্বারা উক্ত উইলসন-প্রস্তাবিত করভার এক বৎসরের জন্য কথঞ্চিৎ লাঘব করিতে সমর্থ হন।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি ব্যাপারেরও উল্লেখ করিতে হয়। উইলসনের কর-পরিকল্পনার সমালোচনা করিয়া মাদ্রাজের গবর্নর সার্ চার্লস এডওয়ার্ড ট্রেভিলিয়ন নিজমত প্রকাশ করিলে ভারত সরকারের পরামর্শে ভারতসচিব তাঁহাকে ১৮৬০, জুন মাসে তারযোগে বিলাতে ডাকিয়া পাঠান। অর্থাৎ তিনি উক্তপদ হইতে অপসারিতই হইলেন।

এই বৎসর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইল। ইহার কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। সিপাহীদের অনাচার এবং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য এই অঞ্চলে সরকারি সেনাবাহিনীর শতগুণ অত্যাচার-উৎপীড়নে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো বানচাল হইয়া যায়। চাষাবাদের লোকাভাব, তাহার উপরে অনাবৃষ্টি ; ফলে এই ভীষণ দুর্ভিক্ষ। ভারতবর্ষীয় সভা দুর্গত দেশবাসীর সাহায্যকল্পে নিজেরাই শুধু অর্থভাণ্ডার খুলিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহারা মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজনৈতিক সভা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদের সাহায্যকল্পে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভূমিব্যবস্থার সংস্কার সাধন সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য একটি সাবকমিটিও সভা স্থাপন করিলেন।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি লাভক্ষতিবিহীন লোকহিতকর বিবিধ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার -কল্পে ভারতবর্ষীয় সভা ভারত সরকারের নিকট একটি আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই বৎসর ১৮৬০ সনে ব্যবস্থা-পরিষদে এ উদ্দেশ্যে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহা ১৮৬০ সনের ২১ আইন নামে পরিচিত হইয়াছে। এই

আইনটি যে কত শুভ এবং সুদূরপ্রসারী তাহা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হইয়াছে। এই সনে এমন কয়েকটি আইন পরপর বিধিবদ্ধ হইল যাহা লইয়া সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে বৈরিতার সূত্রপাত হয় বিশেষভাবে। সিপাহী যুদ্ধের প্রাক্কালে ১৮৫৭ সনে কর্তৃপক্ষ অস্ত্র-আইন পাস করাইয়া লন, ইহা আমরা আগে জানিয়াছি। এই বৎসর এই আইনটিকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। শুধু ইহাই নহে, দেশী বিদেশীদের মধ্যে ব্যবহার-বৈষম্য এই আইনটিতে সূচিত হইল। স্বভাবতই ভারতবর্ষীয় সভা ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। যুদ্ধকালীন সঙ্কটাবস্থা তখন বিদূরিত, কাজেই তাহাদের মতে এই আইনের প্রয়োজনীয়তা আর আদৌ ছিল না। তথাপি তাঁহারা বলেন, এরূপ আইন যদি বিধিবদ্ধ করা একান্তই আবশ্যক বিবেচিত হয় তাহা হইলে তাহাতে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যে ব্যবহার-বৈষম্য করা আদৌ যুক্তিযুক্ত হইবে না। সভার এই প্রতিবাদে অনেকটা কাজ হইল। সরকার ব্যবহারং বৈষম্যমূলক ধারাগুলি তুলিয়া লইলেন এবং জেলাশাসকদের উপর অস্ত্র-ব্যবহারের লাইসেন্স দান বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের ভার দিলেন। আর-একটি আইন বিধিবদ্ধ হইল 'Exemption Law' বা 'অব্যাহতি আইন' নামে। এতদিন মফস্বলের বিচার-আদালতগুলির ইউরোপীয় অপরাধীদের গ্রেফতার করা হাজতে আটক রাখা এবং সুপ্রিম কোর্টে বিচারের জন্য চালান দেওয়া প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি ব্যাপারের অধিকার যদি বা ছিল, এই আইন-বলে তাহা হইতেও ইহাদের বঞ্চিত করা হয়। ভারতবর্ষীয় সভা ইহাতে ভীষণ আপত্তি তুলিলেন, কিন্তু তাহাদের আপত্তি গ্রাহ্য হইল না।

তৃতীয় আইনটি ছিল নীলচাষ সম্পর্কে। নীলকর ও নীলচাষীদের মধ্যে বিরোধ এই সময় খুবই প্রকট হইয়া ওঠে। মফস্বলের নীলকরদের স্থানীয় আদালতে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করায় যে কত অনর্থের সৃষ্টি হইতে পারে সে সম্বন্ধে আঁচ করিয়া ভারতবর্ষীয় সভা কর্তৃপক্ষকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। মফস্বলের শাসকবর্গ ইংরেজ, নীলকরেরাও ইংরেজ। প্রশাসনিক ব্যাপারে উভয়ের যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় নীলচাষীদের দুর্গতির আর অন্ত রহিল না। ইহার উপর আসিল ১৮৬০ সনের চুক্তিভঙ্গ আইন। নীলচাষীরা চুক্তিমত নীলচাষে প্রবৃত্ত না হইলে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহাদিগকে ফৌজদারী আইনে অপরাধী করিয়া শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। ভারতবর্ষীয় সভার অন্যতম প্রধান সদস্য হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু পেট্রিয়টে "Rayots' Coercion Law" বা রায়ত-পীড়ন আইন বলিয়া ইহাকে আখ্যাত করেন। সভা এইরূপ 'বে-আইনী আইনের' জোর প্রতিবাদ করিয়া এই দুইটি প্রস্তাব করিলেন: প্রথমত 'চুক্তিভঙ্গ আইন' তুলিয়া লইতে হইবে; দ্বিতীয়ত একটি নীল কমিশন স্থাপন দ্বারা নীলকর ও নীলচাষীর মধ্যে বিরোধের কারণগুলি অনুসন্ধান করিয়া সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। চুক্তিভঙ্গ আইনের নির্মমতা লক্ষ করিয়া ভারতসচিব সার চার্লস উড মাত্র ছয় মাসের জন্য ইহা চালু করিতে অনুমতি দেন। সভার দ্বিতীয় প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে একটি কমিশন গঠিত হইল ডব্লু. এস. সিটনকারের সভাপতিত্বে। ইহা ইণ্ডিগো বা নীল কমিশন নামে আখ্যাত। ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এই কমিশনে প্রতিনিধিত্ব করেন। নীলচাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের অনাচার-উৎপীড়ন কমিশনের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। কমিশন প্রধানতঃ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিয়া এইরূপ অন্যায় কার্যের প্রতিবিধানের সুপারিশ করিলেন। মধ্যবঙ্গের জেলাগুলির সীমানা রদবদল করিয়া নূতন নূতন মহকুমায় বিভক্ত করা হইল। নীলকরদের আক্রোশ কিন্তু

প্রশমিত হইল না। নীলচাষীদের সপক্ষ হরিশ্চন্দ্রের 'হিন্দু পেটিয়টে'র বিরুদ্ধে 'মানহানি'র মামলা রুজু করিয়া দেয়। ১৪ই জুলাই ১৮৬১ সনে হরিশ্চন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হন। নীলকরদের আক্রোশ হইতে তাহার সহধর্মিণীও নিষ্কৃতি পান নাই। প্রজাদরদী পাদ্রী লঙও নীলকর সাহেবদের কোপে পড়িলেন নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া। সুপ্রিম কোর্টে মানহানির দায়ে তিনি অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁহার এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হইল। ভারতবর্ষীয় সভার সহকারী সভাপতি প্রতাপচন্দ্র সিংহ বিচারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন এবং অন্যতম প্রধান সদস্য কালীপ্রসন্ন সিংহ মামলার রায় বাহির হইবা মাত্রই আদালতে তৎক্ষণাৎ জরিমানার হাজার টাকা নিজ হইতে জমা দিলেন। এই রূপে ভারতবর্ষীয় সভা প্রকাশ্যে পক্ষাপক্ষ গ্রহণ না করিয়াও জনসাধারণের হিতার্থে প্রাণপণ চেষ্টা-উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

এ সময়ে সরকারি বেসরকারি ইউরোপীয়েরা ভারতবাসীদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। উভয়ের মধ্যে নানা ব্যাপারে জাতি-বৈরিতা স্পষ্ট আকার ধারণ করে। ইহা যে সিপাহী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া তাহাতে দ্বিমত নাই। বিচার-আসন হইতেও কোনো কোনো ইংরেজ ভারতবাসীদের উপরে গালিবর্ষণ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। এইরূপ একজন ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি—সার মর্ডাণ্ট লসন ওয়েলস। তিনি বার বার বিচার-আসন হইতে ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্রের উপর অযথা দোষারোপ করিয়া কটুকাটব্য করিতে থাকেন। বাঙালীর পক্ষে ইহা সহ্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষীয় সভার নেতৃবর্গ কুড়ি হাজার বঙ্গবাসীর স্বাক্ষরযুক্ত একখানি প্রতিবাদলিপি ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করেন। ইহা এতই গোপনে হইয়াছিল যে, বিদেশি পরিচালিত বিদ্বেষভাবাপন্ন সংবাদপত্রগুলি শত চেষ্টা সত্ত্বেও ইহার একখণ্ড অনুলিপিও সংগ্রহ করিতে পারে নাই। সভার স্থায়ী সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেবের পৌরোহিত্যে ১৮৬১ সনের ২৬ আগস্ট এক বিরাট জনসভায় বিচারপতি ওয়েলসের নিন্দাসূচক একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। ইহার প্রতিলিপিও ভারতসচিবকে পাঠানো হয়। ইহাতে খুবই কাজ হইল। ওয়েলস্ ঐরূপ আচরণের জন্য ভারতসচিব কর্তৃক তিরস্কৃত হইলেন।

ভারতবর্ষীয় সভা কি প্রশাসনিক কি পৌরসভা-বিষয়ক সকল সরকারি কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। ১৮৬১ সনে পুলিস কমিশন এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বা পৌরসভা কমিশন গঠিত হয়। সভা প্রথমটির উদ্দেশ্যে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কোনো কোনো বিষয়ে তাঁহাদের মতামত গ্রাহ্য হয়। তাঁহারা এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন যে, পূর্বেকার গ্রামীণ চৌকিদারি ব্যবস্থায় কিছু কিছু রদবদল হইলেও মূলত ইহা বজায় রাখিতে কমিশন সম্মত হইয়াছেন। শাসন ও বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণে সভার উদ্যোগ সুবিদিত। এইবারে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে পুলিসি ব্যাপারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব হইতে রেহাই দেওয়া হইল। ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা অধ্যক্ষপদ স্বতন্ত্র করায় বিচার ও শাসন বিভাগকে আলাদা করিয়া লইবার সূচনা হইল।

কলিকাতার উন্নতিকল্পে ভারতবর্ষীয় সভা বরাবর অবহিত ছিলেন। ১৮৬১ সনে সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠিত হইল। সভার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন ইহার অন্যতম প্রধান সদস্য দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা)। কমিশন পূর্ববর্তী আইনের আমূল সংস্কার সাধনের জন্য নির্দেশ দিলেন যে, অতঃপর ছয় জন মাত্র সদস্য লইয়া পৌর কার্য নির্বাহার্থে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই বোর্ডের অধীনে

থাকিবে ছয়টি লোকাল বোর্ড। কেন্দ্রীয় বোর্ড নিজ হস্তে যাবতীয় কার্য পরিচালনার ভার লইবেন, স্থানীয় বোর্ডগুলির মধ্যে প্রয়োজন মত অর্থবণ্টনও করিবেন। পরবর্তীকালে কলিকাতা পৌরসভা স্বায়ত্তশাসন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে যে পরিণত হয় তাহার মূল পাই এই নির্দেশগুলির মধ্যে। এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে দিগম্বর মিত্রের কৃতিত্ব অবশ্যই স্মরণীয়। পর বৎসর উক্ত সুপারিশ অনুসারে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়।

ভারতীয় ফৌজদারি আইন এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইন রচনা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চলে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর যাবৎ। সুবিজ্ঞ ব্যবহারাজীবী এবং আইনবিশারদগণ এ দেশে ও বিলাতে বসিয়া এই বিষয়ক কার্যে প্রবৃত্ত থাকেন। ১৮৬১ সনের প্রথমে ইহা একটি স্পষ্টরূপ ধারণ করে এবং ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে দুইটি আইনের আকারে পাস করিয়া লওয়া হইল। আলাপ আলোচনার বিবিধ পর্যায়ে ভারতবর্ষীয় সভা সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিতেছিলেন; দণ্ডবিধি আইনে তাহার কতকগুলি গৃহীতও হয়। কিন্তু তাহারা এই বলিয়া গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন যে, মফস্বলের ফৌজদারি আদালতগুলির উপর ইংরেজ অপরাধীদের বিচারের ভার এবারেও অর্পিত হইল না। এই প্রকার ব্যবহার-বৈষম্য আমাদের জাতীয় আন্দোলনে যথেষ্ট রসদ যোগাইয়াছে।

আর-একটি কারণে ১৮৬১ সন জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। বহু বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষীয় সভা ভারত-শাসনে ভারতবাসীদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। ইহার দুইটি ধাপ— ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবাসীদের গ্রহণ এবং সিবিল সার্বিসের দ্বার ভারতীয়দের নিকট উন্মোচন। বিচারবিভাগের সংস্কার ও উন্নতি সাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রদেশে সুপ্রিম কোর্ট এবং সদর আদালতগুলিকে একত্র করিয়া হাইকোর্ট স্থাপনের প্রস্তাবও তাহারা কয়েক বৎসর যাবৎ করিয়া আসিয়াছেন। এইরূপে উচ্চতম আদালত স্থাপিত হইলে জেলাসমূহের বিচার-ব্যবস্থারও উৎকর্ষ সাধিত হইবে, সভা এইরূপ মতামতই বহুবার প্রকাশ করেন। এইসকল উদ্দেশ্যে নেতৃবর্গ শুধু দেশেই নয়, বিলাতেও আন্দোলন পরিচালনার আয়োজন করেন। ভারতের হিতকর কার্যকলাপ সম্পর্কে লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়ান রিফর্ম সোসাইটির আন্তরিক সহযোগিতার কথা আমরা জানিয়াছি। ভারতবর্ষীয় সভা অর্থসাহায্যের দ্বারা এই সোসাইটিকে পালন-পোষণ করিতেন। সোসাইটির সভাপতি বিখ্যাত উদারনৈতিক নেতা জন ব্রাইট এবং সম্পাদক জন ডিকিনসন পার্লামেণ্টে ও জনসাধারণের মধ্যে ভারতবর্ষীয় সভার প্রস্তাবসমূহের অনুকূলে প্রচারকার্য পরিচালনা করেন। ১৮৫৯ ও ১৮৬০ সনে পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষীয় সভা কর্তৃক প্রেরিত স্মারকলিপির কথা উল্লেখ করিয়াছি। এইবারে তাহাতে ফল হইতে দেখিয়া সভা নিশ্চয়ই আনন্দিত হইলেন। ১৮৬১ সনের মধ্যভাগে পার্লামেণ্টে তিনটি বিল উত্থাপিত হইল, এগুলি 'ইণ্ডিয়া বিলস্' নামে আখ্যাত। সেপ্টেম্বর মাসে রাজকীয় অনুমতি লাভের পর তিনটিই আইনে পরিণত হয়। এই তিনটি যথাক্রমে— ১. ব্যবস্থাপক সভা আইন, ২. হাইকোর্ট আইন এবং ৩. সিবিল সার্বিস আইন।

ভারতবর্ষীয় সভা এই তিনটি বিষয়েরই সংস্কারকল্পে এতদিন যেসকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু প্রথমোক্ত দুইটি আইনে গৃহীত হয়। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ চিরতরে বিদায় লইলেন। সুপ্রিম কোর্ট ও সদর আদালতগুলিকে একত্র করিয়া তিনটি প্রেসিডেন্সিতেই

একটি করিয়া হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠাকেও তাঁহারা অভিনন্দিত করিলেন। সিবিল সার্বিস আইন সম্পর্কে সভা একেবারেই খুশি হইতে পারেন নাই। তিনটি প্রেসিডেন্সি শহর—কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে লণ্ডনের মত একই সময়ে পরীক্ষাগ্রহণের প্রস্তাব উক্ত আইনে অগ্রাহ্য হয়। পরীক্ষাগ্রহণাদি বিষয়ের বিধি-ব্যবস্থাও ভারতীয়দের প্রতিকূলে যাইবে বলিয়া তাহারা অভিমত প্রকাশ করেন। ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও এইসকল সংস্কার দ্বারা নবযুগের সূচনা সম্ভব হইবে বিশ্বাস করিয়া সভা ১৮৬১, ২ অক্টোবর একটি সাধারণ অধিবেশনে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য করেন: "The sessions of parliament has closed marking a new epoch in the history of Imperial legislation for India. The Indian measures passed during this sessions intimately affect the Judicature, Legislature and the public service of India, the effect of which on the future well-being of the people, time and experience will alone test. Although the committee do not approve of the changes introduced in the constitution of the legislature, they will accept the measures on the whole as important, though small instalments of reform and earnest of a better and enlighted spirit that will henceforward guide the public affairs. The committee need hardly add that these measures have placed in the hands of Lord Canning means of developing the policy of progress which few of his predecessors ever possessed."

আইন-দ্বারা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা পুনর্গঠন, বোম্বাই ও মাদ্রাজে আইন-পরিষদ পুনঃপ্রবর্তন এবং বঙ্গপ্রদেশে নূতন করিয়া আইন সভা স্থাপনের কথা হইল। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। ইতিমধ্যে ১৮৫৯-৬১ এই তিন বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষীয় সভার অপরাপর কার্যকলাপ সম্বন্ধে বলি। শিবপুরে একটি শাখা সভা নূতন স্থাপিত হইল। ভারতবর্ষীয় সভার অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় অযোধ্যায় সরকার কর্তৃক স্থিত হইবার পর ইহার আদর্শে আউধ তালুকদার অ্যাসোসিয়েশন (অযোধ্যা তালুকদার সভা) স্থাপন করেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। ভারতবর্ষীয় সভা তাহার মত কৃতী ও গুণী মানবদরদী সদস্যের মৃত্যুতে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করেন। এই সভায় তাহার নামে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি বৃত্তি স্থাপন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল। বিখ্যাত সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে রাজা রামমোহন রায়ের পর এমন কৃতিত্ব-সম্পন্ন মানুষ আমরা দ্বিতীয়টি আর পাই নাই। এ বৎসরে সভা নূতন সভ্যরূপে পাইলেন শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শম্ভুচন্দ্র সাংবাদিক ও সমাজসেবীরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র শুধুমাত্র আইনবিশারদ ব্যবহারাজীবী ছিলেন না, তিনি শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি -মূলক বিবিধ সমাজ-কল্যাণকর্মেও আজীবন লিপ্ত ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি।

হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর হিন্দু পেট্রিয়টের অস্তিত্ব লোপের আশঙ্কা হইল। এই সময় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যস্থতায় ভারতবর্ষীয় সভার সদস্য কালীপ্রসন্ন সিংহ 'পেট্রিয়টে'র পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন। ইহার পর হইতে হিন্দু পেট্রিয়ট পুরাপুরি ভারতবর্ষীয় সভার মুখপত্ররূপে গণ্য হইল। সভার

সহকারী সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল ক্রমে ইহার সম্পাদনা ও পরিচালনা -ভার গ্রহণ করেন। সিপাহী যুদ্ধের পরে জাতীয় জীবনে যে সংকট উপস্থিত হয়, বিবিধ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষীয় সভা তাহা হইতে ত্রাণ পাইবার উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিতে উদ্যোগী হইলেন। বিবিধ বিষয়ে এ দেশে ও বিদেশে আন্দোলন চালাইতেও তাহারা বিশেষ উদ্যোগী হন। পূর্বের মত সরকারকেও বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় কল্যাণের ভিত্তিতে পরামর্শ দিতে থাকেন। এক কথায়, এই সময়ে যে নবযুগের সূচনার সম্ভাবনা দেখা দিল তাহাতে ভারতবর্ষীয় সভার কৃতিত্ব সমধিক।

সমালোচনাতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ সম্পর্কে আমাদের বোধ যতই বাড়তে থাকবে, সাহিত্য-আলোচনাতেও ততই নিত্য-নতুন দিক খুলে যাবে, এটা স্বাভাবিক। আমাদের সাহিত্য-আলোচনাতে যে নতুন-নতুন জটিলতার উদ্ভব হচ্ছে, তার একটা কারণ এই যে, সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের সচেতনতার মধ্যেই নিত্য-নতুন জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

এইখানেই শেষ নয়। নতুন-নতুন দৃষ্টিকোণ খুলে যাওয়ার ফলে আমাদের সাহিত্য-আলোচনায় বিচিত্র সব জাতি এবং উপজাতিরও সৃষ্টি হচ্ছে। তার কোনোটা ঐতিহাসিক, কোনোটা সমাজতাত্ত্বিক, কোনোটা হয়তো দার্শনিক। আবার কোনোটা হয়তো নৃতত্ত্বভিত্তিক, কোনোটা মনস্তাত্ত্বিক, কোনোটা বিশুদ্ধ ভাষাতত্ত্বকেন্দ্রিক। তাছাড়া, সাহিত্যভিত্তিক নানারকমের আলোচনা তো আছেই।

এইসব নানা জাতের নানান্ গোত্রের তাবৎ আলোচনাকেই আমরা সাধারণত 'সাহিত্যসমালোচনা' নাম দিয়ে থাকি। কিন্তু এদের বহুবিধতার কথা ভাবলে, এদের মেজাজের মৌলিক ভিন্নতার কথা স্মরণ করলে, একটা প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। 'সমালোচনা' নামটা কি সাহিত্য-আলোচনার এই ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্য ও জটিলতার সঙ্গে সত্যিই পাল্লা রাখতে পারছে? তা যদি পারত, তা হলে প্রকৃত সমালোচনা কী তা নিয়ে এত মতভেদ থাকত না, সমালোচনাতত্ত্ব নিয়ে এত পরস্পরবিরোধী মতবাদের সৃষ্টি হত না।

দ্বিমত নেই যে, সাহিত্যের আবেদন নিয়েই সাহিত্যসমালোচনা। কিন্তু 'সাহিত্যের আবেদন' কথাটা শুনতে যত সহজ, ব্যাপারটা ঠিক তত সরল নয়। আমাদের মনে সাহিত্যের এই আবেদন একদিকে যেমন সহজ ও ও অব্যবহিত, অন্যদিকে তা তেমনি জটিল, প্রস্তুতিসাপেক্ষ এবং বহুস্তর-বিন্যস্ত। আমাদের প্রত্যেক অভিজ্ঞতার একটা নিজস্ব জগৎ আছে এ যেমন সত্যি, তেমনি এ-কথাটাও সমান সত্যি যে, আমাদের কোনো অভিজ্ঞতাই নিজেকে শেষ পর্যন্ত নিজের দেওয়াল-ঘেরা জগতের মধ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ রাখতে পারে না। এ কথা সাহিত্য-অভিজ্ঞতার পক্ষেও প্রযোজ্য। বিশুদ্ধ রসাস্বাদনই হয়তো তার অভীষ্ট জগৎ, কিন্তু যেহেতু আমরা খুব মিশ্র ধরণের জীব, সেই হেতু সাহিত্যের সামগ্রিক আবেদন শুধু রসাস্বাদনের মধ্যেই নিজেকে আটকে রাখে না। রসাস্বাদন থেকেই তার যাত্রা শুরু। কিন্তু তার পর ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো আমাদের উপলব্ধির ঘাটে ঘাটে নিজেকে সে প্রসারিত করে দেয়। উপলব্ধির প্রত্যেকটি ঘাট থেকে প্রতিক্রিয়ার নতুন-নতুন তরঙ্গ ফিরে এসে সেই প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করে, তাকে ব্যাপকতর ও সমৃদ্ধতর বোধে পরিণত করে। ক্রমে পাঠকের চিত্তে যে একটি গভীর ও জটিল সামগ্রিক উপলব্ধির প্রতিষ্ঠা হয় তা হয়তো সেই প্রাথমিক অভিজ্ঞতার মতো অমিশ্র নান্দনিক (ইস্থেটিক) ব্যাপার নয়, কিন্তু বিস্তৃতি ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে তা পূর্ণতর।

'অমিশ্র নান্দনিক' কথাটা হয়তো কিছু শীর্ণ ঠেকতে পারে। ইচ্ছা করলে 'রস' কথাটিকে আমরা পূর্ণতর অর্থেও গ্রহণ করতে পারি। অর্থাৎ, আস্বাদনের ইস্থেটিক বিশুদ্ধতা নিয়ে যদি খুঁতখুঁতে না হই,

তা হলে পাঠকের জটিল ও ব্যাপক উপলব্ধিকেই— এই মিশ্রিত কিন্তু ঐশ্বর্যশালী সামগ্রিক চেতনাকেই আমরা রস বা রসাস্বাদন বলে গ্রহণ করতে পারি। মোট কথা, খাঁটি ইস্থেটিক হোক আর না-ই হোক, এ'কে রস বলি আর না-ই বলি, এই বহুস্তরান্বিত জটিল এবং পূর্ণতর উপলব্ধিই সাহিত্যপাঠকের সামগ্রিক প্রাপ্তি।[১]

সাহিত্যসমালোচনা পাঠকের দিকের এই ব্যাপক প্রাপ্তির স্বীকৃতি।

সাহিত্যপাঠকের— পাঠক হিসাবে পাঠকের— প্রাপ্তির যেখানে সীমা, সাহিত্যের সামগ্রিক আবেদনেরও যে সেইখানেই সীমানা তা বলা যায় না। বিশুদ্ধ পাঠক হিসাবে সাহিত্যের কাছে আমরা যা চাই এবং যা পাই, সেইখানেই তার দেওয়া এবং আমাদের পাওয়া থেমে যায় না। সাহিত্য আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে স্পর্শ করে, সেখানেও অনেক নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি করে। অনেক সময় বিশুদ্ধ ব্যবহারিক প্রবর্তনার ফলেও আমরা সাহিত্য-আলোচনাতে প্রবৃত্ত হয়ে থাকি।

সাহিত্যের আবেদন আমাদের মনের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিকে জাগিয়ে তুলে যে-সব সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের আলোচনার জন্ম দেয়, সাধারণ ভাবে তাদের সকলেরই নাম সাহিত্য-আলোচনা। কিন্তু এদের সকলকেই কি সমালোচনা বলা চলে? যেখানে আমরা মূলত ভোক্তা নই, অথবা আদৌ ভোক্তা নই— যেখানে আমরা মূলত ঐতিহাসিক, কি সমাজসেবী, কিংবা তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অথবা বৈজ্ঞানিক, সেখানেও সাহিত্য আমাদের স্পর্শ করে। সেই সম্পূর্ণ অ-সাহিত্যিক মন নিয়ে, অ-সাহিত্যিক বৃত্তির প্রবর্তনায় যখন সাহিত্য-আলোচনায় বসি, তখন সেও কি সাহিত্যসমালোচনা?

সমালোচনা কথাটা বাংলায় খুব পুরোনো নয়। সাধারণত ইংরেজি 'ক্রিটিসিজ্‌ম' কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবেই একে আমরা ব্যবহার করে থাকি। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনে বহুকালের বহু-ব্যবহারের ফলে ক্রিটিসিজ্‌ম কথাটির একটি বিশিষ্ট অর্থ ও ভাবানুষঙ্গ কথাটার গায়ে পাকা হয়ে বসে গেছে। তার মধ্যে বিচার বা মূল্যায়নের ভাবটাই প্রধান। কথাটার ব্যুৎপত্তিতেও বিচারেরই ইঙ্গিত। কিন্তু সাহিত্য-আলোচনার সবটাই তো আর বিচার-জাতীয় নয়। এ ক্ষেত্রে, সব রকম বা যে-কোনো রকম সাহিত্য-আলোচনাকে ক্রিটিসিজ্‌ম অর্থে সমালোচনা বললে, অন্য ক্ষতি না হোক, কাজের ক্ষেত্রে প্রচুর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

সব আলোচনাই যদি সমালোচনা না হয়, তা হলে ঠিক কোন্‌টুকু যে সমালোচনা তা স্থির করে নেওয়া দরকার। কথাটার আদিম প্রয়োগ যা-ই হোক-না কেন, বর্তমানে কথাটাকে যদি কোনো-একটা বিশিষ্ট অর্থেই ব্যবহার করতে হয়, তা হলে বোঝা দরকার কোন্‌ ব্যবহারটা সংগততম। অর্থাৎ কোন্‌টা ক্রিটিসিজ্‌মের বা সমালোচনার আসল কাজ।

১ রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় এই রকম সামগ্রিক প্রাপ্তিকেই রস বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন, "শ্রেষ্ঠ কাব্যে প্রথমে আমাদের কানের এবং কলাবোধের তৃপ্তি, তার পরে আমাদের বুদ্ধির তৃপ্তি ও তার পরে হৃদয়ের তৃপ্তি ঘটলে তবেই আমাদের সমগ্র প্রকৃতির তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যে যে রস তাই আমাদের স্থায়িরূপে প্রগাঢ়রূপে অন্তরকে অধিকার করে। নইলে, হয় রসের ক্ষীণতা ক্ষণিকতা নয় রসের বিকার ঘটে।" —বিকারশঙ্কা, শান্তিনিকেতন, প্রথম খণ্ড।

বলা প্রয়োজন যে, এই উদ্‌ধৃতিটিতে ওই যে 'কলাবোধের তৃপ্তির' কথা আছে, অনেকের মতে মাত্র ওইটুকুই খাঁটি ইস্থেটিক আস্বাদন। আস্বাদন কথাটিকে এ-প্রবন্ধে বিশুদ্ধ ইস্থেটিক আস্বাদন অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে।

অনেকের মতে সমালোচনার আসল কাজ হল সাহিত্য-বিশেষের পরিচয় দেওয়া। আধুনিক কালের প্রবণতা ততটা পরিচয়ের দিকে নয় যতটা ব্যাখ্যার দিকে। কেউ কেউ অবশ্য বিচারেরই পক্ষপাতী। দেখতে হবে, এর মধ্যে কোন্‌টি পাঠকের সাহিত্য-সাক্ষাৎকারের জটিল ও বহুমুখী প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে মিলনের সূত্র রচনা করতে পারে। দেখতে হবে, পাঠকের সাহিত্যিক প্রাপ্তির সমগ্রতা কাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে বিপরীত মুখে এও দেখতে হবে, কোন্‌ প্রতিক্রিয়া সাহিত্যকে সাহিত্য-হিসাবে মোটেই স্পর্শ করছে না।

রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা কথাটাকে কোনো-কোনো সময় ঢিলে-ঢালা অর্থেও ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত কাজের সময় কথাটাকে তিনি বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করারই পক্ষপাতী। তাঁর মনঃপূত সেই বিশিষ্ট অর্থটি কী?

রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যসমালোচনার বিশিষ্ট অর্থ হল সাহিত্যবিচার। এই বিশিষ্টতার উপরে জোর দেবার জন্যেই তিনি সাহিত্যসমালোচনার বদলে সাহিত্যবিচার কথাটাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে। বিচার মানে কিন্তু শুধুই বিচার নয়, কেবল রায় দেওয়াই নয়। ক্ষেত্র-বিশেষে আদৌ রায় দেওয়া নয়। এ বিচার আসলে, এক কথায় বলা যায়—সামগ্রিক সাহিত্য-সচেতনতা। এই সচেতনতা এমন একটা সাধারণ-ভূমি, যাকে স্পর্শ করার ফলে সাহিত্য-আবেদনসঞ্জাত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এই কথাটাই একটু বিশেষভাবে বুঝে দেখা দরকার।

২

'সাহিত্য-বিচার'[২] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসমালোচনা কথাটির বদলে সাহিত্যবিচার কথাটি ব্যবহারের প্রস্তাব করে সঙ্গে সঙ্গেই মন্তব্য করেছেন, "বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্যবিচারের লক্ষ্য।" আবার প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি এও বলেছেন যে, "সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ নয়।"

এ থেকে সহজেই মনে হতে পারে যে, পরিচয়, ব্যাখ্যা ও বিচার, এরা বুঝি একই ক্রিয়ার তিনটি ভিন্ন নাম। আর বিশ্লেষণটা বুঝি একেবারে আলাদা জাতের। বিশ্লেষণের কথা আপাতত থাক, কিন্তু সত্যিই কি ব্যাখ্যা, পরিচয় আর বিচার সম্পূর্ণ অভিন্ন?

কথাগুলির সাধারণ ব্যবহার কিন্তু মোটেই অভিন্নতার সূচক নয়। শুধু লোক-ব্যবহারই বা কেন, সাহিত্যসমালোচনাতেও এদের প্রয়োগ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে। সাহিত্য-আলোচনায় ব্যাখ্যা, পরিচয়, বিচার তিনেরই যথাযোগ্য স্থান আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু একথাও ঠিক যে এই তিনের মূলগত প্রবর্তনা সম্পূর্ণ পৃথক। এই পার্থক্যের সূত্রেই আমরা পরিচয়মূলক, ব্যাখ্যামূলক আর বিচারমূলক—এই তিনটি ভিন্ন জাতের সমালোচনার সাক্ষাৎ পাই, তিনটি পরস্পর-বিরোধী সমালোচনাতত্ত্বের তিন রকম দাবির সঙ্গে পরিচিত হই।

২ সাহিত্যের পথে, গ্রন্থপরিচয়।

পরিচয়ই একমাত্র সমালোচনা, এই হল পরিচয়মূলক সমালোচনাতত্ত্বের বক্তব্য। সমালোচনার কাজ পাঠককে সমালোচ্য বিষয়ের যথাসম্ভব সাক্ষাৎ পরিচয় দেওয়া, এবং পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে মূলের আস্বাদ দেওয়া। বিষয়ের পরিচয় কথাটা অবশ্য খুব স্পষ্ট নয়। কারণ 'বিষয়' বলতে অনেক-কিছুই বোঝায়। রচনার স্থূল বস্তুগত অবলম্বনকেও (যাকে বলা হয়, সাব্‌জেক্ট-ম্যাটার) বিষয় বলা যায়, আবার রচিত শিল্প-বিগ্রহ (কন্টেন্ট্), তাকেও বিষয় বলতে বাধা নেই। রূপ, সে-ও বিষয়ের বহির্গত নয়। যাকে রস বলি, তা-ও বিষয়-আশ্রিত। পরিচয়মূলক সমালোচনা কিসের পরিচয় দেয় ?

শিল্পবস্তু মাত্রেই তো অদ্বিতীয়। তার রূপ অনন্য, তার কন্টেন্ট্— সে-ও অনন্য। তার রস বিকল্প-রহিত। এদের কোনো দ্বিতীয় পরিচয় সম্ভব নয়। এবং তা যেহেতু সম্ভব নয়, সেই হেতু পরিচয়মূলক সমালোচনাকে তার দাবি শুরুতেই অনেকখানি খাটো করে নিয়ে আসতে হয়। রচনা-বিশেষের— তা সে কবিতা নাটক উপন্যাস যা-ই হোক না কেন, তার— অনন্য শিল্প-রূপটির সাক্ষাৎপরিচয় যেখানে সাধ্যাতীত, অথচ পরিচয়ই যেখানে একমাত্র উপজীব্য, সেখানে করণীয় কী ? বলা বাহুল্য, যে পরিচয়টুকু দেওয়া সাধ্যায়ত্ত, অগত্যা সেইটুকুই দেওয়া। তা যদি ভগ্নাংশ মাত্র হয়, তা যদি নিতান্তই বহিরঙ্গের পরিচয় হয়, উপায় নেই।

বিভিন্ন গোত্রের পরিচয়মূলক সমালোচনা সাহিত্যের বিভিন্ন বহিরঙ্গের অথবা বিভিন্ন ভগ্নাংশের এক-একটিকে বেছে নিয়েছে। তার একটা হল, স্থূল অর্থে যাকে সাব্‌জেক্ট-ম্যাটার বা বিষয়বস্তু বলা হয়, যেমন কাহিনী বা ঘটনাংশ বা শুষ্ক ভাব-বস্তু— এরই একটা বাহ্য বর্ণনা দিয়ে দেওয়া, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় প্যারাফ্রেজ-মূলক সমালোচনা। দ্বিতীয় এক পথ হচ্ছে, সমালোচ্য বিষয়ের আঙ্গিক বা টেক্‌নিকগত পরিচয় দেওয়া। অপর এক পথ হল, রচনাটির জাতি-কুলগত পরিচয় দেওয়া অথবা শ্রেণীগত পরিচয় দেওয়া : রচনাটি কতটা ভারতীয় অথবা কতটা ইউরোপীয় তার সন্ধান দেওয়া। কিংবা, কী পরিমাণ ট্র্যাজেডি, কতখানি লিরিক, খাঁটি সনেট-রীতি কতটা রক্ষিত হয়েছে ইত্যাদির পরিচয়।

আরও অনেক পথ আছে। রচনাটি যখন বিশেষ দেশের বিশেষ কালের সাহিত্য-ইতিহাসের কোনো-একটি ধারার কোনো-এক নির্দিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠিত, তখন সাহিত্য-ঐতিহ্যের দিক থেকে তার একটা অধিষ্ঠানগত পরিচয় নিশ্চয়ই হতে পারে। অথবা, অন্যতর ঐতিহাসিক পরিচয়ও সম্ভব। শুধু সাহিত্যধারার নয়, রচনাটি যেহেতু সমগ্র ইতিহাসেরই অঙ্গ, একটি ঐতিহাসিক ঘটনা— বহুবিধ সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক তরঙ্গাভিঘাতের অন্যতম ফল, সেই হেতু উক্ত তরঙ্গগুলির বলক্রিয়ার পরিচয়ের মধ্যে রচনাটির কিছু পরিচয় অবশ্যই মিলবে।

আরও আছে। রচনার জন্মগত, অথবা বলা উচিত, রচনার জন্মদাতাগত পরিচয়। আসলে রচনার নয়, রচয়িতার পরিচয়— তাঁর অন্তর্জীবনের পরিচয়। (এ-ও এক রকমের ঐতিহাসিক পরিচয়ই বটে।) মুখ্যত লেখকের প্রেরণার পরিচয়, প্রেরণার পটভূমির পরিচয়, কোনো প্রেরণাদাত্রীর খোঁজ মিললে তাঁর পরিচয়, শিল্পীমানসের চেতন ও অবচেতন উৎকণ্ঠার পরিচয়। অথবা, যে রহস্যময় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিল্পীর আবেগ একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপের মধ্যে স্বস্তি খুঁজে পেল, তথ্যগত কার্য-কারণের প্রমাণ দিয়ে সেই রহস্যের সমাধান।

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, আঙ্গিকগত পরিচয়, কিংবা এই সব নানান্ জাতের 'ঐতিহাসিক'

পরিচয়, এরা অংশত ব্যাখ্যাও বটে। এদের সকলের মধ্যেই এক-ধরণের সন্ধানীবৃত্তি ক্রিয়াশীল। এই সন্ধানীবৃত্তি বিজ্ঞানবুদ্ধিরই সগোত্র।

সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জাতের পরিচয়ের কথাও এখানে বলা দরকার। এমন এক পরিচয়, যার পিছনকার তাগিদটা মোটেই বিজ্ঞানবুদ্ধির নয়, পুরোপুরিই শিল্পপ্রেরণার। এমন শিল্পপ্রেরণা যেখানে মূল সাহিত্য-সাক্ষাৎকারটা স্বদূর একটা উপলক্ষ মাত্র। সচরাচর যাকে সৃজনধর্মী বা ক্রিয়েটিভ সমালোচনা বলা হয়, এ হল সেই জাতের জিনিস। কোনো কোনো শিল্পী-সমালোচক এবং অনেক শিল্পী-মন্য সমালোচক এই কাজই করে থাকেন। ব্যাপারটা হল, খানিকটা মূল রচনাকে অবলম্বন করে, অথবা তাকে উপলক্ষ করে', সমালোচকের নিজস্ব সৃষ্টি ক্ষমতার দ্বারা মূলের অনুরূপ (অনেক সময় মোটেই মূলের অনুরূপ নয়) একটি রসের সৃষ্টি করা।[৩]

এর খুব কাছাকাছি আরও এক জাতের সৃজনধর্মী পরিচয় আছে। মূল রচনা বা রচয়িতার পরিচয় নয়, সমালোচকের নিজেরই পরিচয়।

অধিকাংশ পরিচয়ের মধ্যেই যেমন ব্যাখ্যা মিশে থাকে, অধিকাংশ ব্যাখ্যাতেই তেমনি এক ধরণের পরোক্ষ পরিচয় ঘটা স্বাভাবিক। তবু পরিচয় আর ব্যাখ্যা মোটেই এক বস্তু নয়। এদের পরিধিতে কিছুটা সাধারণ-ভূমি আছে, কিন্তু বেশিটাই পরস্পর-বহির্ভূত। আসলে এদের স্বভাব আলাদা, পিছনকার তাগিদও আলাদা।

রচনা-বিশেষ যখন পাঠকের কাছে কোনো-না-কোনো দিক থেকে সমস্যার আকার নিয়ে দেখা দেয়— সে-সমস্যা অংশেরই হোক আর সমগ্রেরই হোক— মাত্র তখনই ব্যাখ্যার কথা আসতে পারে। সমস্যা না থাকলে, সমস্যা পূরণের প্রশ্নই ওঠে না। এমন স্বচ্ছ রচনা আশা করি অসম্ভব নয়, যেখানে ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অবান্তর। কিন্তু তার কি সমালোচনাও সম্ভব নয়?[৪]

শিল্পবস্তুর অনন্য সত্তাটির যেমন দ্বিতীয় কোনো পরিচয় নেই, তেমনি তার কোনো ব্যাখ্যাও সম্ভব নয়। তা ব্যাখ্যার ব্যাপারই নয়। বিশুদ্ধ শিল্পসত্তায় সে স্বপ্রকাশ। সমস্যা তাকে নিয়ে নয়, সমস্যা আসলে পাঠকের বোধকে নিয়ে। সাহিত্য-বোধ এবং সাহিত্য-অভিজ্ঞতার ব্যাপারে সব পাঠক সমস্তরের নয়, সমস্যা এইখানে। এ সমস্যা শিল্পের নিজস্ব সমস্যা নয়। এ সমস্যা অনেকটা শিক্ষা-সমস্যার সমগোত্রীয়।

পরিচয়ের মতো ব্যাখ্যাও অনেক জাতের। যেমন, রচনার ভাব-সম্পদের ব্যাখ্যা; সামগ্রিক ভাবে দার্শনিক ব্যাখ্যা; লেখকের জীবন-দর্শনের ব্যাখ্যা। অথবা, সাহিত্য-ইতিহাসের আলোতে ব্যাখ্যা। কিংবা টেক্‌নিকের বিশ্লেষণ: রচনার উপাদান-উপকরণ ঘটিত ব্যবহারিক সমস্যার প্রকৃতি-নিরূপণ। ভাষা-

৩ বিখ্যাত সমালোচক J. E. Spingarn, যিনি একদিকে ক্রোচের ভাবশিষ্য, অন্যদিকে 'New Critic'দের অন্যতম মন্ত্র-দাতা (যোগাযোগটা লক্ষণীয়), তাঁর একটি উক্তি এখানে তুলে দিচ্ছি : "As for me, I re-dream the poets' dream . . . I at least strive to replace one work of art by another, and art can only find its *alter ego* in art."

৪ আধুনিক ব্যাখ্যাপন্থীরা বিশ্বাস করেন যে, এরকম রচনা সত্যিই সম্ভব নয়। অথবা তাঁরা মনে করেন যে, ব্যাখ্যা যেখানে অবান্তর তেমন রচনা শিল্পবস্তুই নয়।

বিশ্লেষণের সাহায্যে বিচিত্র ধ্বনিপুঞ্জ এবং চিত্রসম্ভারের অন্তর্নিহিত ছন্দ বা প্যাটার্ন আবিষ্কার। অন্যথায়, রচনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তাদের পারস্পরিক সংস্থানের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

ব্যাখ্যার ক্ষেত্র প্রায় ইচ্ছামতই বাড়ানো চলে। প্রতীক ও রূপকল্পের তাৎপর্য ব্যাখ্যা। দুরান্বিত উপমা, সুদূরপ্রসারী উল্লেখ, গূঢ় ইঙ্গিত, প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ইত্যাদির রহস্য-উদ্‌ঘাটন। অথবা, শব্দার্থতত্ত্বের সাহায্যে সহজের মধ্যে কঠিনের, পরিচিতের আড়ালে অপরিচয়ের দ্যোতনা আবিষ্কার। মিথলজির সাহায্যে, নৃতত্ত্বের আলো ফেলে, সাহিত্যের মধ্যে বিশিষ্ট জাতি-স্বভাবের প্যাটার্ন আবিষ্কার। রূপক ও সংকেতের ব্যাখ্যা, তাদের সাহায্যে রচয়িতার ভাবনা ও বেদনার ছন্দকে আয়ত্ত করার চেষ্টা। কিংবা, রচয়িতার অবদমিত বাসনার সন্ধান নিয়ে তারই সূত্র ধরে রচনার মর্মোদ্‌ঘাটন। অথবা, যাকে বলে— সামাজিক ব্যাখ্যা। পরিচয়মূলক সমালোচনার প্রসঙ্গে এদের অনেকের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বিচার প্রসঙ্গে প্রথমেই যে কথা বলা দরকার তা হল এই যে, সাহিত্যে বিচার বলতে যা বোঝায়, প্রচলিত বিচারমূলক সমালোচনার বিচার থেকে তা অনেক ব্যাপক, গভীর ও সংবেদনশীল বস্তু। রচনাটি ভালো কি মন্দ সরাসরি এই রায় দেওয়াটাই বিচার নয়। কতখানি ভালো তার পরিমাপ করা বা কেন ভালো তার হেতু-নির্ণয় করা, এ-ও বিচারের একটি ধাপ মাত্র— তার শেষ কথা নয়। প্রচলিত বিচারমূলক সমালোচনা কিন্তু অনেক সংকীর্ণ এবং অনেক যান্ত্রিক ব্যাপার। সেখানে রায় দেওয়াটাই আসল কথা। তার ভালোত্বের পরিমাপ ও হেতু-নির্ণয় অবরোহ-পদ্ধতির, তার মানদণ্ড পূর্ব-স্বীকৃত সাহিত্যিক অনুশাসন। কোথাও সে-বিচার নব্য-ক্লাসিক অনুশাসনের বিচার। কোথাও সে-বিচার সংকীর্ণ সামাজিক স্বার্থের বিচার। আবার কোথাও সে-বিচার নিতান্তই ব্যক্তিগত রুচির মানদণ্ডে বিচার। অর্থাৎ এমন সাব্‌জেক্‌টিভ মানদণ্ডে, যাকে কোনো মানদণ্ডই বলা চলে না, অতএব যে-বিচার আদপেই বিচার নয়।

ব্যাখ্যা ও পরিচয় দুয়ের মধ্যেই কিছুটা সন্ধানীবৃত্তির ক্রিয়া আছে, এইটুকুই তাদের সাধারণ-ভূমি। এটুকুর কথা বাদ দিলে, পরিচয়ের মেজাজে রয়েছে পুনর্গঠনের ঝোঁক, অনুসরণ বা অনুগমনের আকাঙ্ক্ষা। ক্বচিৎ পূজার আবেগ। কখনো স্বগত সৃষ্টিপ্রেরণা। কখনো বা নির্ভেজাল আত্মরতির বাসনা। ব্যাখ্যার মেজাজটা ভিন্ন রকমের। ব্যাখ্যা কখনো কখনো পরিচয়েরই ভূমিকা বটে, কিন্তু তা ছাড়াও ব্যাখ্যার বড়ো একটা তাগিদ হল সমস্যাপূরণের পরিতৃপ্তি। আর একটা তাগিদ হল শিক্ষার তাগিদ, জ্ঞানদানের আকাঙ্ক্ষা। লক্ষণীয় যে, হাল-আমলের ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা অধিকাংশক্ষেত্রেই দুর্ধর্ষ পণ্ডিতিজাতের সমালোচনা।

বিচার, পরিচয় ও ব্যাখ্যার চরিত্রগত পার্থক্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে যদি আমরা স্মরণ করি যে, এই তিন জাতীয় সমালোচনায় তিনটি স্বতন্ত্র যুগধর্মের প্রকাশ ঘটেছে। অল্পস্বল্প ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, প্রাচীন ইউরোপীয় সমালোচনা প্রধানত বিচারমূলক এবং উনবিংশ শতকের সমালোচনা প্রধানত পরিচয়-মূলক। চরমপন্থী ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা বিশেষভাবে বিংশ শতাব্দীরই সম্পত্তি।

এইবারে মূল প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথ এই তিনের মধ্যে একাত্মতা আবিষ্কার করলেন কি উপায়ে? একাত্মতার কথা যদি ছেড়েও দিই, এদের মধ্যে মোটামুটি একটা যোগসূত্রই বা তিনি কি করে স্থাপন করলেন? অথবা, তিনি কি তত্ত্বের ক্ষেত্রেই মাত্র এদের যোগাযোগের কথা বলেছেন, না কার্যক্ষেত্রেও অর্থাৎ নিজের সমালোচনা সাহিত্যেও, এই যোগাযোগ সংসাধিত করতে পেরেছেন? এই তথ্যগত প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানই বর্তমান আলোচনার দিক থেকে আপাতত আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব।

এর উত্তর রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সমালোচনাসাহিত্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তাই, যতই সংক্ষেপে হোক, তার সবটাই আমাদের এক-নজরে একটু দেখে নেওয়া দরকার।

৩

একথা সকলেরই সুবিদিত যে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যে ব্যাখ্যা পরিচয়, এই তিনেরই সাক্ষাৎ মেলে। তিনি যে এদের মেজাজগত পার্থক্য সম্পর্কে একেবারেই অবহিত ছিলেন না, এমন মনে করার কারণ নেই। আসলে, এই পার্থক্যকে তিনি মোটেই আমল দেন নি। এমন একটা ব্যাপকতর ও গভীরতর কিছুকে তিনি অবলম্বন করতে পেরেছিলেন যে, এই সব পার্থক্য তাঁর ক্ষেত্রে তেমন করে মাথা তুলতেই পারে নি। একই প্রবন্ধে এই তিন ধারার ত্রিবেণীসংগম, এইটেই তাঁর সমালোচনাতে সব থেকে বেশি দেখতে পাওয়া যাবে।

এর মধ্যেও একটা আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রশ্ন অবশ্য থেকে যেতে পারে। তার কারণ, বাইরে থেকে দেখলে মনে হতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় ব্যাখ্যারই গুরুত্ব সব থেকে বেশি। দ্বিতীয় স্থান পরিচয়ের। বিচার যেন অনেকটাই গৌণ। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই সে ভুল ভাঙবে। দেখা যাবে, বিচার যেখানে সম্পূর্ণ নেপথ্যচারী, সেখানেও তা মোটেই গৌণ নয়।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যকে আমাদের কাজের সুবিধার দিক থেকে আমরা তিনটে কাল-পর্বে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথম পর্বে তাঁর বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবনের রচনা, মোটামুটি ১৮৭৬ থেকে ১৮৯২ খ্রী। দ্বিতীয় পর্ব তাঁর পরিণত যৌবনকাল, প্রৌঢ়ত্বেরও কিছুদুর, ১৮৯৩ থেকে ১৯০৭ খ্রী ; সাধনা-বঙ্গদর্শন পর্ব। এটাই তাঁর সমালোচনাসাহিত্যের ভরা ফসলের কাল। তৃতীয় পর্ব তাঁর পরিণত বয়েসের রচনা নিয়ে।

ইতিহাসের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ হলেও, বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথম পর্বের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম।

পুরোপুরি সাহিত্যসমালোচনা বলে গণ্য হতে পারে এমন রচনার সংখ্যা এ পর্বে নিতান্তই যৎসামান্য। তার সবগুলিকেই মোটামুটি বিচারমূলক বলা যায়। তবে প্রথম রচনা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' ইত্যাদিতে অথবা মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা দুটিতে বিচার যে-রকম স্পষ্টোচ্চারিত, অপরগুলিতে— অর্থাৎ 'ডি প্রোফণ্ডিস' 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' 'বসন্ত রায়'— ঠিক তা নয়। এবং এদের মধ্যে ব্যাখ্যা ও পরিচয়ের গুরুত্বও কিছু কম নয়। কাব্যসংকলন-গ্রন্থের সমালোচনাকে যদি সাহিত্যসমালোচনা বলে ধরা যায় তা হলে 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ'[৫] প্রবন্ধটির কথাও উল্লেখ করা যায়। এর মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে সযত্ন পাঠব্যাখ্যা, অন্যদিকে তেমনি কাব্যসংকলনের আদর্শ সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ বিচারও স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বটি কিছু জটিল। এ পর্বের অধিকাংশ রচনাই 'আধুনিক সাহিত্য' 'লোকসাহিত্য' ও 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থ তিনটিতে স্থান পেয়েছে। প্রথম দুটি বইয়ের অধিকাংশ রচনাই এ-পর্বের আগের দিকের এবং একটি বাদে ('মেঘদূত') 'প্রাচীন সাহিত্যে'র সমস্ত রচনাই এ পর্বের শেষের দিকের। বিচার প্রথম

৫ ভারতী : ১২৮৮ শ্রাবণ।

দিকের রচনায় যেমন অকুণ্ঠ, শেষের দিকে ঠিক তা নয়। সেখানে পূজার আবেগই যেন মুখ্য। সেদিক থেকে গোটা পর্বটিকে মোটামুটি দুটো আলাদা পর্যায়ে ভাগ করে দেওয়া যায়। কাজের সুবিধার জন্যে শেষের পর্যায়ের রচনা নিয়েই আমরা প্রথমে আলোচনা করব।

'প্রাচীন সাহিত্য' বইটির প্রসঙ্গে একটা কথা আগেই বলে রাখা দরকার। এর কোনো কোনো প্রবন্ধ আদৌ সমালোচনা হিসাবে রচিত নয়, তারা গ্রন্থবিশেষের ভূমিকা বা চিত্রবিশেষের পরিচয়পত্র হিসাবে রচিত হয়েছে। যেমন, 'রামায়ণ' এবং 'কাদম্বরীচিত্র'।

'প্রাচীন সাহিত্যে'র সমস্ত প্রবন্ধই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের—ও সংস্কৃতির—আলোচনা। প্রধানত তাদেরই নিয়ে, কালের বিচারে যাদের উৎকর্ষ সুপ্রমাণিত। রবীন্দ্রনাথ এখানে নতুন করে রায় দিতে বসেন নি, পরোক্ষভাবে কালের রায়কেই তিনি সমর্থন করেছেন। ব্যাখ্যার আকারে আপন সমর্থনের হেতুটাকে সামনে তুলে ধরেছেন, রায়টাকে নয়। এদের মধ্যে মূল্যায়নের ভূমিকা যে কোন্‌খানে তা যেন নজরেই পড়ে না। ব্যাখ্যা আর পরিচয়কেই বেশি করে নজরে পড়ে।

যেটা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষ করবার তা হল এই যে, 'প্রাচীন সাহিত্য' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসন্ধানই শুধু নয়, নবীন ভারতের জন্যে পথের সন্ধানেও যে একদা তিনি অতীতের ভারতবর্ষে পদযাত্রা করেছিলেন, এর মধ্যে তার চিহ্নও সুস্পষ্ট। অতীতের ভারত এখানে তাঁর সমালোচ্য বিষয় নয়, প্রেরণার উৎস। এর প্রবন্ধগুলি প্রধানত প্রশস্তিমূলক। তার সবটাই সাহিত্যিক কৃতিত্বের প্রশস্তি নয়, অনেকখানি সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের প্রশস্তি। সেই ভাবাদর্শের কিছুটা সাহিত্যকে পরোক্ষভাবে স্পর্শ করে, কিছুটা তাও করে না। এই-সব কারণে, 'প্রাচীন সাহিত্য'কে ষোলো-আনা সাহিত্যসমালোচনা-গ্রন্থ বলে গ্রহণ করা যায় না।

সাহিত্যিক প্রশস্তিও অবশ্য এর মধ্যে প্রচুর আছে। কিন্তু সে প্রশস্তি কোনোখানেই নিষ্কারণ নয়। সকারণ প্রশস্তিকে যদি বিচার বলতে আপত্তি না থাকে তা হলে 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রায় সর্বত্র ব্যাখ্যা ও পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিচারেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। 'শকুন্তলা' কিংবা 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'র কথাই ধরা যাক। এখানে যে ব্যাখ্যা তা কি সুস্পষ্ট মূল্যবোধের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে না? অথবা, 'কাব্যের উপেক্ষিতা'— একে সমালোচনা বলি আর না-ই বলি, একথা মানতেই হবে যে, এর মূল বক্তব্যটি গূঢ় বিচারের ভিত্তির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। এবং সে বিচার যেমন সশ্রদ্ধ তেমনি সূক্ষ্মদর্শী, যেমন বিনীত তেমনি লক্ষ্যভেদী। যদি 'কাদম্বরীচিত্রে'র কথা ধরি, তাহলেও এই একই কথা। বর্ণনার প্রতি সংস্কৃত সাহিত্যের অতি-পক্ষপাত; 'মনুষ্য ও সংসারের প্রতি সেকালের সেই অপেক্ষাকৃত ঔদাসীন্য'; 'কিরীটে কুণ্ডলে কঙ্কণে কণ্ঠমালায়' রাজার মতো সজ্জিত কিন্তু 'মেদস্ফীত বিলাসীর' মতো অচল সংস্কৃত গদ্যের হাতে গল্পের দুর্গতি— এই-সব প্রাসঙ্গিক মন্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, 'পূজার আবেগ' রবীন্দ্রনাথের সতর্ক সাহিত্য-বিবেককে কখনোই ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারে নি। যে পূজা প্রাপ্য তা তিনি অকুণ্ঠচিত্তে দিয়েছেন। কিন্তু যে পূজা প্রাপ্য নয় তা তিনি, বাণভট্ট কেন, কালিদাসকেও দেন নি। সময়-বিশেষে বৃদ্ধ বাল্মীকিকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি, যদিও— গ্যেটে যেমন বলেছিলেন— 'with bended knees'।

'মেঘদূত' প্রবন্ধটি অবশ্য ভিন্ন জাতের। বাইরের দিকে তা কালিদাসের কাব্যের ভাবব্যাখ্যা। ভিতরে তাকালে দেখা যাবে, কালিদাস উপলক্ষ, স্বগত রসসৃষ্টিই আসল লক্ষ্য। এই একটি প্রবন্ধই সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম

স্থানীয়। এর সঙ্গে সুরের মিল 'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতায়। এ যেন তারই কাব্য-রূপ। এর রচনাকালও 'সোনার তরী'-পর্বে, 'মেঘদূত' কবিতা রচনার এক বছর পরে— ১২৯৮ সালে।

এইবারে প্রথম পর্যায়ের রচনা। অর্থাৎ 'লোকসাহিত্য' এবং 'আধুনিক সাহিত্য'।

'লোকসাহিত্যে'র তিনটি প্রবন্ধই পরিচয়-প্রধান। তবে ব্যাখ্যাও আছে। বিচার তো আছেই (পুনর্বিচার বলাই বোধকরি সংগত)। 'আধুনিক সাহিত্যে'র বিষয়বস্তুই এমন যে তার মধ্যে ব্যাখ্যার অবকাশ কম। এরও অধিকাংশ প্রবন্ধই পরিচয়-প্রধান। কিন্তু শুধু যে বিষয়-নির্বাচনেই বিচার পরোক্ষভাবে ক্রিয়া করেছে তা নয়, পরিচয়ের ভূমিকার মধ্যেই বিচারের ক্রিয়া অনুপ্রবিষ্ট।

'আধুনিক সাহিত্যে' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পাঁচটি: একদিকে 'বঙ্কিমচন্দ্র' 'বিহারীলাল' ও 'সঞ্জীবচন্দ্র', অন্যদিকে 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং 'রাজসিংহ'। প্রথমোক্ত তিনটি প্রবন্ধই বাহ্যত লেখক-পরিচিতি। সুতরাং, বলা বাহুল্য, তিনটিই পরিচয়-প্রধান। কিন্তু মূল্যায়ন তিনটিতেই ক্রিয়াশীল। তার মধ্যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি যেহেতু পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না, ব্যাখ্যাও যেহেতু এক্ষেত্রে অনাবশ্যক, সেই হেতু রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিক মূল্যায়নের উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে কিছু ভাবব্যাখ্যা এবং কিছু টেকনিকগত আলোচনাও স্থান পেয়েছে।

টেকনিকগত কিংবা গঠনগত আলোচনা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যে খুব বেশি নেই। সেই জন্যে এই প্রসঙ্গে 'ফুলজানি' ও 'যুগান্তর' এ দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা দরকার। উক্ত প্রবন্ধ দুটিতে, আলোচিত উপন্যাস দুটির গঠনগত ত্রুটি সম্পর্কে, তাদের উভয়েরই এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের সামঞ্জস্যের অভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন তার মধ্যে মূল্যের নির্দেশ অনতিপ্রচ্ছন্ন। প্রসঙ্গত 'কঙ্কাবতী'র[৬] কথাও স্মরণ করা যায়। 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসখানির প্রথম অংশের সঙ্গে পরবর্তী অংশের সংগতি-অসংগতির প্রশ্ন নিয়ে, তার বাস্তব-অংশের সঙ্গে পরবর্তী রূপকথা-অংশের জোড়-মেলানো নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিপুণ বিচার-বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যবিচার মোটেই বিশ্লেষণ নয়, শুধুই ব্যাখ্যা— রবীন্দ্রনাথের নিজের সমালোচনাসাহিত্যে কিন্তু তাঁর এই ধরনের উক্তির খুব জোরালো সমর্থন আমরা খুঁজে পাব না। বরং কিছু প্রতিবাদই নজরে পড়বে। তার কারণ, বিশ্লেষণ ও বিচার অচ্ছেদ্য। অবশ্য শুধু বিশ্লেষণ নয়, সংশ্লেষণও।

বিচার-বিশ্লেষণ 'কৃষ্ণচরিত্রে' যেমন প্রখর এমন বোধকরি আর কোনো প্রবন্ধেই নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে যুগপৎ এমন মুগ্ধ উদ্‌বেজিত ও বিচলিত করেছিল, এর বিষয়বস্তুর মহত্ত্ব এবং তার উপস্থাপনার দুঃসাহসিকতা রবীন্দ্রনাথের বোধ বুদ্ধি ও বিবেককে এমন এক সানন্দ দ্বৈরথে আহ্বান করেছিল যে, সমস্ত গৌণ বিবেচনাকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ এখানে গোড়া থেকেই সমালোচকের মুখ্যতম দায়িত্বটি বেছে নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমালোচ্য বিষয়টি বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়, রবীন্দ্রনাথের এ সমালোচনা ও সাহিত্যসমালোচনা নয়। কিন্তু মূল্যায়ন যে কত সংবেদনশীল হতে পারে এবং অপর পক্ষে, শ্রদ্ধা যে কত নির্মোহ হতে পারে, তা এই প্রবন্ধটি এবং এর সঙ্গে 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি মিলিয়ে পড়লেই আমরা বুঝতে পারব। তাঁর সাহিত্যসমালোচনাতেও আমরা সব সময় এই

৬ সাধনা, ১২৯৯ ফাল্গুন; 'এটি 'আধুনিক সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত নয়।

শ্রদ্ধা ও সংবেদনশীলতার পরিচয় পাই। উপরন্তু সমবৃত্তিকের সৌজন্য ও বিনয়, এবং কাউকে আহত না-করবার জন্য সতত-সচেষ্টতা সেখানে বিচারের কাঠিন্যের চারপাশে একটি পুরু ভেলভেটের আস্তরণ রচনা করে রেখেছে।

'রাজসিংহ' প্রবন্ধটি অনেক দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। এর ব্যাখ্যাংশের মধ্যে রূপ ও সত্যের, অথবা বলি, ফর্ম ও কণ্টেণ্টের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর যে আলোকপাতের প্রয়াস দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যে তা দুর্লভ বস্তু। এই সূত্রে, শিল্পরূপের উপর আঙ্গিকের প্রভাব, অথবা উল্টো করে বললেই বোধকরি ঠিক বলা হয়, শিল্পরূপের প্রয়োজনে আঙ্গিকের নির্বাচন— এই রহস্যের উপরেও হয়তো কিছুটা আলো এসে পড়েছে। উপন্যাসখানির শ্রেণীগত পরিচয়কেও রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করেন নি (যদিও সাধারণত তিনি শ্রেণীগত পরিচয়ে মোটেই আস্থাশীল নন)। রসবিচারের ক্ষেত্রে এর 'ঐতিহাসিক রস-এর দিকটাতেই তিনি বেশি জোর দিয়েছেন বলা যায়। লেখকের মনস্তত্ত্বের দিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি। এমন কি, পাঠকের মনস্তত্ত্বও বাদ যায় নি।

'কৃষ্ণচরিত্র' যদি প্রীতিপূর্ণ দ্বৈরথ হয়, 'রাজসিংহ' তা হলে আনন্দিত অভ্যর্থনা, পুলকিত করমর্দন। উভয়ত্রই মূল্যবোধ সক্রিয়। 'রাজসিংহ' প্রবন্ধটিতে পরিচয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ তত্ত্বালোচনা— সমস্তই একটি ব্যাপক ও গভীর প্রাপ্তি-চেতনার মধ্যে সাঙ্গীকৃত। সমালোচনাতত্ত্বের দিক থেকে এই প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্রনাথের 'সমন্বিত সমালোচনা'র একটি বিশিষ্ট নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

সমন্বয়ের ভিত্তির কথা পরে আসবে, কিন্তু সমন্বয়ের আদর্শই যে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার তত্ত্বগত আদর্শ, এর পরে তাতে বোধ করি আর সন্দেহ করা যায় না।[৭]

৪

আমাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসার উত্তরের জন্য আর বেশি দূর অগ্রসর না হলেও বোধকরি চলতে পারে। তবু, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যের তৃতীয় পর্বটিকে যদি বাদ দিই, তা হলে আমাদের অনুসন্ধান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সমালোচক রবীন্দ্রনাথের পরিণত সাহিত্যচিন্তার চেহারাটা যে বরং এইখানেই স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যাবে এমন আশা করাটা অন্যায় নয়।

অথচ তাঁর সমালোচনাসাহিত্যে এ পর্বটা যেন নিতান্তই একটা পরিশিষ্ট। বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁর সমালোচক-জীবন সাধনা-বঙ্গদর্শন-পর্বের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়েছে। সমালোচনা-প্রবন্ধ বলতে যা বোঝায়— সমালোচনা যেখানে মাত্র প্রসঙ্গসূত্রে আগন্তুক নয়, সমালোচনাই যেখানে মূল লক্ষ্য— সেই রকম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যসমালোচনার প্রবন্ধ বোধকরি রবীন্দ্রনাথ এ-পর্বে একটিও রচনা করেন নি।

তা না করলেও, নানাবিধ প্রসঙ্গসূত্রে— বিশেষ করে সাহিত্যতত্ত্বের প্রসঙ্গে—অনেক সময়েই তাঁকে এমন-সব আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছে যাকে খাঁটি সাহিত্যসমালোচনা বলে গণ্য না করার হেতু নেই।

---

৭ বিশ্লেষণের বিপরীতধর্মী—এই অর্থে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাকে কেউ কেউ সংশ্লেষণাত্মক বা 'সিন্‌থেটিক্যাল' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ দুই-ই আছে। প্রকৃত পক্ষে, যা আদৌ বিশ্লিষ্ট নয়, তার সংশ্লেষণের প্রশ্নই ওঠে না। তবে, বিভিন্ন ধরণের সমালোচনা-আদর্শের সমন্বয় ঘটেছে—এই অর্থে যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাকে সংশ্লেষণাত্মক আখ্যা দেন, তাতে আপত্তি করার কিছু নেই।

আলাদা করে তারা যতই স্বল্পায়তন বা অসম্পূর্ণ হোক-না কেন, এই জাতীয় প্রাসঙ্গিক সমালোচনার সামগ্রিক পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। অবশ্য শুধু পরিমাণের প্রশ্নই নয়, চিন্তার পরিণতির কথাও এখানে বিশেষ বিবেচনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের রসগ্রাহিতা এবং মননশীলতা যে এ পর্বে কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি, বরং তাঁর সাহিত্য-বিবেক যে আরও প্রখরভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে, এগুলির মধ্যে তার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। সরকারীভাবে সমালোচকের ভূমিকা পরিহার করার ফলে কিঞ্চিৎ ভারমুক্ত হয়ে তাঁর মতামত যেন আরও ঋজু, আরও অকুণ্ঠিত হয়ে উঠেছে।

এই-সব খণ্ড ছিন্ন প্রাসঙ্গিক সমালোচনা ছাড়া এ-পর্বে আরও দু জাতের 'সাহিত্যসমালোচনার' সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ভিতর ও বাইরের নানারকম তাগিদে অনেক সময় রবীন্দ্রনাথকে নিজের বিভিন্ন রচনার ব্যাখ্যা করার ভারও নিতে হয়েছে। এর অধিকাংশই তত্ত্বব্যাখ্যা। কিছু কিছু পাঠকের প্রশ্নের উত্তর। কিছু কিছু পঠনপাঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে আমরা যে রবীন্দ্রনাথকে পাই, বেশির ভাগ সময়ই তিনি তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ, সমালোচক রবীন্দ্রনাথ নন।

রবীন্দ্ররচনাবলীর অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রন্থের 'সূচনা' বা ভূমিকা বরং আমাদের সন্ধানের দিক থেকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। পূর্বোক্ত প্রাসঙ্গিক সমালোচনা-খণ্ডগুলির সম্পর্কে বিবেচনা আপাতত স্থগিত রেখে আমরা এই গ্রন্থসূচনাগুলির দিকেই প্রথম দৃষ্টি দিতে চাই।

বলা বাহুল্য, এগুলি গ্রন্থসূচনাই। এদের কাছে খুব বেশি দাবি করলে ভুল হবে। সংক্ষেপে রচনার পটভূমি দেওয়া হয়েছে; কখনো বা প্রায় সূত্রাকারে দু-একটি প্রধান বিশেষত্বের কথা বলা হয়েছে, ক্বচিৎ একটু-আধটু ব্যাখ্যাও স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের সাক্ষাৎ পরিচয় তো গ্রন্থ-মধ্যেই আছে, সূচনা-অংশে অল্প-স্বল্প তার আভাসও হয়তো কিছু মিলবে। আর মূল্যায়ন? নিজের রচনা, সুতরাং স্বভাবতই এটা মূল্যায়নের ক্ষেত্র নয়। 'নৌকাডুবি'র গ্রন্থসূচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

> পাঠক যে-ভার নিলে সংগত হয় লেখকের প্রতি সে-ভার দেওয়া চলে না। নিজের রচনা উপলক্ষে আত্ম-বিশ্লেষণ শোভন হয় না। তাকে অন্যায় বলা যায় এই জন্যে যে, নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবে এ কাজ করা অসম্ভব—এইজন্য নিষ্কাম বিচারের লাইন ঠিক থাকে না।

বোঝা গেল, রবীন্দ্রনাথের মতে, সমালোচনা হল খাঁটি পাঠকের তরফ থেকে সাহিত্যের 'নিষ্কাম বিচার', এবং সেই কারণে তা অন্তত কিছু পরিমাণে 'নৈর্ব্যক্তিক' হওয়া দরকার। এখানে তা শোভনও নয়, সম্ভবও নয়। অতএব এই 'সূচনা'গুলিকে আমরা পুরোপুরি সমালোচনা বলে গণ্য করতে পারি না।

কিন্তু আদৌ সমালোচনা নয়, এমন কথা বললে ভুল বলা হবে। অশোভনতার প্রশ্ন যেখানে ওঠে না, 'নিষ্কাম বিচার' যেখানে নিজের অনুকূলে যায় না, সেখানে মাঝে মাঝেই আমরা অতি কঠোর (বোধহয় অতিরিক্ত কঠোর) এক বিচারকের সাক্ষাৎ পাই। বিভিন্ন কাব্য নাটক ও উপন্যাসে 'সূচনা' থেকে এর কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। বোঝা যাবে যে, সমালোচক-রবীন্দ্রনাথ সৌজন্য ইত্যাদির কারণে অপরের ক্ষেত্রে যা করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন, নিজের ক্ষেত্রে সুযোগ পেয়ে তা যেন সুদ সমেত উশুল করে নিয়েছেন।—

প্রভাত-সংগীত সম্পর্কে:

> ··মনের ভাবগুলো নূতনত্বের আবেগ নিয়ে রূপ ধরতে চাচ্ছে কিন্তু যে উপাদানে তাদেরকে শরীরের

বাঁধন দিতে পারত তারই অবস্থা তখন তরল,· ·ওরা মূর্ত হয়ে ওঠেনি সুতরাং কাব্যের পদবীতে পৌছতে পারেনি।

ছবি ও গান সম্পর্কে :

মোটের উপরে অক্ষম ভাষার ব্যাকুলতায় সবগুলিতেই বানানো ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সহজ হয় নি।

রাজা ও রানী সম্পর্কে :

এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয় রকমের অসংগত।

পূর্বে 'তপতী'-র ভূমিকায় (১৯২৯) 'রাজা ও রানী' সম্পর্কে বলেছেন—

কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার-উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে— এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।

বউঠাকুরানীর হাট :

চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। তারা আপন চরিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, · ·।

নৌকাডুবি :

এর চরম সাইকলজির প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কি না যাতে অজ্ঞানতাজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে।· ·বন্ধনটা এবং সংস্কারটা দুই সমান দৃঢ় হয়ে যদি নারীর মনে শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের অস্ত্র-চালাচালি চলত তা হলে গল্পের নাটকীয়তা হতে পারত সুতীব্র, মনে চিরকালের মতো দেগে দিত তার ট্র্যাজিক শোচনীয়তার ক্ষতচিহ্ন।· ·এই কারণে বিচারক যদি রচয়িতাকে অপরাধী করেন আমি উত্তর দেব না।

উদ্ধৃতিগুলির যৌক্তিকতা এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিবেক যে সতত-সক্রিয়, এইটেই এখানে আমাদের প্রধান লক্ষণীয় বিষয়।

৫

আমাদের প্রশ্ন এখন আর এ নয় যে, ব্যাখ্যা পরিচয় আর বিচার— সমালোচনায় এরা আদৌ সমন্বিত হতে পারে কি না। পারে যে, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য। কোন্ সাধারণ ভিত্তির উপর রবীন্দ্রনাথ এই ত্রিমুখী বৃত্তিত্রয়ের মিলন ঘটিয়েছেন, তাও আমরা দেখেছি। সে হল, পাঠকের সাহিত্য-চেতনা ; সাহিত্যসাক্ষাৎকারের ফলে পাঠকের যে সামগ্রিক প্রাপ্তি, সেই প্রাপ্তির মূল্য সম্পর্কে পাঠকের সচেতনতা।

প্রশ্ন এখন কিঞ্চিৎ তত্ত্বঘটিত। ওই সামগ্রিক প্রাপ্তি কথাটাকে নিয়েই প্রশ্ন। সামগ্রিক প্রাপ্তিটা সামগ্রিক বলেই তার মধ্যে স্তরভেদ অপরিহার্য। স্তরগুলিও সবকটিই তুল্যমূল্য নয়। সামগ্রিক প্রাপ্তির মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য কোন্‌টা ?

নিশ্চয়ই রসাস্বাদন ?— অর্থাৎ কিনা খাঁটি ইস্থেটিক সম্ভোগ ? সাহিত্যসাক্ষাৎকার-সঞ্জাত উপলব্ধিই যখন সমালোচনার একমাত্র আশ্রয়, এবং সেই উপলব্ধিতে রসাস্বাদন ব্যাপারটাই যখন মুখ্য, তখন বিশুদ্ধ আস্বাদনই তো সমালোচনার একমাত্র উপজীব্য হওয়ার কথা ? কিন্তু আস্বাদন আর মূল্যায়ন তো মোটেই এক কথা নয় ? এ কথা যদি মানি, তা হলে সমালোচনাতে মূল্যায়ন বা বিচারের ভূমিকাই তো গৌণ হবার কথা ? বিচার নয়, বরং আস্বাদনই তো সমালোচনাতে সর্বত্র-পরিব্যাপ্ত ? রবীন্দ্রনাথ কি রসাস্বাদনের গুরুত্ব সম্যক অনুধাবন করতে পারেন নি ? নতুবা তিনি 'নৈর্ব্যক্তিক' হবার কথা বলবেন কেন, 'নিষ্কাম বিচারের লাইন ঠিক' রাখার উপর এমন জোর দেবেন কেন ?

এ প্রশ্নের মধ্যে কিছুটা সত্য যেমন আছে, অনেকখানি ভ্রান্তিও তেমনি লুকিয়ে আছে। এর সদুত্তর পেতে হলে রসাস্বাদন ব্যাপারটাকে একটু ভালো করে বুঝে দেখতে হবে।

এ কথা ঠিক যে, সাহিত্যসাক্ষাৎকারের প্রতিক্রিয়াসমূহের মধ্যে রসাস্বাদনই সর্বাগ্রগণ্য। রসাস্বাদন না ঘটলে সমালোচনার জন্ম অসম্ভব। আবার একথাও মানতে হবে যে, রসাস্বাদন ঘটলে মনের মধ্যে কোনো-না-কোনো রকম সমালোচনা— তা প্রকাশ্য হোক, প্রচ্ছন্ন হোক, অবচেতন হোক, স্তিমিত বা প্রখর, সুবিন্যস্ত বা অবিন্যস্ত, যে-রকমই হোক না কেন— কিছু-না-কিছু সমালোচনা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু রসাস্বাদন নিজেই সমালোচনা নয়, সমালোচনাও নিজেই রসাস্বাদন নয়। রসাস্বাদন সমালোচনার অবলম্বন বটে, কিন্তু উপজীব্য নয়। অবলম্বন মাত্র এই অর্থেই যে, তা সমালোচনার উদ্‌বেজক, সমালোচনার অপরিহার্য পূর্ব-শর্ত, সমালোচনায় আগাগোড়াই তার ক্রিয়া অব্যাহত। পাঠকের মনোভূমি থেকে রসাস্বাদন সম্পূর্ণ অপসারিত হলে, পাঠক আর খাঁটি পাঠক থাকেন না। তখন যে-সমালোচনা সম্ভব, তার প্রবর্তনা বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বৃত্তির দ্বারা। তা সাহিত্যিক সমালোচনা নয়। অর্থাৎ সাহিত্যসমালোচনা নয়।

কিন্তু রসাস্বাদনকেই উপস্থাপিত করা—এটা সমালোচনার লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হওয়া সম্ভবও নয়। কেন সম্ভব নয়, সেই কথাটা এখানে একটু পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার।

চলতি কথায় আমরা যাকে 'ভালো-লাগা' বলি, সেটা একটা ঢিলে-ঢালা মিশ্র ধরনের ব্যাপার। তার মধ্যে অনেক বাইরের উপাদান, অনেক ব্যক্তিগত অবান্তর বিবেচনা, অনেক খাদ অনেক ভেজাল মিলে-মিশে থাকতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ রসাস্বাদন— নান্দনিক সম্ভোগ, পাশ্চাত্য শিল্পশাস্ত্রীরা যাকে বলেছেন 'ইস্থেটিক কন্‌টেম্‌প্লেশন'— তা মোটেই এরকম ঢিলে-ঢালা ব্যাপার নয়। সে এমন এক তীব্র রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতা, এমন একটা বিদ্যুৎ-উদ্‌ভাসের মতো প্রজ্বলন্ত ব্যাপার, ভাষার মাধ্যমে যার সশরীরী উপস্থাপন সম্পূর্ণ অসম্ভব। (হয়তো বাইরের দিক থেকে তার বর্ণনা কিছু পরিমাণে সম্ভব, কিন্তু তা নিয়েও প্রচুর মতভেদ আছে)।

ব্যাপারটা জ্ঞানাত্মক, কি বাসনাত্মক, কি বেদনাত্মক, কিংবা এই তিনের সম্মিলিত উপলব্ধি, অথবা কি এই তিনের অতিরিক্ত এক অনন্য অভিজ্ঞতা, তা নির্ণয় করা সহজ নয়। এ বিষয়ে তত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যেও মতের মিল নেই। সমালোচনায় যে বিশেষ ধরনের আত্মসচেতনতা এবং যে-রকম ব্যাপক বস্তু-সচেতনতা অপরিহার্য, রসাস্বাদনের স্তরে তার অবকাশ কতটুকু সেইটেই প্রশ্ন।

ভারতীয় রসশাস্ত্রীদের বর্ণনায়, এ যেন এক তুঙ্গস্পর্শী আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। আস্বাদনই এর তন্মাত্র। আস্বাদনের মধ্যে দ্বিতীয় কোনো-কিছুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। শুধু যে রস আর তার আস্বাদনই অভিন্ন তা নয়, আস্বাদনের প্রচণ্ড রাসায়নিক পাকে রসের অবলম্বন এবং রসের আস্বাদক (অর্থাৎ সাহিত্যবস্তু এবং তার পাঠক), এরাও সম্পূর্ণ দ্রবীভূত, আস্বাদন-ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চিহ্ন। এ হল, দর্শন-পরিভাষায় যাকে বলা যেতে পারে, কেবলাস্বাদন। অথবা, কেবলানন্দও বলতে পারি। অর্থাৎ ছোট-খাটো স্কেলে— ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জাতীয় ব্যাপার।

রসাস্বাদন যদি এই রকম জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ত্বভেদরহিত, এই রকম নির্বিকল্প সমাধি-জাতীয় ব্যাপার হয়, অথবা যদি এর কাছাকাছি কিছু একটাও হয়, তা হলে এ স্তরে পাঠকের স্বকীয় বা বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তার কারণ পাঠক এখানে আপন পাঠকত্ব বিষয়ে সচেতনই নন। পাঠক এখনো তাঁর পাঠকত্ব-ভূমিকায় অধিষ্ঠিতই নন।

রসের প্রসঙ্গে রূপের কথাও অবশ্য উঠতে পারে। কখন রস-তন্ময়তাকে আড়াল করে রূপ-তন্ময়তা জেগে ওঠে, কিংবা রূপ-চেতনা বরাবরই রস-চেতনার সহগামী কিনা, অথবা বরাবরই তার সমান্তরাল কিনা, এসব প্রশ্ন নন্দনতত্ত্বের অন্তর্গত।[৮] রস-চেতনা ও রূপ-চেতনার ভেদ বা অভেদ অথবা অচিন্ত্যভেদাভেদ আমাদের আলোচনার পক্ষে দরকারী নয়। আমাদের পক্ষে যা দরকারী তা হল এই যে, রস— যাকে ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রীরা বলেছেন অলৌকিক, তা— যেমন সমালোচ্য নয়, তেমনি, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ সৌন্দর্যধ্যান— যাকে পাশ্চাত্য শিল্পশাস্ত্রীরা বলেছেন 'ইস্থেটিক কন্‌টেম্‌প্লেশন' যে সম্পর্কে একটু আগেই উল্লেখ করেছি তা-ও তেমনি সমালোচ্য বিষয় নয়। বিশুদ্ধ নান্দনিক চেতনা, তা রূপ বা রস যারই হোক, মূলত একই। কেননা দুই-ই আস্বাদনধর্মী।[৯] সমালোচনাবুদ্ধির জাগরণের পূর্বগামী।

কিন্তু কোনো অভিজ্ঞতারই শাণিত সূক্ষ্মাগ্রে মানুষ বেশিক্ষণ অটল থাকতে পারে না। এ কথা নান্দনিক অভিজ্ঞতার সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। হয়তো বা বেশি করেই প্রযোজ্য। শুদ্ধ অভিজ্ঞতার সেই তনুবাত-শিখরে সীমিত-শক্তি এবং বিমিশ্র-চরিত্র মানুষ কতক্ষণ অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে?

অমানুষিক বিশুদ্ধি আমাদের স্বভাবধর্মেরই বিরোধী। বিশুদ্ধ আস্বাদন কেবল তীব্র বলেই যে ক্ষণস্থায়ী তা নয়, তার সহযোগী শক্তিরাও তার একচ্ছত্র আধিপত্য সহ্য করে না, ক্ষেত্র-বিশেষে তারাও তার প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্যসাক্ষাৎকার যে-মনের সঙ্গে ঘটল, সে তো ফাঁকা মাঠ নয়, কেবলমাত্র কতকগুলি 'ভাব'-এর আধার, তাও নয়। সে এক বিশাল মনোব্রহ্মাণ্ড। নিজের শিক্ষা-দীক্ষা, অভ্যাস-অভিজ্ঞতা ও রুচি-প্রবণতা নিয়ে সেও তো একটা বিরাট প্রস্তুতির ক্ষেত্র রচনা করে রেখেছে; অনেক অনুরাগ ও অনেক বিরাগের জটিল জনতা নিয়ে সেও তো উদ্যত হয়ে আছে। এই যে প্রস্তুতি, তা রসস্বাদনেরই সহায়, হয়তো তার অপরিহার্য শর্ত (কচিৎ অবশ্য কিঞ্চিৎ বিঘ্নও হয়ে দাঁড়াতে পারে বটে)। কিন্তু এরও একটা সুদীর্ঘ

৮ রস-চেতনা ও রূপ-চেতনার পার্থক্য নিয়ে দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'The Concept of Rasa' প্রবন্ধে (*Studies in Philosophy*) অতি সূক্ষ্মদর্শী ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় অন্তর্মুখী চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা রসের অভিমুখে এবং পাশ্চাত্য বহির্মুখী চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা রূপের অভিমুখে।

৯ রূপ-চেতনা ব্যাপারটা বিষয়-আশ্রিত, হয়তো ষোলো-আনা আস্বাদনধর্মী নয়। সম্ভবত বিষয়-আশ্রিত বলেই রূপ জিনিসটা সমালোচনার সম্পূর্ণ অনধিগম্য নয়।

জীবন আছে, নিজস্ব চরিত্র আছে, স্বাধীন সত্তা আছে। নিজের সম্পূর্ণ আত্ম-বিসর্জন সে কখনো সানন্দে স্বীকার করে নেয় না। রসাস্বাদনের তুঙ্গ মুহূর্তে তার ক্রিয়াশীলতা হয়তো স্তম্ভিত থাকে। কিন্তু এও ঠিক যে, উপনিষদ্-বর্ণিত দুই পাখির মতো মানুষের একটা সত্তা যখন আস্বাদন করে, অপর একটি আপাত-মুহ্যমান সত্তা তাকে নিরীক্ষণও করে।

ক্রমে এই আপাত-নিষ্ক্রিয় নিরীক্ষণকারী আর মাত্র নিরীক্ষণকারীই থাকে না। রসাস্বাদনের প্রসাদে তার চরিত্রের মৌলিক রূপান্তর ঘটে, রসাস্বাদনের প্রসাদেই তার মধ্যে নতুন সক্রিয়তার সঞ্চার হয়। রসাস্বাদনকে সে বিস্মৃত হয় না। রসাস্বাদনকে অবলম্বন করেই তার কাজের আরম্ভ, রসাস্বাদনকে অবলম্বন করেই তার অগ্রগতি এবং তার কাজের পরিসমাপ্তি। কিন্তু তার কাজটা রসাস্বাদন নয়, রসাস্বাদনের বর্ণনাও নয়। কাজটা বিষয়-আশ্রিত, বিষয়-চেতনার সঙ্গে সংবদ্ধ। তা বিশুদ্ধ আস্বাদন-ধর্মী নয়, অনেকখানি পরিমাণে মননধর্মী।

এখন আর পাঠকচিত্ত নির্বিশেষ আনন্দেই মগ্ন নয়। সেই আনন্দের হেতু, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও এখন সে সচেতন। এখন আর সে শুদ্ধ রূপ-ধ্যানেই সমাহিত নয়। রূপের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে—রূপের সত্যতা সম্পর্কেও—এখন সে সজাগ। অর্থাৎ সাহিত্যসাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতা এখন কেবল ধ্যান-লোকেই বিরাজিত নয়, সে এখন পর্যবেক্ষণের ভূমিতেও নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছে। এইখানেই আমরা আপন-পাঠকত্বে-অধিষ্ঠিত পাঠকের বিশিষ্ট ভূমিকার প্রথম সাক্ষাৎ পেলাম। সমালোচনার সূচনা এইখান থেকেই।

রসাস্বাদন নয়, রসাস্বাদনের প্রান্তদেশই সমালোচনার ঊর্ধ্বতম সীমা। ঊর্ধ্বতম সীমানাতেও সমালোচনা ষোলো-আনা নান্দনিক ব্যাপার নয়। তা না হোক, কিন্তু ষোলো-আনা নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করেই যাত্রা শুরু, এবং এই অভিজ্ঞতাকে (বা তার স্মৃতিকে) বরাবরই সে নিজের মধ্যে লালন করে চলে। তাই প্রত্যক্ষ জীবনের ব্যবহারিক দায়-দাবির সঙ্গে একটা নিশ্চিত ব্যবধান তার স্বভাবে বরাবরই রক্ষিত থাকে। এই যে দূরত্ববোধ, এর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে, কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি অর্থই হল, পাঠকের পাঠকত্ব-ভূমিকার অবসান। যতদূর পর্যন্ত এই ব্যবধানের প্রভাব কিছু-পরিমাণেও পাঠকের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অনুভব করা যাবে, ততদূর পর্যন্তই সেই প্রতিক্রিয়া সাহিত্যিক প্রতিক্রিয়া। যেখানে এসে এই ব্যবধান সম্পূর্ণ ঘুচে যায়, সেইখানেই সমালোচনার নিম্নতম সীমা। এই সীমার বাইরে সাহিত্যের যে-কোনো আলোচনাই অ-সাহিত্যিক আলোচনা। তা সাহিত্যসমালোচনা নয়।

৬

ব্যক্তিগত ভালো-লাগা অনেক সময় আমাদের উপলব্ধিকে ছোট একটা গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখে, ভালো-লাগার সম্পূর্ণ চেহারাটা দেখতে দেয় না। ব্যক্তিগত ভালো-লাগার অর্থই হল ব্যক্তিগত কারণে ভালো-লাগা। অর্থাৎ শিল্পগত কারণে নয়, আপেক্ষিক ও আপতিক কারণে ভালো-লাগা। ভালো-লাগার ব্যক্তি অতিরিক্ত কারণকে ব্যক্তিগত আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখলে ভালোত্বের বিশুদ্ধ আস্বাদটা টের পাওয়া যায় না। রসাস্বাদন এই আবরণ ভেঙে দেয়।

ভালো-লাগার পূর্ণ রূপটি দেখতে পেলে তখন ভালো-লাগার কারণ সম্পর্কেও চেতনা জন্মে, সেই

কারণ বা কারণ-সমাহার থেকে ব্যক্তিগত উপাদানগুলি খসে যায়, এবং ভালোত্বের ব্যক্তি-অতিরিক্ত রূপটি মনের পটে উদ্‌ভাসিত হয়। 'লেখাটি আমার ভালো লেগেছে'— চেতনার এই স্তর থেকে পাঠক তখন 'লেখাটি ভালো এবং এই এই কারণে ভালো'— এই স্তরে উপনীত হন। এরই নাম বিচারশীলতা। এরই সক্রিয় সহযোগিতায় ব্যক্তিগত পাঠক প্রতিনিধিস্থানীয় পাঠকে, সর্বজনীন পাঠকে পরিণত হন।

মূল্যায়ন একটা হঠাৎ-ঘটা ব্যাপার নয়, কোনো দিব্য আবির্ভাবের মতো চকিত উদ্‌ভাস নয়। মূল্যায়ন মোটেই অব্যবহিত ঘটনা নয়, এ একটা জীবন্ত প্রক্রিয়া। রসাস্বাদন নিজেই মূল্যায়ন-প্রক্রিয়াকে সতত-উদ্‌বেজিত করে রাখে। এই সতত-সক্রিয়তাই সাহিত্যপাঠককে নানা ঘাট ঘুরিয়ে শেষ পর্যন্ত সেইখানে পৌঁছে দেয় যেখানে তার উপলব্ধির পরিপূর্ণতা।

চরিত্রের দিক থেকে রসাস্বাদন ব্যাপারটা যে রকমই হোক না কেন, ঘটনা হিসাবে সে-ও কোনো আকাশ-থেকে-পড়া আকস্মিক আবির্ভাব নয়; তার জন্যও একটা বহুশর্তসাপেক্ষ ভূমিকা-রচনার প্রয়োজন হয়। সাহিত্যপাঠ ব্যাপারটাই তো একটা জটিল ও জীবন্ত প্রক্রিয়া। তাছাড়া, এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্য-বস্তু নিজেও নানা জটিলতার সমন্বয়, তারও শিকড় নানা ভূমিতে প্রোথিত, ডালপালা নানা আকাশে প্রসারিত। সেই কারণে, তার সামগ্রিক মূল্য সম্পর্কে আমাদের চেতনাও তেমনি স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠতে থাকে। এই চেতনা কোথায় কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে আগে থেকে তার নির্দেশ দেওয়া যায় না। এই মূল্যায়ন-প্রক্রিয়া যেখানে যতদূর পর্যন্ত পৌঁছয়, সমালোচনাও ততদূর গিয়ে পৌঁছতে পারে। ততদূর পর্যন্তই তার দায়িত্ব। তার কম গেলে অসম্পূর্ণতা। কিন্তু তার বেশি গেলে আত্মনাশী পরধর্ম।

এই বন্ধুর বিসর্পিল স্বল্পালোকিত পথে অনেক প্রতিবন্ধক ডিঙিয়ে, অনেক সমস্যার সমাধান করে করে, তবে সমালোচনাকে অগ্রসর হতে হয়। তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়, তত্ত্বের কাছে আলোক ভিক্ষা করতে হয়, সন্ধানীর ভূমিকায় নামতে হয়— এতে তার স্বধর্মচ্যুতি ঘটে না। এবং এইখানেই পরিচয়ের দাবি, ব্যাখ্যার অধিকার।

সাহিত্যের উপাদান একদিকে যেমন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি, অন্যদিকে তেমনি ভাষা। এর কোনোটাই জটিলতা-বর্জিত নয়, কোনোটাই বশংবদ আজ্ঞাবহ নয়। সাহিত্যবস্তুর সংগঠনের মধ্যে অনেক সমস্যা ও অনেক সমস্যাপূরণ, অনেক যুদ্ধ ও অনেক যুদ্ধজয়ের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকে। সেইসব ক্ষেত্রে, মূল্যবোধের তাগিদেই সমালোচনাকে নির্মিতি-ঘটিত বিবিধ সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। সেই কারণে, তারা মূল্যায়নেরই অঙ্গ বলে গণ্য হতে পারে। তাগিদটা কার, প্রয়োজনটা কিসের, সেটাই এখানে আসল কথা। মূল্যায়নের প্রয়োজনেই যেখানে ব্যাখ্যা বা পরিচয়ের জন্ম, সেখানে তা সমালোচনার অপরিহার্য অঙ্গ, এবং বিচারের সঙ্গে তা জন্মাবধিই সমন্বিত।

কিন্তু যেখানে তারা স্বাধীন বৃত্তি হিসাবে জন্মলাভ করে অথবা স্বাধীন বৃত্তি হিসাবে বেড়ে উঠবার সুযোগ পায়, সেখানে মূল্যায়নের সঙ্গে তাদের অন্তরের যোগ ঘটতে পারে না। সেখানে ব্যাখ্যা ও পরিচয় উভয়েরই ভূমিকা বিজ্ঞানীর ভূমিকা, কৌতূহলীর ভূমিকা, এমন-কি কখনো-কখনো গোয়েন্দার ভূমিকা। অথবা, ব্যাখ্যা মানে শিক্ষকতা। আর পরিচয় হল অনুগমন। ক্ষেত্রবিশেষে বিশুদ্ধ আত্ম-কণ্ডূয়ন। এই রকম স্বাধিকারপ্রমত্ত ব্যাখ্যামূলক বা পরিচয়মূলক সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই

অ-সাহিত্যের ভূমিতে পা দিয়ে দাঁড়ায়। যেমন সাম্প্রতিক কালের 'বৈজ্ঞানিক সমালোচনা'— নিছক তথ্য-আশ্রিত সাহিত্য-ব্যাখ্যা, অথবা একান্তভাবে ইতিহাস-নির্ভর সাহিত্য পরিচয়।[১০] নিজ নিজ ক্ষেত্রে এদের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য-স্বীকার্য। এরা মূল্যবান সাহিত্য-আলোচনা। কিন্তু সমালোচনা নয়।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা বা পরিচয় কোনোটাই স্বাধিকারপ্রমত্ত নয়। বিচারও খণ্ডিত-দৃষ্টির বিচার নয়। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের উদারপন্থী সমালোচনায় একাধিক বৃত্তির দান এমন অনায়াসে সমন্বিত হতে পেরেছে।

এই যে তত্ত্বগত ব্যাপকতা বা স্থিতিস্থাপকতা, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু সমালোচনার মৌল ঐক্যে তাঁর অনাস্থা প্রমাণ করে না। বরং ঠিক তার উল্টো। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, মতবাদের ক্ষেত্রে না হলেও, কার্যক্ষেত্রে পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ সমালোচকই অল্পবিস্তর উদারপন্থী। এটা হতেই হবে। কিন্তু তাঁদের সকলেরই উদারপন্থা ঠিক এক জাতের নয়। একটি বলিষ্ঠ তত্ত্বগত ভিত্তি না থাকলে উদারতা সব সময় সমন্বয়ের সার্থকতায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। অনেক সময় এ শুধু লুব্ধ এক্লেক্টিসিজ্‌মেরই জন্ম দেয়। উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ আহরণের সঞ্চয়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের উদারপন্থা এক্লেক্টিক সংগ্রহ-প্রবণতা নয়। চিন্তার অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাই: একটি মৌল বিশ্বাসের ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে— তারপর সমন্বয়।

ব্যাখ্যা পরিচয় আর বিচার, এর এক-একটিকে অবলম্বন করে সমালোচনার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন গোত্রের অদ্বৈতবাদের উদ্ভব হয়েছে, কিছুকাল যাবৎ তার বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাচ্ছে। সাহিত্যবস্তুর জটিলতার দিকে দৃষ্টি রেখে, তার সত্তার অনেকত্বের দিকটাকেই একান্ত করে ধরে এই প্রতিক্রিয়া সমালোচনায় চরম বহুবিধতার মতবাদ (pluralism) প্রচার করতে শুরু করেছে।[১১]

এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথও সমালোচনার বহুবিধতায় বিশ্বাসী। কিন্তু, মনে রাখতে হবে, এই অনেকত্বকে তিনি চরম বলে গ্রহণ করেন নি। একটা মূল ঐক্যকেও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যই সেই ঐক্যের ভিত্তি। সাহিত্যসাক্ষাৎকারের ফলে আমাদের যে প্রাপ্তি, তা যুগপৎ সুন্দর সত্য এবং কল্যাণকর। সত্য শিব ও সুন্দর— মানবজীবনের এই পরম সম্পদগুলির প্রতি মানুষের যে দুর্মর নিষ্ঠা, মানবমনের এই মজ্জাগত মূল্যবোধকে রবীন্দ্রনাথ চরম বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এবং এই স্বীকৃতিই তাঁর সমালোচনাতত্ত্বে বহুত্বের অন্তরালে ঐক্যসূত্র রচনা করে রেখেছে।

কিন্তু—সত্য আর মঙ্গল আর সৌন্দর্য, এ-ও তো সেই বহুই হল? এরা কি হুবহু এক? এরা কি তিনটি স্বতন্ত্র ভাবভূমির অধিবাসী নয়? কে না জানে যে, সত্যের অধিষ্ঠান জ্ঞানলোকে, মঙ্গলের অধিষ্ঠান কর্মজগতে আর সুন্দরের অধিষ্ঠান একান্তভাবে অনুভূতিলোকেই আবদ্ধ? সাহিত্যবিচার কি তা হলে ত্রিধাবিভক্ত হয়ে পড়ছে না? পড়ে না, যদি এদের অভিন্ন বলে মেনে নিই। উত্তম কথা; কিন্তু—রবীন্দ্রনাথ এই তিন 'ভ্যালু'র অভিন্নতা প্রতিপাদন করলেন কী উপায়ে?

অভিন্নতা প্রতিপাদনের প্রশ্নটা দর্শনের প্রশ্ন। তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ যে এদের

১০ প্রসঙ্গক্রমে সাম্প্রতিক *New Criticism* এবং *Historical Criticism*-এর কথা এখানে উল্লেখ করা যায়।

১১ এই প্রসঙ্গে R. S. Crane-প্রমুখ 'চিকাগো-গোষ্ঠী'র ('নব্য-এরিস্টটেলীয় গোষ্ঠী'র) সমালোচকদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অভিন্ন বলে মেনেছেন, এইটেই আমাদের কাছে আসল কথা। সমালোচকের মৌল বিশ্বাসের স্বরূপ নিয়েই আমাদের জিজ্ঞাসা, সেই বিশ্বাসের যৌক্তিকতা নিয়ে নয়।

৭

মুখে সত্য শিব ও সুন্দরের কথা বলা এক বস্তু, আর কার্যক্ষেত্রে— অর্থাৎ সত্যিকারের সাহিত্যবিচারে— এই তিনেরই প্রয়োগ করা আর-এক বস্তু। সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথ যে রূপের মানদণ্ড দিয়ে সাহিত্যবিচার করবেন, এটা সহজবোধ্য। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি তিনি সত্যের মানদণ্ড ও কল্যাণের মানদণ্ডও তেমনি অনায়াসে প্রয়োগ করতে পেরেছেন? না, এখানে রূপটাই আসল, সত্য আর মঙ্গল তারই ছদ্মনাম মাত্র?

ক্ষেত্র-বিশেষে এরকম সন্দেহ যে সম্পূর্ণ অমূলক, তা বলা যায় না। মুখে সত্য ও সুন্দর বললেও, কারও কারও ক্ষেত্রে দেখতে পাই, আসলে এরা কল্যাণেরই নামান্তর মাত্র। অথবা মুখে সুন্দর ও মঙ্গলের কথা বললেও কেউ কেউ কার্যক্ষেত্রে এদের সত্যেরই লেজুড় হিসাবে গণ্য করেন। রবীন্দ্রনাথের মতো লীলাবাদী কবি-সমালোচকের কাছে আমাদের আশঙ্কাটা অন্য রকম। কার্যক্ষেত্রে হয়তো সৌন্দর্যের প্রশ্নটাই তাঁর মনে একান্ত হয়ে উঠবে। হয়তো তিনি যে-সত্যের কথা বলবেন তা মোটেই বাস্তব সত্য বা জীবনের সত্য নয়, যে-কল্যাণের কথা বলবেন তা মোটেই ঐহিক কল্যাণ নয়।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সাহিত্যের দিকে একটু অভিনিবেশ সহকারে তাকালেই এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। তাঁর সমগ্র সমালোচনাসাহিত্যেই সেই উত্তর ছড়ানো। কিন্তু তা হলেও, আমাদের বর্তমান অনুসন্ধান শুধু তৃতীয় বা পরিণতি পর্বের পূর্ব-কথিত সেই প্রাসঙ্গিক সমালোচনাসমূহের মধ্যেই আবদ্ধ রাখব। প্রথমত, এই অংশটি এখনো অনালোচিত আছে। দ্বিতীয়ত, বিচার-প্রসঙ্গে মতামত এই অংশেই সব থেকে কুণ্ঠাহীন।

আপাতত আমাদের কাজ শুধু এমন কয়েকটি উক্তি উৎকলিত করে দেওয়া, যার মধ্যে কেবল বিচার নয়, বিচারের আদর্শটাও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

প্রথমে রূপের প্রসঙ্গ।—

> কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখীকে নিয়ে যে-একটা উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা গৃহধর্মের পক্ষে ভালো নয়, এই অতি জীর্ণ কথাটাকে প্রমাণ করবার উদ্দেশ্য রচনাকালে সত্যই যে তাঁর [বঙ্কিমচন্দ্রের] মনে ছিল, এ আমি বিশ্বাস করি নে— ওটা হঠাৎ পুনশ্চ-নিবেদন; বস্তুত তিনি রূপমুগ্ধ রূপদ্রষ্টা রূপস্রষ্টা রূপেই বিষবৃক্ষ লিখেছিলেন। —সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে

অথবা—

> মধুসূদন দত্তের প্রতিভা আত্মপ্রকাশের জন্যে সাহিত্যে একটি রূপের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিল।·· রূপটিকে মনের মতো গাম্ভীর্য দেবেন বলে ধ্বনিবান শব্দ বেছে বেছে জড়ো করলেন। তাঁর বর্ণনীয় বিষয় যে-রূপের সম্পদ পেল সেইটেতেই সে ধন্য হল। —সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে

বিদ্যাপতির সেই 'যব গোধূলি সময় বেলি' ইত্যাদি পংক্তিগুলির সম্পর্কে—

> তিন লাইনে আমরা একটি সম্পূর্ণ রূপ দেখলুম— সামান্য একটা ঘটনা কাব্যে অসামান্য হয়ে রয়ে গেল। —সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে

কিংবা, কীট্‌সের 'Ode To A Nightingale' কবিতার স্তবক-বিশেষ সম্পর্কে—

> একে ইন্‌টেন্সিটি বলা চলে না, এ রুগ্ন চিত্তের অত্যুক্তি, এতে অস্বাস্থ্যের দুর্বলতাই প্রকাশ পাচ্ছে—তৎসত্ত্বেও মোটের উপর সমস্তটা নিয়ে এই কবিতাটি রূপবান। —সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই যে রূপ, এ কি শূন্যাশ্রয়ী? গগন-কুসুমের মতো বৃন্তহীন? এর উত্তর রবীন্দ্রনাথের মুখেই শোনা যাক।—

> শিশুকাল থেকে মানুষ বলেছে 'গল্প বলো'; সেই গল্প তথ্যের প্রদর্শনী নয়, কোনো-একটা মানব-পরিচয়ের সমগ্র ছবি, আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বেঁধেছে তার মধ্যে।··এর মধ্যে অলৌকিক জীবের কথাও আছে কিন্তু তারা মানুষেরই প্রতীক।··মানুষ আপন হাতে আপনাকে, আপন সংসারকে তৈরি ক'রে সেই সংসারের ছবি বানায় আপন হাতে; তাতে তাকে নিবিড় আনন্দ দেয়, কেননা সেই ছবি তার মনের নিতান্ত কাছে আসে। যে শকুন্তলার ঘটনা মানবসংসারে ঘটতে পারে তাকেই কবি আমাদের মনের কাছে নিবিড়তর সত্য করে দেখিয়ে দেন। —সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের পথে

কিংবা—

> শেক্‌স্‌পীয়র রচিত ফল্‌স্‌টাফ একটি বিশিষ্ট মানুষ সন্দেহ নেই। তবু বলতে হবে, আমাদের অভিজ্ঞতায় অনেক মানুষের কিছু কিছু আভাস আছে, শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিভার গুণে তাদের সমবায় ঘনীভূত হয়েছে ফল্‌স্‌টাফ-চরিত্রে। —সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের পথে

অথবা—

> কুমারসম্ভবের হিমালয়-বর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিম, তাতে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিমর্যাদা হয়তো আছে, তার রূপের সত্যতা একেবারেই নেই, কিন্তু সখীপরিবৃতা শকুন্তলা চিরকালের। —সাহিত্যের মূল্য, সাহিত্যের স্বরূপ

'রূপের সত্যতা' কথাটা বিশেষভাবে লক্ষ করবার মতো। তা হলে দেখা যাচ্ছে, সাহিত্য যে রূপ-কে পরিবেশন করে, সে রূপ শূন্যে ভাসমান নয়। তার বৃন্ত মানবসংসারে। তথ্যে না হোক, নিবিড়তর সত্যে। সেই নিবিড়তর সত্যটা অবাস্তব কিছু নয়। কেননা, মানবসংসার জিনিসটা খাঁটি বাস্তব। সেই খাঁটি বাস্তবের খাঁটি রূপের কথাই রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বলেছেন। যেমন—

> রূপকার বাস্তবকে আমার অতি কাছে এনে দেন, রিয়্যালিটির চেতনা আমার মধ্যে উজ্জ্বল করে তোলেন। নানা পদার্থের মধ্যে বাস্তব ছড়িয়ে আছে, তাকে অব্যবহিত বিশুদ্ধরূপে সমগ্র করে দেখতে পাই না— রসসৃষ্টির মধ্যে বাস্তব অব্যবহিতভাবে চেতনার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, তার রূপ দেখতে পাই। —রূপকার, সাহিত্যের পথে

রিয়্যালিটির চেতনা বলেই তাকে বলি সত্য, আর উজ্জ্বল বিশুদ্ধ এবং অব্যবহিতভাবে উপস্থিত বলেই তাকে বলি রূপ।

সাহিত্যে রূপ যে সত্যকেই প্রকাশ করে, এবং সত্য যে রূপের প্রসাদেই সাহিত্যে স্থান পায়— এই হল উপরের উদ্ধৃতিগুলির সারমর্ম। কিন্তু শুধু তাই নয়। রূপ ও সত্যের সঙ্গে কল্যাণের যোগ অবিচ্ছেদ্য। এ যোগ বাইরের নয়। রূপ যেমন জীবনের রূপ, সত্য যেমন জীবনেরই সত্য, কল্যাণও তেমনি জীবনেরই কল্যাণ। জ্ঞানলোক, কর্মলোক, ভাবলোক— তিনটি পৃথক্ জগৎ নয়। চেষ্টা করলে এদের বিশ্লিষ্টভাবেও দেখতে পারি বটে, কিন্তু আমাদের অখণ্ড উপলব্ধির কাছে এরা এক এবং অবিভাজ্য।

সুন্দর যে সুন্দর বলেই কল্যাণকর, এটি রবীন্দ্রনাথের একটি মৌল প্রত্যয়। সত্যের কথাও তাই।

উপলব্ধির সত্য যে তথ্যমাত্র নয় বলেই— সমগ্র সত্য বলেই নিজের মধ্যে মঙ্গলের বীজকে বহন করে, এবং যে-সত্য বড়ো, যে-সত্য গভীর তা যে মঙ্গলের স্পর্শেই বৃহত্ত্ব, তাৎপর্য এবং মহত্ত্ব অর্জন করেছে, এও সেই একই প্রত্যয়ের আর একটা দিক। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, সাহিত্য ও জীবনের ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক প্রভাব সম্পর্কে যিনিই বিশ্বাসী, সাহিত্যের অগ্রগতিতে এবং সাহিত্যের প্রগতিশীল ভূমিকায় যিনিই আস্থাবান, ঠিক এই রকম একটি মৌল প্রত্যয়ের পাদপীঠে তাঁকে দাঁড়াতেই হবে। অন্য গতি নেই।

কল্যাণবোধের দৈন্য যে সৌন্দর্যকে কী ভাবে শীর্ণ করে দেয়, অন্যদিকে মঙ্গলের সঙ্গ যে তাকে কী ভাবে পূর্ণ করে তোলে, সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক যে কত নিবিড়, তা রবীন্দ্রনাথ নানা স্থানে নানা ভাবে বলেছেন। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি।—

> আমাদের দেশের অধিকাংশ আচার-বিচার পুরাতনের নির্জীব পুনরাবৃত্তি। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তাহার অসঙ্গতির সীমা নাই। এইজন্য তাহার অধিকাংশই আমাদিগকে পদে পদে পরাভবের দিকে লইয়া যাইতেছে। কেবল আমাদের সাহিত্যই নূতন রূপ লইয়া নূতন প্রাণে নূতন কালের সঙ্গে যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত। এইজন্য বাঙালিকে তাহার সাহিত্যই যথার্থভাবে ভিতরের দিক হইতে মানুষ করিয়া তুলিতেছে। যেখানে তাহার সমাজের আর-সমস্তই স্বাধীন পন্থার বিরোধী, যেখানে তাহার লোকাচার তাহাকে নির্বিচার অভ্যাসের দাসত্বপাশে অচল করিয়া বাঁধিয়াছে, সেখানে তাহার সাহিত্যই তাহার মনকে মুক্তি দিবার একমাত্র শক্তি। সেখানে সাহিত্যেই অনেক সময়ে তাহার অগোচরেও জীবনসমস্যার নূতন নূতন সমাধান, প্রথার গণ্ডি পার হইয়া আপনিই প্রকাশ হইতেছে। এই অন্তরের মুক্তি একদা তাহাকে বাহিরেও মুক্তি দিবে। —সাহিত্যসম্মিলন, সাহিত্যের পথে

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আপন অগোচরেই কল্যাণপ্রদ সাহিত্য। সহজভাবেই সে জীবনের সপক্ষে। বিকৃতি শুধু যে সংকীর্ণ সামাজিক স্বার্থেই নিন্দনীয় তা নয়, তাতে সাহিত্যিক মূল্যেরই হানি ঘটে। কেননা তাকে সত্যেরও হানি সৌন্দর্যেরও হানি। সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষের প্রতি মানুষের মনে যে একটি অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা আছে, সাহিত্য সেই মহৎ আকাঙ্ক্ষারই অন্যতম প্রকাশ।—

> এক-একটা সময় আসে যখন এক-একটা জাতির মধ্যে মানুষের ভিতরকার বিকৃতিগুলিই উগ্র হয়ে দেখা দেয়।…আমাদের সংস্কৃতসাহিত্যেও এই বিকৃতি অনেক দেখা গিয়েছে।…বর্তমান কালের আরম্ভে কবির লড়াই, পাঁচালি, তর্জা প্রভৃতিতে সাহিত্যের যে-বিকার দেখা দিয়েছিল সেগুলিতে বীর্যবান জাতির প্রবল উন্নতির বা মহৎ আকাঙ্ক্ষার পরিচয় নেই। তার ভিতর অত্যন্ত পঙ্কিলতা আছে। সমাজের পথযাত্রায় পাথেয় হচ্ছে উৎকর্ষের জন্যে আকাঙ্ক্ষা। জীবনের মধ্যে ব্যবহারে তার প্রকাশ খণ্ডিত হয়ে যায় বলেই মনে তার জন্যে যে-আকাঙ্ক্ষা আছে তাকে রত্নের মতো সাহিত্যের বহুমূল্য কৌটোর মধ্যে রেখে দিই— তাকে সংসার-যাত্রায় ব্যক্ত সত্যের চেয়ে সম্পূর্ণতর করে উপলব্ধি করি। —সাহিত্যসমালোচনা, সাহিত্যের পথে

কিংবা—

> আমাদের সব সাহিত্যের গোড়াতেই যে-মহাকাব্য, স্পষ্টই দেখি, তার লক্ষ্য মানুষের দৈন্য প্রচার, মানুষের লজ্জা ঘোষণা করা নয়— তার মাহাত্ম্য স্বীকার করা। —সাহিত্যসমালোচনা, সাহিত্যের পথে

পুনশ্চ—

> বাল্মীকি যেদিন ছন্দ পেলেন সেদিন অনুভব করলেন, এ ছন্দ কোনো মহৎ চরিত্র, কোনো পরম অনুভূতি

প্রকাশ করবার জন্যে, এমন-কিছু যাতে মানবজীবনের পূর্ণতা, যাতে তার গৌরব। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, তখনকার লোক মনুষ্যত্বের কোন্ রূপকে শ্রেষ্ঠ বলে জানতেন।

—সাহিত্যসমালোচনা, সাহিত্যের পথে

৮

রূপ সত্য ও মঙ্গল সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবেও সাহিত্যবিচারের মানদণ্ডরূপে গৃহীত হয়ে থাকে।

যাঁরা বিশুদ্ধ ফর্ম-বাদী, তাঁদের বিচারের মানদণ্ড নিছক রূপ, বস্তুবর্জিত রূপ,— ভাসমান বৃন্তহীন অবচ্ছিন্ন রূপ। কেবল রূপকেই অবলম্বন করলে শেষ পর্যন্ত বস্তুকে—এবং সেই সূত্রে জীবনকে— বাদ দেওয়া ছাড়া পথ থাকে না। অন্যপক্ষে, সংকীর্ণ বস্তুতান্ত্রিক বিচারের মাপকাঠি হল সত্য, নির্জলা আকাট সত্য— অর্থাৎ কিনা বিশুদ্ধ তথ্য। নিছক তথ্যের দিক থেকে সমস্ত সত্যই তুল্যমূল্য। নির্বাচনের উপায় নেই বলে' সমস্ত সত্য সেখানে পিণ্ডীকৃত বস্তুভারে পরিণত হয়। তেমনি, বিশুদ্ধ নৈতিক বা সামাজিক বিচারের একমাত্র মানদণ্ড মঙ্গল। শেষপর্যন্ত— প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক মঙ্গল। তারই নাম প্রচার, প্রোপাগাণ্ডা, আধুনিক সাংবাদিকতা।

এ রকম মানদণ্ড রবীন্দ্রনাথের নয়। সম্পূর্ণ সমন্বিতভাবেই এদের তিনটিকে তিনি সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড রূপে গ্রহণ করেছেন। আসলে মানদণ্ড তো তিনটি নয়। মানদণ্ড একটিই। তার নাম মূল্যবোধ, কিন্তু প্রকৃত অর্থ হল জীবনবোধ।

যদি একথা মানি যে, মানবজীবনই সমস্ত 'ভ্যালু'র আদি উৎস; যদি জানি যে, এই পরম সম্পদগুলি ব্যবহারিকের উর্ধ্বে বটে কিন্তু তা বলে জীবনের উর্ধ্বে নয়; যদি বুঝি যে, শেষ পর্যন্ত জীবনের মূল্যেই এদের যা-কিছু তাৎপর্য,— তা হলে সহজেই বুঝতে পারব রবীন্দ্রনাথ কোন্ পথে এদের সমন্বয়সাধন করেছেন। সহজেই বুঝতে পারব যে, জীবনের সূত্রে এরা স্বভাবতই সমন্বিত।

সে দিক থেকে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের মতে, জীবনের আদর্শ ই সাহিত্যসমালোচনার চরম ও পরম আদর্শ। সবার উপরে সেইটেই সত্য, তার উপরে আর কিছু নেই। এই জীবনের আদর্শের কথা স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—

'চরণনখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে' এই লাইনের মধ্যে বাক্‌চাতুরী আছে, কিন্তু জীবনের স্বাদ নেই। অপর পক্ষে—

> তোমার ঐ মাথার চূড়ায় যে রঙ আছে উজ্জ্বলি
> সে রঙ দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচলি—

এর মধ্যে জীবনের স্পর্শ পাই, একে অসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। —সাহিত্যের মূল্য, সাহিত্যের স্বরূপ

শতবার্ষিক রবীন্দ্রচর্চা আলোচনা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী পত্রিকার উনবিংশ বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় শতবার্ষিক রবীন্দ্রচর্চার একটি ধারাবাহিক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, বেশ দীর্ঘ তালিকা, এক শ উনত্রিশ জন লেখক এবং এক শ ছেচল্লিশটি গ্রন্থনাম তার উপজীব্য, যদিও কেবল বাঙলাভাষার সংস্করণগুলিই এতে মুদ্রিত করা হয়েছে। এই একবছরে স্থানে ও অস্থানে আক্ষরিক রবীন্দ্রচর্চার পরিমাণ কি সংখ্যানির্ণয় রীতিমত সময়সাপেক্ষ, তার জন্য আরও কিছুকাল অনায়াসে অপেক্ষা করা যায়।[১]

মনুষ্যত্বের সবদিকের অংশগুলি বহুযত্নে তিনি অসামান্য করে তুলেছিলেন, শুধু এই ব্যাপকতার কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিত্বকে অজস্র বিষয়ে বিভাজ্য করে রেখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ' কথাটির প্রতিশব্দ জানতে চাইলে আমরা এক নিশ্বাসে কবি-চিত্রী-গীতিকারের যোগফল কষি, কিন্তু পরমুহূর্তেই অধীর হয়ে জানাতে চাই একটি অসহায় ভূখণ্ড কতিপয় অস্থির ইতিহাসমুহূর্ত কেমন করে ওই নামটিকে ঘিরে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল কৃতার্থ হয়েছিল, দ্রুত বলে উঠতে চাই এ দেশের পল্লীউন্নয়ন কিংবা এ দেশের রাজনীতি-সমাজনীতি-শিক্ষা-মানবতাবাদ এমনকি এ দেশের চিন্তা-ধ্যান-ধারণা সবকিছু তাঁর করস্পর্শে কতদূর প্রগত হয়েছিল, আন্তর্জাতিকতার পুরোধা এবং বিশ্বমৈত্রীর পুরোহিত, ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে তাঁকে পৃথিবীর কতিপয় অলোকদ্রষ্টার পাশে অসংকোচে স্থাপন করা যায়, ইত্যাদি। এই উক্তির লিখিত ও অলিখিত প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ আলাদা আলাদা পৃথক বিভাগে বিন্যস্ত হয়ে রবীন্দ্রচর্চার এবং আমাদের আলোচ্য গ্রন্থপঞ্জীর অজস্র শ্রেণী রচনা করেছে। শ্রেণীর চেয়ে শাখার রূপকটিই হয়তো এখানে অধিকতর সহজবোধ্য, মূল বৃক্ষটিকে তাতে সবসময় মনে থাকে। কিন্তু এ-সবই একটিমাত্র দিক। আপাতদৃশ্য। অপর পিঠ, যেটি অপেক্ষাকৃত পরোক্ষ ও অগোচর, এই পঞ্জিকার ব্যাপকতা দিগন্তরে বাড়িয়ে দিয়েছে। আরও স্থূল ভাষায় বইগুলি বর্ণনা করা যাক। কোনো কোনো গ্রন্থ রবীন্দ্রচরিত অথবা রবীন্দ্র-রচনার একটিমাত্র অংশকে অবলম্বন করে আদ্যন্ত প্রণীত। কোনো কোনো গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ নামক মহীরুহটিকে আশ্রয় করে শাখা-প্রশাখা-পত্রগুচ্ছে নিবিড় (অথবা পল্লবগ্রাহী)। কখনও কখনও একজন গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থে কতিপয় রচনা সংকলিত করেছেন; রচনাগুলি বিবিধ বিষয়ক, এবং বিচ্ছিন্ন। হয়তো নানাসময়ের লেখা একত্র হয়ে সেই গ্রন্থকারেরই চিন্তাধারার পরিণাম— এক কথায় সেই গ্রন্থকারকেই আলোচ্য করে তোলে। কখনও কখনও একজন সম্পাদক তাঁর গ্রন্থে কতিপয় রচনা সংকলিত করেছেন; রচনাগুলি বিবিধবিষয়ক এবং বিভিন্ন রচনাশৈলীতে শবলিত। কখনও কখনও সম্পাদিত রচনাবলীর লেখকেরা সমকালবর্তী নন, রবীন্দ্রচর্চার প্রথম ও অব্যবহিত কালকে পাশাপাশি ধরে আছেন। যেসব পুরাতন গ্রন্থের নতুন সংস্করণ এই একই বছরে প্রকাশিত হয়েছে কখনও তাদেরই সঙ্গে কখনও তাদের চেয়েও প্রখরভাবে এইসব রচনার পুনর্মুদ্রণ আলোচনার সময়সীমাকে নিঃশব্দে প্রসরতর করে দেয়। যেসব

১ বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভা ১৯৬১ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উপরে রচিত পুস্তকের তালিকা প্রকাশ করেছেন।

গ্রন্থে রবীন্দ্রচর্চার বিগত ক্রমান্বয় ইতিহাসটিকে আভাসে বর্ণনায় অথবা উদাহরণত উন্মোচিত করা হয়েছে সেইসব জায়গায় এই প্রসার স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত।

সন্দেহ নেই, শতবার্ষিক রবীন্দ্রচর্চার একটি অংশ নিরঙ্কুশ, তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বর্ণনায় ব্যাপৃত— সেখানে তথ্যঘটিত বিরোধ কখনও হয়তো ঘটে কিন্তু পরক্ষণেই সেই বাধা এড়িয়ে বহুসংবাদে ভাণ্ডার ভরে ওঠে— সেই অংশটিই সচ্ছল ও স্ফীতকায় সন্দেহ নেই। অপর অংশটি যেটি ক্ষীণতোয়া শীর্ণ এবং আপাতলক্ষগোচর নয় তারই তর্কোদ্বেজিত ঘূর্ণাবেগে, অথচ, এই একবছরের রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে অধিকতর জীবনরক্তিমা এসেছে বলে মনে হয়।[২] তার জিজ্ঞাসা দ্বিকোটিক। প্রথমত— বাঙলাদেশে বাঙালী-জীবনে বাঙলাসাহিত্যে এবং ধরণীপটে রবীন্দ্রনাথের স্থান— কেমন? কোথায়? কি কারণে? দাবি কতটুকু? অধিকার কতখানি? দ্বিতীয় প্রশ্নটি আরও বিশুদ্ধ, বাঙলাদেশের সাহিত্যচিন্তার বিবর্তন সম্পর্কিত। রবীন্দ্রনাথ বাঙলাসাহিত্যের পৃষ্ঠাঙ্ককে একাকী বহুগুণ বাড়িয়েছিলেন, শুধুমাত্র তাঁকে ঘিরে বাঙলাসাহিত্যের কলেবর আজ আরও অজস্রগুণ স্ফীত হয়ে উঠেছে। তাঁর সময়ে সাহিত্যে নতুন চিন্তা তিনি এনেছিলেন— সাহিত্যপাঠের সাহিত্যরচনার সাহিত্য-আলোচনার। তাঁরই রচনা পড়তে গিয়ে ও আলোচনা করতে গিয়ে বাঙলাদেশের সমালোচনা-বিদ্যা ও নন্দনতত্ত্ব ক্রমাগত আত্মক্ষালন করতে করতে আজ এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। শতবার্ষিক রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ সেই মূল্যবান সমীক্ষার জন্য যে সুযোগ করে দিয়েছে শুধু সেই সূত্রটিকে অধোরেখ ও বৃহদাক্ষর করে দিতে চাই। এই বিষয়ের একটি তৃপ্তিকর ও সার্বভৌম আলোচনা বাঙলাদেশের কোনো প্রবীণ আচার্য অথবা তরুণ গবেষকের মুখাপেক্ষী হয়ে রইল।

২. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রচরিতের উপকরণ

বিশেষভাবে শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ করেই কয়েকখানি রবীন্দ্রজীবনী প্রকাশিত হয়েছে, যে রবীন্দ্রনাথ বহু বিচিত্রভাবে স্পর্শ করে আছেন বাঙালী জীবনকে, যে রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক বাঙালীর যথাসর্বস্ব', তাঁর

---

২ শতবার্ষিক বছরের সূচনায়, পাঠকের মনে আছে, বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী বিষয়ে একটি প্রবন্ধ তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সাহিত্য আকাদেমীর সেন্টিনারী ভল্যুম্‌এ শ্রীযুক্ত তারকনাথ সেন লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাটির কণ্ঠস্বরে সেই প্রতিক্রিয়ারই সংক্রমণ অনুমান করা যায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-এর গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ একই জাতীয় অস্বস্তির অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে। বুদ্ধদেব বসু নিজেও 'রবীন্দ্রনাথ: বিশ্বকবি ও বাঙালি' নামে একটি রচনা পরে লিখেছেন, একই উৎসপ্রণোদিত। রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী নামক বিষয়টি বহুদিন ধরেই আমাদের বিতর্কের উপাদান যুগিয়ে আসছে। ভাষান্তরে এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা। 'রবীন্দ্রনাথ কি ইউরোপীয়' পত্রমালায় অন্নদাশঙ্কর রায় এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, 'আধুনিক' একটা কালবাচক শব্দ। 'ইউরোপীয়' একটা দেশবাচক শব্দ।...রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে আঁকা ছবিগুলো modernist art-এর নিদর্শন। ইউরোপীয় আর্টের নয়। নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁর গ্রন্থের একটি রচনা 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরপক্ষ'-এ বিষয়টি অংশত আলোচনা করেছেন। কিছুদিন আগে, শিবনারায়ণ রায় এইসূত্রে একটি তীব্র বিতর্কের সূচনা করে দিয়েছিলেন, তারই ফলে পিয়ের ফালোঁ-র অনবদ্য সমালোচনাটি লেখা হয়। এর জের নানা রচনায় এখনও পর্যন্ত মেলে। 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ'-এর পরিশেষে অমল হোমের একটি উক্তি এই মুহূর্তে চোখে পড়ছে। এ বছরে সুশোভন সরকার লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার নবজাগরণ' প্রবন্ধটি অনুরূপ বিতর্কের হাওয়া তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে পশ্চিমী দৃষ্টির জয়যাত্রা শেষপর্যন্ত অব্যাহত থেকেছে, এই মন্তব্য বিদগ্ধমহলকে আন্দোলিত করেছে। কিন্তু এই সব আলোচনায় কবির সামর্থ্য ক্রমাগত প্রমাণিত হতে থাকে। যাঁর সম্বন্ধে আমাদের কোনো সংশয় নেই তাঁর সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল আদৌ জাগ্রত থাকবে কেন? বহুদিন ধরে জাগ্রত থাকবে কি করে? প্রশ্নচিহ্নের প্রতিক্রিয়াতেই তাঁর প্রতি নতুন সমর্থন অঙ্কুরিত হয়, তাঁর শক্তির নতুন নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে।

জীবনালেখ্য যাতে সাধারণ ও সর্বশ্রেণীর গৃহস্থের জাড্য অপসারিত করে তার আঙিনায় সহজ অধিকারে প্রবেশ করে,[৩] তা-ই প্রধান উদ্দেশ্য। যতদূর সম্ভব স্বল্পতম রেখা ও সাবলীলতম বাক্যবন্ধ এই জাতীয় জীবনীর প্রণেতা, এইদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রশতাব্দী জয়ন্তীর পক্ষে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-চরিত' বইখানি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। লেখক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। ভূমিকায় উদ্দেশ্যটি বিশদ করা আছে: 'বাংলা বর্ণজ্ঞান আছে অথচ উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান নাই এমন লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে নিতান্ত কম নয়। এই অনতিশিক্ষিত বিপুল জনসমষ্টিকে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মসাধনার সহিত পরিচিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে· · রবীন্দ্রচরিত রচিত হইল।' তদনুসারে সমগ্র রবীন্দ্রজীবন এখানে আঠাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রত্যেকটি অধ্যায় অমোঘতম বিভাগে বিন্যস্ত, এমনকি প্রতিটি উদ্ধৃতি পর্যন্ত অমোঘতম মনে করা যায়। অধ্যাপক ভট্টাচার্য রবীন্দ্রজ্ঞ হিসেবে খ্যাতিমান, এই যুগ্ম অধিকার তাঁর বইখানিকে একাধারে নির্ভরযোগ্য ও চিত্তাকর্ষক করেছে। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের বংশলতিকা ও রবীন্দ্রনাথ-রচিত বাঙলা পুস্তকের তালিকা যুক্ত হয়ে বইটির উপযোগিতা আরও বাড়িয়েছে।

অপ্রাপ্তমনস্কের সঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্কের পার্থক্য খুবই অল্প, বস্তুত রবীন্দ্রচরিতের আবেদনও উভয়মহলেই সমান। একই কারণে ছোটদের জন্য যেসব রবীন্দ্রজীবনী প্রকাশিত হয়েছে তারও আবেদন শুধু অপ্রাপ্ত-বয়স্কদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উপরন্তু এই দুই পক্ষকে অতিক্রম করে সাধারণ পাঠকও এইসব বইয়ের নির্ভরে ও উজ্জ্বল আলোচনায় তৃপ্তিসহ অংশ নিতে পারেন। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -লিখিত 'রবি-কথা' নামে আর একখানি বইয়েরও নাম করা যেতে পারে, 'রবীন্দ্রচরিত'-এরই মত এই বইখানিও একইভাবে অনতিশিক্ষিতজনের কিশোর-বয়সীর এবং সাধারণ জিজ্ঞাসু পাঠকের উপযোগী।

এই সূত্রে 'ছোটদের রবীন্দ্রনাথ' পর্যায়টি এই মুহূর্তেই সংযোজন করা যায়, আদ্যোপান্ত কবিজীবনীর সঙ্গে অন্যপ্রকার রবীন্দ্রপরিচয়ও সেখানে এক নিশ্বাসে বর্ণনীয়।

ছোটদের জন্য সম্ভবত সংক্ষিপ্ততম জীবনী গ্রন্থখানি লিখেছেন লীলা মজুমদার (১৪ পৃষ্ঠা), নয়াদিল্লী সাহিত্য অকাদেমী তার প্রকাশক। শ্রীযুক্তা মজুমদার দ্বিতীয় আর-একখানি জীবনী লিখেছেন 'বাঙ্লাদেশের ছেলেমেয়েদের জন্য'— 'এই যা দেখা'— এক শ উনিশ পৃষ্ঠার পরিসরে অত্যন্ত সুলিখিত কিশোরপাঠ্য, তাঁর কিশোরপাঠ্যও অবশ্যই শুধুমাত্র কিশোরপঠিত নয়, আর লীলা মজুমদারের পাঠক-মাত্রেই জানেন তাঁর লেখা একবার শুরু করে এক নিশ্বাসে শেষ না করে ওঠা কত দুরূহ।

এর পরেই বলা যাক শিশুসাহিত্য-সংসদ্ প্রকাশিত ও বিজনবিহারী ভট্টাচার্য লিখিত 'নবীন রবির আলো'— এই নাম; একই লেখকের 'প্রভাতরবি'। 'প্রভাতরবি' দীর্ঘদিন ধরে বাঙালী পাঠকের পরিচিত, আজকের দিনে অনেক পরিণত যুবার কিশোরবয়সের সঙ্গী, প্রথমবয়সের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সূত্র।

অতঃপর আরও কয়েকটি। যামিনীকান্ত সোম লিখিত 'ছোট্ট রবি', রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের মনোরম কাহিনী। নীরেন্দ্র গুপ্ত লিখিত 'রবি-কাহিনী', মণি বাগচি লিখিত 'রবির আলো', গীতা মুখোপাধ্যায়

৩ 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি সাধারণ পাঠকের মনোভাব হল কিছুটা উদাসীন।' রবীন্দ্রকথা, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

লিখিত 'ছোটদের রবীন্দ্রনাথ'— সুখপাঠ্য ধারাবাহিক রবীন্দ্রজীবনকথা। অনিলচন্দ্র ঘোষের 'রবীন্দ্রনাথ' অপেক্ষাকৃত প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের উপযোগী। ধীরেন্দ্রলাল ধর লিখিত 'আমাদের রবীন্দ্রনাথ' 'বাঙালী কিশোর ছাত্রসমাজের জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ'। কিন্তু বইটি আদৌ কৃশকলেবর নয়, বেশ পুষ্ট। প্রায় পাঁচ শ পৃষ্ঠার এই বইটিতে জীবনপঞ্জী রচনাপঞ্জী ও তন্মধ্যে রবীন্দ্ররচনার ইংরেজী অনুবাদ সমূহের বিবরণ, ও বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্ররচনাবলীর তালিকা ইত্যাদি আছে. কিশোর ছাত্রদের সেইসব সংবাদাদি অবশ্যই কাজে লাগবে। এছাড়া, বিমল ঘোষ লিখিত 'শিশুরবি' জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা অবলম্বনে নাটিকা। আরও কয়েকটি বই গণনার বাইরে রয়ে গেল, সবগুলিই মোটামুটি সহজপাঠ্য ও বিশেষত্ববর্জিত।

অন্য প্রকার রবীন্দ্রপরিচয়ের জন্য কিশোর পাঠকদের উপযোগী সংকলন গ্রন্থগুলি স্মর্তব্য। তার মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বৃহৎ বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত 'রবীন্দ্রস্মৃতি', যশস্বী ও অনতিখ্যাত হাতে স্বাক্ষরিত সত্তরটি রচনার সংকলন। এই রচনাগুলির জন্য তিনটি বিভাগের পরিকল্পনা করা হয়েছে— স্মৃতিকথা, জীবনকথা, ও সৃজন-কথা; প্রথম বিভাগে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ধন্য মানুষদের স্মৃতিতে যে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় বিভাগে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন সমাজজীবন ও ঘরোয়াজীবনের নানা ঘটনা, তৃতীয় বিভাগে রবীন্দ্ররচনার ছোটদের উপযোগী আলোচনা। শেষ বিভাগটিও, বলাই বাহুল্য, জীবন-পর্যালোচনারই একটি অংশ, আলংকারিক ভাবার্থনির্ণয় নয়। কিন্তু সূচীপত্রে এই যে পরিকল্পনাটি লেখা হয়েছে, সেই অনুসারে বইটি সাজালে কি ক্ষতি হত? অপিচ, বইটিতে রবীন্দ্রনাথের সর্বদিকের পরিচয় আকর্ষণীয়ভাবে একত্র করা হয়েছে। যদিও মুদ্রণ অনুজ্জ্বল ও অঙ্গসজ্জা মামুলী তথাপি দাম কম এই কারণেও বইটিকে সংরক্ষণযোগ্য বিবেচনা করা যায়।

ছোটদের রবীন্দ্রনাথ পর্যায়ের দ্বিতীয়ার্ধটি অবশ্য বাকি রইল, শিশুসাহিত্য কিংবা শিশুশিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরবর্তী সূত্র। কিন্তু সেই সীমায় পৌছোবার পূর্বক্ষণে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'রবীন্দ্রজীবনকথা' নামক মাঝারি মাপের বইটির নাম করা কর্তব্য। 'রবীন্দ্রজীবনকথা' বিশ্বভারতী শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার অন্তর্গত। প্রায় বছর পাঁচেক আগে রবীন্দ্রকৃত্য প্রসঙ্গে বিমলচন্দ্র সিংহ জানিয়েছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের জীবনীরচনারও প্রয়োজন আছে। সৌভাগ্যক্রমে বাঙলায় প্রভাতকুমারের মহৎ গ্রন্থ আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি ছোট জীবনীর [প্রয়োজনীয়তার?] উল্লেখ করি।' সেই দায়িত্বও প্রভাতকুমারই পালন করেছেন। বিজ্ঞাপনে ও সমালোচনায় এই বইয়ের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে একটি কথার উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া থাকে: এই বই চার খণ্ডের বৃহদায়তন রবীন্দ্রজীবনীর সংক্ষেপিত সংস্করণ নয়, নতুন বই। এই সচ্ছল ও গুরুভারবর্জিত চলিত ভাষায় লেখা বইটি— কিশোরপাঠ্য কিংবা প্রাকৃতজনমান্য না হয়েও— রবীন্দ্রানুরাগী সাধারণ পাঠকের অশেষ উপকার সাধিত করেছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রসাহিত্যের ছাত্রদের কাছে এই বই অতি আবশ্যকীয় একটি হ্যাণ্ডবুক, পরিশেষে একটি বিবলিওগ্রাফি যুক্ত হওয়ায় আরও অপরিহার্য হয়ে ওঠার সুযোগ লাভ করেছে।

রবীন্দ্রজীবনকথা যে উপকরণাদির উপর নির্ভর করে রচিত সেই পর্বতপ্রমাণ তথ্য সংকলিত আছে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রবাদপ্রসিদ্ধ বৃহৎ বইখানিতে। রবীন্দ্রজীবনী লেখা শুরু হয়েছিল ১৯২৯এ, ১৯৬১ সালেও এই দায়িত্বকে পূর্ণতর করে তুলতে লেখক কণামাত্র শিথিল নন, প্রথম তিনটি খণ্ডের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ সেই সদাসক্রিয়তার সাক্ষ্য। প্রভাতকুমারের এই গ্রন্থখানি

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সর্বশ্রেণীর অনুসন্ধিৎসা নিবারণের প্রতিশ্রুতি দেয়, এত বিপুল তথ্য ও নিশ্ছিদ্র নিষ্ঠার সমাহারে এই বই এখনও পর্যন্ত অসামান্য ও দ্বিতীয়রহিত। তৎসত্ত্বেও এই জীবনীখানি পেয়ে রবীন্দ্রজীবনী সম্পর্কে আমরা চূড়ান্ত তৃপ্তিলাভ করেছি, এমন কথা ভাবা যায় না। তার কারণ হয়তো এই— জীবনের কোনো কিছুর সম্বন্ধেই তৃপ্তিলাভ করা যায় না, জীবনের কোনো কিছু সম্বন্ধেই চূড়ান্ত তৃপ্তিলাভ করা মোহগ্রস্থ হওয়ার নামান্তর। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন, 'অরণ্যকে চেনাতে গেলেই জঙ্গলকে সাফ করা চাই, কুঠারের দরকার,' প্রভাতকুমারের বইটি যে লঘু তরণীর মতো সাবলীল এমন কথা মনে করা যায় না। বরং ইংরেজিতে টমসন, রীস অথবা এই বছরে কৃপালনীর যে বই দুটি প্রকাশিত হয়েছে— অনেক মসৃণ ও গতিশীল। কিন্তু এহ বাহ্য। এই বইয়ের প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন :

গ্রন্থকার প্রধানত ঐতিহাসিক কর্তব্য করেছেন, কিন্তু স্থানে স্থানে সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হন নি। গুরুভক্তিকে তিনি পদে পদে সংযত করেছেন, নইলে এও হত আর-একখানি 'রবীন্দ্রচরিতামৃত'।[৪]

বুদ্ধদেব বসুর উক্তি :

তথ্যের এই আধিক্য সত্ত্বেও, কিংবা সেইজন্যই, রবীন্দ্রনাথ কোনো-একটি পৃষ্ঠাতেও জীবন্ত হ'য়ে ওঠেন নি, কোথাও নিশ্বাস পড়ে নি তাঁর, একবারও শুনতে পেলাম না তাঁর হৃৎস্পন্দন। ভিক্টরীয় ইংলণ্ডের 'সরকারি' জীবনীর অনুসরণে প্রভাতকুমার অধিগম্য সকল তথ্যই একত্র করেছেন, তার উপর নায়ককে অবতীর্ণ করেছেন প্রথম থেকেই মহত্ত্বের ইস্পাত-জামা পরিয়ে।[৫]

এবং সজনীকান্ত দাসের ধারণা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা, চিঠিপত্র এবং রচনাসমূহের প্রকাশকাল প্রভৃতি তন্নতন্ন বিচারের দ্বারা সুবৃহৎ চার খণ্ডে 'রবীন্দ্রজীবনী' নামে যে দিনপঞ্জী-রচনাপঞ্জী-ও-রবীন্দ্রসাহিত্যের তাৎপর্য-ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন, সন-তারিখ-তথ্য-তত্ত্বের কিছু কিছু ভুল সত্ত্বেও রবীন্দ্ররসিকেরা সেটির ব্যবহার অপরিহার্য বলিয়া বিবেচনা করেন। এই বইটিকে ভিত্তি করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে রবীন্দ্রনাথকে বুঝা বরঞ্চ সহজতর হইবে, হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী সুবিপুল রবীন্দ্রসাহিত্য-বিশ্লেষণমূলক বহু গ্রন্থে সরলমনা পাঠকের বিপদ আছে।[৬]

---

৪ রবীন্দ্রায়ণ, দেশ ১৯ চৈত্র ১৩৬৬।

৫ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসমালোচনা, সাহিত্যচর্চা।

এই সূত্রে আঁন্দ্রে মোরোয়ার কথা মনে পড়ে : নির্দিষ্ট তারিখে পোর্টসীতে যে শিশুর জন্ম হয়েছিল, সে কিন্তু আদৌ কোন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিল না, যদিও তার নাম চার্লস ডিকেন্স। জীবনীলেখকের নিপুণতা এখানেই, তিনি দেখাবেন কেমন করে ওই obscure শিশুটি খ্যাতনাম মানুষ হয়ে দাঁড়ালো।

বার্কার ফেয়ারলি জর্জ হেনরি ল্যুয়েস এর গ্যেটে-জীবনীর কোন বক্তব্য সূত্রে লিখছেন : Lewes was writing in the eighteen-fifties with Goethe's life-work spread before him and was thinking partly about his poetry, whereas Goethe was at the beginning of his career and was thinking about his mind or his temperament, regardless of poetry, এ স্টাডি অব গ্যেটে, পৃ ৫

রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই এইসব উক্তির আলোকে বিচার্য হতে পারেন না, যেহেতু কবিতাই তাঁর আজন্ম প্রেয়সী। তাঁর জীবনে দ্বিধা নেই, ক্রমবিকাশ আছে।

৬ রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য, পৃ ১৩০

কিন্তু এই দ্বিধা ও স্বীকৃতি-সুদ্ধ নিতান্তই সরলমনা লাগে যখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনীরচনাই আরও গভীরতর কারণে দুরূহ। 'তোমরা রচিলে যারে নানা অলঙ্কারে/তারে তো চিনিনে আমি, চেনেন না মোর অন্তর্যামী/তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা।'— এই আক্ষেপোক্তি পর্যন্ত একটি সরলতর সূত্রকেই আকর্ষণ করে। আসলে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে তিনি যে চরম বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন— 'কবিরে খুঁজো না তাহার জীবনচরিতে'— তার প্রধানতম হেতুও তিনি জানিয়েছিলেন— 'কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে'— বহির্ঘটনার তরঙ্গমালায় তিনি নিজেকে প্রেক্ষণীয় দেখতে চান নি, বহিরঙ্গ জীবনে নিজেকে প্রমাণিত দেখতে চান নি—

বাহির হইতে দেখো না অমন করে
আমায় দেখো না বাহিরে

তাঁর আবেদনের মূল কথা ছিল এ-ই। টেনিসনের পুত্র লিখিত কবিজীবনীর সমালোচনায় এই কথাই আরও স্পষ্টভাবে লিখেছেন, প্রথমত

কবি কোথায়, কাব্যস্রোত কোন্ গুহা হইতে প্রকাশিত হইতেছে তাহা তো খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে।

এবং পরক্ষণেই

কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্মে উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন— কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে।

উক্ত ক্ষণজন্মা পুরুষের উদাহরণ দিতে গিয়ে সেই মুহূর্তে দান্তের নাম তাঁর মনে পড়েছিল, অথচ নিজে যতবার আত্মপরিচয় লিখতে বসেছেন, এই একটি সূত্র তাঁর কলমের মুখে এসে বসেছে। বঙ্গভাষার লেখক-এর জন্য জীবনীতে

আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যে-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব।

জীবনস্মৃতির প্রথম খসড়ায়

কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও-দুটা একই বৃহৎ রচনার অঙ্গ। জীবনটা যে কাব্যেই আপনার ফুল ফুটাইয়াছে আর কিছুতে নয়, তাহার তত্ত্ব সমগ্র জীবনের অন্তর্গত।

হয়তো এই কারণেই অজিতকুমারের সমালোচনা তাঁর মনোমত হয়েছিল— 'অজিত আমার জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন'— এই তৃপ্তি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে তিনি জানাতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই কথা যে প্রভাতকুমারের অজানা, আদৌ তা নয়, তা হলে তাঁর বইয়ের উপনামটিকে তিনি অনিবার্য বিবেচনা করতেন না, তাঁর বইয়ের পুরো নাম : রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক। তিনি শুধুই রবীন্দ্রজীবনের সন-তারিখ একত্র করতে চান নি, কাব্যজীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে সবসময় সচেষ্ট থেকেছেন।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পূর্বমুহূর্ত থেকেই জীবন ও কাব্যের ভেদ আমরা বিসর্জন দিতে এগিয়েছি, পণ্ডিতেরা এমন কথা মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু তাতে ইন্ধন যুগিয়েছেন অথবা তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, কবিতা

যে কবিরই আত্মপ্রকাশ (internal made external), আলোচনার ক্ষেত্রেও এই ধারণায় আমরা বদ্ধমূল হয়েছি। 'আমি তো মনে করি কবির কাব্যরচনা ও জীবনরচনা একই রচনার অন্তর্গত, জীবনটাই কাব্যে আপনাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে'— এই কথা লিখে অজিতকুমার হয়তো পুরোবর্তিতা করেছেন। এবং এই অন্তরঙ্গ জীবনভাষ্য -রচনার প্রবণতাবশেই অজিতকুমারের বই সমালোচনা হয়েও কবিজীবনী, যেমন প্রভাতকুমারের এই বই জীবনী হওয়া সত্ত্বেও কাব্যালোচনা।

কিন্তু জীবনীপ্রণয়ন ও কাব্যালোচনা অতিসূক্ষ্ম বিভাগরেখার দুইপারে থেকে ক্রমেই আরও মিলনোৎসুক হয়ে উঠেছে, আরও অভিন্নহৃদয় হয়ে উঠেছে। মোহিতলাল মজুমদার দেখেছিলেন, 'সংস্কৃত আলংকারিকদের কাব্যবিচারে কবি-মানসের কোনো স্থান ছিল না— তেমনই আধুনিক কাব্যবিচারে…কবি-মানসই সকল স্থান জুড়িয়া বসে', এবং রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে— 'কাব্য পাঠ না করিয়া কবিকে পাঠ করিতে হয়'— এতদূর উচ্চারণ করেছিলেন। এই ধারণা ক্রমাগত পরিণাম খুঁজে চলেছে। উদাহরণত: প্রমথনাথ বিশী-র 'রবীন্দ্রসরণী' কি কাব্যালোচনা না কবির অন্তরঙ্গ জীবনী। জগদীশ ভট্টাচার্যের 'কবিমানসী' কি কবির অন্তর্জীবনী বা কাব্যবোধিনী। শ্রেণীনির্ণয় করতে এগোলে এই সংশয় অপ্রতিকার্য। কিন্তু শ্রেণীনির্ণয়ের উদ্যমেই বা কি ফল। মিড্ল্টন্ মারি লিখেছেন, সাহিত্য অধিগত করার অর্থ যে-মানুষটি তার রচয়িতা তাঁরই হৃদয়টিকে জানা, তাঁর রচনার উদ্দেশ্যও তাই— যাতে তাঁর হৃদয়টিকে জানা যায়। স্বভাবতই সমালোচনা কবির হৃদয়োৎসেরই আনাচে কানাচে ঘুরছে, জীবনীসন্নদ্ধ হয়ে উঠছে। পাঠকেরাও দাবি করছেন নতুন কবিজীবনীর— আরও অন্তরঙ্গ— যেখানে কাব্য ও হৃদয়াবেগ সুচারুভাবে সম্পর্কিত হয়, হৃদয়তলটি প্রত্যক্ষবৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাতে প্রভাতকুমারের অথবা অজিতকুমারের অন্তরঙ্গতা খণ্ডিত হচ্ছে না, কিন্তু অন্তরঙ্গ কথাটি যে স্থির স্তম্ভিত একটি অর্থে আলগ্ন হয়ে নেই এবং আরও অন্তর্ভেদী হয়ে উঠতে চাইছে, তা-ই বোঝা যাচ্ছে। উপরন্তু একটু পরে হলেও বিশ-শতক এতদিনে আমাদের দেশে এসে ঢুকেছে, স্বমহিমচ্ছায়ায় আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৭] প্রুস্ত্ কিংবা ফ্রয়েডএর প্রতিকৃতি সম্মুখে রেখে, বলাই বাহুল্য, আমাদের অন্তরঙ্গতার ধারণা আরও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠতে চায়।

রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে অবশ্যই এতদূর সংকেতিত ছিল না। তাঁর রচনায় তাঁর অন্তর্জীবন অনুলিখিত আছে— এই কথা বলে তিনি তাঁর অন্তর্জীবনের গৌরব আমাদের কাছে আভাসিত রাখতে চেয়েছেন, এবং সম্পূর্ণভাবে স ·যৎস্বভাবঃ কবিস্তদনুরূপং কাব্যম্ কিংবা লেখকস্য চ যদ্রূপং চিত্রে ভবতি তাদ্রূপ্যম্ ইত্যাদি প্রবচনপ্রভাবে আদর্শ কবিচর্যায় আজীবন অসামান্য নিষ্ঠিত থেকেছেন, আধুনিক মনোবিকলনের শল্যশয়ানে নিজেকে উপস্থাপিত দেখতে চান নি। অথচ এই মুহূর্তে কাব্যপংক্তিসমূহ যে-অন্তর্জীবনের উৎসে আমাদের নির্দেশিত করে, সেই অন্তর্জীবন কথাটির অর্থ আমাদের কাছে কি। কিছুদিন আগে মনে পড়ে, কোনো বিদগ্ধ ব্যক্তি এই শূন্যস্থানটিই প্রচণ্ডভাবে আলোচ্য করে তুলেছিলেন। হয়তো এ কথা ঠিক, ডাউডেন-এর শেলি দেবত্বে যে পরিমাণে অত্যুজ্জ্বল আমাদের কাছ থেকে ততখানিই দূরবর্তী। কয়েক

৭ হাউসার তাঁর সোশাল হিস্টরি অব আর্ট বইয়ে দেখিয়েছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ওদেশে বিশ শতকের শুরু, ১৯২২এ জয়স ও এলিয়টের বই দুটি যুগপৎ বেরুবার পর সাহিত্যক্ষেত্রে সরকারীভাবে বিশ শতকী হাওয়া বইতে লাগলো। আধুনিক বাস্তবতা বলতে যা বুঝি তা আমার মনে হয় আমাদের স্বাধীনতার পরে অর্জন করেছি, তৎপূর্বে কল্লোলযুগ ইত্যাদি সময়ে তার পূর্বলেখমাত্র দেখা যায়।

বছর আগে ইতিহাসবেত্তা ও সমালোচক অক্সফোর্ডের এফ. ডব্লু. বেটসন টিনটর্ন অ্যাবি ও লুসি-কবিতাগুচ্ছের নেপথ্যে ওয়ার্ডস্বার্থ ও ডরোথি-র প্রণয়বৃত্তান্ত আবিষ্কার করে কবিতাগুলিকে আরও স্পষ্ট ও অর্থবহ করে তুলতে চেয়েছেন, তাঁর যুক্তি

> In the mid-twentieth century, to put it crudely, the poems must *make sense*; and *to make sense of them the modern reader must be able to relate them significantly to the emotional undercurrents* of Wordsworth's life and personality.

সেই সূত্রে, ডরোথি-র সঙ্গে ওই বিপজ্জনক সম্পর্কটির মূলোচ্ছেদ করার জন্যই যে লুসি-র অকালমৃত্যু ঘটাতে হয়েছে, এমন কথাও বলেছেন।[৮] রবীন্দ্রনাথের নেপথ্যজীবনের প্রতি উৎসাহ এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় নি। কিন্তু তাঁর নেপথ্যজীবনে আগ্রহ যে বিপুল পরিমাণে বেড়েছে এতে ভুল নেই। সেই আগ্রহ অবশ্য খণ্ডিতভাবে তাঁর চিত্রকলার আলোচনায় কখনও কাব্যবিচারে নিয়োজিত আছে, সেই উৎসাহে এখনও পর্যন্ত তাঁর আদ্যন্ত জীবনী প্রণীত হয়ে ওঠে নি। ইতস্তত কেউ কেউ তাঁর ভাবজীবনের তাৎপর্য নির্ণয়ে অথবা তাঁর কবিতার মানবিক উৎসসন্ধানে সচেষ্ট হয়েছেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের সম্বল প্রধানত রবীন্দ্রনাথের সেই তেইশ বছর বয়সের শোক, এবং প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ডের ১৭৮-১৮৩ পৃষ্ঠায় যে তথ্য পাওয়া যায় তারই প্রতি নিষ্ঠা। অবশ্য কোনো কিছু বিশ্লিষ্ট ও আলাদা করে রাখলেই তার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপিত হয়, এ কথা অস্বীকার্য করা যায় না।

জগদীশ ভট্টাচার্য লিখিত 'কবিমানসী' এই সম্পর্কেরই বিস্তারিত ভাষ্য, ধারাবাহিকভাবে যখন প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই বিস্তর ভ্রূকুটী ও কিছু পরিমাণ অভিনন্দন কুড়িয়েছিল।[৯]

এই সঙ্গেই আরও কয়েকটি খণ্ড-রচনার নাম করা যায়। ড. সুকুমার সেন লিখিত 'রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ' বিশ্বভারতী পত্রিকায় (বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৪ ও বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১) প্রকাশিত। একই লেখকের 'রবীন্দ্রনাথ মানুষটি কেমন ছিলেন' সংক্ষিপ্ত হলেও অন্তরালোকে উদ্ভাসিত, রবীন্দ্রচর্চা নামে সংকলনগ্রন্থে উপস্থাপিত আছে। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'বিজয়ার করকমলে' রচনায় ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ও রবীন্দ্রনাথ এবং সেই সূত্রে তৎকালীন রবীন্দ্রকাব্যকে সম্পর্কিত করেছেন। বিশ্লেষণ নয়, কিন্তু অমিতাভ চৌধুরীর 'আপন মানুষের দূতী' প্রবন্ধে আন্না তরখড় সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান তথ্য সংকলিত হয়েছে। ১৯ নভেম্বর ১৯৬১-র রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত। শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গে প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত 'ভোরের পাখি' প্রবন্ধটিও এই প্রসঙ্গে মূল্যবান। কবির প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'অভিলাষ'এর পশ্চাৎপটে কুমারসম্ভব ও ম্যাকবেথ -এর প্রভাব এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙালীর বাহুবল প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি পরিমাপ করে লেখক এই কবিতার রচনাকাল সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত নয়, ঐ কবিতার রচনাকাল ১২৮১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ থেকে অগ্রহায়ণের মধ্যবর্তী কোনো সময়।

---

৮ ওয়ার্ডসোয়র্থ—এ রি-ইন্টারপ্রিটেশন, পৃ ১৫৩

৯ দান্তে প্রসঙ্গে মারিতাঁ-ব্যবহৃত prime wound কথাটি এক্ষেত্রে অতীব প্রয়োগযোগ্য, ক্রিয়েটিভ ইনট্যুইশন ইন আর্ট অ্যাণ্ড পোয়েট্রি, ২৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু এই রচনাধারা রবীন্দ্রজীবনী রচনার একদিককার উৎসাহ, করাগ্রে গণনীয়। সত্য কথা বলতে কি, রবীন্দ্রজীবনের স্থির মূল্যায়ন করবার মতো স্থিতাবস্থা আমরা এখনও পর্যন্ত পেয়েছি কিনা সন্দেহ। জনৈক সমালোচক জানিয়েছেন

> ১০ বৎসরের পরিশ্রমে রাটগার্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রেঞ্চ ৫ খণ্ডে 'লাইফ রেকর্ড্‌স্ অব জন মিল্টন' নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কর্মময় জীবনের সমস্ত কথা একত্রিত করিবার সময় আসিয়াছে।[১০]

একত্র করবার পূর্বক্ষণে সম্ভবত আমরা উপনীত হয়েছি। আলোচ্য বৎসরে কবিজীবনের বহু উপকরণ আমরা ইতস্তত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পত্রিকায় অথবা গ্রন্থাদিতে সংকলিত হতে দেখেছি, এ-ও কম আশার কথা নয়, ভবিষ্যতের রবীন্দ্রজীবনীকার এই ভাণ্ডার যথেচ্ছ ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন।

জীবনী কথাটি শূন্যগর্ভ বৃত্তের সমার্থক, যদি না সেই মণ্ডলটিকে ভরাবার জন্য কিছু ব্যক্তি কিছু ভাবনা ও কিছু পরিমাণ ভূমিখণ্ডের সন্নিবেশ ঘটানো যায়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ যেসব ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন যে-সব ভাবনায় আন্দোলিত হয়েছিলেন এবং যেসব ভূখণ্ডে পদক্ষেপ ফেলেছিলেন, সেই সবই প্রতিদানে তাঁকে একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতির স্পষ্টতা দিয়েছে। সেদিক থেকে জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথ যুগসমস্যায় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ কিংবা শিশুদের রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকাহিনী প্রণয়নে সমদায়িত্বের অধিকারী। 'যে-সব ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন' এইটিও আবার দ্বিভাজ্য : ১. যেসব ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিত্বে কোনো রেখা সংযোজিত করেছেন, ২. যেসব ব্যক্তির স্মৃতিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের কোনো রেখা মুদ্রিত হয়েছে, সেদিক থেকে বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ নামের প্রবন্ধ অথবা হেমলতা দেবী লিখিত 'কবিস্মৃতি' সমানভাবে তাঁর জীবন-কাহিনীর অঙ্গ।

এই বর্ণনায় যদি এমন ধারণা হয়, বিভিন্ন বিষয়ে নিবিষ্ট বিভিন্ন রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় বিষয়কে ব্যক্তির আড়ালে, একক ব্যক্তিটির আড়ালে বিসর্জন দিচ্ছি, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ও রাজনীতি রবীন্দ্রনাথ ও ইতিহাস কিংবা রবীন্দ্রনাথ ও সংগীত ইত্যাদি আলোচনার শেষ শব্দগুলিকে গ্রস্ত ও অদৃশ্য করে তুলছি এবং তদনুসারে নিজেরই পূর্বসংকল্পিত শ্রেণীবিন্যাসের প্রতিবাদ করছি— তবে সেই ধারণায় দ্বিতীয় সায়টিও রাখতে চাই। একদিক থেকে অধিকাংশ আলোচনাই জীবনকাহিনীরই পৃষ্ঠা— সেদিক থেকে প্রফুল্লকুমার সরকার লিখিত 'জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ' অথবা সুধীরচন্দ্র কর লিখিত 'শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা'র মধ্যে ভেদ নেই— তথাপি আলোচনার সুবিধার্থেই আমরা বিভিন্ন বিভাগে কোনো কোনো রচনার স্থান নির্ধারণ করে বৈষয়িক রচনা হিসাবে তাদের প্রতিপন্ন করতে চাইব, বিভাগগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখতে চাইব। আপাতত জীবনকাহিনীর দ্ব্যর্থরহিত উপকরণগুলিকে চরিত্রানুযায়ী পৃথক পৃথক সাজানো যেতে পারে। কিন্তু সেই উদ্যমেরও প্রাক্কালে কয়েকজন পূর্বসূরীর নাম স্মরণীয়। প্রথমত রবীন্দ্রনাথ নিজে, যিনি কয়েকবার আত্মপরিচয় রচনায় নিযুক্ত হয়েছেন, তাছাড়া ভ্রমণবৃত্তান্ত ডায়ারি ও অজস্র পত্রাদিতে তাঁর জীবনকাহিনীর প্রাথমিক উপকরণ রেখে গেছেন। সেগুলি আমাদের ভাণ্ডারের প্রথম সঞ্চয়। অতঃপর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সজনীকান্ত দাস ইত্যাদির নাম মনে পড়ছে। সীতা দেবীর 'পুণ্যস্মৃতি' ইত্যাদি বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতিকথাগুলির নাম মনে পড়ছে। আরও একাধিক রবীন্দ্রব্রতীর নানাবিধ কৃত্য মনে

১০ শতবার্ষিক বৎসরে রবীন্দ্রচর্চা, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। দেশ ১৩৬৯ রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা।

পড়ছে, কিন্তু সে সবই পরিচিত। ১৩৬৯ দেশ সাহিত্য সংখ্যায় পুলিনবিহারী সেন রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্রের এক সংকলন করেছেন, 'তাতে যে সকল পত্রিকায় তিনি প্রকাশ্যত সম্পাদক ছিলেন না, কিন্তু কার্যত সম্পাদক ছিলেন বা সম্পাদনকর্মে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন, বা কোনো বিশেষ বিভাগের সম্পাদক ছিলেন, কিংবা সম্পাদককে বিশেষভাবে অনুপ্রেরিত করেছেন— সেগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগের বিবরণও যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করা হয়েছে'। এ বিষয়ে দুটি পূর্ববর্তী রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্র' এবং সজনীকান্ত দাস লিখিত 'ভাণ্ডারের কাণ্ডারী রবীন্দ্রনাথ'। শেষোক্ত রচনাটিতে ভাণ্ডার-সম্পাদনার সূত্রে অন্যান্য সাময়িকপত্র সম্পাদনার বিবরণও লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি সম্প্রতি লিখিত আরও দুটি পরস্পরপরিপূরক রচনার উল্লেখ করা যায়— তথ্য-গৌরবে নয়, বিশ্লেষণধর্মেই যদিও তাদের বিশেষত্ব: ভবতোষ দত্ত লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ও সাময়িক পত্র' এবং অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত 'সবুজপত্র, কল্লোল : রবীন্দ্রনাথ'। ভবতোষ দত্ত, বলাই বাহুল্য, সবুজ-পত্রের পূর্বযুগ পর্যন্ত অনুসরণ করেছেন, এবং জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব ভারতী বালক হিতবাদী সাধনা বঙ্গদর্শন ভাণ্ডার ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রতিফলিত রবীন্দ্রনাথের ক্রমবিকাশ লক্ষ করেছেন, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর পর্বে সাময়িক পত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত পরোক্ষ কিন্তু গভীরতর সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রস্তাবনা করেছেন, এবং পরিশেষে তাঁকে 'কেবল মহৎ নন, তিনি মহত্তম; কেবল আধুনিক নন, আধুনিকোত্তম' ইত্যাদি সপ্রমাণ করেছেন। প্রবন্ধ দুটি 'রবীন্দ্রচর্চা' নামক সংকলনগ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ।

এই পর্যন্ত রবীন্দ্রজীবনীর তথ্যসংগ্রহ-বিষয়ে একদিকের আভাস লিপিবদ্ধ করা গেল। এরই সঙ্গে প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত লিখিত 'রবীন্দ্রপরিচয় সভা' নামক কৌতূহলোদ্দীপক রচনাটির উল্লেখ করা যায়, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫-৩৬ পর্যন্ত অর্থাৎ ছ-সাত বছর মাত্র এই সভা সজীব ও সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের ৭৬তম জন্মোৎসব উপলক্ষে যে আভ্যন্তর তিক্ততা দেখা দিয়েছিল তার বিবরণ এখানে পাওয়া যায়। চিত্তরঞ্জন দেব লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত ভাষণাদির অনুলিখন সূচী'টিও মূল্যবান। এই দুটি রচনাই গীতবিতান পত্রিকার শতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যার অন্তর্গত। বর্ধমান সাহিত্য সভা প্রকাশিত 'রবীন্দ্ররচনা : ভূনির্দেশিকা'র মানচিত্রগুলিও এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য। এবং অপর্ণা সেনের 'নোবেল প্রাইজ ও রবীন্দ্রনাথ' নামক সবিশেষ তথ্যবহুল পুস্তিকাটি, যার উল্লেখ আগের অনুচ্ছেদেই কর্তব্য ছিল, পৃথক্‌কৃত করে সাধারণ পাঠকের নিকট এর উপযোগিতা চিহ্নিত করা গেল।[১১]

পরিচিতজনের স্মৃতিতে যে রবীন্দ্রনাথ

স্মৃতিকথা পর্যায়ে গ্রন্থের সংখ্যা কম, খণ্ড রচনার সংখ্যাই বেশি। গ্রন্থগুলির নামই প্রথমত করা যাক।

রবীন্দ্রস্মৃতি: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। বিশ্বভারতী শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার অন্তর্গত, এই পর্যায়ে আলোচ্য বৎসরের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বই, শুধু এই কারণে নয় যে লেখিকা আশৈশব কবির বহুস্নেহধন্যা ভ্রাতুষ্পুত্রী, তা ছাড়াও অপর কারণ

আমাদের পরবর্তীকালে নিজ নিজ অভিজ্ঞতানুসারে নানাজনে রবীন্দ্রনাথের নানা ছবি আঁকতে চেষ্টা

১১ আর-একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ: আকাশবাণী ও কবিকণ্ঠের রেকর্ড, মনোমোহন ঘোষ, দেশ ২ ভাদ্র ১৩৬৮

করেছেন।··তবে, আর যতই সুবিধা থাকুক, বয়সে কেউ আমার সমকক্ষতার দাবি করতে পারবেন না এটুকু আশা করতে পারি।

মিতায়তন এই বইয়ের সংবাদাদি সংগীতস্মৃতি নাট্যস্মৃতি সাহিত্যস্মৃতি ভ্রমণস্মৃতি ও পারিবারিক স্মৃতি— এই পাঁচ অংশে বিন্যস্ত। প্রধানত লেখিকার প্রথমজীবন অর্থাৎ প্রাক্‌বিবাহ স্মৃতিলেখাই এই বইয়ের উপজীব্য, পরবর্তী জীবনেরও কিছু কিছু উল্লেখ অবশ্যই আছে। আগাগোড়া নিপুণ ও সাবলীল রচনাশৈলী, অত্যন্ত সুখপাঠ্য। রবীন্দ্রজীবনের ওই মুহূর্তগুলিকে তিনি বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শসহ জীবন্ত করে তুলেছেন।

এরই সঙ্গে সংযোজনযোগ্য ক্ষিতীশ রায় অনুলিখিত তাঁর মায়ার খেলার স্মৃতি, কথোপকথনচ্ছলে বলা, গীতবিতান পত্রিকা, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যায় মুদ্রিত।

সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ : শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। কবির সান্নিধ্যভোগী হিসেবে শ্রীযুক্ত অধিকারী বাঙালী পাঠকের অতিপরিচিত, বহুদিন যাবৎ সংসারিক ও ঘরোয়া রবীন্দ্রনাথের আলেখ্যরচনায় নিযুক্ত আছেন। রবীন্দ্রনাথের যে সাধারণ জীবনটি অজ্ঞাত পল্লীপথের নানা জায়গায় বিক্ষিপ্ত ও বিলীয়মান হয়ে আছে, তাও যে কত অসামান্য— সেই পরিচয় তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। উপরন্তু তাঁর লেখায় মধুর একটি গল্পের স্বাদ বর্তমান। এই বইটি তাঁর বহুপূর্বের প্রকাশ, পুনর্মুদ্রিত। কিন্তু রবীন্দ্রমানসের লৌকিক উৎস সন্ধানের প্রবণতা এখানেও সমান উপস্থিত।

ঠাকুর-বাড়ির আঙিনায় : জসীমউদ্দীন। এই বইটি অংশত রবীন্দ্রস্মৃতি। লেখকের ব্যক্তিজীবন সেই স্মরণচিত্রের পটভূমিকা হিসাবে আলিখিত হয়েছে। অত্যন্ত মর্মস্পর্শী আন্তরিকতায় তাঁর রচনা ভারাক্রান্ত ও মধুক্ষরা। অপিচ কোনো কোনো সংবাদ ও মন্তব্য শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিবেচনা করা যায় না, আরও বিচারসহ বিবেচ্য, যেমন ৩১-৩৩ পৃষ্ঠায় মৈমনসিংহ গীতিকা ও ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত বাউলগানগুলি প্রসঙ্গে তাঁর মতামত, ৪৩-৪৬ পৃষ্ঠায় বাঁশী-বাজিয়ে কালা মিয়া-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য প্রসঙ্গে

> আজ পরিণত বয়সে বুঝিতেছি যে, কবি কোন দিনই এই বাঁশী শুনিয়া আমাদের মতো মুগ্ধ হইতেন না। কবি যখন সাহিত্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন সমস্ত দেশ পল্লীগানে মুখর ছিল। কালা মিয়ার চাইতে সহস্রগুণের ভালো বাঁশী-বাজিয়ের সুর তিনি শুনিয়াছিলেন। লোকসাহিত্যের উপর কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা ছাড়া তাহাদের সুর বা কৃষ্টি রক্ষা করিতে তিনি বিশেষ কিছুই করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ : প্রমথ চৌধুরী। এই বইয়েরও অন্তত তিনটি রচনাকে নিখাদ রবীন্দ্রস্মৃতি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। 'রবীন্দ্র-পরিচয়', বইয়ের প্রথম রচনা, লেখকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়ের বিবরণ। পরের দুটি— 'একটি আবিষ্কার' ও 'রবীন্দ্র-সন্দর্শন'। অপর রচনাগুলিতেও অবশ্য স্মৃতির উপাদান ব্যবহৃত। প্রমথ চৌধুরীর এই রচনাগুলিকে গ্রন্থভুক্ত করে সম্পাদক রণজিৎকুমার সেন পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

রবীন্দ্র আলোকে রবীন্দ্রপরিচয় : সুধীরচন্দ্র কর। এই বইটি প্রত্যক্ষ স্মৃতিচারণ নয়; জীবন-যোগে, সাহিত্য-সমীক্ষায়, ধর্ম-ধারণায় ও যুগ-উদ্দীপনায় রবীন্দ্রজীবনের পর্যালোচনা। কিন্তু এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অংশ আছে, আরও অনেকের স্মৃতিকথার সহযোগিতা আছে, তার সাথে লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতির অবতারণাও অল্প নয়, যেমন ২৬ পৃষ্ঠায় অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে কবির কথোপকথনসূত্রে, ৩২ পৃষ্ঠায় : 'স্মৃতিসূত্রে টান পড়ে এই প্রসঙ্গে, মনে আসছে আর-এক দিনের কথা। ১৩৪৩ সনের বৈশাখ···',

৪৫ পৃষ্ঠায় প্রফুল্ল ঘোষের শান্তিনিকেতন আগমন সূত্রে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব কারণে বইটি এই পর্যায়েই উল্লেখযোগ্য। স্বল্প পরিসরে লেখক রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী বিকাশ ও সেই সঙ্গে মানবরূপের পরিচয় দিয়েছেন।

অতঃপর খণ্ড-রচনাগুলি। কিন্তু প্রতিটি রচনার শুধুমাত্র পরিচয় লিখতে গেলেও যে পরিমাণ জায়গা লাগবে সেই বিপুলতার কথা ভেবে মোটামুটি একটি তালিকা দেওয়া যাচ্ছে।

কবির সংস্পর্শে : সাহানা দেবী

পল্লীর উন্নতি : পিতৃস্মৃতি : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর —রবীন্দ্রায়ণ

রবীন্দ্রনাথ : নবীনচন্দ্র সেন। 'আমার জীবন'এর চতুর্থভাগ-ধৃত এই রচনায় পূর্ণাঙ্গ সংস্করণটি কোথাও কোথাও রবীন্দ্র সমালোচনা হিসাবেও উৎকলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আর. জে. ক্যামবেল

কবি : সি. এফ. এণ্ড্রুজ

সংসারী রবীন্দ্রনাথ : হেমলতা দেবী। 'রবীন্দ্রনাথের ঘর সংসার কেমনটি ছিল'—তারই পরিচয়।

রবিকাকা : ইন্দিরা দেবী

সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ : ড. সমরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

অবিস্মরণীয় মুহূর্ত : বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী —সুজনী

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন : শান্তা দেবী

পুরোনো কথা : অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতনের প্রথমবয়সের কথা, লেখক পরে যখন গেছেন, 'সে সব পুরোনো জায়গা ঘরদোর কোনোটা নেই, অধিকাংশই খুঁজে পাওয়া যায় না' ইত্যাদি।

শিলাইদহ থেকে শ্রীনিকেতন : ক্ষিতীশ রায়। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা ও শ্রীনিকেতনের আদর্শের পরিচয়।

শান্তিনিকেতনের গোঁসাইজী : সুধাকান্ত রায়চৌধুরী —ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট

সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী —রবীন্দ্র বীক্ষা

বায়োকেমিক ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ : পশুপতি ভট্টাচার্য —কথাসাহিত্য রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা

রবিকাকা ও সবুজপত্র : ইন্দিরা দেবী। এইটিই লেখিকার শেষ রচনা বলে বিজ্ঞাপিত।

—উত্তরসূরী রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ সংখ্যা

শান্তিনিকেতনের শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে : প্রফুল্লকুমার সরকার —রবীন্দ্রচর্চা

কবিস্মৃতি : প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

কবিগুরু গুরুদেব : সৈয়দ মুজতবা আলী। 'হে মাধবী দ্বিধা কেন' এই গানটির মৌলিক উৎস এই রচনায় পাওয়া যায়।

কবিগুরু : অন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁর গ্রন্থেও মুদ্রিত হয়েছে। —দেশ : ১৩৬৮ ও ১৩৬৯ সাহিত্য সংখ্যা

এ ছাড়া 'ব্রহ্মচর্য আশ্রমের দিনগুলি' : নৃপেন্দ্রকুমার বসু, 'গুরুপল্লীর সূচনাপর্ব' : সুধাময়ী দেবী, 'গুরুদেবের আশ্রমে ছাত্রীজীবন' : শৈলনন্দিনী সেন (গীতবিতান পত্রিকা, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা)—ইত্যাদি রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। বিদেশী পরিচিতজনের কবিস্মৃতিও প্রচুর পরিমাণে এবৎসর প্রকাশিত

হয়েছে, তার বঙ্গাক্ষর সংস্করণের সংখ্যাও কম নয়। জেম্‌স. পি. ব্রাউন লিখিত 'দ্বিধাবিভক্ত বিশ্বে রবীন্দ্রনাথের বাণীর প্রভাব' এই রচনার একটি অংশ অন্তত উদ্ধৃতিযোগ্য, তিনি তাঁর বালক বয়সে লক্ষ্য করেছেন, 'চাষ আবাদ করা ও গরু বাছুর রাখা যাবতীয় কাজ করতেন আমার জ্যাঠামশায়, সারাদিন করতেন কঠোর পরিশ্রম আর রাত্রিবেলা বসতেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে।' এই স্মৃতিচিত্র আমাদের উৎসাহিত করে তোলে।[১২]

অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিত 'আমাদের ছাত্রাবস্থা ও রবীন্দ্রনাথ' মূল্যবান রচনা : 'আমাদের কলেজের শিক্ষার পাথরের চাপ রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যই বিদীর্ণ করেছিল'— এই প্রসঙ্গে অনেক আন্তরিক তথ্য এখানে পাওয়া যায় (রবীন্দ্রনাথ। উত্তরপক্ষ)। অতঃপর 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে' : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৮ চার সংখ্যা, বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১), 'কবির সঙ্গে ফ্রান্স যাত্রা' : গিরিজাপতি ভট্টাচার্য (পরিচয়) ইত্যাদি ভ্রমণকথাগুলিরও উল্লেখ করা যায়, স্মৃতিকথা হিসাবে যেমন, কবির সঙ্গে ওই সব স্থানের সম্পর্ক বিশ্লেষণেও তেমনই কার্যকরী।

ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ

দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।

উপরের 'ভারত' কথাটির আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের পরিবর্তে আমরা এই মুহূর্তে তার ভৌগোলিক অর্থটি গ্রহণ করছি। ভারতের ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে অবস্থান করেছেন, সেই সব স্থানের যোগে তাঁর জীবনে নতুন আলো আক্ষেপিত হয়েছে। ডানলপ কোম্পানী ও পূর্ব রেলোয়ে প্রকাশিত দুখানি ইংরেজি স্মারক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপর্যটনের একটি সূচীপত্র রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের সহযোগে যে রবীন্দ্রনাথ আমরা সেই পর্যায়ের গ্রন্থ ও রচনাগুলি আপাতত লিপিবদ্ধ করতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক তাঁর প্রথম জীবন থেকেই। ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ের অস্ফুট কবিকে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান জানিয়েছিলেন। অতঃপর ত্রিপুরার রাজপরিবার নানাসূত্রে সারাজীবন কবির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সমিতির পক্ষে গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এই মহার্ঘ পুস্তকটি এই বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙলা প্রকাশন। বস্তুত একাধারে এত তথ্যসমৃদ্ধ ও শোভনমুদ্রিত পুস্তক বাঙলাভাষায় এ বছরে আর প্রকাশিত হয় নি। সম্পাদকদ্বয় বলেছেন, 'ত্রিপুরার সঙ্গে তাঁর যে সুদীর্ঘ নিবিড় ও ব্যাপক আত্মীয়তার বন্ধন ছিল তার একটি যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ, তথ্যভিত্তিক বিবরণ এতে বিধৃত করার চেষ্টা হয়েছে। কবির জীবনের এ অধ্যায়টি বিশদ ও প্রামাণিকভাবে ইতিপূর্বে কোথাও আলোচিত হয় নি।' সে কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। এই বইয়ের প্রথম রচনা 'ত্রিপুরায় রবীন্দ্রস্মৃতি', লেখক সত্যরঞ্জন বসু। এই প্রবন্ধে লেখক বিপুল নিষ্ঠাভরে ত্রিপুরা রাজবংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘদিনের আত্মীয়তার ধারাবাহিক ইতিহাস— বীরচন্দ্র, রাধাকিশোর এবং মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর ও মহারাজকুমার

---

১২ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'মহামানবের সাগর তীরে' সঙ্কলনে আরও কয়েকজন বিদেশীর কবিস্মৃতি পাওয়া যায়। প্রফুল্লচন্দ্র দাশ সঙ্কলিত 'আলোর কবি রবীন্দ্রনাথ' এ আরও কয়েকটি।

ব্রজেন্দ্রকিশোর— এই তিন অধ্যায়ে অজস্র তথ্যসহ বিবৃত করেছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রতীর্থ পরিক্রমায় মহারাজ বীরবিক্রমের সঙ্গে', লেখক দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। এই প্রবন্ধে লেখক মহারাজ বীরবিক্রমের সঙ্গে কবির বন্ধুত্ব, ত্রিপুরায় কবির সর্বশেষ পদার্পন ও আগরতলায় উমাকান্ত অ্যাকাডেমী স্কুলে কিশোর সাহিত্যসমাজ কর্তৃক কবি সম্বর্ধনা, আগরতলায় কবিরচিত সংগীত, মহারাজের শান্তিনিকেতন দর্শন, ১৩৪৮এ আগরতলায় রবীন্দ্রজয়ন্তী দরবারে কবিকে 'ভারতভাস্কর' উপাধি প্রদান এবং শান্তিনিকেতনে কবির হাতে সেই উপাধির অভিজ্ঞানপত্র অর্পণ—ইত্যাদি নানা সম্পর্কের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তথ্যক্রমপঞ্জীটিও দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সংকলিত। ১২৮৭ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ বীরচন্দ্রের রাজত্বকাল থেকে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ত্রিপুরা ও রবীন্দ্রনাথের আনুপূর্বিক সম্পর্কের কালানুক্রমিক ও বিস্তারিত পরিচয় এতে গ্রথিত আছে, অপরাপর পূর্ববর্তী তথ্যসংগ্রাহকদের উল্লেখও যথোচিত স্থানে পাশে পাশে রক্ষিত আছে।

অতঃপর শান্তিনিকেতন আশ্রমস্মৃতি হিসাবে ছয়টি স্মৃতিচিত্র সংকলিত হয়েছে। পরিশিষ্টে আগরতলায় রচিত রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি সংগীত এবং পাঁচটি প্রবন্ধ ও ভাষণ উপস্থাপিত হয়েছে, সেই সঙ্গে ত্রিপুরা ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আরও কয়েকটি প্রবন্ধ ও ভাষণ স্থান পেয়েছে। চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে ১০৬ খানি পত্র, রবীন্দ্রনাথের লেখা ৯৫খানি ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা ১০খানি, অবশিষ্টখানি আচার্য জগদীশচন্দ্র কর্তৃক মহিম ঠাকুরকে লিখিত, তার মধ্যে ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত পত্রের সংখ্যা ৩৩। মোট ৫৯খানি চিত্র ও পাণ্ডুলিপি-চিত্রের মধ্যে ৩৬খানি ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত। সেই অপ্রকাশিত চিত্রতালিকাতেই শৈলেশ দেববর্মাকে বিজয়ার আশীর্বাদ রবীন্দ্রনাথের আঁকা একখানি ত্রিবর্ণ চিত্রও আছে। প্রচ্ছদচিত্রটি অসামান্য, ত্রিপুরার অধুনা অবলুপ্তপ্রায় রিয়াবস্ত্রের রঙীন আলোকচিত্র।

'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' আরও বিস্তৃততর আলোচনার যোগ্য পুস্তক, সন্দেহ নেই। ভূমিকায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বাঙলাসাহিত্যে ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই পুস্তকের স্বাগত করিতেছি।' আমরা এই কথারই পুনরুক্তি করতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর। হরিহর শেঠ সংকলিত এই পুস্তকখানিও বহু তথ্যের আকর। তরুণ রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরে এসেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে, ছিলেন ভাগীরথী-তীরস্থ মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে। এই অধ্যায়টি কবিজীবনে সুদূরশায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন :

> আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বস্তুত চন্দননগরও কবিজীবনের বিকাশে অত্যন্ত অনিবার্য একটি অধ্যায়। শ্রীযুক্ত শেঠ সেই সম্পর্কের ধারাটিকে তাঁর গ্রন্থে তিন ভাগে বিন্যাস করেছেন। প্রথম ভাগে কবির স্মৃতিপূত স্থান ও চন্দননগর সম্পর্কে কবির উক্তি, দ্বিতীয় ভাগে চন্দননগরে অবস্থানকালে কবিরচিত কবিতাদি, স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত কবির প্রবন্ধ, চন্দননগরে কবিসম্বর্ধনা ও প্রতিভাষণ এবং বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ। তৃতীয় ভাগে চন্দননগরবাসীর রবীন্দ্রবিষয়ক রচনাদি স্থান পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ : কালিম্পঙের দিনগুলি। লেখক শক্তিব্রত ঘোষ। রবীন্দ্রনাথের শেষজীবন অংশত কালিম্পঙে কেটেছিল, তাঁর শেষ কালিম্পঙবাসের বিবরণ বিষয়ে 'নির্বাণ' নামে সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটির নাম এখনই মনে পড়ছে। লেখক শ্রীযুক্ত ঘোষও বিভিন্ন মুদ্রিত উপাদান থেকেই তাঁর তথ্য সংগ্রহ

করেছেন, বস্তুত জোর দিয়েছেন "কবির তৎকালীন মানসিকতার বিশ্লেষণে"। সেদিক থেকে তাঁর প্রয়াসকে প্রশংসনীয় বিবেচনা করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ও মহারাষ্ট্র। প্রমথনাথ বিশী লিখিত এই বিবরণটি আভ্যন্তর অর্থেও আলোকিত। 'রবীন্দ্রনাথের কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল মহারাষ্ট্র দেশটার উপরে।' মহারাষ্ট্রের সঙ্গে কবির সর্ববিধ শারীর-সম্পর্ক বিবৃত করে পাশাপাশি 'রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতবর্ষ একটি ভূখণ্ড মাত্র নয়— একটি মহৎ আইডিয়া'— এই আইডিয়ার অনুসরণও রবীন্দ্রচেতনা থেকে তিনি উৎকলিত করেছেন :

> ভারতের যিনি মহাকবি হবেন ভারতের সমস্ত অঙ্গরাজ্য থেকে তাঁকে রস আহরণ করতে হবে, সমস্ত রাজ্য তাঁকে যোগাবে রস, সমগ্র দেশকে তাঁর করতে হবে রস-ভিত্তি।···মহারাষ্ট্রের ইতিহাস ও জীবন থেকেই যেন তিনি সবচেয়ে বেশি রস আহরণ করেছেন— মহারাষ্ট্রই যেন সবচেয়ে বেশি পুষ্ট করে তুলেছে তাঁর মানস-প্রকৃতিকে।

এই সিদ্ধান্তকে লেখক যুগপৎ বহিরঙ্গ তথ্য ও উপরোক্ত আইডিয়ার আলোকে পুষ্ট করে তুলেছেন। এই রচনাটি সৃজনী-তে সংকলিত হয়েছে।

উড়িষ্যায় রবীন্দ্রনাথ : প্রভাত মুখোপাধ্যায়। নাগরিক কমিটির 'রবীন্দ্রনাথ'এ প্রকাশিত। লেখক দেখিয়েছেন উড়িষ্যার সঙ্গে কবির আজীবন কি পরিমাণ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। পরিশেষে বলেছেন : 'কবি আজ নাই কিন্তু আধুনিক ওড়িয়া কবিতার উপর তাঁর রচনার প্রভাব সেই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।'

উত্তর-ভারতে রবীন্দ্রনাথ : মহামানবের সাগর তীরে নামক সংকলনে মুদ্রিত। এই রচনার লেখক শ্রীকালীপ্রসাদ খৈতান অবাঙালী, জানিয়েছেন : 'রবীন্দ্রনাথ যখন রাজাধিরাজরূপে ভারতের গগনে উদয় হইলেন তখন হিন্দী সাহিত্য বাঙলা সাহিত্যের আওতায় বাড়িতে লাগিল।'

শান্তিনিকেতন। প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রজীবনের অন্তর্ভৌম জগতটিকে স্থানানুক্রমিকভাবে যে তিন পর্যায়ে ভাগ করেছেন তার শেষের পর্যায়টি শান্তিনিকেতন।[১৩] শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কবির সম্পর্ক অবশ্য পূর্বপুরুষ থেকে সূচিত। অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, 'এখানে তিনি [দেবেন্দ্রনাথ] তাঁহার 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'কে পাইলেন।[১৪] রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ এখানে তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার চেয়েও বেশি এই স্থানের সঙ্গে তাঁর কর্মময় উত্তরজীবন বহুদিক থেকে আশ্লিষ্ট হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন নামে প্রমথনাথ বিশীর বইখানি অধুনা ক্লাসিকএর পর্যায়ে এসেছে। বুদ্ধদেব বসুর বইটিতে কয়দিনের মধুর আলেখ্য লিখিত আছে। তাছাড়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রকাশিত সুধীরঞ্জন দাসের বইটিও সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই বৎসরে রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের নানাদিকের কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে চিত্তরঞ্জন দেবের "শান্তিনিকেতন পরিক্রমা' রচনাটি উল্লেখযোগ্য। খণ্ডরচনাগুলির মধ্যে 'রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়' : হিমাংশুপ্রকাশ রায়, 'শান্তিনিকেতনে সংস্কার সমিতি' : পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় (গীতবিতান), 'রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও শান্তিনিকেতন' : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট), 'শান্তিনিকেতনের নৃত্য

---

১৩ যুক্তবেণী, রবীন্দ্রসরণী

১৪ ব্রহ্মবিদ্যালয়, পৃ ৭

আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান' : শান্তিদেব ঘোষ, 'বাইশে শ্রাবণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব' : পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় (দেশ), ইত্যাদি রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ

'দেশে দেশে রবীন্দ্রনাথ' নামে মিউনিসিপাল গেজেটে প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র রচনায় ভবানী মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিদেশ পর্যটন ও বিভিন্ন স্থানিক প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ বিষয়ে বৃহত্তর গ্রন্থটির নাম 'বাহিরবিশ্বে রবীন্দ্রনাথ', শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী লিখিত পূর্বমুদ্রণের পরিবর্ধিত সংস্করণ। আগের বছরে এই পর্যায়ে একটি সুন্দর নির্ভরযোগ্য বই প্রকাশিত হয়েছিল, মৈত্রেয়ী দেবী লিখিত 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ'। এই গ্রন্থে লেখিকা গীতাঞ্জলি-পর্বের পূর্বে ও পরে আমেরিকা ইংলণ্ড জার্মানি ফ্রান্স ইতালি কানাডা ও রাশিয়া ভ্রমণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপভ্রমণের বৃত্তান্ত যা কোথাও প্রকাশ পায় নি বলে কবির ক্ষোভ ছিল, সেই অনালোকিত অংশকে বিস্তর পরিশ্রমসহ লেখিকা উদ্ঘাটন করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। এই বছরে উক্ত বইয়ের ইংরেজি সংস্করণখানি দি গ্রেট ওয়াণ্ডারার নামে প্রকাশিত হয়েছে।[১৫]

রবীন্দ্রনাথ ও এশিয়া প্রসঙ্গে কোনো উল্লেখযোগ্য রচনাই চোখে পড়ে নি। তান ওয়েন লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ও চীন' অতি-ক্ষুদ্র একটি রচনা, 'মহামানবের সাগর তীরে' নামক সংকলনে মুদ্রিত হয়েছে। শক্তি দাশগুপ্ত লিখিত 'টেগোর্‌স্ এশিয়ান আউটলুক' নামক গ্রন্থে কবির শ্যামভ্রমণের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনটি মুদ্রিত হয়েছে। শ্যামভ্রমণ বিষয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচনাটির উল্লেখ ইতিপূর্বেই করেছি।

বরং প্রতীচী ও রবীন্দ্রনাথ পর্যায়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা লক্ষ করা যায়। ড. শশধর সিংহের 'বিলাতে রবীন্দ্রনাথ' রচনায় তাঁর আগেকার উদ্ঘাটিত কিছু তথ্য আভাসিত আছে, নতুন কিছু সংবাদ উল্লিখিত আছে। অমিতা রায় সংকলিত 'রুমানিয়ায় রবীন্দ্রনাথ'ও তথ্যবহুল রচনা। সাগরময় ঘোষ পশ্চিম-জার্মানি সফর করে স্টুটগার্ডএর ড. কিসেল ও কলিকাতাস্থ পশ্চিম জার্মানির ভাইস কন্সাল ড. ফিশারের সহযোগিতায় 'জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথ' নামে এক নির্ভরযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনটি রচনাই সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও আমেরিকা পর্যায়ে দুটি রচনার নাম একত্রে বলা উচিত। প্রথমটি ইউ. এস. আই. এস প্রকাশিত ও জে. এল. ডীজ লিখিত পুস্তিকাখানি। অপরটি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টীফেন হে লিখিত, দেশ ১৩৬৯ রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যায় প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছিলেন মোট পাঁচ বার, পাশ্চাত্য জগতে তাঁর কবিতা প্রথম আমেরিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল, পশ্চিমী সভ্যতার ইতিহাসে আমেরিকার মহান ভূমিকা-বিষয়ে তিনি উচ্চকণ্ঠ হয়েছিলেন, পাশ্চাত্য জগতের তমোময় দিকটি তিনি আমেরিকার মধ্যেই প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবং আরও বহু কারণে আমেরিকার সঙ্গে কবির সম্পর্ক সবিশেষ অর্থবহ। জে. এল. ডীজ লিখিত পুস্তিকাটি কৌতূহলী পাঠকের জন্য লিখিত, অনিবার্য

---

১৫ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ : 'বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ' আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থনাম।

সংবাদাদি সহযোগে সাতটি অধ্যায়ে তিনি এই বিবরণ পর্যায়বদ্ধ করেছেন। অপরপক্ষে স্টীফেন হে'র লেখাটি ভূমিকা ও সমাপ্তিসমেত সুনিবদ্ধ একটি রচনা, পূর্বাপর প্রভূত তথ্য ও প্রভূত শ্রমের স্বাক্ষর। উপরন্তু রচনাটিকে শুধুমাত্র বিবরণী বলা যায় না, লেখকের বিচার বুদ্ধি ও সমীক্ষণ ইত্যাদির দ্বারা উত্তীর্ণ। রবীন্দ্রচর্চার ইতিহাসে বিদেশবাসী লিখিত মূল্যবান সংযোজন।

এই পর্যায়েরই পরিপূরক সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ও রাশিয়া। এই প্রবাদপ্রতিম ভূখণ্ডে রবীন্দ্রনাথ এমন সময়ে পদার্পণ করেছিলেন যখন ওই ভূখণ্ড সমগ্র বিশ্বের থেকে ঈষৎ অস্পষ্ট ও পৃথক হয়ে ছিল। মস্কোর বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয় থেকে 'সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ' নামে যে বইটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে ১৯৩০এর সেই সফর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর মস্কো ভ্রমণের কার্যসূচী, সোভিয়েত সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর ন'টি সাক্ষাৎকারের স্টেনোগ্রাফিক রিপোর্ট, আত্মীয়বন্ধুদের কাছে লেখা রাশিয়া সম্পর্কে তাঁর চিঠিপত্র, বিভিন্ন সোভিয়েত সংগঠনের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ ইত্যাদি প্রচুর নথিপত্র এই বইয়ে সংগৃহীত হয়েছে। অধিকাংশ তথ্যই ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত। এই বইয়ের সঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ রায় লিখিত 'সোভিয়েটে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' নামে একটি পুস্তক-সমালোচনার নাম করা যায়। রাশিয়ায় রবীন্দ্রচর্চার পরিচয় এই সমালোচনায় লিখিত হয়েছে। সমালোচনাটি প্রবন্ধ পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত।

দ্বিতীয় পুরুষ

জনৈক সমালোচক লিখেছেন, 'রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের জীবনী গভীর পর্যালোচনা করে রবীন্দ্রনাথের সত্যবোধ যেন নিঃসংশয় হতে পেরেছিল।'[১৬] শুধু রামমোহন বিদ্যাসাগর নয় এবং শুধুমাত্র জীবনী-পর্যালোচনা করে নয়, আজীবন বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথ বারংবার নিজের জীবনবোধকে দৃঢ়মূল করে নিয়েছেন। তিনি যে ভেবেছিলেন প্রতিটি ব্যক্তিমানব এক একটি জীবনকমল, পরমপুরুষের মানসসরোবরে বিকাশোন্মুখ, সেই দ্বিতীয় পুরুষেরা তাঁর জীবনপ্রণয়নে বহুবার অত্যন্ত দায়িত্ববহ অংশ নিয়েছেন, আর ওই সম্পর্কসমূহের চিত্রাবলী তাঁর জীবনীর অন্যতম উপাদান। অবশ্য এই আলেখ্যনির্মাণে পরিবীক্ষণের আসন সংবাদের উপরে, অন্তর্গত অভিপ্রায়ের অদৃশ্য স্রোতোধারা অনুসরণ করে চলতে হয় আলোচককে। এই পর্যায়টি এই বৎসরে হয়তো স্বাভাবিকভাবেই কৃশকায়। রামমোহন-বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন একজায়গায় কয়েকটি অনুচ্ছেদ লিখেছেন,[১৭] কিন্তু তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কাউকে লিখতে দেখা যায় নি। 'রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ একই সময়ের মানুষ হয়েও পরস্পরকে এড়িয়ে গেছেন'— শিবনারাণ রায় বিষয়টির উপর এতখানি জোর দিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও এ বছরে এই বিষয়ে যা লেখা হয়েছে তা ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর একটি পুস্তিকা, লেখক জনমেজয় দাস।[১৮]

---

১৬ মহাপুরুষ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, ভবতোষ দত্ত, দেশ ১৮ আষাঢ় ১৩৬৭

১৭ রবীন্দ্রনাথ মানুষটি কেমন ছিলেন, রবীন্দ্রচর্চা।

১৮ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য-এর 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' অনেকদিন আগের লেখা: 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তি কিভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার ঔৎসুক্যবশেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পারস্পারিক সম্পর্কের এই খণ্ড ইতিহাসের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।' অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে ভবতোষ দত্ত লিখিত গ্রন্থে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি অধ্যায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই বছর রবীন্দ্রবীক্ষা নামক সঙ্কলনে এই দুই চরিত্রের মতান্তরের অধ্যায়টি প্রকাশিত হয়েছে 'ধর্ম-বিতর্ক' এই শিরোনামে। 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী' এই বিষয়ে রণজিৎকুমার সেনের সম্পাদনাটি উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয় বিষয়ে অন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছ থেকে একটি পর্যালোচনা অবশ্য পাওয়া গেছে, এবং ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিত 'টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ' নামে অনুধাবনযোগ্য একটি পুস্তক। রোমাঁ রোলাঁ গান্ধীকে আরও ভদ্র ও তুষ্ট টলস্টয় বলে আখ্যাত করেছিলেন, আলেক্স আব্‌নসন নামীয় আলোচক রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন হিন্দু টলস্টয়, এবং প্রমথনাথ বিশী গান্ধীর সঙ্গে পরিচয়ের বহুপূর্বেই রবীন্দ্রসাহিত্যে গান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাস বিশ্লেষণ করেছিলেন। ড. দাশগুপ্ত এই তিন চরিত্রের মৌল সদৃশতা নির্ধারণ করেছেন— তাঁরা অধ্যাত্মবিশ্বাসের আলোকে জীবনের সবকিছুর চরমমূল্য দিয়েছেন। বইটির প্রথমাংশ গান্ধী ও টলস্টয় বিষয়ে, অধিকাংশ গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ— তাঁদের মিল ও মতান্তর এবং সেই সূত্রে চরকা ও অসহযোগ-আন্দোলনের পটভূমিকায় এই দুই চরিত্র; শেষাংশে শিল্পধারণায় তিনজনের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করেছেন।

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও রোলাঁ সম্পর্কে আঁদ্রে মোরোয়ার রচনাটি অংশত অনুবাদ করেছেন পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্রনাথ ও তেলেগু সাহিত্য-রবি আপ্পারাও'এর ক্ষণিক সম্পর্কটি উদ্‌ঘাটন করেছেন কপিলা কাশীপতি।

রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক চিত্রগুলির কথা এইখানেই বলা চলে। 'রবীন্দ্রনাথ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' এই নামে একটি রচনা দেশ ১৩৬৭ সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, লেখক ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। এ বৎসরে কেশব চক্রবর্তী লিখিত একই নামের রচনাটি বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা একতা'য় প্রকাশিত হয়েছে, আরও প্রণালীবদ্ধ। 'রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী চীনাভবন'এর সম্পর্ক লিখেছেন সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্রনাথ ও সারস্বত সমাজ' নামে অপর-একটি রচনা লিখেছেন গোপালচন্দ্র রায়।

৩. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড

> গত পঞ্চাশ বছরের ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস বহুল পরিমাণে রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতিহাস বললে অত্যুক্তি হবে না।—হুমায়ুন কবির
>
> আর কোনও সাহিত্যে কোনও একজনের সৃষ্টিশক্তি এতখানি প্রভাবশালী হইতে দেখা যায় নাই।—মোহিতলাল মজুমদার

ড. সুকুমার সেন লিখিত পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠার এই ইতিহাসখানি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্যালোচনা। এই খণ্ডে লেখক বাঙলা সাহিত্যের অপরাপর যুগতরঙ্গমালাকে প্রাধান্য না দিয়ে সেই পরিপ্রেক্ষিতটিকে একটিমাত্র ব্যক্তিত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন করে নিয়েছেন, অর্থাৎ এই বই বাঙলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে সম্পর্কসন্ধানী আলোচনা অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টিকেই নানাদিক থেকে আলোকিত করে তুলছে, এই ইতিহাসগ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডটি সেদিক থেকে এর পরিপূরক, রবীন্দ্রনাথকে মধ্যবিন্দুতে রেখেই রবীন্দ্রকালসীমার জরীপ সেখানে করা হয়েছে।

এই বইয়ের প্রথম চোদ্দটি পরিচ্ছেদে কাব্য, পরবর্তী পাঁচটি পরিচ্ছেদে নাটক এবং পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের অপরাপর বিভাগের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অধ্যায়নামগুলিও অত্যন্ত তাৎপর্যবহ, সংকোচের বিহ্বলতা থেকে শেষ পালা পর্যন্ত ক্রমবিকাশের ধারাটি ওই নামগুলির মধ্যেও যেন

অনুসৃত।' অন্যদিক থেকে স্বগত প্রগত অধিগত ও সুগত—রবীন্দ্রকাব্যকে এই চতুষ্ক্রমে বিভক্ত করা হয়েছে। শেষ পরিচ্ছেদ 'কথার আভা' অত্যন্ত মূল্যবান একটি অধ্যায়। আমাদের কাব্যসমালোচনায় সেমান্টিক অ্যাপ্রোচ সম্ভবত ড. সেনই প্রথম শুরু করেছেন, সেইসব রচনা বিভিন্ন সংকলনে ছড়িয়ে আছে, এই বইয়ের ২৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'কাব্যসৃষ্টির প্রধান উপকরণ দুইটি, কবির মন আর কাব্যের ভাষা।' সেই মন ও মাধ্যমের অনন্যনির্ভরতা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ওই শেষ অধ্যায়, রূপক বিশ্লেষণ-সূত্রে রবীন্দ্রকাব্যের মৌল থীমগুলি যেখানে তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখিয়েছেন।

আরও অনেক রবীন্দ্রনাথানুরাগীর মতো ড. সেনও গানকে রবীন্দ্রসাহিত্যের অগ্রস্থান দিয়েছেন: 'কবি-ভাবনার ও অধ্যাত্মচিন্তার সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ ও সহজ প্রকাশ তাঁহার গানে।' চিত্রকলা সম্পর্কে দেখিয়েছেন: 'রবীন্দ্রনাথের বাণীশিল্পের ও চিত্রশিল্পের সৃষ্টিপ্রণালী বিপরীতমুখী। বাণীশিল্পে কবির প্রেরণা প্রথমে আইডিয়া হইয়া মনে আসিত, তাহার পর কলমের মুখে তাহা সম্পূর্ণরূপ ধরিত। চিত্রশিল্পে ঠিক বিপরীত।'

এককথায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব এবং শব্দ সুর ও রেখা এই ত্রিজাতীয় শিল্পের পর্যালোচনা আছে এই গ্রন্থে। সর্বোপরি তাঁর ভাষাশিল্প। তাঁর রচনায় শব্দের যাথাযথ্য বিন্দুমাত্র শিথিল হয় না এবং প্রসন্নতা কখনও বিচলিত হয় না। ইতিহাস-রচনার পক্ষে এই ভাষার ঈর্ষণীয় উপযোগিতা স্বীকার না করে উপায় নেই।

৪. রবীন্দ্রসমনুক্রমণিকা

One of the very best ways of honouring the memory of Tagore would be, to my mind, to prepare a standard concordance to his works.—Taraknath Sen.

এই পর্যায়ে পাওয়া গেছে চার খানি গ্রন্থ, এই বছরে, প্রত্যেকটিরই উদ্যম সমান শ্রদ্ধেয়। সমালোচনা সর্বদেশেই বিদগ্ধজনের পাঠ্য, কোনো কবির সমগ্র রচনাবলী অধিগত করা সুশীল ছাত্র অথবা ফললোভী গবেষকের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছেই কোষগ্রন্থের সমান আবশ্যকীয়তা, এতদিন আমাদের চিত্ততলে নিষ্ক্রিয় ছিল। এই চার খানি গ্রন্থের উদ্দেশ্যই সেদিক থেকে একপ্রকার। নির্মলেন্দু রায়চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনির্দেশিকা' মোটামুটিভাবে উত্তীর্ণ প্রয়াস। চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি -কৃত 'রবীন্দ্র-রচনা-কোষ' কিয়ৎ পরিমাণে জটিল, হীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল-কৃত 'রবীন্দ্রসাহিত্যের অভিধান' অতিরিক্ত পরিমাণে সরল, শেষটি, সোমেন্দ্রনাথ বসুর 'রবীন্দ্র-অভিধান' এই দুয়ের মধ্যবর্তী, এখনও পর্যন্ত এর 'আ' অক্ষরটি অবধি সমাপ্ত হয়েছে, এখনও পর্যন্ত এই বইটিকেই বর্তমান লেখকের সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন বলে বোধ হয়েছে। 'রবীন্দ্র-রচনা-কোষ' নানাবিধ পরিকল্পনার প্রস্তাবনায় হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু ইনডেক্স অথবা কনকর্ডেন্স রচনার পরিশীলন এতে ততখানি প্রমাণিত হয় নি। স্বরবর্ণ অবধি শেষ হয়েছে, আশা করা যায় অতঃপর গ্রন্থকারদ্বয় আরও অবহিত এবং অপ্রমাদ হবেন। হীরেন্দ্রনাথ ঘোষালের বইটি একটি সূচীপত্র মাত্র, তার বেশি নয়, এবং সেই সূচীপত্র কাজে লাগানোও কিঞ্চিৎ কষ্টকর, শেষকালে যে গ্রন্থপঞ্জীটি যুক্ত আছে তাতে হয়তো কখনও কখনও কোনো কোনো ছাত্রের সুবিধা হতে পারে।

আসলে এই জাতীয় কাজ কোনো একক প্রচেষ্টায় করে ওঠা রীতিমত দুরূহ, এর জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের

সমবেত উদ্যম প্রয়োজন, কিন্তু পৃথক পৃথক ভাবে এই-যে-গ্রন্থকারেরা এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন, তার জন্য তাঁরা পরবর্তী সকল প্রচেষ্টার নিকট ধন্যবাদার্হ থাকবেন, আপাতত তাঁদের সবারই প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

৫. অন্তর্ভৌম নিসর্গপট

বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেনে এবং অক্সিজেনে যেমন মেশে তেমনি করিয়াই মিশিয়াছে।— ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নিকট রবীন্দ্রনাথের পত্র

Henry James had a mind so fine that no idea could violate it.—T. S. Eliot.

নলিনীকান্ত গুপ্ত দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যপ্রচেষ্টা চতুর্ধারায় অভিসিঞ্চিত। উপনিষদের ধারা বা Upanishadic monism, বৈষ্ণবের দ্বৈতভাব বা Vaishnavic dualism, বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্যভোগের ধারা বা Paganism এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ বা Scientific rationalism— তাঁর মতে চারটি ধারার এই পরিচয়।[১৯]

উপনিষদের স্তন্যরসে আবাল্য লালিত কবির কর্মে ও চিন্তায় ঔপনিষদ ভাবকণিকাসমূহ পরিলিপ্ত হয়ে আছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত এ বছরের অনেকগুলি সংকলনগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবনচর্যা ও কাব্যচর্চার উৎসে স্থিত উপনিষদের ভাবধারার পর্যালোচনা করেছেন, সেই প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে: 'উপনিষদ্ ও রবীন্দ্রনাথ' 'রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ' 'রবীন্দ্রকাব্যে আমি ও তুমি' 'রবীন্দ্রনাথ ও অমরতা' 'রবীন্দ্রনাথ ও মুক্তি' ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু একটি সুরে বাঁধা, এবং একটি গ্রন্থে এই বিষয়গুলিকে সমাহৃত দেখা যায়: 'উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস'। বস্তুত এই গ্রন্থে লেখক উপনিষদ্ ও রবীন্দ্রনাথের আনুপূর্ব সম্পর্কটি বিধৃত করেছেন। সম্পর্ক বলতে স্বভাবতই 'লেনদেনের পরিমাণগত পরিসংখ্যান' বোঝেন নি, এবং নিছক সমান্তর সন্ধানে সকল শ্রম ব্যয় করেন নি। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ্ অধ্যয়ন করেছেন নিষ্ঠাভরে কিংবা ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু তার দ্বারা উৎসাহিত সকল প্রত্যাশাকে ব্যর্থ করে লেখক দেখিয়েছেন, অদ্বৈতবাদী কিংবা দ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল নেই, কবিধর্মই তাঁর স্বধর্ম, এবং অত্যন্ত তাৎপর্যবহ একটি বাক্যে 'যেদিন সচেতন হইলেন তখন উপনিষদের সঙ্গে তাঁহার গভীর মিল তাঁহাকে সচকিত করিয়া দিল' (পৃ ৬৮/৬৯),— এই কথা লিখে স্বতোৎসার ভাবনাগৌরবে তাঁর সেই আশরীর কবিধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। পরক্ষণেই, 'নিজের বিশেষ সাধনপ্রবৃত্তি দ্বারাও তিনি উপনিষদ্‌কে তাঁহার সাধনার অনুরূপ করিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন'— এই উক্তির সূত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যসাধনাকে গ্রন্থের বৃহত্তর পরিসর ছেড়ে দিয়েছেন।

তিনি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধের পিছনে ঔপনিষদ্ অদ্বয়ানুভূতি বহুল পরিমাণে প্রেরণা দিয়েছে সন্দেহ নেই, জীবনের বিভিন্ন বাঁকে তাঁকে সমাজজীবনের যোগে নতুন করে জাগ্রত করে তুলেছে, কিন্তু এই মানবতাবোধের অনেকখানিই তাঁর নিজস্ব ভাবনা। অপরপক্ষে পাশ্চাত্যের অনধ্যাত্মবাদী মানবতাবাদের সঙ্গেও এর সাদৃশ্য কম। গ্রন্থের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথের অমরতার ধারণা ও মুক্তির আদর্শ এবং 'আমি' ও 'তুমি' এই তত্ত্ব উপনিষদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হয়েছে। অতঃপর এই অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈতধারণাটি তাঁর কাব্যেতিহাসের যোগে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে।

---

১৯ রবীন্দ্রপ্রতিভার ধারা

কবি ও সাধকের অভিজ্ঞতা হৃদয়কন্দরে একেবারে পাশাপাশি উপজাত হয়, উপরন্তু আলোচ্য ব্যক্তিটি রবীন্দ্রনাথ, হয়তো সেই কারণেই তাঁর গ্রন্থে এই উভয় সত্তার আত্মবিনিময় যতদূর প্রস্ফুটিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কবিচরিত্র ততদূর প্রতিষ্ঠিত হয় নি, কিন্তু তা যদি না হয়ে থাকে সেজন্য রবীন্দ্রনাথের দায়িত্বও কম নয়। এই সুবিশ্লেষিত সুপাঠ্য গ্রন্থখানি রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে মূল্যবান একটি সংযোজন।[২০]

উপনিষদের মতো বৈষ্ণব পদাবলীও তাঁর অন্তর্ভূমির অন্যতম দৃশ্যপট। তার কাব্যভাষা ও তার আন্তরসংরাগ বহুবিচিত্রভাবে রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে আছে। বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলীর স্থান' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, 'তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী উপনিষদ্ ও বৈষ্ণবধর্মের সামঞ্জস্যমূলক সংহতির ফল'। লেখক তাঁর এই বিস্তারিত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের উপর বৈষ্ণব প্রভাব সন্ধানের প্রচেষ্টায় বিরত থেকেছেন; কারণ হিসাবে জানিয়েছেন, 'মহাজনগণের পদাবলীর কাব্যাংশ রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের ভজনপ্রণালীকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইতে পারেন নাই।' কিন্তু '১২৮২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তত ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে পদাবলীর রস আস্বাদনের কিরূপ পরিচয় আছে তাহা ঐতিহাসিক কালানুক্রম অনুসারে আটটি অধ্যায়ে' তিনি বিচার করেছেন। তন্মধ্যে ১২৮৭ থেকে ১৩১২ পর্যন্ত পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব ও প্রভাবমুক্তির প্রয়াস, ১৩১৩ থেকে ১৩২১ পর্যন্ত 'তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সুবর্ণময় যুগ'এ পদাবলীর আন্তরিক অনুপ্রেরণা এবং সেখান থেকে ১৩৪৭ পর্যন্ত পদাবলীর প্রভাব বর্জনের প্রবণতা। আট অধ্যায় যথাক্রমে: পদাবলীর পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথ, পদকর্তা রবীন্দ্রনাথ, পদাবলীর মাধুর্য বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ, পদাবলীর সংকলয়িতা রবীন্দ্রনাথ, পদ-উদ্ধৃতি প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ, প্রাক্-গীতাঞ্জলি যুগের কাব্যে পদাবলীর প্রভাব, গীতাঞ্জলি-গীতালিতে পদাবলীর অপ্রত্যক্ষ প্রভাব এবং পদাবলীর বিলীয়মান প্রভাব। লেখকের আলোচনা সর্বত্রই তথ্যসচেতন ও জীবনীসন্নদ্ধ। তাঁর জীবনের কয়েকটি মাহেন্দ্রমুহূর্তকে লেখক বৈষ্ণবসাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। যেমন, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে—'এই শোক হইতে মুক্ত হইবার জন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ পদাবলী-সাহিত্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি সংকলন করিতে প্রবৃত্ত হন' (পৃ ৪৪)। 'গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালির যুগে তাঁর বৈষ্ণবোচিত আকূতি আর্তি ও নম্রতা, শব্দান্তরে— দৈন্যবোধ ও

---

২০ আসলে রবীন্দ্রনাথের অবিচল একটি চরিত্র তাঁকে প্রতিমুহূর্তেই এবম্বিধ প্রমাণিত করে তোলে। রাধাকৃষ্ণণ যখন রবীন্দ্রদর্শন লিখছিলেন, তখন স্পষ্টতই দেখিয়েছিলেন একজন বেদান্তিন, a thinker who draws his inspiration from the Upanishads. ড. ক্ষুদিরাম দাশ সম্প্রতিকালে একইভাবে লক্ষ্য করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ কবিসত্তা তার কবিস্বভাব বজায় রেখেও ধীরে ধীরে দার্শনিক সত্তায় লীন হয়ে গেছে।' রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়, পৃ ৩৪০

সমীরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শারদোৎসব দর্শন', 'গুরুদর্শন' ইত্যাদি গ্রন্থে উক্ত নাটকেরও অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব পরিস্ফুট করেছেন। 'তিনি ভারতীয় 'ক্লাসিকাল' ঐতিহ্যের কবিপরম্পরার অন্তর্ভুক্ত কবি।'— অন্নদাশঙ্কর রায়। 'ক্লাসিক আলোকে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য ভক্ত পুরাণবিৎএর আসন থেকে বিবিধ পুরাণের সাক্ষ্যকে রবীন্দ্রপংক্তিসমূহের পাশে উদ্ধার করে গ্রন্থনামের সার্থকতা প্রতিপালন করেছেন।

এই সূত্রে আর দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ কর্তব্য। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকটি মন্ত্র' 'উপনিষদের মন্ত্ররাজি কিভাবে কবিচিত্তকে প্রভাবিত করিয়াছিল' দশটি মন্ত্রসহ তার আলোচনা, পশ্চিমবঙ্গ অধ্যাপক সমিতির সঙ্কলনে প্রকাশিত। ক্ষিতিমোহন সেনের 'রবীন্দ্রনাথের বেদমন্ত্রানুবাদ' রবীন্দ্রনাথ কৃত কয়েকটি অনুবাদসহ আলোচনা। সৃজনীতে সঙ্কলিত।

আত্মসমর্পণ তারও— পিছনে তেমনই কয়েকটি শোক, তাঁর পুত্র শমীন্দ্রনাথ, জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ও আবাল্যসুহৃদ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের অকালমৃত্যু' (৮২-৯২ পৃ)।

এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক ১২৯২ সালে সম্পাদিত পদরত্নাবলীর পদগুলির যে পাঠ অষ্টাদশ শতাব্দীর সংকলনগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় মূলত সেই পাঠ ও পাঠান্তরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-ধৃত পাঠ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আলোচনা ও এই সংযোজনী-সহ সমগ্র গ্রন্থটি লেখকের বিপুল নিষ্ঠা শ্রম ও সাফল্যের পরিচায়ক।

অতঃপর কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অনালোকিত বিষয়-সম্পর্কে আলোচনার উল্লেখ করা কর্তব্য। 'সুফীতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথ' এমনই একটি বিষয়, রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প-এ সংকলিত। লেখক হরেন্দ্রচন্দ্র পাল। সুফীধর্মের মূলতত্ত্ব বৈদান্তিক তত্ত্বের তুল্য। জীবনদেবতা কল্পনার মধ্যে সুফীমতের প্রভাব বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনাও হয়েছে, যদিও সে-সব আলোচনায় মূলত নঙর্থই প্রকটিত। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক প্রথমত সুফীসাধনার বিশেষত্ব ও পরিশেষে সেই আলোকে 'তাসের দেশ' নাটিকাটির পর্যালোচনা করেছেন। ত্রিপুরাশঙ্কর সেন লিখিত এইরূপ আরেকটি রচনা। গীতা রবীন্দ্রনাথকে কোনো দিনই তেমন একটা প্রেরণা দান করে নি, রবীন্দ্রব্যাখ্যাতাদের মতামত এইরকম। শ্রীযুক্ত সেন দেখিয়েছেন, গীতার ভিতর রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সাধনার সমন্বয়ের আদর্শটি খুঁজে পেয়েছেন, 'গীতার সামঞ্জস্যের আদর্শ ও নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শের ভিতরেই তিনি ভারতের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেয়েছেন।' এই প্রবন্ধটি 'রবীন্দ্রপ্রবাহ' সংকলনের অন্তর্গত।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রাগাধুনিক ভারতবর্ষ বিষয়ে আরও কয়েকটি মূল্যবান রচনা এ বৎসরে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' 'রবীন্দ্রদৃষ্টিতে অশোক' 'রবীন্দ্রসাহিত্যে অতীত ভারত' 'রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কালিদাস' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সংকলনে মুদ্রিত হয়েছে। কালিদাসকে সুকুমার সেন বলেছেন রবীন্দ্রনাথের চৈত্যগুরু। প্রবোধচন্দ্র সেন দেখিয়েছেন 'আমরা আজ রবীন্দ্র-সৃষ্ট কালিদাসলোকের উত্তরাধিকারী।' অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য' এ বিষয়ে আর একটি মূল্যবান পুরোনো রচনা, রবীন্দ্রপ্রবাহে পুনর্মুদ্রিত।

প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করেছেন, ত্রিপুরাশঙ্কর সেন লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচেতনা' প্রবন্ধে এ-ই প্রতিপাদ্য।[২১] নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় এর নাম ঐতিহ্যসাধনা, তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় ঐতিহ্য'-এ লিখেছেন, ভারত ঐতিহ্যের সামগ্রিক রূপের সন্ধান রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম করেছিলেন, 'ভারত-সংস্কৃতির সকল অর্থগর্ভ পর্বের ঘনিষ্ঠ পরিচয় গ্রহণ করেছিলেন, এবং জীবনের প্রায় সকল স্তরের।'[২২] প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে এ-ই হল ভারতবর্ষের বিশ্বতোমুখী রূপ, যা ইতিহাসগত ভূগোলগত ও আদর্শগত এই ত্রিবিধ উপায়ে প্রকাশিত। ভারত-মহাপথের গৌরবিত পথিকটির পরিচয় পেতে হলে ভারতবর্ষের এই ব্যাপক রূপটিকেও প্রত্যক্ষভাবে

২১ নাগরিক কমিটি-র রবীন্দ্রনাথ

২২ রবীন্দ্রায়ণ ২

উপলব্ধি করা চাই।[২৩] দিলীপকুমার বিশ্বাস তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তা'য় ভারতীয় সভ্যতার স্বতন্ত্র প্রকৃতির উপর রবীন্দ্রনাথের জোর লক্ষ্য করেছেন।[২৪]

এতদ্ব্যতীত নাগরিক কমিটির সংকলনে ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর 'ভারতীয় সাধনার প্রমূর্ত বিগ্রহ রবীন্দ্রনাথ', ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটে অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রচিন্তায় ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মবাদ' ইত্যাদি রচনা উল্লেখযোগ্য।

এইসব কিছু মিলে তাঁর স্বতন্ত্র একটি দর্শনের রূপ ফুটে উঠেছে যা তাঁর কাব্যদর্শনের পাশে পৃথকভাবে আলোচ্য, অথবা যা তাঁর মূল মশাল যেখান থেকে কক্ষে কক্ষে দীপ জ্বালিয়ে নেওয়া হয়। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের দর্শন বুঝিতে হইলে তাঁহার কাব্য বুঝিতে হইবে, আবার তাঁহার কাব্য বুঝিতে হইলে তাঁহার দর্শনের সন্ধান লইতে হইবে।' শুধু তাই নয়, শিক্ষা-রাজনীতি-সমাজনীতি ইত্যাদি সর্ববিষয়ক মতামতে তাঁর এই মৌল দর্শনের সূত্রগুলি প্রতিফলিত হয়েছে।

অপিচ, ভারতীয় দর্শনমহাসভার সভাপতি হিসাবে, হির্বার্ট বক্তৃতামালায় এবং বিভিন্ন সমালোচকের নির্দেশে দার্শনিকমহলেও রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ স্থান আছে, যদিও তাঁর মন কখনও থিয়োরিলালিত নয়, 'ফিলজফির সিস্টেমগুলি' সম্বন্ধে তাঁর বরাবরের ভীতি, এবং বারংবার তিনি জানিয়েছেন, 'my religion is a poet's religion; all that I feel about it is from vision and not from knowledge.'[২৫]

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে তাঁর কাব্য ও বিবিধ দর্শনগন্ধী নিবন্ধ পর্যালোচনা করে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক সত্তার উপর সমূহ আলোকপাত করেছেন।[২৬] এ বিষয়ে পূর্ববর্তী একটি বইয়ের পুনর্মুদ্রণ এ বৎসর লক্ষ্য করা গেল, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রদর্শন'। রবীন্দ্রনাথের সর্বেশ্বর-বাদ, ব্যক্তি ও বিশ্বের লীলান্বেষী সম্পর্ক, সত্যোপলব্ধি ও মানুষের আচরণীয় ধর্ম বিষয়ে রবীন্দ্রসিদ্ধান্ত এবং দার্শনিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে মনন ও অনুভূতিমার্গের মধ্যে শেষোক্তের প্রতি কবির পক্ষপাত ইত্যাদি সহজ ভাষায় ওই বইয়ে আলোচিত আছে। আর-একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, 'রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন' : সরোজকুমার দাস : 'রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন-আলোচনা-প্রসঙ্গে যে জীবন-পুরঃসর-প্রবৃত্তি বা জীবন-যোনি-প্রযত্নের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কবিগুরুর সমর্থনসূচক বা আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক উক্তিসমূহ' উদ্ধৃত করে তিনি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন।[২৭]

এই অধ্যায়ের সর্বশেষ পরিচ্ছেদটি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনা-বিষয়ক। তাঁর সুগভীর আধ্যাত্মচেতনার দেহলীদুয়ারে দার্শনিক সূত্রাদির অনুপ্রেরণা অপেক্ষা প্রকৃতির পরামর্শ কম নেই, এই বিষয়ে অজস্র আলোচনাদির মধ্য থেকে অমিয়কুমার সেন লিখিত 'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ' বইটি নির্বাচন করে

---

২৩ অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ

২৪ রবীন্দ্রায়ণ ২

২৫ দি রিলিজিয়ন অব অ্যান আর্টিস্ট, পৃ ১২

২৬ রবীন্দ্রায়ণ ২

২৭ অধ্যাপক সমিতি-র রবীন্দ্রনাথ

নেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনা সমালোচকগণের পাণ্ডিত্যে অনেকাংশেই উপনিষদের অদ্বয়তত্ত্বের দ্বারা সমাবৃত হয়ে গেছে।[২৮] অমিয়বাবু দেখেছেন এমনকি গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-যুগেও 'অধ্যাত্ম-অনুভূতি অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবল হয়ে প্রকৃতিপ্রেমের অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে নি। এমন কি অনেক কবিতায় প্রকৃতিপ্রেমের অনুভূতিই প্রবল, অধ্যাত্ম অনুভূতি তার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন থেকে মৃদু সৌরভের মতো সমস্ত কবিতাটির উপর গভীরতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।' লেখক শেষ পর্যন্ত প্রতিপাদন করেছেন, কবির মানবপ্রেম ও ভগবদ্ভক্তিও উপজাত হয়েছে প্রকৃতির মধ্যস্থতায়। এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ আরও ঢের ঘনিষ্ঠজনের মতো আমাদের নিকটতর হয়ে ওঠেন, প্রায় পনেরো বছর পরেও এই নূতন সংস্করণে বইটির উজ্জ্বলতা তিলার্ধও নিষ্প্রভ হয় নি।[২৯]

৬. এক ও বহুধাবিচিত্র

'প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের কীর্তি তাঁর জীবন।' অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' (রবীন্দ্রবীক্ষা) প্রবন্ধে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি তাঁর অপরাপর কাব্যের মতো করে তাঁর জীবনকালকেও ছন্দে মিলে উপমায় ব্যঞ্জনায় কল্পনার প্রসারে ও অনুভূতির গভীরতায় একখানি গীতিকাব্যের ঐক্য দিয়েছেন।' আসলে রবীন্দ্রনাথের শিল্পরূপের চেয়ে তাঁর মানবরূপের আকর্ষণও বিন্দুমাত্র কম নয়, তাঁকে বলা হয়েছে বিশ্বমানব, অর্থাৎ মানবতার সমূহ বিস্তার তাঁর ব্যক্তিত্বে সহজলভ্য। সেই সূত্রে রবীন্দ্রপ্রতিভার সর্বব্যাপকতা বৈচিত্র্য কিংবা বৈশিষ্ট্য বিষয়ে এ বছরে অগণিত প্রবন্ধ রচিত হয়েছে,

---

২৮ দেশ রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা

২৯ রবীন্দ্রমানসের অন্তর্ভূমিতে বিভিন্ন কবিচিত্তের প্রতিফলন বিষয়ে প্রমথনাথ বিশীই সম্ভবত প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে 'যেসব কবিদের প্রভাব রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্লোক পর্যন্ত পৌঁছেছে তাঁরা হলেন বৈষ্ণব কবি, শেলী ও কালিদাস।' এই সূত্রে 'দুই কবি' শীর্ষক একটি সমান্তরসন্ধানের পরিকল্পনা মনে আসে। অধ্যাপক তারকনাথ সেন অবশ্য এর অসারতা অতি নিপুণভাবে প্রতিপাদন করেছেন। কিন্তু এই প্রবণতার উদাহরণ অজস্র, তার থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস বিষয়ে ইতিপূর্বে গবেষণা পর্যন্ত হয়ে গেছে। জয়দেব ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বিশদভাবে সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংক্ষেপে নলিনীকান্ত গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ও শেলি বিষয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও গ্যেটে বিষয়ে শিবনারায়ণ রায় ইত্যাদির আলোচনা উল্লেখ করা যায়। 'রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ' নামে একটি বই লিখেছেন অজয়কুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ ও এডগার অ্যালান পো নামে একটি প্রবন্ধ সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসাহিত্যের নবরাগ' নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে। দুটি আলোচনাই সাম্প্রতিক, এবং পাঠকের প্রত্যাশাকে সমানভাবে ক্ষুণ্ণ করে। ওয়ার্ডস্বার্থের তুলনায় সেই প্রিলিউড-এর পংক্তিকতিপয় ও জীবনস্মৃতির অংশগত সাদৃশ্য, কিছু কবিতার চকিত সাদৃশ্য নির্ধারণ এবং 'প্রাচীন ভারতের মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথের মত ওয়ার্ডস্বার্থও এই বিচিত্র বিপরীত শান্তিসংঘাতপূর্ণ জগতের মধ্যে একটি পরম সুরসঙ্গতি একটি পরম শান্তিসম্পদের সন্ধান পেয়েছেন' ইত্যাদি উপসংহার। পো-সূত্রে লেখক দুজনকেই সৌন্দর্যের কবি ও গীতিধর্মী কবি হিসাবে মিলিয়েছেন, লিজিয়া ও নিশীথে ইত্যাদি গল্পের ভাবসাদৃশ্য দেখিয়েছেন, সর্বোপরি ইন্দিরা দেবীর রবীন্দ্রস্মৃতি উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথের উপর জোর প্রভাব নিষ্পাদন করেছেন, কিন্তু যথার্থ সমান্তরের অন্তর্গূঢ় যোগজাল রচিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ও হাইনে নামে অরুণকুমার সরকারের একটি ক্ষুদ্র লেখা দেশ-এ প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ও হিমেনেথ এই সম্পর্কটি গারথিয়েলা পি. নেমেস এর লেখা, হিমেনেথ-দম্পতির পূর্বরাগ মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ অগোচরে প্রণয়দেবতার কার্য সম্পাদন করেছিলেন এবং হিমেনেথ-এর কাব্যে রবীন্দ্রস্পর্শ ইত্যাদি বিষয়ক এই রচনাটি সেণ্টিনারী ভল্যুম-এর, অনূদিত অবস্থায় প্রবন্ধ পত্রিকা বৈশাখ ১৩৬৯ এ পাওয়া যায়।

অজস্র পত্রপত্রিকায়, এবং প্রায় প্রতিটি সংকলন-গ্রন্থেরই একাংশ এই দিকে নিয়োজিত, স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে লেখকেরা এই জাতীয় রচনাগুলিকে প্রায়শই যথাসাধ্য সম্পন্ন করে তুলেছেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁকে বলেছেন 'সহস্রমনা'[৩০] কবি। মুল্‌ক্ রাজ আনন্দ্'র 'রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য'[৩১] অশোকবিজয় রাহার 'রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বরূপ', সোমনাথ মৈত্রের 'রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈচিত্র্য' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি এই জাতীয় রচনার মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয়। আরও বিশদভাবে রবীন্দ্রচরিত্রের সার্বভৌম রেখালেখ্য রচিত হয়েছে কয়েকখানি গ্রন্থে। নলিনীকান্ত গুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ' ষোলটি বিভিন্নবিষয়ক রচনার সংকলন ও রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈচিত্র্যের নির্দেশক। নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্রচর্চার ভূমিকা' রবীন্দ্রজীবন রবীন্দ্রসাহিত্য রবীন্দ্রমনন ও রবীন্দ্রচর্চা— এই চার অধ্যায়ে বিন্যস্ত। তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে কবির দর্শন ধর্ম রাজনীতি সমাজ শিক্ষা সাহিত্য ও শিল্পকলার দিক্‌রেখা বর্ণিত হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়টি মাত্র আলোচনা। এবং সরল আলোচনা অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসমীক্ষা'ও রবীন্দ্রপ্রতিভার এই বহুমুখিতার পরিচয়বাহী, রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিন্তা রাষ্ট্রচিন্তা ধর্মচিন্তা মঞ্চচিন্তা ও সমাজচিন্তা— এইভাবে সাজানো, সূচনায় উনিশ শতক ও বিশ শতকীয় পরিপ্রেক্ষিতটি কাব্যালোচনার সুবিধার্থে লেখক অঙ্কন করেছেন।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সর্বমানবত্ব অত্যন্ত দূরদর্শিতা সহকারে, কল্পনাশীল সাহিত্যকারের উপযুক্ত লেখনীতে অঙ্কিত। 'রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ' 'শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ' 'মানবিকবাদ ও রবীন্দ্রনাথ' 'পাশ্চাত্য প্রভাব ও রবীন্দ্রনাথ' 'সর্বমানব ও রবীন্দ্রনাথ', 'রেনেসাঁস ও রবীন্দ্রনাথ' 'আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথ' 'সভ্যতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি প্রবন্ধের পাশে কয়েকটি লঘু মেজাজের স্বল্পায়তন আলোচনা তার মধ্যে কয়েকটি চিঠিপত্র এই বইয়ে স্থান পেয়েছে। প্রতিটি রচনাই আধুনিকতম সমস্যা সংশয় ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্পর্শে প্রাণোজ্জ্বল।

রবীন্দ্রনাথের মানবরূপ প্রধানত প্রতিফলিত তাঁর সমাজ রাষ্ট্র ও শিক্ষা -চিন্তায়। রাষ্ট্রনীতি ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এ বৎসরের সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত বইটির নাম 'ভারতে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ', লেখক নেপাল মজুমদার। এই বই তাঁর প্রস্তাবিত সুদীর্ঘ আলোচনার প্রথম ভাগ, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবন থেকে ১৯১৮ সাল 'অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানকাল পর্যন্ত তদানীন্তন বাস্তব অবস্থার পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এবং তৎকালীন নেতৃবৃন্দ ও চিন্তানায়কগণের রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যাবলীর বিস্তারিত পরিচয়' এতে লেখা হয়েছে। এই সূত্রে বাঙলাদেশে প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদের জন্ম থেকে শুরু করে কংগ্রেসের জন্ম, স্বদেশী আন্দোলন, শিক্ষাসমস্যা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন করা হয়েছে। মহাযুদ্ধের আগে ও মহাযুদ্ধকালে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী, অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক অধ্যায়গুলি কৌতূহলোদ্দীপক। আগাগোড়া লেখকের শ্রম ও নিষ্ঠা প্রশংসাযোগ্য।

এই বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তায়তন বইটি নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের 'মুক্তিসাধনায় রবীন্দ্রনাথ', রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম স্বজাতিপ্রীতি ও রাজনীতিক মতামত সম্বন্ধে পাঁচটি প্রবন্ধের সংকলন। কিন্তু ক্রমান্বয় ইতিহাসটি এখানেও আদৌ অস্বীকার করা হয় নি, 'প্রাক্-স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ' 'স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ' 'রবীন্দ্রনাথের

---

৩০ তু. 'the greatest genius, that perhaps human nature has yet produced, our *myriad-minded* Shakespeare'. কোলরিজ, বায়োগ্রাফিয়া, লিটারারিয়া, ১৫শ অধ্যায়

৩১ ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটেও এই প্রবন্ধ মুদ্রিত

স্বাদেশিকতার আদর্শ' 'রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীত' ও 'স্বদেশী যুগোত্তর কালের রবীন্দ্রনাথ'— এইভাবে বইটির বিন্যাসসাধন করা হয়েছে। ভূমিকায় সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র উদ্ধার করেছেন, 'দেশের জন্য আমার যত কিছু ভাবনা, সুদূর বাল্যকাল থেকে যা আমার মনকে অবিরত আচ্ছন্ন করেছিল. . আমি বরাবরই সেই ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছি কাজে. এর জন্য সর্বস্ব পণ করেছিলাম।. .এক মুহূর্ত নিশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না।. .দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই ইতিহাস কেউ লিখে রাখে নি। আজ চেষ্টা করলেও তোমরা সে নষ্ট ইতিহাস উদ্ধার করতে পারবে না।' ব্যক্তিগত যোগবশতই সম্ভবত নগেন্দ্রকুমার গুহরায় সেই নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের যোগ্যতম ব্যক্তি, অভিজ্ঞতা ও গবেষণার সহযোগে রবীন্দ্রনাথের সেই স্বাজাতিকতা বা সার্বজাতিকতার মূর্তিটি নির্মাণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই মর্ত্যরূপ আরও কয়েকটি খণ্ড-রচনায় নিপুণভাবে প্রকটিত হয়েছে। সুশোভন সরকারের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার নবজাগরণ' প্রবন্ধটির উল্লেখ আগেই করেছি, বিদগ্ধমহলে প্রচুর মন্দখ্যাতি অর্জন করেছে। একই লেখকের 'রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি'র মধ্যেও প্রচুর চিন্তণীয় সূত্র ছিল। 'প্রগতিবাদী মহলে রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে' কিন্তু লেখক দেখেছেন প্রগতিবাদী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের স্থান আরও তাৎপর্যবহ, এমন কি 'স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে।' প্রয়োজনের সময় রবীন্দ্রনাথ আর্টের বিচ্যুত দ্বীপে নিজেকে আলাদা করে রাখেন নি, 'গণজাগরণের বিরোধীরূপে তাঁকে কল্পনা করা শক্ত।' 'সেদিক থেকে ভারতের রাষ্ট্রনেতা মহাত্মা গান্ধীর চাইতে তাঁকে অনেক অগ্রসর মনে হয়।' 'রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি' নামক রচনায় ধূর্জটিপ্রসাদ স্পষ্টতই বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী মনোযোগ দিয়ে পড়ে আমার প্রতীতি জন্মেছে যে সাহিত্য, সংগীত, অন্যান্য চারুকলা কিংবা দর্শনের গণ্ডীতে তাঁকে আবদ্ধ রাখা অন্যায়। এতে তাঁর সম্পূর্ণতাকে এবং নিজেদের বিচারবুদ্ধিকে খর্ব করা হয়। সমাজ, রাজনীতি, প্রভৃতি কলাবহির্ভূত বিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত ভারতবর্ষকে আরও স্পষ্টভাবে জানাবার সময় এসেছে।' এই রচনা 'রবীন্দ্রনাথ : উত্তরপক্ষ' সংকলনে পুনর্মুদ্রিত।

কিন্তু সে কথা স্পষ্টভাবে জানাবার সময়ে সীমা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকা প্রয়োজন, নচেৎ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই বিপন্ন করা হয়, তাঁর মৌল কবিসত্তা সহজেই আচ্ছন্ন হয়ে যায়, এই দুই সত্তাকে সরলরেখায় বিভাজ্য মনে করে নিতে পারেন। অনেকে রবীন্দ্রনাথকে হিউম্যানিস্ট (মানবতাবাদের প্রসার এই শব্দের দ্বারা সংকোচন করতে চাই) প্রমাণ করেই তাঁকে একমাত্র সম্মানযোগ্যবিবেচনা করে থাকেন, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার' গ্রন্থখানি এর অধুনালিখিত একটি সরল দৃষ্টান্ত। অপিচ, অরবিন্দ পোদ্দার লিখিত 'রবীন্দ্রহিউম্যানিজ্‌ম্' (রবীন্দ্রনাথ : উত্তরপক্ষ) এবং 'রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তা' (ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট) অনেক বিশ্বাস্য ও সযৌক্তিক রচনা, সন্দেহ নেই। সদৃশমনা আরও কয়েকটি রচনা, গোপাল হালদারের 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগচেতনা' (রবীন্দ্রায়ণ) ও 'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা' এবং চিন্মোহন সেহানবিশের 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা' (রবীন্দ্রনাথ : গোপাল হালদার)।

'রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা' নামে আরও দুটি রচনা লক্ষ করা যায়, প্রথমটির লেখক মোহিত মৈত্র (ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট), দ্বিতীয়টির অমিয় চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতার যে

মঙ্গলময় বাণী বিশ্বভারতীর মধ্যে রূপপরিগ্রহ করেছিল তা-ই শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর আলোচ্য। ডক্টর শচীন সেন -কৃত রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিবাদে একদা রবীন্দ্রনাথকে 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' লিপিবদ্ধ করতে হয়েছিল। 'রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ রবি-প্রদক্ষিণ সংকলনের এবং 'রাষ্ট্র বনাম সমাজ' নামে আরেকটি রবীন্দ্রায়ণ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজনীতিক রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি অনুধাবনযোগ্য বিশ্লেষণ— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনীতিক : হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প), রবীন্দ্ররচনায় মুক্তির রাষ্ট্রদর্শন : জ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত (রবীন্দ্রায়ণ), রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ : নীলিনা আব্রাহাম (রবীন্দ্রবীক্ষা)। রমেশচন্দ্র মজুমদার 'রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভারত-ইতিহাস-ব্যাখ্যার বিচার করেছেন এবং ভারতবর্ষের নবীন জাতীয়তাবাদের বিষয়ে রবীন্দ্রধারণার সমর্থন করেছেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বর্ণনা— রবীন্দ্রনাথ ও রাজনীতি : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (অধ্যাপক-সমিতির রবীন্দ্রনাথ), রবীন্দ্রনাথ ও স্বদেশী আন্দোলন : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট), ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ও অর্থনীতিক চিন্তা বিষয়ে প্রিয়তোষ মৈত্রেয় লিখিত কয়েকটি আলোচনা ইতস্তত লক্ষ্য করা যায়। ভবতোষ দত্ত লিখিত 'আর্থিক উন্নতি ও রবীন্দ্রনাথ' রবীন্দ্রায়ণে সংকলিত। কম্যুনিটি প্রজেক্ট ও সমবায় প্রথা সম্পর্কে আমাদের সাম্প্রতিক মনস্কতার পূর্বলিখন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন।[৩২]

বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মধ্যে বাঙলাদেশের শিক্ষা-আন্দোলনের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু প্লেটো থেকে ড্যুই পর্যন্ত শিক্ষাধারণার ইতিহাসেও রবীন্দ্রনাথের একটি সুনিবদ্ধ স্থান নির্ধারণ করা যায়। অশোক মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয় শিক্ষাসমস্যা' নামক রচনায় অধ্যাপক ফিণ্ড্‌লে'র একটি উক্তি উদ্ধার করেছেন : There are two great men in our epoch, John Dewey in the West and Rabindranath Tagore in the East, whose wisdom illumines the general mind.[৩৩] ড্যুই-র প্রগতিবাদী শিক্ষাদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের সাম্য ও বৈষম্যের সূত্রগুলি একটি কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনার বিষয় হতে পারে।

কারা শিক্ষণীয়, কি শিক্ষণীয়, কেমন করে শেখানো কর্তব্য, এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য লক্ষ ও সার্থকতা— এই সবই রবীন্দ্রশিক্ষাচিন্তার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ফাঁকগুলি তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন ও ভরাবার চেষ্টা করেছিলেন, শান্তিনিকেতনের শিক্ষাশ্রমটিকে ঘিরে রবীন্দ্রাদর্শ পল্লবিত হয়ে উঠতে চেয়েছিল। শিক্ষা বলতে তিনি বুঝতেন সর্বৈব বিকাশ, সুধীরচন্দ্র কর উল্লেখ করেছেন, তাঁর আশ্রমের মুখপত্র পুরোনো কালের 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকাতে নিয়মিতভাবে সর্বদেশীয় শিক্ষারীতি আলোচিত হত। সুধীজনস্বীকৃত প্রণালীমাত্রেই কবি হাতে কলমে নিজের বিদ্যালয়ে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সদাসচেষ্ট থাকতেন। প্রথমে দেশীয় আধুনিক স্কুল-কলেজের ধারা ছেড়ে গেলেন ঐতিহাশ্রয়ী ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পথে, শেষে নিলেন বিশ্বভারতীর পথ, যেখানে বিশ্ব ও ভারত পাশাপাশি সমপরিমাণে উপস্থিত।

---

৩২ রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যরূপ আরও যে সব গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে তার মধ্যে অমল হোম লিখিত 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ প্রধান। সুবোধচন্দ্র প্রামানিকের 'রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা' নামে আর একখানি বইয়ের উল্লেখ করা যায়।

৩৩ একতা, রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা ১৩৬৮

আপাতত এ বৎসরের রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শ বিষয়ক আলোচনাগুলির উল্লেখ করা যাক। প্রতিভা গুপ্তা লিখেছেন 'শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ' নামে বই, রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের ব্যবহারাভিলাষে সমুৎসুক, শুধু তাই নয়: 'যতদিন না কবির বিরাট সাহিত্যের মধ্যে তাঁহার যে শিক্ষাদর্শন ছড়াইয়া আছে তাহা আমরা সংগ্রহ করিয়া এবং প্রয়োগক্ষেত্রে তাহার নিরূপণ করিয়া তাঁহাকে শিক্ষাবিদ্ ও কর্মযোগীরূপে প্রণাম জানাই, ততদিন পর্যন্ত গুরুদেবের জীবনকাহিনী পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ হইবে না।' এই জাতীয় গ্রন্থে যে বিপদ আসে, রবীন্দ্রসাহিত্যকে একমাত্র উপযোগিতামূল্যে বিচার করা, লেখিকা সেই বিপদ এড়াতে পারেন নি। কিন্তু এই বইয়ের আবেদনও পুরোপুরি ব্যবহারিক।

যেসব খণ্ডরচনা বিভিন্ন সংকলনে ছড়ানো: রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শনে প্রকৃতি: হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্রপ্রবাহ); শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ: চিত্রিতা দেবী; শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ: প্রমথ চৌধুরী; রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ: সুনীলচন্দ্র সরকার (সৃজনী); রবীন্দ্র-শিক্ষানীতির মূলকথা: হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (রবীন্দ্রায়ণ); জাতীয় শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের স্থান: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (রবি-প্রদক্ষিণ); ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শ: সুধীরচন্দ্র রায় (অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ)। এর মধ্যে শেষোক্তটি বিশেষ বিস্তারিত সুলিখিত, ও মূল্যবান রচনা।

প্রবোধচন্দ্র সেনের 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা' আর-একটি মূল্যবান সংযোজন। সাতটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থের অন্তর্গত: বাঙলা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী প্রসঙ্গ, শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাসমস্যা, শিক্ষার মুক্তি, ভাষার মুক্তি ও সাহিত্যের মুক্তি। 'শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্য পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। জাতীয় চিত্তের প্রাণশক্তি নির্ভর করে এই তিনের মুক্ত প্রকাশের উপরে। এই ত্রিবিধ মুক্তির যোগে কিভাবে জাতীয় জীবন নবশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাসূত্র অবলম্বনে' তা-ই এই পুস্তকে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান শিক্ষাসমস্যার দিনে 'বাঙলার বিশেষ কর্তব্য বা দায়িত্ব কি' গ্রন্থকার পরোক্ষভাবে তা-ও আভাসিত করতে চেয়েছেন, সেদিক থেকে এই গ্রন্থের কালোপযোগিতা অসংশয়িত। 'বাঙলা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সূচনায় ও গ্রন্থের আরম্ভেই— শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ— এই রবীন্দ্রোক্তি গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত পুনরাবৃত্ত হয়েছে, এমনকি গ্রন্থশেষে 'সাহিত্যের মুক্তি' প্রবন্ধেরও অন্তিমে 'এই শুভ মুহূর্তে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে বিদেশী খনির তিমির গর্ভ থেকে' এই কথা লিখে সূত্রটিকে সজীব রেখেছেন। সমস্ত আলোচনাতেই রবীন্দ্রাদর্শের পাশাপাশি এতদ্দেশীয় অপরাপর শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তাবিদের ধারণা স্থাপিত হয়ে আলোচনাগুলিকে পুষ্ট করে তুলেছে।

এ বিষয়ে অপর-একটি প্রবন্ধ দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞানশিক্ষা' (রবীন্দ্রনাথ: মনন ও শিল্প) 'ছেলেদের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে ঔৎসুক্য ও বিজ্ঞানবোধ জাগ্রত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের চেষ্টার অন্ত ছিল না।' এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান এই প্রসঙ্গটি আকর্ষিত হয়। সে ক্ষেত্রেও দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের আরেকটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য, 'রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চেতনা' (অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ)। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত রচনাটি পরিমল গোস্বামীর 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান' (রবীন্দ্রায়ণ), রবীন্দ্রনাথের আজীবন ও বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর বহুবিধ সম্পর্কের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রেরই মতো রবীন্দ্রনাথেরও কৌতূহল ছিল, 'পাঠপ্রচয়'এর কিছু রচনায় অথবা জ্যোতির্বিজ্ঞানে, প্রধানত 'বিশ্বপরিচয়'এ, সেই কৌতূহল সুচিহ্নিত। কিন্তু ভাষা-বিজ্ঞানে তাঁর অবদান আরও অনেক

সুদূরপ্রসারী। সুকুমার সেন লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথকে বাঙালী ভাষা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রথম বলিতে হয়।' এ বিষয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ'(অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ) 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলাভাষা' (রবীন্দ্রায়ণ) এবং ক্ষুদিরাম দাস রচিত 'বৈয়াকরণ রবীন্দ্রনাথ'— এই প্রবন্ধগুলি লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ পেশাদার ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন না, কিন্তু ভাষার প্রকৃতি-সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি বিবেচনা করলে তাঁকে 'বাক্‌পতি' এই বিশেষণে ভূষিত করতে হয়। সুনীতিকুমার তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধে দৈনন্দিন আলাপে ভাষাতত্ত্বের নানা আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ যেভাবে অংশ গ্রহণ করতেন উল্লেখ করেছেন। উভয় লেখকই ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে ছন্দস্তত্ত্বকে একত্রে আলোচ্য বলেছেন।

৭. সংগীত ও চিত্রকলা

তোমার কাছে এ বর মাগি, মরণ হতে যেন জাগি
গানের স্বরে॥—স্বরবিতান ৪৩

জগতে রূপের আনাগোনা চলছে,
সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি রূপ,
অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে।
সে প্রতিরূপ নয়। — শেষ সপ্তক, পনেরো

রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে সর্বাধিক প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে গীতবিতান পত্রিকার রবীন্দ্রশতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যায়। প্রতিটি রচনাই কোনো না কোনো কারণে উল্লেখযোগ্য কিন্তু তার প্রত্যেকটির নাম করতে গেলেও প্রচুর জায়গা জুড়বে বলে উৎসাহী পাঠকদের সমগ্র সংকলনটির প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এর মধ্যে 'রবীন্দ্র-সংগীতের সামাজিক মূল্য' বিষয়ে লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। 'জনসংযোগে রবীন্দ্রসংগীত', সুধীরচন্দ্র কর, আর-একটি কৌতূহলকর রচনা। সাধনা কর 'রবীন্দ্রনাথের সংগীত আলোচনা'র একটি অত্যাবশ্যক সংকলন করতে চেষ্টা করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যগান'এ বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের গান পদ্য থেকে চাল শুরু করে গদ্যপদ্যের মাঝামাঝি একদেশে এগিয়ে এসেছে এবং তারপর পৌঁছেছে গদ্যের নতুন দেশে।··গদ্যপদ্যের মাঝামাঝি মুক্তক আঙ্গিকে গান তৈরি করতে করতে যখন নৃত্যনাট্যের আসরে নামলেন,··চিত্রাঙ্গদা শ্যামা প্রভৃতি নৃত্যনাট্যে মিল ছন্দ তাল ইত্যাদির নানান গরমিল ও ঢঙ শেষে মিশল চণ্ডালিকার গদ্যচালে।' প্রবোধচন্দ্র সেনের 'বাণী ও বীণা' রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুরের মিলনতত্ত্ব।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রবীন্দ্রনাথের গান' সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থ। ভূমিকায় লেখক এগারোটি উদাহরণসহ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, সংগীতজীবী বণিকেরা রবীন্দ্রনাথের দেওয়া গানের সুর বদল করে কিভাবে তার যথেচ্ছ ব্যবহার করছেন। প্রথম প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন রবীন্দ্রসংগীতে বিশুদ্ধ দরবারী সংগীত এবং অবিশুদ্ধ লোকসংগীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সুরও কিভাবে সংমিশ্রিত হয়েছে এবং পরবর্তী কোন প্রবন্ধে বলেছেন, 'ভারতবর্ষের রাগস্রষ্টাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ।' সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপর একটি প্রবন্ধ 'সংগীতে রবীন্দ্রনাথ'এ (ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট) এই উক্তিটিকে বিশদ করেছেন, 'ভারতীয় সংগীতের ধারার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতের সৃষ্টিস্রোতহীন বদ্ধজলে নতুন সুরসৃষ্টির স্রোত এনেছেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে কোন দিক থেকে ভারতীয় সংগীতের

বিকাশ সম্ভব তারও ইঙ্গিত তিনি দিয়ে গেছেন।' এই সংকলনের আর-একটি প্রবন্ধ 'কবির গানের অন্তঃপ্রকৃতি' : অসিতকুমার হালদার, লেখক দেখিয়েছেন, 'কবির গান স্বতঃস্ফূর্ত গীতিকাব্য।'

রবি-প্রদক্ষিণ'এ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে' আলোচনাটি মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রবীক্ষায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর 'সংগীতে রবীন্দ্রনাথ'। সৃজনীতে 'শাস্ত্রীয় সংগীতে রবীন্দ্রনাথ' লিখেছেন বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং 'রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য' শান্তিদেব ঘোষ। সূর্যাবর্তে 'রবীন্দ্রনাথের গান' : ধ্রুব গুপ্ত। 'রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প'এ শঙ্খ ঘোষ ও রাজ্যেশ্বর মিত্রের দুটি, তার মধ্যে শঙ্খ ঘোষের আলোচনা 'নাটকে গান— রবীন্দ্রনাথের নাটক' অবশ্য মূলত নাটকেরই আলোচনা, গানের আলোচনা নয়। নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রায়ণ ও সৃজনীতে বিমলচন্দ্র সিংহের একটি প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়েছে। সুধীর চক্রবর্তী লিখিত 'আধুনিক নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথ'এ লেখকের নিপুণ বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় আছে। শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসাধনায় সংগীত ও নৃত্য' রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত ঘোষের আর-একটি মূল্যবান প্রবন্ধ 'শান্তিনিকেতনের নৃত্য-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান' দেশ ১৩৬৮ সাহিত্য সংখ্যায় দ্রষ্টব্য। 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীতগুরু' : দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় (দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৮), রবীন্দ্রসংগীতের ইতিহাসভূমি নির্মাণে সবিশেষ মূল্যবান। সুধীর চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার সংগীত পাঠান্তর' (অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ) আর-একটি আকর্ষণীয় আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথের গান যেমনই বহুপরিচিত, চিত্রকলা তেমনই গূঢ়চারী ও আত্মকেন্দ্রিক। কুমারস্বামী লিখেছেন, তাঁর কবিতায় নিশ্চয়ই একটি সার্বজনীন পরিধি রয়েছে, সে ভাষা বোঝাবার রাস্তা তাঁকে নিজে হাতেই তৈরি করতে হয়েছে অথচ ছবির বেলায় তিনি একান্তই ব্যক্তিগত। গোপন ঘনিষ্ঠ চিঠি লেখবার ঐশ্বর্য তাতে লুকোনো। কুমারস্বামীর এই রচনাটি সমেত আরও কয়েকটি রবীন্দ্রশিল্পকলার পূর্বখ্যাত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে সৃজনীতে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, পৃথ্বীশ নিয়োগী ও মৈত্রেয়ী দেবী সেই আলোচনাগুলির লেখক। সূচনায় 'ছবির কথা' শীর্ষক একটি পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে ও কালে প্রদত্ত আত্মপরিচয়মূলক উক্তিসমূহ সংকলন করা হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে গীতবিতান পত্রিকার উল্লেখ করেছি, রবীন্দ্রচিত্রকলা সম্বন্ধে সৃজনীতে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য রচনা সমাহৃত করা হয়েছে।

যামিনী রায়ের রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কিত মতামত স্বল্প কথায় প্রত্যক্ষভাবে চরিত্রনির্দেশক, অন্তত আরও দুটি সংকলনে মুদ্রিত হয়েছে: সূর্যাবর্ত ও রবিপ্রদক্ষিণ'এ। রবীন্দ্রায়ণে যে তিনটি শিল্পবিষয়ক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, গুরুদেবের আঁকা ছবি : নন্দলাল বসু, রবীন্দ্রচিত্রের ভিত্তি : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়; রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প : পৃথ্বীশ নিয়োগী— তার প্রতিটিই বিশেষভাবে সুলিখিত। রবীন্দ্রপ্রবাহে ড. শশধর দত্তের একটি আলোচনা দেখা যায়, প্রতীচ্য ও প্রাচ্য শিল্পাদর্শের কোন্ কোন্ সূত্রে রবীন্দ্রনাথ মেলেন এবং কতদূর পর্যন্ত, যা ছাড়ালেই স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ স্বপ্রকাশ হয়ে ওঠেন, সেই বিষয় তাঁর আলোচনা। উত্তরসূরী পত্রিকার রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ সংখ্যায় রবীন্দ্রশিল্পকলার কয়েকটি সুন্দর আলোচনা স্থান পেয়েছে। দেশ ১৩৬৮ ও ১৩৬৯ সাহিত্য সংখ্যায় দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের দুটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ ও সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ'এ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি।

গোপাল হালদার সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ'এ বিষ্ণু দে লিখিত 'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ'। বিষ্ণু দে দেখিয়েছেন, 'যখন জীবনাভিজ্ঞতায় তিনি নিজে সম্পূর্ণতা পেলেন পরিণত বয়সের প্রশান্তির এবং দীর্ঘ কৃতিত্বের সাবলীলতায়, তখনই তাঁর অসামান্য গীতিপ্রতিভায় এল দৃশ্য স্পৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই বহির্বিশ্বের আর মানবিক প্রেমের সৌন্দর্যের মধ্যে সহজ আত্মদানের বিহ্বল মুক্ত সৌন্দর্যবোধ।' এবং 'চিত্রে রবীন্দ্রনাথ সব বস্তুর চরম ইস্থেটিক বা সংবেদন-উপযোগ উপলব্ধি করেছিলেন, যদিও সে তুলনায় কাব্যে তাঁর সৌন্দর্যের মান ছিল গোঁড়া ধরণের।' নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্রচিত্রের মর্মলোক' ও জোসেফ সাউথ হল'এর 'রবিঠাকুরের ছবি' এই দুটি রচনা ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। দেশ'এ প্রকাশিত রামকিঙ্করের চোখে রবীন্দ্রচিত্রকলা আর-একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা।

৮. রবীন্দ্রসাহিত্য ও বিবিধ ভাষ্যকার

কিছুদিন আগে আদিত্য ওহদেদার 'রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার ধারা' নামে একখানি ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করেছিলেন, ১৮৭৩ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত কালানুক্রমিক সমালোচনার ইতিহাসটি তাতে বিবৃত ছিল। এ জাতীয় গ্রন্থ সম্ভবত এই প্রথম, সমালোচনার বহুল উদ্ধৃতি তিনি স্বকীয় সূত্রযোজনার দ্বারা একটি ধারাবাহিক ও নিটোল পুস্তকে রূপার্পিত করেছিলেন। এ বৎসরে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় -কৃত 'রবীন্দ্রবিতান' নামে এক পুস্তক প্রণীত হয়েছে, 'রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে রচিত বিপুল সমালোচনা-সাহিত্য থেকে নির্বাচিত প্রবন্ধের সংকলন।' পূর্বোক্ত গ্রন্থে এই জাতীয় সংকলনের প্রত্যাশা আভাসিত ছিল, সন্দেহ নেই।

'রবীন্দ্রবিতান'এর সময়সীমা ১৮৭৮এ কালীপ্রসন্ন ঘোষের কবিকাহিনী-সমালোচনা থেকে কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত। ছাব্বিশটি প্রবন্ধ এই সময়ের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। বিরোধ ও বরণের সূত্রে এই কালপরিসরকে গ্রন্থকার তিন ভাগে ভাগ করেছেন যার দুটি ভাগ মাত্র এই গ্রন্থের বিষয়, ভূমিকায় সেই বিভাগের আভ্যন্তর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বাঙলা সমালোচনা কীভাবে আপন বিচারশক্তি, রসগ্রাহিতা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছে, তার প্রমাণ এই সংকলনে পাওয়া যাবে।' ভূমিকা-অংশে এই তত্ত্বও বিশ্লেষিত হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার প্রভাতকালে যে দুটি বন্দনা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল তারও অস্বীকার করেন নি, যদিও ব্রহ্মবান্ধবের বিশ্বকবি রচনাটি বাঙলা সংস্করণে উদ্ধৃত হলে আমরা সাধারণ পাঠকেরা হয়তো আরও খুশি হতে পারতাম। রবীন্দ্রসমালোচনার দ্বিতীয় পর্বকে আরও দুই অর্ধে বিভক্ত করে শেষার্ধ-প্রসঙ্গে 'বস্তুত এই সময়েই বাঙলা সমালোচনা নানা বিরোধ সংঘর্ষ ভ্রান্তি নিন্দা স্তুতি প্রশংসা ও ভক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-প্রতিভাকে স্বীকার করে নেয়'—এইরকম নিষ্পাদন করেছেন। অপিচ বিগত যুগের বহু মূল্যবান ও বিস্মৃতপ্রায় রচনাকে একত্রে প্রকাশিত করে তিনি সর্বশ্রেণীর বাঙালী পাঠকের এবং ভবিষ্যৎ রবীন্দ্রভাষ্যকারগণের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তাঁর পরিকল্পনার তৃতীয় পর্বটিও আমরা যথাশীঘ্র প্রত্যাশা করি।

শ্রীযুক্ত ওহদেদার তাঁর ইতিবৃত্তের অন্তিমে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, 'আমাদের সমালোচকগণ আজ অবধি· • উনবিংশ শতাব্দীয় প্রচেষ্টা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের উপর কিছু Bio-critical গ্রন্থ লিখেছেন। এ-জাতীয় গ্রন্থ লেখা পরিশ্রমসাপেক্ষ হলেও বিশেষ ক্ষমতার মুখাপেক্ষী নয় এবং এমন রচনার জন্য সাহিত্য-

রস-বোধ বিশেষ না থাকলেও চলে।··রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রকৃত সমালোচনা এখনো শুরুই হয় নি।·· ইংরাজিতে যাকে practical criticism বলে, কিংবা নব্য সমালোচনা new criticism-এর যে ধারা দেখা দিয়েছে, বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যে এখনও তার কোন নিদর্শন তেমন পাওয়া যায় নি, সুতরাং রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে এমন সমালোচনার প্রবর্তনা সম্ভব হয় নি।' অমল হোমও বলেছিলেন, 'আমাদের অধ্যাপকীয় রবীন্দ্রসমালোচনা ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজি সাহিত্য -সমালোচনার ছকে কাটা।' সাম্প্রতিক কোনো কোনো পুস্তকসমালোচনায় কিছু কিছু নব্যতন্ত্রী সমালোচনাকে স্বাগত ও সাধুবাদ জানানো হয়েছে।

কিন্তু এই নব্যসমালোচনা কেমন? গ্রন্থনামে আকৃষ্ট হয়ে প্রথমেই উল্লেখ করছি ড. শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার' বইখানি। ড. মুখোপাধ্যায় পূর্ববর্তী রবীন্দ্রসমালোচনার ঊনত্ব ঘোষণা করে জানিয়েছেন,

বিজ্ঞানীর দৃষ্টি ফুলের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। বিজ্ঞানী খোঁজে ভূমিগর্ভ থেকে বৃন্তমূল পর্যন্ত সেই প্রাণপ্রবাহের ক্রিয়া যার পরিণামে একদিন ফুল দেখা দেয়।

এবং অতঃপর বলেছেন, 'কাব্যসমালোচনায় তিনটি দৃষ্টিধারার সমাবেশ প্রয়োজন—ঐতিহাসিক মনোবিজ্ঞানী এবং নান্দনিক।' অতঃপর, 'আমাদের আলোচনার মুখ্যতম বিষয় কাব্য নয় কবি—বহু অনুভূতি-সঞ্চালিত, বহু উপলব্ধি-অনুপ্রাণিত, ক্রমবিবর্তিত কবিমানস।' লেখক এই গ্রন্থে রবীন্দ্রকাব্যধারার গোমুখী পর্যায় এবং মানসী-সোনার তরী ও চিত্রা—এই তিন কাব্যের আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য এবং এই বইখানি রবীন্দ্রকাব্যের মোটামুটি নিশ্চিত এবং সযত্নপঠন হিসাবে বর্তমান লেখকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। এই সযত্নপঠনের আরও একটি উদাহরণ শিশিরকুমার ঘোষের 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য'।

কিন্তু 'কাব্য নয় কবি'—এই প্রস্তাবনাকে তিনি অভিনব বিবেচনা করলেন কেমন করে তা বোঝা সহজ নয়। রবীন্দ্রসমালোচনার সমগ্র ইতিহাসকে বিস্মৃত হয়ে শুধুমাত্র এ বৎসরের প্রকাশনার দিকেই তাকানো যাক। প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৬এ, এ বৎসর পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তার ভূমিকায় প্রমথনাথ বলেছিলেন, 'কবিমনকে বুঝিবার জন্যই কবির সম্পূর্ণ মনকে জানা প্রয়োজন—এবং এই সম্পূর্ণ মনকে জানিতে হইলে একই কালে লিখিত কাব্যের সঙ্গে পরিপূরকভাবে প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও জীবনী মিলাইয়া আলোচনা করা আবশ্যক।' শ্রীযুক্ত বিশীর নূতন গ্রন্থ 'রবীন্দ্রসরণী' সূচিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ' এই উক্তি থেকে, এবং কবিমানসের একটি স্থির প্রবণতাকে উৎস বিকাশ ও পরিণতির পরমমুহূর্ত পর্যন্ত অবিচল ভাবে অনুসরণ করে চলেছে। শ্রীযুক্ত বিশীর মনস্তাত্ত্বিক কৌতূহল কখনও অতিরেকের স্তরে পৌঁছায় নি, কিন্তু প্রতিটি পরিচ্ছেদ বিকাশের এক-একটি সোপানের মতো রচিত হয়েছে, প্রতিটি অধ্যায়নাম্ পর্যন্ত হৃদয়লোককে অনর্গল করে দিতে দিতে এবং সমস্ত পথ কবির জীবনের সকল তথ্যকে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ রূপান্তরণের মধ্যে আবিষ্কার করতে করতে অগ্রসর হয়েছে। বস্তুত জীবনীসন্নদ্ধ আলোচনায় প্রমথনাথ বিশীকে সার্থকতার বিরল দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য করা যায়, এবং 'নান্দনিক দৃষ্টিধারা' বলতে যদি 'রসসম্ভোগ' নামক পুরাতন শব্দটিকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় তবে' রবীন্দ্রসরণী'র তুল্য আলোচনা বর্তমান লেখকের স্মৃতিতে আর নেই।

অনুমান করি, শ্রীযুক্ত বিশীর আলোচনা তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও রসস্নিগ্ধ বাচনের উজ্জ্বলতায় কারও কারও হয়তো সাঁৎ ব্যভ'এর রচনাধারা মনে পড়তে পারে। সাঁৎ ব্যভ তাঁর প্রতিপাদ্য শিল্পীর সমীক্ষণে কখনও কখনও শিল্পীর আশৈশব প্রতিবেশ-অনুষঙ্গ এমন কি বংশলতিকা অবধি সংশ্লিষ্ট করে নিতে চাইতেন। কাজী আবদুল ওদুদ 'রবীন্দ্রনাথ: বাল্য ও কিশোর' রচনায় সারদাদেবী, হেমেন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বিহারীলাল ইত্যাদির সহযোগে এমনই এক মানচিত্র প্রণয়ন করতে চেয়েছেন। দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখিত 'রবীন্দ্রজননী সারদাদেবী' (রবীন্দ্রবীক্ষা) কিংবা হিরণকুমার সান্যালের 'তিনপুরুষ' (রবীন্দ্রায়ণ) ইত্যাদি রচনাকে এই জাতীয় প্রবণতায় আপন্ন অনুমান করা যায়।

কবিমানসকে যদি জীবনীর লৌকিক বলয় থেকে সামান্য সরিয়ে নেওয়া যায়, শিল্পে প্রতিফলিত সেই 'পরিণামমুখী গতিশীল কবিস্বভাব'এর পর্যালোচনায় ড. ক্ষুদিরাম দাস -কৃত 'রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়' অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও সুলিখিত একটি পুস্তক। কচিৎ গবেষণাগন্ধী কিন্তু আচার্যের মতো প্রতিশ্রুতিপরায়ণ।

এতদ্ব্যতীত নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতি রবীন্দ্রজ্ঞের বিবিধ আলোচনা স্মরণ করা যেতে পারে। শঙ্খ ঘোষের 'রবীন্দ্রনাথের পত্রধারা' (রবীন্দ্রায়ণ) এবং বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের 'ছিন্নপত্র ও রবীন্দ্রমানসের উপাদান' (বিশ্বভারতী পত্রিকা)— এই রচনা দুটির উল্লেখ করা যায় চিঠিপত্রের সাহায্যে রবীন্দ্রমানসের উপর আলোকপাত করার উদাহরণ হিসাবে। এর মধ্যে মনোবিশ্লেষণের আভাসও সম্ভবত আছে। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'রিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথ' পুনর্মুদ্রিত পুস্তক, সেখানে দুই বোন, মালঞ্চ, বাঁশরী, চার অধ্যায় ও শেষের কবিতা— রবীন্দ্রজীবনের শেষ পর্বের এই রচনাগুলি আলোচিত হয়েছে মনোবিকলনতত্ত্বের সাহায্যে। শিশির চট্টোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের দুখানি উপন্যাস' (অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ) প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে অন্তর্মুখিনতা ও নব-বাস্তবতাবোধের সন্ধান পেয়েছেন তাও একই প্রবণতাজাত।

কিন্তু মনোবিকলনের সহায়তা গ্রহণের জন্য যে-জাতীয় শাস্ত্রাধিকার থাকা প্রয়োজন আমাদের সমালোচকগণের তা আছে কি না জানিনে, এমন কি 'পুনর্বিচার'এও ততদূর শাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় মেলে না। তা ছাড়া জীবনীঘনিষ্ঠ আলোচনার তেমন জৌলুস বোধহয় আর নেই, শিল্পীর মনোবিকলনের মধ্যেও আর তেমন নব্যতা আছে কি না সন্দেহ। আধুনিক নন্দনতত্ত্বে ফ্রয়েডীয় অবদান ক্রমশই প্রশ্নচিহ্নে আবেষ্টিত হয়ে পড়ছে। শিল্পীদের আদ্যন্ত ইন্ট্রোভার্শন য়ুং-ও লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু য়ুং দেখিয়েছেন ফ্রয়েডীয় শিল্পদর্শন শিল্পের অন্তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ না ঘটিয়ে শিল্পীর মানসিক অবস্থাকেই একমাত্র প্রতিপাদ্য করে তোলে।[৩৪] শিল্পী কি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মুদ্রাদোষে বিশিষ্ট ও বিচ্যুত, তা-ই যদি হয় তা-হলে নিঃসন্দেহে মনস্তত্ত্ববিদের কৌতূহলকর উপজীব্য, কিন্তু শিল্প যে আরও ব্যাপ্ত ও সাধারণীকৃত তার সেই দাবি কে অস্বীকার করবে।

'শিল্পের অন্তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ' সম্ভবত রিচার্ড্‌সেরও প্রতিপাদ্য ছিল। কবিতাতেই শব্দের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার— এই বলে ভাষাবিজ্ঞানকে কাব্যবিচারে নিয়োগ করতে গিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য রিচার্ড্‌স্ এইভাবে ব্যক্ত করেছেন— to explore with thoroughness the intricacies of the modes of

৩৪ মডার্ন ম্যান ইন সার্চ অব এ সোল, পৃ ১৮০-১৮৮ দ্রষ্টব্য

language *as working modes of mind.*[৩৫] হয়তো এ কথা ঠিক, কবিরা সৃষ্টি করেন শব্দের নেশায়, শব্দের ঘোরে ; ভালেরী এক জায়গায় খুব সুন্দর এক কবিতার সংজ্ঞা দিয়েছেন, অশ্রু শীৎকার সোহাগ চুম্বন ইত্যাদির যা বক্তব্য— কবিতায় তা-ই প্রকাশ করে শব্দ এবং শব্দ।

অবশ্য সুনন্দা দত্ত লিখিত 'রবীন্দ্রকাব্যভাষা' নিছক বৈয়াকরণ জিজ্ঞাসার দৃষ্টান্ত। লেখিকা সন্ধ্যাসংগীত থেকে জন্মদিন পর্যন্ত কবির সুদীর্ঘ কাব্যপ্রবাহে এগারোটি প্রধান প্রধান তরঙ্গভঙ্গ লক্ষ্য করেছেন। অতঃপর প্রাচীন কাব্যরীতি ও প্রাচীন কবি-ব্যবহৃত শব্দ ও পদের রবীন্দ্রনাথ-কৃত ব্যবহার আলোচনা করেছেন, দেখিয়েছেন, 'তদ্ভব শব্দের ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ জাতিপাতি মানেন নাই', এমন কি তৎসম শব্দের সঙ্গে তদ্ভব বা অর্ধতৎসম শব্দের যথেচ্ছ মিলন ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রকাব্যে ক্রিয়ার বিবিধ ব্যবহার, পদের ধ্বনি পরিবর্তন এবং সমাসবিচার পদপ্রয়োগ অলঙ্কারবিচার ইত্যাদির পরে প্রায় দু হাজার শব্দসমন্বিত রবীন্দ্রব্যবহার একটি নির্বাচিত শব্দকোষ দিয়েছেন এবং সপ্তম অধ্যায়ে কবিতা ও কাব্যনাম বিশ্লেষণ করেছেন। এ জাতীয় প্রচেষ্টা এ-ই প্রথম এবং নির্দ্বিধায় অভিনন্দনযোগ্য।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন শিল্পরূপের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই অজস্র রচনা ও একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এ বছরে, তার মধ্যে প্রৌঢ় ও নবীন প্রথায়ত ও নিরাক্ষাবৃত্ত উভয়বিধ মানসিকতাই লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের ছন্দের আলোচনা নানাস্থানে করেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন ও অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা করেছেন প্রবাসজীবন চৌধুরী, আদিত্য ওহ্‌দেদার 'সমালোচক রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি বই লিখেছেন, তাঁর পূর্বের বইটির মতই এই বইয়েরও সংকলননৈপুণ্য শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। ধীরানন্দ ঠাকুরের 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। কেমন করে অতি অনায়াসে লাভজনক স্ফীতির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়। 'রাবীন্দ্রিকী'র মধ্যে 'রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যের ভূমি' নামে যে রচনাটি আছে তার মধ্যে অবশ্য একটি মিতায়তন গ্রন্থের উপাদান সংহত ও সংকেতিত আছে, শ্রীযুক্ত ঠাকুর এই রচনাটি যথোচিত বৈশদ্য সহকারে আরও পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্পর্কে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে মনোরঞ্জন জানার বইটি বিশেষভাবেই ছাত্রবোধ এবং পুলকেশ দে সরকারের বইটি মোটামুটি সুখপাঠ্য। সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ'ও একইভাবে ছাত্রদের বিশেষ উপকারী। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত 'রবীন্দ্রমনীষা'য় রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন অংশ পর্যালোচিত হয়েছে। সুশীলকুমার গুপ্তের 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রসঙ্গ' কাব্যনাটকের আলোচনা। যে সব একক কাব্যগ্রন্থ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছে— গ্রন্থাকারে কিংবা অনতিসংক্ষেপে— সেই পক্ষপাতের মূলেও অধিকাংশ সময়েই পরার্থপ্রবণতা ও কদাচিৎ ব্যক্তিগত অনুরাগ দেখা গেছে। মানসী সোনার তরী বলাকা ও আরও কয়েকটি কাব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠ্যতালিকাভুক্ত। অবশ্য সেই সূত্রেও অনেক কথা নানাজনের কাছ থেকে প্রকাশ পেয়েছে। অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি আবেগার্দ্র ও সুখপাঠ্য আলোচনা এই জাতীয় বহুগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্যপরিক্রমা'-তেও ভাষ্যকারের ভূমিকাটি স্বতঃসিদ্ধ রসিকের, উপরন্তু এর অধিকাংশ উক্তিই রবীন্দ্রবচননির্ভর বলে সেই সান্নিধ্যের প্রত্যক্ষতা এই বইয়ের অনেক স্থলেই পরিকীর্ণ হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণতা কথিত আছে— 'মানসী', এবং

---

৩৫ কোলরিজ অন ইমাজিনেশন

আসলে 'মানসী'তে অর্জিত কাব্যতত্ত্বই যে তিনি আজীবন পুনরাবর্তন করেছেন এমন কথাও সুধীজনের অনুমোদিত।

বিষয়টিকে আর-একটু প্রসারিত করে নিলে লোকসাহিত্য, শিশুসাহিত্য ইত্যাদি সম্পর্কগুলির উল্লেখ করা যায়। লোকসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থে নানাদিক থেকে এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার লোকসাহিত্যে' 'রবীন্দ্রকাব্যে লোকসাহিত্য' অন্তত এই দুটি অধ্যায়ে বিশেষভাবে মূল্যবান আলোকপাত করেছেন। ড. ভট্টাচার্যের দুটি প্রবন্ধ এই বৎসর দেখা গেল: লোকসাহিত্য-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রচর্চা) এবং রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য বিচার (অধ্যাপক সমিতির রবীন্দ্রনাথ)। এতদ্ব্যতীত বিনয় ঘোষ (রবীন্দ্রায়ণ) এবং সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের (রবীন্দ্রনাথ: গোপাল হালদার) দুটি প্রবন্ধ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজনা।

রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য বিষয়ে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি বই দেখা গেল, বিস্তারিত আলোচনা। সম্ভবত একটি বিশেষ সমাজতাত্ত্বিক অথবা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। ছড়ার ছবির উদ্দেশ্যমূলকতা লেখক লক্ষ করেছেন, 'কবি যেন নূতন যুগের মানুষ গড়ার উদ্দেশ্যে এমন শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন।' 'দুনিয়াচাঁদ'এ লেখক দেখেছেন প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রীতিমত উত্তেজনা-প্রদান। রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে অনুপযোগী বিষয়ের অবতারণাও লেখক দেখিয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও স্বপন বুড়ো লিখিত দুটি রচনা লক্ষ্য করা যায়, একটি দেশ'এ, অপরটি নাগরিক কমিটির রবীন্দ্রনাথ'এ।

৯

> সমালোচকেরা সাহিত্য-কারবারীদের মুচ্ছদ্দি— তাদের নিজের পুঁজি-পাটা থাকা চাই, এবং জগতের বাজার যাচাই করবার মতো অভিজ্ঞতা ও শক্তি না থাকলে তাদের চলে না। আমাদের মূলধন কেবল, আমার কি ভালো লাগে এবং না লাগে সেইটুকু।· ·
>
> তাই তো আমি অনেকদিন থেকে তোমাকে বলচি, মাঝে মাঝে সমালোচনার ক্ষেত্রে নাবো না কেন?— কাব্যকে সাহিত্যকে একটা বিশ্বভূমিকার উপর দাঁড় করিয়ে দেখাও না কেন?
>
> — সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

সমালোচনার প্রক্রিয়া সৌন্দর্যশাস্ত্রের ধারণার সঙ্গে সমান্তরিতভাবে চলে। এক সময় আমরা শিল্পের দার্শনিক অর্থ খুঁজেছি, এক সময় মনস্তত্ত্বের (metaphysical এবং psychological values)। সমাজনীতির দৌরাত্ম্যে একসময় সৌন্দর্যনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, মনে পরে প্রথমবয়সের রবীন্দ্রনাথের কাছে সেই দুরপনেয় অস্বস্তি। সৌন্দর্যের কি কোনো নীতি আছে? অথবা 'নীতি' কথাটিকে সৌন্দর্যের পাশে প্রথামাফিক উচ্চারণ করা শালীনতা কিনা সে সন্দেহ আপাতত থাক্। আসলে তারা একদিক থেকে সবাই সমধর্মী, তাদের লক্ষ্য শারীরলাবণ্যে নয়, শরীরের অন্তস্তলে। আর যেহেতু শিল্প সমস্ত মানব-অভিজ্ঞতাকেই স্পর্শ করে আছে, তার পরিচয় লিখতে গিয়ে সেইসব বিষয়েরও কারোর দাবিই আমরা ফেলি না, এমনকি উপনিষদ্ এবং ডায়ালেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম্ সমানভাবে তার কাঠামোটির দিকে অপাঙ্গে তাকায়, অবহেলায় তাকে গৌণ বিবেচনা করে। কিছুদিন আগে এ. সি. ব্র্যাডলীর অক্সফোর্ড

বক্তৃতামালা আমাদের সমালোচকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু কলাকৈবল্যবাদ শিল্পকে যে ধরনের সুবিধাই দিক না কেন, সমালোচনার পক্ষে ওই শব্দটিকে প্রশ্রয় দেওয়ায় অনেক অসুবিধা। আমাদের বর্তমান সমালোচনায় নানা বিষয়েও নানা শাস্ত্রে সানুরাগ হস্তক্ষেপ প্রায়শই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য বারংবার বলেছেন, তাঁর রচনা অন্যফল-নিরপেক্ষ। "এই পর্যন্ত বলিতে পারি, যখন কবিতাটা লিখিতে বসিয়াছিলাম তখন কোনো অর্থ ই মাথায় ছিল না, তোমাদের কল্যাণে এখন দেখিতেছি লেখাটা বড়ো নিরর্থক হয় নাই, অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না।" অথবা আরও সরলভাবে, "কিছু একটা বুঝাইবার জন্য তো কেহ কবিতা লেখে না। হৃদয়ের অনুভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার ধারণ করিতে চেষ্টা করে।" কিন্তু এই উক্তিমালাও হয়তো, ম্যাকলীশ-এর আর্স পোয়েটিকা-র মতোই, বিশেষভাবেই বক্তব্যবাহী; আসলে শব্দানুবিদ্ধ হলেই শিল্পকে নানাবিধ অর্থের দায়িত্ব অঙ্গীকার করতেই হয়। অথচ বড়োই ক্ষীণজীবী ওই শিল্প— অর্থোদ্ঘাটনের সমারোহে সে মুহুর্মুহু ম্রিয়মান পাংশু ও প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আন্তরিকতম প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সমালোচনা শুধু কবিতাটির— একমাত্র তারই কণ্ঠলগ্ন হয়ে নিশ্চয়ই বিভোর থাকতে পারে না, তা সম্ভবই নয়, কিন্তু এই অন্যার্থনির্ভরতা কিংবা বহুজ্ঞতার অতিরেকে অজস্র পুস্তক প্রণীত হয়েছে, তাতে আমাদের সমালোচনা সাহিত্য বহুল সম্পন্নতা পেয়েছে জেনেও শোনা যায়, আমরা আর একবার গ্রন্থসংশয় অগোচরে হয়ে পড়েছি। সমালোচনা কেন? কি হেতু? কোন্ প্রয়োজনে? শ্রীচৈতন্য সার্বভৌমকে বলেছিলেন, বেদান্তসূত্র বোঝা সহজ, কিন্তু শঙ্করভাষ্য অনুধাবন করা যায় না। বলা বাহুল্য, অতি বড় কৌতূহলী পাঠকও নেহাত প্রয়োজন না পড়লে আজ আর সমালোচনার দ্বারস্থ হন না। হয়তো কখনোই হতেন না!— কিন্তু এই ভাষ্য প্রণয়ন করে আমরা তা হলে কার উপকার করব? উদ্দিষ্ট কবির? অনালোকিত পাঠকের?

তা ছাড়া এতদিনে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে সমাজবদ্ধ মানুষের কাছে উপযোগের প্রশ্ন কত প্রবল, কারও লেশমাত্র খেয়ালকেও সে নানাভাবে সযৌক্তিক না জেনে ছাড়তে পারে না। কিছুতেই পারে না। পরন্তু রবীন্দ্রনাথের তিরস্কার ও পরামর্শ-সুদ্ধ আজ দৃশ্যান্তরের কালান্তরের সামগ্রী। অপিচ, এই সমালোচনা, আবার আমাদের ভাষ্যকারদের ধারণাতেই, এখনও যথেষ্ট বিশ্বভূমিক হয়ে ওঠে নি। আমাদের আলোচনায় আমরা প্র্যাকটিকাল ক্রিটিসিজ্‌ম্ এখনও পাই নি, মনোবিকলনের সমূহ বিকাশ এখনও দেখি নি। অথচ এসব বাদ দিয়ে যদি আমরা শুধুমাত্র শিল্পের প্রতিক্রিয়াটুকুই প্রকাশ করি? সেই সম্ভোগবৃত্তান্তকেই বরণীয় করে তুলি? আর্ন্‌স্ট্ কাসিরের বইয়ে পড়েছি: if instead of seeking a metaphysical theory of beauty we simply analyze our immediate experience of the work of art we can hardly miss the mark। শুধু প্রতিক্রিয়ার প্রতিবেদন রচনাতে আমাদের কারও কি আর লোভ আছে? অথবা এলিয়ট যাকে বলেছেন lemon-squeezer school of criticism? সেই ভাবনারই পূর্বলিখন কি কদাচিৎ মোহিতলালে? সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কিন্তু শুধু মানুষের মর্মানুসন্ধানে নয়, শিল্পেরও 'মর্মানুসন্ধানে বিদেশী পরকলাই সাম্প্রতিকদের একমাত্র সম্বল।'[৩৬] কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সত্য। আধুনিক শিল্পে যেমন আধুনিক শিল্পবিশ্লেষণেও তেমনই কোথাও কোনো ভৌগোলিক বিভাগ নেই। উপরন্তু বাঙলা সাহিত্যে সমালোচনার কোনো

৩৬. কুলায় ও কালপুরুষ।

ইতিহাস নেই। সনাতন রসতত্ত্বেও বৈষ্ণব ভাববাদকে সন্নিহিত করে দুএকজন বাঙালী লেখক সম্ভবত শেষবার অলঙ্কারশাস্ত্রকে নতুন করে তুলতে চেয়েছিলেন।

এই বিচিত্রমুখ বাক্যস্রোতের মধ্যখানে প্রত্যেক মুহূর্তে আরও নতুন স্রোতধারার মধ্যখানে থেকে একসঙ্গে সমস্ত দিকে ভেসে যাবার আকর্ষণ দুর্নিবার হয়ে উঠছে, কিন্তু তার চেয়ে গূঢ়গভীর অপরিচিত আবর্তের হাতছানিতে তলিয়ে যাওয়াই সম্ভব। আসলে এই একটি কথাই শেষ পর্যন্ত ছুঁয়ে থাকা যায়— রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে আমরা প্রতিদিন এই একবছরে আরও নিবিড় ভাবে পরস্পরমুখী আত্মোপলব্ধিতে পূর্ণতর হয়ে উঠেছি— 'শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, জীবনেও'—এই বলে কথাটিকে ব্যাপকতাও দেওয়া চলে। রবীন্দ্রনাথের এই সুদীর্ঘ ভীতিকর তালিকা উল্টে যেতে যেতে বারংবার হীনমন্যতায় দ্বেষপ্লুত হয়ে এবং সারাক্ষণ আত্মসংবরণের আত্মগোপনের একমাত্র বিচক্ষণতায় লুকোবার সুযোগ খুঁজেও পুঁথি অনেক দীর্ঘ হল। যথারীতি প্রয়োজনীয় কথা সব অদৃশ্য, অপ্রয়োজনীয় সমস্তই সম্ভবত প্রকটিত হল। নিজেকে আড়াল দেওয়া গেল না। শুধু দেশব্যাপী নানা উৎসাহের বাত্যাপ্রবাহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নামে অক্ষোভ্য বনস্পতি মূলের ছায়াতপ এখনও টাঙানো, এই সত্য টের পাওয়ার তৃপ্তিতে ইতিপূর্বের দীর্ঘ অর্থহীনতাও ঢেকে দেওয়া যায়।

সি. এফ. এণ্ডরুজ

জন্ম ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭১

মৃত্যু ৫ এপ্রিল ১৯৪০

পত্রাবলী সি. এফ. এণ্ডরুজকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথমপর্ব

লণ্ডন ১৬ই আগস্ট ১৯১৩

আপনি এখন শান্তিনিকেতনে আছেন জেনে খুব খুশি হয়েছি। সেখানে আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়া যে আমার কতখানি আন্তরিক ইচ্ছা, তা আপনাকে কি করে বোঝাই?

অবশেষে ইংলণ্ড থেকে আমার ফেরবার সময় এসে গেল। আমি বুঝতে পারছি, এখানে এই পশ্চিমে আমার কাজ আমাকে ছাপিয়ে উঠেছে। এই কাজে আমাকে যতখানি মন দিতে হচ্ছে তার প্রয়োজনীয়তা ততখানি নয়। সেজন্য যত শীঘ্র সম্ভব, আমাকে আমার সেই নির্জনতার আশ্রয় নিতে হবে। কারণ প্রত্যেক ফলবান বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষেত্র নিরালাতেই থাকে।

আজ সকালে আমি মোটরে রোটেনস্টাইনের পল্লীভবনে যাব। তাই এখন যদি আর একটুও দেরি করি, তবে এ ডাকে আর কাউকে চিঠি দিতে পারব না। সেইজন্য এখানেই এ চিঠি শেষ করছি।

কলিকাতা, ১১ই অক্টোবর ১৯১৩

আমি একটি বিপদের কাল উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি। জীবনটা বড় শূন্য এবং আমার একার পক্ষে গুরুতর দায়ভারগ্রস্ত মনে হয়েছিল। বুঝতে পারছি, আমার মন ইংলণ্ডের বন্ধুদের উপর বেশিরকম নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, আর তাতে আমার চিত্তস্রোতও বাইরের দিকে বয়ে চলেছিল। আমার নিজের দেশে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ পশ্চিমের মতো অতটা ঘনিষ্ঠ নয়। তাই এখানে ফিরে এসে হঠাৎ আমি অত্যন্ত অসহায় ও বিপন্ন বোধ করছি। অবশ্য নিজ নিজ সমস্যা নিয়ে প্রত্যেককে একাই লড়তে হয়। কিছুকাল এই নির্জনতা আমার মনে অত্যন্ত গুরুভার হয়ে চেপে বসেছিল। অবশেষে আমি পূর্বের মানসিক সমতা ফিরে পেয়েছি। বাইরের জগৎ থেকে আমার চিত্তের প্রবাহ যে এতদিনে অন্তর্মুখ হয়েছে তাও টের পাচ্ছি। এখন লোকের সাহচর্য আমাকে গভীর আনন্দ দেয়, আর প্রাণে প্রাচুর্যের বেগ অনুভব করি। আমার মনের ভার দূর করে তা এখন আমাকে আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ভারতবর্ষে আমাদের জীবনের ক্ষেত্র সংকীর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন। সেইজন্যই আমাদের মন মাঝে মাঝে অনুদার প্রাদেশিকতায় ভরে ওঠে। শান্তিনিকেতনে আমাদের আশ্রমের ছেলেদের দৃষ্টির পরিধি কিন্তু যথাসম্ভব বিস্তৃত হওয়া চাই। বিশ্বমানব সম্বন্ধে তাদের ঔৎসুক্যও যেন ব্যাপকতর হয়। এ জিনিসটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসা চাই— তবে, তা শুধু বই পড়ে হবার নয়, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগের ফলেই তা আসবে।

শান্তিনিকেতন, ১১ই অক্টোবর ১৯১৩

শান্তিনিকেতনের কাজে নিয়মিত যোগ দেবার আগে আপনার শরীর থেকে ম্যালেরিয়ার বীজ নির্মূল করা চাই।

অবিলম্বে আমাদের কাছে এসে কিছুকালের জন্য চুপচাপ বিশ্রাম নেওয়া কি আপনার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব? এখানকার কাজে যোগ দেবার আগে জগদানন্দও খুব বিশ্রী ধরণের ম্যালেরিয়ায় ভুগছিলেন।

বোলপুর' আসাতেই তিনি রক্ষা পেয়ে গেলেন। আমাদের আশ্রমকে আপনি একবার পরীক্ষার সুযোগ দিন। এখানে এলে নিশ্চয়ই আপনি পূর্বস্বাস্থ্য ফিরে পাবেন। ঘরে আপনার জন্য একটি ডেস্‌ক্‌, লেখার সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকবে। স্কুলের জমিতে আপনি ছোট্ট একটু বাগান করতে পারেন, আর যদি মন চায়, আমাদের শালবীথিতে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াবেন। আবার, কখনো বা যদি আমাকে গ্রীক্‌ সাহিত্য পড়াতে চান, তবে আপনার পক্ষে সেটা খুব ক্লান্তিকর হবে না আশা করি।

ক'দিন ধরে গানরচনায় আমাকে পেয়েছে। রোজ নতুন নতুন গান রচনা করছি।

শান্তিনিকেতন ফেব্রুয়ারী ১৯১৪

আপনি আমার ভালোবাসা নেবেন, তা ছাড়াও সঙ্গে পাঠাচ্ছি প্রায় দু মাস আগে রচিত আমার একটি গানের অনুবাদ। মৃত্যুশোকের[১] উপলব্ধিতে ও তার শক্তিতে আপনার অন্তর পূর্ণ করে আনছেন জেনে আমরা সবাই আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছি। গান্ধীজী ও অন্যান্য অনেকেরই সঙ্গে আপনি যখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় আমাদেরই সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন, তখন আমাদের সমস্ত অনুরাগ ও শুভেচ্ছা আপনাকে ঘিরে ছিল।

আমি এখনও ভারি বিশৃঙ্খলার মধ্যে বাস করছি। আজ পর্যন্ত একটু বিশ্রামও পেলাম না, নিজের কাজকর্ম নিয়ে একটু গুছিয়ে বসতেও পারলাম না। প্রত্যহই নানা আকারে বাধা এসে পড়ছে। এবার আমি মন স্থির করেছি। ঠিক করেছি একটু কঠিন হব, সব আমন্ত্রণ উপেক্ষা করব, আর সব চিঠির উত্তর দেবার জন্যে ব্যস্ত হব না।

আশ্রমের গাছে আমের বোল দেখা দিয়েছে। বাতাস শ্রুত এবং অশ্রুত সংগীতে মুখর, আর আমরাই বা কেন ঋতুর ডাককে উপেক্ষা করব? শীত বা বসন্ত মানুষের পক্ষে যেন সমান। দুয়ের মধ্যে কোনো তফাতই যেন আমরা বোধ করি না। এমন নির্বোধের মত আচরণ কেন করব জানি না। প্রতিদিন একই কাজের চাকায় আমাদের ঘুরে মরতে হবে, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করলেও কি একটু বেপরোয়া খেয়াল-খুশিতে চলতে পারিনে? নিষ্কর্মা অপদার্থ হয়ে বসে থাকার আনন্দে অন্য-সব দায়িত্ব ভুলে থাকার মতলবেই আছি এখন।

শান্তিনিকেতন, ৫ই মার্চ ১৯১৪

সম্প্রতি কিছুদিন আমি শিলাইদহের নির্জনতায় একাকী বাস করে এসেছি। এটা আমার পক্ষে খুবই প্রয়োজন ছিল। আর, এতে আমার যথেষ্ট উপকারও হয়েছে। সব রকম বিক্ষিপ্ততার মধ্য থেকে নিজেকে রক্ষা করা দরকার, তা বুঝতে পারছি। সেভাবেই আমার অন্তরের সম্পদ্‌গুলো বাড়িয়ে তুলতে পারব। কর্তব্যজ্ঞানে অন্যের উপকার করছি ভেবে জোর করে কোনো কাজে লাগা আমার পক্ষে অনুচিত। তার চেয়ে বরং যে কাজটি করব তাকেই সত্য ও জীবন্ত করে তুলতে চেষ্টা করব।

এক দিকে পরোপকারের চেষ্টা করা আর অন্য দিকে নিজের অন্তরে অপরকে দেবার মত পদার্থ কিছু না থাকা— এরকম অবস্থাটা নিতান্তই অসংগত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শান্তিনিকেতন, ১০ই মার্চ ১৯১৪

আপনি আমার পাহাড়ে যাবার সঙ্গী হচ্ছেন কবে? খুব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আপনার দিন কাটছে মনে হয়, তাই বিশ্রাম এখন আপনার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই ছুটিতে আপনাকে আমি কোনও কাজ করতে

১ এণ্ড্রুজ সাহেবের মায়ের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে, এণ্ড্রুজ দক্ষিণ-আফ্রিকায় থাকতেই তাঁর মা মারা যান।

দেব না। ছুটির জন্য আমরা আগে থেকে কোনও প্ল্যানই করব না। যতদিন পর্যন্ত কুঁড়েমি আমাদের পক্ষে ভার হয়ে না ওঠে, ততদিন চলুন আমরা ছুটির দিনগুলো সম্পূর্ণ বাজে-খরচ করি। মাত্র মাস-খানেকের জন্য যদি আমরা সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে নিজেদের না দেখি, তাতে আর কার কি ক্ষতি?

আমরা সর্বদা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠার একান্ত আগ্রহে ঘন ঘন বীজ বুনি বলেই কি ফল কম পাই নে?

রামগড়, ১৪ই মে ১৯১৪

এখানে এসে আমার মনে হচ্ছে, পৃথিবীর ঠিক যে জায়গাটিতে আসা আমার প্রয়োজন ছিল, সেখানেই এসে পড়েছি। বাংলাদেশের সমভূমির প্রতি আমি অকৃতজ্ঞ হতে চাই নে। মাটি সেখানে নম্রভাবে আকাশকে তার আধিপত্য ছেড়ে দেয়। কিন্তু সুখের বিষয়, কবির চিত্ত সর্বদাই পরিবর্তনশীল তাই তাকে অনায়াসে জয় করা যায়। এতদিন যে অন্ধ অবিশ্বাসে দূরে সরে ছিলাম, তার জন্য আজ আমি নগাধিরাজের কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করছি।

চার দিকের পাহাড়গুলোকে মনে হয় যেন শান্তিতে ও সূর্যালোকে পরিপূর্ণ পান্নার পাত্র। আর এই নির্জনতাটি যেন ফুলের মতো তার সৌন্দর্যের পাপড়ি দিকে দিকে মেলে দিয়ে জ্ঞানের মধু অন্তরে সঞ্চিত করে রেখেছে। আমার জীবনও এখন পরিপূর্ণ। এখন আর এতে কোনো খণ্ডতা বা অপূর্ণতা নেই।

রামগড়, ১৫ই মে ১৯১৪

এতদিনে আমি পরিপূর্ণ সুখ পেয়েছি। জায়গাটির নির্জনতা যে শুধু আমার কর্মক্লান্ত জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে দিয়েছে তাই নয়, এ আমার মনের স্বাভাবিক খোরাকও জোগাচ্ছে। এ রকম একটা জায়গায় এলে বুঝতে পারি, এতকাল মনটা আধপেটা খেয়ে কোনোমতে বেঁচে ছিল।

এখানে এসে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। একটি ঘাসের শীষের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি ও আনন্দ রয়েছে, আমাতেও তাই রয়েছে— এ কথা ভেবে খুবই বিস্ময়বোধ করছি। আমরা যখন চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াই তখন নিজেদের চতুর্দিকে ধুলো ওড়াই— আর সবচেয়ে পরম সত্যটিকে ভুলে থাকি যে, আমরা আছি। অন্তর থেকে যে দৃষ্টি আসে, সে দৃষ্টিতে সব-কিছু দেখার অপার আনন্দ যে কি, তা আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না।

রামগড়, ১৭ই মে ১৯১৪

আজ আমার পিতৃদেবের বার্ষিক জন্মতিথি। আমাদের ভোরের উপাসনা শেষ হয়ে গেছে, এখন আমার অন্তর পরিপূর্ণ। আজ সকালে ঝোড়ো হাওয়া বইছে— চারি দিকে ঘোর অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে একটি ম্লান আলোর রশ্মি হঠাৎ আকাশে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এটি আমার আধ্যাত্মিক নবজন্মলাভের সূচনা বয়ে আনছে। আমি একটি মহান্ সম্ভাবনার ইঙ্গিত অন্তরে অনুভব করছি, অবশ্য গভীর দুঃখের বীজও তার মধ্যে নিহিত আছে। চিরন্তন সত্যের অন্তরে পুনর্জন্মলাভ আর সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে শাশ্বতচিত্তের হৃৎস্পন্দন অনুভব আমার আত্মার ব্যাকুল কামনা। আপনাকে এসব জানাবার কারণ হল, আমার মন কি আলোড়নের মধ্য দিয়ে চলেছে তা আপনি বুঝবেন এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।

আপনার শরীরের প্রতি যত্ন নিয়ে একটু সেরে উঠুন, তবেই নবতর আশায় ও শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত স্যামর্থ্য লাভ করবেন।

রামগড়, ২১শে মে ১৯১৪

আমি অরণ্যপথে সংগ্রাম করে চলেছি। পর্বতশিখর থেকে যে আলো আসছে তা স্পষ্ট, কিন্তু অন্ধকার ঢালু উপত্যকা-পথে ছায়া ভারি গভীর ও তির্যক। আমার পা-দুটি রক্তাক্ত, তবু আমি রুদ্ধশ্বাসে চলেছি। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ধুলোয় পড়ে কাঁদি, আর তাঁরই নাম স্মরণ করি।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হবে, সে আমি জানি। যে বেদনা আমার হৃদয় বিদীর্ণ করছে, ভগবান জানেন, তা মৃত্যুযন্ত্রণাই। নিজের পুরোনো সত্তাকে ত্যাগ করা খুবই কঠিন। সময় না এলে কেউ বুঝতেই পারে না, কতদুর পর্যন্ত তার শিকড় ছড়িয়ে গেছে, আর কোন্ অভাবিত অজ্ঞাত গভীরে তার সূক্ষ্ম তন্তুগুলি পৌছে অমৃতময় জীবনরস আকর্ষণ করছে।

আমাদের মা কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তিনি মিথ্যার সমস্ত জাল ছিন্ন করে দেবেন। যা মরে গেছে তা নিজের সত্তার মধ্যে পোষণ করা অনুচিত। কারণ মৃত্যুই মৃত্যু ঘটায়। 'মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়'। দুঃখের মাশুল পুরোই দিতে হবে।

যতক্ষণ আমাদের সব ঋণ শোধ না হবে এবং মৃত অতীতের বন্ধন আমরা ছিন্ন করতে না পারব, ততক্ষণ আমরা উদার আলোক এবং পবিত্র প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করতেই পারব না। তবে আমি জানি, মা আমার সঙ্গেও রয়েছেন, আবার আমার সামনেও পথ দেখিয়ে চলেছেন।

রামগড়, ২২শে মে ১৯১৪

আত্মার অবগাহন জলে নয়, আগুনে। জলে বাইরের মালিন্য ধোওয়া যায় বটে, কিন্তু যে বস্তু-স্তূপ জীবনকে আঁকড়ে ধরে থেকে তার আতিথ্যকে অবমাননা করে, তাকে তো সরানো যায় না। সেইজন্য মাঝে মাঝে আমাদের এই আত্মিক অগ্নিস্নান দরকার।

অথচ সেই অগ্নিদাহের চিন্তাতেই আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠি, সংকুচিত হয়ে পড়ি। তবে মা আমাদের এই ভরসা দিচ্ছেন যে, যা সত্য যা জীবন্ত— অগ্নি তাকে স্পর্শও করবে না।

আগুন পাপকেই দগ্ধ করে, আত্মাকে নয়। আমাদের আত্মাকে আমরা সর্বশেষে জানতে পারি। কারণ মা যে নিভৃতে গোপনে তাকে পোষণ করেন, সে স্থানটি অন্ধকার। দুঃখের আগুনে যে প্রখর আলো জ্বলে, তাতেই সে পবিত্র দৃশ্যটি আমাদের চোখে পড়ে। কখনো কখনো মৃত্যুই সেই আলো জ্বালাবার মশাল হাতে করে নিয়ে আসে। আবার, কখনো বা ভগবানের যে দূত তা নিয়ে আসেন তাঁকে চোখে দেখা যায় না।

এই শেষোক্ত আগন্তুকটি এবার আমার দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে আমি কত প্রশ্ন করি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর। আমার হৃদয়ে তীব্রভাবে আগুন জ্বলছে— আত্মার সমস্ত নিভৃত গোপন কন্দর উদ্‌ঘাটিত করে, মিথ্যা ও বঞ্চনার সঞ্চিত স্তূপ দগ্ধ করে সে জ্বলছে। জ্বলুক সেই আগুন, যতক্ষণ তার ক্ষুধার ইন্ধন পায়। যা ধ্বংসের যোগ্য, তার একটুও যেন অবশিষ্ট না থাকে।

রামগড়, ২৩শে মে ১৯১৪

মনে হচ্ছে আবার আমি আলো-হাওয়াতে বেরিয়ে এসে সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারছি। বাইরে, স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে ফিরে আসা, জীবনের সমতা ফিরে পাওয়া, জগতের মুক্ত আনন্দমেলায় পুনরায় নিজের স্থানটি অধিকার করা— এসব যে কত আরামের তা বলে বোঝানো যায় না।

সফলতার সবচেয়ে বড় শত্রু হল প্রবল উদ্যমশীলতা। যে শক্তি জয়লাভ করে, তা শান্ত। তার নিষ্ক্রিয়তার অন্তরেই অক্ষয় সম্পদ বিরাজ করে। লোভ নিজেকেই নিজে ক্ষয় করে, সে যদি ভগবানের প্রতি লোভ হয়, তাও।

গত ক' দিন আমি এমন একটি জগতে সংগ্রাম করেছি, যেখানে ছায়ারই আধিপত্য, আর যথার্থ মাত্রাজ্ঞান একেবারেই বিলুপ্ত। যেসব শত্রুর সঙ্গে আমি এতদিন যুদ্ধে রত ছিলাম তারা প্রায় সবাই অবাস্তব। তবে এই অন্ধকারের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে একটি মহৎ শিক্ষা বহন করে এনেছে। অসত্য যখন জীবনের অনেকখানি স্থান হালকাভাবে জুড়ে বসে থাকে, তখন তাকে দেখাও যায় না, অনুভবও করা যায় না। আমরা যেন তার সঙ্গে খানিকটা আপস করে চলি। কিন্তু এখন, আমি যেমনি তার পরিপূর্ণ বীভৎস রূপটি দেখে নিয়েছি, অমনি জীবনের প্রতিটি দিন তার সঙ্গে সংগ্রামে নিযুক্ত থাকার আহ্বান পেয়ে গেছি।

রামগড়, ২৪শে মে ১৯১৪

আজ এখানকার সব পার্বত্য ওক গাছের মতো আকাশ থেকে আলোর সম্পদ সঞ্চয় করে নিজেকে বলিষ্ঠ করে তুলতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে। ঝড় যদি আসে তবে তার সঙ্গে সানন্দে শক্তিপরীক্ষার জন্য আমি প্রস্তুত। আবার আমার মনে হচ্ছে, জীবনে সব রকম আগ্রহ সজাগ রাখতে হবে। সর্বপ্রকারে নিজেকে বাড়িয়ে তুলতে হবে, নানাবিধ সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে জগতে প্রবেশ করতে হবে, শরীর ও মনকে জাগ্রত রাখতে হবে।

বীণায় যখন তার থাকে অসংখ্য তখন তার প্রত্যেকটিতে সুর মেলানো যেমন কঠিন, তেমনি মানুষের প্রকৃতিই যেখানে জটিল সেখানে সুসংগতি কঠিনতর।

তবু আমি জানি জীবন সরল, তার যান্ত্রিক গঠন যতই জটিল হোক-না কেন। জীবনের কেন্দ্রে যে সরল সত্য রয়েছে তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

রামগড়, ২৫শে মে ১৯১৪

রাতের চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও দিন সহজস্বচ্ছ, কারণ তা উজ্জ্বল এবং উন্মুক্ত। রাত্রি বাস্তবের সব সমস্যা ঢেকে রেখে স্বপ্নরাজ্যের একাধিপত্য বিস্তার করতে চায়। আলোক সত্যের অন্তস্তল উন্মোচিত করে দেখায়। যা-কিছু অপরিণত অথবা সংগ্রামে রত, যা-কিছু মুমূর্ষু অথবা মৃত, সবই প্রকাশিত করে দেয়। শ্রী ও শক্তি নিয়ে যা-কিছু বেড়ে উঠছে তাকে যে শুধু সাহায্য করছে তা নয়, তার মূলেও রয়েছে এই আলোক।

সব অসংগতি চোখে দেখেও সংগতির সুষমা আমরা অন্তরে অনুভব করি। দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ সর্বত্রই আছে, তবু সৌন্দর্যই চিরজয়ী। দিন যখন অনাড়ম্বর শুভ্র পরিচ্ছদে আবির্ভূত হয়, রাত্রি তখন মিথ্যার রহস্যজাল

নিয়ে লজ্জায় আত্মগোপন করে। দিনের পশ্চাতে বিজয়গৌরব বয়ে আনে আশা এবং আনন্দ। কারণ তখন আর একটি ঘাসের শীষ বা কণ্টক পর্যন্ত চক্ষুর অগোচরে থাকে না।

আমার জীবনেও অবশেষে প্রাতঃসূর্যের অভ্যুদয় হয়েছে। ছায়ার সঙ্গে সংঘর্ষের কাল আমি অতিক্রম করে এসেছি। এখন পিছনে-ফেলে-আসা জীবনের বন্ধুর পথের দিকে তাকালেই দেখি তা কোথাও পরিণতশ্যামল, কোথাও বালুকাময় ঊষর। তবু মন বলে, এ সবই ভালো। প্রশস্ত এই পথ, দিগন্তপর্যন্ত উন্মুক্ত; এর চারিদিকে বিরাজ করছে রবির আলো।

সি. এফ. এণ্ডরুজ -লিখিত ভূমিকা

আমি তখন সবেমাত্র শিক্ষক হিসেবে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছি। এই পত্রগুলি কবি রবীন্দ্রনাথ সেই সময়েই আমাকে লেখেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি য়ুরোপ থেকে ফিরে আসেন। কিন্তু আমি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়াতে তখনই তাঁর কাজে যোগ দিতে পারি নি। তার পরেই আবার আমাকে বন্ধুবর পিয়ার্সনের সঙ্গে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যেতে হল। সেখানে ভারতীয় শ্রমিকদের চুক্তিপত্রে আবদ্ধ করার বিরুদ্ধে যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-সংগ্রাম চলছিল তাতে আমরাও তখন যোগ দিয়েছিলাম। ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে আমরা ভারতে ফিরলাম। তার পর ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরে ফিজি যাবার আগে পর্যন্ত আমরা দুজনেই কবির সঙ্গে ছিলাম।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের শেষের দিকে নইনিতালের কাছে রামগড় থেকে কবি আমাকে প্রতিদিন যে চিঠিগুলো লিখতেন, সেগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

গ্রীষ্মের ছুটিটা পাহাড়ে কাটাবেন বলে তিনি বেশ সুস্থ শরীরেই সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, সেখানে পৌঁছবার পরে থেকেই তিনি যে মানসিক কষ্ট ভোগ করেছেন সে প্রায় মৃত্যুযন্ত্রণারই সমতুল্য। তার হাত থেকে যে কোনোদিন নিষ্কৃতি পাবেন তাও তখন আশা করতে পারেন নি। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই, ঠিক যখন তিনি এখানকার অত্যধিক গরম থেকে গিয়ে হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শরীরে মনে অশেষ তৃপ্তি অনুভব করছেন তখনই এই আঘাতটা হঠাৎ এল। মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন, মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ থেকে হঠাৎ বজ্রপাতের মতোই এই ব্যাপারটি তাঁকে অভিভূত করে।

মে মাসে লেখা চিঠিগুলোতে যে মানসিক কষ্টের উল্লেখ করেছেন তা একেবারেই কেটে গিয়েছিল। জুন মাসে তাঁর শরীর ও মনের অবস্থা খুবই ভালো। ছুটির পর স্কুলের ছেলেদের নিয়ে তিনি তাঁর কাজে আবার পূর্ণ উদ্যমে মেতে উঠলেন। সেই জুন মাসটিকে বিশেষ-একটি আনন্দের সময় বলে আমারও মনে পড়ে।

কিন্তু জুলাইর আরম্ভে আবার তাঁর জীবনে সেই পুরানো অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আবার তিনি তার আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। অস্বাস্থ্য বা প্রতিকূল আবহাওয়া—এসব কিছুই নয়, এমনকি স্কুলের কাজও তখন খুব চমৎকারভাবেই চলছিল। কিন্তু তিনি সবসময় আমাকে বলতেন যে, কিরকম একটা অনির্দেশ্য এবং অসহনীয় কষ্ট তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। আর সেইজন্যই তিনি নির্জনে যেতে

চান। স্কুল থেকে সরে কিছুদিন সুরুলে গিয়ে একা রইলেন। এভাবে তাঁর এই অবসাদের ভাব কাটতে প্রায় তিন মাস লেগেছিল। এ সময়ে তিনি বলতে গেলে প্রায় চিঠিপত্র লেখেনই নি। তবু তাঁকে যেভাবে কষ্ট পেতে দেখেছি— তার সেই বেদনাদায়ক স্মৃতি এখনও আমার মনে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের কোনো খবর তখনও আমরা পাই নি। এমনকি, শান্তিনিকেতনে এত নির্জনে আমরা থাকতাম বলে এ বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত আমাদের কানে আসে নি। অথচ কত আগেই তাঁর মন সেই ঘনিয়ে-আসা দুর্যোগের আশঙ্কায় ছেয়ে গেছে। এই সময়েই তিনি বলাকার 'সর্বনেশে' কবিতাটি লেখেন এবং যুদ্ধারম্ভের কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই এই আশ্চর্য কবিতাটি প্রকাশিত হয়। পৃথিবীতে যে অকস্মাৎ ধ্বংসের প্লাবন নেমে আসছে, তার পূর্বাভাস এতেই আমরা প্রথম পাই। এতে রয়েছে—

এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে,
রোদনে যায় ভেসে গো।
রক্তমেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গহন-পারে,
কোন্ পাগল ঐ বারে বারে
উঠছে অট্টহেসে গো।
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো॥

জীবন এবার মাতল মরণ-বিহারে।
এই বেলা নে বরণ ক'রে
সব দিয়ে তোর ইহারে।

সেই সময়কার কথা যখন ভাবি— ভয়ংকর যুদ্ধে পৃথিবীর জনসমাজ ক্ষতবিক্ষত ছিন্নবিচ্ছিন্ন, তখন আমার নিশ্চিতই মনে হয় কবির অত্যন্ত সংবেদনশীল চিত্তে এই দারুণ সংকটের আবির্ভাব বহুপূর্বেই ছায়াপাত করেছিল। অন্য কোনো ভাবেই তো আমি তাঁর এই তীব্র মনোবেদনার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারি না।

অনুবাদ শ্রীমলিনা রায়

তাও-তে-চিং (Tao-Te-Ching)। লাও-ৎস (Lao-Tsze) কথিত জীবনবাদ। ভূমিকা ওয়াং ওয়েই-ছং (Wang Wei-ch'oug)। অনুবাদ অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্য অকাদেমী (Sahitya Akademi) নয়া-দিল্লী, ১৯৬০। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৷৵০+৫০। মূল্য দুই টাকা।

এই অনুবাদখানির প্রকাশনকে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব এবং বিশেষ লক্ষণীয় ঘটনা বলা যায়। এই বিষয়ে প্রথম উল্লেযোগ্য কথা হইতেছে এই যে, এই বইখানি চীনা ভাষা হইতে সরাসরি বাঙ্গালায় অনূদিত প্রথম পুস্তক। মৌখিক বা কথ্য চীনা ভাষা, আধুনিক চীনদেশের পেই-চিঙ্ বা পিকিঙ্, শাঙ্-হাই, কান্-তুঙ বা কাণ্টন প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের নানা কথ্য ভাষা, সহজেই আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু লিখিত চীনা ভাষার কার্য্যকর জ্ঞান লাভ করা বহু বৎসরের বহু পরিশ্রম সাপেক্ষ। চীনা ভাষার লিখন-পদ্ধতিই এই ভাষা শিক্ষার পক্ষে প্রধান অন্তরায়। চীনা লিখন-পদ্ধতি ভারতীয়, আরবী এবং ইউরোপীয় পদ্ধতির মতন কেবল ভাষাগত স্বর ও ব্যঞ্জন-ধ্বনি অবলম্বন করিয়া নহে। চীনা ভাষায় নির্দিষ্ট বর্ণমালা বা অক্ষর-সমষ্টি নাই, আছে সহস্র-সহস্র বিভিন্ন Pictogram বা বস্তু-চিত্র, Ideogram বা ভাব-চিত্র, এবং Phonogram বা ধ্বনি-চিত্র। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে সংকলিত সুবৃহৎ চীনা অভিধান K'ang-Hsi খাঙ্-শী-তে এইরূপ বিয়াল্লিশ হাজার চিত্রলিপি সংগৃহীত হইয়াছে। এই লিপিগুলির গঠনে একটি চিত্তাকর্ষক ও কৌতুকাবহ কিন্তু বিশেষ জটিল রীতি কার্য্য করিতেছে দেখা যায়, এবং এই রীতি সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিলে, চীনা চিত্রলিপির গঠন বুঝিতে পারা যায়, এবং এগুলিকে যথাসম্ভব মনে রাখিবার জন্য সাহায্যও পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও, বড়ো-বড়ো পণ্ডিতরাও সাধারণতঃ দশ হইতে পনেরো হাজারের বেশী সংখ্যার চিত্রাক্ষর মনে রাখিতে পারেন না, এবং যাঁহারা তিন, চার বা পাঁচ হাজার অক্ষর মনে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারেন, অর্থাৎ পড়িতে, বুঝিতে ও লিখিতে পারেন, চীনা ভাষায় তাঁহাদের কিঞ্চিৎ অধিকার হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে পারা যায়। কিন্তু এই তিন, চার বা পাঁচ হাজার অক্ষর শিক্ষা করিতে চার পাঁচ বৎসর লাগিয়া যায়, এবং অতন্দ্রভাবে চীনা লিপির চর্চা না রাখিলে ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। সুতরাং চীনা ভাষার চর্চা অন্যান্য ভাষার চর্চার তুলনায় একটি বিশেষ কঠিন ব্যাপার। প্রাচীন চীনা জাতির ও চীনা সংস্কৃতির একটি অদ্ভুত শক্তির পরিচয় ইহা হইতেই পাওয়া যায় যে, কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণে চীনা ভাষার লিখিত রূপ এই প্রকার জটিল হওয়া সত্ত্বেও, তাহাদের সাহিত্য পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম প্রধান ও বিরাট্ সাহিত্য, এবং চীনা জনসাধারণের মধ্যেও আশ্চর্য্যভাবে বিদ্যানুরাগ ও অক্ষরজ্ঞান বিদ্যমান।

পৃথিবীতে পাঁচটি ভাষায় বিরাট্ মৌলিক সাহিত্য পাওয়া যায়, যে সাহিত্য কতগুলি বড়ো-বড়ো সংস্কৃতির আশ্রয়-স্থল। সেই পাঁচটি ভাষা হইতেছে সংস্কৃত, গ্রীক, লাতীন, আরবী ও চীনা। সংস্কৃত সাহিত্যের অনেকটাই আমরা আমাদের ভারতীয় জীবন-প্রবাহের মধ্যেও বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষায় অনুকরণ ও অনুবাদের মাধ্যমে পাইয়াছি। গ্রীক, লাতীন এবং আরবী সাহিত্যের অনেকগুলি বই বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছে— তবে বেশীর ভাগই ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে। আরবী ভাষার কোরান এই ভাষার

একটি প্রধান গ্রন্থ, এবং সরাসরি আরবী হইতে ইহার একাধিক বাঙ্গালা অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতাবৎ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে চীনা সাহিত্যের উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া আমরা বঙ্গভারতীর চরণে নিবেদন করিতে সমর্থ হই নাই। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ প্রচারকেরা, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হইতেই চীনদেশে বুদ্ধ-বাণী প্রচারের জন্য যাইতে থাকেন, তাঁহারা ভারত ও চীনের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির পথে একটি সংযোগ-সেতুর স্থাপনা করেন; এবং হাজার বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ভারত ও চীনের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ বিদ্যমান ছিল। এই সংযোগের ফলে, ভারতের বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা কল্যাণমিত্র-রূপে চীনের মানুষের কাছে যাইতেন, এবং দুরূহ চীনভাষা শিক্ষা করিয়া, সংস্কৃত ও পালি হইতে বৌদ্ধ শাস্ত্র ও অন্য গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করিতেন। এই কার্য্যে তাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ চীনা পণ্ডিতদেরও সহযোগিতা পাইয়াছিলেন। ইঁহাদের মিলিত চেষ্টার ফলে, চীনা বাঙ্ময়ের একটি নূতন দিক্ খুলিয়া যায়—চীনা বৌদ্ধ সাহিত্য। ইহার প্রভাব কোরিয়া, জাপান ও ভিয়েৎ-নামে পরিব্যাপ্ত হয়, এবং ইহার দ্বারা চীন কোরিয়া জাপান ও ভিয়েৎ নামের জনসাধারণের মনে এক অভূতপূর্ব দার্শনিক ও ধর্মীয়, এবং সাংস্কৃতিক ও আনুষ্ঠানিক বোধ, বিচার ও ধর্মজীবন প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু চীন-প্রবাসী ভারতীয় পণ্ডিতগণ চীনভাষা হইতে কোনও লক্ষণীয় গ্রন্থ ভারতীয় ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে অনুবাদ করেন নাই, এবং চীনা পণ্ডিতেরাও এই বিষয়ে আদৌ আগ্রহ দেখান নাই। এ বিষয়ে আগ্রহ দেখা দিয়াছিল একজন ভারতীয় রাজার মনে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে, হর্ষবর্ধন এবং Hiuen-Ts'ang হিউএন-ৎসাঙ-এর (বা Hswan Chuang শ্যুআন্ চুআঙ-এর) সমসাময়িক কামরূপ বা আসামের রাজা কুমারভাস্কর, চীনদেশের ধর্ম ও সাহিত্যিক সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সময়ে ভারতবর্ষে কি করিয়া একটি চীনা গীতি-নাট্যের কতকগুলি গীতি ও সুর আসিয়া পহুঁছায়,—ইহার গানগুলি অবশ্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া থাকাই স্বাভাবিক। এই গীতি-নাট্যের কথা সম্রাট্ হর্ষবর্ধন শুনিয়াছিলেন, এবং তিনি চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন-ৎসাঙ্-কেও এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন। কুমারভাস্কর চীনদেশের ঋষি লাও-ৎসে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু মন লইয়া, ৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে চীন হইতে আগত রাজদূত Li Yi-piao লী য়ী-পিয়াও-কে অনুরোধ করেন, লাও-ৎসে-প্রণীত দার্শনিক পুস্তক চীনা হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে যেন পাঠানো হয়, এবং সেই সঙ্গে লাও-ৎসে-র একটি প্রতিমূর্তি। লাও-ৎসে-প্রচারিত তাও-বাদ বা ঋত-বাদের পরবর্তী বিকারের আধারে যে বামাচার বা বীরাচার চীনদেশেই প্রথম প্রবর্তিত হয়, এবং যাহা পরে ভারতবর্ষে 'চীনাচার' নামে ভারতীয় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রে স্থান লাভ করে, তাহার প্রাথমিক প্রভাব সম্ভবতঃ ঐ সময়ে, 'বশিষ্ঠ'-প্রমুখ চীন হইতে প্রত্যাগত ভারতীয় তান্ত্রিক গুরুগণের মাধ্যমে, স্থলপথে কামরূপে আসিয়া পহুঁছিয়াছিল (এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, মৎপ্রণীত প্রবন্ধ— India and China : Ancient Contacts— What India received from China : Journal of the Asiatic Society, Calcutta, Vol, I, No. 1, 1959, Published 1961 : pp. 87—122)। যাহা হউক, লী য়ী-পিয়াও চীনদেশে ফিরিয়া গিয়া এই অনুবাদের জন্য ভারতীয় রাজার অনুরোধ চীন-সম্রাটের গোচরে নিবেদন করেন। চীন-সম্রাট্ সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধ ও তাও-বাদী চীনা পণ্ডিতদের আহ্বান করিয়া, উভয় পক্ষের মিলিত চেষ্টায় এই অনুবাদটি প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। অনুবাদের খুঁটিনাটি লইয়া নানা মত ভেদ ও বাদ-বিবাদের পরে, অনুবাদটি প্রস্তুত হয়, ও যথাকালে

ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়; কিন্তু এই অনুবাদের পরিণাম কি দাঁড়াইয়াছিল কেহ জানে না, ভারতবর্ষে আসিয়া থাকিলেও এই অনুবাদ এখন একটি লুপ্ত গ্রন্থ।

প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন চীনের ঘনিষ্ঠ মিলনের যুগে এই ছিল একমাত্র চীনা গ্রন্থ যাহার ভারতীয় অনুবাদ হয়— কিন্তু এই সংস্কৃত অনুবাদ একেবারে লুপ্ত। অন্য চীনা গ্রন্থের অনুবাদের কথা আমরা জানি না। তবে, পরোক্ষভাবে মুখে-মুখে চীনা সাহিত্যের কিছু-কিছু সংবাদ ও তথ্য ভারতবর্ষে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচারিত হওয়া অসম্ভব নহে, বরঞ্চ বিশেষ সম্ভবপর ব্যাপারই ছিল। আমার মনে হয়, এইভাবে কালিদাসের মতো দিব্যশক্তি-সম্পন্ন কবির মধ্যেও পরোক্ষভাবে কিছুটা চীনা প্রভাব আসিয়া গিয়াছিল— এ বিষয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি (উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মোটের উপর, চীনের সাহিত্য ভারতবর্ষে এতাবৎ অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে।

ইউরোপে আধুনিক কালে অনেক চীনবিৎ পণ্ডিত ফ্রান্স জার্মানী ইংলাণ্ড হলাণ্ড সুইডেন ইটালি রুষ প্রভৃতি দেশে এবং আমেরিকায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং ইঁহাদের মধ্যে কাহারও-কাহারও চীনভাষায় অসাধারণ প্রবেশ ছিল দেখা যায়। ইঁহাদের দ্বারা বহু চীনা পুস্তক ইংরেজী ফরাসী জার্মান প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়; বিশেষ করিয়া ইংরেজী অনুবাদ, স্বল্পসংখ্যক কৌতূহলী ভারতীয় সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের নিকট সমাদর লাভ করে। চীনা ভাষার চর্চা ভারতীয়দের মধ্যে হাজার বৎসরেরও বেশী কাল ধরিয়া বন্ধ ছিল। ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে শিক্ষিত ভারতবাসী আধুনিক যুগে তাহার প্রাচীন কল্যাণমিত্র চীনকে আবিষ্কার করিল, এবং চীনা সাহিত্য সম্পর্কে সচেতন হইল, চীনা ভাষার চর্চার কথা ভাবিতে লাগিল। এই শতকের দ্বিতীয় পাদে বহু-ভাষাবিৎ হরিনাথ দে মহাশয় চীনা ভাষার চর্চা আরম্ভ করেন। মীর্জাপুর ও পাটনার বিখ্যাত ব্যারিস্টর ও ঐতিহাসিক গবেষক স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ভাষার চর্চা করিয়া একটি বৃত্তি লাভ করেন, কিন্তু তিনি বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এদিকে ১৯১৭ সালে স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ভাষা শিখাইবার জন্য একজন বেলজিয়ান পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন; কিন্তু তিনিও বিশেষ কৃতকার্য্য হন নাই। চীনা ভাষার প্রকৃষ্ট চর্চা আরম্ভ হইল রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীতে। ১৯২২ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক Sylvain Le'vi সিল্‌ভ্যাঁ লেভি-র শুভাগমন ঘটিল, এবং তিনি রীতিমত চীনা পাঠন আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইতিপূর্বে অধ্যাপক Lim লিম্ নামে একজন চীনদেশীয় তরুণ অধ্যাপক শান্তিনিকেতনে চীনা পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কয়েক মাস ধরিয়া চীনা পড়িবার সুযোগ আমারও হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত সাগ্রহে এ বিষয়ে অধ্যাপক লেভির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু লেভির প্রধান শিষ্য ছিলেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী। প্রবোধচন্দ্রকে এ যুগে ভারতবর্ষের প্রথম ও প্রধান চীনবিদ্যা-বিৎ বলিতে পারা যায়। তিনি শান্তিনিকেতনে নেপালে ইন্দোচীনে এবং জাপানে ও ফরাসীদেশে গুরু সিল্‌ভ্যাঁ লেভির নিরন্তর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং চীনা ভাষায় প্রাবীণ্য অর্জন করিয়া গুরুর স্নেহ ও আশীর্বাদে ধন্য হইয়াছিলেন। প্রবোধচন্দ্র, ফরাসী ভাষায় চীনা বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাস রচনায়, চীন-সংস্কৃত প্রাচীন অভিধান সম্পাদনায়, চীন ও ভারতের সংযোগের নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিয়া, চীন এবং মধ্য-এশিয়া ও ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে

গবেষণাত্মক গ্রন্থ লিখিয়া, সমগ্র বিশ্বের পণ্ডিতদের কাছে আধুনিক ভারতের চীন-বিদ্যাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্র প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন, পরে বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন, এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হন। তাঁহার কার্য্যকালে, কতকটা অধ্যাপক Tan Yun-Shan তান্ য়ুন-শান্-এর সহযোগিতায়, বিশ্বভারতী ভারতবর্ষে চীন-বিদ্যার প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। স্বাধীনতা-লাভের পরে ভারতীয় পণ্ডিতদের পক্ষে চীনা ভাষার চর্চার প্রয়োজন ভারত সরকার অনুভব করিতে থাকেন, এবং তাহার ফলে প্রতি বৎসর স্বল্পসংখ্যক কতকগুলি ভারতীয় যুবককে চীনা ভাষা শিক্ষার জন্য বৃত্তি দিয়া চীন দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। প্রায় এই সঙ্গেই সংস্কৃতের ও ভারতবিদ্যার অধ্যাপনার জন্য পিকিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবোধচন্দ্র বাগচীও প্রেরিত হন। প্রথমবার যে পাঁচ ছয় জন ভারতীয় ছাত্র প্রেরিত হন, তাঁহাদের মধ্যে পুনা Ferguson ফার্গুসন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাসুদেব গোপাল পরাঞ্জপের পুত্র শ্রীমান্ বসন্ত বাসুদেব পরাঞ্জপে সকলের চেয়ে বেশী নাম করেন। পিকিঙের চলিত ভাষা তিনি অনর্গল বলিতে পারেন ইহা আমি পিকিঙ-এ অবস্থান-কালে দেখিয়াছি, এবং তাঁহার ভাষা-জ্ঞানের প্রশংসা চীনাদেরও করিতে শুনিয়াছি ; তদ্ভিন্ন তিনি চীনা লিখিত ভাষাও খুব ভালো করিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন— সুদূর আমেরিকাতে ফিলাডেল্‌ফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত Derk Bodde ড্যর্ক বডে-র মুখে ইঁহার ভাষা-জ্ঞান সম্বন্ধে সাধুবাদ শুনিয়াছি। এই প্রথম দলে ছিলেন শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি ইতিপূর্বেই চীনা হইতে কিছু কিছু অনুবাদ বাঙ্গালায় করিয়াছেন ; এবং ইঁহার চীন-ভাষা-শিক্ষার সার্থকতা এই আলোচ্য অনুবাদেই প্রথম ভালো করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

চীনা হইতে অনূদিত এই পুস্তকখানি এক হিসাবে চীন-জাতির গভীরতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উপলব্ধির পরিচায়ক। এইরূপ পুস্তক চীনা ভাষায় তো একক বটেই, পৃথিবীর অন্যান্য সমৃদ্ধ ভাষার সাহিত্যেও ইহার জুড়ি মেলা দুষ্কর। একমাত্র ভারতের প্রাচীনতম উপনিষদ্‌গুলির সহিত এই পুস্তকের তুলনা হইতে পারে। জগতের সাহিত্যে কতকগুলি এমন বই আছে যেগুলি একবার পাঠ করিলে আর ছাড়িতে পারা যায় না— যেমন, কালিদাসের 'মেঘদূত' ও 'শকুন্তলা', রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রচনা, গ্রীক ট্রাজেডি নাটকাবলী, শেক্‌স্পিয়রের নাটক, হাইনের গীতি-কবিতা, প্রকৃতি-অবলম্বনে রচিত প্রাচীন চীনা কবিতা, ইত্যাদি। আধ্যাত্মিক এবং রহস্যবাদের রসে ভরপূর এইরূপ সাহিত্য দুর্লভ। প্রাচীন ভারতের উপনিষদাবলী, প্রাচীন চীনের তাও-তে-চিঙ্, রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা' পর্য্যায়ের কবিতা, মাণিক্যবাচকের তমিল ভাষায় রচিত শিবের প্রতি আত্মনিবেদনের কবিতা, আরব জাতির ও ইরাণের সূফী ভক্তদের কবিতা, সন্ত কবীরদাসের প্রেম ও তত্ত্ববিষয়ক পদ— মানবমনের এবং মানবাত্মার পক্ষে এইরূপ 'অপৌরুষেয়' রচনার আবেদন চিরন্তন।

লাও-ৎসে উপনিষদের ঋষিদের যুগের শেষ পর্য্যায়ের মানুষ ছিলেন, তিনি ভারতের বুদ্ধদেব ও তাঁহার স্বদেশের মনীষী K'ung Fu Tsze খুঙ-ফূ-ৎসে বা Confucius কন্‌ফুশিয়স্ উভয়ের বয়োবৃদ্ধ সমসাময়িক ছিলেন। তিনি যে আধ্যাত্মিক মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের আবিষ্কার বা স্বকপোল-কল্পনা নহে। সুপ্রাচীন কালে চীনা জাতির গভীরতম আধ্যাত্মিক প্রশ্ন ও আকুতির ফলে যে বিচার ও দর্শনধারা গড়িয়া উঠে, লাও-ৎসের তাও-বাদের মূল তাহারই মধ্যে নিহিত। সব দেশেই

পদ্মের মূল খুঁজিতে গেলে জলের নীচে পঙ্কস্তূপে গিয়া পঁহুছিতে হয়। পৃথিবীর সব ধর্মেই যে-সব মনোহর ভাব বা কল্পনা পাওয়া যায়, নৃতত্ত্ববিদ্যার প্রমাণে দেখা যায়, বহু ক্ষেত্রে সেগুলির উদ্ভব হইয়াছে কতগুলি বর্বর এবং এমনকি বীভৎস কল্পনা বা অনুষ্ঠান হইতে। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনার স্থান ইহা নহে। তাও-বাদ এবং আমাদের নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মবাদ— এই দুই প্রায় এক পর্য্যায়েই গিয়া পঁহুছিয়াছে। তাও-বাদের পিছনে একটি পুরাতন চীনা কল্পনা আছে— সেটি হইতেছে এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের মধ্যে সদাই চলিতেছে য়াঙ (Yang) এবং য়িন্ (Yin) অর্থাৎ আলোক ও ছায়া, তাপ ও শীত, পুরুষ ও প্রকৃতি, এই দুইয়ের খেলা। অনুরূপ কল্পনা বা চিন্তা অন্য বহু জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু এই য়াঙ ও য়িন্-এর লীলার মধ্যে বা পরস্পরের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটি বিশ্বনিয়ন্ত্রী শক্তি কার্য্য করিতেছে; সেই শক্তির নাম হইতেছে 'তাও'। 'তাও' শব্দের সোজা অর্থ 'পথ', এবং যে চীনা চিত্রলিপি এই 'তাও' শব্দের ভাবকে প্রকাশ করে, তাহার বিশ্লেষ করিলে দেখা যায় যে তাহাতে দুইটি অংশ আছে— একটি হইতেছে মানুষের মাথা, আর একটি হইতেছে মানুষের হাত; এই দুইটি চিত্রের সংযোগে ইহাই সূচিত হয় যে, যদ্দ্বারা কাহাকেও হাতে ধরিয়া মাথা অর্থাৎ মূলস্থানে পঁহুছাইয়া দেওয়া যায়— এই চিত্রলিপির রূঢ়ি অর্থ হইতেছে 'পথ', যে পথ মানুষকে তাহার অভীপ্সিত বা মূল গন্তব্যে পঁহুছাইয়া দেয়। চীনে ঋষি লাও-ৎসে এই তাও-কে যেভাবে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি 'তাও'-এর দুইটি স্বরূপ বা প্রকৃতি উপলব্ধি করিয়াছিলেন— (১) সমগ্র বিশ্ব, জগৎ ও জীবন, যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান, যাহা কিছু বোধ- ও অনুভূতি-সাপেক্ষ, তাহার পিছনে যে অদৃশ্য শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহা হইতেছে 'তাও'। এই 'তাও'-এর কোনও ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে, ইহা বাঙ্‌মনোঽতীত, সব-কিছুর উৎস এই 'তাও'— কিন্তু 'তাও'-কে ধরিতে ছুঁইতে পারা যায় না। ইহা রহস্যের অন্তর্নিহিত রহস্য, অর্থাৎ আমাদের উপনিষদ্ বা বেদান্তের ভাষায়, ইহা নির্গুণ ব্রহ্ম। আবার এই 'তাও' নিজেকে বিশ্বজগতের মধ্যে প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে— যেখানে যাহা কিছু কার্য্য করিতেছে, সবই 'তাও'-এরই কাজ, অর্থাৎ (২) অন্যদিকে 'তাও'-এর এই প্রকাশকে আমাদের সগুণ ব্রহ্মের সঙ্গে তুলিত করিতে পারা যায়। 'তাও' নিজেকে প্রকট করিয়াছে তাহার Teh 'তেঃ' বা Te' 'ত্য' অর্থাৎ বিশ্ব প্রপঞ্চের ধারক ধর্ম-রূপে— সে ধর্ম কেবল যে সব-কিছু ধরিয়া থাকে তাহাই নহে, সব-কিছুর পরিচালক নীতিও বটে।

বইখানির নাম 'তাও-তেঃ-চিঙ্'। শব্দটি পিকিঙ-এর উচ্চারণে 'চিঙ্', প্রাচীনতর King 'কিঙ'-এর পরিবর্তিত রূপ— 'কিঙ্' এই উচ্চারণ এখনও দক্ষিণ চীনে অবিকৃত আছে। 'কিঙ্' বা 'চিঙ্' শব্দের অর্থ, 'শাস্ত্র' বা 'সূত্র', অথবা 'বিশেষ গ্রন্থ'। বৌদ্ধ 'সূত্র' বা 'শাস্ত্র' চীনভাষায় 'কিঙ্' বা 'চিঙ্' রূপে অনূদিত হয়। 'তাও' শব্দের মূলগত অর্থ— 'পথ'। প্রকৃত অর্থে এই শব্দ নানাভাবে অনূদিত হয়। ইংরেজীতে Way ছাড়া Reason, Intelligence, Way of Life, Supreme Reality প্রভৃতি নানা অনুবাদ আছে। সংস্কৃতে এই বই অনুবাদের চেষ্টা যখন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে হইয়াছিল, তখন তাও-বাদী পণ্ডিতেরা ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ স্থির করেন 'বোধি' বা পূর্ণজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান, কিন্তু হিউএন-ৎসাঙ তাহাতে আপত্তি করেন, ইনি স্থূলার্থ 'মার্গ' শব্দই ব্যবহার করিতে চাহেন। কিন্তু উত্তরকালে সংস্কৃত 'বোধি' ও চীনা 'তাও' বহু চীনা বৌদ্ধ পণ্ডিতের নিকট সমার্থক বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু 'বোধি' ও 'তাও'কে সমার্থক বলা চলে না। আমার মনে হয়, তার-এর লক্ষণ লাও-ৎসে যাহা দিয়াছেন তাহা

ধরিলে, তাও শব্দের যথার্থ বা উপযুক্ত সংস্কৃত প্রতিশব্দ হইতেছে 'ঋত'। সংস্কৃত ঋ-ধাতুর অর্থ গমন-করা— 'ঋচ্ছতি' = 'যায়'। 'ঋত' অর্থে 'গত', অর্থের প্রসারে, 'গমন' এবং 'গমন-পথ বা মার্গ'। যেমন, সংস্কৃত সৃ-ধাতু— প্রসরণ বা চলন-অর্থে; 'সরতি' = 'চলে, সরে', 'সৃত' = 'চলিত, গত', পরে 'গমন'; 'সৃত' + স্বার্থে 'ক' = 'সৃতক', প্রাকৃতে 'সটক', 'সডক', এবং ইহা হইতে হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভাষায় 'সড়ক'—'রাস্তা বা পথ' অর্থে। যাহার মধ্য দিয়া বিশ্ব-প্রপঞ্চের সব কিছু বাহিত বা চালিত হইয়া থাকে, তাহাই 'পথ', Way বা 'তাও'; তাহাই 'ঋত'— অর্থাৎ বিশ্বের পথ, বিশ্বের পরিবাহণ বা পরিচালন যাহার দ্বারা সাধিত হয়। এইভাবে, অর্থ-সম্প্রসারণে Teh 'তেঃ' বা Te 'ত্য' শব্দও বহ্বর্থ, কিন্তু ইহার এক মৌলিক অর্থ, 'অন্তর্নিহিত গুণ, বা ধর্ম'। 'তাও-তেঃ-কিঙ্ (চিঙ্)'— এই গ্রন্থ-নামকে আমরা সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় 'ঋত-ধর্ম-শাস্ত্র' বা 'সূত্র' রূপে অনুবাদ করিতে পারি।

এখন য়ুরোপ ও চীনের প্রাচীন-চীন-বিদ্যা-বিৎ পণ্ডিতেরা এই তাও-বাদের মূল উৎস কী ছিল, তাহা লইয়াও আলোচনা করিতেছেন। আপাতদৃষ্টিতে, তাও-তে-চিঙ্-এর ভিতরের কথা মোটামুটি ভাবে আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, ইহা আমাদের ভারতের প্রাচীন উপনিষদের মধ্যেই যেন একখানি। অনেক ভারতীয়ের পক্ষে, এই উপর-উপর সাদৃশ্য দেখিয়া পুলকিত হইয়া এইরূপ অনুমান করা অস্বাভাবিক হইবে না যে, বুঝি-বা চীনের তাও-বাদের উপরে ভারতের ব্রহ্মবাদের ছাপ আছে। কিন্তু তাহা প্রমাণিত হয় নাই। বরং ইহাই অধিকতর সম্ভব যে, এই দুই দেশের দার্শনিক বিচার-ধারা স্বতন্ত্র-ভাবে উদ্ভূত হয়, এবং পরে তাহাদের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা মানব-সাধারণতা বা বিশ্বমানবিকতার এক প্রকাশ মাত্র। পোলিনেসিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে যে Mana 'মানা' অর্থাৎ সর্বত্র কার্য্যকর অদৃশ্য ঐশী শক্তির ধারণা আছে, তাহা, এবং আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ জনগণের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে যে এক সর্বব্যাপী ঐশী শক্তি সম্বন্ধে আস্থা আছে, সেই আস্থাও, চীনের তাও-বাদ এবং ভারতের ব্রহ্মবাদের অনুরূপ। একই ধরনের বিশ্বাস বা বিচার যে এত পরিব্যাপ্ত, তাহার মূল কারণ, আমাদের মনে হয় ইহাই যে, সর্বত্র মানুষ একই প্রকার উপলব্ধি বা অনুভূতিতে পঁহুছিতে পারিয়াছে। এইরূপ ভাব একটি বিশেষ দেশকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিবার পরে, বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে— এইরূপ অনুমানের বিপক্ষে কেবল এই কথা বলা যায় যে, দেশ কাল ও পাত্র অবলম্বন করিয়া এই বিষয়ে কোন প্রমাণ আমরা দিতে পারি না।

তাও-তে-চিঙ্-এর ভিতরের কথা বিশদ করিয়া বুঝাইবার শক্তি বা সময় আমার নাই— উপনিষদের মতো তাও-তে-চিঙ্-এরও বহু টীকা ও বহু ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে— এক ইংরেজীতেই আজ পর্য্যন্ত অন্যূন কুড়িখানি সটীক অনুবাদ পাওয়া যাইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে শেষ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না, নিজের-নিজের মানসিক আধারে সহৃদয় ব্যক্তি তাও-বাদকে নিজের মতো করিয়াই দেখিবেন। তাও-তে-চিঙ্-এর প্রতি ইংরেজীর মাধ্যমে অনেক ভারতবাসী আকৃষ্ট হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথা আমাদের বলিতে হয়। Lionel Giles লায়োনেল গাইল্‌স্-কৃত ইংরেজী অনুবাদের আধারে বাঙ্গালায় ইনি তাও-তে-চিঙ-এর কতকগুলি অংশ অনুবাদ করেন 'চীনের ধূপ' এই নাম দিয়া। সত্যেন্দ্রনাথের ধারণা ছিল, তাও-তে-চিঙ্ উপনিষদেরই ভাবজগতের গ্রন্থ, এবং তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন যে 'তাও' শব্দ সংস্কৃতের পরব্রহ্ম-বাচক সর্বনাম-শব্দ 'তৎ'-এর চীনা রূপ। কিন্তু বাস্তবিক

একথা ঠিক নহে— চীনা ভাষায় এখন শব্দটি Tao, Dao 'তাও' বা 'দাও' রূপে উচ্চারিত হয়, এবং খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগে এই শব্দের উচ্চারণ ছিল Dhao 'ধাও' বা Dhau 'ধাউ'।

তাও-তে-চিঙ্ বইখানি বিশেষ মন দিয়া পড়িবার। ইহাতে লাও-ৎসে-র প্রস্তাবিত ও প্রচারিত দর্শন, ধারাবাহিক রূপে বিষয় হইতে সম্পৃক্ত বিষয়ান্তরে, বিচার-শৈলী পরিচালিত করিয়া লিপিবদ্ধ হয় নাই। কতকটা এলোমেলো ভাবে, কোনও শৃঙ্খলা না মানিয়া, বিভিন্ন বিষয়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ইহার একাশীটি বিভিন্ন অধ্যায়ে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই একাশী অধ্যায়কে আবার নূতন-রূপে না সাজাইলে, পর-পর ইহার আলোচনার বিষয়বস্তু ও ধারা বুঝিতে পারা সহজ হয় না। Lionel Giles-এর ইংরেজী অনুবাদ, যেটি Wisdom of the East গ্রন্থমালায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং পরে যাহার বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহার একটি বিশেষ গুণ হইতেছে যে অনুবাদক অধ্যায়গুলি নূতন করিয়া বিভিন্ন বিভাগে বিন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে, মূল গ্রন্থের উপর একটু উৎপীড়ন করা হইলেও, সাধারণ পাঠকের কাছে বিভিন্ন বিষয়— আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উপলব্ধি, দার্শনিক বিচার ও দৃষ্টিভঙ্গী, জীবন-নীতি, রাজ্য-পরিচালন, যুদ্ধ, বিনয় ও নম্রতা, নিষ্ক্রিয়তা, বিরোধিভাব-মূলক উক্তি ও নীতিসূত্র, ইত্যাদি নানা বিষয়ে লাও-ৎসে-র বক্তব্য ধরা ও বুঝিয়া লওয়া সহজ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ মূল গ্রন্থের অনুসারী। ইহাতে প্রাচীন চীনা সম্পাদকেরা গ্রন্থখানিকে যে একাশীটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন, পর-পর সেইরূপ অধ্যায়গুলি ধরিয়াই অনুবাদ করা হইয়াছে। তাও-তে-চিঙ্-এর প্রামাণিকতা লইয়া চীনদেশেই অনেক মতভেদ আছে। সাধারণতঃ কেহই এই গ্রন্থকে লাও-ৎসে-র সময়ে রচিত বলিয়া মনে করেন না, যদিও লাও-ৎসে-র বহু উক্তি ও মতের স্থান যে ইহাতে আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। নানা পাঠভেদও দেখা যায়। মূল পুস্তকের অনুবাদ করিতেছেন বলিয়া অমিতেন্দ্রনাথ বহু পাঠভেদও বিচার করিয়াছেন। বইখানির ভূমিকা-স্বরূপ আধুনিক চীনের একজন বিখ্যাত দার্শনিক Wang Wei-Ch'ong ওয়াঙ্-ওয়েই-ছঙ্-এর একটি নাতিক্ষুদ্র প্রবন্ধ তিনি অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। তাহা হইতে এই বইখানি সম্বন্ধে কতকগুলি নির্ভরযোগ্য তথ্য ও বিচার পাওয়া যাইবে। এই ভূমিকায় লাও ৎসে-র পূর্বেকার ও সমসাময়িক কতকগুলি লেখক কর্তৃক বিভিন্ন গ্রন্থে প্রচারিত কতকগুলি সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক বিচারের সহিত লাও-ৎসে-র গ্রন্থের সাম্য ও সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এ বিষয়ে সুইডেন-দেশীয় চীনবিৎ Karl Ludvig Reichelt কার্ল্ লুড্‌ভিগ্ রাইখেল্ট্-এর প্রাজ্ঞ এবং প্রৌঢ় আলোচনা, তৎপ্রণীত Religion in Chinese Garment পুস্তকের প্রথম কয়েক অধ্যায়েও পাওয়া যাইবে (ইংরেজী অনুবাদ Joseph Tetlie জোসেফ টেট্‌লি-কৃত, Lutterworth Press, London, 1951)। ভূমিকা-লেখক চীনা অধ্যাপক, কম্যুনিস্ট-পন্থী বলিয়া, লাও-ৎসে-র রচনার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্মুখিতার বিচার করেন নাই, কারণ কম্যুনিস্ট নীতি জড়বাদের বাহিরে কোনও বিচারধারার বা আলোচনার মূল্যায়ন করিতে নারাজ বা অপারগ। অথচ, বিশ্বের তাবৎ সভ্যজাতির পণ্ডিতদের মতে, তাও-তে-চিঙ্-এর আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা উপলব্ধিই হইতেছে ইহার প্রধান কথা—যে অনুভূতি বা উপলব্ধি জড়বাদের দ্বারা অস্বীকৃত। Dr. Paul Carus পল কেরস-কৃত অনুবাদ ও আলোচনা (Lao-Tze's Tao-Teh-King, Chinese-English, Chicago, the Open Court Publishing Co., 1898), Lin Yu-Tang লিন্ য়ু-তাঙ-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (The Wisdom

of Lao-tse, the Modern Library, New York, 1948), Arthur Waley আর্থর ওয়েলি-কৃত টীকা-টিপ্পনী সংবলিত অনুবাদ (The Way and its Power : London, George Allen and Unwin, 1934) এবং R. B. Blakney ব্ল্যাকনির সটীক অনুবাদ (The Way of Life, Mentor Books, New York, 1955), তাও-তেঃ-চিঙ-এর আলোচনায় বিশেষ কার্য্যকর হইবে।

মূল চীনা ভাষা অত্যন্ত দুর্বোধ্য, এবং প্রাচীন চীনা বাক্যভঙ্গী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, এবং সূত্রাকারেই যেন প্রাচীন চীনা ভাষায় সব কথা বলা হইত। যেমন, ইংরেজীতে বলিব, the nature of man is radically good, অর্থাৎ 'মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি-মূলেই হইতেছে ভালো বা সৎ'— প্রাচীন চীনায় এই ভাবটিকে প্রকাশের জন্য মাত্র চারিটি একাক্ষর শব্দই যথেষ্ট ছিল—zhin sheng, pen shen—যথাক্রমে এই শব্দ চারিটির ইংরেজী আক্ষরিক অনুবাদ দাঁড়াইবে—man nature, root good। তবুও ইহা একটি সহজ দৃষ্টান্ত— ইহা অপেক্ষা আরও কঠিন ব্যাসকূটের ছড়াছড়ি প্রাচীন চীনা সাহিত্যে। প্রাচীন চীনা ভাষায় যাহা কেবল মূল বা প্রধান ভাব প্রকাশ করে, ধাতুর মত কেবল সেই শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াই যেন বক্তা বা লেখক খালাস, বাক্যপূরক উপসর্গ, অব্যয়, ক্রিয়ার কাল বা প্রকার, বিশেষ্যের বচন ও কারক, এ-সমস্তকে বাক্যের অর্থসঙ্গতি ধরিয়া সংযোগ করিতে হয়, বা বুঝিয়া লইতে হয়। সেগুলির সমাধান এই বইয়ের মধ্যে আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় অমিতেন্দ্রনাথ কি ভাবে করিয়াছেন, সে বিষয় মতামত প্রকাশের অধিকার আমার নাই। তবে ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি যখন এই দুরূহ কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, বিশেষ ঔচিত্যসহকারে তিনি পথিকৃৎ এবং পূর্বাচার্য্যদের বক্তব্য ও অভিমত দেখিয়াছেন ও বিচার করিয়াছেন, এবং তাহার পর নিজের অনুবাদ দিয়াছেন। এইরূপটি করাই বাঞ্ছিত।

আমি বহু বৎসর ধরিয়া তাও-তেঃ-চিঙ্-এর ভক্ত পাঠক। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর হইল, প্রথম Lionel Giles-কৃত অনুবাদ পড়ি, এবং পড়িয়া মুগ্ধ হই। সেই সময় হইতে এই বইখানিকে কখনও ছাড়িতে পারি নাই। প্রায় এই সময়েই, Paul Carus-এর যে একটি চমৎকার সংস্করণ আছে, যাহাতে চীনা মূল গ্রন্থ, ইংরেজী অনুবাদ, এবং রোমান লিপিতে মূলের প্রত্যেকটি অক্ষরের উচ্চারণ প্রদর্শন এবং সেই অক্ষরের ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া আছে, সেই সংস্করণও কিছু-কিছু পড়িয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি কৌতূহল-পরবশ হইয়া Paul Carus-প্রদত্ত সানুবাদমূল চীনার সহিত অমিতেন্দ্রনাথ-কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ একটু-আধটু মিলাইয়া দেখিয়াছি। দেখিয়া খুশী হইয়াছি যে সাধারণতঃ এই বাঙ্গালা অনুবাদ মূলের পরিপন্থী হয় নাই—মূলের গৌরব ইহাতে অক্ষুণ্ণ আছে। অনুবাদ সুখপাঠ্য হওয়া চাই, এবং সেই দিক্ হইতে আমি বলিব যে শুদ্ধ চলিত-ভাষায় রচিত এই অনুবাদ পড়িয়া যাইতে কষ্ট হয় না, মনে হয় না যে ইহা অনুবাদ। স্থানে-স্থানে চীনা ভাষার নিজস্ব রীতিকে হয়তো বাঙ্গালায় আনা সম্ভবপর হয় নাই, তাহা হইলেও এই বাঙ্গালা অনুবাদখানিকে মূল বাঙ্গালা গ্রন্থ বলিয়াই মনে হয়। আজকাল বাঙ্গালা চলিত ভাষা গুণী লেখকের হাতে যে অপূর্ব শক্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে, অমিতেন্দ্রনাথও এই অনুবাদে তাহার সম্পূর্ণ প্রয়োগ সার্থক ভাবে করিয়াছেন। মূল চীনা রচনাতে স্থানে-স্থানে কবিতা আছে ; এবং সূত্রাকারে ছোট-ছোট বাক্যের মধ্যে নিবদ্ধ বলিয়া, ইহার গদ্য অংশও কবিতাধর্মী। বাঙ্গালা অনুবাদে মূল কবিতার ছত্রগুলি ও গদ্য অংশের সূত্রাকারে গ্রথিত বাক্যগুলি পৃথক্-পৃথক্ ছত্রে মুদ্রিত হওয়াতে, পাঠকের চোখের পক্ষে ও রসাস্বাদনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে।

আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, চীনের তথা বিশ্ব-সাহিত্যের এই মহাগ্রন্থ যে এইভাবে তাহার সহজ সৌন্দর্য্য ও ভাব-ভাম্ভীর্য্য এবং গভীর অন্তর্মুখিতা লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সভায় প্রবেশ করিতে পারিল, ইহা আমাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কথা ও গৌরবের কথা।

আমার বাড়িতে একটি প্রকোষ্ঠে দেওয়ালে পাথরের উপরে আমি তাও-তেঃ-চিঙ্ হইতে গৃহীত তিনটি ছত্র প্রাচীন চীনা ধাঁচের অক্ষরে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। পিকিঙ-এর আধুনিক চীনা [এবং বন্ধনীর মধ্যে আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার প্রাচীন চীনা] উচ্চারণ ধরিয়া, সেই অক্ষরগুলির রোমান ও বাঙ্গালা প্রত্যক্ষর ও আক্ষরিক অনুবাদ, সহজ ব্যাখ্যামূলক অর্থ, এবং শ্রীযুক্ত অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ দিয়া এই প্রবন্ধের সমাপ্তি করিতেছি। (লাও-ৎসে-র সময়ের প্রাচীন চীনা উচ্চারণ প্রদর্শনের চেষ্টা, সুইডেন-দেশীয় বিখ্যাত চীনাবিদ্যাবিৎ Bernhard Karlgren বের্ন্‌হার্ড্ কার্ল্‌গ্রেন-এর পুনর্গঠন অনুসরণে করা হইয়াছে।

১। Thien Hsia Mu থিয়েন শিয়া মু [Thien Gha Mwi থিয়েন ঘ.া মুই]

আকাশ, নীচু (বা পৃথিবী), মাতা।

Wu Pu Chi Chhi Ming র়ু পূ চী ছী মিঙ্

[Ngwo Puat Tyie বা Tya Ghyi Myaeng

ঙুও পুঅৎ ত্যিএ বা ত্যা ঘ.্যী ম্যায়্ঙ্]

আমি না জানি ইহার নাম।

'Tsz' Chih, Yueh Tao ৎসঃ চ্যঃ, য়ুয়ঃ তাও

[Dzhi Tsyi, Yiwat Dhau দ্ঝি চ্যী, য়িরৎ ধাউ]

বর্ণনা-করি একে, বলি 'পথ' বা 'ঋত' ॥

[অর্থাৎ, আকাশ আর পৃথিবী এই দৃশ্যমান সব-কিছুর মাতা বা আদি কারণ— ইহার নাম-রূপ বা বর্ণনা কাহারও জানা নাই— অবাঙ্‌মনোগোচর। যদি ইহার বর্ণনা করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ইহা হইতেছে 'পথ'— অর্থাৎ যাহার মধ্য দিয়া সব-কিছু চলিয়াছে— ইহাই 'ঋত' অর্থাৎ শাশ্বত সত্তা, ব্রহ্ম বা সত্য বা ধর্ম।]

অমিতেন্দ্রনাথের অনুবাদে—

আকাশের নীচে সব-কিছুর 'মা'।
এর নিজের নামটি কি, তা আমার জানা নেই ;
তবে এর পোষাকী নাম হ'চ্ছে 'তাও'।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রমেশ-রচনাবলী। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ। মূল্য নয় টাকা।
প্রবন্ধসংকলন: রমেশচন্দ্র দত্ত। শ্রীনিখিল সেন কর্তৃক সম্পাদিত। এভারেস্ট বুক হাউস। মূল্য পাঁচ টাকা।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) মহাশয় অর্ধশতাব্দীর অধিককাল পরলোকগত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর কীর্তি তাঁকে আমাদের কাছে চিরজীবী করে রাখবে। অবশ্য রমেশচন্দ্রকে জানবার যে প্রধান উপায়, অর্থাৎ তাঁর রচনাবলী, তার সঙ্গে পাঠকসাধারণের যোগাযোগ কিছুকাল পূর্বে বিঘ্নিত হয়েছিল, কেননা, তাঁর গ্রন্থাবলী, উপন্যাস অংশ খুব সুলভ ছিল না। আবার, বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সাময়িক ও মাসিক পত্রে বহুদিন ধরে ছড়িয়ে ছিল, সেগুলিকে সংকলিত করবার প্রয়াসও পূর্বে ফলপ্রসূ হয় নি। একখণ্ডে রমেশচন্দ্র দত্তের সবগুলি উপন্যাসকে সংগ্রথিত করে বই বার করার সাধু দায়িত্ব প্রকাশক পালন করেছেন। তাঁরা পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও তাঁর অন্যান্য মননধর্মী রচনাবলীকে দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ডে প্রকাশ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। শ্রীযুক্ত নিখিল সেনের উৎসাহে রমেশচন্দ্রের চিন্তাসমৃদ্ধ পরিচয় 'প্রবন্ধসংকলন' গ্রন্থে পাঠকসাধারণ পাবেন। তবে রমেশচন্দ্রের ইংরাজি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলি, বিশেষতঃ, *A History of Civilisation in Ancient India* (Vols 1-3), *The Economic History of India, India in the Victorian age—An Economic History of the People* এবং *The Peasantry of Bengal* না পড়লে তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর রাষ্ট্র ও অর্থনীতি বিষয়ক বলিষ্ঠ চিন্তা, তাঁর স্বদেশীয় ইতিহাসচেতনা সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। তাঁর *Literature of Bengal*ও একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে কর্তৃক সম্পাদিত Bengal Magazineএ *Literature of Bengal* এবং *Peasantry of Bengal* ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন রমেশচন্দ্রের গ্রন্থাদি ও সমস্ত প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত হওয়া প্রয়োজন।

রমেশচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের শক্তিকে নিজের মধ্যে সংহত করতে পেরেছিলেন। আতশ কাঁচ যেমন বিকীর্ণ সূর্যরশ্মিকণাকে সংহত করে একটি জ্বলন্ত শিখায় রূপান্তর ঘটায়, রমেশচন্দ্র তাঁর স্বচ্ছ মনোদর্পণে উনবিংশ শতকের রেনেসাঁসী রৌদ্রচ্ছটাকে সাগ্রহে ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর চিত্তলোক সেজন্যই জ্ঞান-অগ্নিতে দীপ্যমান হয়েছিল। অগ্নির মত ক্ষুধা নিয়ে তিনি এসেছিলেন—সে ক্ষুধা জ্ঞানচর্চার, জিজ্ঞাসার। বিত্তের দ্বারা মানুষ তর্পণীয় হয় না, উপনিষদের এই মহদ্‌বাক্য তিনি আজীবন স্মরণ করেছেন, তাই তাঁর জীবনসায়াহ্নে লিখতে পারেন:

> Tell me your honest opinion, Sharada, do you not think, I would do well to devote the remaining years of my life in writing such books as the 'Lake of Palms'—as, in compiling a complete history of the Indian people from the earliest times to the twentieth century—than to work and vegetate in Baroda? (17th April 1907).

উনবিংশ শতকে আমাদের দেশে যে সর্বাত্মক নবচেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল তার মূল শক্তিকেন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণের মধ্য দিয়েই ঘটল আমাদের যথার্থ ভারত-

আবিষ্কার। যে ভারতকে নিয়ে আজ আমরা গর্বিত অতীতের সেই ভারতকে আমরা চিনতাম না। ১৭৮৪তে কলিকাতায় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। এবং তার পর জোন্‌স প্রিন্‌সেপ কোলব্রুক, উইলকিন্‌স থেকে উইলসন্ কাওএল পর্যন্ত বহু ইংরেজ সুধী প্রাচ্যসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগবশত প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের মধ্যে বিদ্যমান বিস্মৃতির যবনিকা ছিন্ন করার প্রয়াস পেয়েছেন। কাজেই পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের দেশে আবির্ভূত হয়ে প্রকৃতপক্ষে আমাদের গৌরববাহিনী দেশকে তার সমৃদ্ধ অতীত রূপকে আমাদের কাছে নতুন করে তুলে ধরেছে। এই সময়ে রামমোহন রায় জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উপনিষদের কয়েকখানি বঙ্গভাষানুবাদ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে সাধারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বেদ-উপনিষদের কোনো বিশেষ খবর রাখতেন বলে মনে হয় না, তাঁরা নব্যস্মৃতি নব্যন্যায় এবং ব্যাকরণের চর্চা করতেন। রামমোহনের সহযোগী পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদ-উপনিষদ্ চর্চা করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁরই কাছে শাস্ত্রাদি পাঠ করেন এই সংবাদ পেয়ে বিদ্যাবাগীশের প্রতি দ্বারকানাথ ঠাকুর বিরক্ত হয়েছিলেন, কেননা এর ফলে দেবেন্দ্রনাথের বিষয়-বিরাগী হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। পরে দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ প্রকাশ সেই শাস্ত্রশিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল। ভারতের ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্বের প্রতি ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম। রাজেন্দ্রলালের উত্তরসাধকদের মধ্যে বিশিষ্ট হলেন বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস। এইসূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম স্বতঃই স্মরণে আসে। রামমোহন রায় তাঁর 'সহমরণ' গ্রন্থে প্রবর্তক-নিবর্তক সংবাদে সহমরণ বা সতীদাহ-প্রথার অশাস্ত্রীয়তা প্রদর্শন করেছিলেন। শাস্ত্রপ্রামাণ্য ভিন্ন শুধু হৃদয়হীন প্রথার নিন্দা সেদিনকার সমাজে গ্রাহ্য ছিল না। শাস্ত্র-প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য রামমোহন রায় ঐ পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কৌলীন্যপ্রথার দৌলতে তৎকালীন সমাজে শিশু-বিধবার কোনো অভাব ছিল না। বিদ্যাসাগর অন্তরে বিধবাদের জন্য গভীর বেদনাবোধ করেছিলেন, তার প্রতিকারের জন্য তাঁকেও শাস্ত্রপ্রামাণ্য উপস্থাপিত করতে হয়েছে। এরই মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে প্রাচীন শাস্ত্র-সংহিতায় প্রকৃতপক্ষে কী আছে সে কথা জানবার কৌতূহল জেগেছে, এইটি খুব বড় কথা। রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন: "শাস্ত্র যেখানে আছে সেইখানেই পড়ে আছে, তার উপর সহস্র প্রথাকীটের বল্মীক উঠেছে"। সেই শাস্ত্রকে জানবার ও জানাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন পাশ্চাত্যমনা গোষ্ঠী। কালীপ্রসন্ন সিংহ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তায় মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর প্রথম আরম্ভ করেন, কিন্তু কালীপ্রসন্নের প্রচেষ্টার কথা শুনে আর অগ্রসর না হয়ে বরং নানাভাবে কালীপ্রসন্নকেই সহায়তা করেন। গীতার বঙ্গানুবাদেও কালীপ্রসন্ন বহুদূর এগিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও বঙ্গদেশের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, অন্যদিকে কৃষ্ণচরিত্র ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে তিনি শাস্ত্র ও পুরাণের নবভাষ্যকার রূপে দেখা দিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'হিন্দুশাস্ত্র' গ্রন্থের সপ্তম খণ্ড অর্থাৎ মহাভারত ও ভগবদ্গীতা অংশের সানুবাদ সংকলনের ভার গ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অকাল তিরোধানে ঐ কার্য সম্পাদন করেন দামোদর বিদ্যারত্ন।

রমেশচন্দ্র এই ঐতিহ্যেরই বরণীয় বাহক। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা সর্বাধিক ছিল। যে বিদ্যাসাগর অমৃত মিত্রের পাত থেকে মাছের মুড়ো তুলে নিয়েছিলেন, তিনি সেকালের পক্ষে যে কতদূর সংস্কারমুক্ত ছিলেন এই ঘটনা থেকেই সে কথা সহজেই অনুমেয়। রমেশচন্দ্র যখন প্রথম ঋগ্‌বেদের অনুবাদ প্রকাশে যত্নবান হন (১৮৮৫) তখন বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র ও কৃষ্ণকমল তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রেরণা ও

সমর্থন দান করেন। শূদ্র কর্তৃক বেদপাঠ যে দেশে নিষিদ্ধ ছিল, (এমনকি রামমোহন রায়ও শূদ্রের বেদপাঠের অধিকার স্বীকার করেন নি) সেখানে স্বভাবতই 'শূদ্র' কর্তৃক ঋগ্‌বেদের ভাষান্তর চেষ্টা যে রক্ষণশীল গোষ্ঠী কর্তৃক আক্রান্ত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? আনন্দের কথা, রমেশচন্দ্রের 'ঋগ্বেদের দেবগণ' (১-৬ প্রস্তাব) রচনাগুলি আলোচ্য 'প্রবন্ধ-সংকলন' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার ভারত-চেতনা ও ইতিহাস-চেতনাকে সমার্থক ধরতে হবে। কেননা ইতিহাসের মধ্য দিয়েই খাঁটি স্বদেশ-পরিচয় ঘটে। কাজেই স্বদেশানুরাগ ও ইতিহাসপ্রীতি একসূত্রে বিধৃত। স্বদেশের ইতিহাসকে নতুন ভাবে দেখা ও গঠন করার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বাল্যকাল থেকেই রমেশচন্দ্র ইতিহাসানুরাগী ছিলেন। ইতিহাস-পাঠ একদিকে তাঁকে দিয়েছে স্বদেশের ইতিহাস -রচনার প্রেরণা, জুগিয়েছে স্বাদেশিকতার আবেগ, অপরদিকে সঞ্চার করেছে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনার প্রবণতা।

উনবিংশ শতকে আমাদের জাতীয় জীবনের আর-একটি দিক শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে হল রায়ত ও জমিদারের পারস্পরিক সম্পর্ক। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ছিল বঙ্গদেশের জমিদারদের পক্ষভুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' মুখ্যত তাঁদেরই পত্রিকা। এই পত্রিকা নীলকরদের অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেছে, সাদা-কালো চামড়ার অধিকারগত বৈষম্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে, কিন্তু দেশের রায়তদের ন্যায্য আন্দোলন বা দাবির বেলায় রায়তদের পক্ষে দাঁড়ায় নি, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ বা class interestএর দিক থেকে। (সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ভাষায় 'essentially and by its creed an Association of land-holders')। বাংলাদেশের প্রটেস্টাণ্ট মিশনরীরা একবার গভর্নর জেনারেলের কাছে দেশের রায়তদের দুঃখদুর্দশা বর্ণনা করে দীর্ঘ একখানি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন, তার জন্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট (১৬ এপ্রিল ১৮৫৭) অতীব ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন দেখা যায়। বরং সঞ্জীবচন্দ্র জমিদার ও রায়ত নিয়ে *Bengal Ryots: their Rights and Liabilities* etc. নামে যে বই লিখেছিলেন ক্যালকাটা রিভিউ (১৮৬৪) তার সমালোচনা কালে বলেছিলেন: is apparently a genuine and patriotic effort to defend the cause of the weak against the strong. বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশীয় কৃষক' প্রবন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল, জমিতে কৃষকের স্বত্বহীনতা, বৃটিশ শাসনে হিন্দু-মুসলমান চাষীর দুরবস্থা সর্বজনবোধ্য করে প্রকাশ করেন। রায়ত-জমিদার সম্পর্কে প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদের প্রবন্ধদ্বয়ের কথা ও পরবর্তীকালে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'Rais & Rayyet' (১৮৮২) পত্রিকার কথা সুধীবর্গ জ্ঞাত আছেন। রমেশচন্দ্র তাঁর *The Peasantry of Bengal* (1874) গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে এই সমস্যার প্রতি নতুন আলোকপাত করেছেন। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমর্থন করেছিলেন, এইটুকু জেনেই বহুব্যক্তি তাঁকে নিন্দাবাদ করতে অভ্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষকের এমন কল্যাণকামী মানুষ আমাদের দেশে সেকালে বেশি ছিলেন না। তিনি জমিদারী ব্যবস্থার আমূল বিলোপের প্রস্তাব করেন নি, অতএব তিনি 'প্রতি-ক্রিয়াশীল' এ ধরণের উক্তি ঠিক নয়। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রচিত এই প্রবন্ধগুলিতে রমেশচন্দ্র জমিদারদের সর্বপ্রকার অন্যায় ও অত্যাচারের বিরোধিতা করেছেন। ১৮৭৩ সালে পাবনায় রায়ত ও জমিদারদের মধ্যে ভীষণ হাঙ্গামা হয়। এই প্রজা-বিদ্রোহকে আমাদের সেদিনকার 'জাতীয়তাবাদী' পত্রিকাগুলি প্রবলভাবে নিন্দা করেছিল, সেইদিন রমেশচন্দ্র অকুতোভয়ে রচনা করেন 'An Apology for Pubna Rioteer', প্রবন্ধটি Arcy Dae-এর নামে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সম্পাদিত Bengal Magazine এর

১৮৭৩ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন জমিদারেরা তাঁদের আদৌ প্রাপ্য নয় এমন কর ও শস্যভাগ নানা অছিলায় প্রজাদের কাছ থেকে জোরজুলুম করে আদায় করেছেন এবং বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১৮৫৯এর দশম ধারাকে তাঁরা স্বেচ্ছায় অগ্রাহ্য করেছেন, সেজন্যই এই সংঘবদ্ধ প্রজাবিদ্রোহ ঘটেছে অনিবার্য ভাবে। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, রায়ত ও জমিদারদের মধ্যে দেয় ও প্রাপ্য কর সম্পর্কে একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া দরকার এবং তাঁর মতে 'This we submit will be a noble recognition of the rights of the Bengal Peasants which have unfortunately been so long and so shamefully ignored by the British Government.' ভারতবর্ষের সর্বত্রই এই রীতি প্রচলিত হোক রমেশচন্দ্র এরূপ আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ করেছিলেন। আলোচ্য 'প্রবন্ধ সংকলন'-গ্রন্থের 'ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল', ও 'ভারতবাসীদিগের দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষের কারণ' প্রবন্ধ দুটিতে সরকার, জমিদার ও রায়ত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য জানা যায়। রমেশচন্দ্রই ভারতবাসীর মধ্যে প্রথম ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর *The Economic History of India* (1757-1837) এবং *India in the Victorian Age* (1837-1900) বই দুখানি প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর পাঠ করা উচিত। তিনি খাঁটি ঐতিহাসিক গবেষণার পথে তৎকালীন লভ্য সমস্ত উপাদান সহযোগে দেখিয়েছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্ত অবধি ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনে কী গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটে গিয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধসংকলনে 'ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা' 'বৃটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি' 'ভারতীয় দুর্ভিক্ষ তাহার কারণ ও প্রতিকার' 'বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত রচনাগুলি থেকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে পুরাতন জমিদারীর লুপ্তি, হঠাৎ জমিদারদের উত্থান, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেবীসিংহ, ব্রজকিশোর প্রভৃতি কোম্পানি-পোষিত আমলাদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও জমিদারী লাভ, ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক অন্যায়কারীর পক্ষাবলম্বন, গভর্নর জেনারেলদের দেশি বেনিয়ানদে'র বেনামীতে জমিদারী ক্রয় ও প্রজাশোষণ প্রভৃতি তথ্য পাঠকসাধারণ জানতে পারবেন। কী ভাবে কোম্পানির আমলে আমাদের দেশে প্রজার সর্বনাশ ও কুটীরশিল্পের অবসান ঘটেছে তার বিবরণ এখানে সংক্ষেপে মিলবে। সুখের বিষয়, এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর পাঠ্য তালিকায় ইতিহাস শাস্ত্রের একটি পত্রে 'অর্থনৈতিক ইতিহাস' পড়াবার ব্যবস্থা করেছেন—রমেশচন্দ্রের যুগান্তকারী গ্রন্থগুলি এবার সমাদৃত হবে আশা করা যায়। এ কথা কেউই অস্বীকার করেন না যে পরবর্তীকালের চিন্তাধারার আলোকে বা নতুন তথ্য আবিষ্কারের ফলে রমেশচন্দ্রের গ্রন্থের কোনো কোনো স্থল আজ আর আমাদের স্বীকৃতি লাভ করে না। কিন্তু তার ফলে ঐ গ্রন্থদ্বয়ের মহিমা ক্ষুণ্ন হয় না।

রমেশচন্দ্র বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য দান রেখে গেছেন। যদিচ কুণ্ঠিত পদক্ষেপে তাঁর প্রথম আগমন কিন্তু শেষে তিনি নিজের শক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে তিনি উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হন। তাঁর বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪) মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭) রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯) ও মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত (১৮৭৮) গ্রন্থ চতুষ্টয় 'শতবর্ষ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। বস্তুত এই উপন্যাসগুলির বর্ণিত বিষয় ষোড়শ শতকের শেষার্ধ থেকে সপ্তদশ শতকের শেষপাদ অবধি বিস্তৃত। রমেশচন্দ্র নিজের সম্পর্কে লিখেছেন যে যুগপৎ ইতিহাসপ্রীতি ও ওয়ালটার স্কটের রচনাপ্রীতি তাঁর শিল্পীমানসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে গিবনের *Roman Empire* তাঁর খুব প্রিয় গ্রন্থ ছিল। রমেশচন্দ্রের

'শতবর্ষ' বা উক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সমাহার প্রকৃতপক্ষে 'Mogul Empire' বললে অসত্য হয় না। এবং গিবনের গ্রন্থের দ্বারা সম্ভবত তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

রমেশচন্দ্রের প্রথম রচনা 'বঙ্গবিজেতা' তেমন সবল রচনা নয়। প্লট বা চরিত্রসৃষ্টি কোনো দিকেই তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। নায়ক ও ভিলেন চরিত্র অঙ্কনে প্রচলিত গতানুগতিক রূপ তিনি গ্রহণ করেছেন এবং পরিশেষে সকল বিচ্ছেদের রূপকথাসুলভ মিলন ঘটিয়ে এবং পাপীর শাস্তিদান করে আখ্যান শেষ করেছেন।

মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ও রাজপুত জীবনসন্ধ্যা রমেশচন্দ্রের দুখানি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ইতিহাসপ্রীতির সঙ্গে তাঁর মনে স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত ছিল। উনবিংশ শতকে ও বিংশ শতকের প্রথম দশকে আমাদের স্বাদেশিক চেতনা বা জাতীয়তাবাদী কল্পনার সঙ্গে রাজপুত মারাঠা ও শিখদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ইতিহাস অচ্ছেদ্যভাবে মিশে ছিল। সেজন্যই এই 'জাতীয়তাবাদ'কে অনেকে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ' বলে আখ্যাত করেন। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) কর্মদেবী (১৮৬২), বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ (১৮৮২, ১৮৯৩), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী (১৮৭৫), অশ্রুমতী (১৮৭৯), হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীত (১৮৬৯), রবীন্দ্রনাথের 'গুরুগোবিন্দ' কবিতা, কথা কাব্য (১৯০০), শিবাজী-উৎসব কবিতা, কলিকাতায় তিলক মহারাজ-প্রবর্তিত গণপতি উৎসব পালন, প্রভৃতি অসংখ্য তথ্য এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে।

রমেশচন্দ্র 'জীবনপ্রভাত' রচনার পূর্বে মারাঠাদের ইতিহাস পাঠ করেন এবং একখানি উপন্যাস রচনার সংকল্প নেন: "I read Grant Duff's inspiring work on the history of the Maharattas and spent my nights in dreaming over a story of Shivaji।" এবং তাঁর ইতিহাস-চেতনা ও স্বদেশপ্রেম কিভাবে 'জীবনপ্রভাত'-গ্রন্থে একসূত্রে দেখা দিয়েছে তাঁর নিজের উক্তি থেকেই তার পরিচয় মেলে:

'পাঠক! একত্র বসিয়া এক একবার প্রাচীন গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে এই অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি।'

'জীবনসন্ধ্যা'ও অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত। মহাবীর শিবাজী ও মহারাণা প্রতাপসিংহের স্বদেশব্রত তাঁর চিত্তকে অভিভূত করেছিল, তিনি তাঁদেরই 'আদর্শ' বীররূপে বরণ করেছিলেন। ইতিহাসকে তিনি যথাশক্তি অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন। যথার্থ 'ঐতিহাসিক কল্পনা' তাঁর ছিল এবং তিনি আমাদের তাঁর বর্ণিত স্থান ও কালের পরিমণ্ডলে যে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছেন সেখানেই তিনি সার্থককাম।

'সাহিত্য সংসদ' কর্তৃক প্রকাশিত রমেশরচনাবলীর উপন্যাস খণ্ড সকলের কাছেই আদৃত হবে। গ্রন্থাবলীর প্রারম্ভে মুদ্রিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় রচিত ভূমিকাটি তথ্যপূর্ণ প্রশংসনীয় রচনা। বিশেষভাবে রমেশচন্দ্র সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার লিখিত ও মডার্ন রিভিউ (জানুয়ারি ১৯১০) পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি উৎকলন করে যোগেশবাবু একটি মহৎ কাজ করেছেন। পরিশেষে ঐ প্রবন্ধের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করে বক্তব্যের উপসংহার টানি। : "Ramesh Chunder Dutt was a man of his own people. The object of all he ever did was not his own fame, but the uplifting of India"

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

স্বরলিপি

আমার   প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি—
   হায় বুঝি তার খবর পেলে না।
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কি—
   হায় বুঝি তার নাগাল মেলে না ॥
প্রেমের বাদল নামল, তুমি জানো না হায় তাও কি।
আজ   মেঘের ডাকে তোমার মনের ময়ূরকে নাচাও কি।
আমি   সেতারেতে তার বেঁধেছি, আমি সুরলোকের সুর সেধেছি,
তারি   তানে তানে মনে প্রাণে মিলিয়ে গলা গাও কি—
   হায় আসরেতে বুঝি এলে না।
ডাক উঠেছে বারে বারে, তুমি সাড়া দাও কি।
আজ   ঝুলনদিনে দোলন লাগে, তোমার পরান হেলে না ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

না না II {না না -র্সা । র্সা [র্]র্সা -না I না না -র্সা । না [ন]ধা -পা I
আ মার্ প্রা ণে র্ মা ঝে ০ সু ধা ০ আ ছে ০

I পা -ধা না । -া -া -া I মা -পা পা । পা পা -মা I
চা ও কি ০ ০ ০ হা য়্ বু ঝি তা র্

I পা পা -ধা । না -ধা না I ধপা -া -া । -া (না না)} I -া -া I
খ ব র্ পে ০ লে না০ ০ ০ ০ আ মার্ ০ ০

I পা পা -দা । দা [প]দা -পা I পা পা -দা । মা -পদা -[ম]পা I
পা রি ০ জা তে র্ ম ধু র্ গ ০০ ন্

I মগা -া -া । -া -া -মা I মা -পা পা । -া -া -া I
ধ০ ০ ০ ০ ০ ০ পা ও কি ০ ০ ০

I পর্সা -া র্সা । র্সা [র্]র্সা -না I না না -ধপা । পা -র্মা [র্স]না I
হা০ য়্ বু ঝি তা র্ না গা ০ল্ মে ০ লে

I ধপা -া -া । -া -া -া I পা পা -দা । দা পদা -পা I
না॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ প্রা ণে র্ মা ঝে ॰

I পা পা -দা । দা দা -পা I মপা -দপা মগা । -া না না II
সু ধা ॰ আ ছে ॰ চা॰ ॰ও কি॰ ॰ "আ মার্"

[-া র্সর্জ্জা র্সর্জ্জা]
-া II {র্সনা র্সা -র্জ্জা । র্জ্জা র্জ্জা -র্রা I র্রা -া র্রা । র্রা র্সর্জ্জা -র্রা I
॰ প্রে॰ মে র্ বা দ ল্ না ম্ ল তু মি ॰

I র্সা র্সা -র্রা । র্রা র্সর্জ্জা -র্রা I র্সর্রা -র্জ্জর্রা র্সনা । -া (-া -া)} I না -া I
জা নো ॰ না হা য়্ তা॰ ॰ও কি॰ ॰ ॰ ॰ আ জ্

I না না -র্সা । র্সা -া -া I র্সা -র্রা -র্রর্সা । -না না -া I
মে ঘে র্ ডা ॰ ॰ কে ॰ ॰ ॰ আ জ্

I {না না -র্সা । র্সা র্সা -া I পর্সা র্সা -া । র্সা র্রর্সা -না I
মে ঘে র্ ডা কে ॰ তো মা র্ ম নে র্

I না না -র্সা । ধনা -া ধপা I পা -ধা না । -া (না -া)} I গা গমা I
ম য়ূ র্ কে ॰ না॰ চা ও কি ॰ আ জ্ আ মি॰

I {মা মা -পা । পা পা -া I পা -া -ধা । না নধা -না I
সে তা ॰ রে তে ॰ তা ॰ র্ বেঁ ধে॰ ॰

I নধপা -া -া । পা ধপা -মা I মা মা -পা । পধা পা -াম I
ছি॰ ॰ ॰ আ মি ॰ সু র ॰ লো॰ কে র্

I মা -া -পা । পধা মপা -া I মগা -া -া । -া (গা গমা)} I না না I
সু ॰ র্ সে॰ ধে॰ ॰ ছি॰ ॰ ॰ ॰ আ মি॰ তা রি

I {না না -র্সা । র্সা র্সা -া I পর্সা র্সা -া । র্সা র্রসা -না I
তা নে ॰ তা নে ॰ ম নে ॰ প্রা ণে ॰

I না না র্সা । না নধা -পা I পা -ধা না । -া (না না)} I গা -মা I
মি লি য়ে গ লা° ° গা ও কি ° তা রি হা য়্

I {মা মা -পা । পা পা -া I পা পা -ধা । না -ধা না I
আ স ° রে তে ° বু ঝি ° এ ° লে

[-র্মা র্মজ্জা র্মজ্জা]

I ধপা -া -া । -া (গা -মা)} I -া -া I {র্সা -জ্জা জ্জা । জ্জা র্মজ্জা -র্রা I
না° ° ° ° হা য়্ ° ° ডা ক্ উ ঠে ছে °

I র্রা র্রা -া । র্রা র্মজ্জা -র্রা I র্সা র্সা -র্রা । র্রা র্মজ্জা -র্রা I
বা রে ° বা রে ° তু মি ° সা ড়া °

I র্সর্রা -জ্জর্রা র্সনা । -া (-া -া)} I না -া I না নর্সা র্সা । র্সা -া -া I
দা° °ও কি° ° ° ° আ জ্ ঝু ল° ন দি ° °

I র্সা -র্রা -র্রর্সা । -না না -া I না নর্সা র্সা । র্সা র্সা -া I
নে ° ° ° আ জ্ ঝু ল° ন দি নে °

I পর্সা র্সা র্সা । র্সা র্রর্সা -না I না না -র্সা । না নধা -পা I
দো ল ন লা গে ° তো মা র্ প রা° ন্

I পা পা -ধা । (না না -া)} I নর্সা -ধনা -া I পা পা -দা । দা ণদা -পা I
হে লে ° না আ জ্ না° ° ° প্রা ণে র্ মা ঝে °

I পা পা -দা । দা দা -পা I মপা -দপা মগা । -া না না II II
সু ধা ° আ ছে ° চা° °ও কি° ° "আ মার্"

সম্পাদকের নিবেদন

রেভারেণ্ড্ সি. এফ. এণ্ডরুজের (১৮৭১ - ১৯৪০) নাম তখন এ দেশে তত পরিচিত নয়, সেই সময়ে, ১৯১২ সালে, তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় বিলাতে। প্রথম-পরিচয়েই এণ্ডরুজের ব্যক্তিত্বের ও মহত্ত্বের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হন ; 'ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি' শীর্ষক প্রবন্ধে ("পথের সঞ্চয়" গ্রন্থে সংকলিত) সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "আমি যাঁহার কথা বলিতেছি ইনি রেভারেণ্ড এণ্ডরুজ।· ·তিনি আপনার মধ্যে যে ইংরেজ রাজা আছে তাহাকে একেবারে হার মানাইয়াছেন এবং আমাদের আপন হইবার পবিত্র অধিকার লাভ করিয়াছেন।" উত্তরকালে এই পরিচয় নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে পরিণত হয়। এণ্ডরুজের নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী *Letters to a Friend* (১৯২৮) গ্রন্থে সংকলিত আছে। বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় অন্যান্য রচনার সঙ্গে উক্ত পত্রাবলীর কয়েকটির অনুবাদ মুদ্রিত হল।

বর্তমান বর্ষের প্রথম দুই সংখ্যায় রবীন্দ্রশতপূর্তি-উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ-গ্রন্থাবলীর যে সূচী মুদ্রিত হয়েছে, বর্তমান সংখ্যায় সেই গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রকাশ করা হল। গ্রন্থের ও গ্রন্থাবলীর সংখ্যা সামান্য নয়, এইজন্যে এই আলোচনায় প্রত্যেক গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে লেখা সম্ভব হয় নি। কোন্ গ্রন্থের আলোচনা কতটা স্থান অধিকার করেছে তার দ্বারা গ্রন্থের উৎকর্ষেরও বিচার করা হয় নি।

১৯৬২ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন জন স্টাইনবেক, সেই উপলক্ষে স্টাইনবেক সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে।

স্বীকৃতি

রমা করকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত 'একাকী' চিত্র রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

জন স্টাইনবেকের চিত্রটি দিয়েছেন ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস।

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

উনবিংশ বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৬৯ - আষাঢ় ১৩৭০ · ১৮৮৪-৫ শক

বিষয়সূচী

শ্রীঅজিত দত্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা ২৬০

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য

মানুষ ও বিশ্বজগৎ ৭

ক্ষিতিমোহন সেন

শুভযাত্রা ১২৬

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইভো আন্দ্রিচ ২১১

সরকারী দলিলে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা ২৮৩

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

গ্রন্থপরিচয় ২২৬

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দ্বিজেন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি ২৮৩

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

জন্ স্টাইনবেক ৩৩৮

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

গ্রন্থপরিচয় ১০৭, ৪২৩

শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শতবার্ষিক রবীন্দ্রচর্চা ৩৭০

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সনেট : রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ২৫৯

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

গ্রন্থপরিচয় ১০৬

শ্রীপুণ্যশ্লোক রায়

বাংলাভাষার স্বর ও ছন্দ : আলোচনা ২২১

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

'ছন্দ-ধাঁধা' পরিচয় ১৮৮

শ্রীবিজিতকুমার দত্ত

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৪

গ্রন্থপরিচয় · দ্বিজেন্দ্রপ্রসঙ্গ ৩০০

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

আনন্দবর্ধন ও রসপ্রস্থান ৫০

রসাদ্বৈতবাদ ২৪৫

গ্রন্থপরিচয় ৩১৩

শ্রীভবতোষ দত্ত

বাংলা কাব্যে দুই রীতি ৩২৫

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভারতবর্ষীয় সভা ৮৬, ১৫৩, ২৯১, ৩৪২

শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল · জীবনভাষ্য ২৭২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছন্দ-কণিকা [illegible]

ছন্দ-ধাঁধা ১১[illegible]

চিঠিপত্র ১২৫, ৩২[illegible]

ছন্দ ২৩[illegible]

পত্রাবলী · সি. এফ. এণ্ডরুজকে লিখিত ৪০৭

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র
আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত সংগীত ১৩২
শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ-গ্রন্থপঞ্জী ৯৪
শ্রীশিশিরকুমার দাশ
কোম্পানির আমলে বাংলা ভাষা ৭০
'বাংলা ভাষার স্বর ও ছন্দ' : আলোচনা ২২০
শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার
স্বরলিপি : 'যদি হায় জীবন পূরণ· ·' ১১৩
স্বরলিপি : 'হে নিরুপমা· ·' ২৩০
স্বরলিপি : 'পিনাকেতে লাগে টঙ্কার' ৩১৭
স্বরলিপি · 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে· ·' ৪২৮
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়
প্রকাশবাদ ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাসা ১৯৫
রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য ৩৪৯
শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত
স্যাঁ-জন প্যার্স ২১
সম্পাদকের নিবেদন ১১৭, ৩১৯, ৪৩২
শ্রীসুকুমার সেন
রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ ৩৫
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে ২১
গ্রন্থপরিচয় ৪১
শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার
আমাদের জীবনীসাহিত্য ১৪৫
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
নাটকের নাটকীয়তা · দ্বিজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গে ২৬৮

চিত্রসূচী

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
একাকী ৩২১
শ্রীনন্দলাল বসু
ভাবিনী ১
নটীর পূজা ১১৯
শীতের পদ্মা ২৩৭
আলোকচিত্র
আইন-ই-আকবরীর একটি পৃষ্ঠা ১৩৫
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৬
ইভো আন্দ্রিচ ২১৪
স্যাঁ-জন প্যার্স ২১৫
দ্বিজেন্দ্রলালের 'সনেট' পাণ্ডুলিপিচিত্র ২৫৯
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ২৬৮
জন স্টাইনবেক ৩৩৮
সি. এফ. এণ্ড্রুজ ৪০০

॥ ওরিয়েণ্টের সাহিত্য সম্ভার

• রবীন্দ্র সাহিত্য •

ডঃ তারকনাথ ঘোষ
রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ৫·০০
প্রমথনাথ বিশী
রবীন্দ্র-বিচিত্রা ৫·৫০
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১ম ৫·০০
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ২য় ৫·০০
প্রতিভা গুপ্ত
শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ৬·০০
সমীরণ চট্টোপাধ্যায়
শারোদৎসব-দর্শন ২·০০
গুরু-দর্শন ২·৫০
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ ৩·২৫
ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা ১২·০০
রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ১২·০০
রেণু মিত্র
রবীন্দ্র-হৃদয় ৫·০০

• জীবনচরিত •

নগেন্দ্রকুমার গুহরায়
ডাঃ বিধান রায়ের জীবনচরিত ৮৲
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
আত্ম-চরিত ১২·০০
প্রকাশচন্দ্র রায়
অঘোর-প্রকাশ ৫·০০
[বিধানচন্দ্রের পিতা-মাতার আত্ম-চরিত]
স্বামী অমিতানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের যারা এসেছিল সাথে ৪·০০

ঃ জীবন চরিত ঃ

সুশীল রায়
স্মরণীয় ৮·০০
উপেন্দ্রকুমার দাস
ভক্ত কবীর ৫·০০
রোমা রোলা
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ৬·০০
বিবেকানন্দের জীবন ৬·০০
মহাত্মা গান্ধী ৩·০০
ঋষিদাস
গান্ধীচরিত ৬·০০
সেক্সপীয়র ৮·০০
বার্ণাড শ ৬·০০
আবুল কালাম আজাদ ৩·০০
রাজনারায়ণ বসুর
আত্মচরিত ৫·০০
অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র মৈত্র
বাংলা কবিতার নবজন্ম ১৫·০০
অধ্যাপক শ্রীহুমায়ুন কবির
নয়া ভারতের শিক্ষা ৮·০০
সুধীরচন্দ্র কর
শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা ৪·০০
ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ১০·০০
কালিদাস রায়
বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ৮·০০
মাধুকরী ৬·০০
নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য
বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস ৫·০০
অনাদিনাথ পাল
নেহেরু ও পররাষ্ট্রনীতি ৫·০০

• ভ্রমণ-কাহিনী •

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
হিমালয়-পারে কৈলাস ও মানস সরোবর ৮৲
কল্যাণী প্রামাণিক
দুনিয়া দেখছি [২য় মুদ্রণ] ৫·০০
জ্যোতিষচন্দ্র রায়
কেদার-বদরী ৪·৫০
রামনাথ বিশ্বাস
ভারত-ভ্রমণ ৫·০০
বার্তাবহ
মহাচীনে শ্রীনেহেরু ৩·৫০

• কাব্য ও কবিতা •

প্রমথনাথ বিশী
শ্রেষ্ঠ-কবিতা ৬·০০
কল্যাণী প্রামাণিক
শিশু-তরু ২·০০
খোকনবাবু ২·০০

প্রবন্ধ ও সমালোচনা

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী
ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ৬·০০
যোগেশচন্দ্র রায়
কি লিখি ? ৩·৫০
অনন্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থ
বৈভাষিক দর্শন ২০·০০
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
বাংলা-গ্রন্থ-বর্গীকরণ ১০·০০
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক ৯·০০

॥ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা ১২ ॥

ভালো কাগজের
দরকার থাকলে

এই ঠিকানায়
অনুসন্ধান করুন

দেশী বিদেশী বহু বিচিত্র
কাগজের ভাণ্ডার

**এইচ. কে. ঘোষ
অ্যাণ্ড কোম্পানী**

২৫এ সোয়ালো লেন। কলিকাতা
টেলিফোন ॥ ২২-৫২০৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখন

রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্যসুন্দর হাতের লেখায় তাঁহার কবি-মানসের অপরূপ পরিচয়-লিপি। এই গ্রন্থের বাংলা ও ইংরেজী কবিতিকাগুলি সংখ্যায় আড়াই শতের অধিক, ইতিপূর্বে অন্য কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নি। জাপানী বাঁধাই, মূল্য ৪˙০০, শোভন সংস্করণ ১০˙০০ টাকা।

স্ফুলিঙ্গ

লেখনের সগোত্র আরও বহু কবিতা যাহা রবীন্দ্রনাথের নানা পাণ্ডুলিপিতে, বিভিন্ন পত্রিকায়, ও তাঁহার স্নেহভাজন বা আশীর্বাদপ্রার্থীদের সংগ্রহে বিক্ষিপ্ত ছিল, সেই রকম আরো ১৯৮টি কবিতাসমষ্টির সংকলন 'স্ফুলিঙ্গ'। মূল্য ৩˙৫০, শোভন সংস্করণ ৫˙৫০ টাকা।

গল্পগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ-রচিত সমস্ত গল্প চার খণ্ডে সম্পূর্ণ গল্পগুচ্ছে একত্র গ্রথিত হয়েছে। মূল্য প্রথম খণ্ড ৪˙০০, দ্বিতীয় খণ্ড ৪˙৫০, তৃতীয় খণ্ড ৪˙০০ ও সম্প্রতি প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড ৫˙০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

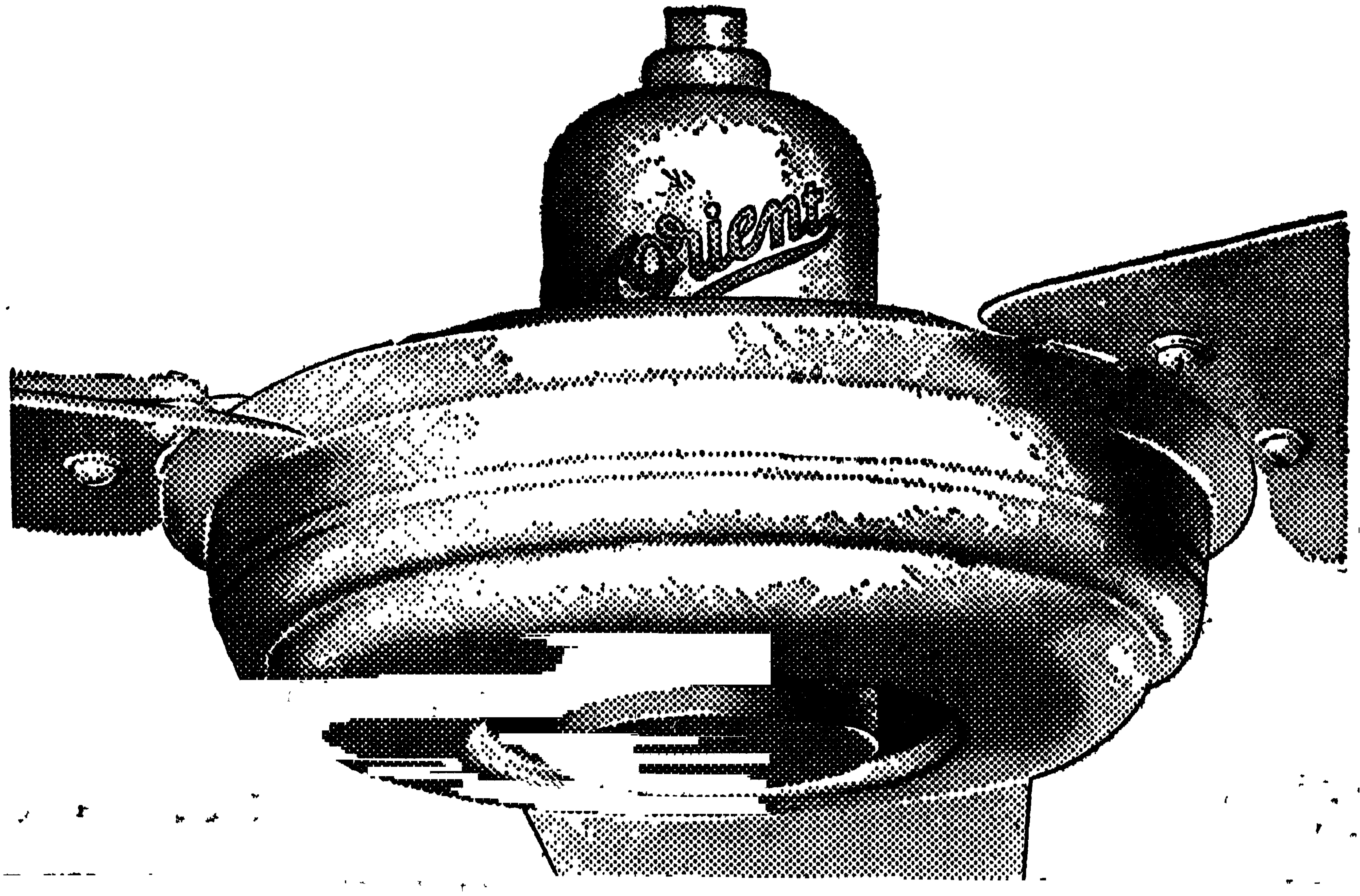

BETTER FANS ARE BUILT THROUGH BETTER ENGINEERING

that is the Orient way

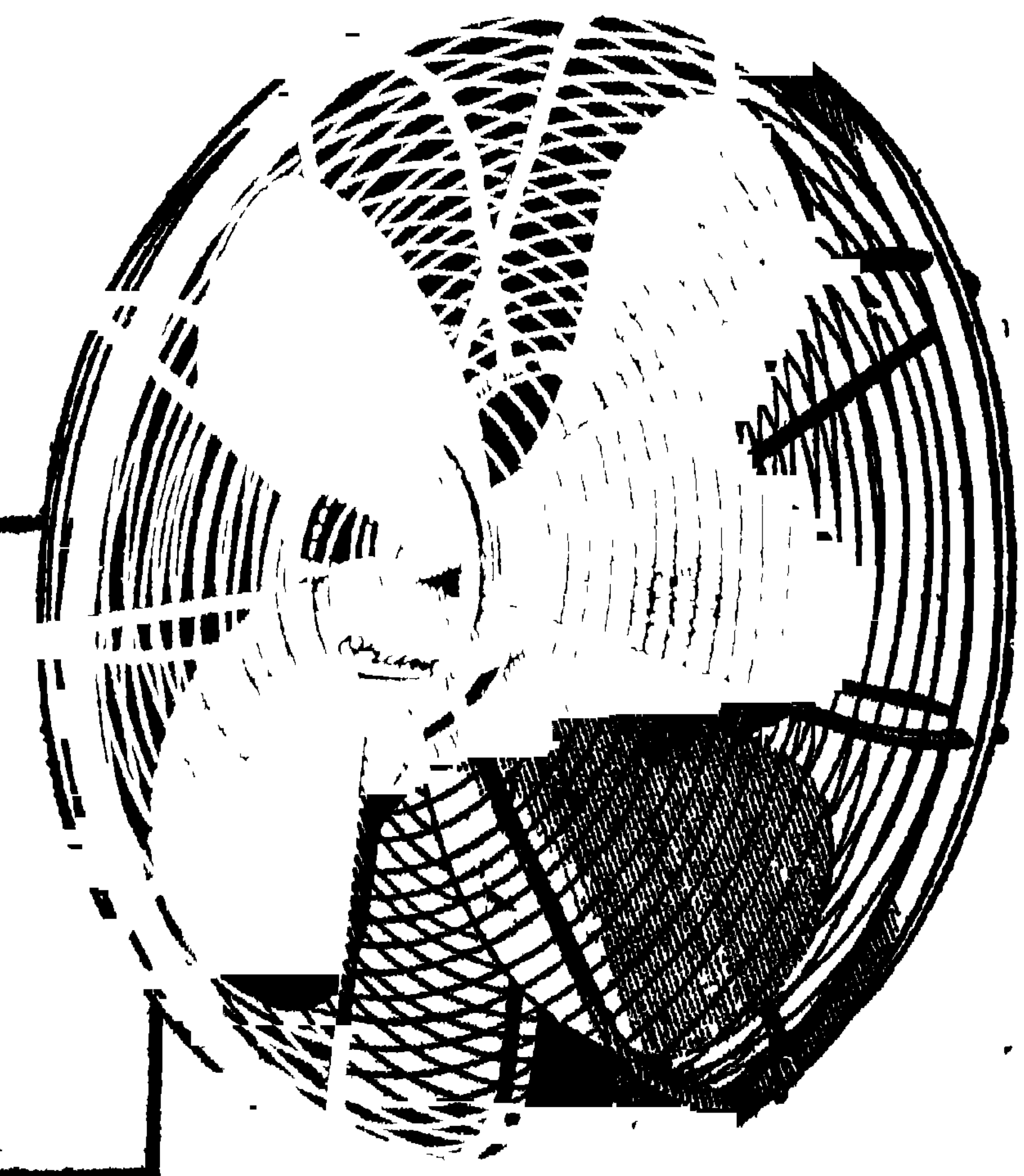

Orient FANS

Years ahead in looks and performance

ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD. CALCUTTA-11

ASP/OGI-2

প্রকাশিত হল

আমাদের গুরুদেব

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

রবীন্দ্রজীবনের ও রবীন্দ্রনাথের সাধনার কেন্দ্র শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে

সসম্ভ্রম ও অন্তরঙ্গ আলোচনা। সচিত্র। মূল্য ৩.৫০ টাকা

আমাদের শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

সরল স্বচ্ছ সশ্রদ্ধ এবং মাঝে মাঝে মৃদু কৌতুকের ছোপ দেওয়া শান্তিনিকেতনের কাহিনী। মূল্য ৫.০০ টাকা

কাব্যপরিক্রমা ॥ অজিতকুমার চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা, রাজা, ডাকঘর, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, ধর্মসংগীত, গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য গ্রন্থের আলোচনা। মূল্য ২.২৫ টাকা

ব্রহ্মবিদ্যালয় ॥ অজিতকুমার চক্রবর্তী

শান্তিনিকেতন ও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রারম্ভ-যুগের ইতিহাস ও আদর্শ। মূল্য ১.৮০ টাকা

রবীন্দ্রনাথ ॥ অজিতকুমার চক্রবর্তী

রবীন্দ্র-সাহিত্য-বিষয়ক প্রথম রীতিমত সমালোচনা। মূল্য ২.০০ টাকা

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীঅমিয়কুমার সেন

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের যথার্থ রূপটি ব্যক্ত হয়েছে এই গ্রন্থে। মূল্য ৫.০০ টাকা

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম ॥ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

চলিত কথায় যাকে গান-ভাঙা বলা হয় দৃষ্টান্ত-সহ তার আলোচনা। মূল্য ২.০০ টাকা

রবীন্দ্রস্মৃতি ॥ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

সংগীত কাব্য নাট্য ও পারিবারিক স্মৃতির কাহিনী। মূল্য ২.০০ টাকা

নির্বাণ ॥ শ্রীপ্রতিমা দেবী

কবিজীবনের সর্বশেষ অধ্যায়টি এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। মূল্য ১.০০ টাকা

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সুন্দর গদ্যে এবং পরিচ্ছন্ন ভাষায় রবীন্দ্র-সনাথ শান্তিনিকেতনের উপভোগ্য বিবরণ। মূল্য ৪.০০ টাকা

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীরানী চন্দ

জীবনের শেষ সাত বৎসর আলাপ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেসব কথাবার্তা-আলোচনাদি করেছেন তার আংশিক সংকলন। মূল্য ৩.৫০ টাকা

গুরুদেব ॥ শ্রীরানী চন্দ

রবীন্দ্রজীবনের শেষ কয় বছরের কাহিনী। মূল্য ৫.০০ টাকা

রবীন্দ্রসংগীত ॥ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণ। মূল্য ৭.০০ টাকা

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর এবং রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড বিষয়ে তথ্যপূর্ণ মৌলিক গবেষণাগ্রন্থ,
বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র এবং রেকর্ডের বিস্তারিত তালিকা ও শিল্পীতালিকাসহ

কবিকণ্ঠ

॥ সন্তোষকুমার দে ও কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য ॥

সুদীর্ঘ ভূমিকার একস্থানে অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন—

"এই গ্রন্থ…রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত তথা সাহিত্যকৃতির একটি মুখ্য অঙ্গ নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষণার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই গবেষণায় পরোক্ষ অনুমান বা কল্পনার কোনো স্থান নেই। আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে যুক্তিপ্রমাণ এবং দলিলাদি প্রত্যক্ষ নিদর্শনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত।…রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত এবং তাঁর সাহিত্য ও সংগীতের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গবেষণা করবেন তাঁদের সকলের পক্ষেই এই গ্রন্থ অপরিহার্য হয়ে থাকবে।"

দাম—৫৲

রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ ॥ সন্তোষকুমার দে ১৲

প্রাপ্তিস্থান

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লি

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

অটুট বন্ধুত্ব

যেখানে দুজনের রুচির মিল, সেখানেই বন্ধুত্ব বেশী স্থায়ী হয়। এই সাইকেলের বেলাতেই দেখুন না!
র‍্যালে সাইকেলের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সকলেই একমত। কারণ সুদৃশ্য ও নিখুঁত এই সাইকেলটি বছরের পর বছর ব্যবহারের পরেও সমান নির্ভরযোগ্য থাকে।

বিশ্ববিখ্যাত
বাইসাইকেল

SRC-59 BEN

রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত

দীপিকা

রবীন্দ্ররচনার দ্বিতীয় সংকলন গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা একত্র সংকলিত হয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হল। নয়জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এই সংকলন প্রস্তুত করেছেন। ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'বিচিত্রা'য় যে সব রচনা প্রকাশ করা যায়নি, 'দীপিকা'য় তার থেকে নির্বাচন করে রচনা সংকলন করা হয়েছে। এই জন্যে 'দীপিকা' গ্রন্থটি 'বিচিত্রা'র পরিপূরক হিসাবে গণ্য করা যায়।

মূল্য ৭·৫০ টাকা • বোর্ড বাধাই ৮·৫০ টাকা

বিশ্বভারতী

জগদীশবা[illegible]র গীতা

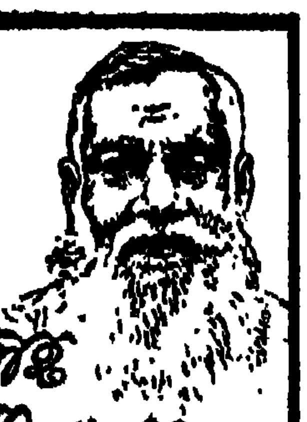

মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-রহস্য ভূমিকাসহ অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ৬·০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা ৫·০০

ভা.[illegible]-আত্মার বাণী ভারতের শাশ্বতবাণী বিশ্বমৈত্রীর কথা ৫·০০

শিক্ষার্থীর ধর্ম শিক্ষা ১·৫০

কর্মবাণী ১·২৫

সুলেখক **শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত**

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	**বাংলার ঋষি**	৩·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	**বাংলার মনীষী**	১·২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	**বাংলার বিদুষী**	২·০০
আচার্য **জগদীশ**	২·০০	*রাজর্ষি* **রামমোহন**	১·৫০
আচার্য **প্রফুল্লচন্দ্র**	১·৫০	*যুগাচার্য* **বিবেকানন্দ**	১·৫০
জীবন গড়া	·৭৫	**রবীন্দ্রনাথ**	১·২৫

ব্যবহা.[illegible] শব্দকোষ

প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান বহুল পরিবর্ধিত ও বহু পরিশিষ্ট-সংবলিত ৯·৫০

STUDENTS' OWN DICTIONARY OF WORDS, PHRASES & IDIOMS

প্রয়োগমূলক নূতনধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান। এই দুই যুগান্তকারী সুসঙ্কলিত সর্বদা-ব্যবহার্য অভিধান প্রত্যেকের অপরিহার্য। ৭·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী· ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

"দেখেছি সকলের চেয়ে গুরুতর অভাব আরোগ্যের,
আধমরা মানুষ নিয়ে দেশে কোনো বড় কাজের পত্তন
সম্ভব নয়, তারা কাজে ফাঁকি দেয় প্রাণের দায়ে, আর সেই
কারণেই প্রাণের দায় দুরূহ হ'য়ে ওঠে।
আমরা অনেক সময় দোষ দেই বাহ্য কারণকে — কিন্তু
রোগজীর্ণতা পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জার মধ্যে বাস
ক'রে গুরুতর কর্তব্যের ভারকে ভগ্ন উদ্যমের ফাটল দিয়ে
পথে পথে সে ছড়িয়ে দিতে থাকে, লক্ষ্যস্থানে অল্পই পৌঁছায়—"

—রবীন্দ্রনাথ

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

শতো-দ্বিতম রবীন্দ্রবর্ষে

হিন্দুস্থানের নিবেদন

হিন্দুস্থান লাইট গ্রীণ লেবেল
মূল্য ৪৲ টাকা
Excise Duty ৩৫ নয়া পয়সা

শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস

H 2141 / এচ ২১৪১
সে যে বাহির হল — রবীন্দ্রসঙ্গীত
সকরুণ বেণু বাজায়ে — ঐ

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত

H 2142 / এচ ২১৪২
ধীরে ধীরে ধীরে বও — রবীন্দ্রসঙ্গীত
বুঝি ওই সুদূরে — ব্রহ্মসঙ্গীত

শ্রীসুবিনয় রায়

H 2143 / এচ ২১৪৩
তোমায় আমায় — রবীন্দ্রসঙ্গীত
বহে নিরন্তর অনন্ত — ঐ

শ্রীমতী রিণী চৌধুরী

H 2117 / এচ ২১১৭
আমি কেবলি স্বপন — রবীন্দ্রসঙ্গীত
আরো একটু বসো — ঐ

শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস

H 2145 / এচ ২১৪৫
সখী ভাবনা কাহারে — রবীন্দ্রসঙ্গীত
আসা-যাওয়ার পথের — ঐ

শ্রীসলিলকুমার মিত্র

H 2146 / এচ ২১৪৬
"জাগরণে যায়" — বেহালা বাদ্য
"এবার তোর মরা" — ঐ

শ্রীঅজিত রায়

H 2104 / এচ ২১০৪
"এ মণিহার আমায়" — গীটার বাদ্য
"পুরানো সেই দিনের" — ঐ

আপনার ডিলারের নিকট শুনুন

হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রডাক্টস্ লিঃ
কলিকাতা ১২

Statement about ownership and other particulars about

VISVA-BHARATI PATRIKA (Bengali)

1. Place of Publication : Calcutta.
2. Periodicity of its publication : Quarterly.
3. Printer's Name : Prabhat Chandra Ray.
   Nationality : Indian.
   Address : 5, Chintamani Das Lane, Calcutta-9.
4. Publisher's Name : Sushil Ray.
   Nationality : Indian.
   Address : 5, Dwarkanath Tagore Lane, Calcutta-7.
5. Editor's Name : Sudhi Ranjan Das.
   Nationality : Indian.
   Address : 5, Dwarkanath Tagore Lane, Calcutta-7.
6. Name and address of individuals who own the newspaper : Visva-Bharati University, Santiniketan, Dt. Birbhum.

I, Sushil Ray, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(Sd.) Sushil Ray
Signature of Publisher.
1-3-63

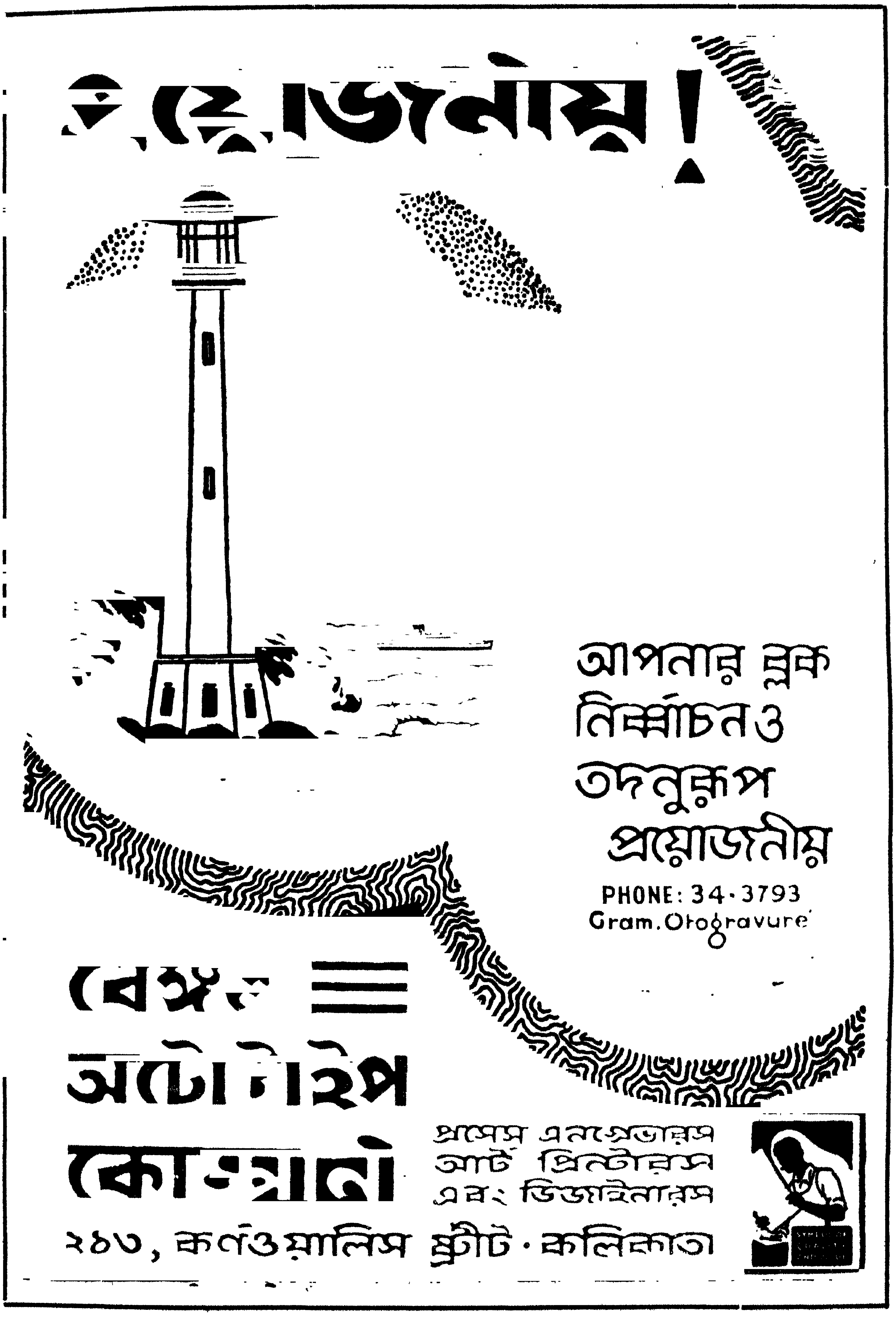

প্রয়োজনীয়!
আপনার ব্লক
নির্ব্বাচন ও
তদনুরূপ
প্রয়োজনীয়
PHONE: 34-3793
Gram. Otogravure
বেঙ্গল
অটোটাইপ
কোম্পানী
প্রসেস এনগ্রেভারস
আর্ট প্রিন্টারস
এবং ডিজাইনারস
২১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট · কলিকাতা

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি॥
— রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের সশ্রদ্ধ উপহার —
রেকর্ডে নতুন নতুন রবীন্দ্রসংগীতের পসরা!

নতুন বেরুল — লং প্লেইং রেকর্ডে কবিগুরুর গীতি-নাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' — ECLP 2272

৪৫ আর-পি এম (ঈ-পী) রেকর্ড

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র
এ শুধু অলস মায়া ;
বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা
7 EPE 1007 (?)

কণিকা বন্দ্যোঃ ও দ্বিজেন মুখোঃ
আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা ;
আমরা নূতন যৌবনেরি দূত
7 EPE 1007

সুচিত্রা মিত্র
জীবন যখন শুকায়ে যায় ;
দুখের তিমিরে যদি জ্বলে ;
আগুনের পরশমণি ;
কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ
EPE 1009

'রেকর্ড-সঙ্গীত' পত্রিকা
১১নং সংখ্যা বেরিয়েছে।
দাম ১.৫০ নঃ পঃ

৭৮ আর-পি-এম রেকর্ড

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়
হায় গো, ব্যথায় কথা
অনেক কথা যাও যে বলে
GE 25134

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
তোমারি তরে মা
আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
N 83010

পূরবী মুখোপাধ্যায়
কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন
দিয়ে যেও বসন্তের এই
GE 25135

সুচিত্রা মিত্র
ফাগুনের পূর্ণিমা এলো
দেখা না দেখায় মেশা হে
N 83009

বাণী ঠাকুর
দীপ নিবে গেছে মম
হে মাধবী, দ্বিধা কেন
GE 25138

মঞ্জুলা গুহঠাকুরতা
তুমি হঠাৎ হাওয়ায়
আহা তোমার সঙ্গে
GE 25136

আলপনা রায়
পুষ্পবনে পুষ্প নাহি
দুজনে দেখা হল
N 83012

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
সে আসে ধীরে
আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল
GE 25139

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়
ধরা দিয়েছি গো
কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
N 83013

শীলা সেন
পরবাসী চলে এসো ঘরে
মম চিত্তে নিতি নৃত্যে
N 83011

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়
ঘরেতে ভ্রমর এল
আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা
GE 25137

৪৫ আর-পি-এম (ঈ-পী) রেকর্ড

হেমন্ত মুখোঃ ও লতা মঙ্গেশকর
তোমার হ'ল শুরু ;
মধু গন্ধে ভরা
SEDE 3001

কৃষ্ণা চট্টোঃ ও তরুণ বন্দ্যোঃ
বাদল ছেঁড়ার সাধন ;
আমরা পথে পথে যাব
SEDE 3001

পঙ্কজ মল্লিক
আমারে তুমি অশেষ করেছ ;
তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
দিন যদি হলো অবসান ;
ভয় হতে তব অভয় মাঝে
7-ERE 2

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়
তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা ;
প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন

পূরবী মুখোপাধ্যায়
এ মণিহার আমায় নাহি সাজে
আমার যোগের যে জন
7-EPE 1008

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড-তালিকা ডীলারদের কাছে পাবেন

'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' ও কলম্বিয়া

প্রকাশক শ্রীসুশীল রায় • বিশ্বভারতী • ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন • কলিকাতা ৭
মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় • শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড • ৫ চিন্তামণি দাস লেন • কলিকাতা ৯
চিত্র ও ব্লক মুদ্রক • বেঙ্গল অটোটাইপ কোম্পানি • ২১৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট • কলিকাতা ৬